মুসলিম উম্মাহর পতনে

বিশ্বের কী ক্ষতি হলো?

সাইয়েদ আবুল হাসান আলী নাদাবী রহ.

ماذا خسر العالم بانحطاط المسلمين؟

মুসলিম উম্মাহর পতনে

বিশ্বের কী ক্ষতি হলো?

সাইয়েদ আবুল হাসান আলী নাদাবী (রহ.)
(১৩৩৩ - ১৪২০ হি.)
(১৯১৪ - ১৯৯৯ খৃ.)

অনুবাদ
আবু তাহের মেছবাহ

দারুলকলম
আশরাফাবাদ (কামরাঙ্গীরচর) ঢাকা, ১২১১
জাওওয়াল, ০১৬৭৫-৪৭৭৯৪৪
(০২) ৯৫১৪৫৬৬

মুসলিম উম্মাহর পতনে
বিশ্বের কী ক্ষতি হল?
সাইয়্যেদ আবুল হাসান আলী নাদাবী (রহ.)
অনুবাদ, আবু তাহের মেছবাহ

দারুলকলম প্রকাশনা – ২৬

প্রচ্ছদ ঃ বশির মেছবাহ

প্রথম প্রকাশ
শাওয়াল ১৪৩৪ হি.
আগস্ট ২০১৩ খৃ.

কম্পিউটার কম্পোজ
দারুলকলম কম্পিউটার
আশরাফাবাদ, ঢাকা

হাদিয়া– ২৩০ . ০০ (দু'শ ত্রিশ টাকামাত্র)

ISBN 978-984-90663-0-9

আমার পুত্র মুহাম্মাদকে

আল্লাহ যেন তাকে নামের মর্যাদা
রক্ষা করার
তাওফীক দান করেন।
আল্লাহ যেন তাকে কিতাবের সমগ্র চেতনা
ধারণ করার তাওফীক দান করেন।
ছাহিবে কিতাবের ইখলাছ ও তাকওয়া,
আবেগ ও জাযবা এবং ফিকির ও প্রজ্ঞা
আল্লাহ যেন আরো বাড়িয়ে তাকে দান করেন।
আল্লাহ যেন তাকে
আমার সমস্ত নেক কাজের উত্তম ওয়ারিছ
এবং إلا من ثلاثة এর ثالث বানিয়ে দেন।
এই দু'আ তার জন্য এবং
ছাহিবে ফিকর সমস্ত তালিবানে ইলমের জন্য, আমীন।

قال الله تعالى :

إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَذِكْرَىٰ لِمَن كَانَ لَهُۥ قَلْبٌ أَوْ أَلْقَى ٱلسَّمْعَ وَهُوَ شَهِيدٌ ﴿٣٧﴾

অতিঅবশ্যই তাতে রয়েছে উপদেশ এমন ব্যক্তির জন্য যার রয়েছে অন্তর, অথবা যে কর্ণপাত করে, মনোযোগের সঙ্গে

(সূরা ক্বাফ, ৫০ : ৩৭)

***

قال النبي صلى الله عليه وسلم :

الناس كإبل مائة، لاتكاد تجد فيها راحلة

(رواه مسلم وابن ماجه عن ابن عمر، واللفظ له)

মানুষ যেন একশ উটের দল, যাতে সওয়ারি-যোগ্য একটিও পাওয়া তোমার জন্য কঠিন।

মুসলিম উম্মাহর
পতনে
বিশ্বের কী
ক্ষতি হলো?

মুসলিম উম্মাহর
পতনে
বিশ্বের কী ক্ষতি
হলো?

আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি, ماذا خسر العالم بانحطاط المسلمين বইটি হাতে পেয়ে একদিনেরও কম সময়ে তা পাঠ করেছি এবং বইটির প্রতি গভীর ভালোবাসায় আবদ্ধ হয়েছি। এমনকি পড়া শেষ করে, আমার নোসখার শেষ পৃষ্ঠায় এ বাক্যটি লিখে রেখেছি–

ইসলামের মর্যাদা ও গৌরব ফিরিয়ে আনার জন্য কাজ করছে, এমন প্রত্যেকের অপরিহার্য কর্তব্য হলো, এ বইটি পড়া (এবং মনে রাখা)।

– ডঃ মুহম্মদ ইউসুফ মূসা (রহ.)
আল-আযহার বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রফেসর
মিশরের সর্বজনমান্য ইসলামী চিন্তাবিদ

***

আমার সুচিন্তিত মত এই যে, বইটি (র ইংরেজি তরজমা) বৃটেন থেকে প্রকাশিত হওয়া উচিত। কেননা বর্তমান শতাব্দীতে মুসলিম পুনর্জাগরণের যে প্রচেষ্টা উত্তম থেকে উত্তম উপায়ে হয়েছে, এ বইটি তার নমুনা ও ঐতিহাসিক দলীল।

ড. বাকিং হ্যাম
মিডল-ইস্ট সেকশন, লন্ডন ইউনিভার্সিটি

অনুবাদকের অনুবাদকর্ম

১/ মসজিদের মর্মবাণী (অংশবিশেষ, আরবী থেকে)
২/ গীবত (উর্দূ থেকে, সংক্ষেপিত) মূল, আল্লামা আব্দুল হাই লৌখনোবী (রহ.)
৩/ আরকানে আরবা'আ, মূল, হযরত মাওলানা সৈয়দ আবুল হাসান আলী নাদাবী রহ.
৪/ যোহাল ইসলাম (৩ খণ্ড, আরবী থেকে) মূল, ড. আহমদ আমীন
৫/ প্রাচ্যের উপহার (অংশবিশেষ), মূল, মাওলানা সৈয়দ আবুল হাসান আলী নাদাবী, রহ.
৬/ আল-মোরতাযা (উর্দূ থেকে) মূল, হযরত আলী নাদাবী, রহ.
৭/ জীবন পথের পাথেয় (উর্দূ থেকে), মূল হযরত আলী নাদাবী, রহ.
৮/ ইতিহাসের কাঠগড়ায় হযরত মু'আবিয়া রা. মূল, শায়খুল ইসলাম হযরত আল্লামা তাকী উছমানী
৯/ মাযহাব কী ও কেন? মূল, হযরত তাকী উছমানী
১০/ মাকামে ছাহাবা, মূল হযরত মাওলানা মুফতী শফী ছাহেব, রহ.
১১/ মাওলানা মুহম্মদ ইলয়াস রহ. ও তাঁর দ্বীনী দাওয়াত, মূল, হযরত আলী নাদাবী, রহ.
১২/ তোমাকে ভালোবাসি হে নবী! (উর্দূ থেকে) মূল, গুরুদত্ত সিং
১৩/ রিয়াদুছ-ছালেহীন (অংশবিশেষ), সঙ্কলক, আল্লামা নববী রহ.
১৪/ মুনতাখাব আহাদীছ (নির্বাচিত হাদীছ) সঙ্কলক, হযরতজী মাওলান ইউসুফ রহ.
১৫/ ফাযায়েলে আ'মাল, মূল শায়খুল হাদীছ হযরত যাকারিয়্যা রহ.
১৬/ হেকায়াতে ছাহাবা, মূল হযরত শায়খুল হাদীছ রহ.
১৭/ ফাযায়েলে ছাদাকাত, মূল হযরত শায়খুল হাদীছ রহ.
১৮/ হিদায়া (চার খণ্ড, চতুর্থ খণ্ডের কিছু অংশ ছাড়া)

কি /ছু /ক /থা

ছাহিবে কিতাব সম্পর্কে

মুসলিম উম্মাহর অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যত সম্পর্কে এ পর্যন্ত যা কিছু লেখা হয়েছে, তার মধ্যে, কোন সন্দেহ নেই, ماذا خسر العالم بانحطاط المسلمين؟ হচ্ছে সবচে' তথ্যপূর্ণ ও বাস্তবমুখী এবং সবচে' দরদপূর্ণ ও উদ্দীপনা সৃষ্টিকারী কিতাব, যার বাংলা তরজমা এখন পাঠকবর্গের হাতে আমরা তুলে দিতে যাচ্ছি। তরজমা সম্পর্কে কিছু বলার আগে কিতাব ও ছাহিবে কিতাব সম্পর্কে আমার অন্তরের কিছু অনুভব অনুভূতি এখানে তুলে ধরতে চাই।

ছাহিবে কিতাব, আমার জীবনের আদর্শপুরুষ, হযরত মাওলানা সাইয়েদ আবুল হাসান আলী নাদাবী রহ. এখন এই নশ্বর পৃথিবীতে বেঁচে নেই। মুসলিম উম্মাহর চলার পথে আলো ছড়িয়ে, জীবনের নির্ধারিত সময় পাড়ি দিয়ে, মৃত্যুর সেতু পার হয়ে, এখন তিনি কবরের শয্যায় শায়িত; রায়বেরেলীর কবরস্তানে, তাঁর মহান পূর্বপুরুষগণের সান্নিধ্যে। طيب الله ثراه

তাঁর জীবন আমি দেখিনি; দেখিনি তাঁর মৃত্যুও। মানুষের মুখে শুনেছি, আর কাগজের পাতায় পড়েছি। আমার বিশ্বাস, তাঁর আলোকিত জীবন ও সমুজ্জ্বল মৃত্যু দু'টোর মধ্যেই আমাদের জন্য রয়েছে অনেক শিক্ষা। সুতরাং আজ এখানে এই সুযোগে মুসলিম উম্মাহর দরদী এই মানুষটির জীবন ও মৃত্যু সম্পর্কে আমি কিছু বলতে চাই।

অনেক ভেবেছি, তাঁর জীবনের কথা আগে বলবো, না মৃত্যুর কথা! বুঝতে পারিনি। হঠাৎ হৃদয়ের গভীর থেকে কে যেন পথ দেখালো, আর বললো, মৃত্যুর কথাই আগে বলো। কারণ তাঁর জীবন ছিলো খুব সুন্দর, কিন্তু মৃত্যু ছিলো আরো সুন্দর। কল্পনা করো, রামাযানের পবিত্র মাস। রহমতের প্রথম দশদিন গত

হলো। রহীমের দরবারে তিনি রহমতের কাঙ্গাল হলেন, নিজের জন্য এবং উম্মতের জন্য। তারপর অতিবাহিত হলো মাগফিরাতের দ্বিতীয় দশদিন। গাফূরের দরবারে তিনি মাগফিরাতের ভিখারী হলেন, নিজের জন্য এবং উম্মতের জন্য।

রহমত-মাগফেরাতের পর শুরু হলো জাহান্নাম থেকে মুক্তির শেষ দশদিন। শুরু হলো তাঁর অশ্রুপাত এবং وقنا عذاب النار মুনাজাত, নিজের জন্য এবং উম্মতের জন্য। নবীর ওয়ারিছ যারা, উম্মতের দরদে দরদী হন তাঁরা। তাঁদের যা কিছু কান্না ও প্রার্থনা, দু'আ ও মুনাজাত, শুধু নিজের জন্য নয়; নিজের জন্য এবং প্রিয় নবীর প্রিয় উম্মতের জন্য।

সেদিন ছিলো ২৩শে রামাযান, শুক্রবার। জুমু'আর জামা'আতের সময় হয়ে এসেছে। সুন্নত গোসল সম্পন্ন করেছেন। কাফন-বর্ণের সাদা লেবাস পরেছেন; পাক-ছাফ লেবাস। আতর-খোশবু মেখে সুবাসিত হয়েছেন। এরপর এমন নাযুক অসুস্থতার মধ্যেও জুমার জামা'আতের ইনতিযার!

৯৩২ হিজরীতে মৃত্যুবরণকারী গুজরাতের দরবেশ-ছিফত বাদশাহ মুযাফ্ফর শাহ হালীম রহ. বলেছিলেন–

'যোহর তো তোমাদের এখানে পড়লাম, আছর ইনশাআল্লাহ জান্নাতে গিয়ে পড়বো।'

সেদিনও ছিলো **জুমার দিন**। অসুস্থতা ছিলো এত গুরুতর যে, বাদশাহ জুমার জামা'আতে **শরীক হতে পারে**ননি। অন্যদের তাগাদা দিয়ে জুমায় পাঠিয়ে মৃত্যু-শয্যায় তিনি **একা যোহর** পড়েছেন। দীর্ঘ **ছয় শতাব্দী** পর ১৪২০ হিজরীতে আল্লাহর এই প্রিয় **বান্দা** যেন বললেন, '**জুমার** নামায ইনশাআল্লাহ জান্নাতে পড়বো এবং জান্নাতে **ইফতার** করবো।'

সূরা ইয়াসীন, যার নাম ক্বালবুল কোরআন, যা মুমিনের মউতকে আসান করে, তিলাওয়াত শুরু করলেন। فبشره بمغفرة وأجر كريم পর্যন্ত পড়লেন, আর মৃত্যু এসে তাঁকে আলিঙ্গন করলো। এমন মৃত্যুকেই তো বলা হয় সুন্দর মৃত্যু! এমন মৃত্যুরই তো তামান্না প্রত্যেক মুমিনের দিলে! আমারও তামান্না, আল্লাহ যেন মাগফিরাতের এবং আজরে কারীমের খোশখবরওয়ালা মউত নছীব করেন, আমাকে এবং একটি দীর্ঘ সুন্দর জীবনের পর আমার সুন্দর মৃত্যুর জন্য যারা দু'আ করে তাদের সবাইকে, আমীন।

জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত প্রায় নব্বই বছরের দীর্ঘ জীবন তিনি যাপন করেছেন এই পৃথিবীতে, এই ভারতের মাটিতে। বড় সুন্দর জীবন ছিলো তাঁর, যেন একখণ্ড শুভ্র বস্ত্র, দাগহীন, নিষ্কলঙ্ক। সুন্নতকে ভালোবেসেছেন, সুন্নতের পথে চলেছেন এবং দূরের কাছের সবাইকে সুন্নতের পথে ডেকেছেন। সংশোধনের মাধ্যমে, নৈতিক, আত্মিক ও বুদ্ধিবৃত্তিক প্রস্তুতির মাধ্যমে উম্মাহ যেন আবার অগ্রসর হয় এবং বিশ্বনেতৃত্বের আসনে সমাসীন হয়, এজন্য উম্মাহর খেদমতে নিজেকে তিনি ওয়াক্ফ করেছেন।

এখানে এই সংক্ষিপ্ত পরিসরে তাঁর কীর্তিময় বিশাল জীবন সম্পর্কে আলোচনা করা তো সম্ভব নয়, শুধু বলা যায়, 'হৃদয়ের উদারতা, চিন্তার প্রসারতা, চেতনার গভীরতা, চরিত্রের পবিত্রতা, দ্বীনের প্রতি দরদ-ব্যথা, উম্মতের প্রতি মায়া-মমতা এবং বিশ্বমানবতার প্রতি দয়া ও করুণা, আল্লাহর কালিমাকে সকল কালিমার উপর বুলন্দ করার জন্য নিরন্তর জিহাদ ও মুজাহাদা, প্রতিটি আচরণে, প্রতিটি উচ্চারণে আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের ব্যাকুলতা', এগুলো ছিলো তাঁর শুভ্র-সুন্দর জীবনের কিছু উজ্জ্বল শিরোনাম।

তিনি যখন যা বলেছেন, একজনের সঙ্গে, কিংবা লক্ষজনতার সামনে, সকলে অনুভব করেছে, তাঁর মুখের কথায় রয়েছে দিলের গরমি ও হৃদয়ের উত্তাপ। তিনি যখন যা লিখেছেন, কোন শাসকের নামে, কিংবা পুরো উম্মাহর উদ্দেশ্যে, সকলে অনুভব করেছে, কাগজে কালো কালিতে রয়েছে অশ্রুর মিশ্রণ। মুখের কথায় দিলের তড়প এবং কলমের লেখায় কলবের 'ধড়কন', এটা ছিলো এ যুগে তাঁর প্রায় একক বৈশিষ্ট্য, যা তাঁর মুখের প্রতিটি কথাকে এবং কলমের প্রতিটি লেখাকে দূরের কাছের, তাঁর নিজের ভাষার, এমনকি অন্যান্য ভাষার মানুষের জন্যও উপকারী ও কল্যাণময় করে তুলেছে।

যত দিন বেঁচে ছিলেন, উম্মতের ইলমী, আমলী, আখলাকী, ফিকরী ও রূহানী তারবিয়াতে নিয়োজিত ছিলেন, আর ভক্তি-মুহব্বত ও শ্রদ্ধা-ভালোবাসায় আপ্লুত উম্মাহ তাঁর দীর্ঘ জীবনের জন্য প্রার্থনা করেছে। এখন রায়বেরেলীর কবর-শয্যায় শায়িত থেকেও কলমের ইরফান ও কলবের ফায়যান দ্বারা তিনি উম্মতের হিদায়াত ও রাহনুমাঈর খেদমত অব্যাহত রেখেছেন, আর উম্মত আল্লাহর দরবারে তাঁর মাগফিরাত ও দরজাবুলন্দির জন্য দু'আ করে চলেছে। এমন সুন্দর জীবন যারা যাপন করে এবং এমন সুন্দর মৃত্যু যারা বরণ করে, অবশ্যই তারা আল্লাহর পক্ষ হতে তাওফীকপ্রাপ্ত এবং সত্যি তারা বড় ভাগ্যবান।

কবরে শায়িত প্রিয়জনদের জন্য তাঁর একটি প্রিয় প্রার্থনা ছিলো, অনেকবার অনেক উপলক্ষে এ প্রার্থনা তিনি উচ্চারণ করেছেন, আমিও তাঁকে স্মরণ করে উচ্চারণ করি–

আসমান উনকে লাহদ প্যর শবনম আফশানি ক্যরে
সবযায়ে নওরাস্তা ইস ঘর কী ন্যগাহবানী ক্যরে

আসমান যেন তাঁর কবরে শবনম ঝরায়
সবুজ গালিচা যেন ঐ ঘর ঢেকে রাখে

***

তিনি নেই, কারণ তিনি মৃত্যুবরণ করেছেন। كل نفس ذائقة الموت আমাকে, তোমাকে, সবাইকে মৃত্যুর স্বাদ গ্রহণ করতে হবে। আমরা সবাই মৃত্যুর স্বাদ গ্রহণ করবো, যখন যার সময় হবে। আমাদের শুধু কর্তব্য, একটি সুন্দর জীবন যাপনের নিরন্তর সাধনায় আত্মনিয়োগ করা, যেখানে আছে হৃদয়ের পবিত্রতা, চরিত্রের সৌন্দর্য, কীর্তি ও কর্মের ঐশ্বর্য, চিন্তার উচ্চতা, আত্মার সজীবতা এবং উম্মাহর প্রতি দরদ-ব্যথা। আমাদের শুধু কর্তব্য, প্রতিটি কথা ও কাজের মাধ্যমে একটি সুন্দর মৃত্যুর জন্য প্রস্তুতি গ্রহণ করা, যেখানে আছে জান্নাতের খুশবু ও নূরের কাফনহাতে ফিরেশতাদের মুখের হাসি, যেখানে আছে ارجعي إلى ربك এর হৃদয়-প্রাণ আশ্বস্ত করা আহ্বান এবং আছে অনন্ত জীবনের উদ্দেশ্যে মহাপ্রয়াণের আনন্দ-উচ্ছ্বাস।

নশ্বর জীবনের বিচারে তিনি এখন আমাদের মাঝে নেই, এটা যেমন সত্য তেমনি এটাও সত্য যে, তিনি আছেন আমাদের হৃদয়ের মণিকোঠায়, আমাদের চেতনায়, প্রেরণায়, অনুভবে এবং আমাদের প্রার্থনায়। তিনি আছেন তাঁর বিপুল কর্ম ও কীর্তির মধ্যে, আমাদের জন্য রেখে যাওয়া তাঁর জ্ঞান, প্রজ্ঞা ও চিন্তা-সম্পদের মধ্যে।

***

জীবনের চলার পথে যখন অত্যন্ত প্রয়োজন ছিলো একজন অভিভাবকের, একজন আদর্শ পথপ্রদর্শকের; যখন সামনে চলার আকুতি ছিলো, কিন্তু প্রস্তুতি ছিলো না, পথের আঁক-বাঁক ও চড়াই-উৎরাই জানা ছিলো না; যখন চিন্তার মধ্যে আলোড়ন ছিলো, উত্তেজনা ছিলো, কিন্তু স্থিতি ছিলো না, প্রসারতা ও গভীরতা

ছিলো না; যখন কিছু করার অদম্য একটা উদ্যম ছিলো, কিন্তু জানা ছিলো না, কাজের উপায় কী, আয়োজন কী, পথ ও পন্থা কী? যখন নিজের কাছেই নিজের প্রশ্ন ছিলো, আমার অতীত কী, বর্তমান কী এবং আমার ভবিষ্যত কী? প্রশ্ন ছিলো কিন্তু উত্তর জানা ছিলো না, কিংবা যে উত্তর পেয়েছি তাতে আশ্বস্তি ছিলো না, প্রশান্তি ছিলো না, বরং হতাশা ও অস্থিরতা আরো বেড়ে যাওয়ার উপকরণ ছিলো; তখন, জীবনের সেই কঠিন প্রয়োজনের সময় আমি পেয়েছিলাম তাঁকে চলার পথের আলোরূপে, চিন্তা-চেতনার প্রদীপরূপে, মনের সব উত্তপ্ত প্রশ্নের প্রাণ-শীতলকারী উত্তররূপে এবং আগামী দিনের জন্য নিজেকে গড়ে তোলার কঠিন সাধনায় আত্মনিয়োগ করার সজীব প্রেরণারূপে। জীবনের যৌবনকালে, আসল পথচলা যখন শুরু হয় তখন আলোর অভাবে দ্বিধাগ্রস্ত ও হতাশায় চুপসে যাওয়া একজন তালিবে ইলমের জন্য এ পাওয়া যে কত বড় পাওয়া তা বুঝতে পারে শুধু সে-ই যে আলোর অভাবে চলার পথে বারবার হোঁচট খেয়েছে, পাথেয়র অভাবে বারবার যার পথচলা থেমে গিয়েছে এবং প্রেরণার অভাবে বারবার হতাশাগ্রস্ত হয়েছে!

তাঁর জীবন সম্পর্কে একসঙ্গে অনেক কিছু জানার সুযোগ আমার হয়নি; তবে যখন যেটুকু জেনেছি তাতে উদ্দীপ্ত হয়েছি। মনে হয়েছে আমার জীবনও বুঝি একটু একটু করে আলোকিত উদ্ভাসিত হচ্ছে। মনে হয়েছে; আমাকেও হতে হবে এমন, অন্তত যতটা কাছে যাওয়া যায় এমন আলোকিত জীবনের, এমন মহত্ত্বের, এমন শুভ্রতা ও পবিত্রতার।

পূর্ণ গ্রন্থরূপে প্রথম তাঁর যে লেখা আমার হাতে আসে তা হলো 'পুরানে চেরাগ' প্রথম খণ্ড। পরে তিনখণ্ড হয়েছে; তখন শুধু প্রথম খণ্ডটি ছিলো। সেখানে তিনি সমকালের বিশিষ্ট কিছু ব্যক্তি ও ব্যক্তিত্বের আলোচনা করেছেন নিজস্ব সম্পর্ক ও ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার আলোকে। তাতে ঐসকল বড় ব্যক্তিত্বের সঙ্গে যেমন শ্রদ্ধার সম্পর্ক তৈরী হয়েছে, তেমনি তাঁর জীবনেরও বিভিন্ন আলোকিত দিক আমার সামনে এসেছে জীবনের মূল্যবান পাথেয়রূপে।

তারপর পেলাম 'পা-জা সুরাগে যিন্দেগী'! এটি বিভিন্ন সময় তালিবানে ইলমের উদ্দেশ্যে দেয়া তাঁর বক্তৃতার মূল্যবান সঙ্কলন। কত দীর্ঘকাল আগের কথা! কিন্তু মনে হয়, এই সেদিনের কথা। বইটি প্রথমে পড়লাম প্রথম হাতে পাওয়ার আনন্দ -জোয়ারে প্লাবিত হয়ে একবারে। তারপর পড়লাম একটু একটু করে, সময় নিয়ে, পারিপার্শ্বিক ও মানসিক প্রস্তুতি নিয়ে। যতটুকু পড়ি ততটুকু

গভীরভাবে চিন্তা করি এবং হৃদয়ঙ্গম করার চেষ্টা করি। তার চেয়ে বড় কথা, লেখার হরফের যে ছাপ তার মধ্যে সেই মানুষটির জলছাপ দেখার চেষ্টা করি এবং .. এবং আশ্চর্য! মানুষ যাকে বলে নিষ্প্রাণ কালো হরফ, সেই হরফের মধ্যে আমি অনুভব করি, সেই জীবন্ত মানুষটির জীবন্ত হৃদয়ের স্নিগ্ধ কোমল স্পন্দন! এমনিতে শোনা যায় না, তবে যখন কেউ থাকে না, থাকে শুধু অখণ্ড নীরবতা, চোখের সামনে থাকে শুধু কিতাবের খোলা পাতা তখন ধীরে ধীরে কালো হরফের মধ্যে সেই জলছাপটি ভেসে ওঠে। চোখ বন্ধ করলে আরো উজ্জ্বল হয়ে ওঠে। বাইরের কান বন্ধ করে মনের কান পেতে রাখলে হৃদয়ের স্নিগ্ধ কোমল স্পন্দনটিও শোনা যায়; আমি শুনলাম, আর সেদিনই যেন এক নবজীবন লাভ করলাম।[১]

'পা-জা সুরাগে যিন্দেগি'; সত্যি যেন আমি প্রকৃত জীবনের সন্ধান পেয়ে গেলাম। আগে শুধু জানতাম, আমি মাদরাসার ছাত্র। ধীরে ধীরে জেনেছি, আমি মাদরাসার তালিবে ইলম। তখনো জানি না, মাদরাসা কী এবং কাকে বলে তালিবে ইলম। পা-জা সুরাগে যিন্দেগি'-এর মাধ্যমে জানলাম মাদরাসার হাকীকত এবং পেলাম তালিবে ইলমের পরিচয়। অবাক হলাম, এত বড় সত্য

[১] কেউ যদি ভাবে, এসব বলে আমি নিজের বুযুর্গি বয়ান করছি, তাহলে শুনুন, এটা বুযুর্গি নয়, এটা ভক্তি-ভালোবাসা। এটা যে কারো হতে পারে, যে কারো প্রতি হতে পারে। রবিঠাকুরের কবিতা পড়াকে যারা মনে করে 'ইবাদত' তাদের একজন বলেছেন, রবীন্দ্রনাথের কবিতায় তিনি তার ছবি ও প্রতিচ্ছবি দেখতে পান। রবীন্দ্রনাথ যেন তার কবিতায় জীবন্ত হয়ে ওঠেন, এমনকি কবিতার সুর ও ছন্দে তিনি তার হৃদয়ের স্পন্দন শুনতে পান।
আমি তাকে বুযুর্গ ভাবিনি, তবে তার কথা বিশ্বাস করেছি। এর নাম ভক্তি-ভালোবাসা। লেখার মধ্যে যখন লেখকের ছবি ও প্রতিচ্ছবি দেখা যায় এবং লেখকের হৃদয়ের স্পন্দন অনুভব করা যায়, সেটা তখন লেখকের কলমের লেখা থাকে না, সেটা তখন পাঠকের কলবের লেখা হয়ে যায়। সেটা হোক তাদের রবিঠাকুরের লেখা, কিংবা হোক আমাদের আলী মিয়াঁর লেখা। পুষ্পের পাতায় যখন শেখ সা'দীর গুলিস্তাঁর তরজমা করেছি তখনো আমার এ অনুভূতি হয়েছে। মনে হয়েছে, বহু শতাব্দীর আগের মানুষটিকে আমি যেন স্পর্শ করতে পারছি। এভাবে সামান্য পড়েও প্রাপ্তি হয় অসামান্য, অন্যথায় অনেক পড়েও প্রাপ্তি হয় সামান্য।
(এখানে কলমে প্রবল স্রোত ও প্রবাহ ছিলো! আরো অনেক কিছু লেখা যেতো। কিন্তু কলম ও কলব উভয়কে সংযমে রেখেছি। আল্লাহর শোকর, শেষ পর্যন্ত লেখার ইচ্ছের উপর না লেখার শক্তি জয়ী হয়েছে। নইলে হয়ত আপনজনেরাও সমালোচনা শুরু করতো। তবু এইটুকু বলে রাখি, কারো যদি ভালো লাগে, যেন অন্তর থেকে গ্রহণ করে। এমন কারো লেখাই যেন শুধু পড়ি যাকে ভালোবাসা যায়, যার জন্য হৃদয় উৎসর্গ করা যায় এবং এমনভাবে যেন পড়ি, যাতে কালো হরফের পর্দায় সেই মানুষটির ছবি দেখা যায়, তার হৃদয়ের স্পন্দন শোনা যায়।

এত দিন আমার অজানা ছিলো! আমার এমন মর্যাদাপূর্ণ পরিচয় আমার অজ্ঞাত ছিলো! আমার নতুন পরিচয়, আমার দায়িত্ব ও কর্তব্য এবং ভবিষ্যতের কর্ম-পরিসরের ব্যাপকতা সম্পর্কে নতুন চেতনা লাভ করে আমি অভিভূত হলাম এবং উদ্দীপ্ত হলাম। তখনকার সেই তরুণ বয়সের অনুভব-অনুভূতি সম্পর্কে বলার আরো কত কিছু আছে! কিন্তু এমনিতেই তো প্রসঙ্গের উপর অনেক অবিচার হয়ে গেলো! সুতরাং থাক সে কথা।

কিতাব সম্পর্কে

আবুল হাসান আলী নাদাবী রহ. তখন আমার প্রিয়তম ব্যক্তি এবং বিশেষ করে আমার চিন্তাজীবনের আদর্শ। তাঁর জীবন সম্পর্কে, কর্ম ও চিন্তা সম্পর্কে জানার আকুতি অনেক, কিন্তু উপায় ও সূত্র নেই। এখন তো কত 'মাকতাবা', কত কিতাব! তখন অবস্থা এমন ছিলো না। কোন কিতাব পাওয়ার উপায় ছিলো না। 'তারীখে দাওয়াত ও আযীমত'-এর নাম শুনেছি, দেখার সৌভাগ্য হয়েছে অনেক পরে। ماذا خسر العالم بانحطاط المسلمين؟ কিতাবের সম্ভবত নামও জানা ছিলো না। মোটকথা, এদিক থেকে বড় দৈন্যের মধ্যে কেটেছে আমাদের, বিশেষ করে আমার জীবন। এমন সময় গায়ব থেকে যেন বান্দার জন্য একটি সুন্দর আয়োজন হলো!

মাওলানা মুহম্মদ হারুন ইসলামাবাদী, যার স্নেহ-সান্নিধ্য পেয়ে একসময় মনে হতো, আমি তাঁর মত হবো, তিনি তাঁর কর্মস্থল আবুধাবি থেকে দেশে এলেন। দেখা করতে শহীদ বাড়িয়া (তখন ব্রাহ্মণবাড়িয়া) গেলাম। দেখি তাঁর হাতে একটি কিতাব। নামটিও দেখা যাচ্ছে, ماذا خسر العالم بانحطاط المسلمين؟ নীচে জ্বল জ্বল করছে, تأليف السيد أبي الحسن علي الحسني الندوي মনে তখন কেমন আনন্দ-অনুভূতি হলো! যেন নাগালের মধ্যে সাতরাজার ধন! আমার প্রিয়তম আলী মিয়াঁর কিতাব! হাত বাড়ালেই স্পর্শ পাবো!

আলতো করে কিতাবটি মাওলানা হারুন ছাহেবের হাত থেকে নিলাম এবং কিতাবটি আমার হয়ে গেলো! এমনই ছিলো তাঁর প্রতি আমার শ্রদ্ধা-ভালোবাসা এবং আমার প্রতি তাঁর স্নেহ-মায়া যে, কোনকিছু তাঁর হাত থেকে নেয়ার অর্থই ছিলো আমার হয়ে যাওয়া। এটা আমি যেমন জানতাম, তিনিও জানতেন। সুতরাং কিতাবটি তিনি আর ফেরত চাইলেন না। আজ এত বছর পরও, কত

কিতাব আমার হারিয়ে যায়, কিন্তু এ কিতাবটি আছে আমার কাছে। অতি সাধারণ নিউজপ্রিন্টের সাধারণ ছাপা, আরো সাধারণ বাঁধাই। এখন এই কিতাবের কত সুন্দর কাগজের ঝকঝকে ছাপা ও মনোরম বাঁধাইয়ের নোসখা আমার সংগ্রহে আছে, কিন্তু ঐটি হাতে নিলে যে রোমাঞ্চ ও আনন্দঘন অনুভূতি হয় তার কোন তুলনা নেই। কারণ তার সঙ্গে জড়িয়ে আছে আমার প্রথম ভালোবাসার প্রথম স্পর্শ! তরজমা করার সময় ঐ নোসখাটিই আমার সামনে ছিলো। তাতে যেন আলাদা একটি প্রেরণা অনুভব করেছি! পক্ষান্তরে অনিবার্য কারণে যখন ঝকঝকে সুন্দর নোসখাটি নিয়েছি, মনে হয়েছে, কী যেন নেই! কিসের যেন অসম্পূর্ণতা! কেন এমন হয়, আমার জানা নেই!

***

দুপুরের গাড়ীতে ফিরলাম এবং সন্ধ্যার আগে কমলাপুর স্টেশনে নামলাম। এর মধ্যে কিতাবটি পড়া প্রায় শেষ হয়ে এসেছে। এখন মনে পড়ে না, কোথায় যেন পড়েছি–

'তোমার সামান্য একটু তন্ময়তা, তোমাকে মুক্তি দিতে পারে চারপাশের সব শোরগোল থেকে।'

সেদিন কিতাব হাতে ঐ সফরে আমার জীবনে কথাটা সত্য হয়েছিলো। কামরা-ভরা যাত্রীদের কত কথা, কত হৈচৈ, স্টেশনে স্টেশনে গাড়ী থামার, যাত্রীদের ওঠা-নামার কত শোরগোল, কোনকিছু আমাকে ছোঁয়নি, আমার তন্ময়তাকে বিঘ্নিত করেনি। এই ছোট্ট সফরের মধ্যে আমি আসলে চলে গিয়েছিলাম দূরে বহু দূরে, আমার প্রিয়তম মানুষটির 'কলম-সফরের' মহাযাত্রার সামান্য একজন অনুগামী হয়ে। আমি তখন হারিয়ে গিয়েছিলাম, যে উম্মাহর ঘুমিয়ে থাকা মানুষ-গুলোর মধ্যে আমিও একজন, সেই উম্মাহর উত্থান-পতনের আনন্দ-বেদনার কাহিনীর জগতে। কী মর্মস্পর্শী ভাষায় কত জীবন্তরূপে তিনি তুলে ধরেছেন প্রতিটি বিষয়! আমাদের প্রিয় নবীর আবির্ভাবকালে কেমন বেদনাদায়ক ও মুমূর্ষু অবস্থা ছিলো বিশ্বের এবং বিশ্ব-মানবতার! আরবের ভূমিতে কেমন কঠিন পরিস্থিতিতে কীভাবে শুরু হলো তাঁর দাওয়াতি মেহনত এবং তৈরী হলো ছাহাবা কেরামের মহান জামা'আত! কীভাবে শুরু হলো বিশ্বের দিকে দিকে ছাহাবা কেরামের বিজয়াভিযান, বরং বলা ভালো, মানবতার মুক্তির অভিযান!

এ পর্যন্ত ছিলো গর্ব ও গৌরবের এবং প্রেরণা ও উদ্দীপনার অধ্যায়। তারপর তিনি এঁকেছেন সর্বব্যাপী এক হতাশার চিত্র, যেন অশ্রুর ভাষায়, রক্তের হরফে! একসময় কীভাবে নেমে এলো তন্দ্রার ঘোর! কীভাবে ঘটলো প্রথমে উম্মাহর পতন, তারপর অধঃপতন! কীভাবে ঝড় উঠলো ক্রুশেডের এবং তাতারীদের! কীভাবে তছনছ হয়ে গেলো বিশাল বিস্তৃত মুসলিম জাহান!

আমার প্রিয় মানুষটি শুধু হতাশার কথা শুনিয়েই দায়িত্ব শেষ করেননি। বলেছেন, ইসলামের অন্তর্নিহিত আত্মশক্তির কথাও, যুগে যুগে যা মুসলিম উম্মাহকে রক্ষা করেছে, যদিও মুসলিম উম্মাহ সবসময় পারেনি ইসলামকে রক্ষা করতে। তিনি শুনিয়েছেন, পতনের যুগেও কীভাবে উঠে এলেন গাজী ছালাহুদ্দীন, কীভাবে দীর্ঘ নব্বই বছর পর উদ্ধার পেলো বাইতুল মাকদিস! হাঁ, সেই বাইতুল মাকদিস যা এখন ইহুদিদের জ্বালানো আগুনে জ্বলছে, আর পথ চেয়ে আছে যামানার নতুন ছালাহুদ্দীনের!

তিনি আমাদের শুনিয়েছেন, যে তাতারীদের পরাজয়কে কাদেসিয়া-ইয়ারমুকের উত্তরসূরীরা মনে করতো অসম্ভব, কীভাবে তারা পরাজিত হলো আইনে জালুতের যুদ্ধে মিশরের মুসলিম বাহিনীর হাতে! আরো শুনিয়েছেন, বিজয়ী তাতারীদের উদ্ধত মাথা কীভাবে নত হলো ইসলামের অপরাজেয় শক্তির সামনে। যারা চেয়েছিলো মুসলিম উম্মাহ বিনাশ, কীভাবে তারাই হয়ে গেলো ইসলাম ও মুসলিম উম্মাহর রক্ষক!

সবচে' ইতিবাচক প্রশ্ন হলো, এই পতন থেকে মুসলিম উম্মাহর উত্তরণের উপায় কী? পতনের কান্না যেমন তিনি কেঁদেছেন তেমনি উত্তরণের পথ ও পন্থাও তিনি বলেছেন। তাঁর ভাষায়–

لا ينهض العالم الإسلامي إلا برسالتـــه التـــي وكلها إليه نبيهم الأمين، ولا ينهض العالم الإسلامي بهذه الرسالة التي هي الدعوة إلى الله ورسولـــه إلا بقوة الإيمان، لابقوة المادة

'ইসলামী বিশ্বের উত্থানের কোন পথ নেই, সেই দাওয়াত ও পায়গামকে ধারণ করা ছাড়া, যা তাদের নবী আল-আমীন তাদের কাছে সোপর্দ করে গিয়েছেন। আর বস্তুগত কোন শক্তি দ্বারা দাওয়াতের এ মহান দায়িত্ব পালন করা তাদের পক্ষে কিছুতেই সম্ভব হবে না; সম্ভব হবে শুধু ঈমানের শক্তি দ্বারা।'

এটা তো চিরসত্য কথা! ঈমানই ছিলো আমাদের অতীতের শক্তি, ঈমানই হচ্ছে আমাদের বর্তমানের শক্তি এবং ঈমানই হবে আমাদের ভবিষ্যতের শক্তি। ঈমান

ছাড়া আমাদের কোন শক্তি নেই, মুক্তিও নেই। একথা তিনি বলেছেন, তাঁর আগেও সবাই বলেছেন, এমনকি তাঁর সমকালেরও সবাই বলছেন। এটা নতুন কথা নয়। তাঁর স্বকীয়তা এই যে, আধুনিক ও প্রাচীন উভয় সমাজকে চমকিত করে একটি নির্মম সত্যের প্রতি তিনি অঙ্গুলি-নির্দেশ করেছেন। তাঁর ভাষায়–

إذا أراد العالم الإسلامي أن يعود إلى قيادة العالم من جديد فعليـــه أن يأخذ الاستعداد التام في العلوم والصناعة والتجارة وفي فن الحرب وأن يستغني عن الغرب في كل مرفق من مرافق الحياة وفي كل حاجـــة من الحاجات

'ইসলামী বিশ্ব যদি নতুন করে বিশ্বনেতৃত্বের আসনে ফিরে যেতে চায়, তাহলে তার অবশ্যকর্তব্য হবে, জ্ঞান-বিজ্ঞান, শিল্প, বাণিজ্য ও যুদ্ধবিদ্যায় পূর্ণ প্রস্তুতি গ্রহণ করা এবং জীবনের যাবতীয় উপকরণ ও প্রয়োজনের ক্ষেত্রে পাশ্চাত্য-নির্ভরতা পরিহার করা।'

এটা ছিলো একেবারে নতুন কথা যা তাঁর পর্যায়ের কোন আলিম আগে বলেননি, অন্তত এমন করে বলেননি। তিনি আরো বলেছেন–

ومن واجب رجال التعليم والتربيـــة وولاة الأمر أن يربوا الشبيـــبة العربيـــة على الفروسيـــة والحياة العسكريـــة على مبدأ قول النبي صلى الله عليه وسلم : ألا إن القوة الرمي! ألا إن القوة الرمي

'শিক্ষা-দীক্ষা ও রাষ্ট্রের কর্ণধার যারা, তাদের কর্তব্য হলো আরবযুবশক্তিকে 'অশ্বচালনা' ও সৈনিকতার উপর গড়ে তোলা এবং তা নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এই মহান নীতিনির্ধারণী বানীর ভিত্তিতে, 'শোনো, নিক্ষেপই আসল শক্তি, শোনো, নিক্ষেপই আসল শক্তি।'

এটাও একেবারে নতুন কথা, বিশেষ করে এ যুগের 'খানকাহি জীবনে অভ্যস্ত' কোন বুযুর্গের কলমে! তিনি আরো বলেছেন–

إذا أراد العالم الإسلامي أن يستأنف حياتـــه ويتحرر من رق غيره، وإذا كان يطمع إلى القيادة فلابد إذا من وضع منهاج تعليمي جديد يجمع بين محكمات الكتاب والسنـــة وبين العلوم العصريـــة النافعـــة، ولابد له من تدوين العلوم العصريـــة على أساس روح

الإسلام، ويجب على العالم الإسلامي أولا وقبل كل شيء أن يخلصوا شبابهم من النظام التعليمي الغربي الذي قد استولى اليوم على العالم الإسلامي كلـــه

'ইসলামী বিশ্ব যদি নতুনভাবে জীবন শুরু করতে চায় এবং অন্যের দাসত্ব থেকে মুক্তি লাভ করতে চায়, সর্বোপরি যদি বিশ্বনেতৃত্বের স্বপ্ন দেখতে চায় তাহলে অবশ্যকর্তব্য হবে এমন নতুন শিক্ষাব্যবস্থা গড়ে তোলা যা কোরআন-সুন্নাহর অপরিবর্তনীয় বিধান এবং কল্যাণপূর্ণ আধুনিক জ্ঞান-বিজ্ঞানের মধ্যে সমন্বয় সাধন করবে। মুসলিমবিশ্বকে অবশ্যই ইসলামের প্রাণপ্রেরণার উপর ভিত্তি করে আধুনিক জ্ঞান-বিজ্ঞানকে নতুনভাবে বিন্যস্ত করতে হবে। মোটকথা, ইসলামী বিশ্বকে প্রথমে এবং সবকিছুর আগে পাশ্চাত্যের শিক্ষাব্যবস্থা থেকে, যা সমগ্র মুসলিমবিশ্বের উপর আধিপত্য বিস্তার করে আছে, তা থেকে তাদের যুবকদের উদ্ধার করতে হবে।'

শহীদ সৈয়দ কুতুব এ গ্রন্থের ভূমিকায় ঠিকই বলেছেন, 'পাঠক হয়ত আশা করেননি যে, একজন আলিম, যিনি ইসলামের রূহানী ও আধ্যাত্মিক শক্তিতে পূর্ণ আস্থাবান, এবং বিশ্বনেতৃত্বের আসনে ইসলামের প্রত্যাবর্তনের জোরালো প্রবক্তা, তিনি নেতৃত্বের যোগ্যতা সম্পর্কেও বস্তুনিষ্ঠ আলোচনা করবেন এবং আত্মিক ও আধ্যাত্মিক শক্তির পাশাপাশি শিল্প, প্রযুক্তি ও সমরশক্তি অর্জনের প্রতিও গুরুত্ব আরোপ করবেন। সেই সঙ্গে অর্থনৈতিক সক্ষমতা ও স্বনির্ভরতা অর্জনেরও আহ্বান জানাবেন এবং আহ্বান জানাবেন পাশ্চাত্য শিক্ষাব্যবস্থার পরিবর্তে নতুন শিক্ষাব্যবস্থা প্রবর্তনের। কিন্তু পরম পরিতোষের বিষয় যে, এসকল গুরুত্বপূর্ণ বিষয় তাঁর চিন্তা থেকে বাদ পড়েনি।'

ফিরে আসি আগের কথায়। আমি তো ছিলাম কিতাবের পাতায় আমার তন্ময়তায়। রেলগাড়ীর সফর শেষ হয়ে গেলো, কিন্তু কিতাবের সফর তখনো শেষ হয়নি। যাত্রীরা সব বাড়ী ফেরার তাড়নায় ব্যতিব্যস্ত, আমার হলো তখন অন্য অবস্থা। কমলাপুর স্টেশনের নিকটবর্তী একটি মসজিদে বসে শেষ অধ্যায়টি সমাপ্ত করলাম, যাতে তিনি উদাত্ত আহ্বান জানিয়েছেন আরবজাতিকে আবার জেগে ওঠার, আরবজাতিয়তাবাদের অন্ধকার ত্যাগ করে কোরআনের আলোকিত অঙ্গনে এবং সুন্নাহর উদ্ভাসিত আঙ্গিনায় আবার ফিরে আসার! মানবতার মুক্তির দূতরূপে আবার জিহাদের ঝাণ্ডা হাতে তুলে নেয়ার।

আরবজাতিকে তিনি স্মরণ করিয়েছেন যে, তাদের শক্তি ও মর্যাদার উৎস অন্য কিছু নয়, শুধু কোরআন ও সুন্নাহ! তাদের প্রাণ ও প্রেরণা অন্য কেউ নন, শুধু মুহম্মদে আরাবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম! তিনি তাদের বলেছেন, কোনরকম অস্পষ্টতা ও সৌজন্যের আবরণ ছাড়া একেবারে স্পষ্ট ও সোজা ভাষায়, 'যদি বিশ্বাস না হয়, তাহলে ফিরিয়ে দাও যা কিছু পেয়েছো তোমাদের আরব-ভূমির এই উম্মী নবীর কাছ থেকে। ফিরিয়ে দাও আল-কোরআন যা এত দিন রক্ষা করেছে তোমাদের ভাষা ও সাহিত্য, এমনকি তোমাদের অস্তিত্ব, তারপর ফিরে যাও তোমাদের জাহেলিয়াতের যুগে! তখন দেখো, কী পরিণতি হয় তোমাদের! মরুভূমির বালুর উপর অঙ্কিত রেখার চেয়ে বেশী কিছু হবে না তোমাদের অস্তিত্ব। ....

কিতাবের সমাপ্তি অংশে ছিলো আরবদের উদ্দেশ্যে তাঁর এ জ্বলন্ত প্রশ্ন–

إلى متى أيها العرب تصرفون قواكم الجبارة التي فتحتم بها العالم القديم في ميادين ضيقة محدودة؟ إلى متى ينحصر هذا السيل العرم الذي جرف بالأمس بالمدنيات والحكومات في حدود هذا الوادي الضيق، تصطرع أمواجه ويلتهم بعضها بعضا؟

'আর কত দিন হে আরব, এসকল ক্ষুদ্র তুচ্ছ ক্ষেত্রে তোমাদের বিপুল শক্তির অপচয় করবে, যা দ্বারা একবার তোমরা প্রাচীন বিশ্বকে জয় করেছিলে?
এই সর্বপ্লাবী জোয়ার আর কতকাল এই সঙ্কীর্ণ উপত্যকায় আবদ্ধ থেকে নিজের ঢেউয়ে নিজে মার খাবে, যা একদিন সমস্ত সভ্যতা ও শাসনব্যবস্থাকে ভাসিয়ে নিয়ে গিয়েছিলো?'

***

কিতাব সমাপ্ত হলো। মাগরিবের তখনো কিছু সময় বাকি, আর আমি একই তন্ময়তায় আচ্ছন্ন। কী পড়লাম! কী দেখলাম!! কী শুনলাম!!!

মনে হলো চিন্তার জলাশয় থেকে চিন্তার সাগরে অবগাহন করলাম! অতীতকে যেন নতুন করে খুঁজে পেলাম! বর্তমানকে যেন আসল চেহারায় দেখতে পেলাম! আর ভবিষ্যতের স্বপ্ন-ছায়া যেন পূর্ণ একটি অবয়ব লাভ করলো!

এমন কি লিখেছেন তিনি যা আগে জানা ছিলো না, যা আগে পড়া হয়নি, শোনা হয়নি! ইতিহাসের পাতায়, সীরাতের আঙ্গিনায় সবই তো ছিলো! সবই তো পড়েছি! তাহলে!!

সত্য কথা এই যে, হৃদয়ের উত্তাপ, চেতনা, মমতা, দহন ও যন্ত্রণা! এগুলোই আসলে কলব থেকে কলমে আসে, আবার কলম থেকে কলবে যায়! তখন মনে হয়, আগে তো শুনিনি! আগে তো পড়িনি! আগে তো কেউ বলেনি! যেমন হযরত আবু বকর রা.-এর যবানে–

وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل

এ আয়াত শুনে ছাহাবা কেরাম বলেছিলেন, মনে হলো, আয়াতটি এই প্রথম নাযিল হলো!

প্রিয় চাচা আবু তালিবকে কিছুটা দ্বিধাগ্রস্ত দেখে, সেই অসহায়ত্বের সময়, নবুয়তের পূর্ণ জালাল ও প্রতাপ নিয়ে নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যা বলেছিলেন, কত পড়েছি এবং কত উপলক্ষে বলেছি ও লিখেছি–

يا عم، والله لو وضعوا الشمس في يميني والقمر في يساري على أن أترك هذا الأمر حتى يظهره الله أو أهلك فيه ما تركته

সেখানে একথাও আছে واستعبر رسول الله صلى الله عليه وسلم বলতে বলতে আল্লাহর রাসূল অশ্রুসিক্ত হয়ে পড়লেন। যতবার পড়েছি আমাদের চোখ কিন্তু যেমন শুকনো তেমনি ছিলো। আজ কেন চোখের পাতা একটু ভিজলো! আজ কেন অন্তরে বিশ্বাস ও প্রত্যয়ের এমন ঢেউ সৃষ্টি হলো!

পারস্যের রাজদরবারে হযরত রাবঈ বিন আমির রা. এর বিপ্লবী ঘোষণা আগেও পড়েছি–

الله ابتعثنا لنخرج من شاء من عبادة العباد إلى عبادة الله و من ضيق الدنيا إلى سعتها ومن جور الأديان إلى عدل الإسلام

কিন্তু আজ যখন পড়লাম, চোখ থেকে ঝরঝর করে অশ্রু ঝরলো। ভিতরের আমি বাইরের আমাকে প্রশ্ন করলো, 'কত উচ্চতা থেকে কত নীচে ঘটেছে আমাদের পতন? কত বড় মর্যাদা ত্যাগ করে কী হীনতা ও দীনতায় আমরা আজ তুষ্ট?' বলাবাহুল্য, ভিতরের সত্তার কাছ থেকে আর কখনো এমন করে এ প্রশ্নের সম্মুখীন আমি হইনি।

কোন কলমের, কোন লেখার এবং কারো সান্নিধ্যের সার্থকতা হয় তখনি যখন তা কারো অন্তর্জগতে আত্মজিজ্ঞাসা জাগ্রত করে এবং তার সর্বসত্তাকে প্রবল-

ভাবে আলোড়িত ও আন্দোলিত করে। তখন সেই আত্মজিজ্ঞাসার সন্তোষজনক উত্তর না খুঁজে এবং না পেয়ে তার আত্মা কখনো শান্তি পায় না। আমাদের সমস্ত দুর্দশার বড় কারণ এই যে, কখনো আমরা আত্ম-জিজ্ঞাসার সম্মুখীন হইনি, হই না; না নিজের শক্তিতে, না কারো কলবের সান্নিধ্য থেকে, না কোন কলমের সাহচর্য থেকে।

সেদিনের সেই বরকতপূর্ণ সফরে ماذا خسر العالم بانحطاط المسلمين কিতাবটির প্রথম পাঠ থেকে এই যে আত্মজিজ্ঞাসার জাগৃতি, এটাই ছিলো আমার বড় প্রাপ্তি, যার জন্য সেদিন মাগরিবের পর, বহুদিন পর আওয়াবীন পড়ার তাওফীক হলো এবং দু'রাকাত শোকরানা পড়ে আল্লাহর শোকর আদায় করলাম যে, কত আয়োজন করে এ কিতাবটি তিনি আমার হাতে তুলে দিয়েছেন এবং পড়ার তাওফীক দান করেছেন।

***

যাকে এত ভালোবাসলাম, যার কাছ থেকে এত কিছু পেলাম, তখনো তাঁকে দেখার সৌভাগ্য আমার হয়নি! তবে এটা ভেবে সান্ত্বনা পেতাম যে, তিনি আমার কথা জেনেছেন এবং....।

সম্ভবত ১৯৮৪ সালে তিনি প্রথম বাংলাদেশ সফর করলেন এবং দূর থেকে তাকে দেখলাম। স্বপ্নেও ভাবিনি তাঁর সঙ্গে দেখার করার সুযোগ হবে। সেউ সুযোগও আল্লাহ দিলেন, আমার মুহসিন উস্তায হযরত মাওলানা সুলতান যওক ছাহেবের ওছিলায়। দিনটি ছিলো শুক্রবার। হাজী বশির ছাহেবের বাসভবনে তিনি আমাকে নিয়ে গেলেন। দু'চোখ ভরে দেখলাম আমার প্রিয়তম আলী মিয়াঁকে! আহা, কী ফিরেশতা-ছুরত। নাম শুনেই বললেন, 'আচ্ছা, ছাহেবে ইকরা!' কোথায় আজ তুমি হে ইকরা! তোমাকে আমি ভুলিনি, কখনো ভোলবো না; তোমাকে দিয়েই যে তাঁর সঙ্গে আমার সম্পর্কের উদ্বোধন![1]

---

[1] ত্রিশবছরেরও বেশী হবে, আমার সেই যুবক বয়সে নূরিয়া মাদরাসা থেকে ইকরা নামে একটি আরবী পত্রিকা বের করেছিলাম, ছোটদের আরবী শেখার উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে। এখন বোঝা যাবে না, তখন কী বৈপ্লবিক ছিলো চিন্তাটি এবং কত কঠিন ছিলো পদক্ষেপটি। বাংলাদেশ তো বটেই, পাক-ভারতেও এর কোন নমুনা ছিলো না। সাহস করে পত্রিকাটি হযরত মাওলানা সাইয়েদ আবুল হাসান আলী নাদাবী রহ.-এর খিদমতে পাঠানো হয়েছিলো। তিনি খুব উৎসাহ দান করে একটি চিঠি লিখেছিলেন। তাতে একটি বাক্য ছিলো এরকম, 'আমার জানা ছিলো না, বাংলাদেশের মত পরিবেশে এমন ইনকিলাবি চিন্তা করার মত মানুষ রয়েছে। আমার খুব তামান্না, আপনাকে দেখি।'

কিতাবের তরজমা

বিদায় মুছাফাহার সময় তিনি বললেন, যওক ছাহেব বলেছেন, আপনি বাংলায়ও লেখেন। আমার কোন কিতাবের তরজমা কি করেছেন? লজ্জিত হলাম। উত্তরের অপেক্ষা না করে তিনি বললেন, 'মাযা খাসিরা'-এর তরজমা করুন, আমি দু'আ করি।'

আমার মনের এতদিনের সুপ্ত আকাঙ্ক্ষাটিই যেন তাঁর পাক যবানে উচ্চারিত হলো, খুব আপ্লুত ও উদ্দীপ্ত হলাম, বললাম, ইনশাআল্লাহ আমি তরজমা করবো, হযরত, আপনি খাছ করে দু'আ করবেন, আল্লাহ যেন তাওফীক দান করেন।

তিনি আরো বললেন, 'লক্ষ্য রাখবেন, আদবি মি'য়ার'[1] যেন অক্ষুণ্ণ থাকে, আর উর্দূ তরজমাটি সঙ্গে রাখবেন।'

***

তারপর কত দিন, কত বছর পার হলো! রায়বেরেলির পাশ দিয়ে বয়ে যাওয়া ছোট্ট নদীটি দিয়ে কত পানি গড়ালো! এমনকি আমার প্রিয়তম হযরত আলী মিয়াঁ দুনিয়া থেকে বিদায় নিলেন, কিন্তু কিতাবটির তরজমা আর হলো না। অথচ ইতিমধ্যে তাঁর আরকানে আরবা'আ এবং পা-জা সুরাগে যিন্দেগি তরজমা করেছি। জীবনের বহু কাজের মত এখানেও সত্য হলো كل أمر مرهون بوقته প্রতিটি কাজ তার সময়ের বন্ধনে আবদ্ধ। সেই সময় যখন হলো, তরজমাও শুরু হলো। কিন্তু ধারবাহিকভাবে নয়। পুষ্পের দ্বিতীয় প্রকাশনার প্রথম সংখ্যা প্রকাশের সময় সামান্য অংশ তরজমা করলাম, ছাপা হলো। কয়েক মাস পর দ্বিতীয় সংখ্যা প্রকাশিত হলো, তখন আবার কিছু তরজমা হলো। এভাবে পুষ্পের একটি সংখ্যা বের হয় মাস দু'মাস, কখনো তিনমাস পর, তখন কিতাবটিরও কিছু অংশ তরজমা হয়। এভাবে বিশটি সংখ্যায় কিতাবের প্রায় চারভাগের তিনভাগ তরজমা হলো এবং ছাপা হলো। তারপর পুষ্পের প্রকাশনা স্থগিত হয়ে গেলো, সেই সঙ্গে কিতাবের তরজমাও।

'কবে আবার পুষ্পের তৃতীয় প্রকাশনা শুরু হবে এবং কিতাবের তরজমা শেষ হবে', এই যখন অবস্থা, আল্লাহ তখন তাঁর এক বান্দাকে আমার উপর যেন

---

[1] সাহিত্যমান

'মুসাল্লাত' করে দিলেন[১]। কিছু দিন পরপর তিনি জিজ্ঞাসা করেন, কিতাবটির বাকি অংশের তরজমা কবে শেষ হবে, কবে কিতাব আকারে পাবো?
আমি বলি, এই তো শুরু করছি। এটাও যখন কয়েকবার হলো, তখন তিনি কিছুটা যেন হতাশ হয়ে বললেন, 'শুরু করছি'টা 'শুরু করেছি' কবে হবে? আসলে তিনি জানতেন, আমারও আকাঙ্ক্ষা কত এবং মজবুরি কত! তাই যখনই তাগাদা দিতেন কোমলভাবেই দিতেন।
গত রামাযানের সম্ভবত প্রথম সেহরির সময় ফোনে আবার সেই প্রসঙ্গ! বাহ্যত কাজটি শুরু করার কোন সুযোগই ছিলো না। কারণ আমার সামনে তখন এমন কিছু নিছাবী কাজ ছিলো, যা একদিনের জন্যও বিলম্বিত করার 'বৈধতা' ছিলো না, কিন্তু আমার প্রিয়তম আলী মিয়াঁ- রহ. এর ভাষায় বলতে হয়, 'ভিতর থেকে কেউ যেন উদ্বুদ্ধ করলো। নিজের অজ্ঞাতেই যেন বলে ফেললাম, 'দু'আ করুন আজ থেকেই শুরু করছি এবং ইনশাআল্লাহ শাওয়ালের মধ্যে ছাপাখানায় যাবে'।
তিনি খুশী হলেন, আমিও বলা যায়, আল্লাহর এ বান্দার খুশিটুকু অক্ষুণ্ন রাখার তাগিদে অবশিষ্ট অংশের তরজমা শুরু করলাম। অন্যান্য কাজ এবং সমস্ত যোগাযোগ বন্ধ রেখে, এমনকি –আল্লাহ মাফ করুন– রামাযানের যে স্বাভাবিক তিলাওয়াত, সেটাও সঙ্কোচিত করে তরজমার কাজ অব্যাহত রাখলাম। এভাবে আল্লাহর শোকর ই'তিকাফের শেষ দিকে তরজমাটি সমাপ্ত হলো। কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করার জন্য ফোন করে প্রথমে তাঁকেই সুসংবাদটি দিলাম। কারণ তাঁর এই অব্যাহত তাগাদা না হলে কাজটি এখন এভাবে সমাপ্ত হতো না, আরো অনেক পিছিয়ে যেতো। অবশ্য আমার নিছাবি কাজগুলো যে বিলম্বিত হলো, এজন্য কিছুটা হলেও তাকে দায়ী করা যায়।
তরজমা সমাপ্ত হয়েছে শুনে তিনি বেশ উচ্ছ্বাস প্রকাশ করলেন, আমার ভালো লাগলো। আসলে একটা সময় এমন আসে, অন্তরঙ্গ মানুষের তাড়া ও তাগাদা ছাড়া কাজ হতে চায় না। হয়ত আমি এখন সেই সময়ের মুখে পড়েছি। তাঁর উচ্ছ্বসিত আনন্দের প্রতি আমার ভালোলাগা প্রকাশ করে বললাম,, 'ইনশাআল্লাহ কিতাবটি ছাপা হয়ে আসার পর এর প্রথম নোসখাটি আপনার হাতে অর্পণ করবো'।
যদিও পুষ্পে তরজমার প্রতিটি কিস্তি যথেষ্ট সম্পাদনার পরই ছাপা হয়েছিলো

[১] চাপিয়ে দিলেন

তবু মনে হলো, গ্রন্থাকারে প্রকাশের জন্য আরো সম্পাদনা দরকার। তাই ঈদের পর নতুন করে সম্পাদনার কাজ শুরু করলাম। আলহামদু লিল্লাহ বিশদিনের লাগাতার মেহনতের পর শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত সম্পাদনার কাজটিও সমাপ্ত হয়েছে। আশা করি, এখন তরজমাটি পূর্ণ মানোত্তীর্ণ না হলেও অপেক্ষাকৃত সুন্দর ও ত্রুটিমুক্ত হয়েছে।
এরপর বাকি ছিলো অনুবাদকের পক্ষ হতে ভূমিকা লেখা। এক্ষেত্রে আমার একটি স্বভাবদুর্বলতা এই যে, ইচ্ছে করলেই বা কলম নিয়ে বসলেই আমার পক্ষে লেখা সম্ভব হয় না। কোন না কোন উপলক্ষে অন্তরে যখন 'প্রবাহ' সৃষ্টি হয় তখনই লেখা তৈরী হয়। তাই ভিতরের প্রবাহের জন্য আমাকে প্রতীক্ষায় থাকতে হয়, কখনো একদিন, দু'দিন, কখনো অনেক দিন। বিষয় ও সময় বেঁধে দেয়া লেখা আমাকে দিয়ে হয় না, হতে চায় না। তো এবারও ভিতর থেকে প্রবাহের প্রতীক্ষায় ছিলাম, একদিন দু'দিন, তিনদিন। আল্লাহর রহমতে সেই প্রবাহটি এসেছে। প্রবাহ যখন আসে ঝরণাধারার মতই লেখা আসতে থাকে। এ লেখাটিও কম্পিউটারের সামনে একবসাতেই আসছে। আশা করছি একবসাতেই সমাপ্ত হবে।

তরজমা সম্পর্কে

এবার তরজমা সম্পর্কে কিছু কথা। কোন কিতাবের সফল অনুবাদ সত্যি এক দুরূহ কাজ। একথা বহুবার বহুজন বলেছেন। কিন্তু প্রতিটি অনুবাদ সেই সত্যকে যেন আরো কঠিনভাবে সত্য বলে প্রমাণ করে। অনুবাদ আসলে একটি শিল্প এবং ললীত ও চারুশিল্প। এর যেমন রয়েছে মোটা দাগের কিছু নিয়মনীতি ও বিধিবিধান তেমনি রয়েছে কিছু সূক্ষ্ম কলাকৌশল ও রীতি–শৈলী। ধর্ম, দর্শন, সাহিত্য, বিজ্ঞান, ইতিহাস ও বুদ্ধিবৃত্তি, বিষয় ও বিষয়বস্তু যাই হোক, অনুবাদের ক্ষেত্রে এটাই প্রথম কথা ও শেষকথা।
আফসোস, অন্যদের কথা জানি না, আমাদের দ্বীনী মহলে উচ্চারণে না হলেও আচরণে সম্ভবত মনে করা হয়, অনুবাদই সবচে' সহজ কাজ। বিষয়টি কিন্তু তা নয়। আমার মতে, অন্তত যারা ধর্মীয় সাহিত্যের সেবারূপে অনুবাদের সঙ্গে নিজেকে যুক্ত করতে চান তাদের কর্তব্য হবে জীবনের উল্লেখযোগ্য একটা সময় দীর্ঘ ও নিরবচ্ছিন্ন সাধনার মাধ্যমে অনুবাদ ও তরজমার দুরূহ কাজের জন্য আগে নিজেকে প্রস্তুত করা।

যে কোন কিতাবের উত্তম অনুবাদের জন্য প্রথম কাজ হলো দু'টি। বিভিন্ন কিতাব অধ্যয়নের মাধ্যমে বিষয়বস্তুর সঙ্গে অন্তরঙ্গ একটি পরিচয় গড়ে তোলা। তারপর 'অনুবাদিতব্য' বইটি আগাগোড়া বারবার পড়ে লেখকের ভাষা ও উপস্থাপনশৈলী এবং তার মনমানসের সঙ্গে 'নিবিড়তা' অর্জন করা।

বিষয়যোগ্যতা, ভাষাজ্ঞান, ও রুচিবোধের ক্ষেত্রে অনুবাদককে এমন একটি স্তরে অবশ্যই উঠে আসতে হবে যে, তিনি ভাববেন, অনুবাদের ভাষায় তিনি লেখকের প্রতিনিধিত্ব করছেন। অর্থাৎ লেখক যদি বাংলাভাষী হতেন এবং বাংলাভাষার পাঠকের জন্য লিখতেন তাহলে তাঁর লেখাটি মোটামুটি এমনই হতো যেমন আমি অনুবাদ করেছি। এভাবেও বলা যায়, লেখক যদি শুধু বাংলা জানতেন, আর অনুবাদটি পাঠ করে বলতেন, আমার মনের কথাগুলো আমার মনের মত করেই এখানে বলা হয়েছে।' তাহলেই বলা হবে, অনুবাদ সফল ও সার্থক হয়েছে।

কথাটা যত সহজ করে বলা হলো, কাজটা অবশ্যই তত সহজ নয়, যথেষ্ট কঠিন। কঠিন বলেই তো সাধনার এবং নিরন্তর সাধনার প্রয়োজন। সাধনার পর, যত কঠিনই হোক কোন কাজ আর অসাধ্য থাকে না। মানুষ তো পর্বতচূড়ায় আরোহণের মত 'অর্থহীন' কাজকেও সাধনার বিষয় বানিয়ে নিয়েছে, সেজন্য প্রাণও বিসর্জন দিচ্ছে, কেউ কেউ সফলতাও অর্জন করছে। এমনকি যারা মারা যাচ্ছে তাদেরও কেউ ব্যর্থ বলছে না, বরং সাহসী মানুষ বলে তাদের প্রশংসা করা হচ্ছে।

দ্বিতীয় করণীয় হলো কিতাবের বিষয়বস্তু, ভাষাগত মান ও উপস্থাপন শৈলী বিচার করে অনুবাদের প্রকৃতি নির্ধারণ করা এবং আগাগোড়া সেই প্রকৃতি অনুসরণ করে অনুবাদ করা। এটাও বিস্তৃত ব্যাখ্যা দাবী করে, যার সুযোগ এখানে নেই। বরং যে উদ্দেশ্যে এ আলোচনার অবতারণা এখন আমরা সেদিকেই অগ্রসর হচ্ছি।

ماذا خسر العالم بانحطاط المسلمين؟ কিতাবটির অনুবাদ শুরু করার আগে আমি কয়েকটি বিষয় গভীরভাবে চিন্তা করেছি। প্রথমত কিতাবটির বেশীর ভাগ উর্দূ অনুবাদ লেখক নিজেই করেছেন, বাকি অংশের অনুবাদও নিজের তত্ত্বাবধানে অতি আপনজনদের দ্বারা করিয়েছেন। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় হলো, উর্দূ অনুবাদে মূল আরবীকে অনুসরণ করা হয়নি, বরং অধিকাংশ ক্ষেত্রে বক্তব্যের অনুবাদ

বক্তব্য দ্বারা করা হয়েছে। অবশ্য মূল বক্তব্যের ভাব ও আবেদন এবং গতি ও তরঙ্গময়তা রক্ষিত হয়েছে পূর্ণ মাত্রায়, বরং কোথাও কোথাও তা মূলকেও অতিক্রম করেছে। কিন্তু শব্দ, বাক্য, উপমা, প্রবাদ, বাগ্‌ধারা স্বাধীনভাবে পরিবর্তন, সংযোজন, বিয়োজন করা হয়েছে। এমনকি আরবী কবিতার অনুবাদ না করে একই অর্থের উর্দূ কবিতা প্রতিস্থাপন করা হয়েছে।

প্রশ্ন হলো, উর্দূ অনুবাদে কেন এরূপ করা হলো এবং লেখক কেন তা অনুমোদন করলেন?

আমার মতে আলোচ্য কিতাবটির অনুবাদের ক্ষেত্রে উপরোক্ত রীতি অনুসরণ করাই যথোপযুক্ত হয়েছে এবং কিছু কিছু ব্যতিক্রম বাদ দিলে বেশ সফল অনুবাদ হয়েছে, ক্ষেত্র-বিশেষে, এমনকি মূলের চেয়ে অনুবাদই উত্তম হয়েছে। আরবীকে হুবহু অনুসরণ করে তরজমা করা হলে এমন হতো বলে মনে হয় না।

এর একটি কারণ এই যে, আরবীভাষার স্বভাব বৈশিষ্ট্যই হচ্ছে إيجاز বা প্রকৃতি-গত সুসংক্ষিপ্ততা। তাই দেখা যায়, আরবী ছোট ছোট দু'টিমাত্র বাক্যে যে বক্তব্যটি সুন্দরভাবে এসে গেছে, উর্দূতে সেখানে বড় বড় চারটি বাক্য ব্যবহার করতে হয়েছে। নইলে বক্তব্যের স্পষ্টতা, আবেদন ও গতিময়তা ক্ষুণ্ণ হতো। আর এ কিতাবের লেখক যিনি, তাঁর লেখার বৈশিষ্ট্যই হলো স্রোতের গতিময়তা এবং জলপ্রপাতের উচ্ছলতা। সেটা যে কোনভাবেই হোক রক্ষা করতেই হবে (তবে বক্তব্যকে অক্ষত রেখে)। উর্দূ অনুবাদক সেটাই করেছেন এবং লেখক তা অনুমোদন করেছেন। তাতে অনুবাদে শব্দ ও বাক্য কমেছে, বেড়েছে, কিন্তু সৌন্দর্য রক্ষিত হয়েছে।

আরেকটি বিষয়, লেখক আমাকে উপদেশ দিয়েছেন (উর্দূ থেকে নয়, বরং) আরবী থেকে অনুবাদ করতে, কিন্তু উর্দূ অনুবাদটি সামনে রাখতে। আর সতর্ক করেছেন অনুবাদে যেন মূলের সাহিত্যমান রক্ষিত হয়। (অবশ্য এ বিষয়ে এমনিতেও তিনি যথেষ্ট সংবেদনশীল ছিলেন।)

এখানেও প্রশ্ন: লেখকের উপরোক্ত উপদেশ ও সতর্কবাণীর অন্তর্নিহিত উদ্দেশ্য কী ছিলো?

আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়, উর্দূ অনুবাদের স্থানে স্থানে মূল কিতাবের কিছু কিছু অংশ বাদ দেয়া হয়েছে, আবার কোথাও কোথাও দীর্ঘ দীর্ঘ অংশ সংযোজন করা হয়েছে, যা মূল কিতাবে নেই। শেষ অধ্যায়টির পূর্বে সর্বোচ্চ চৌদ্দ পৃষ্ঠার দীর্ঘ একটা সংযোজন রয়েছে। এসব কিছু হয়েছে মূল লেখকেরই তত্ত্বাবধানে।

তো সবদিক বিচার করে অনেক চিন্তাভাবনার পর কিতাবটির অনুবাদের ক্ষেত্রে আমি যে পন্থা ও কৌশল অবলম্বন করেছি তা মোটামুটি এই–

(ক) উর্দূ অনুবাদকের মতই বাংলায়ও ভাষার অনুবাদের পরিবর্তে বক্তব্যের অনুবাদ করা হয়েছে; উর্দূ অনুবাদেরও হুবহু অনুসরণ করা হয়নি। বলা যায়, লেখকের 'আত্মিক' তত্ত্বাবধানে মূল আরবী থেকে দ্বিতীয় একটি 'উর্দূ' অনুবাদ করার চেষ্টা করেছি। তবে নতুন সংযোজন-বিয়োজন তেমন একটা করা হয়নি, বরং মূলের অধিকতর নিকটবর্তী থাকারই চেষ্টা করেছি।

(খ) উর্দূ অনুবাদে যে অংশগুলো বাদ গিয়েছে, অথচ প্রয়োজনীয় বলে মনে হয় সেগুলো বাংলা অনুবাদে সংযোজন করা হয়েছে, অদ্রূপ উর্দূ অনুবাদে যে অংশগুলো পরিবর্ধিত হয়েছে এবং প্রয়োজনীয় মনে হয়েছে সেগুলো মূল আরবীতে না থাকলেও বাংলা অনুবাদে গ্রহণ করা হয়েছে। এ কারণে কিতাবের কলেবর যেমন যথেষ্ট বৃদ্ধি পেয়েছে, তেমনি অনুবাদের কাজটিও বেশ জটিল হয়েছে এবং সময়ও অনেক বেশী লেগেছে।

(গ) উর্দূ অনুবাদের মত বাংলা অনুবাদেও প্রয়োজনে সঙ্কোচন বা সম্প্রসারণের রীতি অনুসরণ করা হয়েছে। অবশ্য আগাগোড়া চেষ্টা করা হয়েছে মূল আরবী ও তার উর্দূ অনুবাদের শব্দচয়নের বৈশিষ্ট্যটি অক্ষুণ্ণ রাখার।

(ঘ) অনুবাদের ক্ষেত্রে সর্বোচ্চ চেষ্টা করা হয়েছে – লেখক যেমন উপদেশ দিয়েছিলেন – মূলের এবং উর্দূ অনুবাদের সাহিত্যমান অক্ষুণ্ণ রাখার। আশা করি, এক্ষেত্রে আল্লাহ তা'আলা প্রত্যাশার অধিক সাফল্য দান করেছেন। তবে আমার ধারণা, এক্ষেত্রে আরো উৎকর্ষ অর্জনের প্রচুর সুযোগ রয়েছে, যদি আরো এক-দু'বার আগাগোড়া সম্পাদনা করা হয়। কিন্তু আমার সামনে এখন মাদানী নেছাবের এমন কিছু কাজ অসম্পূর্ণ অবস্থায় রয়ে গেছে যা আর বিলম্বিত করার কোন সুযোগ নেই। তাই বর্তমান 'চেহারা-সুরতেই' বইটি প্রকাশ করতে হচ্ছে। আল্লাহ যদি কখনো সুযোগ দেন তাহলে প্রয়োজনীয় সংস্কার ও পরিমার্জনের ইচ্ছে আছে।

একথাগুলো এজন্য বলতে হলো যে, যারা মূল আরবী ও উর্দূভাষায় কিতাবটি পড়েছেন, বা পড়বেন (এবং তাদের সংখ্যাও প্রচুর) তারা যেন বাংলা অনুবাদটি পাঠ করার সময় পেরেশানিতে না পড়েন।

মূল লেখকের তত্ত্বাবধানে বইটির ইংরেজি তরজমাও হয়েছে, islam and the World নামে, তবে তা আরবী থেকে নয়, উর্দূ থেকে। তিনি মোটামুটি উর্দূর মূলানুগ তরজমাই করেছেন, আবার ক্ষেত্রবিশেষে প্রয়োজনের তাগিদে কিছুটা কমবেশী করেছেন। তবে দেখা যাচ্ছে, নাম নির্বাচনের ক্ষেত্রে তিনি গতানুগতিকতার বৃত্তেই রয়ে গেছেন। মূলে বা উর্দূ অনুবাদে নামের যে অন্যরকম একটি আবেদন ছিলো তা রক্ষিত হয়নি।

ইংরেজি অনুবাদকের নাম আছিফ কিদওয়াঈ, তিনি পক্ষাঘাতগ্রস্ত অবস্থায় কঠিন প্রতিকূলতার মধ্যে বলতে গেলে শয্যাশায়ী অবস্থায় বইটির তরজমা করেছেন, যখন উঠে বসা, দূরের কথা, নিজে নিজে পার্শ্বপরিবর্তন করাও তার পক্ষে সম্ভব ছিলো না। দীর্ঘ চল্লিশ বছর তিনি এ হালতে কাটিয়েছেন তাকদীরের প্রতি সন্তুষ্ট অবস্থায়। তিনি হযরত আলী নাদাবী রহ.-এর আরো কয়েকটি কিতাবেরও তরজমা করেছেন, শুধু তাঁর প্রতি ভক্তি মুহব্বতের কারণে এবং উম্মতের একটি বড় খেদমত মনে করে। হযরত আলী মিয়াঁ, 'পুরানে চেরাগ' এর তৃতীয় খণ্ডে তার খুব উচ্চ প্রশংসা করেছেন। যাদের ইংরেজি জ্ঞান উচ্চ মানের তাদের বরাতে হযরত আলী মিয়াঁ লিখেছেন– 'বইটিকে কোনভাবেই মনে হয় না অনুবাদ, বরং মনে হয়, ইংরেজির টাকশাল থেকে বের হওয়া চকচকে মুদ্রা। অনেকের মতে উর্দূভাষার কোন বইয়ের এর চেয়ে ভালো ইংরেজি অনুবাদ এপর্যন্ত হয়নি।' আল্লাহ তাঁকে জান্নাত নছীব করুন, আমীন।

ইরানের অভিজাত ইসলামী সংস্থা جلسات علمی اسلام شناسی قم কিতাবটির ফারসি তরজমা প্রকাশ করেছে با ضعف مسلمين دنيا در خطر سقوط নামে। ফারসী নামটির মূলানুগ তরজমা করলে দাঁড়ায়, 'মুসলমানদের দুর্বলতার কারণে পৃথিবী দুর্যোগে পড়েছে'।[১] তুর্কীভাষায়ও এর তরজমা প্রকাশিত হয়েছে। ফরাসীভাষায়ও তরজমার আয়োজন চলছে এবং দক্ষিণ এশিয়ার বিভিন্ন ভাষায় তরজমার কথাও লেখক জানিয়েছেন। বাংলায় অবশ্য ইতিমধ্যে বইটির দু'টি তরজমা হয়েছে; একটি বাংলাদেশ থেকে, অন্যটি পশ্চিমবঙ্গ থেকে। বাংলাদেশের তরজমাটি করেছেন আমার সুহৃদ বন্ধু মরহুম ওমর আলী ছাহেব।

---

[১] এই ফারসি তরজমাটি আল্লাহর কোন বান্দা যদি আমাকে যোগাড় করে দিতে পারেন جزاه الله خيرا। আজীবন আমি তার প্রতি কৃতজ্ঞ থাকবো।

এটি অবশ্য একটি সঙ্গত প্রশ্ন যে, দু'টি অনুবাদের পর তৃতীয় অনুবাদ কেন করা হলো? উত্তরে শুধু বলতে পারি, এর প্রয়োজন ছিলো। ইতিমধ্যে যারা তরজমা করেছেন, বিশ্বাস করি, আন্তরিকতার সঙ্গেই করেছেন, তাদের মেহনতকেও আল্লাহ কবুল করুন, আমীন।

লেখক নিজেই বলেছেন, এটি তার প্রথম জীবনে রচনাকর্ম, আর আরবীভাষায় এটিই হচ্ছে তাঁর প্রথম কলমচালনা। কিন্তু আল্লাহর কী শান! আরববিশ্বে এবং মুসলিমবিশ্বে কিতাবটি অকল্পনীয় জনপ্রিয়তা লাভ করেছে। আরববিশ্বে পঁচিশেরও বেশী অনুমোদিত ও অননুমোদিত সংস্করণ ইতিমধ্যে প্রকাশিত হয়েছে। উর্দূ ও ইংরেজি তরজমারও বেশক'টি সংস্করণ প্রকাশিত হয়েছে। বাংলাভাষার অনুবাদ দু'টিরও একাধিক সংস্করণ প্রকাশিত হয়েছে।

***

বহু বছরের দীর্ঘ প্রতিক্ষার পর আল্লাহ তা'আলা আমাকে তাওফীক দান করেছেন কিতাবটি বাংলা তরজমা করার; এজন্য আল্লাহর দরবারে সিজদায়ে শোকর। কত না আত্মিক প্রশান্তির কারণ হতো যদি আমার প্রিয়তম হযরত আলী মিয়াঁর জীবদ্দশায় এটি প্রকাশিত হতো, আর আমি নিজে তাঁর হাতে তা তুলে দিতে পারতাম! এখন আল্লাহর কাছে আন্তরিক প্রার্থনা, আল্লাহ যেন তরজমাটি কবুল করেন, মাকবুল করেন এবং ছাহিবে কিতাবের ইখলাছ ও লিল্লাহিয়াত দ্বারা অনুবাদ ও অনুবাদককে 'ফায়যইয়াব' করেন, আমীন।

যারা আমার দ্বীনী কাজে আন্তরিকভাবে সাহায্য করেছেন, করছেন এবং করবেন তাদের নাম তো আল্লাহ জানেন, তিনি যেন সবাইকে তাঁর শায়ানে শান আজর দান করেন, আমীন।

শেষদিকে যিনি বারবার কোমলভাবে তাগাদা দিয়ে তরজমার কাজটি দ্রুত সুসমাপ্তির দিকে নিয়ে যেতে সাহায্য করেছেন তিনি আমার প্রিয় ব্যক্তিদের একজন, আমার হজ্বের সফরসঙ্গী ভাই শাহজালাল, আল্লাহ তাকেও উত্তম বিনিময় দান করেন।

কিতাবের শেষ একশ পৃষ্ঠার মত কম্পোজ করেছেন আমার প্রিয় ছাত্র মাওলানা মুহম্মদ আলী, আর প্রুফ দেখার কাজে সহায়তা করেছেন মাওলানা যাহিদ, মাওলানা আলমামুন, মাওলানা মীযান, মাওলানা হোসায়ন, মাওলানা মাহমূদ হাসান, মাওলানা আছিম এবং এবারের চতুর্থ বর্ষের কয়েকজন তালিবে ইলম।

আমার পক্ষে এ কাজটি করা এখন কঠিনই হতো, আল্লাহ তাদের উত্তম বিনিময় দান করুন, আমীন।

অনেক চিন্তাভাবনার পর এ কিতাবটি আমি আমার পুত্র মুহম্মদের নামে উৎসর্গ করলাম। আমার জীবনের একটি বড় ব্যর্থতা এই যে, এখনো আমি আমার পরবর্তী মানুষটির সন্ধান পাইনি, যা দ্বীন ও দুনিয়া উভয় ক্ষেত্রেই কাজের স্থিতি ও স্থায়িত্ব এবং বিস্তার ও প্রসারের জন্য অপরিহার্য। অনেক হতাশার পর, বার্ধক্যের কাছাকাছি এসে আল্লাহর রহমতের উপর ভরসা করে ভাবছি, হয়ত আমার সন্তানকে আল্লাহ তা'আলা আমার কাজের ওয়ারিছ বানাবেন। হয়ত এ উৎসর্গের লাজ রক্ষা করার জন্য হলেও কিছু পূর্ণতা ও সৌন্দর্য, কিছু শুভ্রতা ও পবিত্রতা এবং কিছু যোগ্যতা ও প্রজ্ঞা অর্জন করার চেষ্টায় নিজেকে সে নিয়োজিত করবে। وما ذلك على الله بعزيز

সবশেষে আমার স্নেহের ভাই বশির মেছবাহের কথা বলতেই হয়। এখনো পর্যন্ত আমার সমস্ত কিতাবের প্রচ্ছদ তার হাতেই হয়েছে, যা আমার জন্য অতি সন্তোষের বিষয়। মাঝে মধ্যে অবশ্য আমার উপর দিয়ে ছোটখাটো পরীক্ষা যায়, তবে আল্লাহর রহমতে এখনো অনুত্তীর্ণ হইনি।

এখন সব কাজ মোটামুটি শেষ, বাকি শুধু প্রচ্ছদ। আশা করছি খুব মর্মসমৃদ্ধ ও দৃষ্টিনন্দন একটি প্রচ্ছদ বইটির অঙ্গশোভা বর্ধনের জন্য প্রস্তুত হচ্ছে। তাই যেন হয় এবং দ্রুতই যেন হয়। আল্লাহ তাকেও উত্তম বিনিময় দান করুন, আমীন।

আবু তাহের মেছবাহ
মাদরাসাতুল মাদীনাহ
হযরতপুর, কেরাণীগঞ্জ, ঢাকা
২৯/১০/৩৪ হি.

পুনশ্চ– আল্লাহর কী ইশারা! শেষ পর্যন্ত আমার সামনে উপস্থিত হয়েছে বশির মিছবাহের মেয়ে আমার ভাতিজি-এর হাতে তৈরী একটি প্রচ্ছদ! আমি অন্তর থেকে বললাম, যত সুন্দরই হোক আর কোন প্রচ্ছদের আমার প্রয়োজন নেই। আমার ভাতিজির প্রচ্ছদই এ কিতাবের শোভা এবং তার শিল্পগুণের শুভসূচি হয়ে থাক। কামনা করি, তার এ শিল্পগুণ সর্বদা দ্বীনের খিদমতে যেন নিয়োজিত থাকে।

আমরা সাত ভাই, সাত বোন, আমার ভাতিজা, ভাতিজি, ভাগিনা, ভাগিনি ও নাতি-নাতিন, সংখ্যায় আল্লাহর শোকর, পঞ্চাশ ছাড়িয়ে গিয়েছে। তাদের সবার জন্য অন্তরের অন্তঃস্তল থেকে দু'আ করি, আল্লাহ সবাইকে যেন কবুল করেন, সুখী সুন্দর জীবন দান করেন। তাদের কোন হক তো আমি আদায় করতে পারি না, আল্লাহ যেন আমার পক্ষ হতে তাদেরকে উত্তম থেকে উত্তম জাযা দান করেন, আমীন।

(কিতাব সম্পর্কে)

ছাহিবে কিতাবের কথা

সমস্ত প্রশংসা রাব্বুল আলামীন আল্লাহর; দুরূদ ও সালাম তাঁর রাসূলের প্রতি; আল্লাহর রহমত ও করুণা সমস্ত আছহাবে রাসূলের প্রতি এবং কেয়ামত পর্যন্ত যারা সুচারুরূপে তাঁদের অনুসরণ করবে, তাঁদের প্রতি।

অনেক সুধী পাঠকের হয়ত জানা নেই, ماذا خسر العالم بانحطاط المسلمين কিতাবটি আমার একেবারে প্রথম দিকের রচনা। বলা যায় এর মাধ্যমেই আরবীভাষায় আমার 'কলম-সফরের' শুরু। ১৯৪৪ ও ৪৭ এর মধ্যবর্তী সময় হলো এই কিতাবের রচনাকাল। আমার বয়স তখন মাত্র ত্রিশ অতিক্রম করেছে। বিষয়-বস্তুর জটিলতা, সংবেদনশীলতা এবং গভীরতা ও গম্ভীরতার দিক থেকে এটা ছিলো এমন 'অপরিণত' বয়সে আমার মত 'সাধারণ' মানুষের আয়ত্তের উর্ধ্বে। তদুপরি আমার জন্ম, প্রতিপালন, শিক্ষাদীক্ষা ও বেড়ে ওঠা, সবই ছিলো আরবী ভাষা, সাহিত্য ও সংস্কৃতির কেন্দ্রভূমি থেকে বহু দূরে ভারতবর্ষে। বাইরের কোন দেশ তখনো দেখার সুযোগ হয়নি। আল্লাহ আমাকে জীবনের প্রথম যে সফরের তাওফীক দিয়েছেন সেটা ছিলো ১৩৬৬ হিজরীতে ফরয হজ্জ আদায়ের মোবারক সফর। অর্থাৎ এ গ্রন্থরচনার তিন বছর পর। সুতরাং প্রকৃতপক্ষে এটা ছিলো এক দুঃসাহসী বুদ্ধিবৃত্তিক অভিযাত্রা, যার জন্য না আমি প্রস্তুত ছিলাম, না আমার যোগ্যতা ছিলো। বস্তুত এটা ছিলো এমন কোন বিজ্ঞ, প্রাজ্ঞ ও বিদগ্ধ ব্যক্তির কাজ, যার কলম আমার কলমের চেয়ে পরিণত, যার জ্ঞান আমার জ্ঞানের চেয়ে সমৃদ্ধ এবং লেখক হিসাবে যার অভিজ্ঞতা আমার চেয়ে অনেক দীর্ঘ; কিন্তু শেষ পর্যন্ত আল্লাহর ইচ্ছাই তো কার্যকর হয়।

আসলে এ বিষয়ে আমি এমন জোরালো ও রহস্যময় এক আত্মিক তাড়না অনুভব করছিলাম, যা শেষ পর্যন্ত আর এড়াতে পারিনি। যেন অদৃশ্যের কোন

শক্তি আমার হাতে কলম তুলে দিয়েছে এবং এ বিষয়ে আমাকে দিয়ে কিছু লিখিয়ে নিয়েছে।

তখন যদি আকল-বুদ্ধির 'পরামর্শ' চাইতাম, আকল আমাকে অবশ্যই বাধা দিতো, কিংবা যদি লেখক-গবেষকদের অভিজ্ঞতা, বৈদগ্ধ্য ও বুদ্ধিবৃত্তিক উচ্চতার কথা ভাবতাম তাহলেও এমন চিন্তা থেকে আমাকে পিছিয়ে আসতে হতো; এমনকি যদি কোন বিজ্ঞ আলিম ও প্রাজ্ঞ বুদ্ধিজীবীর কাছে বিষয়টি উত্থাপন করতাম, অবশ্যই তিনি এই ইলমী ও বুদ্ধিবৃত্তিক অভিযান থেকে আমাকে বিরত রাখতেন। তবে ভালোই হয়েছে, আমি কারো পরামর্শ নেইনি, না বুদ্ধির, না কোন বুদ্ধিমানের। (আসলে অপার্থিব এক আচ্ছন্নতার কারণে পরামর্শের কথা মনেই আসেনি।) আল্লামা ইকবাল যথার্থ বলেছেন–

বুদ্ধির ইশারায় চলা সবসময় ঠিক নয়/
কিছু বিষয়ে গুটিয়ে রেখো বুদ্ধিকে /
কেননা ঝুঁকির মুখে ভয় দেখাবে বুদ্ধি তোমায় /
আর এসব তিক্ত অভিজ্ঞতা থেকে বলবে দূরে থাকতে

সুতরাং কোন দিকে না দেখে, কোন কিছু না ভেবে একমাত্র আল্লাহর রহমতের উপর ভরসা করে সেই ভিতরের তাড়নায় কলম হাতে তুলে নিয়েছিলাম। তাছাড়া কিতাবটির প্রাথমিক ধারণা মোটামুটি একটি প্রবন্ধের চেয়ে বেশি কিছু ছিলো না, যেখানে কাজ হবে–

(ক) সংক্ষেপে দেখাতে চেষ্টা করবো, জীবনের মানচিত্রে এবং বিশ্বসভায় মুসলিম উম্মাহর অবস্থান ও মর্যাদা কী? উম্মাহর পতন ও অধ:পতন এবং পৃথিবীর নেতৃত্ব ও অভিভাবকত্ব থেকে তার অপসারণের কারণে মানবতার কী ক্ষতি ও দুর্গতি হয়েছে?

(খ) মুহম্মদ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বি'ছাত (আবির্ভাব ও প্রেরণ) জাহেলিয়াতের কোন্ পরিবেশে হয়েছিলো, মানবজাতি তখন অধ:পতনের কোন্ স্তরে উপনীত হয়েছিলো। তাঁর দাওয়াত ও তারবিয়াত কীভাবে উম্মাহকে خير أمة রূপে তৈয়ার করেছিলো। উম্মাহর ঈমান, আখলাক ও সীরাত এবং বিশ্বাস, চরিত্র ও জীবনবোধ কেমন ছিলো? কীভাবে উম্মাহ বিশ্বের নেতৃত্ব-ভার নিজের হাতে তুলে নিয়েছিলো এবং মানবজাতির জীবন ও সভ্যতা, ঝোঁক ও প্রবণতা এবং স্বভাব ও কর্মের উপর কী প্রভাব

পড়েছিলো? জাহেলিয়াতের ঘোর অন্ধকার থেকে ইসলামের আলোর দিকে পৃথিবীর গতিধারা কীভাবে পরিবর্তিত হয়েছিলো?

(গ) এমন উম্মাহর জীবনে এমন অধ:পতন কীভাবে শুরু হলো? কেন তাকে দুনিয়ার ইমামত ও কিয়াদাত এবং পৃথিবীর নেতৃত্ব, কর্তৃত্ব ও আত্মিক অভিভাবকত্ব থেকে সরে যেতে হলো? কীভাবে তা দুর্বল, উদাসীন, অথচ বিশ্বাসী একটি জাতির হাত থেকে শক্তিশালী, উদ্যমী, অথচ স্রষ্টাবিমুখ ও বস্তুবাদী ইউরোপের হাতে গেলো? খোদ ইউরোপে বস্তুপূজা ও ধর্মবিমুখ-তার প্রকাশ ও বিস্তার কীভাবে ঘটেছে? পশ্চিমা সভ্যতার আসল স্বভাব ও প্রকৃতি কী? কী কী অণু-উপাদান দ্বারা এর 'খামীর' ও সত্তা তৈরী হয়েছে? ইউরোপের বিশ্বনেতৃত্ব জীবন ও সভ্যতাকে কীভাবে প্রভাবিত করেছে?

(ঘ) পৃথিবীর গতি এখন কোন্ দিকে এবং এর সম্ভাব্য পরিণতি কী? মুসলিম উম্মাহর দায়িত্ব ও কর্তব্য কী এবং এই দায়িত্বপালনে কীভাবে সে সফল হতে পারে?

মোটামুটি এই ছিলো আলোচনার পরিধি এবং উদ্দেশ্য ছিলো শুধু উম্মাহর মধ্যে যেন বিশ্বমানবতার প্রতি তার দায়িত্বহীনতার এ অমার্জনীয় অপরাধের অনুভূতি জাগে; তারপর আত্মসংশোধন ও পুন:যোগ্যাতা অর্জনের মাধ্যমে এর ক্ষতিপূরণ ও প্রায়শ্চিত্তের প্রেরণা জাগ্রত হয়। একই সঙ্গে মানবজাতিও যেন তার দুর্ভাগ্যের কথা জানতে পারে, যার শিকার সে হয়েছে মুসলিম উম্মাহর নেতৃত্ব থেকে তার বঞ্চিত হওয়ার কারণে। তদ্রূপ এ অমোঘ সত্য যেন সে অনুভব করতে পারে যে, অবস্থার বড় কোন পরিবর্তন কিছুতেই হতে পারে না, যতক্ষণ না বিশ্বের নেতৃত্ব, স্রষ্টার প্রতি ভয়, বিশ্বাস ও আনুগত্যহীন, বস্তুবাদী জীবনের পূজারী মানুষের হাত থেকে ঐ সকল খোদামুখী ও খোদাভীরু মানুষের হাতে আসবে যারা নববী তা'লীমাত ও শিক্ষা এবং হিদায়াত ও দীক্ষা থেকে জীবন-পথের পাথেয় ও দিকনির্দেশনা গ্রহণ করে; যাদের কাছে রয়েছে আখেরি নবীর আখেরি শরী'আত এবং দ্বীন ও দুনিয়ার মুকাম্মাল দস্তুর ও পূর্ণাঙ্গ জীবন-বিধান।

লেখা কিছুদূর এগুতেই আমার পূর্ণ উপলব্ধি হয়ে গেলো যে, গভীরতা ও গম্ভীরতা এবং বিস্তার ও প্রসারের দিক থেকে এটি সাধারণ কোন প্রবন্ধের বিষয়বস্তু নয়, বরং এর জন্য প্রয়োজন বড় আয়তনের কোন কিতাব এবং কোন যোগ্য হাতে তা রচিত হওয়া সময়ের অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ প্রয়োজন। কারণ এ বিষয়ে খোদ মুসলিম

সমাজেরও চিন্তাভাবনা তেমন স্বচ্ছ ও পরিচ্ছন্ন নয়। জীবন ও জগতের সঙ্গে দায়দায়িত্বের কোন সম্পর্কই এখন তারা অনুভব করে না। অনেকে অবশ্য উম্মাহর পতন ও অধ:পতনকে স্থানীয় গুরুতর ঘটনা বা জাতীয় বিপর্যয় মনে করে, কিন্তু এ অনুভূতি কারো নেই যে, এটা কেমন বিশ্বব্যাপী দুর্যোগ এবং সমগ্র মানবতার জন্য কত বড় দুর্ভাগ্য!

বাস্তব সত্য এই যে, এ বিষয়টি এড়িয়ে গেলে আমরা না ইসলামের ইতিহাস বুঝতে পারবো, না মানবজাতির ইতিহাস; আর না মানবতার বর্তমান দুর্গতির সঠিক রূপ নির্ণয় করতে পারবো। সারা বিশ্বকে তছনছকরা এই যে ব্যাপক বিপ্লব, এর সঠিক কারণ ও অনুষঙ্গ নির্ধারণ করাও আমাদের পক্ষে সম্ভব হবে না, যা হচ্ছে ইসলামের বিশ্ব-বিপ্লবের পর পৃথিবীর সবচে' বড় বিপ্লব। পার্থক্য এই যে, প্রথমটি ছিলো অকল্যাণ থেকে কল্যাণের দিকে, অন্ধকার থেকে আলোর দিকে; এবং ছিলো মুহম্মদী নবুয়তের আবির্ভাব ও ইসলামী দাওয়াতের উত্থানের ফল। পক্ষান্তরে দ্বিতীয় বিপ্লবটি হচ্ছে উম্মতে মুহম্মদীর অধ:পতন এবং ইসলামী দাওয়াতের প্রতি অবহেলা, অবজ্ঞা ও উদাসীনতার ফল।

মুসলিম উম্মাহর মধ্যে আস্থা ও আত্মবিশ্বাস এবং ইসলামের দিকে প্রত্যাবর্তনের প্রেরণা ও কর্মোদ্যম সৃষ্টি করার জন্যও অবশ্যকর্তব্য হলো তাদেরকে তাদের অবস্থান ও মর্যাদা স্মরণ করিয়ে দেয়া এবং এটা বুঝিয়ে দেয়া যে, বিশ্বমানবতার বিনির্মাণের মহান কর্মপ্রচেষ্টায় তারা অত্যন্ত প্রভাবক ও কার্যকর উপাদান, তারা কোন চলন্ত যন্ত্রের নিছক যন্ত্রাংশ নয়; নয় কোন নাট্যমঞ্চের অভিনেতা মাত্র।

আল্লাহর নাম নিয়ে কাজ শুরু হলো এবং কাজ এগিয়ে চললো, তবে বড় সমস্যা দেখা দিলো এই যে, এ বিষয়ে যেসব আরবী উৎসগ্রন্থের সাহায্য নেয়া জরুরি, আমার হাতের কাছে তা খুব কমই ছিলো। কারণ সময়টা ছিলো দ্বিতীয় বিশ্ব-যুদ্ধের। ভারতবর্ষ ও আরববিশ্বের সঙ্গে যোগাযোগ ছিলো প্রায় বিচ্ছিন্ন। সাধারণ -ভাবে আরবদেশে এবং বিশেষভাবে মিশরে ইতিহাস, সভ্যতা ও সংস্কৃতিবিষয়ক যে সমস্ত ইলমী কিতাব ও বুদ্ধিবৃত্তিক গ্রন্থ ছিলো সহজলভ্য, ভারতবর্ষে তা খুব কমই আসতো। অবশ্য ইংরেজি ও উর্দূভাষার একাডেমিক উৎসগ্রন্থ পর্যাপ্ত পরিমাণে এবং হাতের নাগালে ছিলো। জ্ঞান ও সংস্কৃতির শহর বলে পরিচিত লক্ষ্ণৌতে অনেক সমৃদ্ধ গ্রন্থাগার ছিলো, যেখানে ইংরেজি ভাষার সর্বশেষ প্রকাশনা এবং বিভিন্ন জ্ঞানবিশ্বকোষ পাওয়া যায়। সেখানে আমার নিয়মিত যাতায়াত ছিলো। প্রয়োজনীয় বইপুস্তক আমি ধার নিয়ে পড়তাম। বিভিন্ন

ব্যক্তিগত গ্রন্থাগারও আমার যথেষ্ট উপকারে এসেছে। এ কঠিন কাজটি আল্লাহ তা'আলা এভাবেও সহজ করে দিয়েছেন যে, নিকট অতীতে আমি ইউরোপের ধর্ম, সমাজ, চরিত্র, রাজনীতি, সভ্যতা ও সংস্কৃতির ইতিহাস খুব আগ্রহের সঙ্গে গভীর ও ব্যাপক পরিসরে অধ্যয়ন করেছিলাম। রাজা ও গীর্জার দ্বন্দ্ব এবং ধর্ম ও বিজ্ঞানের সজ্ঞাত-বিষয়ে আমার পড়াশোনা ছিলো বিশেষজ্ঞ পর্যায়ের। সুতরাং ইউরোপের চরিত্র ও নৈতিকতার ইতিহাস, এর ক্রমবিবর্তন এবং যেসব 'কার্যকারণ' ইউরোপের নৈতিকতাকে বিশেষ কাঠামো ও প্রকৃতি দান করেছে, যা ইউরোপকে বস্তুবাদের বর্তমান নাযুক অবস্থায় এনে পৌঁছিয়েছে, যা পাশ্চাত্য ও প্রাচ্যের জীবন ও চিন্তার গতিধারায় ব্যাপক ও গভীর প্রভাব বিস্তার করেছে; এসব বিষয়ে আমার স্বচ্ছ ধারণা ছিলো।

এছাড়া রয়েছে ইসলামী প্রাচ্যের বিভিন্ন দেশ, ধর্ম, ধর্মীয় ও সংস্কার-আন্দোলন ও দর্শনের ইতিহাস, ইসলাম ও মুসলিম জাতির ইতিহাস, আরবদের জাহেলি ও ইসলামি যুগের ইতিহাস, যা অধ্যয়ন করার মাধ্যম ছিলো সংশ্লিষ্ট বিষয়ের বই-পুস্তক, এবং কবিতা ও সাহিত্যের সম্ভার। তো ধর্ম, সাহিত্য ও ইতিহাসচর্চার পরিবেশে প্রতিপালনের কারণে এ বিষয়ে জ্ঞান অর্জন করা আমার জন্য অপেক্ষাকৃত সহজ ছিলো। তাছাড়া নদওয়াতুল উলামার বিরাট কুতুবখানায় এবং বিভিন্ন ব্যক্তিগত গ্রন্থাগারে এ বিষয়ে পর্যাপ্ত সংগ্রহ ছিলো এবং ভারত উপমহা-দেশের অনুবাদ ও প্রকাশনা-আন্দোলনের সঙ্গে আমার অব্যাহত যোগাযোগ ছিলো। উন্নত মানের গবেষণামূলক পত্রপত্রিকাও আমার অধ্যয়নে ছিলো, যাতে মূল্যবান ও গবেষণাসমৃদ্ধ বহু প্রবন্ধ থাকতো।

সবকিছুর উপরে ছিলো আমার বুদ্ধিবৃত্তিক ও মনস্তাত্ত্বিক প্রতিপালনের বিশেষ পরিবেশ, যা ঐতিহ্যিকভাবেই এ বিশ্বাসে বিশ্বাসী ছিলো যে, ইসলামের দাওয়াত ও পায়গাম হচ্ছে চিরন্তন; মুহম্মদ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হচ্ছেন সর্বশেষ ও সর্বশ্রেষ্ঠ রাসূল, যিনি 'তা-কেয়ামাত' মানবজাতির ইমামত ও নেতৃত্বের জন্য আল্লাহর পক্ষ হতে প্রেরিত। আমিও এ বিশ্বাসের উপর প্রতিপালিত হয়েছি। এ বিষয়েও আমার পরিষ্কার ধারণা ছিলো যে, পাশ্চাত্যের জাতি ও সভ্যতার স্বভাব-প্রকৃতিতেই রয়েছে এমন কিছু বিচ্যুতি-স্খলন যা কোনভাবেই তার থেকে বিচ্ছিন্ন হয় না; অতি প্রকটভাবেই যা ধরা পড়ে তার শাসন ও নেতৃত্বের ক্ষেত্রে। শুরু থেকেই এগুলো আমার চিন্তা-চেতনার অবিচ্ছেদ্য অংশ হতে পেরেছিলো আমার শ্রদ্ধেয় বড় ভাই ডাক্তার সাইয়েদ আব্দুল আলী হাসানী (নদওয়াতুল উলামার

মহাসচীব)-এর তারবিয়াত ও দীক্ষাগুণে, যিনি ছিলেন ইসলাম ও আধুনিক সংস্কৃতির সুসমন্বয়ের ক্ষেত্রে এক বিরল উদাহরণ। বস্তুত ইসলাম সম্পর্কে তাঁর বোধ ও উপলব্ধি যেমন ছিলো গভীর, তেমনি চিন্তা-চেতনাও ছিলো পূর্ণ ভারসাম্য -পূর্ণ এবং সর্বপ্রকার উগ্রতা ও প্রান্তিকতা থেকে মুক্ত। মূলত তাঁর প্রজ্ঞাপূর্ণ তারবিয়াত ও প্রতিপালনই আমাকে এ যোগ্যতা দান করেছিলো, যা দ্বারা আমি আমার বৈচিত্র্যপূর্ণ অধ্যয়ন থেকে পূর্ণ উপকৃত হতে পেরেছি। (অনেক সময় যা মনে হয় পরস্পরবিরোধী এবং 'অপরিপক্ব' পাঠকের জন্য যা চিত্তচাঞ্চল্য ও চিন্তাবিক্ষেপের কারণ হয়) এবং তা থেকে সুনির্দিষ্ট ইতিবাচক সিদ্ধান্ত আহরণে সক্ষম হয়েছি; বরং এ বৈচিত্র্যপূর্ণ অধ্যয়নই আমার অন্তরে এ আস্থা ও প্রত্যয় আরো সংহত করেছে যে, ইসলামের রয়েছে প্রত্যেক যুগে মানবসভ্যতাকে নেতৃত্বদান ও পথপ্রদর্শনের পূর্ণ যোগ্যতা এবং মুহম্মদ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামই হচ্ছেন সর্বশেষ রাসূল এবং সর্বযুগের সর্বজাতির পথপ্রদর্শক, হাদী ও রাহনুমা।

তারপরো বিষয়বস্তুর গুরুত্ব ও সংবেদনশীলতা, সেইসঙ্গে নবীন বয়সের অল্প অভিজ্ঞতা, জ্ঞানস্বল্পতা এবং পথের ঝুঁকি ও বিপদ সম্পর্কে আমি পূর্ণ সচেতন ছিলাম। কিন্তু যে কথা আগেও বলেছি, এক্ষেত্রে আমি নিজের ইচ্ছা দ্বারা নয়, বরং কোন অদৃশ্য শক্তি দ্বারা পরিচালিত হয়েছি। ভিতরের কোন প্রক্ষেপক যেন অন্তরে একথা প্রক্ষেপণ করেছে, 'ওঠো, কলম ধরো; সময়ের এ প্রয়োজন তোমাকেই পূর্ণ করতে হবে'।

আল্লাহর নামে আমি কলম ধরলাম। লিখতে শুরু করলাম, এবং অদৃশ্যের পথ-নির্দেশনায় পূর্ণ উদ্যম ও উদ্দীপনার সঙ্গে লিখেই চললাম। প্রত্যেক প্রতিকূলতায়, প্রত্যেক জটিলতায় আল্লাহর সাহায্য হলো এবং এ দীর্ঘ কাজ শেষ পর্যন্ত সমাপ্তিতে উপনীত হলো। সর্বাবস্থায় সকল প্রশংসা আল্লাহর।

এরই মধ্যে ১৯৪৭-এ হিজাযের প্রথম সফর হলো এবং মক্কায় অবস্থানকালে মনে হলো, কিতাবের প্রথম অধ্যায়ে অনেক অসম্পূর্ণতা রয়েছে। জাহেলিয়াতের পুরো চেহারা-নকশা এখানে উঠে আসেনি। অথচ ইসলামের শানদার ইনকিলাব ও অনন্যসাধারণ বিপ্লব এবং অবিশ্বাস্য কীর্তি ও 'কারনামা' ততক্ষণ পর্যন্ত বুঝে আসতে পারে না যতক্ষণ না জাহেলিয়াতের পূর্ণ চিত্র ও চরিত্র উপস্থাপিত হবে এবং সবিশদ এটা তুলে ধরা হবে যে, মুহম্মদ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আবির্ভাব ও ইসলামী দাওয়াতের আত্মপ্রকাশকালে পৃথিবীর অবস্থা কী ছিলো

এবং ধর্মীয়, নৈতিক, সামাজিক, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক পরিবেশ-পরিস্থিতি কেমন ছিলো? তাই এ অধ্যায়ের উপর নতুন করে কাজ করার প্রয়োজন অনুভূত হলো। তখন দেখা গেলো, জাহেলিয়াত ও তার যুগ সম্পর্কে তথ্য-উপাত্ত একত্রে খুব কম পাওয়া যায়; যা কিছু আছে তা বহুগ্রন্থের বহুসহস্র পৃষ্ঠায় ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে। এগুলো একত্র করে জাহেলিয়াতের একটা পূর্ণ ছবি ও চিত্র তৈরী করা, যাতে সে যুগের পূর্ণ জীবন ও চরিত্র এবং স্বভাব ও বৈশিষ্ট্য উঠে আসে; নিঃসন্দেহে এটা সীরাতে নববীর এক বিরাট খেদমত, তবে এর জন্য চাই অপরিসীম ধৈর্য ও অধ্যবসায়।

সৌভাগ্যক্রমে মক্কায় প্রাচীন ও আধুনিক কিছু গ্রন্থের একটি 'সঞ্চয়' পাওয়া গেলো, যা এক্ষেত্রে বেশ কাজে এসেছে। ভারতে আসার পরও অধ্যয়ন ও গবেষণা অব্যাহত ছিলো। একসময় অধ্যায়টি পূর্ণাঙ্গতা লাভ করলো। ফলে কিতাবের কলেবরও যথেষ্ট বৃদ্ধি পেলো।

এ প্রসঙ্গে আরেকটি চিন্তা মনে এলো যে, মুহম্মদী নবুয়তের বহুমুখী প্রভাব এবং দাওয়াতে ইসলামের বিভিন্ন গুণ ও বৈশিষ্ট্য সম্পর্কেও বিশদ আলোচনা দরকার। এ দাওয়াতের স্বভাব, প্রকৃতি, কৌশল ও কর্মপন্থা কী? নবীগণ স্ব-স্ব যুগে জাতি ও সম্প্রদায়-এর ইছলাহ ও সংশোধন কীভাবে করতেন? তাঁদের দাওয়াত ও মেহনতের 'আন্দায'[১] ও প্রকৃতি সাধারণ সংস্কার-পুরুষ ও সংশোধন-প্রয়াসীদের থেকে কতটা ভিন্ন হতো? তাঁদের দাওয়াতের প্রতিক্রিয়া কেমন হতো এবং জাহেলিয়াত কী কী উপায় ও কৌশলে নববী দাওয়াতের মোকাবেলা করতো? নবীগণ তাঁদের অনুসারীদের শিক্ষা, দীক্ষা ও তারবিয়াত কীভাবে করতেন? অবশেষে দাওয়াত কীভাবে সফলতা লাভ করতো এবং জীবন ও চরিত্রের উপর

---

[১] আন্দায শব্দটি মূলত ফার্সি। সেখান থেকে উর্দু ও বাংলায় শব্দটির আগমন। বাংলায় শব্দটির অর্থ অনুমান, ধারণা। (আন্দাযে ঢিল ছোঁড়া, আন্দাযের উপর লেখা) অনুভব করা, টের পাওয়া। (অন্ধকারেও আন্দায পাচ্ছি ঘরে কেউ ঢুকেছে।) আনুমানিক, মোটামুটি। (সভায় আন্দায দু'শ লোক হয়েছে। আন্দায পাঁচশ' টাকা খরচ হবে।) অনুরূপ, আনুপাতিক পরিমাণ। (একসের ময়দা, সেই আন্দায ঘী)। উর্দুতে এসব অর্থে اندازہ (আন্দাযা) শব্দটি ব্যবহৃত হয়।
উর্দুতে আন্দায শব্দটির অর্থ, ভাব, ভঙ্গি, ধরণ, প্রকৃতি। এখানে শব্দটি এ অর্থেই ব্যবহৃত হয়েছে। বাংলায় বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে এ অর্থে শব্দটি ব্যবহার করার গ্রহণযোগ্যতা রয়েছে বলেই মনে হয়। যেমন, 'তার লেখার একটি নিজস্ব আন্দায আছে।' 'আমাকে অনেকেই মুহব্বত করে, তবে তোমার মুহব্বতের আন্দাযই আলাদা!'

এর কী কী সুফল ও সুপ্রভাব দেখা দিতো? এটি ছিলো কিতাবের অতি জরুরি একটি অধ্যায়, যা যুক্ত না হলে বিষয়বস্তু অসম্পূর্ণ থেকে যেতো এবং কিতাবের আবেদন ক্ষুণ্ন হতো।

কিতাবটি উর্দূতে নয়, বরং ماذا خسر العالم بانحطاط المسلمين নামে আরবীভাষায় লেখা হয়েছে। কিন্তু কেন?! যে দেশ, সমাজ ও পরিবেশের সঙ্গে লেখকের সম্পর্ক এবং যে পরিমণ্ডলে গ্রন্থরচনার চিন্তা ও পরিকল্পনা তার স্বাভাবিক দাবী তো ছিলো ঐ দেশের জ্ঞান-চর্চার ভাষা উর্দূকেই মাধ্যমরূপে গ্রহণ করা! হাঁ, একটি বিশেষ চিন্তার অধীনেই আরবীকে অগ্রাধিকার দেয়া হয়েছে, আর তা এই যে, আমি তীব্রভাবে অনুভব করেছি, আরববিশ্ব ও আরবজাতিই আজ হীনমন্যতা ও আত্মবিস্মৃতির সবচে' বড় শিকার। মানবজাতি যদিও তাদেরই কাছ থেকে নতুন জীবন এবং নতুন ঈমান লাভ করেছে, কিন্তু আজ তাদের পরিবেশই সবচে' বেশী নীরব, নির্বাক; তাদের জীবন-সমুদ্রই সবচে' বেশী নিস্তরঙ্গ। প্রাচ্যের দার্শনিক কবি আল্লামা ইকবাল কয়েক বছর আগে আরবভূখণ্ড ঘুরে এসে ভুল কিছু বলেননি–

سنی نہ مصر و فلسطین میں وہ اذاں میں نے　　دیا تھا جس نے پہاڑوں کو رعشۂ سیماب

وہ سجدہ روح زمیں جس سے کانپ جاتی تھی　　اس کو آج ترستے ہیں منبر و محراب

মিশর-ফিলিস্তীনে সেই আযান আমি শুনিনি/ যা পর্বতে সৃষ্টি করেছিলো জীবনের স্পন্দন/ ঐ সিজদা যা ভূমির প্রাণে তুলতো কাঁপন/ সেই সিজদার জন্য ব্যাকুল আজ মিম্বর-মিহরাব।

ইউরোপের নৈকট্য, বিশেষ রাজনৈতিক অবস্থা এবং ঐসব 'মাজনুপ্রাণ' ব্যক্তির সংখ্যাল্পতার কারণে, সৌভাগ্যক্রমে ভারতবর্ষে প্রজন্মপরম্পরায় যাদের রয়েছে বিপুল উপস্থিতি, দুর্ভাগ্যক্রমে পবিত্র আরবভূমি যাদের পুণ্যউপস্থিতি থেকে ছিলো বঞ্চিত, এসব কারণে আরবজাতি আজ খুব সহজেই ইউরোপের ধোকা, প্রতারণা ও কূটকৌশলের অসহায় শিকারে পরিণত হয়েছে। শায়খ হাসানুল বান্না, 'জীবন-সূর্য যখন মধ্যগগনে' ঘাতকের গুলিতে শহীদ হয়েছেন। তাঁর মত ব্যক্তিত্ব নিকট ভবিষ্যতে আসবে, এরূপ সম্ভাবনা তেমন দেখা যায় না। তাঁর

প্রতিষ্ঠিত 'ইখওয়ানুল মুসলিমূন' ছাড়া আর কোন শক্তিশালী ইসলামী আন্দোলন ও দাওয়াতি মেহনত গোটা আরবজাহানে নেই। কোথাও কোন দ্বীনী তড়প ও অস্থিরতা এবং হিম্মত ও চঞ্চলতার চিহ্নমাত্র নেই। মানুষ হয় সময়ের সঙ্গে সমঝোতা করে নিয়েছে, কিংবা উম্মাহর ভবিষ্যত সম্পর্কে হতাশ হয়ে বসে পড়েছে। আর অনেকে নৌকা ভাসিয়েছে স্রোতের অনুকূলে। কোন মুসাফির যখন আরবজনপদের বর্তমান ও অতীতের মধ্যে তুলনা করে তখন দরদ-ব্যথায় কাতর হয়ে বলতে বাধ্য হয়–

قافلۂ حجاز میں ایک حسین بھی نہیں　　گرچہ ہے تابدار ابھی گیسوئے دجلہ و فرات

হেজাযের কাফেলায় আজ নেই কোন হোসাইন, যদিও দজলা-ফোরাত এখনো বয়ে যায় আগের স্রোতে।

এ বেদনাদায়ক অনুভূতির কারণেই 'হিন্দী মুসাফির'-এর কলম উর্দূর বদলে আরবীকেই গ্রহণ করেছে তার কান্না ও দরদ-ব্যথা প্রকাশে মাধ্যমরূপে। তাছাড়া গৌরবময় ইতিহাস এবং গুরুত্বপূর্ণ ভৌগোলিক অবস্থানের কারণে অবশ্যই আরব-জাহান এখনো বিশ্বনেতৃত্বের দায়িত্বভার গ্রহণ করে সমগ্র সভ্য পৃথিবীকে প্রভাবিত করার পূর্ণ যোগ্যতা রাখে। আরবজনপদ লোহিত সাগর ও ভূমধ্যসাগরের তীরে অবস্থিত। পাশ্চাত্য ও দূরপ্রাচ্যের মাঝে তার অবস্থান। নতুন বিশ্ব-বিপ্লব এবং ইসলামের দ্বিতীয় উত্থান ও নবজাগরণের জন্য আরবজাহান ও মধ্যপ্রাচ্যের চেয়ে অধিক উপযোগী আর কোন জনপদ হতে পারে না। এটাও ছিলো এক বড় 'অনুপ্রাণিকা', যার ভিত্তিতে দূর ভারতের বাসিন্দা হয়েও এমন গুরুত্বপূর্ণ ও সংবেদনশীল বিষয়বস্তুর জন্য আরবী ভাষাকেই আমি নির্বাচন করেছি এবং বিশ্বাস করি, আমি ঠিকই করেছি।

সাতচল্লিশের হিজাযসফরে পবিত্রভূমি ও তার অধিবাসীদের খুব নিকট থেকে দেখার এবং বিভিন্ন শ্রেণীর সঙ্গে ওঠাবসা ও আলাপ-আলোচনার যখন সুযোগ হলো, তখন কিতাবটি যথাসম্ভব দ্রুত প্রকাশের প্রয়োজনীয়তার অনুভূতি আরো জোরদার হলো। কিন্তু লেখার জগতে, বিশেষ করে আরবীভাষায় কলম ধরার ক্ষেত্রে আমি ছিলাম নতুন। তাই স্বভাবতই কিছুটা দ্বিধা-উৎকণ্ঠা ছিলো যে, কিতাবটি কি আরবদেশে, আরবের বুদ্ধিজীবী মহলে সমাদর পাবে? একারণে আমার ইচ্ছা ও চেষ্টা ছিলো, কিতাবটি যেন মিশরের অভিজাত ও মর্যাদাপূর্ণ

কোন প্রকাশনাপ্রতিষ্ঠান থেকে প্রকাশিত হয়, যাতে তা সর্বোচ্চ প্রচার ও পরিচিতি লাভ করে এবং লেখকের অন্তরের আসল যে উদ্দেশ্য ও চাহিদা তা পূর্ণ হয়।

لجنة التأليف والترجمة والنشر হচ্ছে মিশরের অত্যন্ত অভিজাত প্রকাশনাপ্রতিষ্ঠান, যা উচ্চাঙ্গের বুদ্ধিবৃত্তিক গ্রন্থপ্রকাশের কারণে সমগ্র মধ্যপ্রাচ্যে বিশেষ খ্যাতি ও মর্যাদার অধিকারী। প্রতিষ্ঠানটির প্রধান হলেন ডঃ আহমদ আমীন, যিনি তার লেখার গুণে, বিশেষ করে ফজরুল ইসলাম, যোহাল ইসলাম সিরিজগ্রন্থের সুবাদে বিশ্বের সুধী মহলে অতি সমাদৃত ব্যক্তি। তাঁর চিন্তার বিশুদ্ধতা, সূক্ষ্মদর্শিতা, সিদ্ধান্তের নির্ভুলতা ইত্যাদি সম্পর্কে আমার সুধারণা ছিলো। তাই খুব আকাঙ্ক্ষা হলো, কিতাবটি যদি 'লাজনা' থেকে প্রকাশের ব্যবস্থা হতো, খুব ভালো হতো! কারণ এখান থেকে প্রকাশিত যে কোন গ্রন্থ আরববিশ্বে বুদ্ধিবৃত্তিক মর্যাদার চোখে দেখা হয়। যারা বস্তুনিষ্ঠ ও তথ্যনির্ভর অধ্যয়ন ও জ্ঞান-গবেষণায় আগ্রহী তারা এবং শিক্ষিত আরব যুবসমাজ যথেষ্ট আগ্রহের সঙ্গে লাজনার প্রকাশিত গ্রন্থ গ্রহণ করে থাকে।

অনেক চিন্তা ও দ্বিধা-সঙ্কোচের পর আমি ডঃ আহমদ আমীনের নিকট এ বিষয়ে পত্র লিখলাম। সঙ্গে কিতাবের সূচীপত্রও পাঠালাম, যেন কিতাব সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত ধারণা লাভ করা সহজ হয়। অনেক দিন পার হলো, কিন্তু জানতে পারলাম না, প্রেরিত পত্র ও কাগজপত্র-এর কী পরিণতি হলো? অজ্ঞাত, অখ্যাত এক আজমি লেখক, যার কোন একাডেমিক কীর্তি নেই এবং যাকে পরিচয় করিয়ে দেয়ার কেউ নেই তার 'আবেদনপত্রের' কীই বা গুরুত্ব হবে এত বড় প্রতিষ্ঠানের এমন বিরাট ব্যক্তির কাছে?! কিন্তু হঠাৎ একদিন আমাকে হতবাক করে এই অখ্যাত 'হিন্দী'র নামে পত্র এলো। তিনি অনুরোধ করলেন, কিতাবের কিছু নমুনা-অংশ পাঠাতে! পাঠালাম।

কিতাবের বিষয়বস্তু পছন্দ হলো, তবে তাঁর আশঙ্কা হলো, পাশ্চাত্যের শিক্ষা ও সভ্যতার সঙ্গে অপরিচিত একজন আলিমের লেখা 'কিতাবে' হয়তো ওয়াজ ও ধর্মীয় ছাপই প্রকট হবে, আজহার ও অন্যান্য প্রাচীন ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানে শিক্ষাপ্রাপ্ত আলিমদের ক্ষেত্রে যেমন হয় বলে তাঁর ধারণা। তাই তিনি জানতে চাইলেন 'বিদেশী উৎস' কী পরিমাণ ব্যবহার করা হয়েছে? উত্তরে ইংরেজি উৎসগ্রন্থের তালিকা পাঠালাম। 'ডক্টর সাহেব' আশ্বস্ত হলেন এবং সুসংবাদ দিলেন, লাজনা

আপনার কিতাব প্রকাশের জন্য অনুমোদন দিয়েছে। তদুপরি তিনি আত্মিক, বুদ্ধিবৃত্তিক ও সাহিত্যিক সর্বদিক থেকেই কিতাবটির উচ্চ প্রশংসা করলেন। বলতে দ্বিধা নেই, ঐ বয়সে ঐ পত্র পাওয়ার দিনটি ছিলো আমার জীবনের অন্যতম প্রধান আনন্দের দিন, যা আজ পর্যন্ত আমি ভুলিনি।

এরপর কয়েক মাস কেটে গেলো। কিতাবের ভাগ্যে কী ঘটলো, জানা হলো না। এর মধ্যে ১৩৬৯ হিজরীতে (১৯৫০ খৃঃ) হিজাযের দ্বিতীয় সফর হলো। হঠাৎ একদিন সিরিয়ার রাষ্ট্রদূত (দামেস্কের আল মাজমাউল ইলমীর মাননীয় সদস্য) উস্তাদ জাওয়াদ আল মুরাবিত-এর নিকট কিতাবের একটি নোসখা দেখতে পেলাম, যা তিনি কায়রো থেকে সংগ্রহ করেছেন। কিতাবটি দেখিয়ে তিনি হিন্দুস্তানী আলিমদের চিন্তার গভীরতা ও মৌলিকত্বের উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করলেন। তিনি জানতেন না, স্বয়ং ছাহিবে কিতাবের সঙ্গেই তিনি কথা বলছেন! একজন নবীন লেখক, এভাবে এমন পরিবেশে তার জীবনের প্রথম প্রকাশিত গ্রন্থটির দেখা পেলে কী পরিমাণ আনন্দিত হতে পারে তা অনুমান করা খুবই সহজ। মাননীয় রাষ্ট্রদূতের কাছ থেকে 'পড়া শেষে ফিরিয়ে দেয়ার শর্তে' কিতাবটি নিলাম। কিন্তু কিতাবের শুরুতে স্বয়ং আহমদ আমীনের ছোট আকারের ভূমিকাটি দেখে হতাশ হলাম। কারণ তাতে বক্তব্যের সেই জোরালো আবেদনটি অনুপস্থিত যা ডঃ আহমদ আমীনের মত বড় মাপের একজন লেখক-গবেষকের কাছ থেকে প্রত্যাশা ছিলো। গ্রন্থ ও গ্রন্থকার সম্পর্কে তাঁর মন্তব্য ছিলো খুবই সংক্ষিপ্ত।

বিষয়টি লেখকের জন্য কষ্টকর হলেও অস্বাভাবিক কিছু নয়। কোন গ্রন্থের ভূমিকা লেখার জন্য শুধু সুস্থ চিন্তা, সূক্ষ্মদর্শিতা ও বিস্তৃত অধ্যয়নই যথেষ্ট নয়; গ্রন্থের বিষয়বস্তু, আলোচনা-পর্যালোচনা ও সিদ্ধান্তের প্রতি সহমর্মিতা এবং লেখকের যে উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য, যে দাওয়াত ও বার্তা, তার প্রতি পূর্ণ আস্থা ও একাত্মতা থাকাও একান্ত জরুরী। লেখকের সঙ্গে তাকেও হতে হবে একই দাওয়াতের দা'ঈ, একই বার্তার বাহক এবং 'একই কিশতির মুসাফির'। এদিক থেকে ভূমিকা লেখকের মধ্যে যথেষ্ট ঘাটতি ছিলো। তিনি শুধু ছিলেন উচ্চস্তরের লেখক, গবেষক, চিন্তাবিদ ও সফল ইতিহাসবেত্তা। ইসলামের দ্বিতীয় উত্থান এবং বিশ্বনেতৃত্বের আসনে প্রত্যাবর্তনের বিষয়ে তিনি খুব আশাবাদী ছিলেন না। এ বিষয়টিকে তিনি বড়জোর বুদ্ধিবৃত্তিক ও ঐতিহাসিক দৃষ্টিকোণ থেকে চিন্তা করতে পারেন, কিন্তু এর প্রতি তাঁর অন্তরে আলাদা কোন মমত্ব ও উচ্ছ্বাস এবং

আবেগ ও উদ্দীপনা নেই। কিতাবটি প্রকাশে উদ্যোগী হলেও এর লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যের প্রতি তাঁর বিশেষ কোন অন্তরঙ্গতা ছিলো না। ফলে তাঁর লিখিত ভূমিকাটি ছিলো নিস্প্রাণ ও আবেদনহীন, নিছক নিয়মরক্ষা ও দায়সারা-গোছের। মিশর, সিরিয়া, ফিলিস্তীন ও হিজায, সর্বত্র এটা অনুভূত হয়েছে যে, ভূমিকাটি কিতাবের রূপ ও স্বরূপ তুলে ধরা এবং মূল্য ও মর্যাদা বৃদ্ধি করার পরিবর্তে এর মূল প্রাণ ও আবেদনকে ক্ষতিগ্রস্ত করেছে। কিন্তু তখন আর কিছুই করার ছিলো না। তবু আমি আন্তরিক কৃতজ্ঞ যে, ড: আহমদ আমীন কিতাবটি তাঁর প্রকাশনা-সংস্থা থেকে প্রকাশের ব্যবস্থা করেছেন এবং তা কল্যাণপ্রসূই হয়েছে। কেননা ঐসব মহলেও কিতাবটি সহজেই পৌঁছার সুযোগ পেয়েছে যেখানে মূল্যবান গবেষণাগ্রন্থও শুধু 'ধর্মীয়' পরিচয়ের কারণে প্রবেশাধিকার পায় না। ভালো না লাগতে পারে, কিন্তু এটাই বাস্তবতা।

১৯৫১ সালে যখন মিশর ও মধ্যপ্রাচ্যের বিভিন্ন দেশে ভ্রমণের সুযোগ হলো তখন এটা দেখে বিস্ময় যেমন হলো তেমনি আনন্দও হলো যে, সুধীসমাজ ও যুবমহলে কিতাবটি ব্যাপক সমাদর লাভ করেছে এবং অত্যন্ত মনোযোগ ও গুরুত্বের সঙ্গে পঠিত হচ্ছে। প্রকাশের দু'তিন মাসের মধ্যেই তা সমস্ত আরব দেশে পৌঁছে গেছে। আধুনিক সমাজের যারা ইসলাম সম্পর্কে দরদের সঙ্গে ভাবেন; যারা ইসলামের দ্বিতীয় উত্থান ও মুসলিম উম্মাহর নবজাগরণের মহান প্রচেষ্টায় নিবেদিত তারা কিতাবটি এমনভাবে গ্রহণ করেছেন, যা আমার প্রত্যাশা, এমনকি ধারণারও বাইরে।

ইখওয়ানের কর্মতৎপরতা তখন একটু একটু শুরু হয়েছে। দুর্যোগের মেঘও কিছুটা কেটেছে। ইমাম হাসানুল বান্নার মর্মান্তিক শাহাদাতের কারণে হৃদয়ের গভীর ক্ষত থেকে রক্তক্ষরণ হচ্ছে; এমন সময় কিতাবটি যেন তাদের জন্য ছিলো শোকের সান্ত্বনা, জখমের মলম এবং তাদের দরদে দিলের দাওয়া। তারা যে পথের পথিক কিতাবটি ছিলো সে পথেরই পাথেয়। তাদের হৃদয়ের অনুভব-অনুভূতিই যেন তাতে অনুরণিত হয়েছে। তাই কিতাবটি তারা অন্তর দিয়েই গ্রহণ করলেন। ইখওয়ানের দায়িত্বশীলরা এটিকে তাদের তালিম-তারবিয়াত ও প্রশিক্ষণ কোর্সের অন্তর্ভুক্ত করে নিলেন, এমনকি জেলখানায়ও কর্মীদের হাতে পৌঁছানোর ব্যবস্থা করলেন। শুনে ভালো লাগলো যে, আদালতের বিতর্কে ও পার্লামেন্টের বক্তৃতায়ও কিতাবের উদ্ধৃতি দেয়া হয়েছে এবং তথ্য-উপাত্ত কাজে লাগানো হয়েছে।

লেখকের জন্য এটি যেমন সৌভাগ্যের বিষয় এবং শোকর ও কৃতজ্ঞতার কারণ তেমনি তা আরবের উদারচিত্ততা, গুণগ্রাহিতা, ন্যায়পরতা ও সত্যনিষ্ঠার সুস্পষ্ট প্রমাণ। কিতাব ও তার দূরদেশের অজ্ঞাত লেখকের প্রতি আরবদেশে যে সমাদর ও সম্মান প্রদর্শন করা হয়েছে তার আশা তো নিজের দেশে আপনজনের কাছেও করা যায় না।

মিশরে আমার অবস্থানকালেই কিতাবটির দ্বিতীয় সংস্করণের সময় হয়ে গেলো, তখন আমার সুহৃদ এবং কিতাবটির 'সমঝদার' ড: মুহম্মদ ইউসুফ মুসা মরহুম (সাবেক উস্তায আলজামিউল আযহার, প্রফেস ইসলামী আইনশাস্ত্র কায়রো ইউনিভার্সিটি) এগিয়ে এলেন এবং তাঁর নিজস্ব সংস্থা جماعة الأزهر থেকে দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশের প্রস্তাব দিলেন। লেখকের ইঙ্গিতে তিনি ড: আহমদ আমীনের কাছ থেকে অনুমোদনও সংগ্রহ করলেন। ফলে আগের ভুল সংশোধনেরও সম্ভাবনা তৈরী হলো।

এখন প্রয়োজন ছিলো ভূমিকা লেখার জন্য এমন যোগ্য ও বিজ্ঞ কোন ব্যক্তিকে নির্বাচন করা যিনি কিতাবের উদ্দেশ্য ও প্রাণপ্রেরণার প্রতি পূর্ণ আস্থা ও প্রত্যয় পোষণ করেন এবং যিনি এর প্রতি পূর্ণ একাত্ম ও আত্ম-নিবেদিত, যিনি নিজেই এ দাওয়াতের 'পুরজোশ' দাঈ ও আহ্বায়ক। সৈয়দ কুতুবই ছিলেন এর জন্য সবচে' উপযুক্ত ব্যক্তি। তিনি তখন আধুনিক মিশরে ইসলামী চিন্তা ও জীবনদর্শন এবং ইসলামী দাওয়াতের পতাকাবাহী। বহুদিন থেকে তাঁর কলম নওজোয়ান ও তরুণসমাজের ইসলামী চেতনা, আত্মবিশ্বাস জাগ্রত করার প্রচেষ্টায় নিয়োজিত। তাঁর ব্যক্তিত্বে ছিলো বিদগ্ধ আলিমের বিস্তৃত অধ্যয়ন, আধুনিক সাহিত্যের শিল্প ও শৈলীসৌন্দর্য, দাঈ-এর জযবা ও ইখলাছ এবং একজন নওমুসলিমের জোশ-উদ্দীপনার অপূর্ব সমাবেশ।

হাঁ, মুসলিম পরিবারের সন্তান হলেও বিশেষ অবস্থা ও পরিস্থিতির কারণে তাঁকে নওমুসলিমই বলতে হয়। প্রচলিত শিক্ষা-দীক্ষা ও সমাজ-পরিবেশ তাঁকে ইসলাম থেকে অনেক দূরে ঠেলে দিয়েছিলো এবং তিনি ইসলাম থেকে 'বেগানা' হয়ে পড়েছিলেন। আল-কোরআনের সুগভীর ও একনিষ্ঠ অধ্যয়ন এবং পাশ্চাত্য সভ্যতার ব্যর্থতা ও দৈন্য সম্পর্কে তাঁর চাক্ষুষ জ্ঞান তাঁকে আবার ইসলামের কাছে ফিরিয়ে এনেছে। তিনি নতুন উদ্যম-উদ্দীপনা, নতুন জোর ও জোয়ার এবং আস্থা ও প্রত্যয়ের সঙ্গে ইসলামে প্রত্যাবর্তন করেছিলেন। তিনি দারুল উলুম

মিশর থেকে শিক্ষা সমাপন করেছেন এবং সাহিত্যসমালোচনার মাধ্যমে সাহিত্য-জগতে প্রবেশ করেছেন এবং খুব দ্রুত সুখ্যাতি অর্জন ও নিজস্ব অবস্থান তৈরী করেছেন النقد الأدبي (সাহিত্যসমালোচনা) التصوير الفني في القرآن (কোরআনের শিল্পচিত্র) مشاهد القيامة في القرآن (কোরআনে কেয়ামতের দৃশ্য-চিত্র) এগুলো তাঁর ঐ সময়ের সুন্দর স্মারক এবং সহিত্যিক, সমালোচক ও বোদ্ধামহলে সর্বপ্রিয় ও সফলতম গ্রন্থ।

দীর্ঘদিন শিক্ষাবিভাগে কর্মরত থাকার সুবাদে শিক্ষাবিষয়ক কতিপয় দর্শন ও চিন্তাধারা অধ্যয়নের জন্য কিছুদিন তাকে আমেরিকায় থাকতে হয়েছে। সেখানে তিনি পশ্চিমা সভ্যতা ও জীবন-দর্শনের ব্যর্থতা ও কদর্যতা নিজের চোখে দেখেছেন এবং তুলনামূলক চিন্তার মাধ্যমে ইসলামের সভ্যতা ও জীবনদর্শনের সৌন্দর্য অনুধাবন করেছেন। ফলে নতুন ঈমান ও বিশ্বাসে তিনি বলীয়ান হন এবং ইসলামের দাওয়াত ও পায়গামের প্রতি তাঁর অন্তরে নব-উদ্দীপনা সৃষ্টি হয়। আমেরিকা থেকে ফেরার পর তিনি ইসলামের জোশীলা দাঈ এবং পশ্চিমা সভ্যতার চিন্তাশীল সমালোচকরূপে আত্মপ্রকাশ করেন। আর তখন থেকে তিনি প্রত্যয়দৃপ্ত ইসলামী সাহিত্য গড়ে তোলার মহান কাজে আত্মনিয়োগ করেন। তাঁর চিন্তার বৈশিষ্ট্য এই যে, ইসলামকে তিনি একটি চিরন্তন ও বিশ্বজনীন পায়গাম মনে করেন, যে পায়গাম ছাড়া বিশ্বমানবতার মুক্তি ও নিরাপত্তা কল্পনা করা যায় না।

তাঁর লেখনীর সবচে' বড় শৈলী-বৈশিষ্ট্য হলো আত্মরক্ষামূলক অবস্থানের পরিবর্তে আক্রমণাত্মক অবস্থান গ্রহণ করা এবং পশ্চিমা সভ্যতার ভিত্তিমূলে আঘাত হানা এবং প্রতিপক্ষের উপর আগে বেড়ে জোরদার হামলা করা। তাঁর দৃষ্টিতে ইসলামে কোন দুর্বলতা বা অসম্পূর্ণতা নেই, যার জন্য কৈফিয়ত দিতে হবে। ইসলামকে তিনি বরং পরিপূর্ণ ও পূর্ণাঙ্গ জীবনবিধানরূপে পূর্ণ আস্থা ও প্রত্যয়ের সঙ্গে তুলে ধরেন। তাই তাঁর লেখা যারা পড়ে তাদের মধ্যে আস্থা ও প্রত্যয়ের এক নতুন চেতনার উন্মেষ ঘটে এবং পশ্চিমা চিন্তাব্যবস্থার প্রতি অবজ্ঞা ও ঘৃণা বদ্ধমূল হয়ে যায়। বিশেষ করে তরুণ ও যুবশ্রেণী তাঁর লেখা দ্বারা অত্যন্ত প্রভাবিত হয়। তাঁর রচিত العدالة الاجتماعية في الإسلام (কিছু কিছু ভুলবিচ্যুতি সত্ত্বেও) এই চিন্তা-পদ্ধতি ও রচনাশৈলীর সফল উদাহরণ, যা আধুনিক ইসলামী সাহিত্যে বিশেষ অবস্থান ও মর্যাদা লাভ করেছে।

সৈয়দ কুতুব এ কিতাবটি অত্যন্ত আগ্রহ ও মনোযোগের সঙ্গে অধ্যয়ন করেছেন। তাঁর তত্ত্বাবধানে অনুষ্ঠিত সাপ্তাহিক আলোচনাসভায় এর সংক্ষিপ্তসার তৈরী করা হয়েছে এবং এর উপর আলোচনা-পর্যালোচনা হয়েছে, যাতে আমারও অংশ-গ্রহণের সুযোগ হয়েছে। আমার পক্ষ হতে কিতাবটির ভূমিকা লেখার অনুরোধ তিনি সানন্দে গ্রহণ করেছেন এবং এমন সারগর্ভ ও জীবন্ত ভূমিকা লিখেছেন যে, তাতে কিতাবের সারনির্যাস ও প্রাণপ্রেরণা এসে গেছে। ভূমিকাটি এখন কিতাবের শুরুতে শোভা ও সৌন্দর্যরূপে সন্নিবেশিত হয়েছে। যথার্থভাবেই এটিকে এখন কিতাবের সার্থক 'উদ্বোধনিকা' বলা যায়।

এছাড়া, ডঃ ইউসুফ মুসা মরহূমও মহত্ত্বের প্রকাশরূপে একটি ভূমিকা বা পূর্বকথা লিখেছেন, যাতে তিনি বইটি সম্পর্কে তাঁর অন্তর-অভিব্যক্তি ও বুদ্ধিবৃত্তিক চিন্তাভাবনা প্রকাশ করেছেন।

এর মধ্যে ঘটেছে অভিনব একটি ঘটনা। আমার বন্ধু ডঃ আহমদ শিরবাছী (আল আযহারের প্রাজ্ঞ আলিম ও শিক্ষক) এক সাক্ষাতে বিভিন্ন কথার ফাঁকে আমার পরিবার, পরিবেশ, প্রতিপালন, শিক্ষা-দীক্ষা ও জীবন সম্পর্কে কিছু তথ্য কিভাবে যেন 'হাতিয়ে' নেন। আমি তেমন কিছু ভাবিনি; আর কল্পনায়ও আসেনি যে, এগুলো দিয়ে তিনি আমার পরিচিতিমূলক কোন 'রেখা-চিত্র' তৈরী করবেন। সত্য কথা এই যে, কিতাবের দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হওয়ার পরই শুধু তা আমার নযরে এসেছে। এটি তাঁর মুহব্বাতের নিজস্ব প্রকাশ। তবে উর্দূ অনুবাদে এ লেখাদু'টি সংযুক্ত না করাই আমার কাছে ভালো মনে হয়েছে।

সবশেষে একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন, এ কিতাব মুসলিম বিশ্বের আলিম, বুদ্ধিজীবী, গবেষক, যুবসমাজ, ইসলামী আন্দোলনের নিবেদিতপ্রাণ কর্মীবৃন্দ, সর্বমহলে কীভাবে এতটা পাঠকপ্রিয়তা অর্জন করলো এবং এরূপ অভাবনীয় আলোড়ন সৃষ্টি করলো? বিভিন্ন উপলক্ষে আমাকেও এ প্রশ্ন করা হয়।

১৯৮৭ সনের মার্চ মাসে জিদ্দা মালিক আব্দুল আযীয বিশ্ববিদ্যালয়ে একটি আলোচনাসভা অনুষ্ঠিত হয়, যাতে ছাত্র-শিক্ষকসহ বহু জ্ঞানী-গুণী ও সুধী-বুদ্ধিজীবী অংশগ্রহণ করেন। বিষয়বস্তু ছিলো ماذا خسر العالم بانحطاط المسلمين؟ কিতাবটির দাওয়াতি অবদান ও তাৎপর্য। অনেকেই মূল্যবান বক্তব্য রেখেছেন। সেখানেও আমাকে এ প্রশ্ন করা হয়েছে। তখন উত্তরে যা বলেছিলাম সংক্ষেপে সেটাই এখানে তুলে ধরছি।

'এ প্রশ্নের উত্তরে সর্বপ্রথম যা বলতে চাই তা এই যে, শুরু থেকে শেষ এটা শুধু এবং শুধু আল্লাহ তা'আলার অশেষ দয়া ও অনুগ্রহের প্রকাশ। তিনি যখন দয়া করেন, কবুল করেন এবং মাকবুল করেন তখন বান্দার যোগ্যতা ও কাজের সৌন্দর্য দেখেন না। সাধারণ থেকে সাধারণ মানুষ দ্বারাও তিনি কাজ নেন এবং তুচ্ছ থেকে তুচ্ছ কাজকে উম্মতের জন্য কল্যাণকর করে দেন। এ কিতাবটির ক্ষেত্রে নিঃসন্দেহে এটাই ঘটেছে।

বাহ্যিক কোন কারণ যদি নির্দেশ করতে হয় তাহলে বলবো, এখানে আমার নতুন গবেষণা বা নব-আবিষ্কার বলে কিছু নেই। তবে বিষয়বস্তুটি ছিলো সম্পূর্ণ নতুন ও অভিনব।

'মুসলিম উম্মাহর পতনে বিশ্বের কী ক্ষতি হলো?' আসলেই কি মানবজাতির ভাগ্য ও পরিণতি এবং বিশ্বের পরিস্থিতি ও ঘটনাপ্রবাহের সঙ্গে মুসলিম উম্মাহর নিবিড় কোন সম্পর্ক রয়েছে, যার ভিত্তিতে প্রশ্ন করা যায়, উম্মাহর পতনের বিশ্বের কী ক্ষতি হলো? অথবা উম্মাহর নব-উত্থানে এবং মানবতার নেতৃত্বভার গ্রহণে বিশ্বের কী কল্যাণ হবে? মুসলিম জাতি কি এমন কোন অবস্থানে আছে যে, তাদের পতন ও অধঃপতনের কারণে এত শত জাতি ও সভ্যতার পৃথিবী ক্ষতিগ্রস্ত হবে?!!

এর আগে এ আঙ্গিকে মানুষ কখনো চিন্তাই করেনি। বিশিষ্ট-সাধারণ সবাই একটিমাত্র চিন্তাধারায় অভ্যস্ত হয়ে পড়েছিলো, আর তা হলো বিশ্বইতিহাসের বাতায়নপথে মুসলিম উম্মাহকে অবলোকন করা এবং বহু জাতি ও জনগোষ্ঠীর মধ্যে উম্মাহকেও একটি সাধারণ জাতি ও জনগোষ্ঠীরূপে চিন্তা করা। কিন্তু এ কিতাবের লেখক সাহসী পদক্ষেপ গ্রহণ করে পূর্ব-অঙ্কিত সীমারেখা অতিক্রম করেছেন এবং ঐ প্রথাগত বৃত্ত থেকে বের হয়ে এসেছেন যা আরব-অনারব লেখক, গবেষক ও বুদ্ধিজীবীসমাজের উপর আরোপ করা হয়েছে, আর তারা বিনাবাক্য-ব্যয়ে তা মেনেও চলেছেন।

লেখক সম্পূর্ণ বিপরীত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছেন যে, বিশ্বকে তিনি মুসলিম উম্মাহর দর্পণে অবলোকন করবেন। বলা-বাহুল্য যে, উভয় দৃষ্টিকোণের মধ্যে রয়েছে আকাশ-পাতাল পার্থক্য। একটি হলো, বিশ্ব-ইতিহাসের যা কিছু উত্থান-পতন, চলমান ঘটনাপ্রবাহ এবং বিশ্বের যা কিছু ভবিষ্যত সম্ভাবনা, এর আলোকে মুসলিম উম্মাহকে অবলোকন করা। মুসলিম উম্মাহ যেন সাধারণ কোন

জনগোষ্ঠী, যাদের ভাগ্য নির্ধারিত হয়, বৃহৎ পরিসরে পৃথিবীতে যা কিছু ঘটে তা দ্বারা। সুতরাং চিন্তা-গবেষণা ও আলোচনা-পর্যালোচনার এপর্যন্ত এটাই ছিলো সাধারণ ধারা যে, অমুক ঘটনায়, অমুক রাজ্যের পতনে মুসলিম জাতি কতটা ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে? পাশ্চাত্যের নবজাগরণ ও শিল্পবিপ্লব মুসলিম জাতির উপর কী প্রভাব ফেলেছে? উছমানি খেলাফতের বিলুপ্তিতে মুসলিম জাতি কী বিপর্যয়ের মুখে পড়েছে? বিভিন্ন মুসলিম জনপদে পাশ্চাত্যের আগ্রাসন ও দখলদারিত্বের কারণে মুসলিম জাতি বর্তমানে কী কী পরিস্থিতির সম্মুখীন হচ্ছে? অর্থনৈতিক দুর্বলতা, রাজনৈতিক দৈন্য ও সমর-শক্তিতে পিছিয়ে পড়ার কারণে মুসলিম জাতির আরো কী ভাগ্যবিপর্যয় ঘটতে পারে?

এটাই ছিলো তখনকার গণ্ডীবদ্ধ ও প্রথাগত চিন্তাধারা, যাতে মানুষ সম্পূর্ণ অভ্যস্ত হয়ে পড়েছিলো। কিন্তু আল্লাহ তা'আলা আমার বক্ষ উন্মোচিত করলেন এবং অন্তরে এ চিন্তা প্রক্ষেপণ করলেন যে, বিষয়টিকে আমি নতুন চেতনা ও নতুন দৃষ্টিকোণ থেকে দেখবো। অর্থাৎ বিশ্বের দর্পণে মুসলিম উম্মাহকে নয়, বরং উম্মাহর দর্পণে বিশ্বকে দেখবো, যেন মুসলিম উম্মাহই হচ্ছে প্রধান ও কেন্দ্রীয় প্রভাবক। নির্দিষ্ট কোন ভৌগোলিক সীমানায়, কিংবা বিশেষ কোন রাজনৈতিক অঞ্চলে নয়, বরং সমগ্র বিশ্বের ঘটনাপ্রবাহের উপর রয়েছে মুসলিম উম্মাহর মৌলিক প্রভাব।

আমার আশঙ্কা, বহু ইসলামী লেখক, চিন্তাবিদ ও গবেষক, বিভিন্ন ক্ষেত্রে যাদের রয়েছে অবিস্মরণীয় কীর্তি ও অবদান, তারা কেউ এভাবে বিষয়টি চিন্তা করেননি। কারণও ছিলো; যে জঘন্যভাবে ইসলামী ইতিহাসের বিকৃতি সাধন করা হয়েছে এবং আধুনিক শিক্ষায় শিক্ষিত নতুন প্রজন্ম যে মর্মান্তিক হীনমন্যতা ও দৃষ্টিসঙ্কীর্ণতার শিকার হয়ে পড়েছে, তাতে মুসলিম উম্মাহর সঙ্কট-সমস্যাকে বিশ্বের সমস্যা ও মানবজাতির সঙ্কট বলে ভাবতে বহু লেখক-গবেষকই বিব্রত বোধ করেন।

কোথায় মুসলিম উম্মাহ, আর কোথায় বিশ্বনেতৃত্ব?! কী আছে এখন মুসলিম উম্মাহর কাছে? দরিদ্র, দুর্বল, পশ্চাদপদ, পরাধীন এবং যুগের দুর্যোগ ও বিপ্লব-প্রতিবিপ্লবের সামনে অসহায় এক জাতি! সুতরাং কীভাবে যুক্তিগ্রাহ্য হতে পারে বিশ্ব ও বিশ্বমানবতার ভাগ্য-পরিণতিকে মুসলিম উম্মাহর ভাগ্য-পরিণতির সঙ্গে যুক্ত করা?! কিছুতেই না। বরং বহু মানুষ তো একথাই বিশ্বাস করতে প্রস্তুত ছিলো না যে, মুসলিম জাতির এমন কোন অবস্থা ও অবস্থান রয়েছে, যাতে তারা

এধরণের আলোচনায় উঠে আসতে পারে এবং এর উপর কোন কিতাব লেখা যেতে পারে যে, তাদের পতনের কারণে সমকালীন বিশ্ব ও মানবজাতি কোন প্রকার ক্ষতির সম্মুখীন হবে। বিষয়টি আসলেই ছিলো খুব নাযুক ও গুরুতর। এ বিষয়ে আলোচনায় অবতীর্ণ হওয়া ছিলো রীতিমত এক দুঃসাহসিক বুদ্ধিবৃত্তিক অভিযান। কিন্তু গায়ব থেকে আল্লাহ্ তা'আলা সাহায্য করেছেন বলেই তা সম্ভব হয়েছে। এ কিতাবের গ্রহণযোগ্যতা ও জনপ্রিয়তার এটাই রহস্য যে, তাতে মুসলিম উম্মাহকে এমন উচ্চ অবস্থান থেকে দেখা হয়েছে যেখান থেকে সে ইতিহাসের গতিধারা পরিবর্তন করতে পারে এবং পারে মানবজাতির ভাগ্য-নিয়ন্ত্রণ করতে।

আলহামদু লিল্লাহ্ নিজের সম্পর্কে আমি কোন ভুল ধারণায় লিপ্ত নই। নিজের জ্ঞানের দৈন্য, সাংস্কৃতিক ও বুদ্ধিবৃত্তিক পুঁজির স্বল্পতা সম্পর্কে আমার পরিষ্কার ধারণা রয়েছে। সুতরাং এ কিতাবে বুদ্ধিবৃত্তিক নতুন কোন আবিষ্কার, নতুন গবেষণা, নতুন উদ্ঘাটন ও ইজতিহাদ, এজাতীয় কোন দাবী আমার নেই। এখানে পূর্ণ সততার সঙ্গে শুধু একটি ঐতিহাসিক পর্যালোচনা উপস্থাপন করা হয়েছে। চিন্তার জগতে স্বাভাবিক একটি প্রশ্ন ছিলো, যার যৌক্তিক ও বুদ্ধিবৃত্তিক উত্তর এখানে আন্তরিকতার সঙ্গে সন্ধান করা হয়েছে। শুধু এইটুকু, এর বেশী কিছু নয়।

হয়ত এ প্রশ্ন আরো অনেকের চিন্তায় এসেছে এবং বিভিন্ন উপায়ে এর সমাধানও উপস্থাপন করা হয়েছে। হয়ত প্রত্যেকের চিন্তার পথ ও পন্থা ভিন্ন এবং সমাধানও ভিন্ন, তবে আন্তরিকতা ও ঐকান্তিকতা অভিন্ন। এটা হতে পারে এবং হওয়াটাই স্বাভাবিক। তবে প্রশ্নটিকে আমি আলোচনা-পর্যালোচনা ও অনুসন্ধান-গবেষণার অঙ্গনে নিয়ে এসেছি এবং স্বতন্ত্র বিষয়রূপে এর উপর ঐতিহাসিক উপকরণ ও তথ্য-উপাত্ত একত্র করে দিয়েছি। এর দ্বারা যদি কোন হৃদয়ে নতুন ঈমানী চেতনা জাগ্রত হয় এবং কোন বিবেকে কিছুটা দহন-যন্ত্রণা সৃষ্টি হয় আর নিজ নিজ সাধ্যের পরিধিতে কর্মসচেতন হয় তাহলেই ভাববো, লেখক হিসাবে আমার উদ্দেশ্য সফল।

কল্যাণপ্রসূ যে কোন বিপ্লব এবং সৎ, সুন্দর ও আদর্শ সমাজ গঠনের জন্য বিবেক ও চেতনার জাগৃতি এবং মানসিক ও বুদ্ধিবৃত্তিক প্রস্তুতি অপরিহার্য। আর এজন্য চাই ইতিহাসের বস্তুনিষ্ঠ ও উদ্দেশ্যমুখী নতুন বিন্যাস এবং চাই এমন সব গবেষণা-গ্রন্থ যা একদিকে বুদ্ধিবৃত্তিক আশ্বস্তি ও চিত্ত-প্রশান্তি সৃষ্টি করবে;

অন্যদিকে নতুন বিশ্বাস ও প্রত্যয়, নতুন বল ও মনোবল এবং নতুন কর্ম-উদ্দীপনা সৃষ্টি করবে। অতিকথন ও অতিবিনয়, দু'টো থেকেই মুক্ত হয়ে একথা বলার সাহস করছি যে, বিষয়বস্তু ও তথ্য-উপাত্তের দিক থেকে কিতাবটি এক্ষেত্রে অত্যন্ত উপকারী ও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারে। ইসলামী দাওয়াত ও ইসলামী চিন্তার সর্বমহল তা দ্বারা উপকার লাভ করতে পারে।

وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت وإليه أنيب

আবুল হাসান আলী
নদওয়াতুল উলামা, লৌখনো, ভারত
২০শে রজব, ১৪০১ হি.
২৪শে মে ১৯৮১ খৃ.

ভূমিকা

(স্বনামধন্য ইসলামী লেখক, চিন্তাবিদ, মহান দাঈ ইলাল্লাহ এবং ফাঁসির মঞ্চে শাহাদাতবরণকারী সৈয়দ কুতুব রহ. লিখিত)

মুসলিম উম্মাহর আজ এমন যোগ্য মানুষের কত না প্রয়োজন, যিনি গৌরবময় অতীতের প্রতি তাদের আত্মবিশ্বাস ফিরিয়ে আনবেন এবং সম্ভাবনাময় ভবিষ্যত সম্পর্কে তাদের উজ্জীবিত করে তোলবেন। (অবিচল বিশ্বাস ও আত্মপ্রত্যয় নিয়ে উম্মাহকে যিনি বলতে পারবেন, তোমাদের সুন্দর অতীত ছিলো এবং তোমাদের সুন্দর ভবিষ্যত রয়েছে।)

এমন মানুষের আজ সত্যি বড় প্রয়োজন, যিনি দ্বীনের প্রতি তাদের ঈমান ও বিশ্বাসকে নতুন শক্তি ও সজীবতা দান করবেন, যারা দ্বীনের নাম তো ধারণ করে, কিন্তু হাকীকত ও মর্ম অনুধাবন করে না, যারা নিছক রক্ত-সূত্রে 'মুসলিম' পরিচয় তো বহন করে, কিন্তু পরিচয়-মর্যাদা উপলব্ধি করে না।

ماذا خسر العالم কিতাবটি উম্মাহর সে প্রয়োজন পূরণেরই একটি সার্থক প্রচেষ্টা। এ বিষয়ে আধুনিক ও প্রাচীন যা কিছু আমি পড়েছি তার মধ্যে নিঃসন্দেহে এটি অন্যতম সেরা গ্রন্থ।

(ইসলামে দুর্বলতা ও হীনমন্যতার কোন অবকাশ নেই) ইসলাম হচ্ছে শ্রেষ্ঠত্ব-বোধের আকীদা, বিশ্বাস ও প্রত্যয়, যার বড় বৈশিষ্ট্য এই যে, মুমিনের অন্তরে তা মর্যাদাবোধ সঞ্চারিত করে, তবে অহঙ্কার ছাড়া এবং আত্মবিশ্বাস সৃষ্টি করে, তবে আত্মপ্রতারণা ছাড়া এবং স্বস্তির অনুভূতি জাগ্রত করে, তবে দায়িত্বহীনতার মানসিকতা ছাড়া। এ বিশ্বাস তাদের মধ্যে এ চেতনা সৃষ্টি করে যে, তাদের কাঁধে অর্পিত হয়েছে বিশ্বমানবতার দায়িত্বভার; পূর্ব-পশ্চিম, পৃথিবীর সব জনপদের সমগ্র মানব সম্প্রদায়ের অভিভাবকের দায়িত্বভার। উম্মাহ হিসাবে তাদের কর্তব্য

হলো পথহারা মানব-কাফেলাকে সিরাতুল মুস্তাকীমের দিকে পথপ্রদর্শন করা এবং 'সর্ব-অন্ধকার' থেকে উদ্ধার করে সেই আলো ও নূরের দিকে নিয়ে আসা, যা আল্লাহ তাদের দান করেছেন হিদায়াতের কিতাব আল কোরআনরূপে–

كُنتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ

তোমরা শ্রেষ্ঠ উম্মত যাদের উত্থিত করা হয়েছে মানুষের (কল্যাণের) জন্য। তোমরা সৎ কাজের আদেশ করো এবং মন্দ কাজ হতে নিষেধ করো, আর আল্লাহর প্রতি ঈমান রাখো। (আলে ইমরান, ৩ : ১০৯)

وَكَذَٰلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِّتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا

আর এভাবেই আমি তোমাদের বানিয়েছি এক মধ্যপন্থী সম্প্রদায়, যাতে তোমরা সাক্ষী থাকো লোকেদের উপর, আর রাসূল সাক্ষী থাকেন তোমাদের উপর। (বাকারাহ, ২ : ১৪৩)

আমার সামনে এই যে কিতাবটি, পাঠকের অন্তরে তা এ সকল অনুভব অনুভূতিই জাগিয়ে তোলে এবং এ সকল চিন্তা-চেতনাই প্রবাহিত করে। তবে কিতাবের বর্ণনাশৈলী ও উপস্থাপন-পদ্ধতি এমন নয় যে, শুধু ভাবাবেগ উসকে দিলো, কিংবা ধর্মীয় উন্মাদনা সৃষ্টি করলো; বরং প্রতিটি বক্তব্যের স্বপক্ষে তিনি বস্তুনিষ্ঠ তথ্য-প্রমাণ ব্যবহার করেছেন, যা যুগপৎ চিন্তা, বুদ্ধিবৃত্তি ও আবেগ-অনুভূতিকে সম্বোধন করে। সমস্ত ঐতিহাসিক ঘটনা এবং সে যুগের পরিবেশ-পরিস্থিতি তিনি অত্যন্ত ন্যায়ানুগ ও যুক্তিনিষ্ঠরূপে উপস্থাপন করেছেন। তদুপরি যে বিষয়ই আলোচনায় এসেছে সেক্ষেত্রে সিদ্ধান্ত গ্রহণের ভার সত্য ও বাস্তবতা এবং যুক্তি ও বিবেকের হাতে ছেড়ে দেয়া হয়েছে, যার ফলে সমস্ত আলোচনা-পর্যালোচনা, যুক্তি ও তথ্যপ্রমাণ যেন সারিবদ্ধ ও সুশৃঙ্খলভাবে তাঁর দাবীর অনুকূলে এসে দাঁড়িয়েছে। কোন ক্ষেত্রেই যুক্তি-প্রয়োগ ও সিদ্ধান্ত আহরণের ক্ষেত্রে অজ্ঞতা ও কৃত্রিমতার সামান্যতম ছাপও পড়েনি। আমার দৃষ্টিতে এটাই হচ্ছে এ কিতাবের প্রধান বৈশিষ্ট্য।

ইসলামের আলো উদিত হওয়ার পূর্বে পৃথিবীর কী অবস্থা ছিলো? পূর্ব-পশ্চিম, উত্তর-দক্ষিণ, প্রতিটি জনপদে কী পরিবেশ-পরিস্থিতি বিদ্যমান ছিলো? চীন, আরব ও হিন্দুস্তান থেকে শুরু করে রোম ও পারস্য পর্যন্ত বিস্তৃত সমকালীন পৃথিবীর চিন্তানৈতিক ও বুদ্ধিবৃত্তিক রূপ ও প্রকৃতি কেমন ছিলো? তখন সমাজ, সভ্যতা ও সংস্কৃতির ঝোঁক ও প্রবণতা এবং অভিমুখ ও গতিধারা কোন দিকে ছিলো? যে সমস্ত সম্প্রদায়ের উপর আসমানি ধর্মের ছায়া ছিলো, যেমন ইহুদি-ধর্ম ও খৃস্ট-ধর্ম, কিংবা যারা মূর্তিপূজা-ধর্মের অনুসারী ছিলো, যেমন হিন্দুধর্ম, বৌদ্ধধর্ম ও জরথোস্ত্রীয় ধর্ম, তাদের জীবন ও নীতি-নৈতিকতার কী অবস্থা ছিলো? কিতাবের প্রারম্ভ-অংশে এসব প্রশ্নের সংক্ষিপ্ত, তবে স্বচ্ছ ও পূর্ণাঙ্গ একটি চিত্র তুলে ধরা হয়েছে।

বস্তুত এটি অতি সর্বাঙ্গিণ ও সুসম্পূর্ণ একটি 'জীবনচিত্র' যা মানবভূখণ্ডের সঠিক রেখা ও রূপরেখা ফুটিয়ে তোলে। কিন্তু এ বিষয়ে লেখক এখানে কোন প্রকার হঠকারিতা প্রকাশ করেননি বা পূর্ব-নির্ধারিত কোন সিদ্ধান্ত স্বেচ্ছাচারিতার সঙ্গে চাপিয়ে দেয়ার চেষ্টা করেননি, বরং সম্পূর্ণ পর্যালোচনায় আধুনিক ও প্রাচীন অমুসলিম লেখক, গবেষক ও ঐতিহাসিকদেরও শরীক রেখেছেন। অথচ এটাই খুব স্বাভাবিক যে, ইসলামের বিষয়ে তারা উদ্দেশ্য-তাড়িত হবে এবং মুসলিম উম্মাহর অতীতের নেতৃত্বকালকে কলঙ্কিত করার কিছু না কিছু চেষ্টা করবে। বলাবাহুল্য, সে চেষ্টা তারা করেছেও যথেষ্ট।

লেখক ঐ সময়ের পৃথিবীর চিত্র উপস্থাপন করেছেন যখন জাহেলিয়াতের চিন্তা চেতনারই একক আধিপত্য ছিলো। বিবেক-বুদ্ধি, হৃদয় ও আত্মা, এককথায় সর্ব -মানবসত্তায় পচন ধরে গিয়েছিলো। সত্য-মিথ্যা, ভালো-মন্দ, ন্যায়-অন্যায় সবকিছুর মাপকাঠি এবং যাবতীয় মূল্যবোধ নষ্ট হয়ে গিয়েছিলো। মানুষ ছিলো দাসত্বের শৃঙ্খলে বন্দী এবং যুলুম-অনাচার ও শোষণ-নিপীড়নের অসহায় শিকার। মানবতার বুনিয়াদ ধ্বসে পড়েছিলো, একদিকে পাপাচারপূর্ণ বিলাস-প্রাচুর্য, অন্যদিকে সীমাহীন বঞ্চনা ও দুর্দশার কারণে। তদুপরি সমগ্র মানব-জাতির উপর কুফুর ও গোমরাহীর অন্ধকার ছেয়ে গিয়েছিলো। যদিও তখনো আসমানি ধর্ম ছিলো, কিন্তু তা বিকৃতির শিকার হয়ে পড়েছিলো এবং তাতে ঘুণ ধরে গিয়েছিলো। মানুষের চিন্তা-চেতনা ও জীবনাচরণের উপর তার কোন নিয়ন্ত্রণ ছিলো না। ধর্মগুলোর বাহ্যিক কাঠামোই শুধু রয়ে গিয়েছিলো, যাতে না ছিলো রূহ, না ছিলো প্রাণ। বিশেষ করে খৃস্টধর্মের অবস্থা ছিলো আরো

শোচনীয়, যার নিখুঁত চিত্র এঁকেছেন জি, এইচ, ডেন্সন তার emotioons as the basis of civilization গ্রন্থে।

তিনি বলেন, 'পঞ্চম ও ষষ্ঠ শতকে সভ্য পৃথিবী নৈরাজ্যের ধ্বংস-গহ্বরের মুখে দাঁড়িয়েছিলো। কেননা যে সকল ধর্মবিশ্বাস সভ্যতার বিনির্মাণে সহায়ক হয় সেগুলোই বিপর্যস্ত হয়ে পড়েছিলো। সেখানে উল্লেখযোগ্য এমন কিছু ছিলো না, যা সেগুলোর স্থান গ্রহণ করতে পারে। তখন মনে হচ্ছিলো, যে সভ্যতা গড়ে তুলতে চারহাজার বছরের প্রয়াস-প্রচেষ্টা ব্যয় হয়েছিলো তা ছিন্নভিন্ন হওয়ার উপক্রম হয়েছে এবং মানবজাতি আবার অসভ্যতা ও বর্বরতার পূর্ববর্তী স্থানে ফিরে যাচ্ছে। কেননা গোত্র ও সম্প্রদায়গুলো পরস্পর সঙ্ঘাত-সঙ্ঘর্ষে লিপ্ত হয়ে পড়েছিলো। আইন-শৃঙ্খলা বলতে কিছু ছিলো না।

পক্ষান্তরে খৃস্টধর্ম যেসব ব্যবস্থা গড়ে তুলেছিলো তা ঐক্য ও শৃঙ্খলার পরিবর্তে বিভেদ ও বিপর্যয় সৃষ্টির পক্ষেই কাজ করছিলো। সভ্যতা যেন ছিলো ডালপালা ছড়ানো এক বিরাট বৃক্ষ, যার ছায়া সারা বিশ্বে বিস্তৃত ছিলো, তবে তা দাঁড়িয়ে থাকলেও পতনোম্মুখ অবস্থায় ছিলো এবং বিনষ্টি তার মর্মমূলে পৌঁছে গিয়েছিলো। এই ব্যাপক ফাসাদ ও বিপর্যয়ের মধ্যেই সেই মানুষটি জন্মগ্রহণ করলেন যিনি সমগ্র বিশ্বকে ঐক্যবদ্ধ করেছিলেন।'[১]

জাহেলিয়াতের অন্ধকারে আচ্ছন্ন পৃথিবীর চিত্র উপস্থাপনের পর লেখক মানবজাতির জীবনে ইসলামের ভূমিকা ও অবদানের আলোচনা শুরু করেছেন এবং দেখিয়েছেন, কীভাবে ইসলাম মানবজাতিকে যাবতীয় কুসংস্কার থেকে মুক্তি দান করেছে এবং দাসত্বের লাঞ্ছনা থেকে উদ্ধার করেছে; কীভাবে হৃদয় ও আত্মাকে সব ব্যাধি ও অবক্ষয় এবং কদর্যতা ও পঙ্কিলতা থেকে পবিত্র করেছে। সর্বোপরি মানবসমাজকে যুলুম, শোষণ, নিপীড়ন, শ্রেণীবৈষম্য ও শাসকদের স্বেচ্ছাচার থেকে এবং পুরোহীতদের ধর্মীয় স্বৈরাচার থেকে রক্ষা করেছে।

ইসলাম আত্মিক পবিত্রতা, নৈতিক শুচিতা, ইতিবাচক ব্যক্তিত্বগঠন, স্বাধীনতা ও নবশক্তির উত্থানের মযবুত বুনিয়াদের উপর এবং বিশ্বাস, আস্থাবোধ, পরিজ্ঞান, সুবিচার ও আত্মমর্যাদার সুদৃঢ় ভিত্তির উপর পৃথিবীর নতুন পরিচয় সৃষ্টি করেছে। জীবনকে উন্নতি ও অগ্রগতির পথে নিয়ে যাওয়ার জন্য অব্যাহত কর্মপ্রচেষ্টা ও

[১] 'লেখক আখেরি নবী ও বিশ্ব নবী মুহম্মদ ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কথা বলছেন।

নিরবচ্ছিন্ন সাধনার উপর উদ্বুদ্ধ করেছে। জীবনের অঙ্গনে প্রত্যেককে তার প্রাপ্য স্থান ও যথাযথ অধিকার দান করেছে।

এসব অবিস্মরণীয় কীর্তি ও কর্ম ইসলাম সম্পন্ন করেছে যখন এবং যেখানে নেতৃত্ব, কর্তৃত্ব ও কার্যক্ষমতা ছিলো ইসলামের হাতে। আর নেতৃত্ব ও কর্তৃত্বের আসন থেকেই শুধু ইসলাম তার যোগ্য ভূমিকা পালন করতে পারে। কারণ স্বভাবগতভাবেই ইসলাম শ্রেষ্ঠত্বের বিশ্বাস পোষণ করে এবং নেতৃত্বের সুনির্দিষ্ট ও সুশৃঙ্খল ব্যবস্থা ধারণ করে। সৃজনশীলতা ও স্বকীয়তাই হচ্ছে ইসলামের প্রকৃতি; অধীনতা ও অনুসরণ নয়।

এরপর এলো সেই সময় যখন মুসলিম জাতি অবক্ষয় ও অধঃপতনের শিকার হলো এবং বিশ্বনেতৃত্বের যে দায়িত্ব ইসলাম তাদের উপর অর্পণ করেছিলো তা থেকে তারা সরে গেলো; এমনকি মানবতার অভিভাবকত্ব এবং ঐসব দায়-দায়িত্ব থেকেও তারা হাত গুটিয়ে নিলো, জীবনের প্রতিটি গতিপথে যা তাদের পালন করার কথা ছিলো। এর ফলে জীবন ও জগতের উপর নিয়ন্ত্রণ ইসলামের হাতছাড়া হয়ে গেলো।

এখানে লেখক এই আত্মিক ও জাগতিক অবক্ষয়ের বিভিন্ন কারণ পর্যালোচনা করেছেন এবং দ্বীন থেকে বিচ্যুতি ও দায়-দায়িত্ব থেকে নিবৃত্তির কারণে স্বয়ং মুসলিমজাতি যে দুর্দশা ও দুর্যোগের সম্মুখীন হয়েছে তা বিস্তারিত বর্ণনা করেছেন। তারপর মানবজাতি এই কল্যাণ-নেতৃত্ব থেকে বঞ্চিত হওয়ার এবং জাহেলিয়াতের দিকে ফিরে যাওয়ার কারণে সমগ্র বিশ্বের উপর যে মহাদুর্যোগ নেমে এসেছে তারও বিশদ বিবরণ দিয়েছেন। লেখক মানবতার ভয়াবহ অধ:পতনের যে রেখাচিত্র এঁকেছেন তা এমন সময় ঘটেছে যখন জ্ঞান-বিজ্ঞান, শিল্প-সাহিত্য, প্রযুক্তি ও বুদ্ধিবৃত্তির বিস্ময়কর সকল দিগন্ত উন্মোচিত হচ্ছিলো এবং মানবসভ্যতা বস্তুজগতে বিরাট অগ্রগতি অর্জন করেছিলো। এ রেখাচিত্র তিনি এঁকেছেন গভীর চিন্তা ও অনুসন্ধিৎসার মাধ্যমে; উচ্ছ্বসিত আবেগ ও জ্বালাময়ী ভাষা ব্যবহারের মাধ্যমে নয়। কেননা লেখক যে সকল সত্য ও তথ্য এবং বাস্তব প্রমাণ পেশ করেছেন তা কোন প্রকার অতিকথন ও অতিরঞ্জনের মুখাপেক্ষী ছিলো না।

এসমস্ত ঐতিহাসিক পর্যালোচনার আলোকে পাঠক অবশ্যই উপলব্ধি করবেন যে, মানবতার অস্তিত্বরক্ষার জন্যই আজ বিশ্বনেতৃত্বে পরিবর্তনের কত প্রয়োজন এবং কত প্রয়োজন ঐ সত্যের দিকে প্রত্যাবর্তনের যার অবির্ভাব ঘটেছে মানুষকে সর্ব-

অন্ধকার থেকে আলোর দিকে এবং জাহেলিয়াত থেকে জ্ঞান ও অন্তর্জ্ঞানের দিকে বের করে আনার জন্য। পাঠক আরো উপলব্ধি করবেন যে, পৃথিবীতে এ কল্যাণ-নেতৃত্ব বিদ্যমান থাকা কত অপরিহার্য এবং এর অনুপস্থিতির কারণে শুধু মুসলিমজাতি নয়, বরং সমগ্র মানবজাতি কী ভয়াবহ ক্ষতির সম্মুখীন হয়েছে। বস্তুত এ ক্ষতির পরিধি এত ব্যাপক ও বিস্তৃত যে, তা অতীত, বর্তমান এবং নিকট ও দূর ভবিষ্যত সবকিছুকেই বেষ্টন করে আছে।

এ কিতাবের মাধ্যমে একই সঙ্গে মুসলিম হৃদয়ে লজ্জা ও অনুতাপের অনুভূতি জাগে যে, কী অমার্জনীয় অপরাধ সে করেছে; আবার মর্যাদার চেতনাও সৃষ্টি হয় যে, কী বিপুল যোগ্যতা তাকে দান করা হয়েছে; এমনকি সেই নেতৃত্ব পুন:-অর্জনের প্রেরণাও তার মধ্যে সঞ্চারিত হয়, যা সে গাফলতে অবহেলায় হাতছাড়া করেছে।

একটি প্রশংসনীয় দিক এই যে, মুসলিমজাতির নেতৃত্বদানের অক্ষমতার কারণে মানবজাতি যে মহাদুর্যোগ ও অধ:পতনের শিকার হয়েছে, লেখক সেটিকে সব-সময় 'জাহেলিয়াত' বলে আখ্যায়িত করেছেন। এ সুচিন্তিত শব্দব্যবহার একথার সুস্পষ্ট প্রমাণ যে, ইসলামের মূলপ্রাণ এবং অতীত ও বর্তমান জাহেলিয়াতের মূলপ্রাণের মধ্যকার পার্থক্যটি লেখক যথার্থ উপলব্ধি করেন। বস্তুত আবরণে যত ভিন্নতাই থাক, স্বভাব, চরিত্র ও প্রকৃতির দিক থেকে প্রাচীন জাহেলিয়াত, যা ইসলামের পূর্বে পৃথিবীতে আধিপত্য বিস্তার করেছিলো এবং আধুনিক জাহেলিয়াত, যা নেতৃত্বের আসন থেকে ইসলামের অপসরণের পর আজ পৃথিবীর উপর আধিপত্য বিস্তার করে আছে, দু'টোই সম্পূর্ণ অভিন্ন। বস্তুত জাহেলিয়াত নির্দিষ্ট কোন সময়, বা স্থানের গণ্ডীতে আবদ্ধ নয়, বরং জাহেলিয়াত হচ্ছে হৃদয়, আত্মা, চিন্তা, বুদ্ধি ও জীবনের একটা বিশেষ রূপ ও প্রকৃতি, যা তখনই মাথাচাড়া দিয়ে ওঠে যখন মানবজীবনের জন্য আল্লাহর পক্ষ হতে নির্ধারিত মৌলিক মূল্যবোধগুলোর পতন ঘটে এবং ঐসব কৃত্রিম মূল্যবোধ তার স্থলবর্তী হয় যার ভিত্তি হচ্ছে ভোগবাদ ও বস্তুবাদ, যার যন্ত্রণা মানবজাতি আজ তার চরম উন্নতির যুগেও ভোগ করছে, যেমন ভোগ করেছে বর্বরতার প্রথম যুগে। বিজ্ঞ লেখক কিতাবের শেষ অধ্যায়ে লিখেছেন–

'চৌদ্দশ বছর আগের মত আজো বিশ্বমানবতার উদ্দেশ্যে ইসলামী উম্মাহর একই দাওয়াত, একই পায়গাম, অর্থাৎ– 'হে মানুষ, এক আল্লাহকে বিশ্বাস করো। আল্লাহর রাসূলকে বিশ্বাস করো, এক আল্লাহর ইবাদত করো। আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের আনুগত্য করো। আখেরাত ও বিচারদিবসে বিশ্বাস করো।'

এই দাওয়াত ও পায়গাম কবুল করার পুরস্কার কী? পুরস্কার এই যে, জাহেলিয়াতের যে পরত পরত অন্ধকারে শতাব্দীর পর শতাব্দী মানুষ ডুবে আছে তা থেকে বের হয়ে ঈমান ও বিশ্বাসের আলোর বলয়ে প্রবেশ করবে। মানুষের গোলামি ও দাসত্ব থেকে মুক্ত হয়ে এক আল্লাহর দাসত্ব ও বন্দেগির গৌরব অর্জন করবে। জীবনের সঙ্কীর্ণ কারাগার ও যিন্দেগীর যিন্দানখানা থেকে বের হয়ে জীবনের মুক্ত অঙ্গনে এবং পৃথিবীর প্রশস্ত পরিবেশে শান্তি ও স্বস্তির শ্বাস গ্রহণ করবে। বিভিন্ন ধর্মের অনাচার ও বাদ-মতবাদের স্বেচ্ছাচার থেকে বের হয়ে স্বভাবধর্ম ইসলামের ন্যায় ও সুবিচারের ছায়াতলে আশ্রয় লাভ করবে।

অতীতের যে কোন যুগের তুলনায় এ দাওয়াত ও পায়গামের সত্যতা ও শ্রেষ্ঠত্ব এবং গুরুত্ব ও প্রয়োজন অনুধাবন করা এখন অনেক সহজ হয়ে গেছে। কেননা জাহেলিয়াত আজ ভরা বাজারে নাঙ্গা হয়ে গেছে। তার সব পঙ্কিলতা ও কলঙ্ক-কালিমা উৎকটভাবে ধরা পড়ে গেছে। জড়বাদী ও ভোগবাদী জীবনের অনাচার-স্বেচ্ছাচারে মানুষ অতিষ্ঠ হয়ে পড়েছে। সর্ব-অন্তরে জাহেলিয়াতের প্রতি ঘৃণা ও ধিক্কার উপচে পড়ছে। বিশ্ব এখন জাহেলিয়াতের নেতৃত্ব ত্যাগ করে ইসলামের নেতৃত্ব গ্রহণের জন্য সম্পূর্ণ প্রস্তুত।

ইসলামী উম্মাহরও তার ছিনতাই হওয়া নেতৃত্ব পুনরুদ্ধার করার এখনই সর্বোত্তম সুযোগ। যদি আজ ইসলামী উম্মাহ উঠে দাঁড়ায় এবং ইখলাছ, আত্মনিবেদন, পূর্ণ উদ্যম ও সঙ্কল্পের সঙ্গে এই দাওয়াত ও পায়গাম বুকে ধারণ করে আবার মানব-জাতিকে ডাক দেয়, আস্থার সঙ্গে, দরদের সঙ্গে, মমতার সঙ্গে, কল্যাণকামিতার সঙ্গে; যুক্তি দিয়ে, ভক্তি দিয়ে, আচরণ দিয়ে এবং জীবনের পাতায় অঙ্কন করে বিশ্বকে যদি সে বোঝাতে পারে যে, এটাই একমাত্র দাওয়াত ও পায়গাম, যা মানবতা ও মানবসভ্যতাকে পতন ও অধ:পতনের চরম পরিণতি থেকে রক্ষা করতে পারে; যদি মুসলিম উম্মাহ মানবজাতিকে একথা বোঝাতে পারে তাহলে কবির ভাষায়– 'এ ভূমি এখন বড় সিক্ত উর্বর এবং খুবই উপযোগী; চাই শুধু উন্নত বীজ, আর বিচক্ষণ ও দরদী কৃষক।'

পরিশেষে, কিতাবের সর্বত্র যে বৈশিষ্ট্যটি বিশেষভাবে উদ্ভাসিত তা হচ্ছে ইসলামের মূলনীতিমালা ও বুনিয়াদি বিষয়গুলোকে সেগুলোর ব্যাপক পরিসরে

এবং বিশুদ্ধ ইসলামী চেতনা অনুযায়ী অনুধাবন। এ কারণেই এ কিতাব শুধু ধর্মীয় ও সামাজিক গবেষণারই আদর্শ নমুনা নয়, বরং একইভাবে তা ইসলামের দৃষ্টিকোণ থেকে ইতিহাসের গবেষণা ও গ্রন্থনা কেমন হওয়া উচিত তারও আদর্শ নমুনা। ইউরোপের পণ্ডিত-গবেষকগণ বিশ্বের ইতিহাস পশ্চিমাদৃষ্টিকোণ থেকেই লিখে আসছেন। আর স্বভাবতই তারা তাদের বস্তুবাদী শিক্ষা, দর্শন ও সংস্কৃতি এবং সর্বোপরি ধর্মীয় ও জাতীয় সাম্প্রদায়িকতার প্রভাব থেকে কখনো মুক্ত হতে পারেন না; বুঝে হোক বা না বুঝে, সজ্ঞানে বা অজ্ঞানে। তাই তাদের ইতিহাস গবেষণায় প্রচুর ভুলবিচ্যুতি ঘটেছে। কারণ তারা জীবনের এমন বহু মূল্যবোধ সম্পর্কে 'বেখেয়াল' যেগুলোর সযত্ন পরিচর্যা ছাড়া মানবজীবনের ইতিহাস নিখুঁত -নির্ভুল হতে পারে না, এবং ঘটনার সঠিক ব্যাখ্যাপ্রদান ও সঠিক সিদ্ধান্ত- গ্রহণ সম্ভব হতে পারে না। আরো কারণ এই যে, সাম্প্রদায়িক চিন্তার কারণে ইউরোপকেই তারা জীবন ও মানবজীবনের অক্ষদণ্ড ও কেন্দ্রবিন্দু মনে করেন এবং জীবনের আরো বহু গুরুত্বপূর্ণ প্রভাবক ও কার্যকারণকে শুধু এজন্য উপেক্ষা করেন যে, সেগুলোর উৎস পাশ্চাত্য সভ্যতা নয়। উপেক্ষা করেন, কিংবা অন্তত অবমূল্যায়ন করেন।

দুর্ভাগ্যবশত বহুকাল ধরে আমরা এভাবেই অভ্যস্ত হয়ে পড়েছি যে, জীবনের প্রয়োজনীয় দ্রব্যসম্ভার যেমন ইউরোপ থেকে গ্রহণ করি, তেমনি আহরণ করি জীবনের ইতিহাসও, এবং যাবতীয় ভুলবিচ্যুতিসহ। অথচ তাদের গবেষণা ও গ্রন্থনার নীতি-পদ্ধতি আগাগোড়াই ভুল। কারণ জীবনকে তারা একটি সীমাবদ্ধ, প্রান্তিক ও পক্ষপাতদুষ্ট দৃষ্টিকোণ থেকে দেখে থাকে। আর নীতি, পদ্ধতি ও উপস্থাপনের ভ্রান্তির ফলে সিদ্ধান্তের ক্ষেত্রে তারা ভ্রান্তির শিকার হয়ে থাকে। প্রমাণ ও সূত্র সঠিক না হলে আহরিত সিদ্ধান্ত কীভাবে সঠিক হতে পারে?

আলোচ্য গ্রন্থটি ইতিহাসের গবেষণা ও গ্রন্থনার এমন একটি আদর্শ নমুনা, যাতে এসব বিষয় পূর্ণরূপে লক্ষ্য রাখা হয়েছে। সমস্ত কার্যকারণ এবং বিভিন্নমুখী মূল্যবোধও বিবেচনায় রাখা হয়েছে।

পাঠক হয়ত আশা করেননি যে, একজন আলিম, যিনি ইসলামের রূহানী ও আধ্যাত্মিক শক্তিতে পূর্ণ আস্থাবান, এবং বিশ্বনেতৃত্বের আসনে ইসলামের প্রত্যাবর্তনের জোরালো প্রবক্তা, তিনি নেতৃত্বের বিভিন্নমুখী যোগ্যতা সম্পর্কেও বস্তুনিষ্ঠ আলোচনা করবেন এবং আত্মিক ও আধ্যাত্মিক শক্তির পাশাপাশি শিল্প, প্রযুক্তি ও সমরশক্তি অর্জনের প্রতিও বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করবেন। সেই সঙ্গে

অর্থনৈতিক সক্ষমতা ও স্বনির্ভরতা অর্জনেরও আহ্বান জানাবেন এবং আহ্বান জানাবেন পাশ্চাত্য শিক্ষাব্যবস্থার পরিবর্তে নতুন শিক্ষাব্যবস্থা প্রবর্তনের। কিন্তু পরম পরিতোষের বিষয় যে, এসকল গুরুত্বপূর্ণ বিষয় তাঁর চিন্তা থেকে বাদ পড়েনি।

নিঃসন্দেহে এ গ্রন্থে মানবজীবনের উপর প্রভাব সৃষ্টিকারী সকল কার্যকারণ ও উপাদানের সুসংহত ও সুবিন্যস্ত সমাবেশ ঘটেছে এবং পূর্ণাঙ্গ দৃষ্টিকোণ থেকেই মুসলিম জাতি ও মানবজাতির ইতিহাস পর্যালোচনা করা হয়েছে এবং মুসলিম উম্মাহকে এমন দিকনির্দেশনা দেয়া হয়েছে যাতে পূর্ণ বাস্তবতাবোধ ও ভারসাম্য রক্ষিত হয়েছে। এসব কারণেই কিতাবটি ইতিহাস-গ্রন্থনার আদর্শ উদাহরণ [illegible] গৌরব অর্জন করেছে। এ কিতাব আমাদের পথ দেখিয়েছে যে, একজন মুসলিম পশ্চিমা নীতি ও পদ্ধতি পরিহার করে কীভাবে ইতিহাসের গবেষণা ও গ্রন্থনায় অগ্রসর হবে, সেই পশ্চিমা নীতি ও পদ্ধতি যাতে সুসমন্বয়, সুবিচার ও গবেষণা-কৌলীন্য, সবকিছুরই মারাত্মক অভাব রয়েছে। আমার সৌভাগ্য যে, গ্রন্থ সম্পর্কে গ্রন্থকারের সঙ্গে একাত্ম হয়ে এবং অভিন্ন অনুভূতি পোষণ করে কিছু কথা বলতে পেরেছি এবং মনের এ প্রতিক্রিয়াগুলো প্রকাশ করার সুযোগ পেয়েছি। আমি আরো আনন্দিত যে, কিতাবটি আরবী ভাষায় অধ্যয়নের সুযোগ হয়েছে। কারণ বিজ্ঞ লেখক এর জন্য আরবী ভাষাকেই নির্বাচন করেছেন।

إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَذِكْرَىٰ لِمَن كَانَ لَهُۥ قَلْبٌ أَوْ أَلْقَى ٱلسَّمْعَ وَهُوَ شَهِيدٌ ﴿٣٧﴾

নিঃসন্দেহে এতে উপদেশ রয়েছে ঐ ব্যক্তির জন্য যার রয়েছে হৃদয়, কিংবা যে কর্ণপাত করে এমন অবস্থায় যে, সে মনোযোগী। (ক্বাফ, ৫০ : ৩৭)

সাইয়েদ কুতুব
হুলওয়ান, মিশর

প্রথম অধ্যায়

জাহেলিয়াতের যুগ

প্রথম পরিচ্ছেদ

মানবতার মুমূর্ষুদশা

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

জাহেলি যুগে রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক ব্যবস্থা

প্রথম পরিচ্ছেদ

মানবতার মুমূর্ষুদশা

খৃস্টীয় ষষ্ঠশতকের বিশ্ব

এ বিষয়ে কোন দ্বিমত নেই যে, খৃস্টীয় ষষ্ঠ শতাব্দী ছিলো মানবজাতির ইতিহাসে সবচে' অন্ধকার যুগ। শতাব্দীর পর শতাব্দী মানুষ যে অধঃপতনের পথে চলেছিলো, এটা ছিলো তার শেষ ধাপ। পৃথিবীতে তখন এমন কোন কল্যাণশক্তি ছিলো না, যা বিভ্রান্ত মানবতাকে হাত ধরে পথ দেখাবে এবং চূড়ান্ত পতন থেকে রক্ষা করবে, বরং দিন দিন তার পতন ও অধঃপতনের গতি যেন বেড়েই চলেছিলো। খালিক, মালিক আল্লাহকে ভুলে গিয়ে মানুষ তখন নিজেকেই ভুলে গিয়েছিলো এবং নিজের পরিণাম-পরিণতি সম্পর্কে হয়ে পড়েছিলো উদাসীন। সে হারিয়ে ফেলেছিলো তার স্বভাবগত বোধ ও বুদ্ধি এবং কল্যাণ-অকল্যাণের বিবেচনাশক্তি। ভালো কী, মন্দ কী? সত্য কী, মিথ্যা কী? তা যেন তার জানাই ছিলো না,?

আল্লাহর আদেশে নবিগণ হকের যে দাওয়াত দিয়েছিলেন, বাতিলের শোরগোলে তা চাপা পড়ে গিয়েছিলো বহু আগেই। মানুষের সমাজে হেদায়াতের যে বাতি তাঁরা জ্বেলেছিলেন, তাঁদের পর বাতিলের ঝড়-ঝাপটায় হয় তা নিভে গিয়েছিলো, কিংবা ছিলো নিভু নিভু। যুলমাতের ঘোর অন্ধকারে সেই নিভু নিভু[1] প্রদীপ হয়ত দু'একটি হৃদয়ে কিছু আলো দিতে পারতো। কিন্তু ঘরে, পরিবারে, সমাজ ও জনপদে আলো তো দূরের কথা, ছিলো না সামান্য আলোর আভাস। দ্বীনের যারা ধারক ও বাহক তারাও পিছু হটে গিয়েছিলেন যিন্দেগির ময়দান থেকে এবং কোণঠাসা হয়ে পড়েছিলেন মন্দিরে গির্জায় এবং ঘরের ইবাদতখানায়। তারা

[1] নেবা ও নেভা, নিবে যাওয়া ও নিভে যাওয়া, বলা হয়, সুতরাং নিবু নিবু ও নিভু নিভু হতেই পারে।

ভেবেছিলেন, এভাবে অন্তত নিজেদের দ্বীন-ঈমান রক্ষা পাবে যামানার ফিতনা থেকে এবং বাকি জীবন কেটে যাবে আরামে নির্ঝঞ্ঝাটে। আসলে এটা ছিলো জীবনের বাস্তবতা ও দায়-দায়িত্ব থেকে তাদের পলায়ন। এটা ছিলো ধর্মশাসন ও রাজশাসন এবং আধ্যাত্মবাদ ও বস্তুবাদের দ্বন্দ্বযুদ্ধে তাদের কাপুরুষোচিত পরাজয়ের নামান্তর। এককথায়, প্রবল ঝড়তুফানের মুখে তারা হাল ছেড়ে দিয়েছিলেন এবং জনপদ ও জনসমাজের নেতৃত্ব থেকে হাত গুটিয়ে নিয়েছিলেন। অল্পক'জন, যারা তখনো রয়ে গিয়েছিলো যিন্দেগির ময়দানে ঝড়তুফানের মাঝে, তারা ধরেছিলো সমঝোতার পথ, শাসক ও শোষকদের সঙ্গে। যুলুম ও শোষণ-নিপীড়নের ক্ষেত্রে তারা ছিলো রাজশক্তির ধর্মীয় সহযোগী। অন্যায় পথে মানুষের সম্পদ লুণ্ঠনে তারাও ছিলো দুনিয়াদারদের সমান অংশীদার। এককথায়, তারা ছিলো দ্বীনের বিক্রেতা ও দুনিয়ার খরিদদার।

ইতিহাসের অমোঘ নিয়মে এবং কালের বিবর্তনধারায় শাসন ও সিংহাসন ব্যক্তি থেকে ব্যক্তিতে, পরিবার থেকে পরিবারে এবং জাতি থেকে জাতিতে বদল হতেই থাকে। কিন্তু শোষণ-নিপীড়ন এবং মানুষের উপর মানুষের শাসন চালানোর ক্ষেত্রে তারা যেহেতু একই মুদ্রার এপিঠ ওপিঠ, তাই ক্ষমতার এই পালাবদলে মানবতার কিছু যায় আসে না। নীতি ও নৈতিকতার অবক্ষয় এবং জরা ও জড়তার পচনে যে জাতি আক্রান্ত, তদ্রূপ যুলুম-শোষণ ও অনাচার-স্বেচ্ছাচারে যে সাম্রাজ্যের বুনিয়াদ ধ্বসে পড়েছে সেই সাম্রাজ্যের পতনে এবং সেই জাতির অধঃপতনে এ জগতসংসার না কখনো দুঃখবোধ করে, না কোন শোক প্রকাশ করে, বরং এটাই বিশ্বজগত ও তার ঐশী ব্যবস্থার স্বভাবদাবী। কোন রাজা ও রাজ্যের বিদায়ে মানুষের চোখ থেকে অশ্রু ঝরবে, চোখের অশ্রু এর চেয়ে অনেক মূল্যবান। মানবতার কল্যাণসাধনে যার কোন কীর্তি ও কর্ম নেই; সভ্যতার উন্নতিবিধানে যার কোন দান ও অবদান নেই তার শোকে বিলাপ করবে, সে অবসর কোথায় মানুষের! এসব ঘটনা তো অতীতে ঘটেছে বহুবার, ভবিষ্যতেও ঘটবে বারবার। নির্লিপ্ত আসমান-যমীন তা দেখে আসছে নিরবধিকাল–

كَمْ تَرَكُوا مِن جَنَّٰتٍ وَعُيُونٍ ۝ وَزُرُوعٍ وَمَقَامٍ كَرِيمٍ ۝ وَنَعْمَةٍ كَانُوا فِيهَا فَٰكِهِينَ ۝ كَذَٰلِكَ وَأَوْرَثْنَٰهَا قَوْمًا ءَاخَرِينَ ۝ فَمَا بَكَتْ عَلَيْهِمُ ٱلسَّمَآءُ وَٱلْأَرْضُ وَمَا كَانُوا مُنظَرِينَ ۝

কত বাগবাগিচা, কত ঝরণাধারা, কত ফল-ফসল এবং কত উন্নত স্থান তারা ছেড়ে গেছে এবং (ছেড়ে গেছে) কত নেয়ামত, যার ভোগে তারা মগ্ন ছিলো। এভাবেই অন্যকোন জাতিকে আমি এগুলোর উত্তরাধিকার দান করেছি, কিন্তু তাদের শোকে কাঁদেনি আসমান ও যমীন, আর তাদের দেয়া হয় নি অবকাশ।

(দোখান, ৪৪ ঃ ২৫-২৮)

বরং এসব সম্রাট ও সাম্রাজ্য এবং জাতি ও নৃপতি পৃথিবীর জন্য ছিলো বোঝা, মানবজাতির জন্য ছিলো অভিশাপ এবং ক্ষুদ্র ও দুর্বল জনগোষ্ঠীর জন্য ছিলো আযাব। সভ্যতার দেহে তারা ছিলো রোগ-ব্যাধির উৎস, যেখান থেকে দেহের রগ-রেশায় ছড়িয়ে পড়ে রোগজীবাণু, এমনকি সুস্থ দেহেও ঘটে রোগের সংক্রমণ। এ অবস্থায় অনিবার্য হয়ে পড়ে কঠিন কোন অস্ত্রোপচার। রোগাক্রান্ত অঙ্গের কর্তন এবং সুস্থ দেহ থেকে তার অপসারণ, প্রকৃতপক্ষে এটা হলো রাব্বুল আলামীনের রাবূবিয়াত এবং তাঁর অসীম দয়া ও রহমতেরই অভিপ্রকাশ। এজন্য মানব-পরিবারের, বরং বিশ্বজগতের সকল সদস্যের অবশ্যকর্তব্য হলো রাব্বুল আলামীনের হামদ ও প্রশংসা করা এবং তাঁর প্রতি শোকর ও কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা।

فَقُطِعَ دَابِرُ ٱلْقَوْمِ ٱلَّذِينَ ظَلَمُوا۟ وَٱلْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ ٱلْعَٰلَمِينَ ۝

যে কাওম যুলুম করেছে তাদের গোড়া কেটে দেয়া হয়েছে, সুতরাং সকল প্রশংসা আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের। (আন'আম, ৬ ঃ ৪৫)

কিন্তু .. কিন্তু মুসলিম উম্মাহ তো ছিলো নবুয়ত ও রিসালাতের বার্তাবাহী। মানবদেহের জন্য বিশুদ্ধ রক্ত যেমন, বিশ্বমানবতার জন্য তো তাদেরও ছিলো তেমনি প্রয়োজন! সুতরাং তাদের শাসন ও সাম্রাজ্যের পতন এবং তাদের জাতিগত অবক্ষয়-অধঃপতন নিছক একটি জাতি ও জনগোষ্ঠীর এবং দেশ ও জনপদের পতন বা অধঃপতন ছিলো না, বরং তা ছিলো একটি আদর্শের এবং একটি বার্তা ও রিসালাতের পতন, যা মানবসমাজের জন্য রূহ ও প্রাণসমতুল্য। তা ছিলো এমন এক স্তম্ভের ধ্বস, যার উপর নির্ভর করে দ্বীন ও দুনিয়ার নেযাম ও ব্যবস্থাপনা। তো মুসলিম উম্মাহর পতন এবং জীবনের অঙ্গন থেকে তাদের অপসৃতি কি বাস্তবেই এমন কোন ঘটনা ছিলো, যার জন্য পূর্ব-পশ্চিমের সকল মানবসমাজের শোকে সন্তাপে অশ্রুপাত করা কর্তব্য, ঘটনার এত যুগ, এত

শতাব্দী পরও? বিশ্বজগত সত্যি কি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে এই উম্মাহর পতনে, অধঃপতনে, বিশ্বের নেতৃত্ব থেকে তার অপসৃতিতে? অথচ এ বিশ্বে জাতি ও সভ্যতার এবং জনপদ ও জনগোষ্ঠীর তো কমতি নেই! কী ধরনের ক্ষতি ও দুর্গতি ছিলো তা? ইউরোপীয় জাতিবর্গ বিশ্বের শাসন ও নেতৃত্ব গ্রহণ করার পর এবং মুসলিম সাম্রাজ্যের ধ্বংসাবশেষের উপর তাদের বিশাল বিস্তৃত নবসাম্রাজ্য গড়ে তোলার পর পৃথিবীর রূপ ও প্রকৃতি কী দাঁড়িয়েছে এবং মানবজাতি কী পরিণাম ও পরিণতির শিকার হয়েছে? বিশ্বের শাসন ও মানবজাতির নেতৃত্বে এই বিরাট পরিবর্তনের কী প্রভাব-প্রতিক্রিয়া দেখা দিয়েছে, দ্বীন-ধর্ম, আখলাক-চরিত্র, নীতি ও নৈতিকতা এবং শাসন ও জীবন সর্বক্ষেত্রে? এককথায়, মানব ও মানবতার ভাগ্যনির্মাণের ক্ষেত্রে? সর্বোপরি আগামী বিশ্বের গতি-প্রকৃতিতে কী পরিবর্তন আসতে পারে যদি ইসলামী বিশ্ব জেগে ওঠে এবং আবার জীবনের নেতৃত্ব গ্রহণ করে? এসকল প্রশ্নেরই বস্তুনিষ্ঠ ও যুক্তিনির্ভর জবাব দিতে চেষ্টা করবো আগামী পৃষ্ঠাগুলোতে।

পৃথিবীতে বিভিন্ন জাতি ও জনগোষ্ঠীর পতন-অধঃপতনের ঘটনা বারবার ঘটেছে। বহু রাজ্য ও সাম্রাজ্য বিলুপ্ত হয়েছে। জনপদের পর জনপদ পদানতকারী বহু সম্রাট ও সেনাপতি একসময় চূড়ান্ত পরাজয় বরণ করেছে। কালের নির্মম থাবায় বহু সমৃদ্ধ সভ্যতা ধ্বংসাবশেষের নীচে চাপা পড়ে এমনভাবে হারিয়ে গেছে যে, এখন খোঁড়াখুঁড়ি করে তাদের অস্তিত্বের প্রমাণ উপস্থিত করতে হয়। মোটকথা, জোয়ারের পর ভাটা এবং উত্থানের পর পতন প্রত্যেক জাতির ইতিহাসেই ঘটেছে। মানবজাতির সাধারণ ইতিহাসে এর উদাহরণের অভাব নেই। কিন্তু মুসলিম উম্মাহর পতন ও অধঃপতন, এবং পরবর্তী পর্যায়ে বিশ্বনেতৃত্বের আসন থেকে তাদের বিচ্যুতি, আর সর্বশেষে জীবনের কর্মমুখর অঙ্গন থেকে তাদের অপসৃতি, এটা কিন্তু ইতিহাসের বারবার দেখা সাধারণ কোন ঘটনা নয়। এ এমন এক বিরল ঘটনা, যার নযির মানবজাতির সুদীর্ঘ ইতিহাসে দ্বিতীয়টি আর নেই; অথচ যে কোন বিরল ঘটনারই কোন না কোন নযির ইতিহাসের পাতায় খুঁজে পাওয়া যায়।

এ মর্মন্তুদ ঘটনা ও বিপর্যয় শুধু আরবদের নয়, এমনকি ঐসব জাতি ও জন-গোষ্ঠীরও নয়, নিজ নিজ ধর্মত্যাগ করে ইসলামের পতাকাতলে যারা সমবেত হয়েছিলো; বিশেষ কোন ঘর ও ঘরানার তো নয়ই, যারা শাসন ও সিংহাসন থেকে বিতাড়িত হয়ে সর্বস্বান্ত হয়েছে; বরং এ এমন ব্যাপক ও ভয়াবহ মানবিক

বিপর্যয়, যার স্বাক্ষী হয়ে ইতিহাস নিজেও আজ স্তব্ধ। কারণ আগে বা পরে এমন করুণ ও নিদারুণ ঘটনার সম্মুখীন ইতিহাস আর কখনো হয়নি। বিশ্ব যদি এ বিপর্যয়ের প্রকৃত স্বরূপ অনুধাবন করতে পারতো; সাম্প্রদায়িকতার কুয়াসাচ্ছন্নতা থেকে মুক্ত হয়ে বিশ্ব যদি নিজের ক্ষতি ও দুর্গতির গভীরতা ও গুরুত্বরতা কিছুমাত্র বুঝতে পারতো, সর্বনাশের সেই দিনটিকে তাহলে সে কান্না ও বেদনার এবং শোক ও সন্তাপের দিবসরূপে গ্রহণ করতো এবং বিভিন্ন জাতি ও জনগোষ্ঠী একে অপরকে সান্ত্বনা দেয়ার চেষ্টা করতো। এককথায় সেটা হতো কালো পোশাক ধারণের বিশ্বশোকদিবস। কিন্তু এ বিপর্যয় একদিনে ঘটেনি, ঘটেছে ধীর পর্যায়ক্রমে, কয়েক যুগের দীর্ঘ সময়-পরিসরে। তদুপরি বিশ্ব এখনো এ ঘটনার সঠিক মূল্যায়নের কোন উদ্যোগও গ্রহণ করেনি। তাছাড়া নিজের বঞ্চনা ও দুর্ভাগ্যের পরিমাণ নিরূপণের সঠিক মাপকাঠিও তার জানা নেই। তাই এ বিষয়ে এখনো সে অজ্ঞতা ও বিভ্রান্তির শিকার। আর অজ্ঞতা হলো বেদনা ও যন্ত্রণার বিরাট উপশম।

জাতি হিসাবে যদিও আমরা আজ বিপর্যস্ত ও পর্যুদস্ত এবং এখনকার বিশ্ব-শাসকদের দ্বারা চরমভাবে নিগৃহীত ও নির্যাতিত, তবু আসমানি রিসালাতের দায়দায়িত্ব থেকে কোনভাবেই আমরা মুক্ত হতে পারি না। তাই আমাদের এখন দায়িত্ব হলো, বিশ্বের সামনে তার ক্ষতি ও দুর্গতির এবং বঞ্চনা ও দুর্ভাগ্যের সঠিক চিত্র তুলে ধরা, যাতে সে অনুধাবন করতে পারে, মুসলিম উম্মাহর পতনের উল্লাসের মধ্য দিয়ে সে নিজে কী মহাসর্বনাশ ডেকে এনেছে! এজন্য আইয়ামে জাহেলিয়াত, ইসলামের আবির্ভাব, মুসলিম উম্মাহর উত্থান ও তার সুফল, পতন ও পরিণাম এবং উত্থান ও পতনের কার্যকারণ, ইত্যাদি প্রতিটি বিষয় সম্পর্কে আমাদের স্বচ্ছ ধারণা অর্জন করতে হবে। তো প্রথমে আমরা আলোচনা করবো. ইসলামের আবির্ভাবপূর্ব সময়ে বিশ্বের বিভিন্ন জাতি ও ধর্মের কী অবস্থা ছিলো?

একসময়ে বিভিন্ন জাতি ও ধর্ম

পৃথিবীর বৃহৎ ধর্মগুলো তখন হয়ে পড়েছিলো ধর্মজীবী ও ধর্মবণিকদের স্বেচ্ছাচার ও প্রবৃত্তিপরতার শিকার। পদে পদে চলছিলো ধর্মের বিকৃতি ও অপ-ব্যাখ্যা। এভাবে একসময় প্রতিটি ধর্ম হারিয়ে ফেলে তার আসল আকৃতি ও প্রকৃতি। অবস্থা এত দূর গড়িয়েছিলো যে, যদি ধর্মের আদিপুরুষদের কোনভাবে

ফিরে আসা সম্ভব হতো তাহলে নিজেদের রেখে যাওয়া ধর্ম তাঁরাও চিনতে পারতেন না। বিভিন্ন সভ্যতা ও সংস্কৃতি এবং ক্ষমতা ও শক্তির কেন্দ্রগুলো হয়ে পড়েছিলো শোষণ-নিপীড়ন এবং চরম অরাজকতা ও নৈরাজ্যের শিকার। তারা ব্যতিব্যস্ত ছিলো শুধু নিজেদের নিয়েই। বিশ্ব ও বিশ্বের জাতিবর্গের জন্য তাদের কাছে কোন বাণী ও বার্তা ছিলো না। কারণ নীতি ও নৈতিকতা এবং আত্মা ও আত্মিকতার দিক থেকে তারা হয়ে পড়েছিলো একেবারে দেউলিয়া। তাদের জীবন-নির্ঝর হয়ে পড়েছিলো বিশুষ্ক। ফলে তাদের নিজেদেরই জাতীয় সত্তার ছিলো না কোন প্রাণ-সজীবতা। তো অন্যকোন জাতিকে তারা কিভাবে যোগাবে প্রাণের সজীবতা এবং আত্মার শক্তি! তাদের কাছে না ছিলো আসমানী দ্বীনের কোন স্বচ্ছ ধারা, না ছিলো মানুষের তৈরী কোন সংহত শাসনব্যবস্থা।

খৃস্টধর্ম, খৃস্টীয় ষষ্ঠ শতকে

মানবজীবনের সকল সমস্যার সমাধান এবং মনোজগতের যাবতীয় জটিলতা নিরসনের যোগত্যার ক্ষেত্রে খৃস্টধর্ম কখনো বিশদতা, ব্যাপকতা, স্পষ্টতা ও স্বচ্ছতার এমন পর্যায়ে ছিলো না, যার উপর কোন সভ্যতার 'ভিত' তৈরী হতে পারে, কিংবা যার আলোকে কোন দেশ ও সমাজ সামনে অগ্রসর হতে পারে। তারপরো তাতে ছিলো হযরত ঈসা মাসীহের শিক্ষা ও আদর্শের ছিটেফোঁটা এবং সহজ-সরল তাওহীদী বিশ্বাসের হালকা ছাপ। কিন্তু সেন্ট পল এসে সেই শেষ আলোটুকুও নিভিয়ে দিলেন। যে প্রতিমাপূজার পরিবেশে তিনি প্রতিপালিত হয়েছিলেন এবং যে জাহিলিয়াত থেকে খৃস্টধর্মে প্রবেশ করেছিলেন, সেখানকার নানা সংস্কার-কুসংস্কার এবং ভ্রষ্ট চিন্তা-বিশ্বাসের তিনি তাতে সংমিশ্রণ ঘটিয়েছিলেন। এরপর কফিনে শেষ পেরেক ঠোকার কাজটি সম্পন্ন করেছেন কনস্টান্টাইন। ফলে খৃস্টধর্ম হয়ে পড়ে গ্রীক কল্পকথা ও রোমান প্রতিমাবাদ এবং মিশরীয় প্লেটোবাদ ও সন্ন্যাসবাদের অদ্ভুত এক মিশ্ররূপ। বলা যায়, খৃস্টধর্মে তখন সবকিছু ছিলো, ছিলো না শুধু ঈসা মাসীহের সহজ-সরল শিক্ষা-দীক্ষা, আদর্শ ও বিশ্বাস। সাগরে যেমন হারিয়ে যায় বৃষ্টিবিন্দু তেমনি তা হারিয়ে গিয়েছিলো বহুমুখী জলের ঐ জলাশয়ে।

খৃস্টধর্ম তখন হয়ে পড়েছিলো বিক্ষিপ্ত কিছু চিন্তা-বিশ্বাস ও আচার-সংস্কারের সমষ্টি, যাতে না ছিলো রূহ ও আত্মার প্রয়োজনীয় খাদ্য, পুষ্টি; না ছিলো আকল-বুদ্ধি এবং ভাব ও আবেগের চাহিদা পূরণের পর্যাপ্ত উপকরণ। এগুলো না

পেরেছে জীবনের জটিল গ্রন্থি উন্মোচন করতে, না পেরেছে জাতি ও সভ্যতার চলার পথ আলোকিত করতে; বরং মূর্খ ধর্মনেতা ও ধূর্ত ধর্মবণিকদের লাগাতার হস্তক্ষেপের ফলে একসময় তা হয়ে পড়েছিলো জ্ঞান ও বিজ্ঞানের প্রতিপক্ষ, হয়ে পড়েছিলো মানুষ এবং তার মুক্তবুদ্ধি ও সুস্থ চিন্তার মাঝে অন্তরায়। এমনকি বহু শতাব্দীর ধারাপ্রবাহে একসময় তা হয়ে পড়ে নিছক প্রতিমানির্ভর একটি ধর্ম। পবিত্র কোরআনের ইংরেজী অনুবাদক শেল খৃস্টীয় ষষ্ঠ শতকের নাছারাদের সম্পর্কে বলেন–

'ধর্মজাযকদের পূজা এবং খৃস্টের ছবি ও প্রতিমার উপাসনা করার ক্ষেত্রে খৃস্ট-সম্প্রদায় বড় সীমাছাড়া হয়ে পড়েছিলো, এমনকি এ যুগের ক্যাথলিকদেরও ছাড়িয়ে গিয়েছিলো।'[১]

রোমান সাম্রাজ্যে ধর্মীয় গৃহযুদ্ধ

পরবর্তীকালে খৃস্টধর্মের মৌলিক ও পার্শ্বিক বিভিন্ন বিষয়ে এমন প্রবল বিতর্ক ও কলহ দানাবেঁধে উঠেছিলো যে, গোটা জাতির চিন্তা-চেতনা তাতে আচ্ছন্ন হয়ে পড়েছিলো। যদিও তাতে অন্তসার বলে কিছু ছিলো না তবু তা গোটা জাতির মেধা, যোগ্যতা ও কর্মশক্তি একরকম গ্রাস করে ফেলেছিলো। এসব তর্কযুদ্ধ সুযোগে সুযোগে অস্ত্রযুদ্ধের ভয়াল রূপ ধারণ করতো, যার পরিণতি ছিলো নির্যাতন, নিপীড়ন, হত্যা ও রক্তপাত। মানুষের জানমাল, এমনকি ইজ্জত-আবরু পর্যন্ত লুণ্ঠিত হতো ধর্মান্ধদের হাতে। গীর্জা ও ধর্মচর্চার কেন্দ্রগুলো প্রতিদ্বন্দ্বী ও যুদ্ধমান ধর্মীয় দল-উপদলের সমরশিবিরে পরিণত হয়েছিলো। এভাবে গোটা সাম্রাজ্য নিক্ষিপ্ত হয়েছিলো ভয়াবহ এক গৃহযুদ্ধে। এই ধর্মীয় বিরোধ-বিবাদের উৎকটতম প্রকাশ ঘটেছিলো রোমান ও সিরিয়ান এবং মিশরীয় খৃস্টানদের মধ্যে; আরো সঠিক ভাষায়, রাজধর্ম ও মানুবাদের মধ্যে। রাজধর্মের মূল বিষয় ছিলো যিশুখৃস্টের দ্বৈতসত্তায় বিশ্বাস, পক্ষান্তরে মানুবাদীরা বিশ্বাস করতো, তিনি একটিমাত্র সত্তা ধারণ করেন, অর্থাৎ ঈশ্বরীয় সত্তা, যার মাঝে তাঁর মানবীয় সত্তা সম্পূর্ণ বিলীন হয়ে গেছে; বড় জলপাত্রে একফোঁটা দুধ যেমন।

দু'দলের এ বিরোধ-সঞ্জাত খৃস্টীয় ষষ্ঠ ও সপ্তম শতকে এমনই চরম আকার ধারণ করেছিলো, যেন তা পরস্পরের বিনাশকামী দু'টি ভিন্ন ধর্মের যুদ্ধ, কিংবা

[১] (sal's translation. p. 62 (1896)

(কোরআনে বর্ণিত) ইহুদী-নাছারাদের ধর্মীয় বিরোধ, যাতে ইহুদীদের দাবী ছিলো, নাছারারা কোন ধর্মের উপর নেই, আর নাছারাদের জবাব ছিলো, ইহুদীরা কোন ধর্মের উপর নেই।

ডঃ আলফ্রেড জি, বাটলার বলেন–

'ঐ দু'টি শতাব্দী ছিলো মিশরীয় ও রোমানদের মধ্যে লাগাতার রক্তক্ষয়ী সজ্ঘাত-সজ্ঘর্ষের যুগ, যার ইন্ধন ছিলো জাতিগত ভিন্নতা এবং ধর্মীয় বিরোধ, তবে দ্বিতীয়টিই ছিলো প্রবলতর। কেননা সে যুগের সর্বরোগের মূলই ছিলো রাজবাদ ও মানুবাদের হিংস্রতা। প্রথমটি ছিলো, যেমন নাম থেকে বোঝা যায়, রোমান সাম্রাজ্যের রাজধর্ম এবং সার্বজনীন প্রজাধর্ম, যার মূলকথা হলো যিশুখৃস্টের স্বভাবসত্তার দ্বৈততা। এ ধর্মবিশ্বাস ছিলো সনাতন ও পরম্পরাপূর্ণ। পক্ষান্তরে মিশরীয় মানুবাদীরা ঘৃণাভরে তা প্রত্যাখ্যান করতো; এমনকি এর প্রতিরোধে তারা এমন পাশবিক উন্মত্ততা ও জিঘাংসার পরিচয় দিয়েছিলো যা আমাদের পক্ষে আজ কল্পনা করাও সম্ভব নয়। পবিত্র ইনজীলে বিশ্বাসীরা দূরে থাক, ন্যূনতম বিবেকের অধিকারী কোন সম্প্রদায়ও কীভাবে পাশবিকতার এমন স্তরে নামতে পারে তা ভেবে পাই না।'[১]

ছয়শ আটাশ খৃস্টাব্দে পারসিকদের উপর বিজয় লাভের পর সম্রাট হিরাক্লিয়াস (৬১০ – ৬৪১) সাম্রাজ্যের বিবাদমান ধর্মসম্প্রদায়গুলোর মধ্যে ঐক্যবিধান ও সমন্বয়সাধনের এক জোরালো উদ্যোগ গ্রহণ করেন। তার সমন্বয়-প্রচেষ্টার ভিত্তি ছিলো যিশুখৃস্টের স্বভাব ও সত্তার প্রকৃতি সম্পর্কে যাবতীয় আলোচনা ও বিতর্ক পরিহার করা। অর্থাৎ তিনি কি একক সত্তার অধিকারী না দ্বৈত সত্তার, এ বিষয়ে কোন পক্ষ নিজস্ব মত প্রচার করবে না; তবে সকল পক্ষের জন্য এ বিশ্বাস গ্রহণ করা বাধ্যতামূলক যে, 'ঈশ্বর' – তাঁর রয়েছে একক ইচ্ছা এবং একক কার্য-ক্ষমতা।

ছয়শ একত্রিশ খৃস্টাব্দের শুরুতে ঐক্যমত স্থির হলো এবং এটাই সাম্রাজ্য ও গীর্জার অনুসারীদের রাষ্ট্রীয় ধর্মরূপে স্বীকৃতি লাভ করলো। অন্যসব ধর্মমতের উপর এই নতুন ধর্মমত চাপিয়ে দেয়ার জন্য সম্রাট হিরাক্লিয়াস বদ্ধপরিকর

[১] (a. j. butler : arab's conqust of egypt and the last thirty years of the roman dominion, p 29-30)

ছিলেন এবং এ জন্য সর্বউপায় অবলম্বন করেছিলেন। কিন্তু কিবতীরা এটাকে ধর্মবিকৃতি আখ্যা দিয়ে ঘৃণাভরে প্রত্যাখ্যান করেছিলো এবং নিজেদের পুরোনো ধর্মবিশ্বাস রক্ষার জন্য প্রাণপণ প্রতিরোধে অবতীর্ণ হয়েছিলো।

অবশেষে সম্রাট হিরাক্লিয়াস দ্বিতীয় উদ্যোগ গ্রহণ করলেন এবং কিছুটা ছাড় দিয়ে ঘোষণা করলেন, 'ঈশ্বর' – তাঁর রয়েছে একক ইচ্ছা, এ বিশ্বাস গ্রহণ করাই যথেষ্ট। দ্বিতীয় অংশটি, অর্থাৎ ইচ্ছাকে কার্যকর করার ক্ষমতা, তো এ বিষয়টি মুলতবী রেখে এসংক্রান্ত তর্ক-বিতর্কের উপর নিষেধাজ্ঞা আরোপ করলেন, এমনকি তিনি রাজকীয় ফরমানরূপে প্রাচ্যদেশের সব অঞ্চলে তা প্রেরণ করলেন। কিন্তু তাতেও মিশরের গণঅসন্তোষ প্রশমিত হলো না। মিশরে সাইরাসের দীর্ঘ দশবছরের শাসনকাল ছিলো নিষ্ঠুরতম নিপীড়ন-নির্যাতনের যুগ। তখন এমন সব লোমহর্ষক ঘটনা ঘটেছে যা শুনলে এখনো শরীরে কাঁটা দিয়ে ওঠে। হাজার হাজার মানুষকে পানিতে ডুবিয়ে মারা হতো। জ্বলন্ত মানুষকে আগুনে ঝলসানো হতো এবং চর্বি গলে গলে আগুন নিভে যেতো। কখনো বস্তায় ভরে 'অপরাধী'কে নিক্ষেপ করা হতো সমুদ্রে। এধরনের অসংখ্য নিষ্ঠুরতা ও পাশবিকতার কাহিনীতে ইতিহাস ভরপুর।[১]

সামাজিক অরাজকতা এবং অর্থনৈতিক অস্থিরতা

রোমান সাম্রাজ্যের পূর্বাঞ্চলে সামাজিক বিশৃঙ্খলা ছিলো চরম। একদিকে সাধারণ মানুষের জীবন ছিলো বিপদ-সমস্যায় জর্জরিত, তার উপর চাপানো হচ্ছিলো নিত্য-নতুন করের বোঝা। এর মধ্যে বিপদের উপর বিপদ ছিলো লাগামহীন শোষণের হাতিয়াররূপে ইজারাদারি ও সম্পদ বাজেয়াপ্তির ব্যবস্থা। ফলে প্রজা-সমাজে শাসকদের বিরুদ্ধে ধূমায়িত হয়ে উঠেছিলো আক্রোশ ও তীব্র অসন্তোষ। এমনকি স্বদেশী শাসকদের চেয়ে যে কোন বিদেশী শাসন তাদের কাছে অধিক কাম্য হয়ে উঠেছিলো। এসব কারণে ব্যাপক গোলযোগ ও বিদ্রোহ দেখা দিয়েছিলো। ৫৩২ খৃস্টাব্দের এক দাঙ্গা-গোলযোগে শুধু রাজধানীতেই নিহত হয়েছিলো ত্রিশহাজার মানুষ। (লক্ষ্য করুন, তৎকালীন জনসংখ্যার বিচারে ত্রিশহাজার মানুষ!)[২]

[১] প্রাগুক্ত, পৃ : ১৮৩ – ৮৯
[২] encyclopedia britanica. see justin

সময় ও পরিবেশ-পরিস্থিতির বিচারে জীবনের সর্বক্ষেত্রে তখন কঠোর মিত-ব্যয়িতাই ছিলো কাম্য, অথচ সীমাহীন অপচয় ও অপব্যয়ই ছিলো সাধারণ প্রবণতা। নৈতিক অধঃপতনের এমন চূড়ান্ত হয়েছিলো, যেখানে মানুষে আর পশুতে কোন পার্থক্য থাকে না। সবার তখন একটাই চিন্তা, একটাই নেশা, যেভাবে পারো, সম্পদ অর্জন করো এবং যত পারো, সম্পদ ওড়াও। লাগাম ছেড়ে ভোগ করো, উপভোগ করো এবং সর্বউপায়ে প্রবৃত্তির চাহিদা পূর্ণ করো। মানবিক মূল্যবোধ বিলীন হয়ে গিয়েছিলো এবং চরিত্র ও নৈতিকতার ভিত ধ্বসে পড়েছিলো। এমনকি অবাধ যৌনসম্ভোগের লালসায় মানুষ পারিবারিক ও বৈবাহিক বন্ধন থেকে বিমুখ হয়ে পড়েছিলো।[১] ন্যায় ও সুবিচার, শেলের ভাষায়, বাজারের পণ্যের মত বেচা-কেনা হতো। ঘুষ ও দুর্নীতি এবং খেয়ানত ও দুস্কৃতি পেয়েছিলো সামাজিক উৎসাহ।[২]

ঐতিহাসিক গীবন বলেন–

'ষষ্ঠ শতকের শেষ দিকে রোমান সাম্রাজ্য পতন ও অধঃপতনের একেবারে শেষ ধাপে পৌঁছে গিয়েছিলো। এ যেন সেই বৃক্ষ, একসময় যা ছিলো সবুজ বিস্তৃত এবং যার ছায়া ছিলো বিশ্বের সকল জাতির আশ্রয়, কিন্তু এখন আছে শুধু তার কাণ্ড, যা দিন দিন শুকিয়ে যাচ্ছে।'[৩] হিস্টোরিয়ানস হিস্টোরি অব দ্য ওয়ার্ল্ড-এর লেখকমণ্ডলী বলেন–

'বড় বড় নগর-জনপদ, যা দেখতে দেখতে বিরান হয়ে পড়েছিলো এবং কখনো আর নিজের হৃত গৌরব ও হারানো জৌলুস ফিরিয়ে আনতে পারেনি, সেগুলো এ সাক্ষ্যই দেয় যে, বাইজান্টাইন সাম্রাজ্য তখন চরম অবক্ষয় ও অরাজকতার শিকার হয়ে পড়েছিলো এবং এর কারণ ছিলো মাত্রারিক্ত কর ও রাজস্ব আরোপ, ব্যবসা-বাণিজ্যের অবনতি, কৃষি ও চাষাবাদে অবহেলা এবং পরিণতিতে বসতি ও জনপদ ধীরে ধীরে কমে আসা।'[৪]

---

[১] edward gibbon : the history of declin and fall of the roman empire, vol 3.p.327

[২] sal's translation. p. 72 (1896)

[৩] edward gibbon : the history of declin and fall of the roman empire, vol 5.p.31

[৪] historian's history of the world.v.7.175

রোমান শাসনে মিশরঃ ধর্মীয় ও অর্থনৈতিক অবস্থা

মিশর ছিলো রোমান সাম্রাজ্যের অধীন খুব গুরুত্বপূর্ণ অঞ্চল। নীলনদের কল্যাণে দেশটি ছিলো সুজলা, সুফলা ও উর্বরা। কিন্তু রোমকদের যুগপৎ শাসন- শোষণ ও ধর্মীয় নিপীড়নের ফলে সপ্তম শতকে মিশরই ছিলো আল্লাহর যমীনে সবচে' দুর্ভাগা দেশ। খৃস্টধর্ম মিশরকে কিছুই দিতে পারেনি। দিয়েছে শুধু যিশুর সত্তাগত প্রকৃতি, ঈশ্বরতত্ত্ব এবং অতিপ্রাকৃত দর্শনবিষয়ক ব্যাপক কোন্দল ও বিবাদ-বিতর্ক, যা সপ্তম শতকে বীভৎসতম রূপ ধারণ করেছিলো এবং মিশরীয় জাতির চিন্তাশক্তিকে স্থবির এবং কর্মশক্তিকে নিস্তেজ করে দিয়েছিলো। পক্ষান্তরে রোমান শাসন তাদের দিয়েছিলো শুধু ধর্মীয় নিপীড়নের বিভীষিকা এবং রাজনৈতিক শাসন-শোষণ ও দাসত্বের বীভৎসতা। মাত্র দশ বছরে মিশর যে ভয়াবহ ধর্মীয় নিপীড়ন ও রাজনৈতিক শাসন-শোষণের শিকার হয়েছে ইউরোপ ধর্মীয় তদন্তের যুগে কয়েক দশকেও তা ভোগ করেনি। ফলে জীবনের সার্বজনীন সৃজনশীলতা থেকে এবং ধর্মীয় ও আধ্যাত্মিক সাধনায় উত্তরণের ক্ষেত্রে মিশর একেবারেই পিছিয়ে পড়েছিলো। রোমান উপনিবেশ হওয়া সত্ত্বেও তার যেমন রাজনৈতিক স্বাধীনতা ভোগ করার অধিকার ছিলো না, তেমনি ছিলো না খৃস্টধর্মের অনুসারী হওয়া সত্ত্বেও ধর্মীয় ও বুদ্ধিবৃত্তিক স্বাধীনতা ভোগ করার অধিকার। ডঃ গ্যাস্টপ লেভন বলেন–

'বলতেই হবে, মিশরকে খৃস্টধর্ম গ্রহণে বাধ্য করা হয়েছিলো এবং এর ফলে সে অবক্ষয়ের অতলে চলে গিয়েছিলো, ইসলামের বিজয়াভিযানের আগে যা থেকে সে আর উদ্ধার পায়নি। নানা ধর্মীয় বিবাদ-বিতর্কের বেড়াজালে আটকা পড়ে মিশর হয়ে পড়েছিলো চরম দুর্দশার শিকার। কারণ দল-উপদলগুলো ছিলো ভয়ঙ্কর হানাহানি ও সঙ্ঘাত-সঙ্ঘর্ষে লিপ্ত। ফলে ধর্মীয় বিভক্তি এবং শোষণ-নিপীড়নে বিপর্যস্ত মিশর রোমকদের প্রতি চরম বিদ্বেষী হয়ে উঠেছিলো এবং রোমান শাসনের থাবা থেকে মুক্তি লাভের প্রহর গুণছিলো।'[১]

ডঃ আলফ্রেড জি, বাটলার বলেন– 'সপ্তম শতকে ধর্ম-সমস্যা ছিলো মিশরীয়দের কাছে রাজনৈতিক সমস্যার চেয়ে গুরুতর। কেননা রাজক্ষমতা ও রাজ্যশাসনকে কেন্দ্র করে দল-উপদল ও বিবাদ-কোন্দল সৃষ্টি হয়নি, হয়েছে ধর্মীয় চিন্তাধারা ও

---

[১] حضارة العرب، تعريب الأستاذ عادل زعيتر، الفصل الرابع "العرب في مصر"

মতবিশ্বাসকেই কেন্দ্র করে। আর ধর্মকে মানুষ এ দৃষ্টিকোণ থেকে দেখতো না যে, তা পুণ্য-কর্মের সহায়ক, বরং তাদের কাছে ধর্ম ছিলো কিছু মৌলিক বিষয়ের তত্ত্ব-বিশ্বাস।

ফলে যাবতীয় বিরোধ ও তর্ক-বিবাদ ছিলো নানান বিশ্বাসের মধ্যে বিভিন্ন সূক্ষ্ম-জটিল পার্থক্য ও কল্পনাপ্রসূত চিন্তাধারার ভিত্তিতে। এমনকি অর্থহীন ও দুর্বোধ্য বিভিন্ন বিষয় এবং ধর্মের মূল ও অতিপ্রাকৃত দর্শনের চুলচেরা পার্থক্যকে উপলক্ষ করে জীবন দিতেও তারা কুণ্ঠিত হতো না।[১]

অন্যদিকে রোমানরা মিশরকে গ্রহণ করেছিলো শুধু দুধের বকরীরূপে। তারা দুধ দোহন করতো শেষ ফোঁটা পর্যন্ত। ঘাস ও দানা-পানি যা খাওয়াতো তা শুধু এজন্য যে ওলানে দুধ যেন ভালো করে জমে। মিশরে তাদের কাজ ছিলো শুধু মিশরীয়দের সম্পদলুণ্ঠন ও রক্তশোষণ। আলফ্রেড জে বাটলারের নীচের মন্তব্য থেকে তা স্পষ্ট–

'রোমকরা মিশর থেকে মাথাপিছু খাজনা ও বিভিন্নমুখী কর উশুল করে নিতো এবং নিঃসন্দেহে তা ছিলো মানুষের সাধ্যাতীত, আর তা আরোপ করা হতো সম্পূর্ণ অন্যায়ভাবে।'[২]

হিস্টোরিয়ানস হিস্টোরি অব দ্যা ওয়ার্ল্ড-এর লেখকবৃন্দ বলেন–

বাইজান্টাইন সাম্রাজ্যের রাজভাণ্ডারে মিশর তার উৎপাদিত সম্পদের বিরাট অংশ জমা দিতো। মিশরীয় কৃষকশ্রেণী যদিও সর্বপ্রকার রাজনৈতিক ক্ষমতা ও অধিকার থেকে বঞ্চিত ছিলো তবু তারা কর ও খাজনা দিতে বাধ্য ছিলো। উচ্চহারের ভূমিখাজনা ছাড়াও ছিলো বিভিন্ন কর। ফলে ঐ সময়কালে মিশরের সম্পদ হয়ে পড়েছিলো ক্রমসঙ্কোচনশীল।[৩]

এভাবেই মিশর নিষ্পেষিত হচ্ছিলো একাধারে ধর্মীয় নিপীড়ন, রাজনৈতিক স্বেচ্ছাচার ও অর্থনৈতিক শোষণের জাঁতাকলে। ফলে জনগণ নিছক বেঁচে থাকার সংগ্রামেই ছিলো ব্যতিব্যস্ত। তাদের জীবনে নেমে এসেছিলো চরম দুর্দশা এবং তারা হয়ে পড়েছিলো সর্বপ্রকার সুশীল চিন্তা সম্পর্কে উদাসীন।

---

[১] a. j. butler : arab's conqust of egypt and the last thirty years of the roman dominion, p

[২] প্রাগুক্ত

[৩] historian's history of the world.v.7.173

আবিসিনিয়া

মিশরের প্রতিবেশী দেশ আবিসিনিয়া, আরবদের কাছে তার পরিচয় ছিলো হাবাশা নামে। হাবাশার জনগোষ্ঠীও মানুবাদের অনুসারী ছিলো। তদুপরি তারা অসংখ্য প্রতিমার উপাসনা করতো, একত্ববাদের নামে যা কিছু ছিলো তা প্রতিমাবাদেরই উন্নত রূপ ছাড়া আর কিছু ছিলো না, তবে তার উপর খৃস্টধর্মের তত্ত্ব ও পরিভাষার আবরণ ছিলো। তাদের মধ্যে না ছিলো আধ্যাত্মিক প্রাণ ও প্রেরণা, না ছিলো জাগতিক উচ্চাভিলাষ। বরং নিকা ধর্মসম্মেলনের সিদ্ধান্ত ছিলো, ধর্মীয় বিষয়ে আবিসিনিয়ার নিজস্ব কোন সত্তা নেই, বরং তা হবে রাজসভার সম্পূর্ণ অনুগত।

হাবাশার কর্তব্য ছিলো শুধু রোমানদের সেবার জন্য প্রচুর পরিমাণে কালো ও কর্মঠ দাস সরবরাহ করা। মিশরে যাও কিছু ধর্মীয় উত্তাপ ছিলো, হাবাশায় তাও ছিলো না। তাদের অর্থনৈতিক অবস্থা ছিলো শোচনীয়, কিন্তু ধর্মীয় অবস্থা ছিলো আরো শোচনীয়।

উত্তর-পশ্চিম ইউরোপের জাতিগোষ্ঠী

ইউরোপের উত্তর-পশ্চিম জনপদে যেসব জাতির বসবাস ছিলো, এককথায় তারা ছিলো অজ্ঞতা ও মূর্খতার ঘোর অন্ধকারে নিমজ্জিত এবং ছিলো রক্তক্ষয়ী যুদ্ধ-বিগ্রহে বিপর্যস্ত। জ্ঞান ও সভ্যতার ঊষার আলো তাদের ভাগ্যাকাশে উদিত হতে তখনো অনেক দেরী। কেননা দুর্ভাগা ইরোপের মানচিত্রে তখনো আমাদের 'উন্দুলুস'-এর অভ্যুদয় ঘটেনি, ইউরোপকে যারা জ্ঞান ও বিজ্ঞানের আলো উপহার দিয়েছিলো এবং সভ্যতা ও সংস্কৃতির সংস্পর্শে এনেছিলো। যুগের বিভিন্ন দুর্যোগ এবং ইতিহাসের ঝড়ঝাপ্টা, যা কোন জাতিকে ঘোর থেকে জাগিয়ে তোলে এবং এগিয়ে চলার যোগ্যতা দান করে তাও ছিলো তাদের জাতীয় জীবনে অনুপস্থিত। তারা শুধু ক্ষতবিক্ষত ছিলো খুনাখুনি, হানাহানি ও রক্তক্ষয়ী গৃহ-যুদ্ধে। মানবসভ্যতার চলমান কাফেলার যে রাজপথ, তা থেকে তারা ছিলো দূরে বহু দূরে। সমকালীন পৃথিবী সম্পর্কে তারা ছিলো প্রায় অজ্ঞ; পৃথিবীও বলতে গেলে জানতো না তাদের কোন খবর। প্রাচ্য ও প্রতিচ্যের বিভিন্ন দেশে, বিভিন্ন জনপদে ইতিহাসের মোড় পরিবর্তক যে সকল ঘটনা ঘটছিলো সেগুলোর সঙ্গে তাদের না ছিলো কোন যোগ, না ছিলো যোগাযোগ। চিন্তা ও বিশ্বাসের দিক থেকে তারা ছিলো নবীন খৃস্টধর্ম ও প্রাচীন মূর্তিপূজার মাঝামাঝি

অবস্থানে। ধর্ম ও ধর্মবিশ্বাসের ক্ষেত্রে যেমন তাদের কাছে কোন বাণী ও বার্তা ছিলো না, তেমনি রাজ্য ও রাজনীতির ক্ষেত্রেও ছিলো না নিজস্ব কোন ব্যবস্থা ও দর্শন। এইচ, জি, ওয়েলস যেমন বলেছেন, 'পশ্চিম ইউরোপে তখন একতা ও ঐক্য এবং আইন ও শৃঙ্খলার চিহ্নমাত্র ছিলো না।'[১]

রবার্ট ব্রিফল্ট (robert briffault) বলেন–

'পঞ্চম শতক থেকে দশম শতাব্দী পর্যন্ত ইউরোপ ছিলো অন্ধকারে আচ্ছন্ন এবং ক্রমশ তা ঘোর থেকে ঘোরতর হয়ে চলেছিলে। সে যুগের পাশবিকতা ও বর্বরতা ছিলো আদি যুগের চেয়ে অনেক ভয়াবহ। যেন পচনধরা সভ্যতার লাশ পচেই চলেছে। যা কিছু ভালো সব মুছে যাচ্ছে এবং ধ্বংস ও বিলুপ্তি অবধারিত হয়ে পড়েছে। যে সকল সমৃদ্ধ জনপদে ঐ সভ্যতার বিকাশ ঘটেছিলো এবং একসময় চরম উন্নতি লাভ করেছিলো, যেমন ইটালি ও ফ্রান্স, সেগুলো তখন হয়ে পড়েছিলো গোলযোগ, নৈরাজ্য ও বরবাদির শিকার।'[২]

ইহুদি জাতি ও তাদের ধর্ম

ইউরোপ, এশিয়া ও আফ্রিকায় তখন এমন একটি জাতির অধিবাস ছিলো যারা বিশ্বের জাতিবর্গের মধ্যে এদিক থেকে অনন্য ছিলো যে, তাদের কাছে ধর্মের বিরাট সম্পদ ছিলো; আবার ধর্মজ্ঞান ও ধর্মগ্রন্থের ভাষা-পরিভাষা অনুধাবনের ক্ষেত্রে ছিলো সবচে' প্রাগ্রসর। কিন্তু .. কিন্তু তারা ধর্ম ও সভ্যতা এবং শাসন ও রাজনীতির ক্ষেত্রে এমন কোন প্রভাবক শক্তি ছিলো না, যাতে অন্যান্য জাতির উপর প্রভাব বিস্তার করতে পারে, বরং বহুশতাব্দী থেকে তাদের ভাগ্যলিপিই ছিলো অন্য জাতির দাসত্ব করা এবং শোষণ-নিপীড়ন, বিতাড়ন-নির্বাসন ও বিপদ-দুর্যোগের শিকার হয়ে বেঁচে থাকা। পৃথিবীর অন্যান্য জাতির মাঝে তাদের নিজস্ব ঐতিহাসিক ধারা এই ছিলো যে, একদিকে তারা দীর্ঘ দাসত্বের লাঞ্ছনা ভোগ করেছে, অন্যদিকে জাত্যাভিমান, বংশগৌরব, সম্পদলিপ্সা ও সুদখোরিতা, এগুলো তাদের মধ্যে অদ্ভুত কিছু জাতীয় স্বভাব ও চরিত্র এবং ঝোঁক ও প্রবণতা সৃষ্টি করেছে এবং এগুলো ছিলো জাতিবর্গের মধ্যে তাদের একক বৈশিষ্ট্য। যুগ ও প্রজন্মপরম্পরায় তাদের জাতীয় পরিচয়। দুর্বলতা ও পরাজয়কালে আত্ম-

[১] h.g. wells : a short history of the world. p. 164
[২] the making of humanity. p. 164

সমর্পণ ও পদলেহন, আর শক্তি ও বিজয়ের সময় নীচতা ও নিষ্ঠুরতা। তদ্রূপ কপটতা, প্রতারণা, নির্দয়তা, স্বার্থপরতা ও সম্পদ আত্মসাৎ এবং সত্যের পথে অন্তরায় সৃষ্টি করা, এগুলো ছিলো তাদের স্বভাবদোষ। হাঁ, এতক্ষণ যাদের কথা বললাম, আলকোরআনের ভাষায় তারা হলো অভিশপ্ত ইহুদীজাতি। ষষ্ঠ ও সপ্তম শতকে তারা চারিত্রিক অধঃপতন, নৈতিক অবক্ষয়, মনুষ্যত্বহীনতা ও সামষ্টিক নষ্টাচারের যে চরম স্তরে উপনীত হয়েছিলো এবং যে কারণে মানব-জাতির নেতৃত্বের মর্যাদাপূর্ণ আসন থেকে তাদের অপসারণ ঘটেছিলো, তার এক সূক্ষ্ম নিখুঁত বিবরণ আলকোরআন আমাদের সামনে তুলে ধরেছে।[১] ষষ্ঠ শতকের শেষভাগে এবং সপ্তম শতাব্দীর সূচনাপর্বে এমন কিছু ঘটনা ও পরিবেশ-পরিস্থিতির উদ্ভব হয়েছিলো, যার ফলে ইহুদী ও খৃস্টসম্প্রদায়ের মধ্যে ঘৃণা-বিদ্বেষ এমন স্তরে পৌঁছেছিলো যে, পরস্পরের বিনাশসাধন ও প্রতিশোধ গ্রহণের কোন সুযোগ হাতছাড়া করতে তারা প্রস্তুত ছিলো না। একদল যখন বিজয় ও আধিপত্য লাভ করতো তখন পরাজিত জনগোষ্ঠীর সঙ্গে এমনই অমানবিক ও পৈশাচিক আচরণ তারা করতো যা বিশ্বাস করা সত্যি কঠিন।

সম্রাট ফোকাসের রাজত্বের শেষ বছর (৬১০ খৃঃ) ইহুদীরা এন্টাকিয়ায় খৃস্টানদের বিরুদ্ধে ভয়াবহ দাঙ্গাবাজি শুরু করলে সম্রাট তার সেনাপতি বোনোসাসকে বিদ্রোহদমনের দায়িত্ব দিয়ে পাঠালেন। আর সেনাপতি চরম নিষ্ঠুরতার সঙ্গে ইহুদীনিধনে মেতে ওঠেন, হয় তলোয়ারের লোকমা বানিয়ে, ফাঁসির দড়িতে ঝুলিয়ে, আগুনে পুড়িয়ে এবং পানিতে ডুবিয়ে, এমনকি হিংস্র পশুর মুখে নিক্ষেপ করে।

উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যে এই নিষ্ঠুরতা ও বর্বরতার পালাবদল হতো এবং যখন যারা জয়ী হতো, পাশবিকতা ও নির্মমতায় অন্যকে ছাড়িয়ে যেতো। রোমান সম্রাট ফোকাসের শাসনামলে, ৬১৫ খৃস্টাব্দে ইরানীরা যখন শাম (সিরিয়া, জর্দান ও ফিলিস্তীনের বিস্তীর্ণ ভূখণ্ড) জয় করলো তখন ইহুদীদেরই প্ররোচনায় সম্রাট খসরু খৃস্টানদের উপর পাশবিকতা ও বর্বরতার চূড়ান্ত করে ছাড়েন। তিনি তাদের এমন কচুকাটা করেন যে, খুব কমসংখ্যক খৃস্টানই ইরানী তলোয়ার থেকে রক্ষা পেয়েছিলো। এমনকি তিনি তাদের মিশর পর্যন্ত ধাওয়া করে

[১] উস্তায আব্দুল ফাত্তাহ আল-খালেদী কৃত اليهود في وصفهم القرآن الكريم পড়ুন, প্রকাশক, দারুল কলম, দামেস্ক

হত্যাযজ্ঞ চালান, আর দাসরূপে বন্দী করেন বেশুমার। বিজয়ী বাহিনীর ছত্রচ্ছায়ায় ইহুদীরা তখন বহুমঠ ও গীর্জা যেমন ধ্বংস করেছে তেমনি নির্বিচারে তাদের ঘড়বাড়ী জ্বালিয়েছে। পরে যখন রোমক বাহিনী ইরানীদের উপর জয়লাভ করে তখন প্রতিশোধ স্পৃহায় উন্মত্ত খৃস্টানদের দাবীর মুখে সম্রাট হিরাক্লিয়াস এমন হত্যাযজ্ঞে মেতে ওঠেন যে, দেশ ছেড়ে পালিয়ে যাওয়া বা আত্মগোপন করা ইহুদীরাই শুধু জানে বেঁচেছিলো।[১]

উপরের সংক্ষিপ্ত আলোচনা থেকেই বোঝা যায়, সপ্তম শতকে ইহুদী-খৃস্টান, দুই ধর্মসম্প্রদায় নৃশংসতা, বর্বরতা ও বিনাশ-উন্মাদনার কোন ভয়াবহ স্তরে পৌঁছেছিলো। আর বলাবাহুল্য, এমন মানবতাবর্জিত ও পাশবিক চরিত্রের কোন জাতির পক্ষে কিছুতেই সম্ভব নয় যে, পৃথিবীকে তারা ন্যায় ও সত্যের এবং ইনছাফ ও শান্তির বার্তা শোনাবে এবং তাদের শাসন-ছায়ায় মানবসভ্যতা সুখী-সমৃদ্ধ হবে।

ইরানঃ মানবতাবিনাশী আন্দোলন-তৎপরতা

সভ্য পৃথিবীর শাসন ও শোষণের ক্ষেত্রে ইরান ছিলো রোমের প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বী। সেখানেও নেমে এসেছিলো মানবতার চরম বিপর্যয়। ইনসানিয়াতের দুশমন ও মানবতার শত্রুরূপে ইতিহাসে যাদের কুখ্যাতি তাদের যাবতীয় অপতৎপরতার প্রাচীন কেন্দ্রভূমি ছিলো ইরান। পারসিক জাতির নৈতিকতার ভিত্তিমূল নড়বড়ে হয়ে পড়েছিলো বহু আগেই। বলা যায়, কুষ্ঠরোগের মত পচন ধরে গিয়েছিলো তাদের জাতীয় চরিত্রে। অবক্ষয় ও অধঃপতনের একটা ধারাবাহিকতা চলে আসছিলো যুগ যুগ ধরে। যেসব রক্তসম্পর্কের মধ্যে বৈবাহিক সম্পর্ক সকল সভ্য -জাতির নিকট সর্বকালে আইনত অবৈধ এবং স্বভাবত ঘৃণ্য ছিলো, ইরানে সেটাই ছিলো বিবাদ-বিতর্কের বিষয়। সামাজিকভাবেও ভাইবোনের বিবাহকে গর্হিত মনে করা দূরে থাক, বরং তা প্রশ্রয় পেতো। এমনকি পঞ্চম শতকের মধ্যভাগে রাজত্বকারী সম্রাট দ্বিতীয় ইয়াযদাগির্দ আপন কন্যাকে বিবাহ করেছিলো এবং পরে নিজ হাতে তাকে খুন করেছিলো।[২] ষষ্ঠ শতাব্দীর শাসক

[১] বিস্তারিত জানতে দেখুন, الخطط المقريزية খ.৪ পৃ. ৩৯২ এবং the arab's conquest of egypt

[২] historian's history of the world.v.8. p.84

বাহরাম চুবীন-এর স্ত্রী ছিলো তার আপন বোন।[১] ডেনমার্কের কোপেনহ্যাগ বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাচ্যভাষার অধ্যাপক ক্রিস্টেনসিন, যিনি ইরানের ইতিহাসবিষয়ে বিশেষজ্ঞ, বলেন−

'সাসানী যুগের সমসাময়িক ঐতিহাসিক জ্যাতিয়াস ও অন্যান্যরা পারসিক সমাজে রক্তসম্পর্কের মধ্যে বিবাহের প্রচলন ছিলো বলে স্বীকার করেছেন। সমাজের দৃষ্টিতে এটা অন্যায় কিছু ছিলো না, বরং তা পুণ্যকর্ম বলেই সাধুবাদ পেতো। চৈনিক পর্যটক হোয়ান স্যাঙ সম্ভবত এজাতীয় বিবাহপ্রথার প্রতি ইঙ্গিত করেই লিখেছেন, 'ইরানীরা অবাধ বিবাহে বিশ্বাসী। তাদের আইন ও সমাজে কোন রক্তসম্পর্কই বিবাহের পথে বাধা নয়।'[২]

খৃস্টীয় তৃতীয় শতকে মানীর আবির্ভাব ঘটে। বস্তুত তার আন্দোলন ছিলো সমাজের অবাধ যৌন অনাচারের বিরুদ্ধে অপ্রাকৃতিক ও স্বভাববিরুদ্ধ এক প্রচণ্ড প্রতিক্রিয়া। তিনি ভাবতেন, এটা হলো 'তথাকথিত' আলো ও অন্ধকারের চিরন্তন দ্বন্দ্বের স্বাভাবিক ফল, আর যে কোন মূল্যে মানুষকে অন্ধকারের পরিবর্তে আলোর পথ গ্রহণ করতে হবে। তাই সমাজকে কলুষমুক্ত করার লক্ষ্যে তিনি অযৌন জীবন যাপন এবং কুমারব্রত পালনের আহ্বান জানিয়েছিলেন। তার ঘোষণা ছিলো, 'আলো ও অন্ধকারের মিশ্রণই সমস্ত অনিষ্টের মূল, যা থেকে মুক্ত হওয়া মানবজীবনের জন্য অপরিহার্য।' মানবজাতির আশু বংশবিলুপ্তির মাধ্যমে আলো যেন অন্ধকারের উপর স্থায়ী বিজয় লাভ করে, এজন্য তিনি বিবাহ নিষিদ্ধ করেন।

দু'শ ছিয়াত্তর সালে সম্রাট বাহরাম মানীকে এই যুক্তিতে হত্যা করেন যে, সে তো মানবজাতির বিলুপ্তি চায়; সুতরাং সেটা অন্যের পরিবর্তে নিজেকে দিয়ে শুরু করাই তার কর্তব্য। কিন্তু মানী নিহত হলেও তার আন্দোলনের মৃত্যু ঘটেনি, বরং বহুকাল তা বেঁচে ছিলো, এমনকি মুসলিম বিজয়ের পরো পারসিক সমাজে তার প্রভাব বিদ্যমান ছিলো।

পরবর্তীকালে পারস্যজাতির স্বভাব-প্রবণতা মানীর প্রকৃতিবিরুদ্ধ শিক্ষা ও দর্শনের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেছিলো, যা মাযদাকের (জন্ম ৪৮৭খৃঃ) আন্দোলনের মাধ্যমে আত্মপ্রকাশ করে। মাযদাক ঘোষণা করেন−

[১] تاريخ الطبري খঃ পৃ :১৩৮

[২] ফারসি ভাষায় লিখিত, মুহম্মদ ইকবাল কর্তৃক উর্দুতে অনূদিত আহদে সাসানীতে ইরান, পৃ. ৪৩০

মানুষ জন্মগ্রহণ করেছে পার্থক্যহীন সমতার উপর। সুতরাং তাদের জীবনযাপনও হতে হবে পার্থক্যহীন সমতার উপর। আর যেহেতু সম্পদ ও নারীই হলো এমন দু'টি উপকরণ যার নিরাপত্তা ও সুরক্ষা মানবস্বভাবের চাহিদার অন্তর্ভুক্ত, সেহেতু এদু'টি ক্ষেত্রে সর্বাগ্রে সাম্য ও সমঅধিকার প্রতিষ্ঠা করা অপরিহার্য। শাহরাস্তানী বলেন–

তিনি নারী ও সম্পদের মালিকানা অবাধ করে দেন এবং আগুন, পানি ও ঘাসের মত নারী ও সম্পদের ক্ষেত্রেও সমমালিকানা ঘোষণা করেন।[১]

যুবসমাজ ও ভোগবাদী শ্রেণীর মধ্যে এ আন্দোলন ব্যাপক জনপ্রিয়তা অর্জন করে। কারণ এটা ছিলো তাদের ভোগলিপ্সা ও কামপ্রবৃত্তির পূর্ণ অনুকূল। আরো চমকপ্রদ বিষয় এই যে, এ আন্দোলন এমনকি রাষ্ট্রীয় পৃষ্ঠপোষকতাও লাভ করেছিলো। স্বয়ং পারস্যসম্রাট কোবায একে আনুকূল্য ও ছত্রচ্ছায়া দান করেন এবং সাম্রাজ্যব্যাপী তার প্রচার-প্রসারের ব্যবস্থা করেন। ফলে অত্যল্প সময়ের মধ্যে গোটা দেশে এ আন্দোলন দাবানলের মত ছড়িয়ে পড়ে এবং পারসিক সমাজ নৈতিক নৈরাজ্য ও যৌন অনাচারের বাঁধভাঙ্গা জোয়ারে ভেসে যায়। তাবারী বলেন–

'বিকৃতরুচির ইতর লোকেরা এ সুযোগ লুফে নিয়ে মাযদাকীদের দলে ভিড়ে গেলো। তারা এমনই বেপরোয়া হয়ে উঠলো যে, সাধারণ মানুষ হয়ে পড়লো তাদের ভোগলিপ্সা ও কামলালসার অসহায় শিকার। দিনে দুপুরে ঘরে ঘরে হানা দিয়ে মানুষের 'মান ও সামান' তারা ভোগদখলে নিয়ে নিতো। গৃহস্বামীর কিছুই করার থাকতো না। মাযদাকীরা সিংহাসনচ্যুতির হুমকি দিয়ে সম্রাট কোবাযকেও বাধ্য করেছিলো মাযদাকবাদের প্রতি সমর্থন ঘোষণা করতে। ফলে অত্যল্প সময়ে অবস্থা এতদূর গড়ালো যে, সমাজে পিতৃপরিচয় বিলুপ্ত হয়ে গেলো এবং বস্তুর উপর ব্যক্তির মালিকানা রহিত হয়ে হয়ে গেলো।[২]

তাবারী বলেন, 'শুরুতে কোবায ছিলেন পারস্যের অন্যতম আদর্শ শাসক, কিন্তু মাযদাকী আন্দোলনে জড়িত হয়ে তিনি এমন বিপর্যয় ডেকে আনেন যে, গোটা রাজ্যে অরাজকতা ছড়িয়ে পড়ে এবং সকল সীমান্ত হয়ে পড়ে বিপর্যস্ত।[৩]

---

১ الملل والنحل للشهرستاني খ. ১ পৃ.৮৬

২ تاريخ الطبري খ. ২ পৃ. ৮৮

৩ تاريخ الطبري খ. ২ পৃ. ৮৮

পারস্যের সম্রাটপূজা

কিসরা (খসরু) উপাধিধারী পারস্যের সম্রাটগণ ভাবতেন, পৃথিবীতে তারা ঈশ্বরের প্রতিবিম্ব। তাদের ধমনীতে ঐশী রক্ত প্রবাহিত এবং তার বর্ণ নীল। প্রজারাও সম্রাট ও রাজ-পরিবারকে সে দৃষ্টিতেই দেখতো এবং বিশ্বাস করতো, রাজবংশের স্বভাব-প্রকৃতিতে উর্ধ্বজাগতিক পবিত্র কোন উপাদান রয়েছে। তাই তারা তাদের সিজদা-প্রণাম করতো এবং তাদের ঈশ্বরত্বের বন্দনা গাইতো। সম্রাট ছিলেন আইন ও সমালোচনার, এমনকি মানবত্বেরও উর্ধ্বে। তাই সম্রাটের 'পবিত্র' নাম তারা মুখে উচ্চারণ করতো না এবং রাজসভায় উপবেশনের সাহস করতো না। প্রজাদের আরো বিশ্বাস ছিলো, প্রতিটি মানুষের উপর সম্রাটের অধিকার রয়েছে, কিন্তু সম্রাটের উপর কারো কোন অধিকার নেই। সম্রাট যদি কাউকে কিছু দান করেন, কিংবা ভোজপাত্র থেকে কোন টুকরো ছুঁড়ে দেন তবে সেটা শুধুই করুণা, অধিকার ও প্রাপ্য কিছুতেই নয়। সম্রাটের প্রতি নিরঙ্কুশ আনুগত্যই হলো প্রজা-কর্তব্য এবং মোক্ষ লাভের একমাত্র উপায়। রাজবংশের দাসত্বেই প্রজাবংশের গৌরব।

রাজ্যশাসন ও প্রজাপালনের জন্য একটি বিশেষ পরিবার তথা কায়ানী পরিবার নির্ধারিত ছিলো। পারস্যবাসী মনে করতো, রাজমুকুট ধারণ এবং সিংহাসনে আরোহণ, এটা তাদের একক অধিকার এবং রাজ্য ও রাজভাণ্ডারের তারাই একমাত্র হকদার, যা উত্তরাধিকারসূত্রে পিতা থেকে পুত্রে হস্তান্তরিত হবে, হতেই থাকবে। তাতে হস্তক্ষেপ করার কোন অধিকার সাম্রাজ্যের আর কারো নেই। এ অধিকার এমনই মৌরুসি ছিলো এবং প্রজাদের বোধ, বিশ্বাস ও ঐতিহ্যের এমনই অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ ছিলো যে, তাতে সামান্য ব্যত্যয় ঘটাবার সাধ্য ছিলো না কারো। এমনকি প্রাপ্তবয়স্ক উত্তরাধিকারী পাওয়া না গেলে সম্রাটের শিশুপুত্রকে সিংহাসনে বসিয়ে দেয়া হতো। পক্ষান্তরে পুরুষ উত্তরাধিকারী না থাকলে কোন নারীকেই প্রজারা সম্রাজ্ঞীরূপে বরণ করে নিতো, যাতে শাসনদণ্ড রাজপরিবারেই সংরক্ষিত থাকে। যেমন সম্রাট শেরোবার মৃত্যুর পর সাতবছরের পুত্র আর্দেশীরকে সিংহাসনে বসানো হয়। একইভাবে কিসরা পারভেজের শিশুপুত্র ফররুখযাদ খসরু সিংহাসনে আরোহণ করেন। অন্যদিকে কিসরার দুই কন্যা বোরান ও আযরামিদখত একই সূত্রে সিংহাসন লাভ করেন।[১] কিন্তু এত বড়

---

১ تاريخ الطبري খ. ২ এবং তারীখ-ই- ইরান, ম্যাকরিয়স ইরানীকৃত

জাতীয় সঙ্কটকালেও কারো কল্পনায়ও আসেনি যে, যোগ্য, বিজ্ঞ ও প্রভাবশালী কোন সেনাপতি বা সভাসদকে, যেমন ছিলেন রুস্তম, জাভান ও অন্যান্য, তাদের কাউকে রাজ্যশাসনের ভার দেয়া যেতে পারে। কেননা হয়ত তাদের সবকিছু ছিলো, কিন্তু তাদের ধমনীতে ছিলো না রাজবংশের নীল রক্ত।

ইরানী সমাজে শ্রেণীবিভক্তি

ধর্মীয় ও আধ্যাত্মিক পরিবার এবং ভূস্বামী ও অভিজাত শ্রেণী সম্পর্কে জনসাধারণের বিশ্বাস ছিলো যে, সাধারণ মানবীয় স্তর থেকে বহু উর্ধ্বে তাদের অবস্থান। তাদের ব্যক্তিসত্তা এবং মনমস্তিষ্ক সবকিছু সাধারণ মানুষ থেকে ভিন্ন। এই বিশেষ শ্রেণীটিকে পারস্যের সাধারণ মানুষ সীমাহীন ক্ষমতা, অধিকার ও মর্যাদা দিয়ে রেখেছিলো এবং তাদের প্রতি প্রজা-আনুগত্যও ছিলো নিরঙ্কুশ। ইতর-ভদ্রের পার্থক্য, শ্রেণীভেদ ও পেশাগত বিভক্তি ছিলো ইরানী সমাজের অটল বিধান, যাতে সামান্য পরিবর্তনেরও কোন অবকাশ ছিলো না। অধ্যাপক আর্থার ক্রিস্টেনসিন বলেন–

'পারস্যে সমাজব্যবস্থার ভিত্তি ছিলো বংশ ও পেশাগত পরিচয়। সমাজের বিভিন্ন শ্রেণীর মধ্যে ছিলো অনতিক্রম্য ব্যবধান ও দূরত্ব। উপর থেকে নীচে, বা নীচ থেকে উপরে যাওয়ার কোন যোগসূত্র যেমন ছিলো না তেমনি ছিলো না উভয় শ্রেণীর মধ্যে দাস-প্রভু ছাড়া অন্য কোন সম্পর্ক-সূত্র।

সাধারণের জন্য অভিজাত ও শাসক শ্রেণীর কারো ভূসম্পত্তি ক্রয় করা আইনতই নিষিদ্ধ ছিলো। সাসানী শাসননীতির অন্যতম বিধান ছিলো এই – প্রত্যেকে সেই অবস্থা ও অবস্থানেই সন্তুষ্ট থাকবে, যা সে জন্মসূত্র ও বংশপরিচয় থেকে লাভ করেছে। এর চেয়ে উচ্চ মর্যাদার আকাঙ্ক্ষা ও প্রয়াস তার জন্য কিছুতেই বৈধ নয়। তদ্রূপ জন্মগত পেশা, যে জন্য ঈশ্বর তাকে সৃষ্টি করেছেন, তা ছেড়ে অন্য কোন পেশা সে গ্রহণ করতে পারে না। তাছাড়া ইরানী শাসকগণ রাজকার্যে সাধারণ শ্রেণী ও নীচবংশের কাউকে কখনো নিযুক্ত করতো না। এমনকি প্রজাসাধারণের বিভিন্ন শ্রেণীর মধ্যেও সুস্পষ্ট ভেদরেখা বিদ্যমান ছিলো এবং প্রত্যেকের পৃথক অবস্থান সুনির্ধারিত ছিলো।'[১]

বলাবাহুল্য, এই শ্রেণীভেদ ছিলো মানবতার চরম অপমান, যা রাজসভায় এবং

---

[১] ফরাসি ভাষায় লিখিত, মুহম্মদ ইকবাল কর্তৃক উর্দূতে অনূদিত আহদে সাসানী মেঁ ইরান, পৃ. ৫৯০, ৪২০, ৪১৮, ৪২২ ও ২১

অভিজাত শ্রেণীর সমাবেশে প্রকট হয়ে ধরা পড়তো। যেমন সেখানে তাদের বসার অধিকার ছিলো না, বরং বুকে হাত রেখে নিশ্চল পাথরের মত দাঁড়িয়ে থাকতে হতো। সেখানে প্রবেশাধিকারই ছিলো তাদের জন্য চূড়ান্ত মর্যাদার বিষয়। রাজদরবারের এসব দৃশ্য কোন মুসলিম দূতের জন্য এমনই অসহনীয় হতো যে, তিনি প্রকাশ্যে এর সমালোচনা করতেন। তাবারীর একটি বর্ণনায় পরিষ্কার বোঝা যায়, পারস্যসমাজ তাদের চিরাচরিত সংস্কার ও সংস্কৃতি অনুযায়ী দাস-প্রভু মনোবৃত্তির কোন স্তরে পৌঁছে গিয়েছিলো। তিনি বলেন–

'আবু উছমান আন-নাহদী বর্ণনা করেন, ছাহাবী হযরত মুগীরা সেতু পার হয়ে পারস্যে প্রবেশ করলেন। তখন লোকেরা তাকে বসিয়ে রেখে সেনাপতি রুস্তমের সমীপে তার উপস্থিতির জন্য অনুমতি প্রার্থনা করলো। তারা তাদের প্রতাপ প্রদর্শনের উদ্দেশ্যে রাজকীয় ঠাটবাটের কোন পরিবর্তন করলো না। তো হযরত মুগীরা বিন শো'বা (রা) অগ্রসর হলেন।

দরবারে সকলে ছিলো রাজকীয় পোশাকে। মাথায় মুকুট এবং দেহে স্বর্ণখচিত বস্ত্র। তাদের ফরাস ছিলো নির্দিষ্ট দূরত্বে। সেটা হেঁটে অতিক্রম করেই সেনাপতি রুস্তমের নিকটে পৌঁছতে হতো। হযরত মুগীরা হেঁটে রুস্তমের নিকট পৌঁছলেন, তারপর সোজা তার পাশে তার গদিতে বসে পড়লেন। এ অভাবনীয় দৃশ্য দেখে দরবারীরা প্রথমে হতবাক হলো, তারপর ছুটে এসে কঠোর তিরস্কার করে তাঁকে নামিয়ে দিলো। তিনি বললেন, তোমাদের সম্পর্কে তো আমাদের কাছে প্রজ্ঞাপূর্ণ সংবাদই পৌঁছতো, কিন্তু আমি তো তোমাদের চেয়ে নির্বোধ সম্প্রদায় দেখিনি। আমরা আরবজাতি তো সবাই সমান। কেউ কাউকে দাস বানিয়ে রাখি না, তবে যদি সে প্রতিপক্ষ যোদ্ধা হয়। তাই আমার ধারণা ছিলো, পরস্পর তোমরা সম্প্রীতিপূর্ণ আচরণ করো যেমন আমরা নিজেদের মধ্যে করি। তার চেয়ে ভালো ছিলো যদি আমাকে আগেই জানিয়ে দিতে যে, তোমরা একে অন্যের প্রভু, আর এ আচরণ তোমাদের কাছে গ্রহণযোগ্য নয়, তাহলে আমি তা করতাম না। কিন্তু আমি তো নিজে থেকে তোমাদের কাছে আসিনি, তোমরা ডেকে এনেছো। আজ নিশ্চিত হলাম যে, তোমাদের প্রতাপ অস্তগামী এবং তোমরা পরাজিত হবে। কেননা এমন নীতি ও চরিত্র এবং এরূপ চিন্তা ও মানসিকতার উপর কোন রাজত্ব স্থায়ী হতে পারে না।'[১]

---

[১] تاریخ الطبری খ. ৪ পৃ. ১০৮

ইরানীদের জাত্যাভিমান

এতসব নষ্টাচারের পরও ইরানীদের জাত্যাভিমান ছিলো অতিমাত্রায় প্রবল। নিজেদের তারা পৃথিবীর সমস্ত জাতি ও জনগোষ্ঠীর চেয়ে শ্রেষ্ঠ মনে করতো। তাদের বিশ্বাস ছিলো, ইশ্বর তাদের এমন কিছু গুণ, বৈশিষ্ট্য ও স্বভাবযোগ্যতা দান করেছেন, যা আর কোন জাতির মধ্যে নেই। তাই চারপাশের অন্যান্য জাতিকে তারা কৃপা ও অবজ্ঞার দৃষ্টিতে দেখতো এবং এমন সব নামে তাদের সম্বোধন করতো যাতে তাচ্ছিল্য ও বিদ্রূপ ছাড়া আর কিছু ছিলো না।

অগ্নিপূজা ঃ জীবনের উপর তার প্রভাব

একেবারে প্রাচীন কালে ইরানীরা আল্লাহর ইবাদত করতো এবং আল্লাহকেই সিজদা করতো। পরে তারা অন্যান্য আদি জনগোষ্ঠীর মত সূর্য, চাঁদ-তারা এবং আকাশের অন্যান্য জ্যোতিষ্কের উপাসনা শুরু করে। তারপর আগমন ঘটলো পারসিক ধর্মের প্রবর্তক জরথোস্ট্রর। বলা হয়, মূর্তিপূজা প্রত্যাখ্যান করে তিনি একত্ববাদের আহ্বান জানিয়েছিলেন। তাঁর বক্তব্য ছিলো, বিশ্বজগতের আলোকিত ও উজ্জ্বল প্রতিটি বস্তুতে মূলত আল্লাহর নূর বা আলোই প্রতিবিম্বিত হয়। প্রার্থনার সময় তিনি অগ্নি ও সূর্যের অভিমুখী হওয়ার আদেশ করেছেন। কেননা আলো হচ্ছে ইলাহের সর্বশক্তির প্রতীক। তাছাড়া তিনি উপাদানচতুষ্টয় তথা অগ্নি, বায়ু, মৃত্তিকা ও জল– এগুলোকে অসম্মান করতে নিষেধ করতেন। পরবর্তীকালে ধর্মবেত্তাগণ জরথোস্ট্রীয় ধর্মের বিভিন্ন বিধান প্রণয়ন করেছেন। তখন তারা এমন সব পেশা নিষিদ্ধ ঘোষণা করলেন যাতে আগুনের সাহায্য গ্রহণের প্রয়োজন পড়ে। ফলে এ ধর্মের অনুসারীরা ব্যবসা ও কৃষিকাজেই নিজেদের আবদ্ধ করে রাখে। কর্মক্ষেত্রে এই অগ্নি-সম্মান এবং উপাসনায় এ অগ্নিমুখিতার কারণেই একসময় মানুষ অগ্নিপূজায় লিপ্ত হয়ে পড়ে এবং স্বয়ং অগ্নিসত্তারই উপাসনা শুরু করে। তখন থেকেই অগ্নিকুণ্ড ও অগ্নিমন্দির নির্মাণের সূচনা। পরে অগ্নিপূজা ছাড়া অন্যসব উপাসনা ও ধর্মবিশ্বাস বিলুপ্ত হয়ে পড়ে। প্রকৃত সত্য চলে যায় অজ্ঞতার আড়ালে এবং ইতিহাস হয়ে পড়ে বিস্মৃত।[১]

আগুনের যেহেতু নিজস্ব কোন শক্তি নেই এবং পূজারীদের জন্য আগুনের যেহেতু কোন বিধান ও বার্তা নেই এবং আগুণ যেহেতু জীবনসমস্যার কোন সমাধান দিতে পারে না এবং পারে না অপরাধীদের দমন ও শাসন করতে সেহেতু অগ্নিপূজার ধর্ম পরিণত হলো নির্দিষ্ট স্থানের এবং নির্দিষ্ট সময়ের নিছক কতিপয় আচার-অনুষ্ঠানে। উপাসনালয়ের বাইরে জীবনের বিস্তৃত অঙ্গনে ধর্মের কোন ভূমিকাই ছিলো না। ঘরে, পরিবারে, সমাজপরিসরে ও রাজ্যশাসনে মানুষ ছিলো সম্পূর্ণ স্বাধীন, বরং নিজস্ব চিন্তা ও বুদ্ধির, চাহিদা ও প্রবৃত্তির এবং সুবিধা ও স্বার্থের অধীন, যেমন হয়ে এসেছে সব যুগে সব দেশে সকল মুশরিক সমাজে।

মোটকথা পারস্যজাতি তাদের জীবন ও কর্মের ক্ষেত্রে এমন একটি পূর্ণাঙ্গ ও সর্বাঙ্গীন ধর্ম ও জীবন বিধান থেকে বঞ্চিত ছিলো যা আত্মিক ও নৈতিক সংশোধনে সক্ষম এবং প্রবৃত্তির অবদমন ও পুণ্যকর্মে উদ্বুদ্ধকরণে সফল; যা ব্যক্তি, পরিবার, সমাজ ও রাষ্ট্র-পরিচালনায় হতে পারে পথপ্রদর্শক; এবং যা পারে শাসকবর্গকে শোষণ-নিপীড়ন থেকে নিবৃত্ত করতে এবং শোষিত ও বঞ্চিতদের অধিকার ও প্রাপ্য নিশ্চিত করতে। কিন্তু আগেই যেমন বলা হয়েছে, পারস্যজাতির কাছে এমন কোন ধর্ম ও ধর্মব্যবস্থা ছিলো না। ফলে এই অগ্নিপূজক জাতিও হয়ে পড়েছিলো ধর্মহীন ও নীতি-নৈতিকতাহীন জনগোষ্ঠীর মত। আচরণে ও চরিত্রে তাদের মধ্যে কোনই পার্থক্য ছিলো না।

চীনঃ ধর্ম ও সমাজ

চীনের বিশাল ভূখণ্ডে এই শতকে তিনটি ধর্ম বিদ্যমান ছিলো। লাউতিশো-প্রবর্তিত ধর্ম, দার্শনিক কনফোসিয়াস-প্রবর্তিত ধর্ম এবং গৌতম বুদ্ধের ধর্ম। লাউতিশোর ধর্ম একে তো আত্মপ্রকাশের অল্পকাল পরেই মূর্তিপূজাকবলিত হয়ে পড়ে, তদুপরি তাতে বাস্তব জীবনের পরিবর্তে তাত্ত্বিকতার প্রাধান্য ছিলো অনেক বেশী। এ ধর্মের অনুসারীরা ছিলো জীবনবিমুখ ও কঠিন সংসারবিরাগী। সারা জীবন তারা বিবাহ ও নারীসংশ্রব পরিহার করে চলতো। সুতরাং একটি বিশুদ্ধ জীবন ও সমাজ এবং আদর্শ সরকার ও শাসনব্যবস্থার ভিত্তি হওয়ার কোন যোগ্যতা এ ধর্মের ছিলো না। ফলে ধর্মপ্রবর্তকের পরবর্তী অনুসারীরাই তার বিরোধিতা করে নতুন পথ ও ধর্মমত গ্রহণ করতে বাধ্য হয়েছিলো।

অন্যদিকে দার্শনিক কনফোশিয়াস তাত্ত্বিকতার পরিবর্তে বাস্তব জীবনকে অধিক গুরুত্ব দিতেন, তবে তাঁর শিক্ষা ও দর্শন আবর্তিত হয়েছে পার্থিব জীবনকে কেন্দ্র করে। জাগতিক, রাজনৈতিক ও প্রশাসনিক ব্যবস্থাপনা সম্পর্কেই শুধু কিছু দিকনির্দেশনা তাতে ছিলো। পরকালীন জীবনের সুস্পষ্ট কোন ধারণা সেখানে

[১] তারীখ-ই- ইরান, শাহীন ম্যাকারিয়স, ইরানী. পৃ. ২২১-২৪

ছিলো না। কোন একটা সময় কনফোসিয়াসের অনুসারীরা নির্দিষ্ট কোন উপাস্যে বিশ্বাসী ছিলো না, বরং তারা ইচ্ছেমত প্রকৃতির বিভিন্ন উপাদানের, পাথর, গাছ, বা নদনদীর পূজা করতো। তাতে না ছিলো ঈমানের নূর, না ছিলো বিশ্বাসের প্রত্যয়, আর না ছিলো ঐশী বিধানের কোন দিকনির্দেশ, বরং তা ছিলো নিছক একজন প্রাজ্ঞ দার্শনিকের প্রজ্ঞা এবং একজন অভিজ্ঞ মানুষের অভিজ্ঞতালব্ধ কিছু শিক্ষা, যা মানুষ যখন ইচ্ছা গ্রহণ এবং যখন ইচ্ছা বর্জন করতে পারতো। তাতে কোন বাধা ও বিধিনিষেধ ছিলো না।

বৌদ্ধ ধর্মের উত্থান ও পতন

পক্ষান্তরে বৌদ্ধধর্ম ছিলো অপেক্ষাকৃত উন্নত ও সংহত একটি ধর্ম এবং তার অনুসারীর সংখ্যা ছিলো বিপুল ।

বৌদ্ধধর্ম বহুপূর্বেই তার স্বভাবসরলতা ও প্রাণ-উচ্ছলতা হারিয়ে ফেলেছিলো। ব্রাহ্মণ-ধর্মের 'বিশ্বাস ও সংস্কার এবং দেবতা ও অবতার' গ্রহণ করে বৌদ্ধধর্ম আসলে নিজের অস্তিত্বই শেষ করে দিয়েছিলো। উগ্র ও হিংস্র ব্রাহ্মণবাদ বৌদ্ধ-ধর্মকে এমনভাবে গ্রাস করেছিলো যে, তার স্বকীয়তা ও বৈশিষ্ট্য বলতে কিছুই অবশিষ্ট ছিলো না। বস্তুত, বৌদ্ধধর্ম তখন হয়ে পড়েছিলো মূর্তিপূজারই ধর্ম। পৃথিবীর যেখানে বৌদ্ধধর্ম গিয়েছে, মূর্তি ও প্রতিমা সঙ্গে গিয়েছে। বুদ্ধের অনুসারীরা যত দেশে তাদের অধিবাস গড়েছে সেখানে বুদ্ধের অসংখ্য প্রতিমা ও ভাস্কর্য নির্মাণ করেছে। তাদের ধর্মীয় জীবন ও নাগরিক সভ্যতা বলতে গেলে প্রতিমাসংস্কৃতি দ্বারাই আচ্ছন্ন ছিলো, যা বৌদ্ধধর্মের উন্নতির যুগে বিকাশ লাভ করেছিলো।[১]

[১] বৌদ্ধধর্মের প্রাচীন রাজধানী তক্ষশীলার যাদুঘর পরিদর্শনে যারাই যায় তারা ঐসব মূর্তি ও প্রতিমা দেখে অবাক হয়ে পড়ে যা প্রাচীন বৌদ্ধ জনপদ থেকে প্রত্নতাত্ত্বিক খননের মাধ্যমে বের হয়েছে। এ থেকে পরিষ্কার বোঝা যায়, বৌদ্ধধর্ম ও সভ্যতা তখন হয়ে পড়েছিলো একান্তই প্রতিমাসর্বস্ব। ডক্টর গোস্তাভ লী বোন বৌদ্ধ ভবন-প্রাসাদ ও প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শনসমূহ অবলোকন করে এ সিদ্ধান্তেই উপনীত হয়েছেন। indian civilisation বা ভারতবর্ষের সভ্যতা (উর্দূ অনুবাদ, তামাদ্দুন-ই- হিন্দ) গ্রন্থে তিনি বলেন– বৌদ্ধধর্মের প্রকৃত স্বরূপ উদ্ঘাটন করার জন্য বৌদ্ধসভ্যতার প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শনসমূহ অধ্যয়ন করা আবশ্যক। বইয়ের পাতা থেকে আসল সত্য উদ্ধার করা কিছুতেই সম্ভব নয়। ইউরোপীয় লেখক-গবেষকগণ যে সব তথ্য ও তত্ত্ব আমাদের হযম করাতে চান তা প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শনাদির মাধ্যমে প্রমাণিত চিত্রের সম্পূর্ণ বিপরীত। তাদের দাবী হলো, বৌদ্ধধর্ম হচ্ছে নিরিশ্বরবাদী ধর্ম, অথচ প্রত্নতাত্ত্বিক খনন প্রমাণ করছে যে, বাস্তবে বৌদ্ধধর্ম হচ্ছে প্রতিমাপূজা ও বহুউপাস্যবাদী ধর্মের পুরোধা।

একটি ভারতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ে ভারতীয় সভ্যতার ইতিহাসের শিক্ষক প্রফেসর ঈশ্বর টোপা বলেন–

'বৌদ্ধধর্মের ছায়ায় যে ব্যবস্থা ও দর্শন প্রতিষ্ঠা লাভ করেছে তাতে ছিলো বহু অবতার ও মূর্তিপূজার ছড়াছড়ি। বৌদ্ধভ্রাতৃসঙ্ঘের পরিবেশ-পরিমণ্ডল বারবার পরিবর্তিত হয়েছে এবং তাতে নব নব বৈচিত্র্যের প্রকাশ ঘটেছে।'[১]

ভারতের শীর্ষস্থানীয় রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব পণ্ডিত জওয়াহির লাল নেহরুও বিষয়টি লক্ষ্য করেছেন। the discovery of india গ্রন্থে বৌদ্ধধর্মের বিকৃতি ও ক্রমাবনতি সম্পর্কে তিনি লিখেছেন–

'ব্রাহ্মণ্যবাদ গৌতম বুদ্ধকে ঈশ্বরের অবতাররূপে উপস্থাপন করেছিলো; এমনকি স্বয়ং বৌদ্ধধর্মও এ বিষয়ে ব্রাহ্মণ্যবাদের অনুগমন করেছিলো। আর বৌদ্ধভ্রাতৃসঙ্ঘ বিপুল সম্পদের অধিকারী হয়ে বিশেষ কতিপয় গোষ্ঠীর স্বার্থসিদ্ধির আখড়ায় পরিণত হয়েছিলো। সেখানে নিয়ম ও শৃঙ্খলার কোন অস্তিত্ব ছিলো না। উপাসনাব্যবস্থায় জাদু ও কুসংস্কারের ব্যাপক অনুপ্রবেশ ঘটেছিলো। ভারতবর্ষে সুদীর্ঘ একহাজার বছর পর্যন্ত উন্নতি ও সমৃদ্ধি লাভ করার পর একসময় বৌদ্ধ-ধর্মের অবনতি ও সঙ্কোচন শুরু হয়। তখন বৌদ্ধধর্মের যে রুগ্নদশা হয়েছিলো তার নিখুঁত চিত্র তুলে ধরেছেন (mrs rhys davids)। তিনি বলেন, (যেমন বিখ্যাত দার্শনিক স্যার রাধাকৃষ্ণ তার 'ভারতীয় দর্শন' গ্রন্থে এর বরাত দিয়ে লিখেছেন)

'এসকল রুগ্ন চিন্তাদর্শন গৌতম বুদ্ধের নৈতিক শিক্ষার উপর এমনভাবে ছায়া বিস্তার করেছিলো যে, একসময় তা বুদ্ধের অনুসারীদেরও দৃষ্টির আড়ালে চলে যায়। শেষে অবস্থা এমন হলো যে, একেকটি চিন্তা ও দর্শন আত্মপ্রকাশ করে এবং কিছুকালের জন্য মানুষের মনমস্তিষ্ক আচ্ছন্ন করে রাখে। তারপর ধীরে

[১] উর্দূভাষায় রচিত হিন্দুস্তানী তামাদ্দুন

ধীরে স্তিমিত হয়ে পড়ে এবং অন্য একটি মতবাদ বা চিন্তাধারা তার স্থান দখল করে নেয়। উন্মেষ, বিকাশ ও বিলোপের এ ধারা চলতেই থাকে, এমনকি মানবমস্তিষ্কের এসকল চটকদার উদ্ভাবন ধর্মের সমগ্র পরিমণ্ডলেই গভীর অন্ধকার হয়ে ছেয়ে যায়, আর ধর্মের প্রবর্তকের সহজ, সরল ও সমুচ্চ নৈতিক শিক্ষা নানা রকম সূক্ষ্ম জটিল দার্শনিক আলোচনার আড়ালে হারিয়ে যায়।[১]

সামগ্রিকভাবে বৌদ্ধধর্ম ও ব্রাহ্মণ্যবাদ দু'টোই অবক্ষয়ের শিকার হয়ে পড়ে এবং তাতে জঘন্যরকমের প্রথা ও কুসংস্কারের অনুপ্রবেশ ঘটে। অবশেষে বৌদ্ধ-ধর্ম ব্রাহ্মণ্যবাদে এমনভাবে একীভূত ও দ্রবীভূত হয়ে যায় যে, উভয়ের মধ্যে পার্থক্য করাই কঠিন হয়ে পড়ে।

বৌদ্ধধর্মের ইতিহাস ও গৌতম বুদ্ধের জীবনী যারা লিখেছেন তাদের কাছে বৌদ্ধধর্মে ঈশ্বরচিন্তা ও স্রষ্টায় বিশ্বাসের বিষয়টি শেষ পর্যন্ত সংশয় ও বিতর্কের বিষয়রূপেই রয়ে যায়। ফলে তাদের কেউ কেউ হতবাক হয়ে প্রশ্ন রেখেছেন, এমন একটি বিরাট ধর্ম নিছক কতিপয় নীতিশিক্ষার দুর্বল বুনিয়াদের উপর প্রতিষ্ঠিত হলো কীভাবে, যাতে ঈশ্বরচিন্তার কোন স্থান নেই! আত্মশুদ্ধি, প্রবৃত্তি-দমন, সদগুণ অর্জন এবং নির্বাণ লাভের বিভিন্নমুখী কিছু সাধনা ছাড়া আর কিছুই তো ছিলো না এ ধর্মের!

মোটকথা, চীন ও বৌদ্ধশাসিত অন্যান্য দেশের কাছে বিশ্বের জন্য কোন ধর্মীয় বার্তা ও দ্বীনী পায়গামই ছিলো না, যার আলোকে বিশ্ববাসী পাবে তাদের জীবনসমস্যার সমাধান এবং পাবে আল্লাহ পর্যন্ত পৌঁছার সরল পথের সন্ধান। চীন ছিলো সভ্য পৃথিবীর একেবারে পূর্বপ্রান্তে। নিজেদের ধর্মীয় ও জ্ঞানগত ঐতিহ্যের প্রতি তারা ছিলো অতিমাত্রায় রক্ষণশীল। তাদের মধ্যে না ছিলো নিজেদের সম্পদে সমৃদ্ধি অর্জনের আকাঙ্ক্ষা, না ছিলো অন্য জাতির সম্পদে সমৃদ্ধি সাধনের যোগ্যতা।

মধ্য এশিয়ার জাতিবর্গ

পূর্ব ও মধ্য এশিয়ার মঙ্গোল, তুর্কী, জাপানী ও অন্যান্য জাতিবর্গ হয় বিকৃত বৌদ্ধধর্মের অনুসারী ছিলো, না হয় বর্বর মূর্তিপূজায় লিপ্ত ছিলো। তাদের না ছিলো কোন জ্ঞানসম্পদ, না ছিলো কোন উন্নত শাসনব্যবস্থা। বলা যায়, তারা

[১] the discovery of india p. 201-203

অন্ধকার ও বর্বরতার যুগ থেকে আলো ও সভ্যতার যুগে উত্তরণের পথে একটি অন্তর্বর্তীকাল অতিক্রম করছিলো। পক্ষান্তরে কোন কোন জাতিগোষ্ঠী তো তখনো বেদুঈন জীবনের স্তরে এবং চিন্তার শৈশবেই রয়ে গিয়েছিলো।

তো যারা জীবন ও নগর সভ্যতার মাত্র প্রাথমিক স্তরে উপনীত হয়েছে এবং চিন্তা ও বুদ্ধিবৃত্তির ক্ষেত্রে শৈশব অতিক্রম করছে তারা কীভাবে বিশ্বের জাতিবর্গকে সততা ও সত্যের এবং বিশুদ্ধ জীবনযাপনের পথ দেখাবে; পাথেয় যোগাবে?!

ভারতবর্ষঃ ধর্ম, সমাজ ও নৈতিকতার বিচারে

ভারতবর্ষের ইতিহাস যারা লিখেছেন তারা এ বিষয়ে পূর্ণ একমত যে, খৃস্টীয় ষষ্ঠ শতকের গোড়া থেকে যে সময়কালের শুরু সেটাই ছিলো ধর্ম, সমাজ ও নৈতিকতার দিক থেকে ভারতবর্ষের সবচেয়ে অধঃপতিত যুগ, যা ইতিহাসের কোন স্তরে জ্ঞান ও সভ্যতা, নীতি ও নৈতিকতা এবং নানা সংস্কার-আন্দোলনের কেন্দ্ররূপে পরিচিত ছিলো। অধঃপতন ও সামাজিক অবক্ষয়, যা তখন সমগ্র পৃথিবীকে গ্রাস করে ফেলেছিলো, সে ক্ষেত্রে বিশাল ভারতবর্ষও চারপাশের অন্যান্য দেশ, জাতি ও জনগোষ্ঠীর সহযাত্রী ছিলো এবং এগিয়ে না থাকলেও কারো থেকে পিছিয়ে ছিলো না কোন ক্ষেত্রেই। সমগ্র মানবজনপদের উপর যে ঘোর অন্ধকার তখন থাবা বিস্তার করেছিলো, ভারতবর্ষ যেন সে অন্ধকারের পর্যাপ্ত অংশই নিজের বরাদ্দে টেনে এনেছিলো। পক্ষান্তরে কিছু কিছু ক্ষেত্রে তো পৃথিবীর এই বিশাল ভূখণ্ডটি ছিলো একক বৈশিষ্ট্যের দাবীদার। সেগুলোর সংক্ষিপ্ত আলোচনা এখানে আমরা এই তিনটি শিরোনামে তুলে ধরতে পারি– (ক) উপাস্য দেবদেবীর অকল্পনীয় সংখ্যাধিক্য (খ) লাগামহীন যৌন অরাজকতা (গ) বর্বর ও নিষ্ঠুর জাতিভেদ এবং সামাজিক শ্রেণীভাগ।

মাত্র তেত্রিশ কোটি দেবতা!

খৃস্টীয় ষষ্ঠ শতকে মূর্তিপূজা ভারতবর্ষে চরম সীমায় পৌঁছে গিয়েছিলো। বেদ গ্রন্থে দেবতাদের সংখ্যা ছিলো মাত্র তেত্রিশ, যার অকল্পনীয় সংখ্যাস্ফিতি এই শতকে পৌঁছে গিয়েছিলো তেত্রিশ কোটিতে। কল্পনা করুন, তেত্রিশ থেকে তেত্রিশ কোটি! যে কোন সুন্দর, আকর্ষণীয়, অভিনব ও বিদঘুটে বস্তু এবং জীবনের প্রয়োজনীয় যে কোন উপকরণ উপাস্য দেবতার মর্যাদা লাভ করতো। এভাবে মূর্তি ও প্রতিমা এবং দেবী ও দেবতার সংখ্যা সকল সীমা ছাড়িয়ে যায়।

তাদের উপাস্যের তালিকায় যেমন ছিলো বিভিন্ন উদ্ভিদ ও বৃক্ষলতা তেমনি ছিলো অসংখ্য জড়বস্তু ও খনিজ পদার্থ; ছিলো ছোট বড় হাজারো পশু-প্রাণী, এমনকি লিঙ্গপূজা পর্যন্ত বাদ পড়েনি।

পাহাড়-পর্বতও উপাস্যরূপে বরিত হয়েছে এই সুবাদে যে, তাদের কোন কোন দেবতা তাতে অধিষ্ঠান গ্রহণ করেছেন। আর গঙ্গা হলো তাদের মা, যা স্নানকারীর সমস্ত পাপ মোচন করে। কারণ গঙ্গা উৎসারিত হয়েছে 'মহাদেব'-এর মাথার জট থেকে।

'গোমাতা'রও তারা পূজা করে, এমনকি গোবর ও গোচনা হচ্ছে তাদের দৃষ্টিতে পরম পবিত্র পদার্থ। এছাড়া তাদের উপাস্যের তালিকায় রয়েছে কতিপয় ঐতিহাসিক ও কাল্পনিক ব্যক্তিত্ব, হিন্দুবিশ্বাস মতে বিভিন্ন অতিপ্রাকৃতিক ঘটনায় স্বয়ং ভগবান তাদের মাঝে অধিষ্ঠান গ্রহণ করেছেন। এভাবে এই সুপ্রাচীন ধর্ম কিছু কল্পকথা,অলীক কাহিনী, আজগুবী চিন্তাবিশ্বাস ও পূজা-অর্চনার সমাহারে পরিণত হয়েছে, যার স্বপক্ষে না আল্লাহ কোন প্রমাণ অবতীর্ণ করেছেন, না কোন যুগের জ্ঞান ও যুক্তি তা সমর্থন করেছে। ডক্টর গোস্তাভ লী বোন 'ভারতবর্ষের সভ্যতা' গ্রন্থে লিখেছেন–

'পৃথিবীর অন্যান্য জাতির মধ্যে হিন্দুজাতি এদিক থেকে ব্যতিক্রম যে, উপাসনার জন্য তাদের কোন না কোন বাহ্যিক আকৃতির উপস্থিতি অপরিহার্য। যদিও বিভিন্ন যুগে ধর্মসংস্কারকগণ হিন্দুধর্মে একত্ববাদের অস্তিত্ব প্রমাণ করতে চেয়েছেন, কিন্তু তা ছিলো নিষ্ফল প্রচেষ্টা। বৈদিক যুগের হিন্দু হোক, কিংবা এ যুগের, তারা প্রকৃতির ছোট বড় সবকিছুরই পূজা করে থাকে। যা কিছু তাদের বুদ্ধির অগম্য এবং যা কিছু তাদের নিয়ন্ত্রণাতীত (এবং যা কিছু কোন না কোনভাবে তাদের আকৃষ্ট করে) সেগুলোই তাদের দৃষ্টিতে উপাসনার উপযুক্ত। হিন্দু ব্রাহ্মণ ও দার্শনিকদের এমন সব প্রচেষ্টাই ব্যর্থ হয়েছে যা তারা একত্ববাদ প্রতিষ্ঠার জন্য ব্যয় করেছেন, এমনকি উপাস্য দেবতার সংখ্যা তিনের মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখার প্রচেষ্টাও পণ্ডশ্রমে পর্যবসিত হয়েছে। সাধারণ মানুষ তাদের শিক্ষা শুনেছে, হয়ত গ্রহণও করেছে, কিন্তু কার্যত এই তিন উপাস্য সংখ্যায় বেড়েই চলেছে এবং প্রকৃতির প্রতিটি বস্তুতে ও শক্তিতে তারা কোন না কোন উপাস্যকে দেখতে পেয়েছে।'[১]

---

[১] উর্দূ অনুবাদ, তামাদ্দুন-ই- হিন্দ, পৃ. ৪৪০-৪১

আমরা যে যুগের আলোচনা করছি তখন মূর্তি ও প্রতিমানির্মাণশিল্প অভাবনীয় উন্নতি লাভ করেছিলো, আর ষষ্ঠ ও সপ্তম শতকে তার চরমোৎকর্ষ ঘটেছিলো এবং অতীতের যে কোন সময়কে ছাড়িয়ে গিয়েছিলো। রাজা থেকে প্রজা, সমাজের সর্বস্তরেই ছিলো মূর্তিপূজার অপ্রতিহত প্রভাব, এমনকি বৌদ্ধ ও জৈন ধর্মও মূর্তিপূজা অস্বীকার করার উপায় খুঁজে পায়নি, বরং ধর্মের অস্তিত্ব রক্ষা ও প্রচার-প্রসারের স্বার্থে তাদেরও এর আশ্রয় নিতে হয়েছে। মূর্তিপূজা ও প্রতিমা-শিল্পের প্রভাব ও উৎকর্ষ তখন কোন্ পর্যায়ে ছিলো তার কিছুটা ধারণা পাওয়া যায় প্রখ্যাত চৈনিক পরিব্রাজক হিউয়েন শাঙ-এর বিবরণ থেকে, যিনি ৬৩০ থেকে ৪৪ খৃস্টাব্দের মধ্যবর্তী সময়ে ভারতবর্ষ পরিভ্রমণ করেছেন। রাজা হর্ষবর্ধন (৬০৬ –৬৪ খৃঃ) যে বিরাট রাজকীয় উৎসব অনুষ্ঠান করেছিলেন তার বিবরণ দিতে গিয়ে পরিব্রাজক হিউয়েন শাঙ লিখেছেন–

'সম্রাট হর্ষবর্ধন কনৌজে এক বিরাট উৎসবসভার আয়োজন করলেন, তাতে ভারতবর্ষের বিভিন্ন ধর্মের বিপুল সংখ্যক পুরোহিত ও ধর্মীয় পণ্ডিত অংশগ্রহণ করেন। সম্রাট হর্ষবর্ধন গৌতম বুদ্ধের একটি স্বর্ণমূর্তি তৈরী করে পঞ্চাশ হাত উঁচু এক বিশাল স্তম্ভের উপর তা স্থাপন করেন এবং অপেক্ষাকৃত ছোট একটি মূর্তি নিয়ে জাঁকজমকপূর্ণ শোভাযাত্রায় বের হন। সম্রাট হর্ষবর্ধন স্বয়ং বুদ্ধমূর্তির পাশে অবস্থান গ্রহণ করে ছত্রদণ্ড বহন করেন। আর সম্রাটের মিত্র রাজা কামরূপ (ঝালর দুলিয়ে) 'মাছি-নিবারণ'-এর দায়িত্ব পালন করেন।'

সম্রাট হর্ষবর্ধনের পরিবার ও সভাসদবর্গের ধর্মপরিচয় সম্পর্কে হিউয়েন শাঙ লিখেছেন–

তাদের কেউ ছিলো শিবের পূজারী, কেউ বৌদ্ধধর্মের অনুসারী; কেউ সূর্যদেবতার পূজা করতো, কেউ করতো বিষ্ণুপূজা। প্রত্যেকের স্বাধীনতা ছিলো নির্দিষ্ট কোন একটি দেবতার, কিংবা সর্বদেবতার উপাসনা করার।

ভারতের লজ্জা, অবাধ যৌনতা

প্রাচীনকাল থেকেই যৌনতা ও কামকেলি ছিলো ভারতবর্ষের ধর্ম ও সমাজ-সংস্কৃতির অন্যতম বৈশিষ্ট্য। সম্ভবত আর কোন দেশ, ধর্ম ও সমাজে যৌনতা ও কামচর্চার এমন ছড়াছড়ি নেই যেমনটি রয়েছে ভারতবর্ষের ধর্ম ও সমাজ-সংস্কৃতির গভীরে। ব্রহ্মার বিভিন্ন গুণের অভিপ্রকাশ, সত্যযুগের ঘটনা-মহাঘটনা এবং ব্রহ্মাণ্ডের অস্তিত্বরহস্য সম্পর্কে যেসব কাহিনী হিন্দুধর্মের পবিত্র গ্রন্থগুলোতে

বর্ণিত এবং হিন্দুসমাজে আলোচিত হয়ে আসছে, তদুপরি দেব-দেবী এবং দেবতা ও মানবীদের কামলীলার যে অশ্লীল বিবরণ রয়েছে তাতে যে কেউ কানে আঙ্গুল দেবে এবং লজ্জায় মাথা নীচু করতে বাধ্য হবে। ধর্মানুরাগী মানুষ যখন ভক্তি-উচ্ছ্বাসের সঙ্গে এসবের চর্চা করে তখন অবচেতনভাবে তাদের মনমানস ও আবেগ-অনুভূতিতে এর কী প্রভাব-প্রতিক্রিয়া হতে পারে তা তো বলাই বাহুল্য। আরো চমকপ্রদ বিষয় এই যে, হিন্দুধর্মের প্রধান উপাস্য শিবের বীভৎস লিঙ্গমূর্তি স্থাপন করা হয় এবং নারী-পুরুষ ও যুবক-যুবতী একত্রে শিবলিঙ্গের পূজা করে। হিন্দুধর্মে লিঙ্গপূজার গুরুত্ব এবং পূজারীদের লিঙ্গভক্তি সম্পর্কে আলোচনাপ্রসঙ্গে ডক্টর গোস্তাভ লী বোন বলেন–

'প্রতিমা ও প্রতীক এবং মূর্তি ও স্থূল আকৃতির প্রতি হিন্দুদের অনুরাগ সীমাহীন। ধর্ম তাদের যাই হোক না কেন, আচার-অনুষ্ঠান তারা নিষ্ঠার সাথে পালন করে থাকে। তাদের মন্দির ও পূজাঘর অসংখ্য উপাস্য বস্তুতে পরিপূর্ণ। সেগুলোর মধ্যে অগ্রগণ্য হলো লিঙ্গ ও যোনি, যা সঙ্গম ও যৌনতার ইঙ্গিতবহ। অশোক স্তম্ভকেও সাধারণ হিন্দুরা লিঙ্গপ্রতীক বলে বিশ্বাস করে। যে কোন শঙ্কু ও ত্রিকোণ আকৃতিই তাদের কাছে পূজ্য ও ভক্তিযোগ্য।'[১]

কোন কোন ঐতিহাসিকের বর্ণনা মতে কতিপয় হিন্দু সম্প্রদায়ের পুরুষেরা নগ্ন নারীদেহের এবং নারীরা নগ্নপুরুষদেহের পূজা করতো।[২] মন্দির এবং উপাসনালয়ের সেবায়েত, পুরোহিত ও পাণ্ডাদের লাম্পট্য ছিলো এমনই চরমে যে, দেবতার সেবাদাসীদের তারা যৌনদাসীরূপে ব্যবহার করতো; এমনকি মন্দিরে আগত পূজারিণীদের সতিত্বসম্পদও তাদের দ্বারা লুণ্ঠিত হতো। বহু উপাসনালয় শাব্দিক অর্থেই ছিলো পাপাচারের আখড়া। লম্পট ও পশুরা তাদের লাম্পট্য ও পাশবিকতা চরিতার্থ করার জন্য সেখানে সুযোগের সন্ধানে থাকতো এবং বিভিন্নভাবে তাদের যৌনলালসা মেটাতো।

এই যদি হয় মন্দির ও দেবালয়ের অবস্থা, যা গড়েই উঠেছে উপাসনা ও পূজা-অর্চনার উদ্দেশ্যে, তাহলে রাজার রাজপ্রাসাদ ও ধনীর রঙ্গমহলের চালচিত্র কী হতে পারে?! সেখানে তো নগ্নতা ও অশ্লীলতার রীতিমত মহড়া চলতো! নাচগানের জলসায় মদের নেশায় সবাই যখন চুর তখন লজ্জা ও লোকলজ্জার

---

[১] তামাদ্দুন-ই- হিন্দ, উর্দু তরজমা, পৃ.৪৪১
[২] দয়ানন্দ সরস্বতী, সত্যার্থ প্রকাশ. পৃ. ৩৪৪

তো কোন বালাই থাকতো না। সম্ভ্রম ও হায়া-শরম হয়ত নিজেই তখন মুখ লুকোবার জায়গা খুঁজে পেতো না। এভাবে সমগ্র দেশ ভেসে গিয়েছিলো পাপাচার ও অবাধ যৌনতার তোড়ে এবং উভয় লিঙ্গের নৈতিকতা ও চরিত্রে নেমে এসেছিলো বিরাট ধ্বস।

এই ভোগলালসা ও ইন্দ্রীয় পূজার সম্পূর্ণ সমান্তরালে আধ্যাত্মিক সাধনা ও যোগ-তপস্যার ধারাও অব্যাহত ছিলো। তাতেও ছিলো বাড়াবাড়ি ও সীমা-লঙ্ঘনের চরম প্রবণতা। মোটকথা, দেশ, ধর্ম ও সমাজ এ দুই প্রান্তিকতায় এমনভাবে বিভক্ত ছিলো যে, সুস্থ চিন্তা ও মধ্যপন্থার কোথাও কোন অবকাশ ছিলো না। কতিপয় ব্যক্তি ও সাধু-সন্ন্যাসী আধ্যাত্মিক সাধনা ও আত্মদমনের কঠোর তপস্যায় নিমগ্ন ছিলো, পক্ষান্তরে সাধারণ জনপদ ভেসে চলেছিলো প্রবৃত্তিপূজা ও ভোগলালসার প্রবল স্রোতে।

নিষ্ঠুর শ্রেণীভেদ ও বর্ণপ্রথা

পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে ও জনপদে শ্রেণীভেদ ও বর্ণপ্রথা অবশ্যই ছিলো, কিন্তু ভারতবর্ষের মত আর কোথাও এমন কঠোর, নিষ্ঠুর বর্ণপ্রথা ও শ্রেণীভেদ ছিলো না। বস্তুত এটা ছিলো মানবতার প্রতি চরম অবমাননা, যা ভারতবর্ষে শুধু সামাজিকভাবেই নয়, ধর্মীয়ভাবেও স্বীকৃত ছিলো, যা হাজার হাজার বছর ধরে চলে আসছে, এখনো চলছে। ভারতীয় সমাজের এই জাতিভেদ এবং পেশাগত বিভক্তি ও শৃঙ্খল-বন্ধনের সূচনা হয়েছিলো বৈদিক যুগের শেষভাগে, একই পেশা ও কর্মে বংশপরম্পরায় আবদ্ধ থাকার বাধ্যবাধকতা থেকে। বহিরাগত আর্যরা তাদের বংশমর্যাদা ও জাতকৌলীন্য অক্ষুণ্ন রাখার এবং বিজেতারূপে নিজেদের তাপ ও প্রতাপ বজায় রাখার স্বার্থে এই শ্রেণীভেদ ও বর্ণপ্রথা অপরিহার্য মনে করেছিলো। ডক্টর গোস্তাভ লী বোন বলেন–

'বৈদিক যুগের শেষভাগেই আমরা দেখতে পেলাম, বিভিন্ন পেশা ও জীবিকা মোটামুটি পৈত্রিক রূপ ধারণ করে চলেছে এবং শ্রেণীভেদপ্রথার গোড়াপত্তন হয়ে গিয়েছে, যদিও তখনো তা পূর্ণাঙ্গ কাঠামো লাভ করেনি।

বৈদিক আর্যদের মধ্যে এ ধারণা পাকাপোক্ত হয়ে গিয়েছিলো যে, বিজিত জাতি ও জনগোষ্ঠীর মিশ্রণ থেকে নিজেদের সনাতন বংশধারাকে রক্ষা করতে হবে। পরবর্তী পর্যায়ে এই সংখ্যালঘু বিজেতা সম্প্রদায় যখন পূর্বদিকে অগ্রসর হলো এবং দেশীয় জনগোষ্ঠীর এক বিরাট অংশের উপর আধিপত্য বিস্তার করে

ফেললো তখন এর প্রয়োজনীয়তা আরো তীব্র হলো এবং বিধানপ্রণেতাদের জন্য এটা বিবেচনায় আনা জরুরী হয়ে পড়লো।

বংশধারা রক্ষা ও বিলুপ্তির রহস্য ততদিনে তারা বুঝে গিয়েছিলো। ভালো-ভাবেই তাদের জানা হয়ে গিয়েছিলো যে, সংখ্যালঘু বিজেতা জাতি নিজেদের বংশস্বাতন্ত্র্য যদি রক্ষা না করে তাহলে খুব দ্রুত তারা বিজিত জনগোষ্ঠীর মধ্যে বিলীন হয়ে যায়, নামচিহ্ন পর্যন্ত আর বাকি থাকে না।[১]

তবে এই বর্ণপ্রথাকে সুবিন্যস্ত ও পূর্ণাঙ্গ বিধানরূপে প্রবর্তনের কৃতিত্ব এককভাবে মনুজীর। যিশুখৃস্টের জন্মের তিনশ বছর পূর্বে ভারতবর্ষে যখন ব্রাহ্মণ্য সভ্যতার পূর্ণ উত্থান ঘটে তখন ঐ সভ্যতার পৃষ্ঠপোষকতার উদ্দেশ্যে মনুজী ভারতীয় সমাজের জন্য একটি নতুন বিধান প্রবর্তন করেন এবং তাতে নাগরিক ও রাজনৈতিক নিয়মবিধি তৈরী করেন, যা সমগ্র দেশ ও জনপদ মেনে নেয়। ফলে ভারতীয় সমাজ-সভ্যতায় সেটা সার্বজনীন আইন ও ধর্মীয় বিধানরূপে স্বীকৃতি লাভ করে। এটাই বর্তমানে মনুশাস্ত্র বা মনু সংহিতারূপে পরিচিত।

মনুসংহিতায় দেশের জনগোষ্ঠীকে চারটি পৃথক শ্রেণীতে ভাগ করা হয়েছে। যথা–

(১) ব্রাহ্মণ, অর্থাৎ ধর্মীয় পুরোহিত শ্রেণী

(২) ক্ষত্রিয়, অর্থাৎ যোদ্ধাশ্রেণী

(৩) বৈশ্য, অর্থাৎ কৃষি ও বাণিজ্যজীবী শ্রেণী

(৪) শূদ্র, অর্থাৎ সেবকশ্রেণী, যাদের নির্ধারিত কোন পেশা নেই; যাবতীয় নিম্নশ্রেণীর পেশার মাধ্যমে উচ্চবর্ণের সেবা করে যাওয়াই যাদের একমাত্র কাজ।

মুনসংহিতায় বলা হয়েছে–

সংসারের মঙ্গলার্থে ব্রহ্মা ব্রাহ্মণকে আপন মুখ হতে এবং ক্ষত্রিয়কে আপন বাহু হতে এবং বৈশ্যকে আপন উরু হতে এবং শূদ্রকে আপন পদযুগল হতে সৃষ্টি করেছেন। সংসারকে রক্ষাকল্পে ব্রহ্মা স্বয়ং তাদের মধ্যে দায়িত্ব ও কর্মবন্টন করে দিয়েছেন। ব্রাহ্মণের দায়িত্ব হলো বেদ শিক্ষাদান, দেবতাদের উদ্দেশ্যে নৈবেদ্য প্রদান, দান গ্রহণ ও প্রসাদ বিতরণ।

[১] les civilisations del' inde . by dr. gustav le bon p. 265 (উক্ত বইয়ের উর্দূ তরজমা তামাদ্দুন-ই- হিন্দ, মুতারজিম, সাইয়েদ আলী বেলগ্রামী, পৃ. ৩১১)

ক্ষত্রিয়ের কর্তব্য হলো যোদ্ধাধর্ম পালন, অর্থাৎ মানুষকে যাবতীয় উপদ্রব ও অরাজকতা হতে রক্ষা করা, বেদ অধ্যয়ন করা, দান প্রদান, নৈবেদ্য অর্পণ এবং কামসংযম। বৈশ্যের কর্তব্য হলো গবাদি পশু পালন, বাণিজ্য ও কৃষিকাজ, বেদ পাঠ, দান প্রদান ও নৈবদ্য অর্পণ। আর শূদ্রকে ব্রহ্মা একটিমাত্র আদেশ করেছেন, অর্থাৎ উপরের সম্প্রদায়ত্রয়ের সেবায় আত্মনিয়োগ এবং সর্ব-উপায়ে তাদের সন্তুষ্টি অর্জন।[১]

ব্রাহ্মণসম্প্রদায়, মর্যাদা ও বৈশিষ্ট্য

মনুসংহিতার বর্ণবিধান ব্রাহ্মণকে এত বেশী অধিকার ও বৈশিষ্ট্য প্রদান করেছে যে, তারা প্রায় দেবমর্যাদায় অভিষিক্ত হয়ে পড়েছে। মনুসংহিতার মতে–

ব্রাহ্মণসম্প্রদায় হলো ব্রহ্মার প্রিয়পাত্র এবং মানবকুলের সম্রাট। তাদের কাজ শুধু ধর্মের রক্ষণাবেক্ষণ। যেহেতু তারাই হলো সৃষ্টির সেরা এবং জগত-অধিপতি সেহেতু জগতের সকল সম্পদে তাদের একচ্ছত্র অধিকার। ব্রাহ্মণ শূদ্রদাসদের যাবতীয় সম্পদ ইচ্ছামত দখল করতে পারে, এতে কোন পাপ নেই। কেননা দাসের কোন মালিকানাস্বত্ব নেই; তার সম্পদের স্বত্ব আপন মনিবের।[২]

ঋগবেদ যে ব্রাহ্মণের মুখস্থ সে পাপমুক্ত ব্যক্তি, যদিও পাপরাশি দ্বারা সে ত্রিলোক নাশ করে ফেলে। এমনকি কঠিনতম অভাব ও প্রয়োজনের মুহূর্তেও রাজার অধিকার নেই ব্রাহ্মণ থেকে কোনরূপ রাজস্ব বা কর গ্রহণ করার, আর রাজার কর্তব্য হলো রাজ্যের ব্রাহ্মণদের ক্ষুধার কষ্ট থেকে রক্ষা করা এবং অনাহারে মরতে না দেয়া। ব্রাহ্মণ যদি মৃত্যুদণ্ডযোগ্য অপরাধ করে তবে তার শাস্তি হবে শুধু মস্তক মুণ্ডন করা, পক্ষান্তরে অন্যদের শাস্তি হবে যথারীতি মৃত্যুদণ্ড।[৩]

ক্ষত্রিয়সম্প্রদায় যদিও অপর দু'টি বর্ণ বৈশ্য ও শূদ্র থেকে শ্রেষ্ঠ, কিন্তু তাদের অবস্থান ব্রাহ্মণ থেকে অনেক নীচে। মনু বলেন– দশবছর বয়স্ক ব্রাহ্মণ বালক একজন শতায়ু ক্ষত্রিয় থেকে উত্তম, যেমন পিতা সন্তান থেকে উত্তম।[৪]

[১] মনুসংহিতা প্রথম অধ্যায়

[২] মনুসংহিতা, প্রথম অধ্যায় এবং অষ্টম অধ্যায়

[৩] মনুসংহিতা, নবম অধ্যায়, দ্বিতীয় অধ্যায়

[৪] মনুসংহিতা, একাদশ অধ্যায়

মনুসংহিতার বিধান মতে ক্ষত্রিয় সম্প্রদায় যে দায়িত্ব ও মর্যাদা লাভ করেছে তা হলো, যেহেতু তারা বেদ-জ্ঞান তারা নিজেদের চিন্তা ও মস্তিষ্ককে পরিপুষ্ট করেছে সেহেতু তারা দেশের রাজা হতে পারে। শাসক, প্রশাসক, বিচারক ও সেনাপতি হতে পারে। ক্ষত্রিয় সম্প্রদায় হতে রাজা মনোনীত হলে তাকে অমর্যাদা করার অধিকার নেই, হোক সে শিশু। এক্ষেত্রে বলা হবে যে, তিনি মানব, তবে রাজার মানবসত্তায় ভগবানের সত্তা মূর্ত হয়েছে।

ক্ষত্রিয়, এমনকি শান্তিকালেও সৈনিক ও যোদ্ধারূপে জীবনযাপন করবে, আর তার কর্তব্য হবে প্রথম ডাকের সঙ্গে সঙ্গে উপস্থিত হওয়া। পক্ষান্তরে রাজার কর্তব্য হবে অস্ত্রশস্ত্র ও যুদ্ধের যাবতীয় সরঞ্জাম সরবরাহ করা।[১]

বৈশ্যসম্প্রদায়ের দায়িত্ব ও কর্তব্য সম্পর্কে মনুসংহিতায় বলা হয়েছে, বৈশ্যের কর্তব্য হলো আপন সম্প্রদায়ের কোন নারীকে বিবাহ করা। আপন পেশায় যত্নবান হওয়া এবং স্থায়ীভাবে গবাদিপশু পালন করা। আর যারা বাণিজ্য করে তাদের কর্তব্য হলো বাণিজ্যের বিধিবিধান এবং সুদব্যবস্থা উত্তমরূপে জানা, তদ্রূপ কর্তব্য হলো কৃষিজ্ঞান অর্জন করা এবং মাপ ও পরিমাপপদ্ধতি সম্পর্কে পূর্ণ অবগতি অর্জন করা। আরো কর্তব্য হলো শ্রমিকের মজুরি, মানুষের ভাষা এবং পণ্যসংরক্ষণ ও ক্রয়-বিক্রয়সংক্রান্ত যাবতীয় বিষয় জানা।[২]

অভিশপ্ত শূদ্রসম্প্রদায়

মনুপ্রবর্তিত সামাজিক ও ধর্মীয় ব্যবস্থামতে ভারতীয় হিন্দুসমাজে শূদ্র বা অচ্ছুতই হলো সর্বনিম্ন সম্প্রদায়। ইতর পশুর চেয়েও অধম, সমাজে তাদের অবস্থান ও মর্যাদা। মনুশাস্ত্রের সুস্পষ্ট ঘোষণা–

শূদ্রের জন্য এটাই পরম সৌভাগ্য যে, তারা ব্রাহ্মণসেবায় নিয়োজিত হতে পারে: এছাড়া তাদের আর কোন পুণ্য ও প্রাপ্তি নেই। অর্থ উপার্জন ও সম্পদসঞ্চয়ের কোন অধিকার শূদ্রের নেই। কারণ তা ব্রাহ্মণের মনঃকষ্টের কারণ। শূদ্র যদি কোন ব্রাহ্মণের উপর হাত তোলে, বা ক্রোধান্ধ হয়ে লাথি মারে তাহলে তার হাত ও পা কেটে ফেলা হবে। আর যদি কোন পাপিষ্ঠ শূদ্র কোন ব্রাহ্মণের সমকক্ষে বসার ধৃষ্টতা প্রদর্শন করে তাহলে শাসকের অবশ্যকর্তব্য হবে তার পশ্চাদ্দেশে

---

[১] hinduism, by louis. p.p. 34-35
[২] hinduism, p.p. 34-35

গরম লোহার দাগ দিয়ে দেশছাড়া করা। আর কোন ব্রাহ্মণকে স্পর্শ করা, বা তাকে কটু কথা বলার সাজা হলো জিহ্বা ছিঁড়ে ফেলা। আর যদি দাবী করে, ব্রাহ্মণকে সে শিক্ষা দিতে পারে তাহলে তার মুখে তপ্ত তেল ঢেলে দাও। কুকুর, বেড়াল, কাক, পেঁচা এবং কোন শূদ্রকে হত্যা করার প্রায়শ্চিত্ত একই সমান।[১]

হিন্দুসমাজে নারীর মর্যাদা

ব্রাহ্মণদের সমাজ-সভ্যতায় নারীজাতির সেই সম্মান ও মর্যাদা ছিলো না, যা বৈদিক যুগে ছিলো। ডক্টর লী বোন-এর মতে মনুশাস্ত্রে স্ত্রীজাতিকে দুর্বল ও বিশ্বাসঘাতিনী ভাবা হয়েছে এবং ঘৃণা ও অবজ্ঞার ভাষায় তার আলোচনা করা হয়েছে। বস্তুত মনুযুগের হিন্দুসমাজে নারীর মর্যাদা দাসীর চেয়ে বেশী কিছু ছিলো না। জুয়া খেলায় পুরুষ স্ত্রীকে বাজি ধরতো এবং হেরে গিয়ে অন্যের হাতে তুলে দিতো। বিধবাদের জীবন ছিলো মৃত্যুর চেয়ে বিভীষিকাপূর্ণ। তার দ্বিতীয় বিবাহের অধিকার ছিলো না। সমাজ ও পরিবারের লাঞ্ছনা-গঞ্জনাই ছিলো তার ভাগ্যলিপি। মৃত স্বামীর গৃহে দাসিবৃত্তি করেই তাকে জীবন ধারণ করতে হতো। অনেক ক্ষেত্রে বিধবা নারী (স্বেচ্ছায়, কিংবা জবরদস্তি) স্বামীর জ্বলন্ত চিতায় আত্মাহুতি দিয়ে জীবনের অভিশাপ থেকে মুক্তি লাভ করতো, যার নাম ছিলো সতীদাহ। ডক্টর লী বোন বলেন, 'স্বামীর চিতায় বিধবাকে জ্বালানোর বিধান মনুশাস্ত্রে যদিও নেই, তথাপি মনে হয় এ প্রথা ভারতবর্ষে ব্যাপক ছিলো। কেননা গ্রীক ঐতিহাসিকগণ এর উল্লেখ করেছেন।'[২]

এভাবেই যে উর্বর ভারতভূমি ছিলো মেধায়, সম্পদে পরিপূর্ণ, একসময় তাই হয়ে পড়েছিলো মূর্খতার অন্ধকারে নিমজ্জিত এবং অভ্যন্তরীণ গোলযোগ, দারিদ্র্য ও নৈরাজ্যের শিকার। যে জাতি সম্পর্কে কোন কোন আরব ঐতিহাসিক লিখেছেন, 'জ্ঞান ও প্রজ্ঞার আধার; ন্যায়, সুশাসন, বিচক্ষণতা ও সুশীল চিন্তার

---

[১] মনুসংহিতা, ১১, ১০, ৮ অধ্যায়
[২] les civilisations del' inde . by dr. gustav le bon (উক্ত বইয়ের উর্দূ তরজমা তামাদ্দুন-ই- হিন্দ, মুতারজিম, সাইয়েদ আলী বেলগ্রামী, পৃ. ২৩৬-৩৮)
সতীদাহ ছিলো ভারতে উচ্চবর্ণ ও অভিজাত শ্রেনীর একটি মর্যাদাপূর্ণ সমাজ-প্রথা, যা স্ত্রীর জন্য তার শ্রদ্ধাভক্তি এবং সতিত্ব ও মর্যাদার প্রতি বিশ্বস্ততার প্রমাণ। ফরাসী পর্যটক ড. বার্ণিয়ার-এর মতে মুসলিম শাসনের প্রভাবে এবং মুসলিম শাসকদের হস্তক্ষেপের ফলে এই বর্বর ও নিষ্ঠুর প্রথা যথেষ্ট কমে এসেছিলো, আর শেষ দিকে এসে বৃটিশরা তা সম্পূর্ণরূপে নিষিদ্ধ করে দেয়।

উৎস'[১] সে জাতিই দীর্ঘকাল আসমানী সত্যধর্মের শিক্ষা হতে বঞ্চিত থাকার কারণে বিভিন্ন আচার-অনাচার ও কুসংস্কারের বেড়াজালে আবদ্ধ হয়ে পড়ে। নিকৃষ্টতম মূর্তিপূজার পাশাপাশি ছিলো প্রবৃত্তিপূজার জয়জয়কার। সর্বোপরি ধর্মের নামে এমন বর্বরতা, নিষ্ঠুরতা ও শ্রেণীবৈষম্য বিদ্যমান ছিলো, যার নযির পৃথিবীর অন্য জাতির ইতিহাসে নেই।

আরবজাতিঃ স্বভাব ও বৈশিষ্ট্য

জাহেলিয়াতের যুগে বিশ্বের সমস্ত জাতির মধ্যে আরবরা ছিলো অনন্য কিছু স্বভাবগুণ ও প্রকৃতিপ্রদত্ত যোগ্যতার অধিকারী। এমন কিছু চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যও তাদের ছিলো, যা সমকালীন অন্যকোন জাতির মধ্যে ছিলো না। যেমন ভাষাসৌন্দর্য ও কাব্যপ্রতিভা, স্বাধীনতা ও আত্মমর্যাদা, সাহসিকতা ও বীরত্ব, বিশ্বাসের প্রতি নিঃশর্ত আনুগত্য ও প্রবল উদ্দীপনা, বদান্যতা ও অতিথি-সেবা, স্পষ্ট ভাষণ ও ইচ্ছার দৃঢ়তা, অনাড়ম্বরতা ও কষ্টসহিষ্ণুতা, আমানত ও প্রতিশ্রুতি রক্ষায় বিশ্বস্ততা, সামাজিক সমতা ও সম্ভ্রম রক্ষা এবং প্রায় অবিশ্বাস্য স্মৃতিশক্তি। কিন্তু এত সব বৈশিষ্ট্য ও গুণবৈচিত্র্য সত্ত্বেও একসময় তারা ভীষণভাবে ধর্মীয় ও নৈতিক অবক্ষয়ের শিকার হয়ে পড়েছিলো। কারণ একদিকে তারা নবুওয়তের আসমানি শিক্ষা থেকে অনেক দূরে ছিলো, অন্যদিকে জগত-সভ্যতা থেকে বিচ্ছিন্ন অবস্থায় বহু শতাব্দী যাবৎ এক আরব উপদ্বীপেই আবদ্ধ ছিলো। তদুপরি তারা বাপ-দাদার ধর্ম এবং জাতীয় আচার-প্রথা ও কুসংস্কারকেই যুগ যুগ ধরে আঁকড়ে ধরেছিলো।

খৃস্টীয় ষষ্ঠ শতকে তারা অবক্ষয় ও অধঃপতনের এমন চূড়ান্ত সীমায় পৌঁছে গিয়েছিলো, যার নযির সমসাময়িক পৃথিবীতে খুব একটা ছিলো না। মূর্তিপূজা তার যাবতীয় বীভৎসরূপ নিয়ে শিকড় গেড়ে বসেছিলো। বিভিন্ন নৈতিক ও সামাজিক ব্যাধি তাদেরকে ভিতর থেকে খোকলা করে ফেলেছিলো। এককথায় বলতে হলে বলা যায়, আসমানি ধর্মের অধিকাংশ গুণ-বৈশিষ্ট্য ও সৌন্দর্য-মহিমা থেকেই তারা বঞ্চিত ছিলো, আবার জাহেলিয়াতের নিকৃষ্টতম দোষ-ব্যাধিগুলো তাদের মাঝে পূর্ণ মাত্রায় বিদ্যমান ছিলো। পুরো আরব জাযিরাতে আলো বলতে কিছুই ছিলো না, ছিলো শুধু ঘোর অন্ধকার।

---

[১] صاعد الأندلسي (মৃত ৪৬২ হি.) রচিত طبقات الأمم পৃ. ১১

জাহেলিয়াতের মূর্তিপূজা

বস্তুত শিরক ও মূর্তিপূজাই ছিলো আরবের সাধারণ ধর্ম এবং প্রচলিত বিশ্বাস। আল্লাহকে অবশ্যই তারা মানতো এবং বিশ্বাস করতো যে, তিনিই সর্বশ্রেষ্ঠ, বিশ্বজগতের স্রষ্টা ও ব্যবস্থাপক। তাঁরই কুদরতের হাতে সবকিছুর নিয়ন্ত্রণ। তাদের সম্পর্কেই আল-কোরআনে বলা হয়েছে–

وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ خَلَقَهُنَّ الْعَزِيزُ الْعَلِيمُ ۝٩

আর যদি আপনি তাদের জিজ্ঞাসা করেন, কে সৃষ্টি করেছে আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবী তাহলে অবশ্যই বলবে, সৃষ্টি করেছেন এগুলোকে মহাপরাক্রমশালী সর্বজ্ঞ। (যুখরুফ, ৪৩ : ৯)

وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَهُمْ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ ۖ فَأَنَّىٰ يُؤْفَكُونَ ۝٨٧

'আর যদি আপনি তাদের জিজ্ঞাসা করেন, কে তাদের সৃষ্টি করেছে, অবশ্যই তারা বলবে, আল্লাহ! তাহলে কোথায় তাদের ঘোরানো হচ্ছে?' (যুখরুফ, ৪৩ : ৮৭)

কিন্তু খালক ও রবূবিয়্যাতের বিশ্বাস সত্ত্বেও তাওহীদের আকীদা এবং আল্লাহর একত্বের ধারণা তাদের মধ্যে ক্রমশ দুর্বল হয়ে একসময় তা মাত্র অল্পকিছু মানুষের মধ্যে সীমাবদ্ধ হয়ে পড়েছিলো।

নবিগণ তাওহীদ ও একত্বের যে স্বচ্ছ-সমুচ্চ ও নির্ভেজাল আকীদা-বিশ্বাস নিয়ে এসেছিলেন তা গ্রহণ ও ধারণ করা তাদের জাহেলিয়াত-আচ্ছন্ন চিন্তার পক্ষে কিছুতেই সম্ভব ছিলো না। নবী ও নবুওয়ত এবং ধর্মীয় ভাব ও ভাবনা থেকে তারা এত দূরে ছিলো যে, কিছুতেই বুঝতে পারতো না, মানুষের দু'আ-প্রার্থনা কারো মাধ্যম ছাড়া কীভাবে আসমানে পৌঁছতে পারে?! এবং কারো সুফারিশ ছাড়া কীভাবে আল্লাহর কাছে তা কবুল হতে পারে?! বস্তুত ঊর্ধ্ব-জগতের বিষয়কে তারা বস্তুজগতের উপর বিচার করতো, যেখানে রাজ-দরবারে মাধ্যম ছাড়া পৌঁছা যায় না এবং সুফারিশ ছাড়া কোন আর্যি মঞ্জুর হয় না। এ চিন্তা থেকেই দেব-দেবী ও বিভিন্ন মূর্তিকে তারা আল্লাহর কাছে পৌঁছার মাধ্যম-রূপে গ্রহণ করেছিলো এবং দু'আ-প্রার্থনার ক্ষেত্রে আল্লাহর সঙ্গে তাদেরও শরীক করে নিয়েছিলো সেই সূত্রে তাদেরও উদ্দেশ্যে কিছু কিছু উপাসনা শুরু হয়েছিলো।

এভাবে তাদের চিন্তায় সুফারিশের ধারণা বদ্ধমূল হয়েছিলো এবং একসময় তা এই আকীদা-বিশ্বাসে পরিণত হয়েছিলো যে, সুফারিশকারীদেরও ক্ষমতা রয়েছে উপকার ও ক্ষতি করার।

এভাবে শিরকের পথে ধাপে ধাপে এগিয়ে একসময় তারা দেব-দেবীকে আল্লাহ ছাড়াও ইলাহ ও উপাস্যরূপে গ্রহণ করেছিলো এবং এ বিশ্বাস পোষণ করছিলো যে, বিশ্বজগতের পরিচালনা ও ব্যবস্থাপনায় তাদেরও শরীকানা রয়েছে এবং ক্ষতি ও উপকার করার এবং কল্যাণ ও অনিষ্ট সাধনের এবং দান করা ও না করার নিজস্ব শক্তিও তাদের রয়েছে।

এভাবে চূড়ান্ত পর্যায়ে তারা খোল্লমখোল্লা মূর্তিপূজায় লিপ্ত হয়ে পড়েছিলো এবং বন্দেগি ও উপাসনার সম্পর্ক আল্লাহ থেকে কর্তিত হয়ে বিশ্বাসত ও কার্যত বিভিন্ন দেব-দেবী ও মূর্তির সঙ্গে যুক্ত হয়ে পড়েছিলো। এবং ইবাদত-বন্দেগির যত অভিপ্রকাশ ছিলো, যেমন দু'আ, সিজদা, কোরবানি, ইত্যাদি; এগুলো দেব-দেবীর নামেই চালু হয়ে গিয়েছিলো। এককথায় পূর্ব-পুরুষরা যেখানে আল্লাহর নিরঙ্কুশ উপাস্যতা, প্রতিপালকত্ব ও একক শক্তিতে বিশ্বাস করতো এবং মাধ্যম ও সুফারিশ পর্যন্তই ক্ষান্ত হতো, সেখানে পরবর্তীরা উপাস্যদের জন্য আল্লাহর সঙ্গে শরীকানাই সাব্যস্ত করেছিলো এবং তাদেরকে ভালো-মন্দ, লাভ-ক্ষতি ও অনাশ-বিনাশের নিজস্ব শক্তির অধিকারী বলে বিশ্বাস করতে লেগেছিলো। অবশ্য তখনো আল্লাহর শ্রেষ্ঠ উপাস্যত্বের এবং শ্রেষ্ঠ প্রতিপালকত্বের অস্পষ্ট একটা ধারণা তাদের মধ্যে বিদ্যমান ছিলো।[১]

জাহেলিয়াতের মূর্খতা ও অন্ধকার যত বাড়ছিলো, আকীদা-বিশ্বাসের এ দ্বিতীয় ধারা ততই প্রবল থেকে প্রবলতর হচ্ছিলো। কারণ মূর্তিপূজার যাবতীয় কর্মকাণ্ড ছিলো তাদের ইন্দ্রীয় শক্তির নিকটবর্তী এবং তাদের দুর্বল চিন্তাশক্তির সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ। এমনকি একসময় এটাই হয়ে গেলো সমগ্র আরবের সাধারণ আকীদা-বিশ্বাস। পক্ষান্তরে যারা ইলাহ ও উছিলার মধ্যে পার্থক্য রক্ষা করতো তারা হয়ে গেলো জাতির বিচ্ছিন্ন ব্যতিক্রম। তারা ছিলো সমাজের হাতে গোনা

---

[১] (আরব জাহেলিয়াতের আকীদা-বিশ্বাসের হাকীকত ও স্বরূপ এবং শিরকের ক্রমবিবর্তন সম্পর্কে জানার জন্য পড়ুন শামদেশীয় বিদগ্ধ পণ্ডিত মুহাম্মদ ইয্যত দারুযাহ রচিত কিতাব بيئة النبي صلى الله عليه وسلم من القرآن (কোরআনের দৃষ্টিতে নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সমকালীন পরিবেশ) পড়ুন।

ধর্মজ্ঞানী শিক্ষিত শ্রেণী। এছাড়া সমগ্র জাতি ডুবে গিয়েছিলো মূর্তিপূজার ঘৃণ্য আবর্তে।

প্রত্যেক গোত্রের এবং প্রতিটি জনপদের ছিলো আলাদা মূর্তি ও উপাস্য দেব-দেবী, বরং প্রত্যেক ঘরের ও পরিবারের ছিলো নিজস্ব মূর্তি ও পারিবারিক দেব-দেবী। ঐতিহাসিক কালবী বলেন, 'মক্কার প্রত্যেক পরিবারের ছিলো নিজস্ব দেবতা; পরিবারের ভিতরেই শুধু এই পারিবারিক দেবতার উপাসনা হতো। পরিবারের কারো সফরে যাত্রাকালে শেষ কাজ ছিলো গৃহদেবতার স্পর্শ ও আশীর্বাদ গ্রহণ করা, তদ্রূপ সফর থেকে ফিরে প্রথম কাজ ছিলো দেবতার স্পর্শগ্রহণ ও কৃতজ্ঞতা নিবেদন।'[১]

মূর্তিপূজার প্রতি তাদের আসক্তি ছিলো এমনই চরম যে, কেউ কেউ স্বতন্ত্র পূজাগৃহে মূর্তির প্রতিষ্ঠা করতো; যাদের সে সামর্থ্য ছিলো না তারা শুধু মূর্তি নির্মাণ করে বাসগৃহে রেখে দিতো। আরো কম সামর্থ্য যাদের তারা হারামের সামনে, বা নিজেদের পছন্দের স্থানে কোন প্রস্তরখণ্ড স্থাপন করে এমন শানে তার তাওয়াফ করতো যেমন করতো বাইতুল্লাহর। এগুলোকে তারা 'আলআনছাব' নামে ডাকতো। এমনকি যে কাবাঘর তৈরী হয়েছিলো শুধু এক আল্লাহর ইবাদতের জন্য তার ভিতরে ও প্রাঙ্গণে তিনশ ষাটটি মূর্তি স্থাপিত হয়েছিলো।[২]

মূর্তিপূজা একসময় পাথরপূজা পর্যন্ত গড়িয়েছিলো। অর্থাৎ যে কোন সুন্দর পাথরেরও পূজা করা হতো।

ইমাম বুখারীর বর্ণনায় أبو رجاء العطاردي বলেন– 'আমরা সুন্দর পাথরের পূজা করতাম; যখন আরো সুন্দর পাথর পেতাম, আগেরটি ছেড়ে নতুনটির পূজা শুরু করতাম। এমনকি উপযুক্ত পাথর না পেলে মাটি জড়ো করে তার উপর বকরীর দুধ দোহন করতাম এবং দুধ-ভেজা মাটির স্তূপকেই তাওয়াফ করতাম।'[৩]

কালবী বলেন– 'সফরে কোথাও থামার পর চারটি পাথর বাছাই করা হতো এবং সবচে' সুন্দরটিকে উপাস্যরূপে গ্রহণ করা হতো, বাকি তিনটিকে বানানো হতো চুলার পায়া। চলে যাওয়ার সময় অবশ্য সবক'টিকেই ফেলে যাওয়া হতো।[৪]

---

[১] كتاب الأصنام পৃ. ৩৩

[২] صحيح البخاري، كتاب المغازي، باب فتح مكة

[৩] صحيح البخاري، كتاب المغازي، باب وفد بني حنيفة

[৪] كتاب الأصنام পৃ. ৩৪

সবযুগে সবদেশে মুশরিক জাতির অবস্থা যেমন হয়, আরবদেরও ছিলো তেমন। অর্থাৎ উপাস্যের আধিক্য। আরবদেরও উপাস্য দেব-দেবী ছিলো অনেক। সে তালিকায় ফিরেশতা যেমন ছিলো তেমনি ছিলো জ্বিন-পরী, এমনকি আকাশের তারকারাজি।

ফিরেশতাদের সম্পর্কে বিশ্বাস ছিলো, তারা হলেন আল্লাহর প্রিয় কন্যা। তাদের উপাসনা এজন্য করা হতো যে, তারা হবেন আল্লাহর নৈকট্য লাভের ওয়াছীলা ও মাধ্যম। প্রার্থনা গ্রহণ ও প্রয়োজন পূরণের জন্য তারা আল্লাহর কাছে তাদের হয়ে সুফারিশ করবেন। একইভাবে জ্বিন ও কল্পিত দেওদানবকেও তারা আল্লাহর শরীকদার ভাবতো এবং তাদের নিজস্ব শক্তি ও ক্ষমতা বিশ্বাস করে তাদের উপাসনা করতো।[১]

কালবী বলেন, 'খোযা'আ গোত্রের শাখা বনু মালীহ জ্বিনপূজা করতো।'[২]

ছা'ইদ উন্দুলুসী বলেন, 'হিমায়ার ও কিনানাহ গোত্রদু'টি যথাক্রমে সূর্য ও চন্দ্রের পূজা করতো। তামীম গোত্র বিশেষ রাশির পূজা করতো। পক্ষান্তরে লাখম ও জুযাম গোত্রদ্বয় ছিলো বৃহস্পতির পূজারী। এভাবে একেক গোত্র একেক নক্ষত্র বা গ্রহের পূজা করতো।'[৩]

আরবের ইহুদী ও ঈসায়ী ধর্ম

জাযীরাতুল আরবে ইহুদী ও ঈসায়ী ধর্মেরও মোটামুটি অস্তিত্ব ছিলো। তবে আকীদা ও চিন্তা-বিশ্বাসের ক্ষেত্রে আরবরা এদু'টি ধর্মের তেমন কোন প্রভাব গ্রহণ করেনি। তদুপরি ধর্মদু'টি কী পরিমাণ বিকৃতি, বক্রতা ও অবক্ষয়ের শিকার হয়ে পড়েছিলো সে আলোচনা তো পিছনে আমরা করে এসেছি। সুতরাং এখানে তা দোহরানোর দরকার নেই।

নবুওয়ত ও পুনরুত্থানের বিশ্বাস

নবুওয়ত সম্পর্কে আরবদের ধারণা ছিলো নিছক কাল্পনিক। নবী ও রাসূলের এমন অতিমানবীয় সত্তা তারা কল্পনা করতো, যিনি পানাহার করেন না, বিবাহ করেন না, সন্তান জন্ম দেন না এবং বাজারে বিচরণ করেন না।

---

[১] كتاب الأصنام পৃ. ৪৪

[২] كتاب الأصنام পৃ. ৩৪

[৩] طبقات الأمم لصاعد الأندلسي পৃ. ৪৩০

তাদের দুর্বল ও সংকীর্ণ চিন্তায় এটা হযম হতো না যে, মৃত্যুর পর পুনরুত্থান এবং এ জীবনের পর অন্য জীবন বলে কিছু থাকতে পারে, যেখানে হিসাব ও শাস্তি-পুরস্কার হবে। কোরআনের ভাষায়, তারা বলতো–

مَا هِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا نَمُوتُ وَنَحْيَا وَمَا يُهْلِكُنَا إِلَّا الدَّهْرُ ۚ وَمَا لَهُم بِذَٰلِكَ مِنْ عِلْمٍ ۖ إِنْ هُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ ﴿٢٤﴾

'এ তো আমাদের পার্থিব জীবন ছাড়া আর কিছু নয়; এখানে আমরা মৃত্যু বরণ করি এবং জীবন ধারণ করি। আমাদের তো বিনাশ করে শুধু কাল। আসলে এসম্পর্কে তাদের নেই কোন জ্ঞান, তারা শুধু ধারণা করে' (জাছিয়াহ, ৪৫ :২৪)

তাদের আরো বক্তব্য আল-কোরআন এভাবে তুলে ধরেছে–

وَقَالُوا أَإِذَا كُنَّا عِظَامًا وَرُفَاتًا أَإِنَّا لَمَبْعُوثُونَ خَلْقًا جَدِيدًا ﴿٤٩﴾

'আর তারা বলে, যখন আমরা অস্থি ও মৃত্তিকায় পরিণত হবো তখন কি নতুন সৃষ্টিরূপে আমরা পুনরুত্থিত হবো?!' (আল-ইসরা, ১৭ : ৪৯)

ছা'ইদ উন্দুলুসী বলেন, 'তাদের অধিকাংশই এই পুনরুত্থান অস্বীকার করতো। হাশর ও হিসাবের বিশ্বাস প্রত্যাখ্যান করে তারা ভাবতো, বিশ্বজগত কখনো ধ্বংস হবে না, হয়ত নতুন কোন মাখলূক আসবে। হাশর ও হিশাবে বিশ্বাসী কিছু লোকও ছিলো; তারা মনে করতো, যদি তার বাহন-উটনীটি কবরে জবেহ করে দেয়া হয় তাহলে তাকে হাশরে নেয়া হবে সওয়ার অবস্থায়, নচেৎ তার হাশর হবে হাঁটা অবস্থায়।'[১]

নৈতিক ও সামাজিক ব্যাধি

আরব-জাহেলিয়াতে বহু নৈতিক ও সামাজিক ব্যাধি শিকড় গেড়ে বসেছিলো এবং সেটাই ছিলো স্বাভাবিক। কেননা ব্যাধির কারণগুলো সর্বত্র প্রকটভাবেই বিদ্যমান ছিলো। মদ ও পানাসক্তি ছিলো এমনই ব্যাপক যে, মদের আলোচনা ছিলো তাদের সাহিত্য ও কবিতার বিরাট অংশ জুড়ে। পান ও পানশালার বন্দনা ছিলো কবিদের প্রিয় বিষয়। আরবী ভাষায় মদের নাম-প্রাচুর্য এবং নামকরণে

---

[১] كتاب الأصنام পৃ. ৪৪

প্রকার ও প্রকৃতির এত সূক্ষ্ম পার্থক্য দেখে সত্যি অবাক হতে হয়। এতেই মদের ব্যাপকতা ও জনপ্রিয়তা আন্দায করা যায়। যদি বলা হয়, 'তারা মদের সেবা করতো, আর মদ তাদের গ্রাস করতো', তাহলে মোটেই অত্যুক্তি হবে না।[১] পানশালারও ছিলো অসম্ভব কদর-সমাদর। দিনরাত তা ঝাণ্ডা উড়িয়ে খোলা রাখা হতো এবং দূর থেকেই মানুষ তাদের প্রিয় গন্তব্য চিনতে পারতো। ঝাণ্ডারও আলাদা নাম ছিলো, 'আলগায়াহ'। ঝুলন্ত গীতিকাসপ্তকের কবি লাবীদ বলেন–

قد بت سامرها وغاية تاجر   وافيت إذ رفعت وعز مدامها

'কত রাত ভোর হলো বন্ধুদের জলসায়, মদের ফোয়ারায়! কত পানশালায় ছিলো আমার অভিসার 'ঝাণ্ডা' তোলা মাত্র! দুর্লভ মদিরায় পূর্ণ ছিলো পাত্র! এবং আমি ছিলাম বন্ধুদের মধ্যমণি!'

(অর্থাৎ আত্মপ্রশংসা করে বলছেন, বন্ধুদের সভায় আমার কদর ছিলো, কারণ আমি তাদের পানশালায় নিয়ে যেতাম এবং তাদের দামী ও দুর্লভ মদ পান করাতাম।[২]

জাহেলী যুগের কবি ইমরুল কায়সের বন্ধু আমর বিন কোমায়আ বলেন–

إذا أسحب الريط والمروط إلى   أدنى تجاري وأنفض اللمما

'চমকদার ও চটকদার পোশাক জড়িয়ে, ঝাঁকড়া চুল ঝাঁকিয়ে ছুটেছি 'তাজিরের' পানশালে। এভাবেই এসেছি গোটা যৌবন কাটিয়ে।'[৩]

এ দু'টি কবিতাপঙ্ক্তি প্রমাণ করে, মদের ব্যবসা এত জমজমাট ও ব্যাপক ছিলো যে, 'তাজির' দ্বারা মদের ব্যবসায়ী বা পানশালার মালিককে বোঝানো হতো।

আধুনিক পশ্চিমা সভ্যতার মত আরব-জাহেলিয়াতেও মদের পাশাপাশি জুয়ার আসরও ছিলো গর্বের বিষয়। জাহেলী কবি সুবরা বিন ওমায়র বলেন–

أعيرتنا ألبانها ولحومها   وذلك عار يابن ريطة ظاهر

نحابي بها أكفاءنا ونهينها   ونشرب في أثمانها ونقامر

'রায়তার পুত্র! আমাদের লজ্জা দাও উটনীর দুধ-গোশতের কথা বলে! এতে লজ্জার কী হলো! এসব তো বন্ধু, আর অতিথির জন্য! তারপর যা থাকে তা

[১] এসম্পর্কে বিস্তারিত দেখুন, كتاب المخصص لابن سيده খ. ১১ পৃ. ৮২ –১০১

[২] المعلقات السبع (طبع دار الكتب العلمية، بيروت) পৃ. ৯৪

[৩] ديوان الحماسة مع شرحه للأعلم الشنتمري (طبع دار الفكر، دمشق) খ. ২ পৃ. ৬৮২

উড়াই মদে ও জুয়ায়।'[১]

জুয়ার আড্ডায় শরীক না হওয়া ছিলো লজ্জার বিষয় এবং কৃপণতার প্রমাণ। জাহেলী কবি হুজুর বিন খালিদ বলেন–

وإذا هلكت فلا تريدي عاجزا   غسا ولا برما ولا معزالا

'যদি মরে যাই তবে হে প্রেয়সী! এমন কারো সঙ্গ গ্রহণ করো না, যার হাতে নেই সম্পদ এবং যে বসে থাকে জুয়ার আড্ডা থেকে দূরে।'[২]

বিখ্যাত তাবে'ঈ কাতাদাহ বলেন, 'জাহেলী যুগে মানুষ নিজের সম্পদ ও পরিবারের উপর বাজি ধরে জুয়া খেলতো। তারপর সর্বস্ব খুইয়ে হায় আফসোস করতো। যখন সবকিছু অন্যের দখলে দেখতে পেতো তখন তার বুকে হিংসার আগুন জ্বলে উঠতো এবং দুশমনি ও খুনখারাবি শুরু হতো।'[৩]

হিজাযের অধিবাসী আরব ও ইহুদীদের মধ্যে সুদের কারবার ছিলো ব্যাপক। চক্রবৃদ্ধি হারে সুদ বসানো হতো এবং সুদ আদায়ের ক্ষেত্রেও অবলীলায় চরম নিষ্ঠুর ও পাশবিক আচরণ করা হতো।[৪] সুদের কারবার এতই স্বাভাবিক ও সাধারণ ছিলো যে, প্রচলিত বেচাকেনা ও সুদের মধ্যে তারা কোন পার্থক্যই দেখতে পেতো না, বরং উল্টো উপমা দিয়ে বলতো (কোরআনের ভাষায়)–

إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَوٰا

'বেচা-কেনা তো সুদেরই মতো!' (বাকারাহ, ১ : ২৭৫)

যিনা ও বিবাহবহির্ভূত সম্ভোগ খুব একটা দোষের ছিলো না এবং আরব-জীবনে বিরল ছিলো না। স্ত্রীর বাইরে উপপত্নী রাখার রীতি অভিজাত শ্রেণীতেও ছিলো, এমনকি ছিলো দেহব্যবসাও। দাসীকে জোরপূর্বক দেহব্যবসায় নামানো হতো, আর মনিব তার 'দেহ-উপার্জন' ভোগ করতো।[৫] পেশাদার নারীদের আলাদা

[১] شرح حماسة أبي تمام খ. ১ পৃ. ২৫৪

[২] شرح ديوان الحماسة لأبي تمام للتبريزي (طبع دار الكتب العلمية، بيروت) খ. ১ পৃ. ২৫৩

[৩] تفسير الطبري، تفسير آية : إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَن يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ

[৪] বিস্তারিত দেখুন, তাফসীরে তাবারী, খ. ৪ পৃ. ৫৯ - ৬৯

[৫] তাফসীরে তাবারী, খ. ১৮ পৃ. ৪০১

কুঠি ছিলো, পানশালায়ও নারীদেহের আয়োজন ছিলো।[১] বিবাহেরও এমন বিচিত্র প্রকার-পদ্ধতি ছিলো, আদতে যা যৌন স্বেচ্ছাচারেরই নামান্তর। হযরত আয়েশ রা. বর্তমানের শরীয়ত-অনুমোদিত বিবাহ ছাড়া জাহেলিয়াতে প্রচলিত আরো তিনটি বিবাহপ্রথার কথা উল্লেখ করেছেন, যা বুখারীতে বর্ণিত হয়েছে।[২] বস্তুত এক্ষেত্রে ইউরোপের আধুনিক জাহেলিয়াত প্রাচীন আরব-জাহেলিয়াতকে তেমন অতিক্রম করে যেতে পারেনি।

জাহেলী সমাজে নারী

পৃথিবীর অন্যান্য জাতির তুলনায় আরব-জাহেলিয়াতের নারী বরং অনেক বেশী নিষ্ঠুরতা ও বর্বরতার শিকার ছিলো। নারী-অধিকার বলতে কিছুই ছিলো না। তার সম্পদ ছিলো পরিবারের পুরুষদের ভোগদখলে। মীরাছ ও উত্তরাধিকার থেকে সে ছিলো সম্পূর্ণ বঞ্চিত।

বিবাহবিচ্ছেদ বা স্বামীবিয়োগের পর পছন্দের দ্বিতীয় স্বামী গ্রহণের অধিকার ছিলো না তার, বরং পশুসম্পদের মত নারীও মীরাছরূপে হস্তান্তরিত হতো। পুরুষ তো তার অধিকার ষোল আনা আদায় করে নিতো, কিন্তু স্ত্রীর যাবতীয় অধিকার হতো লুণ্ঠিত। বেশকিছু আহার্যদ্রব্য পুরুষের জন্য নির্ধারিত ছিলো, যা স্ত্রীলোকের জন্য ছিলো নিষিদ্ধ। পুরুষ যে কোন সংখ্যায় স্ত্রী গ্রহণ করতে পারতো, তদুপরি স্ত্রীদের মধ্যে অধিকার ও ব্যবহারে সমতা রক্ষার কোন বাধ্যবাধকতা ছিলো না।

হযরত ইবনে আব্বাস রা. বলেন, পিতার মৃত্যুতে তার পুত্রই 'পিতার স্ত্রী'র অধিক হকদার হতো। ইচ্ছা করলে সে তাকে রেখে দিতো, বা আটকে রাখতো। তারপর হয় মোহর ফেরত দিতো, না হয় মারা যেতো, আর সে তার সম্পদ দখল করতো।

আস্‌সুদ্দী রহ. বলেন, জাহেলিয়াতের প্রথা এই ছিলো যে, কারো বাবা, ভাই বা ছেলে স্ত্রী রেখে মারা গেলো। তখন মাইয়েতের ওয়ারিছ যদি আগেভাগে ঐ বিধবার উপর বস্ত্র নিক্ষেপ করতো তাহলে সেই হতো তার বিষয়ে অধিক হকদার। হয় সে তাকে মাইয়েতেরই মোহরের বিনিময়ে বিবাহ করতো, কিংবা অন্যত্র বিবাহ দিয়ে মোহর নিজে ভোগ করতো। পক্ষান্তরে যদি ঐ বিধবা সবার

---

[১] العقد الفريد لابن عبد ربه، كتاب أخبار زياد

[২] صحيح البخاري، كتاب النكاح হাদীছ নম্বর ৪৭৩২

চোখ এড়িয়ে পিত্রালয়ে চলে যেতে পারতো তাহলে তার আত্মঅধিকার সাব্যস্ত হতো।[১]

কন্যাসন্তান ছিলো লজ্জা-কলঙ্কের বিষয়, এজন্য এমনকি জন্মগ্রহণ করামাত্র জীবন্ত কবর দেয়ার প্রচলন ছিলো। হায়ছাম ইবনে আদীর সূত্রে আলমায়দানী লিখেছেন, জীবন্ত কবর দেয়ার নিষ্ঠুর প্রথা আরবের সব গোত্রেই ছিলো। শতে দশজনই এ নিষ্ঠুরতার পরিচয় দিতো এবং ইসলামের আবির্ভাব পর্যন্ত অব্যাহত ছিলো। অনেকে করতো লজ্জা-কলঙ্কের কারণে, আর অনেকে তো দারিদ্র্যের ভয়ে। এক্ষেত্রে আরবের নেতৃস্থানীয়, অভিজাত ও মহানুভব কোন ব্যক্তি অর্থের বিনিময়ে হতভাগ্য শিশুকন্যাদের রক্ষা করতেন। 'আ বিন নাহিয়া বলেন, 'ইসলামের আবির্ভাব পর্যন্ত তিনশ শিশুকন্যাকে এ ম পরিণতি থেকে আমি উদ্ধার করেছি।'

ন কোন ক্ষেত্রে পিতা তার ঔরসজাত কন্যাকে জীবন্ত কবর দিতে গিয়ে এমন নিষ্ঠুরতার পরিচয় দিতো যা পড়লে অতি বড় পাষাণেরও চোখে পানি আসে। এমনো হতো যে, বাপ সফরে থাকার কারণে, বা অন্য কোন কারণে সঙ্গে সঙ্গে কবরে পুঁতে ফেলা সম্ভব হয়নি। হতে হতে কন্যা বড় হয়ে গেছে। তখন নিষ্ঠুর বাপ কন্যাকে ফুসলিয়ে দূরে নিয়ে যেতো এবং চরম নির্দয়ভাবে তাকে যিন্দা পুঁতে ফেলতো, অথচ মাটি খোঁড়ার সময় সেই মেয়ে ওড়নার প্রান্ত দিয়ে পরিশ্রান্ত বাবার ঘাম মুছে দিচ্ছিলো। ইসলাম গ্রহণের পর জনৈক ছাহাবী নিজের হাতে যিন্দা কবর দেয়ার এরূপ মর্মবিদারী ঘটনা শুনিয়েছেন, আর পেয়ারা নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অঝোরে কেঁদেছেন।[২]

অন্ধ গোত্রপ্রীতি ও বংশগরিমা

আরব জাহেলিয়াতে গোত্রপ্রীতি ও সাম্প্রদায়িকতা ছিলো খুব ভয়াবহ ও রক্তক্ষয়ী এবং এর বুনিয়াদ ছিলো জাহেলী চিন্তা-চেতনা ও মনমানসিকতা, যা বোঝার জন্য প্রাচীন কাল থেকে আরবে প্রচলিত এ বাক্যটিই যথেষ্ট, যা জুন্দুব বিন আম্বর সর্বপ্রথম উচ্চারণ করেছেন বলে কথিত আছে–

---

[১] তাফসীরে তাবারী, খ. ৪ পৃ. ৩০৮

[২] এসম্পর্কে বিস্তারিত দেখুন, بلوغ الأرب في أحوال العرب للآلوسي এবং দেখুন كتاب الأغاني আরো দেখুন, سنن الدارمي باب ما كان عليه الناس قبل مبعث النبي صلى الله عليه وسلم من الجهل والضلالة (المجلد الأول، الصفحة الثالثة

انصر أخاك ظالما أو مظلوما

'তোমার ভাইকে সাহায্য করো, হোক সে যালিম, বা মযলূম।'[১]

তাই করা হতো। মানুষ যখন আপন ভাই এবং স্বগোত্রের পক্ষে নাঙ্গা তলোয়ার হাতে ঘোড়ার পিঠে চড়ে বসতো তখন একবারও ভেবে দেখতো না, কে যালিম, কে মাযলূম।

বংশগরিমা ও গোত্রাভিমানও ছিলো আরবসমাজের আরেকটি দুষ্ট উপসর্গ। কোন কোন গোত্র ও পরিবার ছিলো আভিজাত্য ও স্বতন্ত্র মর্যাদার দাবীদার। পরস্পর তারা শ্রেষ্ঠত্ব ও মর্যাদার গর্ব করতো। কোন কোন পরিবার অন্য পরিবারের সঙ্গে বা সাধারণ মানুষের সঙ্গে আচার অনুষ্ঠানে অংশ নেয়া অগৌরবের মনে করে তা থেকে বিরত থাকতো, এমনকি হজের মত অনুষ্ঠানেও কোরায়শ কিছু কিছু ক্রিয়াকর্মে সাধারণ হাজীদের থেকে আলাদা অবস্থান করতো। আরাফার মাঠে অন্যান্য গোত্রের সঙ্গে অবস্থান করাকে তারা অগৌরবের মনে করতো। এজন্য গমন ও আগমন অগ্রে অগ্রে সম্পন্ন করতো।[২] একটি শ্রেণী ছিলো বংশপরম্পরায় প্রভুত্বের অধিকারী। আরেক শ্রেণী ছিলো জন্মগতভাবেই নিম্নশ্রেণীর, যাদের বেগার খাটানোও দোষের কিছু ছিলো না। বাজারশ্রেণীর লোকদের কোন মর্যাদাই ছিলো না অভিজাত শ্রেণীর চোখে। মোটকথা, শ্রেণীভেদ আরবসমাজেও কোন না কোন পর্যায়ে স্বীকৃত বিষয় ছিলো।

যুদ্ধের স্বভাব-আসক্তি

লড়াই, হামলা, লুণ্ঠন ও খুনখারাবি ছিলো আরবীয় স্বভাব-প্রকৃতির অন্তর্গত। তাছাড়া সভ্যতা থেকে দূরে তাদের মরুজীবনের স্বতঃস্ফূর্ত চাহিদাও ছিলো এগুলো। যুদ্ধ শুধু তাদের জীবন ও জীবিকার প্রয়োজনই ছিলো না, যুদ্ধ ছিলো তাদের গর্ব, গৌরব ও মর্যাদারও সোপান; বরং যুদ্ধই ছিলো তাদের আনন্দ-বিনোদনের এবং উচ্ছ্বাস-উল্লাস প্রকাশের সবচে' প্রিয় মাধ্যম। যুদ্ধ ছাড়া তাদের বেঁচে থাকা যেমন সম্ভব ছিলো না, তেমনি যুদ্ধ ছাড়া তাদের মরণও সম্ভব ছিলো না। কারণ তরবারির আঘাত ছাড়া যে মৃত্যু, শত্রু-মিত্র সবার চোখেই সেটা ছিলো লজ্জাজনক মৃত্যু। এজন্যই আরব জাহেলিয়াতের কবি বলতে পারে–

---

[১] ইমাম বুখারী রহ. হযরত আনাস বিন মালিক রা. হতে বর্ণনা করেছেন 'আলামযালিম ওয়াল গছব' অধ্যায়ে, হাদীছ নম্বর ২২৬৩ এবং ২২৬৪, ইমাম তিরমিযি বর্ণনা করেছে, আলফিতান অধ্যায়ে;

[২] দেখুন, বাকারাহ, ১৯৮-৯৯ আয়াতের তাফসীর, তাবারী ও অন্যান্য।

وأحيانا على بكر أخينا إذا ما لم نجد إلا أخانا

'কখনো ঝাঁপিয়ে পড়ি আমাদের ভাই বনুবকরের উপর / যখন ভাই ছাড়া কাউকে না পাই।'[১]

আরেক কবি তার মনের বাসনা প্রকাশ করেছে এভাবে–

إذ المهرة الشقراء أدرك ظهرها فشب الإله الحرب بين القبائل

'আমার ঘোড়া যখন হবে জোয়ান ও তেজীয়ান/ যুদ্ধদেবতা যেন ছড়িয়ে দেয় যুদ্ধের আগুন/ আমার ঘোড়া যেন দেখাতে পারে তেজ/ আর তলোয়ার দেখাতে পারে ধার।[২]

যুদ্ধ ও রক্তপাত তাদের জীবনে ছিলো এমনই মামুলি যে, তুচ্ছ থেকে তুচ্ছ ঘটনাও যথেষ্ট হতো ভয়ঙ্কর থেকে ভয়ঙ্কর যুদ্ধের অগ্নিলাভা উদ্গীরণের জন্য। ওয়াইল বংশের বকর ও তাগলিব গোত্রদ্বয়ের মধ্যকার যুদ্ধ স্থায়ী হয়েছিলো দীর্ঘ চল্লিশ বছর এবং তাতে বয়ে গিয়েছিলো খুনের নহর। অথচ ঘটনা ছিলো আর কিছুই না, মা'আদের প্রধান কোলায়ব বাসূস বিনতে মুনকিযের উটনীর ওলান লক্ষ্য করে তীর ছুঁড়েছিলো, যাতে ওলানের সাদা দুধে আর লাল খুনে একাকার হয়ে গিয়েছিলো। এর প্রতিশোধে জাস্সাস বিন মুররাহ কোলায়বকে হত্যা করলো, আর বকর ও তাগলিবের মধ্যে যুদ্ধ বেঁধে গেলো, যা সুদীর্ঘ চল্লিশ বছর স্থায়ী হয়েছিলো এবং জাহেলিয়াতের দীর্ঘতম যুদ্ধরূপে খ্যাতি অর্জন করেছিলো। কোলায়বের ভাই মুহালহালের মুখে শুনুন সেই যুদ্ধের পরিণতি–

قد فني الحيان، وثكلت الأمهات، ويتم الأولاد، دموع لاترقأ، وأجساد لاتدفن

'দুই কবিলা ফানা হয়ে গেলো। মায়েরা হলো পুত্রহারা, সন্তানেরা হলো পিতৃহারা। *(চারদিকে ছিলো শুধু এতীম-বিধবা।)* কে মুছে দেয় চোখের পানি, আর কে দাফন করে বে-কাফন লাশ!'[৩]

দাহিছযুদ্ধের উপলক্ষ ছিলো আরো তুচ্ছ। কায়স বিন যোহায়র এবং হোযায়ফা বিন বদরের মধ্যে ঘোড়দৌড়ের প্রতিযোগিতা হলো। কায়সের তেজী ঘোড়া 'দাহিছ' যখন এগিয়ে গেলো তখন **হোযায়ফার** ইঙ্গিতে আসাদগোত্রীয় কেউ

---

[১] شرح الحماسة لأبي تمام খ. ১ পৃ. ৩৩৭

[২] شرح الحماسة لأبي تمام

[৩] বিস্তারিত জানতে দেখুন, أيام العرب في الجاهلية

একজন আগে বেড়ে দাহিছ-এর মুখে আঘাত করলো, এতে তার দৌড়ের গতি ব্যাহত হলো এবং অন্যান্য ঘোড়া তাকে পিছনে ফেলে এগিয়ে গেলো। এর পর শুরু হলো খুন এবং খুনের বদলা খুন। যার যার গোত্র এসে দাঁড়ালো তার পাশে যুদ্ধের সাজে। উজাড় হলো কবিলার পর কবিলা। নিহত হলো হাজার হাজার যোদ্ধা। *(শেষে যুদ্ধ থেমে গেলো যোদ্ধার অভাবে।)*[১]

'খুন এবং খুনের বদলা খুন' এই মরণজালেই যেন জড়িয়ে পড়েছিলো আরব গোত্রগুলোর জীবন। মৃত্যুর সময় পুত্রের প্রতি পিতার একমাত্র উপদেশ হতো, প্রতিশোধ, প্রতিশোধ এবং প্রতিশোধ!

মরুপ্রকৃতি, জীবিকার স্বল্পতা, লোভলালসা, হিংসা ও প্রতিহিংসা এবং জীবনের মূল্যহীনতা– এগুলোই ছিলো খুনখারাবি, লুটতরাজ ও পরস্পর হানাহানির অনুঘটক। অবস্থা এতদূর গড়িয়েছিলো যে, গোটা আরব জাযীরা যেন ছিলো শিকারীর জালে ঘেরা। কেউ জানে না, কখন কে কোথায় খুন হবে, কিংবা হবে লুণ্ঠনের শিকার। নির্জন মরুভূমিতে চলমান কাফেলায় আপন দলবলের মাঝখান থেকে যেন বাজপাখীর মত ছোঁ মেরে তুলে নেয়া হতো জ্যান্ত মানুষকে। এমনকি শক্তিশালী রাষ্ট্রগুলোরও সশস্ত্র প্রহরা, চৌকিব্যবস্থা এবং গোত্রপ্রধানদের ছত্রচ্ছায়া গ্রহণের প্রয়োজন হতো। তারীখে তাবারীর বর্ণনা মতে পারস্যসম্রাট কিসরার কাফেলাকে সশস্ত্র প্রহরায় মাদায়েন থেকে হিরায় নোমান বিন মুনযিরের হেফাযতে পৌঁছানো হতো, আর নোমান তার নিজস্ব প্রহরাব্যবস্থায় ইয়ামামা অঞ্চলের হাওযা বিন আলী আলহানাফীর হেফাযাতে পৌঁছে দিতেন। তার ছত্রচ্ছায়ায় কাফেলা বনু হানীফার এলাকা পাড়ি দিয়ে বনু তামীমের এলাকায় প্রবেশ করতো। তারপর নির্ধারিত অর্থের বিনিময়ে বনু তামীমের ছত্রচ্ছায়ায় কাফেলা নিরাপদে ইয়ামান পৌঁছতো। শেষে কিসরার প্রশাসক কাফেলার দায়িত্ব গ্রহণ করতেন। আরবমরুর দস্যুদের লুণ্ঠন থেকে বাণিজ্যকাফেলা ও প্রেরিত দূতদের রক্ষা করার জন্য পারস্য-সম্রাটেরও বিকল্প কোন উপায় ছিলো না।[২]

অন্ধকারে কিছু জোনাকি

মোটকথা পৃথিবীর বুকে তখন না ছিলো বিবেকবান কোন জাতি, না ছিলো নীতি ও নৈতিকতাভিত্তিক কোন সমাজ, আর না ছিলো ন্যায় ও ইনছাফ এবং দয়া ও

---

[১] দেখুন, أيام العرب في الجاهلية

[২] দেখুন, তারীখে তাবারী, খ. ২ পৃ. ১৩৩

সদাচারের অনুসারী কোন শাসক ও শাসন। আর নবী ও পয়গম্বরদের আনীত দ্বীন ও শরীয়তের বিশুদ্ধ রূপ তো ছিলো একেবারেই বিলুপ্ত। পৃথিবীর জলে-স্থলে ছড়িয়ে পড়েছিলো শুধু ফাসাদ আর ফাসাদ, গোলযোগ আর গোলযোগ।

এই সর্বগ্রাসী অন্ধকারের মাঝে সাধু সন্ন্যাসীদের কোন কোন মঠ ও গীর্জা থেকে আলোর যে ক্ষীণ রশ্মি দেখা যেতো, তা রাতের অন্ধকারে জ্বলে ওঠা জোনাকির চেয়ে বেশী কিছু ছিলো না, যাতে না অন্ধকার দূর হতো, আর না চলার পথ হতো আলোকিত। এ অন্ধকারের মধ্যে যারা সত্যধর্মের সন্ধানে বের হতো তারা শুধু দিশেহারা হয়ে দেশ থেকে দেশে ঘুরে মরতো, কিন্তু পেতো না সত্যের সন্ধান। সাগরের ঢেউয়ের মত এক ভূখণ্ড তাদের ঊর্ধ্বে তুলে ধরতো, তো অন্য ভূখণ্ড তাদের তলিয়ে দিতো। এর মধ্যে কখনো কোন জনপদ ও ভূখণ্ডে তারা পেয়ে যেতো বিরল কিছু মানুষের সন্ধান। তখন তারা তাদের আশ্রয় গ্রহণ করতো যেমন ডুবন্তজন আশ্রয় গ্রহণ করে ঝড়তুফানে ভেঙ্গে যাওয়া কিশতির ভাসমান কাষ্ঠখণ্ডে।

সত্যের সন্ধানী হযরত সালমান ফারসী (রা) এর ঘটনা হলো এর সর্বোৎকৃষ্ট উদাহরণ। ষষ্ঠ শতাব্দীর ঘোর অন্ধকারে তিনি বের হয়েছিলেন সত্যের অনুসারী-দের সন্ধানে দেশ থেকে দেশান্তরের অভিযানে। ছুটে গিয়েছেন শাম থেকে মোছলে, সেখান থেকে নিছীবীনে এবং সেখান থেকে আমুরিয়ায়। আর এক সাধুপুরুষ তাঁকে বলে দিতেন আরেক দূর দেশের কোন সাধুপুরুষের নাম। এমনকি চতুর্থজনের কাছে এসে তিনি আর পঞ্চমজনের সন্ধান পেলেন না। অবশেষে ইসলাম তাঁকে উদ্ধার করলো এই সর্বগ্রাসী অন্ধকার থেকে। হযরত সালমান (রা) এর মুখেই শুনুন সত্যের সন্ধানে তাঁর মর্মস্পর্শী সেই সুদীর্ঘ অভিযানের কাহিনী। তিনি বলেন–

শাম দেশে আগমন করে আমি জানতে চাইলাম, এই (নাছারা) ধর্মের শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি কে? লোকেরা বললো, গীর্জার পাদ্রী। তার কাছে হাযির হয়ে আরয করলাম, আমি এ ধর্মের প্রতি আকৃষ্ট হয়েছি। তাই আমার একান্ত আশা, গীর্জায় আপনার সঙ্গে থেকে আপনার সেবা করি, শিক্ষা গ্রহণ করি এবং আপনার সঙ্গে প্রার্থনা করি। তিনি রাজি হলেন; আমি তার সঙ্গে থাকলাম। কিন্তু তিনি ছিলেন মন্দ ব্যক্তি। লোকদের তিনি দানে উদ্বুদ্ধ করতেন। তারা যখন বিপুল দানসামগ্রী তার কাছে এনে জমা করতো, তিনি গরীবের মধ্যে বণ্টন না করে তা নিজে রেখে দিতেন। এভাবে তার কাছে জমা হয়েছিলো সাত কলস সোনা-চাঁদি।

হযরত সালমান বলেন, এসব দেখে তার প্রতি আমার ভীষণ ঘৃণা হলো। মৃত্যুর পর নাছারারা তাকে দাফন করতে জমায়েত হলো। তখন বললাম, তোমাদের ধর্মগুরু ছিলেন মন্দ লোক। তোমাদের তো দানের আদেশ-উপদেশ দিতেন, কিন্তু সেই বিপুল দানসামগ্রী থেকে গরীবদের কিছুমাত্র না দিয়ে নিজেই তা আত্মসাৎ করতেন। এই দেখো তার গোপন ভাণ্ডার!

লোকেরা সাত কলস সোনা-চাঁদি দেখে তাকে ধিক্কার দিলো, আর বললো, কসম আল্লাহর, তাকে আমরা দাফন করবো না। তারা তাকে শূলে চড়িয়ে পাথর মারলো। পরে অন্য একজনকে তার স্থানে বসালো।

হযরত সালমান বলেন, আমি এমন কাউকে দেখিনি, যে পাঁচ ওয়াক্ত নামায পড়ে না, অথচ সে তার চেয়ে উত্তম এবং তার চেয়ে দুনিয়াবিমুখ ও আখেরাতমুখী এবং দিন-রাত তার চেয়ে ইবাদতমগ্ন। তাই তাকে এমন ভালোবাসলাম, যা আগে অন্য কাউকে বাসিনি। তার সঙ্গে আমি দীর্ঘকাল অবস্থান করলাম। যখন তার মৃত্যুর সময় উপস্থিত হলো তখন বললাম, হে আল্লাহর বান্দা! আপনার সঙ্গে থেকে আপনাকে আমি এমন ভালোবেসেছি, যা আগে কাউকে বাসিনি। এখন আল্লাহর যে ফায়ছালা আপনার কাছে এসে গেছে তা তো দেখতে পাচ্ছেন! তো আপনি আমাকে কার কাছে যাওয়ার অছিয়ত করেন এবং আমার প্রতি আপনার কী আদেশ?

তিনি বললেন, হে বৎস! যে (ধর্মশিক্ষার) উপর আমি ছিলাম তার অনুসারী কাউকে আমার জানা নেই। আসল লোকেরা তো মরে গেছে, আর পরবর্তীরা তাদের শিক্ষার অধিকাংশই পরিবর্তন করে ফেলেছে। তবে একজন আছে মোছেলে; তার নাম এই। তিনি শুধু এই শিক্ষার অনুসারী যার উপর আমি ছিলাম। সুতরাং তুমি গিয়ে তার সঙ্গে লেগে থাকো।

হযরত সালমান বলেন, মউতের পর তাকে দাফন করে আমি মোছেলের অধিবাসীর কাছে হাযির হয়ে আরয করলাম, হে আল্লাহর বান্দা! অমুক তার মৃত্যুর সময় আমাকে অছিয়ত করেছেন আপনার সঙ্গে যুক্ত হওয়ার। কারণ তার মতে আপনি তার শিক্ষার উপর রয়েছেন।

তিনি বললেন, আচ্ছা, থাকো আমার কাছে।

থাকলাম এবং তাকে তার সঙ্গীর শিক্ষার অনুসারী উত্তম ব্যক্তিরূপেই পেলাম। কিন্তু অল্পকাল পরেই তার মৃত্যু হলো। মৃত্যুর সময় বললাম, হে আল্লাহর বান্দা! অমুকের অছিয়তে আপনার কাছে আমার আসা। এখন আল্লাহর যে ফায়ছালা তা

তো আপনি দেখতে পাচ্ছেন! তো আমাকে কার কাছে যাওয়ার অছিয়ত করেন এবং আমার প্রতি আপনার কী আদেশ?

তিনি বললেন, হে বৎস! আমরা যে শিক্ষার উপর ছিলাম, তার অনুসারী কারো পরিচয় আমার জানা নেই, নিছীবীনের অধিবাসী এক ব্যক্তি ছাড়া; তার নাম এই। তুমি গিয়ে তার সঙ্গে লেগে থাকো।

মউতের পর তাকে দাফন করে আমি নিছীবীনবাসীর খেদমতে হাযির হয়ে আমার বৃত্তান্ত বললাম এবং অছিয়তের কথা জানালাম।

তিনি বললেন, আচ্ছা, থাকো আমার কাছে।

থাকলাম এবং তাকে তার দুই পূর্ববর্তীর শিক্ষার উপর পেলাম। একজন উত্তম ব্যক্তির সঙ্গেই আমি সময় যাপন করতে লাগলাম। কিন্তু আল্লাহর কসম, দেখতে না দেখতে তারও উপর মউত নাযিল হলো। তখন বললাম, হে আল্লাহর বান্দা! অমুক আমাকে অমুকের অছিয়ত করেছিলেন, তারপর সেই অমুক আমাকে আপনার অছিয়ত করেছিলেন। এখন আপনি আমাকে কার অছিয়ত করেন এবং আমার প্রতি আপনার কী আদেশ?

তিনি বললেন, হে বৎস! আল্লাহর কসম! এমন কারো পরিচয় আমার জানা নেই যে আমাদের শিক্ষার উপর রয়েছে, যার কাছে যাওয়ার আদেশ তোমাকে করতে পারি। তবে আমুরিয়ায় একজন মোটামুটি আমাদের শিক্ষার উপর রয়েছেন। তুমি চাইলে তার কাছে যেতে পারো।

হযরত সালমান বলেন, মউতের পর তাকে দাফন করে আমি আমুরিয়ার অধিবাসীর খেদমতে হাযির হলাম এবং আমার বৃত্তান্ত জানালাম। তিনি বললেন, আচ্ছা, আমার কাছে থাকো।

তখন আমি এমন এক ব্যক্তির সঙ্গে থাকলাম যিনি তার পূর্ববর্তীদের তরীকা ও শিক্ষার উপর ছিলেন।

হযরত সালমান বলেন, একসময় তার উপরও আল্লাহর ফায়ছালা নাযিল হলো। মৃত্যুশয্যায় তাকে বললাম, হে আল্লাহর বান্দা! আমি অমুক, অমুক এবং অমুকের মাধ্যমে আপনার কাছে উপনীত হয়েছি। এখন আপনি আমাকে কার অছিয়ত করেন এবং আমার প্রতি আপনার আদেশ কী?

তিনি বললেন, হে বৎস! আল্লাহর কসম! এমন কারো পরিচয় আমার জানা নেই যে আমাদের শিক্ষার উপর রয়েছে, যার কাছে যাওয়ার আদেশ তোমাকে করতে পারি। তবে এমন এক নবীর আগমনকাল ঘনিয়ে এসেছে যিনি ইবরাহীমের

দ্বীনের উপর প্রেরিত হবেন। তিনি আরবভূমিতে আবির্ভূত হবেন এবং দুই প্রস্তরভূমির মধ্যবর্তী ভূমিতে হিজরত করবেন, যেখানে রয়েছে খেজুরবাগান। তাঁর মধ্যে নবুয়তের সুস্পষ্ট কতিপয় নিদর্শন পাওয়া যাবে। (যেমন) তিনি হাদিয়া আহার করবেন, কিন্তু ছাদাকা আহার করবেন না। তাঁর দুই কাঁধের মাঝে নবুয়তের মোহর থাকবে। তুমি যদি সেই ভূমিতে পৌঁছতে পারো তবে তাই করো। ... (শেষ পর্যন্ত)[১]

সমকালীন বিশ্বের একটি সাধারণ পর্যালোচনা

প্রখ্যাত ইংরেজ জীবনীকার r v c bodly তার the messenger গ্রন্থে ইসলামের আবির্ভাবকালীন পৃথিবীর একটি সাধারণ পর্যালোচনা পেশ করেছেন। আলোচ্য অধ্যায়ের সমাপ্তিতে সেটা আমরা পাঠকবর্গের সামনে পেশ করতে চাই। তিনি সমকালীন বিশ্বের উল্লেখযোগ্য দেশ ও জনগোষ্ঠীগুলোর অবস্থা এভাবে তুলে ধরেছেন–

'যদিও আরবজাতি প্রাচীন ঐতিহ্যের অধিকারী ছিলো তবু খৃস্টীয় ষষ্ঠ শতাব্দীর পৃথিবীতে তাদের কোন গুরুত্ব ছিলো না। শুধু আরবরা কেন, প্রকৃতপক্ষে তখন কোন জনগোষ্ঠীরই আলাদা কোন গুরুত্ব ছিলো না। কারণ সেটা ছিলো (মানব-সভ্যতার জন্য) একটা মুমূর্ষুকাল, যখন পূর্বইউরোপ ও পশ্চিম এশিয়ার বিশাল দুই সাম্রাজ্য হয় সম্পূর্ণ ধ্বংস হয়ে গিয়েছিলো, কিংবা তাদের রাজকীয় শাসন বিলুপ্তির প্রান্তসীমায় এসে পড়েছিলো।'

'সেটা ছিলো এমন এক পৃথিবী যা তখনো গ্রীকদের ভাষা-অলঙ্কার, পারস্যের তাপ ও প্রতাপ এবং রোমের জৌলুস ও জাঁকজমক দ্বারা বিমোহিত ছিলো। কোন কিছু, এমনকি কোন একটি ধর্মও এমন ছিলো না, যা ঐগুলোর কোন একটির স্থান গ্রহণ করতে পারে।'

'ইহুদীরা তো সারা পৃথিবীতে ছিন্নমূল এবং কেন্দ্রীয় নেতৃত্বহীন অবস্থায় ঘুরে মরছিলো। পরিস্থিতি অনুযায়ী কখনো তাদের সহ্য করা হতো, আর কখনো

[১] (ইমাম আহমদ নিজস্ব সনদে তা বর্ণনা করেছেন হযরত ইবনে আব্বাস (রা) হতে, আর তিনি হযরত সালমান (রা) হতে। হাদীছ নম্বর, ২২৬২০, বাযযাও তাঁর মুসনাদে বর্ণনা করেছেন, খ. ৬ পৃ. ৪৬৩, তাবারানীও বর্ণনা করেছেন المعجم الكبير এ; খ. ৬ পৃ. ২২৩। এই বর্ণনাটি অবিচ্ছিন্ন সনদের কারণে এবং বর্ণনাকারীদের আদালত ও ন্যায়পরতার কারণে জাহেলিয়াত ও তার ধর্মীয় অবস্থা সম্পর্কে বিশুদ্ধতম ঐতিহাসিক একটি দলীলরূপে গণ্য।)

তাদের উপর যুলুম নির্যাতন চালানো হতো। নিজের বলতে তাদের কোন দেশ ছিলো না। তখনো তাদের ভবিষ্যত তেমনি অনিশ্চিত ছিলো যেমন আজ।'

'মহামতি পোপ গ্রেগরীর প্রভাববলয়ের বাইরে খৃস্টানরা তাদের সহজ-সরল ধর্মবিশ্বাসে বিচিত্র সব জটিল তত্ত্ব উদ্ভাবনে তৎপর ছিলো এবং এ নিয়ে পরস্পর হানাহানিতে মেতে উঠেছিলো।'

'শুধু পারস্যে সাম্রাজ্যবিনির্মাণের একটি শেষ সম্ভাবনা দেখা যাচ্ছিলো। সম্রাট দ্বিতীয় খসরু তার সাম্রাজ্যের সীমানা বিস্তারে ব্যস্ত ছিলেন। রোমসাম্রাজ্যকে পর্যুদস্ত করে তিনি কাপাডোসিয়া, মিসর ও সিরিয়া দখল করে নিয়েছিলেন। তাছাড়া ৬২০ খৃস্টাব্দে (যখন মুহম্মদ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) পথ-প্রদর্শকরূপে আত্মপ্রকাশ করেন সে সময় সম্রাট দ্বিতীয় খসরু বাইতুল মাকদিস ধ্বংস করে পবিত্র ক্রুশ লুণ্ঠন করে নিয়ে গিয়েছিলেন। এভাবে তিনি সম্রাট প্রথম দারা-এর রাজপ্রতাপ পুনরুদ্ধার করেছিলেন। অবস্থাদৃষ্টে মনে হচ্ছিলো যেন মধ্যপ্রাচ্যেও শৌর্য-সাহস নতুন প্রাণ লাভ করেছে। অবশ্য বাইজান্টাইন রোমকরাও তাদের অতীতশৌর্য তখনো কিছুটা ধারণ করছিলো। পারস্যসম্রাট খসরু যখন কনস্টান্টিনোপলের নগরপ্রাচীরের কাছে তার বাহিনী নিয়ে উপস্থিত, তখন তারা সংগ্রাম ও প্রতিরোধের একটা চূড়ান্ত প্রচেষ্টার প্রদর্শনী করেছিলো।'

'দূরপ্রাচ্যের পরিবেশ-পরিস্থিতিও সন্তোষজনক কোন ছাপ রাখতে পারছিলো না। হিন্দুস্তান তখনো ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ও গুরুত্বহীন রাজ্যে বিভক্ত ছিলো এবং সামরিক ও রাজনৈতিক পর্যায়ে শ্রেষ্ঠত্ব অর্জনের চেষ্টায় লিপ্ত ছিলো।'

'চীনারাও সবসময়ের মত পারস্পরিক সঙ্ঘাত-সঙ্ঘর্ষে লিপ্ত ছিলো। সুঈ বংশের উত্থান হলো, পতনও হয়ে গেলো, আর তাদের স্থান দখল করে নিলো তাঙ বংশ, যারা শাসনক্ষমতায় ছিলো তিনশ বছর।'

'জাপানে প্রথমবারের মত এক নারী সিংহাসনে আরোহণ করেছিলেন। তখন সেখানে বৌদ্ধধর্ম শিকড় গেড়ে বসছিলো এবং জাপানীদের নিজস্ব ধ্যান-ধারণা ও চিন্তা-চেতনার উপরও তার প্রভাব পড়তে শুরু করেছিলো।'

'স্পেন ও ইংলেন্ড ছিলো গুরুত্বহীন ও ক্ষুদ্র দেশ। স্পেনে ছিলো 'ভিসিগথ'দের শাসন, যারা মাত্র কিছুকাল আগে ফ্রান্সের বিরাট এলাকা দখল করেও সেখান থেকে বিতাড়িত হয়েছে। স্পেনে তারা ইহুদীদের উপর চরম যুলুম নির্যাতন চালিয়ে যাচ্ছিলো, যা শতাব্দীকাল পরের মুসলিম অভিযানের অনুকূল ক্ষেত্র প্রস্তুত করছিলো।'

'বৃটেন উপদ্বীপ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র স্বাধীন রাজ্যে বিভক্ত ছিলো। রোমকরা বিদায় নিয়েছে, দেড়শ বছর হয়ে গিয়েছে এবং নরদিকরা তাদের স্থান দখল করে নিয়েছে। খোদ ইংল্যান্ড সাতটি স্বতন্ত্র রাজ্যের সমষ্টি ছিলো।'[১]

মোটকথা বিশ্বজাতিবর্গের বিশৃঙ্খল ও শক্তিহীন অবস্থা যেন একটি নতুন শক্তির আবির্ভাবের প্রতীক্ষায় ছিলো।

[১] the messenger :the lif of muhammad সংক্ষেপিত, পৃ. ১৮-১৯

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

জাহেলী যুগের রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক ব্যবস্থা

ধর্ম ও রাজনীতি এবং নীতি ও অর্থনীতির সম্পর্ক

সমাজ-সংস্কার ও সমাজ-সংশোধনের কল্যাণ-চিন্তা যারা করেন তারা সাধারণত সমাজে বিদ্যমান রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক পরিস্থিতির কথা ভেবে দেখেন না, বা ভেবে দেখার প্রয়োজন বোধ করেন না। অথচ রাজনীতি ও অর্থনীতি হচ্ছে সমাজ-জীবনের অবিচ্ছেদ্য বিষয়। ভুল করে হলেও সমাজতন্ত্রের প্রবক্তা কালমার্কস তো অর্থনীতিকেই (সেই সূত্রে রাজনীতিকেও) ভেবেছেন সকল সামাজিক সম্পর্কের ভিত্তি এবং সকল পরিবর্তনের কেন্দ্রবিন্দু। তিনি ভুল করেছেন, তবে এর দ্বারা মানবজীবনে অর্থনীতি ও রাজনীতির গুরুত্ব তো অতি-অবশ্যই প্রমাণিত হয়। রাজনীতি ও অর্থনীতিকে বাদ দিয়ে বা পাশকাটিয়ে পরিচালিত যে কোন সামাজিক ও ধর্মীয় সংস্কারপ্রচেষ্টা ব্যর্থ হতে বাধ্য। কোরআন ও সুন্নাহ তাই ধর্ম ও নীতি-নৈতিকতার কথা যেমন বলেছে তেমনি শাসনব্যবস্থা ও অর্থব্যবস্থার সংশোধনের কথাও গুরুত্বের সঙ্গে বলেছে। পৃথিবীতে ধর্ম, সভ্যতা ও সংস্কৃতির ইতিহাসে যত পরিবর্তন এসেছে এবং যত উত্থান-পতন ঘটেছে তাতে মানুষের চরিত্র ও নৈতিকতার যেমন ভূমিকা ছিলো তেমনি ভূমিকা ছিলো রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক পরিস্থিতিরও। জাতীয় জীবনের গঠন-পুনর্গঠনের ক্ষেত্রেও রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক ধ্যান-ধারণা ও বিধিবিধান অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ও কার্যকর অনুঘটকরূপে গণ্য হয়ে থাকে।

ইসলামপূর্ব যুগের জাহেলিয়াত সম্পর্কে আলোচনার ক্ষেত্রেও একই কথা। জাহেলী যুগের বিভিন্ন জনগোষ্ঠী ও জনপদের ধর্মীয় ও আধ্যাত্মিক এবং নৈতিক ও সামাজিক অবস্থা পর্যালোচনা করার পর তখনকার রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক

চালচিত্রের উপরও বিশেষভাবে আলোকপাত করা জরুরী বলে আমরা মনে করি। সুতরাং এখানে আমরা অতি সংক্ষেপে সে আলোচনাটা সেরে নিচ্ছি।

স্বেচ্ছাচারী রাজতন্ত্র

এককথায় বলা যায়, ইসলামপূর্ব জাহেলী যুগ ছিলো একনায়কতন্ত্র ও স্বেচ্ছাচারী শাসনের যুগ। কেননা অবাধ রাজতন্ত্রই ছিলো সে যুগের একমাত্র প্রচলিত শাসন -ব্যবস্থা, যেখানে রাজ্যের ও প্রজাবর্গের প্রতিটি বিষয়ে রাজ-আজ্ঞাই ছিলো প্রথম কথা এবং শেষ কথা। রাজতন্ত্র প্রায় ক্ষেত্রে রাজবংশের অতিমানবীয় মর্যাদার উপর প্রতিষ্ঠা লাভ করতো, যেমন ছিলো ইরানে। সাসানী রাজবংশের দাবী ও বিশ্বাস ছিলো, শাসনক্ষমতার উপর তাদের রয়েছে মৌরুসি অধিকার এবং তা ঐশী সমর্থনপুষ্ট। প্রজাসমাজেও এ বিশ্বাস তারা বদ্ধমূল করার সর্বাত্মক চেষ্টা করেছে এবং সফলও হয়েছে। একসময় পারস্যের প্রজাবর্গ সাসানীদের এই পবিত্র রাজ-অধিকার স্বীকার করে নিয়েছিলো, এমনকি তা তাদের ধর্মবিশ্বাসের অবিচ্ছেদ্য অংশে পরিণত হয়েছিলো।

কখনো রাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হয়েছে স্বয়ং সম্রাটের নিরঙ্কুশ অতিমানবীয় মর্যাদার-উপর। যেমন চীনে সম্রাটকে প্রজারা 'আকাশের পুত্র' বলে অভিহিত করতো। কেননা তাদের বিশ্বাসে, আকাশ ও পৃথিবী হলো 'নর' ও 'নারী' এবং উভয়ের মিলনে সৃষ্টিকুলের উদ্ভব। আর সম্রাট প্রথম 'খাতা' হচ্ছেন আকাশ-পৃথিবীর মিলনের প্রথম ফল। এ বিশ্বাসের ভিত্তিতেই সিংহাসনে সমাসীন সম্রাটকে মনে করা হতো প্রজাকুলের একমাত্র পিতা, যার নিরঙ্কুশ অধিকার রয়েছে যে কোন ইচ্ছা করার এবং তা কার্যকর করার। সম্রাটকে সম্বোধন করা হতো 'আপনিই আমাদের মাতা-পিতা' বলে! সম্রাট লীয়ান, কিংবা তাঈগুঙের মৃত্যুতে সমগ্র চীন এমন শোক-মাতম করেছিলো যার নযির ইতিহাসে দ্বিতীয়টি আর নেই। কেউ সুঁই-খুঁচিয়ে চেহারা রক্তাক্ত করেছে, কেউ কফিনে মাথা ঠুকে নাক-কান জখম করেছে। বুকফাটা কান্না তো ছিলো মামুলি কথা![১]

কখনো রাজতন্ত্রের ভিত্তি ছিলো বিশেষ কোন জাতির এবং বিশেষ কোন দেশ ও ভূখণ্ডের অতিমানবীয় মর্যাদার উপর। যেমন ছিলো রোমান সাম্রাজ্যে। রোম ও রোমান জাতির প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শন ছিলো সাম্রাজ্যের মৌলিক বিধানের অন্তর্ভুক্ত। অন্যান্য জাতি ও জনগোষ্ঠী ছিলো রোমান জাতীয়তার সেবাদাস, দেহের শিরা-

[১] জেমস কারকর্ন-রচিত, চীনের ইতিহাস।

উপশিরা যেমন রক্ত সঞ্চালন করে নিয়ে যায় দেহের মূল কেন্দ্র হৃদ্‌পিণ্ডে, তেমনি রোমানরা ছিলো সাম্রাজ্যের হৃদপিণ্ড। তাদের অধিকার ছিলো যে কোন আইন লঙ্ঘন করার, যে কারো অধিকার হরণ এবং সম্ভ্রম লুণ্ঠন করার। যে কোন জুলুম ও স্বেচ্ছাচার তাদের জন্য ছিলো বৈধ। এমনকি রোমান-ধর্মবিশ্বাস গ্রহণ এবং রোমান সাম্রাজ্যের প্রতি আন্তরিকতা ও বিশ্বস্ততা প্রদর্শনের পরও কোন ব্যক্তি বা গোষ্ঠী রোমানদের জুলুম-নির্যাতন থেকে রেহাই পাবে, এমন নিশ্চয়তা ছিলো না। নিজেদের ভূখণ্ডে বিজিত জাতির স্বায়ত্তশাসন, বা মৌলিক সুযোগ-সুবিধা ভোগ করার কোন উপায় ছিলো না। এ ধরনের চিন্তা করাও ছিলো ফাঁসি-যোগ্য রাজদ্রোহিতার অপরাধ। বিজিত প্রতিটি অঞ্চল ও জনগোষ্ঠী যেন ছিলো সেই উটনী যা ভার বহন করবে, দুধও দেবে। বিনিময়ে পাবে শুধু বেঁচে থাকার এবং ওলানে দুধ জমা হওয়ার মত দানাপানি।

রোমান সাম্রাজ্য সম্পর্কে রবার্ট ব্রিফোল্ট বলেন–

'রোমান সাম্রাজ্যের পতন ও ধ্বংসের মূল কারণ কিন্তু ক্রমবর্ধমান অপরাধ ও দুর্নীতি ছিলো না *(যেমন হত্যা, লুণ্ঠন, ঘুষ ইত্যাদি)*, বরং মূল কারণ ছিল এই যে, যাবতীয় দুর্নীতি, মন্দাচার ও বাস্তববিমুখতা ছিলো তাদের স্বভাবপ্রবণতা, যা সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠা ও বিকাশের সূচনা থেকেই বিদ্যমান ছিলো এবং তা সমাজ ও রাষ্ট্রের গভীরে শিকড় গেড়ে বসেছিলো। যে কোন মানবসমাজ বা মানবপ্রতিষ্ঠান যদি এ ধরনের ভুল বুনিয়াদ ও ভ্রান্ত ভিত্তির উপর গড়ে ওঠে তাহলে নিছক মেধা ও কুশলতা দ্বারা, তা যত বিপুল পরিমাণেই হোক, সমাজ ও প্রতিষ্ঠানকে পতন থেকে রক্ষা করতে পারে না। যেহেতু অনাচার ও মন্দাচারই ছিলো রোমান সাম্রাজ্যের ভিত্তি-বুনিয়াদ সেহেতু একদিন না একদিন তার পতন ও বিলুপ্তিও ছিলো অনিবার্য। কেননা আমরা দেখেছি, রোমান সাম্রাজ্য গড়েই উঠেছিলো বিপুল জনগোষ্ঠীকে শোষণ করে ক্ষুদ্র জনগোষ্ঠীর ভোগবিলাসের আয়োজন করার উদ্দেশ্যে। এটা ঠিক যে, রোমে ব্যবসা-বাণিজ্য পূর্ণ সততা ও বিশ্বস্ততার সঙ্গে পরিচালিত হতো এবং তা ছিলো রোমান সাম্রাজ্যের অন্যতম মৌলিক বৈশিষ্ট্য। তদুপরি বহুমুখী যোগ্যতায় এবং বিচারব্যবস্থার নির্ভরযোগ্যতায় এ সাম্রাজ্য ছিলো অতুলনীয়, কিন্তু এতসব গুণ ও বৈশিষ্ট্য সাম্রাজ্যকে তার বুনিয়াদি গলদের নির্মম পরিণতি থেকে রক্ষা করতে পারেনি এবং পারার কথাও নয়।'[১]

[১] robert briffault : the making of hummanity. p. 159

রোমান শাসনে মিসর ও সিরিয়া

ডক্টর আলফ্রেড বাটলার মিসরে রোমান শাসন সম্পর্কে বলেন–

'মিসরে রোমান শাসনের একটাই শুধু লক্ষ্য-উদ্দেশ্য ছিলো, শাসকদের ভোগের জন্য প্রজাশোষণ ও সম্পদলুণ্ঠন। মানুষের কল্যাণ ও সুখ-শান্তি এবং জীবন ও জীবিকা নিশ্চিত করার চিন্তাও তাদের ছিলো না; মন ও মনন এবং চিন্তা ও দর্শনের উৎকর্ষসাধন তো অনেক পরের কথা, এমনকি দেশের অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি অর্জনের কথাও তারা ভাবতো না। আগা থেকে গোড়া তাদের শাসন ছিলো একটি বিদেশী শাসন, যা টিকে ছিলো প্রজাসমর্থনের পরিবর্তে সম্পূর্ণ সামরিক শক্তির উপর। শাসিত জনগোষ্ঠীর প্রতি হিতৈষণা ও মমত্ববোধ বলতে কিছুই তাদের মধ্যে ছিলো না।'[১]

একজন সিরীয় আরব ঐতিহাসিক সিরিয়ায় রোমান শাসন সম্পর্কে লিখেছেন–

'শুরুর দিকে সিরীয়দের প্রতি রোমান-আচরণ ছিলো কিছুটা ন্যায়ানুগ; যদিও তাদের রাজত্বে আভ্যন্তরীণ গোলযোগ ও বিশৃঙ্খলা ছিলো। কিন্তু যখন রোমান সাম্রাজ্য জরাগ্রস্ত হয়ে পড়ে তখন সিরিয়ায় তাদের শাসন স্বেচ্ছাচারের নিকৃষ্টতম স্তরে নেমে গিয়েছিলো। অসহায় দাসের প্রতি নিষ্ঠুর মনিবের যে পাশবিকতম আচরণ কল্পনা করা যায় সেটাই তারা তাদের শাসিত জনগোষ্ঠীর সঙ্গে করতো। রোমানরা সিরিয়াকে কখনো সরাসরি তাদের সাম্রাজ্যভুক্ত করেনি। ফলে সিরীয় ভূমি যেমন রোমান ভূখণ্ডের মর্যাদা পায়নি তেমনি সিরীয়রাও পায়নি রোমান নাগরিকের স্বীকৃতি। একজন রোমান যেসব অধিকার ও সুযোগ-সুবিধা ভোগ করতো, হতভাগ্য সিরীয়দের জন্য সেগুলো ছিলো নিষিদ্ধ। নিজ ভূমিতেই তারা ছিলো প্রবাসী, শাসিত ও শোষিত। শোষণমূলক কর-খাজনা আদায়ের জন্য অনেক সময় মানুষ কোলের সন্তান পর্যন্ত বিক্রি করতে বাধ্য হতো। শোষণ-নিপীড়ন চূড়ান্ত সীমায় পৌঁছে গিয়েছিলো। ক্রীতদাস বানানো এবং বেগার খাটানো ছিলো সাধারণ রেওয়াজ। ক্রীতদাস ও মজুরদের বেগার-শ্রমেই রোমানরা তাদের এতো গর্বের ইমারত-স্থাপনা এবং প্রতিষ্ঠান ও শিল্পকারখানা গড়ে তুলেছিলো তাদের বিশাল সাম্রাজ্যে।'

---

[১] arab's conquest of egipt and the last thirty years of the roman dominion

রোমানরা সিরিয়ায় সাতশ বছর রাজত্ব করেছে। সিরিয়া ছিলো শান্তিপূর্ণ দেশ, 'রোমান রাজত্বের উপসর্গরূপেই সেখানে শুরু হয় বিবাদ-গোলযোগ, হানাহানি ও স্বেচ্ছাচার। এদিকে গ্রীকরা সিরিয়ায় রাজত্ব করেছে তিনশ উনসত্তর বছর। তাদের রাজত্বকালে সমগ্র ভূখণ্ডটি ছিলো ভয়ঙ্কর যুদ্ধবিগ্রহের কবলে। সিরীয়দের উপর তখন নেমে আসে অত্যাচার উৎপীড়নের ভয়াবহ অন্ধকার। গ্রীকজাতির স্বভাবপাশবিকতা ও সম্পদলিপ্সা বীভৎসতম রূপে প্রকাশ পায়। বস্তুত সিরীয় জনগোষ্ঠীর জন্য গ্রীকশাসন দেখা দিয়েছিলো চরম অভিশাপ এবং ঘোরতম বিপদরূপে।'[১]

মোটকথা, রোমান ও পারসিক উপনিবেশগুলো বিদেশী শাসনের যাঁতাকলে শুধু পিষ্ট হচ্ছিলো এবং তাদের দুঃখদুর্দশা চরমে পৌঁছে গিয়েছিলো। রাজনৈতিক, সামাজিক ও অর্থনৈতিক সর্বদিক থেকেই দেশ ছিলো চরম অস্থিরতার শিকার; এমনকি রাজধানী ও গুরুত্বপূর্ণ কেন্দ্রগুলোর অবস্থা ছিলো আরো করুণ।

ইরানের খাজনা ও রাজস্বব্যবস্থা

ইরানের খাজনাব্যবস্থা ও রাজস্বনীতি কোনভাবেই ন্যায়ানুগ ও স্থিতিশীল ছিলো না, বরং অধিকাংশ ক্ষেত্রেই ছিলো চরম শোষণমূলক ও অস্থিতিশীল। রাজস্ব-সংগ্রহকারীদের খেয়ালখুশি ও মন-মর্জির উপর যেমন তা নির্ভর করতো তেমনি দেশের রাজনৈতিক ও যুদ্ধপরিস্থিতির কারণে তা ওঠানামা করতো। 'সাসানী শাসনকালে ইরান' গ্রন্থের লেখক বলেন–

'কর নির্ধারণ ও রাজস্ব আদায়ের ক্ষেত্রে রাজকর্মচারীরা সততা ও স্বচ্ছতার পরিচয় দিতো না, বরং শোষণ ও লুণ্ঠনের মানসিকতা পোষণ করতো। যেহেতু কর ও রাজস্বের পরিমাণ ফি বছর পরিবর্তিত হতো এবং ওঠানামা করতো সেহেতু রাজ্যের আয়-ব্যয় কখনো পরিকল্পিত ও স্থিতিপূর্ণ হতো না। 'যেমন খুশি আয় যেমন খুশি ব্যয়' এই ছিলো অবস্থা। এমনও হতো যে, যুদ্ধ বেঁধে গেছে, অথচ রাজকোষ শূন্য, তখন 'যুদ্ধব্যয়' নামে নতুন কর চাপানো হতো। আর প্রায় সবসময় সাধারণভাবে পশ্চিমের সমৃদ্ধ অঞ্চলগুলো এবং বিশেষভাবে বাবিল এই করনৈরাজ্যের শিকার হতো।'[২]

---

[১] خطط الشام للأستاذ محمد كرد علي খ. ১ পৃ. ১০১ - ১০৩

[২] a.l. christensen : l'iran sous les sassanides উর্দূ অনুবাদ মুহম্মদ ইকবাল, পৃ.১৬৩

রাজভাণ্ডার ও রাজার ভাণ্ডার

দেশের উন্নয়ন ও প্রজাকল্যাণে রাজকোষ থেকে যা ব্যয় করা হতো তার পরিমাণ ছিলো অতি নগণ্য। বরং 'সম্পদ জমা করো রাজভাণ্ডারে নয়, রাজার ভাণ্ডারে' এ-ই ছিলো প্রাচীনকাল থেকে পারস্যের নীতি। তাই যতদূর সম্ভব নগদ অর্থ, সোনাদানা ও মূল্যবান সামগ্রী সম্রাটের ব্যক্তিগত কোষাগারে জমা হতো। সম্রাট দ্বিতীয় খসরুর ব্যক্তিগত সম্পদ যখন মাদায়েনে নবনির্মিত প্রাসাদে স্থানান্তরিত হয় তখন শুধু স্বর্ণের পরিমাণই ছিলো ৪৬ কোটি ৮০ লাখ মিছকাল, অর্থাৎ ৩৭ কোটি ৫০ লাখ ফ্রাংক স্বর্ণমুদ্রা। তার রাজত্বের তেরবছর পূর্তির পর এর পরিমাণ বেড়ে দাঁড়িয়েছিলো ৮০ কোটি মিছকাল। সম্রাট সাহেবের রাজমুকুটে ব্যবহৃত স্বর্ণের পরিমাণ ছিলো ১২০ পাউন্ড (প্রায় দেড় মন)। (রাজমুকুটটি ছিলো স্বর্ণ-রৌপ্যনির্মিত এবং হিরা, পান্না ও মুক্তাখচিত। আর তা 'রাজমস্তকের' উপর এত সূক্ষ্ম স্বর্ণশৃঙ্খল দ্বারা ঝুলন্ত ছিলো যে, দূর থেকে বোঝা যেতো না। মনে হতো রাজমস্তক স্বয়ং তা ধারণ করে আছে, অথচ কোন মানব-মস্তকের পক্ষে এত ভার ধারণ করা সম্ভবই ছিলো না। কেননা তার ওজন ছিলো ৯১ কিলোগ্রামেরও বেশী। বেচারা সম্রাট!)

বিশাল শ্রেণীবৈষম্য

পারস্যের জাতীয় জীবনে সমৃদ্ধি ও প্রাচুর্য ছিলো অকল্পনীয় পরিমাণে। তবে তা সীমাবদ্ধ ছিলো অল্পকিছু ব্যক্তি ও পরিবারের মধ্যে। আর বিশাল জনগোষ্ঠী ছিলো অভাব ও দারিদ্র্যের অসহায় শিকার। পারস্যের ইতিহাসে সম্রাট নওশেরাঁওয়া ছিলেন সুশাসন ও সুবিচারের ক্ষেত্রে প্রবাদমর্যাদার অধিকারী। তারই শাসনকাল সম্পর্কে 'সাসানী শাসনে ইরান' গ্রন্থের লেখক বলেন−

সম্রাট নওশেরাঁওয়া রাজ্যের অর্থব্যবস্থায় যে সংস্কার সাধন করেছিলেন তা প্রজাস্বার্থের চেয়ে রাজকোষের স্বার্থই বেশী রক্ষা করেছিলো। ফলে প্রজাসাধারণ আগের মতই অজ্ঞতা ও দারিদ্র্যের অন্ধকারে জীবনধারণ করতো। যেসব বাইজান্টাইন দার্শনিক 'রাজ-আশ্রয়' গ্রহণ করেছিলেন, অচিরেই তারা পারস্যের প্রতি বীতশ্রদ্ধ হয়ে পড়েন। একথা সত্য যে, তারা এমন উচ্চমার্গের দার্শনিক ছিলেন না যে, একটি ভিন্ন জাতির সংস্কৃতি ও রীতি-প্রথা নিরপেক্ষ দৃষ্টিতে বিচার করতে পারেন; তদুপরি একজন দার্শনিকসম্রাটের রাজত্বে যে সকল কল্যাণচিন্তার প্রত্যাশা ছিলো তা তারা দেখতে পাননি; সর্বোপরি জাতিতত্ত্বের গভীর অধ্যয়নেও

তাদের আগ্রহ ছিলো না এবং তাদের মননশীলতাও এমন ছিলো না, যা জাতিতত্ত্বে গভীর জ্ঞানের অধিকারী ব্যক্তির হয়ে থাকে; এসব কারণে পারস্যের প্রতি তাদের বীতশ্রদ্ধার ভিত্তি ছিলো সাধারণ কতিপয় আচার-প্রথা, যেমন কন্যা-ভগ্নিবিবাহপ্রথা এবং মৃতদেহ উন্মুক্ত ফেলে রাখার সংস্কার। অথচ নিছক এ জাতীয় রীতি-প্রথা তাদের পারস্যবাস অপ্রিয় হওয়ার কারণ হওয়া উচিত ছিলো না। আসল কারণ তো ছিলো উচ্চ-নীচ জাতপ্রথা, সমাজের অনতিক্রম্য শ্রেণী-বৈষম্য, নিদারুণ অভাব ও দুর্দশাগ্রস্ত জীবন, দুর্বলের প্রতি সবলের অবর্ণনীয় যুলুম-নিপীড়ন এবং চরম পাশবিক ও নিষ্ঠুর আচরণ; এগুলো ছিলো আসল মর্মপীড়ার কারণ, (অথচ এগুলো তাদের নযরেই পড়েনি।)[১]

এ নাযুক অবস্থা শুধু ইরানেই ছিলো না, বরং তাদের সমসাময়িক ও প্রতিপক্ষ বাইজান্টাইন সাম্রাজ্যেও অমানবিক শ্রেণীব্যবস্থা ও বৈষম্যপ্রথা বিদ্যমান ছিলো। রবার্ট ব্রিফোল্ট লিখেছেন−

এটাই চিরাচরিত নিয়ম যে, যখন কোন সমাজ-প্রতিষ্ঠান পতনমুখী হয়ে পড়ে তখন সমাজনিয়ন্ত্রকরা আর কোন উপায় খুঁজে পায় না সমাজের গতি ও অগ্রগতি রুদ্ধ করে দেয়া ছাড়া। এ কারণেই দেখা যায়, রোমান সমাজ (তার পতনযুগে) চরম নিপীড়নমূলক শ্রেণীপ্রথার নিগড়ে আবদ্ধ হয়ে ধুকে ধুকে মরছিলো। সমাজের নিম্নশ্রেণীর কারো উপায় ছিলো না পেশা পরিবর্তন করার। সন্তান বাধ্য ছিলো বাবার পেশায় পড়ে থেকে অন্ধকার ভবিষ্যতকেই বরণ করে নিতে। উভয় সাম্রাজ্যেই বড় বড় রাজপদ ঐসব বনেদি ঘর ও ঘরানার জন্যই নির্ধারিত ছিলো যাদের প্রভাব ও প্রতাপ ছিলো এবং রাজবংশের সঙ্গে সুসম্পর্ক ছিলো।[২]

পারস্যের কৃষকসমাজ

নিত্যনতুন কর ও খাজনার বোঝা পারস্যের কৃষকসমাজ ও সাধারণ মানুষের কোমর ভেঙ্গে দিয়েছিলো। ফলে বহু কৃষক কৃষিকাজ ছেড়ে ধর্মীয় উপাসনালয়ে আশ্রয় নিয়েছিলো। উদ্দেশ্য ছিলো করভার থেকে এবং বাধ্যতামূলক সেনাভর্তি থেকে আত্মরক্ষা করা। কেননা রাজবংশের প্রতি যেমন তাদের ভালোবাসা ছিলো

---

[১] সাসানী শাসনে ইরান সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে হলে দেখুন 'ইরান বা-আহদে সাসান (উর্দূ অনুবাদ) মূল লেখক a.l. christensen মূল গ্রন্থের নাম, l'iran sous les sassanides

[২] robert briffault : the making of hummanity. p. 160

না, তেমনি যুদ্ধের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যের প্রতিও কোন আকর্ষণ ছিলো না। ফলে ব্যাপক বেকারত্ব দেখা দিলো এবং অপরাধপ্রবণতা বেড়ে গেলো, আর মানুষ ঝুঁকে পড়লো অসদুপায়ে উপার্জনের বিভিন্ন পথে।

পারস্যের কৃষকসমাজ, যারা ছিলো রাজ্যের খাদ্য ও রাজস্বের প্রধান উৎস তাদের দুর্দশা ও করুণ অবস্থা সম্পর্কে 'সাসানী আমলে ইরান' গ্রন্থের লেখক বলেন–

'কৃষকরা ছিলো চরম দুঃখ-দুর্দশায় নিপতিত। তাদের পরিচয় ছিলো, নিজ নিজ ভূমির সঙ্গে বাঁধা ভূমিদাস। তাদের থেকে যখন তখন যে কোন বেগারশ্রম নেয়া হতো। ঐতিহাসিক এ্যাম্মিয়ান মারসেলিনিউস বলেন, 'এই হতভাগ্য কৃষকদের বড় বড় দল (ভারবহন ও অন্যান্য কাজের জন্য) সৈন্যবাহিনীর পিছনে পায়ে হেঁটে চলতো। এ থেকে বাঁচার কোন উপায় ছিলো না। দাসত্বই যেন ছিলো তাদের স্থায়ী নিয়তি ও জীবন-পরিণতি। ন্যূনতম মজুরি বা সামান্য সান্ত্বনা-পুরস্কারও জুটতো না তাদের ভাগ্যে। ভূস্বামীদের সঙ্গে তাদের নিতান্তই দাস-মনিবের সম্পর্ক ছিলো।

স্বেচ্ছাচার ও যুলুম-অত্যাচার

সিরিয়া ও ইরাকে ইহুদিরা এবং মিসরে ইয়াকূবীরা ভয়াবহ নির্যাতন-নিপীড়ন ও যুলুম-অত্যাচারের শিকার ছিলো। রাজকর্মচারী ও শাসকশ্রেণী এমন পাশবিক ও নিষ্ঠুর আচরণ করতো যে, সাধারণ মানুষ দিশেহারা হয়ে পড়েছিলো। না জানমালের নিরাপত্তা ছিলো, না ইয্যত-আবরু রক্ষিত ছিলো। চোখ বুজে ঠোঁট কামড়ে সবকিছু সয়ে যাওয়া ছাড়া তাদের কোন উপায় ছিলো না। ক্ষমতার বাগডোর যাদের হাতে তারা কারো অভিযোগ-ফরিয়াদ কানেই তুলতো না, শুনেও শুনতো না। হতভাগ্য মানুষ শেষে ধরেই নিয়েছিলো, এ অভিশপ্ত জীবনই তাদের নিয়তি, যা থেকে মুক্তির কোন উপায় নেই। তবে কখনো কখনো কেউ কেউ মৃত্যুযন্ত্রণার মাধ্যমে জীবনযন্ত্রণা থেকে পরিত্রাণের চেষ্টা করতো।

অসার সভ্যতা ও ভোগবাদী জীবন

রোম ও পারস্য উভয় সাম্রাজ্যেই মানুষ ভোগবিলাসের জীবনে প্রবলভাবে মেতে উঠেছিলো এবং কৃত্রিম জীবন ও নগরসভ্যতার পঙ্কে আকণ্ঠ ডুবে ছিলো। রোমান ও পারসিক রাজপুরুষ ও শাসকশ্রেণী ভোগবিলাসের ঘোরে এমনই বিভোর ছিলো, যেন রাজ্যশাসন ছিলো গৌণ; জীবনকে চুটিয়ে ভোগ করাই ছিলো মুখ্য।

তাদের একমাত্র চিন্তা ছিলো চেটেপুটে আনন্দ করা এবং জীবন থেকে স্ফূর্তির রস নিংড়ে বের করা। আয়েশ-অপচয় ছিলো এমনই সীমাহীন যে, কল্পনা করাও সম্ভব নয়। জীবনের আড়ম্বরে, ভোগের উপাদানে এবং বিনোদনের উপায়-উপকরণে ছিলো এমন বৈচিত্র্য, সূক্ষ্মতা ও রসবোধ যার বিবরণ মনে হবে স্বপ্নের মত। তবু কিছুটা শোনা যাক– সম্রাট পারভেজের 'ব্যবহারে' ছিলো বারো হাজার সুন্দরী নারী এবং পঞ্চাশ হাজার সুন্দর ঘোড়া; ছিলো অসংখ্য মনোরম প্রাসাদ। আনন্দ-বিলাসের এমন সব আয়োজন এবং সম্পদপ্রাচুর্যের এমন রকমারি প্রদর্শন ছিলো যে, চিন্তা-বুদ্ধি রীতিমত তাক লেগে যায়। জৌলুসে, জাঁকজমকে ও আলোঝলমলতায় তার খাছ মহল নিজেই ছিলো নিজের তুলনা। পার্সিক ধর্মের অনুসারী ঐতিহাসিক শাহীন ম্যাকারিউস বলেন–

'ইতিহাস বলে না যে, পৃথিবীর কোন বাদশাহ বা সম্রাট পারস্যের রাজপুরুষদের মত ভোগবিলাসের দৃষ্টান্ত রাখতে পেরেছেন, যাদের কাছে উপহার উপঢৌকন জড়ো হতো দূর ও নিকটপ্রাচ্যের সকল দেশ থেকে।'[১]

ইসলামী বিজয়াভিযানের মুখে ইরাক থেকে পলায়নকালে তারা বিপুল পরিমাণ বিলাসপোশাক, স্বর্ণপাত্র, প্রসাধনী, সুবাসদ্রব্য এবং বিচিত্র বস্তুসামগ্রী ফেলে গিয়েছিলো, যার অর্থমূল্য পরিমাপ করাও দুঃসাধ্য ছিলো। তাবারীর বর্ণনায়, মাদায়েন বিজয়কালে আরবরা কিছু তুর্কী খিমা পেয়েছিলো যা মুখগালা করা অসংখ্য ঝুড়িতে পূর্ণ ছিলো। আরবরা বলে, 'আমরা ভেবেছিলাম, এগুলোতে খাদ্যসামগ্রী রয়েছে, কিন্তু দেখা গেলো, তা সোনা-রূপার দ্রব্যসামগ্রীতে পূর্ণ!'[২]

মাদায়েনদিবসে আরবরা যে আজব গালিচাটি পেয়েছিলো, যার নাম ছিলো 'ফরাস বাহার', যাতে বসে ইরানী রাজপুরুষেরা সুর ও সুরা উপভোগ করতেন তার বর্ণনা দিতে গিয়ে আরব ঐতিহাসিকগণ বলেন–

'একটি মাত্র গালিচার আয়তন ছিলো ষাট বর্গগজ, যা প্রায় এক একর ভূমি জুড়ে বিছানো হতো। যার যমিন ছিলো সোনার তারে বোনা এবং মণিমুক্তাখচিত। পুরো গালিচা ছিলো বাগানসদৃশ, যাতে বৃক্ষ ছিলো স্বর্ণের, পাতা ছিলো সবুজ রেশমের, ফুল ও ফুলের কলি এবং ফল ও ফলের মুকুল ছিলো ছোট বড় হিরা-জহরতের। তাতে বিভিন্ন নহর-নালা ও পায়চারির পথ ফুটিয়ে তোলা হয়েছিলো

---

[১] تاريخ إيران (شاهين مكاريوس) طبع مصر ১৮৯৮ সনে প্রকাশিত, পৃ. ৯০ এবং ২১১
[২] তারীখে তাবারী ৪র্থ খণ্ড

আশ্চর্য সব কারুকাজ করে। তার চারপাশে ছিলো বসন্তের সবুজ ফসলভূমি এবং সবজীর বাহার। সবই রচনা করা হয়েছিলো সোনা-রূপা, রেশমসুতা, হিরা-মুক্তা ইত্যাদি দ্বারা। এটা তারা প্রস্তুত করেছিলো শীতকালের জন্য, যখন ফুলের মৌসুম গত হয়ে যেতো। তখন তারা সেই গালিচার উপর সুর ও সুরার আসর জমাতো, আর মনে হতো যেন বসন্ত-উদ্যান![1]

এ থেকেই আন্দায করা যায়, পারস্যসভ্যতা ভোগ-উপভোগ ও বিলাসপ্রাচুর্যের কোন্ চরম সীমায় গিয়ে উপনীত হয়েছিলো। বস্তুত পারস্যের রাজপুরুষদের আনন্দবিনোদনে সম্পদপ্রাচুর্যের এমন কারিশমা ঝলমল করে উঠতো যা প্রবহমান সময় ও কাল কখনো কোথাও দেখেনি।

একই অবস্থা ছিলো রোমান শাসনাধীন সিরিয়া ও তার কেন্দ্রীয় শহরগুলোতে। বলা যায়, ভোগবিলাসে, বিনোদনপ্রাচুর্যে এবং নগরসংস্কৃতির সূক্ষ্মতা ও বৈচিত্র্যে রোমান ও পারসিক সভ্যতা যেন পরস্পরকে ছাড়িয়ে যাওয়ার প্রতিযোগিতায় ছিলো বিভোর। রোমান রাজপুরুষগণ এবং তাদের সিরীয় রাজন্যবর্গ প্রাণ খুলে ভোগ-উপভোগ ও আনন্দবিনোদনের 'সমঝদারি' করতেন। তাদের আলিশান মহল ও বালাখানা এবং নাচগান ও শরাবের জলসাগুলো ছিলো বিলাস ও প্রাচুর্যের বিচিত্র সব দ্রব্যসামগ্রীতে পরিপূর্ণ। ইতিহাস ও লোকবর্ণনা থেকে জানা যায়, রুচিবোধ, পরিপাটিতা ও বিলাসবৈচিত্র্যে এরা অনেক দূর গিয়েছিলো। ইসলাম গ্রহণের পূর্বে হযরত হাসসান বিন ছাবিত সিরিয়ার গাস্সানী সরদারদের মজলিসে ওঠাবসা করেছেন। তিনি জাবালা ইবনুল আয়হামের বিনোদনজলসার চিত্র এঁকেছেন এভাবে–

'আমি দশজন গায়িকা দাসী দেখেছি, পাঁচজন ছিলো রোমের, যারা সেতারা বাজিয়ে রোমান গান গায়। অন্য পাঁচজন গায় হিরা অঞ্চলের সুরে। আরব সরদার ইয়াস ইবনে কোবায়সা উপঢৌকনরূপে তাদের পাঠিয়েছিলো। এছাড়া মক্কা ও অন্যান্য অঞ্চল থেকেও গায়ক-গায়িকার দল তার কাছে আসতো। যখন শরাবের মজলিসে জাবালার ফরাসের উপর জুঁই-চামেলী ও অন্যান্য ফুল বিছিয়ে দেয়া হতো এবং সোনা-রূপার পাত্রে মিশক-আম্বর পরিবেশন করা হতো। শীতকালে হলে উদ ও চন্দনকাঠ জ্বালানো হতো, আর গরমকালে বরফ ছড়িয়ে দেয়া হতো। গরমের সময় তার ও তার পানসঙ্গীদের জন্য বিশেষ ঠাণ্ডা

---

[1] তারীখে ইসলাম, মওলভী আব্দুল হালীম শরর, খ. ১ পৃ. ৩৫৪ (তাবারী ও অন্যান্য সূত্র থেকে)

পোশাকের ব্যবস্থা করা হতো; পক্ষান্তরে শীতকালে পশমী পোশাক এবং চর্মবস্ত্রাদির ব্যবস্থা করা হতো।'[1]

দেশের অভিজাত ও বিত্তশালী শ্রেণী, এমনকি মধ্যবিত্তরাও পানাহার, পোশাক-পরিচ্ছদ এবং জীবনযাপনের সর্বক্ষেত্রে রাজপুরুষদের অনুকরণের চেষ্টায় মেতে উঠেছিলো। জীবনযাত্রা হয়ে পড়েছিলো অতি ব্যয়বহুল এবং সমাজযাত্রা অত্যন্ত জটিল। একজন মানুষ শুধু নিজের উপর, শুধু নিজের পোশাকপরিচ্ছদের উপর, এমনকি পোশাকের একেকটি অংশের উপর এত বিপুল অপচয় করতো যা গোটা জনপদের অন্ন-বস্ত্রের সংস্থানের জন্য যথেষ্ট হতে পারতো। কিন্তু যে কোন ভদ্র ও অভিজাত ব্যক্তি এ অপচয় বা অপব্যয় করতে বাধ্য ছিলো। কেননা এ বিষয়ে সামান্য শিথিলতা করার অর্থই ছিলো সমাজের চোখে নিজেকে হেয় করা এবং লোকনিন্দার শিকার হওয়া।

মোটকথা, এটা হয়ে পড়েছিলো জীবনের অপরিহার্য প্রয়োজন এবং সমাজের অপরিবর্তনীয় বিধান। শা'বী বলেন, পারস্যের অভিজাত লোকেরা নিজ নিজ সামাজিক মর্যাদা অনুযায়ী মস্তকাবরণ গ্রহণ করতো। যে ব্যক্তি পূর্ণ অভিজাত্য অর্জন করেছে তার মস্তকাবরণের মূল্য একলাখ দিরহাম। হুরমুয ছিলেন পূর্ণ আভিজাত শ্রেণীর, তাই তার মস্তকাবরণের মূল্য ছিলো একলাখ এবং তা মুক্তো-খচিত ছিলো। পূর্ণ আভিজাত্যের অর্থ ছিলো ইরানের সপ্তঅভিজাত পরিবারের কোন একটির সদস্য হওয়া। কিসরার শাসনামলে হিরা অঞ্চলের শাসক আযাদিয়া ছিলেন অর্ধআভিজাত্যের অধিকারী, তাই তার মস্তকাবরণের মূল্য ছিলো পঞ্চাশ হাজার দিরহাম। (মুসলিম বিজয়াভিযানের পর) রুস্তমের মস্তকাবরণ সত্তর হাজার দিরহামে বিক্রি হয়েছিলো, যার প্রকৃত মূল্য ছিলো একলাখ।[2]

এই বিলাস-সভ্যতা ও তার পচনধরা রীতি-প্রথা মানুষের অস্থিমজ্জায় এমনই মিশে গিয়েছিলো যে, তা থেকে বেরিয়ে আসা তাদের জন্য একরকম অসম্ভব হয়ে পড়েছিলো। এমনকি কঠিন থেকে কঠিন বিপদ ও দুর্যোগের সময়ও তাদের পক্ষে সহজ-সরল জীবনের স্তরে নেমে আসা সম্ভব হতো না। একটিমাত্র উদাহরণ দেখুন, মুসলিম বাহিনীর হাতে মাদায়েনের পতন হলো এবং পারস্যের

---

[1] الأغاني لأبي الفرج الأصفهاني الجلد الأول الصفحة [illegible] এবং তারীখে তাবারী, খ. ৪ পৃ. ১৭৮

[2] تاريخ [illegible] খ. ৪ পৃ. ৬, ১১. ১৩৪

হতভাগ্য শেষ সম্রাট ইয়াযদাজারদকে মাদায়েন থেকে পালাতে হলো, তখন তার কী নাযুক অবস্থা ছিলো! তবু তিনি সঙ্গে নিয়েছেন একহাজার পাচক, একহাজার গায়ক, একহাজার ব্যঘ্রপালক এবং একহাজার ইত্যাদি ইত্যাদি! তবু তার মনে হয়েছে, তাড়াহুড়ায় আয়োজনটা কম হয়েছে।[১]

আহওয়াযের প্রশাসক হরমুযানকে যখন বন্দী অবস্থায় মদীনায় হযরত ওমর (রা)-এর সামনে হাযির করা হলো তখন তার খুব পানির পিপাসা। একটি সাধারণ পেয়ালায় পানি দেয়া হলো (সম্ভবত খলীফাতুল মুসলিমীনের 'পানিপাত্র')। বেচারা তখন বলে, পিপাসায় মরে গেলেও এমন পেয়ালায় পানি পান করতে পারবো না। শেষে অনেক তালাশ করে তার পছন্দমত পেয়ালা আনা হলো।[২]
এ দু'টো ঘটনা থেকেই অনুমান করুন, ইরানীদের স্বভাব ও জীবনাচার কেমন নষ্ট হয়ে গিয়েছিলো; আড়ম্বর ও লৌকিকতায় তারা কেমন 'কাবু' হয়ে পড়েছিলো এবং সহজ-সরল জীবনযাত্রা থেকে কতটা দূরে সরে গিয়েছিলো।

অর্থশোষণ ও করভার

এই সীমাহীন ভোগবিলাস এবং অপচয়পূর্ণ জীবনের অনিবার্য ফল এই ছিলো যে, সাধারণ মানুষের উপর 'কোমরভাঙ্গা' করের বোঝা চাপানো হলো। তাতেও যখন কুলায় না তখন কৃষি, ব্যবসা ও অন্যান্য পেশার লোকদের ধনসম্পদ লুণ্ঠনের জন্য নতুন নতুন করবিধান প্রবর্তন করা হলো, এমনকি তা অসহনীয় পর্যায়ে পৌঁছে গেলো এবং মানুষের জীবন শাব্দিক অর্থেই বিপর্যস্ত হয়ে পড়লো।
'সাসানী আমলে ইরান' গ্রন্থের লেখক বলেন—

নিয়মিত কর ও খাজনা ছাড়াও ইরানী শাসকেরা বিভিন্ন উপলক্ষে প্রজাসাধারণের কাছ থেকে রাজদর্শনী বা রাজউপঢৌকন প্রথার প্রচলন করেছিলেন, যার সরকারী নাম ছিলো 'আইন'। নওরোয বা নববর্ষ এবং মেহেরেগান বা জাতীয় উৎসবে বাধ্যতামূলক রাজউপঢৌকন গ্রহণ করা হতো। এছাড়া আরমেনিয়ার স্বর্ণখনিগুলো গণ্য করা হতো সম্রাটের ব্যক্তিসম্পদ, যা থেকে তিনি ব্যক্তিগত ব্যয় নির্বাহ করবেন।[৩]

---

[১] সাসানী শাসনে ইরান সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে হলে দেখুন 'ইরান বা-আহদে সাসান (উর্দু অনুবাদ) মূল লেখক a.l. christensen মূল গ্রন্থের নাম, l'iran sous les sassanides

[২] تاريخ الطبري খ, ৪ পৃ. ১৬১

[৩] সাসানী আমলে ইরান, আর্থার কৃস্টিন রচিত (উর্দূতে অনূদিত, পৃ. ১৬১)

রোমান সাম্রাজ্যের শাসননীতি ও আয়-ব্যয় সম্পর্কে এক আরব সিরীয় ঐতিহাসিক লিখেছেন—

'সিরীয়দের জন্য বাধ্যতামূলক ছিলো যে, তারা নিয়মিত খাজনা ও রাজস্ব আদায় করবে এবং যাবতীয় আয় ও উৎপন্ন ফসলের একদশমাংশ এবং মূলধনের উপর ধার্যকৃত কর পরিশোধ করবে। মাথাপিছু একটি পরিমাণ নির্ধারিত ছিলো যা আদায় করা ছিলো বাধ্যতামূলক। রোমান সাম্রাজ্যের সম্পদ আহরণের আরো কিছু গুরুত্বপূর্ণ খাত ছিলো, যেমন, নগরশুল্ক, বাণিজ্যশুল্ক, বিভিন্ন খনি ও অন্যান্য রাজস্ব। তাছাড় গমচাষের উপযোগী জমি ও চারণভূমি ইজারায় দিয়ে দেয়া হতো। এই ঠিকাদারদের বলা হতো আশারীন। এরা সরকারের কাছ থেকে টোল-অধিকার ক্রয় করে নিতো। প্রতিটি প্রদেশে আশারীনদের যৌথপ্রতিষ্ঠান ছিলো এবং সেখানে মুন্সী ও তহশীলদার নিযুক্ত ছিলো, প্রজাসাধারণের সঙ্গে যাদের আচরণ ছিলো প্রভুসুলভ। তারা নির্ধারিত পরিমাণের চেয়ে বেশী কর উশুল করতো এবং মানুষকে আরাম আয়েশের সব উপায়-উপকরণ থেকে বঞ্চিত রাখতো; এমনকি সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিকে ক্রীতদাসের মত বিক্রি করে দিতো।'

জনৈক ঐতিহাসিক রোমানসাম্রাজ্যের শাসননীতির চিত্র সুসংক্ষেপে তুলে ধরেছেন এভাবে—

'আদর্শ রাখাল সে-ই যে ভেড়ার লোম কাটে, কিন্তু উপড়ে ফেলে না। তো দুই শতাব্দী ধরে রোমান সম্রাটগণ তাদের প্রজাবর্গের শুধু লোম কাটছেন, (তবে উপড়ে ফেলার চেষ্টা করছেন না।) অর্থাৎ তিনি তাদের বিপুল সম্পদ হরণ করছেন, তবে বহিঃশত্রু থেকে তাদের রক্ষাও করছেন।[১]

প্রজাসাধারণের দুর্ভোগ-দুর্দশা

এভাবে উভয় সাম্রাজ্যে সম্পূর্ণ পৃথক দুটি শ্রেণী সৃষ্টি হয়েছিলো। প্রথমটি হলো রাজা ও রাজবংশ এবং রাজ-অনুগ্রহধন্য অভিজাত ও বিত্তশালী পরিবার। তারা সোনার পেয়ালায় আহার করতো, ফুলের বিছানায় ঘুমোতো, গোলাব ও দুধের নহরে গোসল করতো এবং সর্বপ্রকার ভোগবিলাসে গা ভাসিয়ে দিতো। তাদের ঘোড়ার নাল হতো মূল্যবান পাথরের এবং ঘরের দেয়াল সাজানো হতো রেশমি কাপড়ে।

---

[১] خطط الشام للأستاذ محمد كرد علي খ. ৫ পৃ. ৪৭

দ্বিতীয় শ্রেণীতে ছিলো কৃষিজীবী, বিভিন্ন পেশাজীবী, ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী এবং খেটে খাওয়ার লোকেরা, যাদের জীবন ছিলো আগাগোড়া দুঃখ-কষ্টের ও বিপদ-দুর্যোগের। কর-খাজনার ভারে তারা এমনই ভারাক্রান্ত ছিলো যে, জীবন তাদের কাছে সত্যি দুর্বিসহ হয়ে পড়েছিলো। এককথায় অর্থনৈতিক শোষণের জালে তারা এমনই আবদ্ধ ছিলো যে, যতই ছিন্ন করার চেষ্টা করতো সেই জাল যেন তাদের আরো অষ্টেপৃষ্ঠে বেঁধে ফেলতো। শাব্দিক অর্থেই তাদের জীবন ছিলো পশুর জীবন।

এই যে, অন্যের ভোগবিলাসের জন্য কাজ করে যাওয়া, আর বেঁচে থাকার জন্য কিছু দানা-পানি মুখে দেয়া, জীবনের কাছে এই যেন ছিলো শুধু তাদের পাওয়া। এ ছাড়া অন্য কোন চিন্তার সুযোগ তাদের ছিলো না। কখনো যদি এই অভিশপ্ত জীবন অসহ্য হয়ে উঠতো তখন তারা নেশা-বিনোদনে ও নিষিদ্ধ কাজে লিপ্ত হয়ে পড়তো। এ দুর্বিষহ জীবনের উপর আরো বিপদ এই ছিলো যে, তারা অভিজাত শ্রেণী জীবনপদ্ধতির অনেক কিছু অনুসরণের প্রাণান্ত চেষ্টা করতো। জীবনধারণের মেহনতে তাদের যত না কষ্ট হতো তার চেয়ে বেশী কষ্ট হতো উচ্চ শ্রেণীর অনুকরণের কসরতে। ফল হতো আরো দুর্ভোগ, আরো দুর্দশা এবং আরো দুশ্চিন্তা। সুখ-শান্তি তো দূরের কথা, সামান্য স্বস্তিও তাদের জীবনে জুটতো না কখনো।

সম্পদস্ফীতি ও চরম দারিদ্র্য

মোটকথা, তদানীন্তন সভ্য পৃথিবীর জীবনযাত্রা দুই চরম প্রান্তিকতার মাঝখানে বিপর্যস্ত ছিলো। একদিকে ছিলো অফুরন্ত সম্পদ এবং সম্পদের লাগামহীন স্বেচ্ছাচার, অন্যদিকে ছিলো অভাব ও দারিদ্র্যের নির্মম কষাঘাত। এ দুই জীবনযাত্রার টানা-পড়েনের মধ্যে নবুয়তের দাওয়াত ও তালীম এবং মহৎ চরিত্র ও উন্নত নীতি-নৈতিকতা যেন পথ হারিয়ে ফেলেছিলো। যারা সম্পদের প্রাচুর্যে ডুবে ছিলো তাদের জীবন ছিলো এমনই ভোগবিলাস ও ফুর্তি-উচ্ছ্বাসের জীবন যে, দ্বীন-আখেরাত এবং মৃত্যু ও পরকালচিন্তার তাতে কোন অবকাশই ছিলো না। অন্যদিকে অভাব ও দারিদ্র্যের কষাঘাতে জর্জরিত কৃষক-শ্রমিক ও মেহনতি মানুষের জীবন ছিলো রুটি-রোযির দৌড়ঝাঁপে এমনই ব্যতিব্যস্ত যে, অন্নচিন্তা ছাড়া অন্য কোন চিন্তার সেখানে কোন উপায় ছিলো না। বিত্তশালীরা মেতে ছিলো সম্পদের জৌলুসে এবং ভোগ-উপভোগের উল্লাসে, পক্ষান্তরে মেহনতি

মানুষের দল পর্যুদস্ত ছিলো অভাবের তাড়নায় এবং ক্ষুধার যন্ত্রণায়। এভাবে জাগতিক জীবন ও তার বহুমুখী চাহিদার জাল ধনী-গরীব সবাইকে এমনভাবে জড়িয়ে রেখেছিলো যে, কলব ও রূহ এবং হৃদয় ও আত্মার বিষয়ে সামান্যতম চিন্তা করারও কোন অবকাশ ছিলো না।

হযরত শাহ ওয়ালিউল্লাহ দেহলবী (রহ) হলেন শেষ যুগে ইসলামী উম্মাহর শ্রেষ্ঠ তাত্ত্বিক ও দার্শনিক। তিনি তাঁর মহামূল্যবান কিতাব হুজ্জাতুল্লাহিল বালিগায় ইসলামপূর্বযুগের সভ্য পৃথিবীর এই সুরতেহালের পূর্ণ চিত্র তুলে ধরেছেন অত্যন্ত বিচক্ষণতার সঙ্গে। তিনি বলেন–

'বহু শতাব্দী ধরে রাজ্য শাসন করে এবং ভোগবিলাস ও প্রবৃত্তিপূজায় ডুবে থেকে রোম ও পারস্যের মানুষ আল্লাহ ও আখেরাত একেবারেই ভুলে গিয়েছিলো। আরাম-আয়েশ ও ভোগ-বিলাসের উপায়-উপকরণের ক্ষেত্রে তাদের যেমন অসম্ভব সৌখিনতা ছিলো তেমন ছিলো সুতীব্র সামাজিক প্রতিযোগিতা। পৃথিবীর বিভিন্ন অঞ্চল থেকে বড় বড় জ্ঞানী, গুণী ও কলাকুশলীরা সাম্রাজ্যের কেন্দ্রস্থলগুলোতে এসে জড়ো হয়েছিলো, যারা জীবনের ভোগ-উপভোগের নিত্যনতুন সামগ্রী এবং আয়েশ-বিলাসের চমকপ্রদ কলাকৌশল উদ্ভাবনে তাদের সবটুকু মেধা ও প্রতিভা নিয়োজিত রেখেছিলো। সমাজের অভিজাত শ্রেণী সেগুলো তখনই লুফে নিতো এবং একে অন্যকে ছাড়িয়ে যাওয়ার প্রতিযোগিতায় লিপ্ত হতো। এগুলোই ছিলো তাদের নিজেদের মধ্যে গর্ব ও গৌরবের বিষয়। অবস্থা এমন হয়েছিলো যে, লাখ দিরহামের নীচে কোন রাজকর্মচারীর কোমরবন্ধ বা মুকুট ব্যবহার করা ছিলো রীতিমত লজ্জার বিষয়। আলিশান বালাখানা, বাগবাগিচা, উৎকৃষ্ট সওয়ারি এবং সুদর্শন দাসদাসী ছাড়া সামাজিক মর্যাদা লাভের কোন উপায় ছিলো না। আভিজাত্য বিচার করা হতো বেশভূষা ও আহার-বিহারের জৌলুস দ্বারা।

আমি আর কত বলবো, নিজ দেশের রাজাবাদশাহদের যে অবস্থা দেখছো তা থেকেই অনুমান করতে পারো। এসকল আড়ম্বর ও জাঁকজমক তাদের জীবনের অবিচ্ছেদ্য অংশ হয়ে গিয়েছিলো এবং তাদের মনমগজে এমনভাবে মিশে গিয়েছিলো যে, তা থেকে মুক্ত হওয়া কোনভাবেই সম্ভব ছিলো না। সর্বোপরি এর ফলে শহরজীবনে এবং সমগ্র সমাজ-সভ্যতায় বিভিন্ন দুরারোগ্য ব্যাধি ছড়িয়ে পড়েছিলো। এ ছিলো এমন এক সর্বগ্রাসী বিপদ যা থেকে ধনী-গরীব, আম-খাছ, আশরাফ-আতরাফ, এককথায় সমাজের কোন স্তরই মুক্ত ছিলো না।

আড়ম্বরপূর্ণ জীবনের মোহ সবাইকে এমন পেয়ে বসেছিলো যে, শান্তি, স্বস্তি ও স্থিতির পরিবর্তের দুঃখ-দুর্দশা এবং হতাশা ও যন্ত্রণাই হয়ে পড়েছিলো তাদের অবধারিত পরিণতি। কারণ অঢেল সম্পদ ছাড়া বিলাসী জীবন সম্ভব ছিলো না, আর অঢেল সম্পদ অর্জন করা সম্ভব ছিলো না লাগামহীন শোষণ ছাড়া এবং কৃষক, ব্যবসায়ী ও অন্যান্য পেশার লোকদের উপর নিপীড়নমূলক করের বোঝা চাপানো ছাড়া।

এই শাসন-শোষণে যদি তারা অবাধ্য হওয়ার চেষ্টা করতো তাহলে তাদের উপর নেমে আসতো পাশবিক নির্যাতন, আর যদি নির্বিবাদে মেনে নিতো তাহলে তারা হতো হালের বলদ, যাদের বাঁচিয়ে রাখা হতো শুধু কাজ নেয়ার জন্য। আর দিনরাত পশুর মত খেটে যাওয়াই ছিলো তাদের কাজ। ফলে আত্মিক উন্নতি ও পরকালীন সৌভাগ্যের বিষয়ে চিন্তা করারও সুযোগ ছিলো না তাদের এই অভিশপ্ত জীবনে। হয়ত গোটা দেশে এবং সমগ্র প্রদেশে এমন একজনও পাওয়া যেতো না, ধর্ম সম্পর্কে যার কোন চিন্তা ভাবনা রয়েছে।[১]

সর্বনাশা এক অন্ধকার

মোটকথা এই সপ্তম খৃস্টাব্দে পৃথিবীর কোথাও এমন কোন জাতি ও জনগোষ্ঠীর অস্তিত্ব ছিলো না, স্বভাব ও প্রকৃতির দিক থেকে যাদের সৎ ও যোগ্য বলা যেতে পারে। এমন কোন সমাজ ও জীবনধারাও ছিলো না, যা নীতি ও নৈতিকতার উচ্চ মূল্যবোধ ধারণ করতে পারে। এমন কোন শাসক ও শাসনব্যবস্থাও ছিলো না, যার ভিত্তি হবে ন্যায় ও সুবিচার, জ্ঞান ও প্রজ্ঞা এবং দয়া-মায়া ও মানব-দরদ। ছিলো না এমন কোন দ্বীন ও শরীয়াত, নবুয়তের সঙ্গে যার আছে সঠিক সম্পর্ক এবং যা নবিদের শিক্ষাদীক্ষা, আদর্শ ও বৈশিষ্ট্যের অধিকারী। চারদিকে ছিলো শুধু ঘোর অন্ধকার। এই সর্বগ্রাসী অন্ধকারের মধ্যে এখানে সেখানে দু'চারটি খানকা ও উপাসনাগৃহে সামান্য কিছু আলো যদিও বা দেখা যেতো, সেটা অন্ধকার রাতে জোনাকির 'আলো-কণিকার' ক্ষণিক নেভা-জ্বলার চেয়ে বেশী কিছু ছিলো না। ছহীহ ইলম ও আমল এবং বিশুদ্ধ জ্ঞান ও কর্ম ছিলো এত দুর্লভ এবং আল্লাহপ্রেমিক ও সত্যপথের পথিক যারা তাদের অস্তিত্ব ছিলো এতই বিরল যে, পারস্যের সাহসী যুবক সালমান ফারসী, যিনি স্বজাতির অগ্নিপূজার

---

[১] حجة الله البالغة، باب إقامة الارتفاقات وإصلاح الرسوم طبع دار الكتب العلمية، بيروت، عام أحد وعشرين وأربع مائة بعد الألف من الهجرة النبوية খ. ১ পৃ. ১৯৭-৯৮)

ধর্মের প্রতি আস্থা হারিয়ে সত্যধর্মের সন্ধান লাভের জন্য অস্থির হয়ে পড়েছিলেন, তিনি ইরান থেকে শামের শেষ সীমা পর্যন্ত সুদীর্ঘ সফরকালে মাত্র চারজন এমন ব্যক্তির সন্ধান পেয়েছিলেন যারা নবী-রাসূলদের রেখে যাওয়া পথের উপর অবিচল ছিলেন এবং যাদের দ্বারা তাঁর বেচায়ন কলব ও রূহ কিছুটা সুকূন ও ইতমিনান লাভ করেছিলো এবং তাঁর অস্থির হৃদয় ও আত্মা কিছুটা শান্ত ও তৃপ্ত হয়েছিলো।

এই সর্বগ্রাসী অন্ধকার ও নৈরাজ্যের যে নিখুঁত চিত্র আলকোরআন আমাদের সামনে তুলে ধরেছে তার চেয়ে উত্তম কিছু আর হতে পারে না। দেখুন কোরআনের ভাষায়–

ظَهَرَ ٱلْفَسَادُ فِى ٱلْبَرِّ وَٱلْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِى ٱلنَّاسِ لِيُذِيقَهُم بَعْضَ ٱلَّذِى عَمِلُوا۟ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ ۝

'জলে-স্থলে (সর্বত্র) ফাসাদ (ও বিপর্যয়) ছড়িয়ে পড়েছে মানুষেরই কৃতকর্মের কারণে, যেন আল্লাহ চাখিয়ে দেন তাদেরকে তাদের কিছু কর্মের ফল, আর তারা (তাদের মন্দ কর্ম থেকে) ফিরে আসে। (রূম, ৩০ : ৪১)

(সত্যের সন্ধানে হযরত সালমান ফারসী (রা) এর ত্যাগ-তিতিক্ষার ঘটনা, যা অবিচ্ছিন্ন সূত্র এবং বর্ণনাকারীদের বিশ্বস্ততার বিচারে একটি মূল্যবান ঐতিহাসিক দলীলের মর্যাদা লাভ করেছে, তা মুসনাদে আহমদ এবং মুসতাদরাকে হাকিমে বিশদরূপে বর্ণিত রয়েছে।)

দ্বিতীয় অধ্যায়

জাহেলিয়াত থেকে ইসলামের দিকে

প্রথম পরিচ্ছেদ

সংস্কার ও সংশোধনের নববী পদ্ধতি

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

জাহেলিয়াতের অন্ধকার থেকে ইসলামের আলোতে

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

নববী তারবিয়াতে আদর্শ ইসলামী সমাজ

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

জাহেলিয়াতের কাঁচামাল থেকে মানবতার শ্রেষ্ঠ সম্পদ

প্রথম পরিচ্ছেদ

সংস্কার ও সংশোধনের নববী পদ্ধতি

যে সমাজে মুহম্মদী নবুয়তের আবির্ভাব

মানবতা যখন মুমূর্ষুদশায় উপনীত হয়েছিলো এবং মানুষের এই পৃথিবী যখন সমস্ত চাকচিক্য ও জাঁকজমকসহ ধ্বংস ও বরবাদির অন্ধকার গহ্বরে নিক্ষিপ্ত হতে চলেছিলো, গোটা মানবজাতি যখন আঁধার রাতের মুসাফিরের মত দিশেহারা অবস্থায় ছিলো এবং মুক্তির কোন উপায় খুঁজে পাচ্ছিলো না, বরং উপায় খোঁজার যোগ্যতাও ছিলো না; ঠিক সেই চরম মুহূর্তে আল্লাহ তা'আলা যেন তাঁর রহমতের দরজা খুলে দিলেন এবং মুহাম্মাদ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে রহমাতুল-লিল আলামীনরূপে এবং আখেরি নবীরূপে দুনিয়াতে পাঠালেন, যাতে মুমূর্ষু মানবতাকে তিনি নবজীবন দান করেন এবং মানবজাতিকে অন্ধকার থেকে আলোর পথে বের করে আনেন। আলকোরআনের ভাষায়–

الٓرۚ كِتَٰبٌ أَنزَلْنَٰهُ إِلَيْكَ لِتُخْرِجَ ٱلنَّاسَ مِنَ ٱلظُّلُمَٰتِ إِلَى ٱلنُّورِ بِإِذْنِ رَبِّهِمْ إِلَىٰ صِرَٰطِ
ٱلْعَزِيزِ ٱلْحَمِيدِ ۝١

'আলিফ-লাম-রা, এ তো সেই কিতাব যা আমি নাযিল করেছি আপনার প্রতি, যাতে সমস্ত মানুষকে আপনি তাদের প্রতিপালকের ইচ্ছায় বের করে আনেন অন্ধকার থেকে আলোর দিকে, মহা-পরাক্রমশালী মহা-প্রশংসিত সত্তার পথের দিকে।' (ইবরাহীম, ১৪ : ১)

নবুয়ত লাভের সময় যে পৃথিবীর তিনি মুখোমুখি হয়েছিলেন, কেমন ছিলো সেই পৃথিবী? কেমন ছিলো পৃথিবীর মানুষ? কেমন ছিলো সমাজ, সভ্যতা ও তার অন্ধকার? যিনি বলেছেন বড় সুন্দর বলেছেন–

'পৃথিবীটা যেন ছিলো এক বিশাল ভবন, যা প্রবল কোন ভূমিকম্পে বিধ্বস্ত হয়ে গিয়েছে, যার আসবাবপত্র সব তছনছ হয়ে গিয়েছে। কোন কিছু যথাস্থানে নেই, বরং যত্রতত্র ছড়িয়ে ছিটিয়ে পড়ে আছে। কোন কিছুই ব্যবহার-উপযোগী নেই; হয় ভেঙ্গেচুরে, না হয় দুমড়েমুচড়ে গিয়েছে। স্তূপ ও ধ্বংস্তূপ ছাড়া সেখানে আর কিছুই নেই।'

আল্লাহর নবী যখন নবুয়তের দৃষ্টিতে পৃথিবীর দিকে তাকালেন, দেখতে পেলেন এমনসব মানুষ যাদের কাছে নিজেদের মানবসত্তাই ছিলো মূল্যহীন। তারা ভুলে গিয়েছে আপন স্রষ্টাকে এবং নিজেদের সৃষ্টি-মর্যাদাকে। তাই তারা পূজা শুরু করেছে চাঁদ-সূর্যের, নদী-সাগরের, আগুন-পাথরের, কারো ক্ষতি-উপকারের কোন ক্ষমতা নেই যাদের।

তিনি দেখতে পেলেন এমনসব মানুষ যাদের চিন্তা-চেতনা হয়ে গিয়েছে বক্র এবং রুচি ও স্বভাব হয়ে পড়েছে বিকৃত। ফলে সহজ সত্যকে মনে হচ্ছে দুর্বোধ্য এবং দুর্বোধ্যকে সহজ সত্য। বিশ্বাসের ক্ষেত্রে ছিলো তাদের দ্বিধা-সংশয়, আর যা কিছু সন্দেহযোগ্য তাতে ছিলো অটল বিশ্বাস। অসুন্দর ছিলো তাদের চোখে সুন্দর, আর যা কিছু শোভন-সুন্দর তা ছিলো অসুন্দর। যা কিছু অখাদ্য-কুখাদ্য, তাদের কাছে মনে হয় সুখাদ্য, আর সুখাদ্যকে মনে হয় অখাদ্য। কল্যাণকামী বন্ধুকে তারা শত্রু ভেবে দূরে সরিয়ে দেয়, আর প্রাণঘাতী শত্রুকে বন্ধু ভেবে কাছে টেনে নেয়।

চারপাশে তিনি দেখতে পেলেন এমন এক সমাজ, যা বৃহৎ বিশ্বেরই এক ক্ষুদ্র সংস্করণ। সবকিছু নষ্ট হয়ে গিয়েছে, সবকিছু উল্টে গিয়েছে। সেখানে নেকড়ে হয়েছে মেষপালের রক্ষক এবং অপরাধীর হাতে চলে এসেছে বিচারের দণ্ড। যারা পাপাচারী ও দুস্কৃতিকারী তারা হলো সবল সচ্ছল; যারা সৎ ও সদাচারী তারা হলো বঞ্চিত দুর্বল। সমাজের চোখে যেন সততার চেয়ে মন্দ এবং শঠতার চেয়ে উত্তম কিছু আর নেই। সরলতাকে মনে করা হয় নির্বুদ্ধিতা, আর ধূর্ততাকে ভাবা হয় কুশলতা।

সমাজদেহে এমন সব দুষ্ট ব্যাধি বাসা বেঁধেছে যা মানবতার ধ্বংসকেই শুধু ত্বরান্বিত করছে এবং আশা ও আশ্বাসের সব আলো নিভিয়ে এমন অন্ধকার গহ্বরের দিকে টেনে নিয়ে যাচ্ছে যেখান থেকে উদ্ধারের কোন উপায় থাকে না। সেখানে মদ ও মদাসক্তি ছিলো, নগ্নতা ও বেহায়াপনা ছিলো, লোভ-লালসা ও নিষ্ঠুরতা ছিলো, সুদের নামে শোষণ ও লুন্ঠন ছিলো। পাশবিকতা ও হিংস্রতা

ছিলো। এতীমের কান্না ছিলো, দুর্বলের ফরিয়াদ ছিলো, অবলা নারীর আহাজারি ছিলো এবং পুঁতে ফেলা জীবন্ত কন্যাসন্তানের আর্তনাদ ছিলো। মেটকথা নীচতা, হীনতা, জঘন্যতা ও বীভৎসতার যত রূপ হতে পারে, ঐ সমাজে তার সবই ছিলো এবং সদম্ভে ছিলো।

তিনি দেখতে পেলেন, যারা ছিলো রাজা ও শাসক তারা হয়ে পড়েছে শোষক ও উৎপীড়ক। আল্লাহর যমিন যেন তাদের জন্য ছিলো শিকারভূমি, আর আল্লাহর বান্দারা তাদের অসহায় শিকার। যাদের হাতে ছিলো দ্বীন ও ধর্মের দায়িত্ব, খোদার পরিবর্তে তারাই দাবীদার সেজেছে খোদায়িত্বের। ধর্মের নামে নির্দ্বিধায় তারা আত্মসাৎ করছে মানুষের ধনসম্পদ এবং মানুষকে সরিয়ে রাখছে আল্লাহর পথ থেকে।

তিনি দেখতে পেলেন, আল্লাহ-প্রদত্ত মানবপ্রতিভার বড় নির্দয়ভাবে অপচয় হচ্ছে, কিংবা হচ্ছে অপব্যবহার। জীবনের কোন ক্ষেত্রেই তা সঠিক খাতে পরিচালিত এবং সঠিক কাজে নিয়োজিত নয়। মানুষের যাবতীয় মেধা ও প্রতিভা মানবজাতি ও মানবসভ্যতার কল্যাণ সাধনের পরিবর্তে ডেকে আনছে তার চরম সর্বনাশ। সাহস ও বীরত্বের প্রকাশ ঘটছে যুলুম অত্যাচারের পথে। দানশীলতা ও বদান্যতার প্রকাশ ঘটছে অপচয় ও অপব্যয়ের মাধ্যমে, আভিজাত্য ও আত্মমর্যাদাবোধের প্রকাশ ঘটছে জাহেলিয়াতের অহমিকায়। মেধা ও বুদ্ধির প্রকাশ ঘটছে অপরাধের নব নব কৌশল এবং প্রবৃত্তির চরিতার্থতার নতুন নতুন উপায় উদ্ভাবনের ক্ষেত্রে।

বস্তুত বহু গুণ ও যোগ্যতার আধার মানুষ ছিলো এমন মহামূল্যবান কাঁচামাল যা কাজে লাগানোর জন্য ছিলো না কোন বিজ্ঞ ও অভিজ্ঞ কারিগর, যিনি সভ্যতার বিনির্মাণে এগুলোর সঠিক ব্যবহার করতে পারেন। কিংবা মানুষ যেন ছিলো উৎকৃষ্ট কাঁচা কাঠ, যা রোদ-বৃষ্টিতে পচে গলে শেষ হচ্ছে, কিন্তু এমন কারো উপস্থিতি ছিলো না যিনি এগুলোকে শুকিয়ে জোড়া দিয়ে জাহাজ তৈরী করবেন, আর সে জাহাজ জীবনসমুদ্র পাড়ি দিয়ে মানবতাকে নিয়ে যাবে অনন্ত সৌভাগ্যের আলোকিত বন্দরে।

পৃথিবীর সব জাতি ও জনগোষ্ঠী যেন ছিলো রাখালহীন মেষপাল, যাতে ক্ষুধার্ত নেকড়ের দল ঝাঁপিয়ে পড়ে বারবার। রাজনীতি যেন ছিলো লাগামহীন পাগলা ঘোড়া এবং শাসনক্ষমতা যেন মাতালের হাতে তলোয়ার, যা জখম করে আপন-পর সবাইকে, এমনকি কখনো নিজেকে।

খণ্ডিত সংস্কারের ব্যর্থতা

এই পচনধরা নষ্ট জীবনের সংশোধন ও সংস্কার সহজ কোন কাজ ছিলো না। জীবন যত কঠিন জীবনের সংশোধন তার চেয়ে অনেক বেশী কঠিন; এত কঠিন যে, জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্র একজন সংস্কারকের সারা জীবনের সাধনা ও পরিশ্রম দাবী করে। বরং এমনও হয় যে, সবটুকু মনোযোগ এবং সর্বশক্তি নিয়োগ করার পরও একটি মাত্র ফাসাদ ও মন্দের মূলোৎপাটন করা সম্ভব হয়ে ওঠে না। কর্মক্লান্ত ও হতাসাগ্রস্ত সংস্কারকের জীবন শেষ হয়ে যায়, কিন্তু ফাসাদ ও মন্দের শিকড় থেকে যায়।

তো আরবের সে যুগের সেই সমাজে যদি সাধারণ কোন সমাজসংস্কারকের আবির্ভাব হতো যিনি নূরে নবুয়তের পরিবর্তে নিজের জ্ঞান-বুদ্ধি ও বিচার-বিচক্ষণতা দ্বারা পরিচালিত, তিনি কী করতেন? নিজের সংস্কার-কর্মকাণ্ডের জন্য অবশ্যই জীবনের কোন একটি শাখা বেছে নিতেন এবং সারা জীবনের সাধনা ও পরিশ্রম নিয়োজিত করতেন অসংখ্য ব্যাধিগ্রস্ত সমাজের কোন একটি ব্যাধি দূর করার পিছনে। কিন্তু তাতে কাজের কাজ কিছুই হতো না। ব্যাধি যেমন ছিলো তেমনি থেকে যেতো, কিংবা তার রূপ পরিবর্তন হতো, অথবা দেখা দিতো নতুন কোন ব্যাধি। কারণ মানুষের স্বভাব ও মনস্তত্ত্ব খুবই দুর্বোধ্য ও সূক্ষ্ম-জটিল এবং বহুমুখী ও বহুরূপী। তাতে রয়েছে অনেক চোরাপথ এবং অসংখ্য ফাঁক-ফোকর। স্বভাব ও মনস্তত্ত্বের আসল দুর্বলতা চিনতে পারা এবং তার কেন্দ্রবিন্দুকে চিহ্নিত করা যুগের সেরা জ্ঞানী ব্যক্তির পক্ষেও সহজ কাজ নয়। কেননা জনে জনে এবং ক্ষণে ক্ষণে তা পরিবর্তিত হতে থাকে।

মানুষের চিন্তা, রুচি ও স্বভাব যখন বক্র ও বিকৃত হয়ে পড়ে তখন একটিমাত্র দোষের সংশোধন এবং একটিমাত্র দুর্বলতা নিরসনের চেষ্টা কিছুতেই ফলপ্রসূ হয় না, বরং তখন অনিবার্য প্রয়োজন দেখা দেয় এমন এক সর্বাত্মক ও সর্বব্যাপী চেষ্টা-সাধনার, যা স্বভাবের গতিমুখ মন্দ থেকে ভালোর দিকে এবং অনিষ্ট থেকে কল্যাণের দিকে আমূল পরিবর্তিত করে দেবে এবং জীবনের অঙ্গন থেকে সেই সব দুষ্ট আগাছা উপড়ে ফেলবে যা সমাজ ও পরিবেশ দূষিত হওয়ার কারণে এবং শিক্ষা-দীক্ষার অনুপস্থিতির সুযোগে গজিয়ে উঠেছে, যেমন বে-আবাদ পড়ে থাকার কারণে উৎকৃষ্ট ভূমিও আগাছা-পরগাছায় ভরে যায়। এভাবে জীবনের অঙ্গন এবং হৃদয়ের ভূমি যখন পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন ও পূর্ণ উপযোগী হয়ে যাবে

তখনই শুধু তাতে কল্যাণপ্রীতি ও আল্লাহভীতির সবুজ বৃক্ষ অঙ্কুরিত হতে পারে। এভাবেই শুধু জীবন ও সমাজের এবং মানবস্বভাবের কাঙ্ক্ষিত সংশোধন ও কল্যাণ সাধন সম্ভব হতে পারে।

এছাড়া সংস্কার ও সংশোধনের যে কোন খণ্ডিত প্রয়াস-প্রচেষ্টা ব্যর্থ হতে বাধ্য। মানবসমাজে রোগব্যাধির অভাব নেই এবং মানবজীবনেও দোষ-দুর্বলতার কমতি নেই। প্রতিটি ব্যাধি ও দুর্বলতার সংশোধনের পিছনেই কেটে যায় একজন সংস্কারকের সারা জীবন। বরং কখনো কখনো বহুজনের সারা জীবনের সম্মিলিত সংস্কার-প্রয়াসের পরও দেখা যায়, জীবন শেষ হয়ে গেছে, অথচ ব্যাধি একই অবস্থায় রয়ে গেছে, বরং তার প্রকোপ আরো বেড়েছে।

উদাহরণস্বরূপ, যে সমাজ গড়ে উঠেছে বল্গাহীন ভোগবিলাস ও আনন্দ-উল্লাসের জীবনদর্শনের উপর সেখানে কেউ যদি মদ ও মাদকবিরোধী আন্দোলন শুরু করে তাহলে ফল কী হবে? মদাসক্তি তো শিকড় গেড়ে বসেছে সমাজের সর্বস্তরে এবং মিশে আছে মানুষের অস্থিমজ্জায়! সুতরাং ফল হবে ব্যর্থতা এবং চরম ব্যর্থতা; ব্যর্থতা ছাড়া আর কিছু নয়। ক্লান্ত শ্রান্ত ও হতাশাগ্রস্ত হয়ে একসময় সে হাল ছেড়ে দেবে এবং তার সকল প্রয়াস-প্রচেষ্টা ভেসে যাবে মদের তোড়ে। কারণ মদাসক্তি তো উপসর্গ মাত্র, মূল ব্যাধি তো হলো বিকৃত রুচি এবং অসুস্থ মানসিকতা যা শুধু আনন্দের স্বাদ পেতে চায়, এমনকি বিষের পাত্রে চুমুক দিয়ে হলেও; যা শুধু ভোগের ফূর্তিতে মাতোয়ারা হতে চায়, এমনকি পাপের পঙ্কে ডুব দিয়ে হলেও। সুতরাং নিছক প্রচার-প্রচারণা, বক্তৃতা-বিবৃতি এবং মদের চরিত্রগত ও স্বাস্থ্যগত ক্ষতির লম্বা লম্বা বয়ান-বিবরণ দ্বারা মদের নেশা ছোটানো যাবে না, এমনকি কঠোর থেকে কঠোর আইন প্রণয়ন ও শাস্তি প্রয়োগের মাধ্যমেও তা রোধ করা যাবে না। সব শ্রমই হবে শুধু পণ্ডশ্রম।

এটা সম্ভব হতে পারে শুধু মৌলিক মানসিক পরিবর্তন সাধনের মাধ্যমে এবং অন্তরের গভীরে ঊর্ধ্বজাগতিক মহাশক্তির বিশ্বাস উৎপাদনের মাধ্যমে। এছাড়া আর যে কোন পথ ও পন্থাই অবলম্বন করা হোক, কোন কাজ হবে না। কারণ মানুষ মদ হালাল করে নেবে অন্য কোন নামে, অন্য কোন কৌশলে, কিংবা মদাসক্তি আবার ফিরে আসবে অপরাধের ভিন্ন কোন রূপ ধারণ করে।

এটা শুধু তত্ত্ব কথা এবং উর্বর কল্পনা নয়, আমাদের আধুনিক যুগেই রয়েছে এর বাস্তব প্রমাণ। আমেরিকার কথা ধরুন; মদাসক্তির ভয়াবহ পরিণামে মার্কিনসমাজ যখন বিধ্বস্তপ্রায় তখন সেখানে আইন করে মদ নিষিদ্ধ করা হয়েছিলো। সরকার

ও তার সমগ্র প্রশাসন সর্বশক্তি নিয়োগ করে মদবিরোধী অভিযানে ঝাঁপিয়ে পড়েছিলো। মদের ক্ষতি ও অপকারিতা সম্পর্কে সচেতনতা সৃষ্টির উদ্দেশ্যে পত্রপত্রিকায় এবং সিনেমা ও টিভি-পর্দায় বিজ্ঞাপন ও প্রতিবেদন প্রকাশ থেকে শুরু করে সভা-সেমিনার ও ব্যাপক গণসংযোগ, কোন কিছুই বাদ যায়নি। এক পরিসংখ্যানমতে মদবিরোধী প্রচারণায় মার্কিন সরকার ষাট মিলিয়ন ডলারেরও বেশী ব্যয় করেছিলো এবং প্রকাশিত বইপত্র ও পুস্তক-পুস্তিকার পৃষ্ঠাসংখ্যা ছিলো দশ বিলিয়ন। তাছাড়া মদনিষিদ্ধ আইন কার্যকর করার পিছনে সুদীর্ঘ চৌদ্দ বছরে সরকারকে দু'শ পঞ্চাশ মিলিয়ন ডলার ব্যয় করতে হয়েছিলো। আইনের প্রয়োগ এত কঠোর ছিলো যে, তিনশ ব্যক্তিকে মৃত্যুদণ্ড দেয়া হয়েছিলো, আর কারাগারে নিক্ষেপ করা হয়েছিলো পাঁচ লাখ বত্রিশ হাজার তিনশ পঁয়ত্রিশ ব্যক্তিকে। অর্থ-জরিমানার পরিমাণ ছিলো ষোল মিলিয়ন ডলার এবং সম্পত্তি বাজেয়াপ্তির পরিমাণ ছিলো চারশ চার মিলিয়ন ডলার। কিন্তু এত কিছুর পরো দেখা গেলো, মার্কিন জাতির মদাসক্তি বেড়েই চলেছে। জীবনের মূল্যেও তারা মদের পেয়ালা ছাড়তে রাজি নয়। শেষ পর্যন্ত মার্কিন সরকারকে নতি স্বীকার করতে হলো এবং ১৯৩৩ সালে মদবিরোধী আইন তুলে নিয়ে ঘোষণা দিতে হলো, এখন থেকে মার্কিন মুল্লুকে মদ নিঃশর্তভাবে বৈধ।

নবুয়তের মেহনত

সমাজ ও মানবসমাজের সংশোধনের জন্য মুহম্মদ বিন আব্দুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যে মেহনত শুরু করেছিলেন তা নির্দিষ্ট কোন ব্যাধি ও দুর্বলতার সংশোধনের খণ্ডিত মেহনত ছিলো না। তাঁর মেহনত ছিলো সমাজ ও পরিবেশের, স্বভাব ও চরিত্রের এবং মন ও মানসের আমূল পরিবর্তনের এক সামগ্রিক মেহনত। সর্বোপরি তাঁর দাওয়াত ও মেহনত ছিলো না নিজস্ব জ্ঞান-বুদ্ধি ও বোধ-বিচার দ্বারা পরিচালিত এবং নিজের বা অন্যের অভিজ্ঞতা দ্বারা প্রভাবিত। তাঁর দাওয়াত ছিলো অহী ও নবুয়তের দাওয়াত। আলকোরআনের ভাষায়–

وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ ﴿٣﴾ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ ﴿٤﴾

'তিনি নিজস্ব ইচ্ছায় কিছু বলেন না, তা তো শুধু অহী, যা তাকে দান করা হয়।'
(আন-নাজম, ৫৩ : ৩-৪)

মানুষকে তিনি দাওয়াত দিয়েছেন দুনিয়ার সব দাসত্ববন্ধন থেকে মুক্ত হয়ে এক আল্লাহর দাসত্ব গ্রহণের এবং শুধু তাঁর ইবাদতের। আলকোরআনের ভাষায়–

قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ يُوحَىٰ إِلَيَّ أَنَّمَا إِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ ۖ فَمَن كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ

فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا ﴿١١٠﴾

'আপনি বলুন, আমি তো শুধু তোমাদেরই মত একজন মানুষ, আমাকে অহী প্রদান করা হয় যে, তোমাদের ইলাহ এক ইলাহ। সুতরাং যে তার প্রতিপালকের সাক্ষাৎ প্রত্যাশা করে সে যেন নেক আমল করে, আর আপন প্রতিপালকের সঙ্গে কাউকে শরীক না করে।' (কাহফ, ১৮ : ১১০)

মানুষের সামনে তিনি তুলে ধরেন জীবনের আসল নেয়ামত ও প্রকৃত সুখ-শান্তি, যা থেকে মানুষ অজ্ঞতাবশে নিজেকে বঞ্চিত করে রেখেছিলো। যেসব জোয়াল ও শৃঙ্খল মানুষ অযথা নিজের উপর চাপিয়ে রেখেছিলো, তা থেকে তিনি তাদের মুক্তির ব্যবস্থা করেন। কোরআন বলছে–

يَأْمُرُهُم بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَاهُمْ عَنِ الْمُنكَرِ وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ

وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ

'তাদের তিনি সৎ কর্মের আদেশ করেন এবং মন্দ কর্ম থেকে বিরত রাখেন। উত্তম বস্তুসকল তাদের জন্য হালাল করেন এবং নিকৃষ্ট বস্তুসকল তাদের জন্য হারাম করেন। আর ঐসব বন্ধন ও শৃঙ্খল থেকে তাদের মুক্ত করেন যা তাদের উপর চেপে বসেছিলো।' (আল-আ'রাফ, ৭ : ১৫৭)

তাঁর নবুয়তকে ঘোষণা করা হয়েছে সমগ্র বিশ্বের জন্য রহমত বলে। তাঁর মাধ্যমে মুমূর্ষু মানবতা লাভ করেছে এক নতুন জীবন, নতুন শক্তি, নতুন উত্তাপ, নতুন আলো ও ঈমান, নতুন চেতনা ও বিশ্বাস এবং নতুন সমাজ ও নতুন সভ্যতা। মূলত তাঁর আবির্ভাব থেকেই শুরু হয়েছে পৃথিবীর নতুন ইতিহাস এবং মানবতার নতুন পথ চলা। কেননা আত্মবিস্মৃতি ও আত্মবিনাশের অন্ধকারে হারিয়ে গেছে যে দীর্ঘ সময় তাতে তো নেই কোন কল্যাণ! আলো ও অন্ধকার তো এক হতে পারে না! কোরআন বলছে–

وَمَا يَسْتَوِي ٱلْأَعْمَىٰ وَٱلْبَصِيرُ ﴿١٩﴾ وَلَا ٱلظُّلُمَٰتُ وَلَا ٱلنُّورُ ﴿٢٠﴾ وَلَا ٱلظِّلُّ وَلَا ٱلْحَرُورُ ﴿٢١﴾ وَمَا يَسْتَوِي ٱلْأَحْيَآءُ وَلَا ٱلْأَمْوَٰتُ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ يُسْمِعُ مَن يَشَآءُ ۖ وَمَآ أَنتَ بِمُسْمِعٍ مَّن فِي ٱلْقُبُورِ ﴿٢٢﴾

'সমান হতে পারে না অন্ধ ও চক্ষুষ্মান এবং যাবতীয় অন্ধকার ও আলো এবং ছায়া ও রোদ এবং সমান হতে পারে না জীবিতরা ও মৃতরা। আল্লাহ যাকে ইচ্ছা করেন শ্রবণযোগ্যতা দান করেন। আপনি তো শোনাতে পারেন না ঐ ব্যক্তিকে যে কবরে আছে' (আল-ফাতির, ৩৫ : ১৯ – ২২)

ক্ষণস্থায়ী জীবনের আরো ক্ষণস্থায়ী ভোগ-আনন্দের পরিবর্তে মানুষকে তিনি সুসংবাদ দিয়েছেন অনন্ত জীবনের অফুরন্ত নেয়ামতের, যা মানুষ না চোখে দেখেছে, না কানে শুনেছে, আর না মনে কল্পনা করেছে।' কোরআনের ভাষায়–

وَبَشِّرِ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ وَعَمِلُوا۟ ٱلصَّٰلِحَٰتِ أَنَّ لَهُمْ جَنَّٰتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَٰرُ ۖ كُلَّمَا رُزِقُوا۟ مِنْهَا مِن ثَمَرَةٍ رِّزْقًا ۙ قَالُوا۟ هَٰذَا ٱلَّذِي رُزِقْنَا مِن قَبْلُ ۖ وَأُتُوا۟ بِهِۦ مُتَشَٰبِهًا ۖ وَلَهُمْ فِيهَآ أَزْوَٰجٌ مُّطَهَّرَةٌ ۖ وَهُمْ فِيهَا خَٰلِدُونَ ﴿٢٥﴾

'আর সুসংবাদ দান করুন আপনি তাদেরকে যারা ঈমান এনেছে এবং নেক নেক আমল করেছে, (এমর্মে) যে, তাদের জন্য রয়েছে এমন 'বাগবাগিচা' যার পাদদেশ দিয়ে প্রবাহিত হয় নদী-নহর। যখনই তাদেরকে তা থেকে কোন ফল রিযিকরূপে দান করা হবে, তারা বলবে, এটা তো আমাদের দেয়া হয়েছে ইতিপূর্বে, আসলে তাদের দেয়া হবে দেখতে সদৃশ ফলফলাদি। আর তাদের জন্য রয়েছে সেখানে পবিত্র সঙ্গিনিসকল।' (বাকারাহ, ২ : ২৫)

পার্থিব জীবনের মোহে পড়ে যারা ভুলে যায় আখেরাতের জীবন তাদের তিনি সতর্ক করেছেন জাহান্নামের কঠিন শাস্তির বিষয়ে, যা শুরু হবে তো শেষ হবে না, চলতেই থাকবে। কোরআনের ভাষায়–

إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا۟ بِـَٔايَٰتِنَا سَوْفَ نُصْلِيهِمْ نَارًا كُلَّمَا نَضِجَتْ جُلُودُهُم بَدَّلْنَٰهُمْ جُلُودًا غَيْرَهَا لِيَذُوقُوا۟ ٱلْعَذَابَ ۗ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَزِيزًا حَكِيمًا ﴿٥٦﴾

'নিঃসন্দেহে যারা অস্বীকার করেছে আমার আয়াতসমূহ তাদের আমি আগুনে ঝলসাবো। যখনই তাদের চামড়া সিদ্ধ হবে, আমি বদলে দেবো তাদের চামড়া, যেন তারা আযাব চাখতে পারে। নিঃসন্দেহে আল্লাহ মহাপরাক্রমশালী, মহপ্রজ্ঞাবান।' (নিসা, ৩ : ৫৬)

এসমস্ত সুসংবাদ বা সতর্কবাণী তাঁর নিজের পক্ষ থেকে নয়, মহা-পরাক্রমশালী আল্লাহর পক্ষ থেকে। নিজের জন্য তিনি কোন কীর্তি ও কৃতিত্ব দাবী করেননি। তিনি ছিলেন শুধু আল্লাহর প্রেরিত সুসংবাদদাতা ও সতর্ককারী রাসূল। তাঁর দায়িত্ব শুধু মানুষের দুয়ারে সত্যের বাণী পৌঁছে দেয়া। বিদায় হজ্জে ছাহাবা কেরামের মজমায় তিনি অন্যকিছু বলেননি, শুধু এই প্রশ্ন করেছেন, الا هل بلغت শোনো, আমি কি পৌঁছে দিয়েছি?

জাহেলিয়াতের সমাজে পথভোলা মানুষের মাঝে মুহম্মদ বিন আব্দুল্লাহ ছাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম নবুয়তি দাওয়াতের যে মেহনত শুরু করলেন, কী ছিলো তার ফল? পিছনে আমরা তদানীন্তন জাহেলিয়াতের যে চিত্র তুলে ধরে এসেছি তা থেকে এটা স্বতঃসিদ্ধ যে, ইসলাম ও জাহেলিয়াতের মধ্যে যে দূরত্ব ছিলো তার চেয়ে বড় কোন দূরত্ব কল্পনা করাও সম্ভব নয়। এ যেন পৃথিবীর দুই মেরুর দূরত্ব! তবে যে বিস্ময়কর দ্রুততার সঙ্গে এ দূরত্ব অতিক্রম করা হয়েছে পৃথিবীতে তারও কোন তুলনা নেই। নবী রাহমাতুল্-লিল আলামীনের আলোকনির্দেশনায় মানবজাতি দীর্ঘ পথের এ দীর্ঘ সফর কীভাবে অতিক্রম করেছে? এবং জাহেলিয়াতের অন্ধকার থেকে ইসলামের আলো পর্যন্ত কীভাবে এসে পৌঁছেছে? আগামী পৃষ্ঠাগুলোতে রয়েছে এ প্রশ্নেরই বিশদ উত্তর।

রাসূল নন কোন আঞ্চলিক বা জাতীয় নেতা

উত্তম নেতৃত্বগুণের অধিকারী যে কোন উচ্চাভিলাষী ব্যক্তির জন্য আরবদেশ ও আরবজাতি ছিলো কাজের অত্যন্ত অনুকূল ও বিস্তৃত এক ক্ষেত্র। তো মুহম্মদ বিন আব্দুল্লাহ যদি আল্লাহর প্রেরিত নবী ও রাসূল না হতেন, বরং কোন আঞ্চলিক ব্যক্তি বা দেশপ্রেমিক নেতা হতেন; আপন জাতির মাঝে তিনি যদি জাতীয় নেতার ভূমিকায় অবতীর্ণ হতেন এবং রাজনীতির পথ ও পন্থা অনুসরণ করতেন তাহলে তিনি কী করতেন? প্রথমেই তিনি আরবজাতীয়তাবাদের ডাক দিয়ে মক্কার কোরায়শ ও আরবের গোত্রগুলোকে ঐক্যবদ্ধ করতেন এবং একটি

সুসংহত আরবসাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা করে তিনি হতেন মহামান্য আরব-সম্রাট। তারপর শুরু হতো তাঁর অব্যাহত অগ্রযাত্রা। ইচ্ছে করলে তিনি বীর আরবের অশ্বারোহী যোদ্ধাদল নিয়ে রোম ও পারস্যের ভূখণ্ডে আরবজাতীয়তাবাদের বিজয় পতাকাও উড্ডীন করতে পারতেন। বিচ্ছিন্ন ও বিভক্ত আরবদের একসময় যারা অবজ্ঞার চোখে দেখেছে সেই বলদর্পী আগ্রাসী আজমীদের বিরুদ্ধে প্রতিশোধ গ্রহণ করা তাঁর পক্ষে অসম্ভব কিছু ছিলো না। যদি মেনে নেয়া হয় যে, তখনকার দুই বৃহৎ শক্তির কোন একটির সঙ্গে শক্তি পরীক্ষায় অবতীর্ণ হওয়া রাজনৈতিক প্রজ্ঞার পরিচায়ক হতো না তাহলে অন্তত ইয়ামান, হাবাশা ও অন্যান্য প্রতিবেশী দেশে হামলা চালিয়ে সেগুলোকে নতুন আরবসাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত করে নেয়া তো অবশ্যই সহজ ছিলো?!

আরবদের জীবনেও গোত্রীয়, সামাজিক ও অর্থনৈতিক বহু সমস্যা ছিলো যার সফল সমাধানের জন্য প্রয়োজন ছিলো অভূতপূর্ব রাজনৈতিক প্রজ্ঞা, প্রশাসনিক ও সাংগঠনিক যোগ্যতা, সুউচ্চ মনোবল এবং সৃজনশীল ব্যক্তিত্বের অধিকারী একজন জাতীয় নেতার, যিনি নেতৃত্বের জাদুগুণে আরবজাতিকে একটি নতুন শক্তিরূপে পৃথিবীর সামনে তুলে ধরতে পারতেন এবং পারতেন আরবভূখণ্ডকে বিশ্বমানচিত্রে নতুন মর্যাদায় চিহ্নিত করতে।

তিনি যদি ইচ্ছা করতেন, শুধু ইচ্ছা, তাহলেই তা হতে পারতো। এমনকি কোন সন্দেহ নেই যে, আবুল হাকাম বিন হিশাম[১] ওতবা বিন রাবী'আ এবং অন্যান্য কোরাইশনেতা তাঁর নেতৃত্বে এই জাতীয় পতাকার নীচে সবার আগে জমায়েত হতো। নবুয়তের অনেক আগে, যখন তিনি মাত্র যুবক, তখনই তারা তাঁকে আছ-ছাদিক, আল-আমীন-এর মর্যাদায় ভূষিত করেনি?! কোরাইশ কি তাদের জীবনের সবচে' নাযুক ঘটনায়, হজরে আসওয়াদ স্থাপনের কঠিন বিরোধের সময় তাঁকে বিচারক মেনে নেয়নি?! সমস্বরে বলে উঠেনি–

هذا الأمين رضينا

এই যে আমাদের আল-আমীন, আমরা তাঁর ফায়ছালা মেনে নিলাম!

সবচে' বড় কথা, কোরাইশ কি ওতবার মাধ্যমে তাঁকে বলে পাঠায়নি, 'যদি রাজত্ব তোমার উদ্দেশ্য হয় তাহলে বলো, আমরা আমাদের পতাকা তোমার হাতে তুলে দেবো। আজীবন তুমিই হবে আমাদের নেতা!'

[১] আবু জেহেল

এটা তো নিছক মুখের কথা, বা কোন ছল ও ছলনা ছিলো না, ছিলো সম্ভ্রান্ত কোরাইশের ওয়াদা এবং অভিজাত আরবের প্রতিশ্রুতি, যা জীবন যেতে পারে, কিন্তু মিথ্যা হতে পারে না। রাজনৈতিক প্রতারণা, প্ররোচনা, কপটতা তো তাদের জানাই ছিলো না। কোরাইশের নেতা তো রোম-সম্রাটের দরবারেও মুহম্মদ বিন আব্দুল্লাহ সম্পর্কে সামান্য একটি মিথ্যা উচ্চারণেরও সাহস করেনি এই ভয়ে যে, মানুষ বলবে, দেখো, নেতা হয়ে মিথ্যা বলে! সুতরাং কোরাইশের প্রস্তাবের পর তিনি শুধু ইচ্ছা করলেই হতো, শুধু হাত বাড়ালেই হতো।

কিন্তু না, তিনি তা করেননি। কারণ নবী রাহমাতুল্লিল আলামীন তো এজন্য প্রেরিত হননি যে, একটি মিথ্যার বদলে আরেকটি মিথ্যাকে প্রতিষ্ঠা দান করবেন এবং একটি অনাচার দিয়ে আরেকটি অনাচারের অপসারণ ঘটাবেন; নবী তো এজন্য আসেন না যে, একটি জাতির অহমিকা, আগ্রাসন ও স্বেচ্ছাচার দমন করে আরেকটি জাতিকে সে পথেই পরিচালিত করবেন! তিনি তো বিশেষ কোন দেশ-অঞ্চল বা জনগোষ্ঠীর নেতা ছিলেন না, যার কাজ হলো ন্যায়-অন্যায় সর্ব-উপায়ে স্বজাতির স্বার্থ রক্ষা করা এবং অন্য দেশের ভূমি ও সম্পদ লুণ্ঠন করে স্বদেশের ভাণ্ডার পূর্ণ করা। রোম ও পারস্যের গোলামি থেকে মুক্ত করে মানুষকে আরবের গোলামির জিঞ্জিরে আবদ্ধ করবেন, এজন্য তো পৃথিবীতে তাঁর আগমন ঘটেনি! তিনি তো প্রেরিত হয়েছেন সমগ্র মানবজাতির জন্য 'বাশীর ও নাযীর', তথা জান্নাতের সুসংবাদদাতা এবং জাহান্নামের আযাব সম্পর্কে সতর্ককারীরূপে! তিনি তো সিরাজুম-মুনীর, আল্লাহর আদেশে আল্লাহর পথে আহ্বানকারী উজ্জ্বল আলোকবর্তিকা! তিনি তো পথ দেখাবেন সাদা-কালো, আরব-আজম সবাইকে, আলোর দিকে, সত্যের দিকে!

তিনি তো প্রেরিত হয়েছেন সমস্ত মানুষকে বান্দার বন্দেগি থেকে এক আল্লাহর বন্দেগিতে টেনে আনার জন্য এবং দুনিয়ার সঙ্কীর্ণ গণ্ডী থেকে আখেরাতের প্রশস্ততার দিকে এবং নানা ধর্মের আনাচার থেকে ইসলামের ন্যায় ও সুবিচারের দিকে বের করে আনার জন্য! তিনি তো মানুষকে সৎ কাজের আদেশ দেবেন, অসৎ কাজ থেকে নিষেধ করবেন এবং মানুষের জন্য উৎকৃষ্ট বস্তুকে হালাল করবেন, আর নিকৃষ্ট বস্তুকে হারাম করবেন এবং ঐ সকল বন্ধন ও শৃঙ্খল থেকে মানুষকে মুক্ত করবেন যা তাদের উপর এমনভাবে চেপে বসেছিলো যে, বাহ্যত তা থেকে উদ্ধার পাওয়ার কোন উপায় ছিলো না। কোথাও কোন আশার আলো ছিলো না। মুক্তির কোন পথ ছিলো, এমনকি মুক্তির কোন ইচ্ছাও ছিলো না।

তাঁর দাওয়াত ও আহ্বান বিশেষ কোন অঞ্চল ও দেশ এবং বিশেষ কোন জাতি ও জনগোষ্ঠীর প্রতি ছিলো না; তাঁর উদাত্ত আহ্বান ও মর্মস্পর্শী আবেদন ছিলো মানবজাতি ও মানববিবেকের উদ্দেশ্যে। তবে অধঃপতনের চূড়ান্ত সীমায় পৌঁছে যাওয়ার কারণে দয়া ও রহমতের দাবী এটাই ছিলো যে, আরবজাতির মধ্যেই তাঁর আবির্ভাব হবে এবং সেখান থেকেই শুরু হবে নবুয়তের দাওয়াত ও মেহনত। তাছাড়া ভৌগোলিক অবস্থান ও রাজনৈতিক স্বাতন্ত্র্যের কারণে উম্মুল কোরা ও জাযীরাতুল আরবই ছিলো তাঁর নবুয়ত ও রিসালাতের কেন্দ্রভূমি হওয়ার সবচে' উপযোগী এবং বিভিন্ন মনস্তাত্ত্বিক ও চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের কারণে আরবজাতিই ছিলো তাঁর দাওয়াতের ধারক, বাহক ও প্রচারক হওয়ার প্রথম হকদার।

মানবস্বভাবের রহস্যতালা ও তার চাবি!

পৃথিবীতে যুগে যুগে বিভিন্ন সমাজ ও জনপদে বহু সংস্কারক এসেছেন এবং নিজ নিজ জ্ঞান-বুদ্ধি ও বিচার-বিবেচনায় সমাজসংস্কারের সংগ্রামসাধনা করেছেন। সফলতা-ব্যর্থতা যাই হোক অবশ্যই তারা তাদের নিষ্ঠা ও আন্তরিকতার কারণে ইতিহাসের শ্রদ্ধার পাত্র। কিন্তু নবী রাহমাতুল্-লিল আলামীন ঐসব সাধারণ সমাজসংস্কারকের মত ছিলেন না, যারা নির্দিষ্ট কোন সামাজিক ব্যাধি ও চারিত্রিক ক্ষত নিরাময়ের চেষ্টায় আত্মনিয়োগ করেন। তারপর হয় তাতে সাময়িক সাফল্য অর্জন করেন, কিংবা ব্যর্থতার বেদনা নিয়েই পৃথিবী থেকে বিদায় নেন, যেমন কেউ পিছনদুয়ার দিয়ে, বা জানালাপথে কোন বে-আবাদ ঘরে ঢুকলো এবং সামান্য কিছু ঝাড়পোঁছ করে কিংবা কিছু না করে একই পথে আবার বেরিয়ে গেলো। তাতে ঘরের একটি কোণ একটু পরিষ্কার হলো, অথবা যেমন ছিলো তেমনই রয়ে গেলো।

না, মুহম্মদ বিন আব্দুল্লাহ (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এমন কোন সাধারণ সংস্কারক ছিলেন না; তিনি তো ছিলেন আল্লাহর প্রেরিত নবী ও রাসূল, আখেরি নবী ও শ্রেষ্ঠ রাসূল! দাওয়াত ও সংস্কারের গৃহে তিনি প্রবেশ করেছিলেন সামনের দরজা দিয়ে এবং উভয় কপাট খুলে। মানবস্বভাবের বন্ধ তালা তিনি খুলেছিলেন সঠিক চাবি দিয়ে; সেই বন্ধ তালা, যা খুলতে তো চেয়েছেন নিজ নিজ সময়ের সকল সংস্কারক, কিন্তু নিদারুণভাবেই ব্যর্থ হয়েছে তাদের সকল প্রয়াস-প্রচেষ্টা। এমনকি তাঁর পরবর্তী যুগেও যারা সংস্কারকের ভূমিকায় অবতীর্ণ

হয়েছেন, কিন্তু তাঁকে অনুসরণ না করে অন্য পথে, অন্যভাবে, তাদেরও বরণ করতে হয়েছে একই ভাগ্য, একই পরিণতি।[1]

সভ্যতার ইতিহাসে অন্ধকারতম যুগে, অন্ধকারতম সমাজে যখন তিনি আসমানি ওয়াহীর দায়িত্ব প্রাপ্ত হলেন তখন সর্বপ্রথম তিনি কী করলেন? দ্ব্যর্থহীন ভাষায় সর্বপ্রথম তিনি তাওহীদের ডাক দিলেন এবং মানুষকে এক আল্লাহর প্রতি ঈমান

---

[1] উদাহরণ রয়েছে অনেক, তবে খুবই সঙ্গত হয়, যদি এখানে ভারত উপমহাদেশের সর্বসংবাদিত রাজনৈতিক ও আধ্যাত্মিক নেতা করমচাঁদ গান্ধীর নাম উল্লেখ করি। কারণ তাঁর সময়ে তিনি ছিলেন অসাধারণ রাজনৈতিক প্রতিভা ও আধ্যাত্মিক শক্তির অধিকারী এক মহাপুরুষ। জীবনের শুরু থেকেই দু'টি মহান মূলনীতিকে তিনি তাঁর লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যরূপে স্থির করেছিলেন এবং এ পথেই আপন রাজনৈতিক নেতৃত্ব ও আধ্যাত্মিক ব্যক্তিত্বকে নিয়োজিত রেখেছিলেন, যার তুলনা সত্যি বিরল।

প্রথম মূলনীতি ছিলো অহিংসা। বস্তুত একটি স্বতন্ত্র ধর্ম ও দর্শনরূপেই তিনি অহিংসার মতবাদ প্রচার করেছিলেন। বছরের পর বছর স্বজাতিকে তিনি অহিংসার পথে ডেকেছেন, মুখে, কলমে, বক্তৃতায়, বিবৃতিতে এবং সর্ব-উপায়ে। জীবনের সর্বস্ব তিনি উজাড় করে দিয়েছিলেন অহিংসার আহ্বানের পিছনে। কিন্তু যেহেতু তিনি মনমানস ও স্বভাব পরিবর্তনের পথ গ্রহণ করেননি এবং নবী দাওয়াতের মৌলিক পন্থা অনুসরণ করেননি সেহেতু তা তাঁর সম্প্রদায়ের মধ্যে তেমন কোন প্রভাবই সৃষ্টি করতে পারেনি। বরং নিজের চোখেই তিনি দেখে গিয়েছেন সাতচল্লিশে ভারতের সেই ভয়াবহ সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা ও পাশবিকতম মুসলিমনিধনযজ্ঞ, যাতে রক্তের গঙ্গা প্রবাহিত হয়েছিলো এবং ইজ্জত-আবরু লুণ্ঠনের আর্তনাদে মন্দিরের চূড়াও লজ্জাবনত হয়েছিলো। সেই একটিমাত্র দাঙ্গায় পাঁচ লাখেরও বেশী মুসলিম শিশু-নারী-পুরুষ নিহত হয়েছিলো।

'মহাত্মাজী' নিজের চোখেই দেখেছেন, তাঁর 'অহিংসার চিতা' কীভাবে জ্বলেছে সেদিন ভারতের মাটিতে। বস্তুত এমন নিষ্ঠুরতা ও পাশবিকতার ঘটনা তখন ঘটেছিলো যা হয়ত ইতিহাসের পাতায় দেখে একদিন বিশ্বাস হতে চাইবে না। এমনকি শেষ পর্যন্ত এই ভালো মানুষটিকে ঘাতকের হাতে প্রাণ দিতে হয়েছিলো, যিনি আপন সম্প্রদায়ের কাছে প্রায় ঈশ্বরের মর্যাদা লাভ করেছিলেন।

তাঁর দ্বিতীয় মূলনীতি ছিলো অস্পৃশ্যতার ধারণা বর্জন, যা ভারতীয় সমাজে এক ভয়াবহ ব্যাধিরূপে যুগ যুগ ধরে বিদ্যমান ছিলো।

এক্ষেত্রেও তিনি এক জোরদার সংস্কার আন্দোলন গড়ে তুলেছিলেন এবং নিজেকে তাতে সঁপে দিয়েছিলেন। কিন্তু উল্লেখযোগ্য কোন সফলতা অর্জন করতে পারেননি। বস্তুত গান্ধীজীবনের ব্যর্থতা একথারই জ্বলন্ত প্রমাণ যে, সমাজসংস্কার ও জাতিসংশোধনের স্বভাবসম্মত ও সঠিক পন্থা সেটাই যা নবী ও রাসূলগণ রেখে গেছেন এবং সেই পথেই শুধু গড়ে উঠতে পারে একটি আদর্শ সমাজ এবং মহৎ জাতি।

ও বিশ্বাস স্থাপনের আহ্বান জানালেন। মূর্তি, দেব-দেবী ও বাতিল উপাস্যদের পরিত্যাগ করার এবং 'সমগ্র অর্থে' 'তাগুত'কে প্রত্যাখ্যান করার আদেশ দিলেন। নবুয়তের পূর্ণ জালাল ও প্রতাপ নিয়ে মানুষের সভায় তিনি উদাত্ত কণ্ঠে ঘোষণা করলেন–

يا أيها الناس قولوا لا إله إلا الله تفلحوا

'হে লোকসকল! বলো লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ, লাভ করবে সফলতা ও ফালাহ!'

আর আহ্বান জানালেন তাঁকে ও তাঁর রিসালতকে স্বীকার করার এবং আখেরাত-কে বিশ্বাস করার।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

জাহেলিয়াতের অন্ধকার থেকে ইসলামের আলোতে

জাহেলিয়াতের আত্মরক্ষার শেষ চেষ্টা

এই নবুয়তি দাওয়াতের গতি ও প্রকৃতি এবং লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য বুঝতে তদানীন্তন জাহেলিয়াত ও জাহেলি সমাজ বিন্দুমাত্র ভুল করেনি। কী এই দাওয়াতের অন্তর্নিহিত মর্ম ও হাকীকত, তা জাহেলিয়াতের মোড়ল যারা তাদের সামনে মোটেই অস্পষ্ট ছিলো না। তাই ছাফা পাহাড়ের পাদদেশে আল্লাহর নবীর কণ্ঠে তাওহীদের উদাত্ত আহ্বান শোনামাত্র তারা এ সত্য অনুধাবন করতে পারলো যে, তাওহীদের এ ডাক মূলত জাহেলিয়াতের মর্মমূলে আঘাত। এ এমন এক তীর যা জাহেলিয়াতের হৃদপিণ্ডে গিয়ে বিদ্ধ হবে এবং তার মৃত্যু ডেকে আনবে। এজন্যই সর্বত্র ভীষণ 'হালচাল' মেচে গেলো এবং নবী ও তাঁর নবুয়তের বিরুদ্ধে সাজ সাজ রব পড়ে গেলো। অস্তিত্বের শঙ্কায় শঙ্কিত জাহেলিয়াত যেন ঢাল-তলোয়ার এবং ঘোড়া ও ঘোড়সওয়ার নিয়ে জীবন-মরণ যুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়লো। আল কোরআনের ভাষায়–

وَٱنطَلَقَ ٱلْمَلَأُ مِنْهُمْ أَنِ ٱمْشُوا۟ وَٱصْبِرُوا۟ عَلَىٰٓ ءَالِهَتِكُمْ ۖ إِنَّ هَٰذَا لَشَىْءٌ يُرَادُ ۝

'তাদের মোড়লরা এই বলে বেরিয়ে পড়লো যে, চলো চলো এবং তোমাদের দেবতাদের জন্য প্রাণপণ করো। এটাই এখন করণীয়।' (ছোয়াদ, ৩৮ : ৬)

এককথায় জাহেলিয়াতের সমাজ ও জীবনের সর্বস্তরে যেন অস্তিত্বের এক প্রবল ঝাঁকুনি অনুভূত হলো এবং পরিষ্কার হয়ে গেলো যে, জাহেলিয়াতের সমগ্রজীবন-ব্যবস্থাই এখন হুমকির সম্মুখীন। আর এ কারণেই নবী ও তাঁর মুষ্টিমেয় ছাহাবার

উপর নেমে এলো নির্যাতন ও নিপীড়নের এমন বিভীষিকা যার নযির মানবজাতির ইতিহাসে দ্বিতীয়টি আর নেই। বস্তুত এটা ছিলো নববী দাওয়াতের সফলতা ও সার্থকতারই জ্বলন্ত প্রমাণ। কারণ তাতে এটা তো বোঝা গেলো যে, তিনি জাহেলিয়াতের মর্মমূলে এবং সংবেদনশীল স্থানে আঘাত করেছেন এবং তাঁর নিক্ষিপ্ত তীর লক্ষ্যভেদ করেছে।

জাহেলিয়াতের 'আবুজাহেল'রা তাদের যাবতীয় হিংস্রতা ও বর্বরতা নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়েছিলো, আর নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর দাওয়াতের উপর এমন অটল-অবিচল ছিলেন যার সামনে পাহাড়-পর্বতের অটলতা এবং সান্দে-সিকান্দারির অবিচলতাও ছিলো তুচ্ছ। না কোন নির্যাতন-নিপীড়ন তাঁকে টলাতে পেরেছে, না কোন লোভ ও প্রলোভন লক্ষ্যচ্যুত করতে পেরেছে। বিরোধিতা ও প্রতিকূলতার চতুর্মুখী ঝড় এসেছে এবং পার হয়ে গেছে, কিন্তু আপন স্থানে তিনি ছিলেন স্থির-অবিচল। এমনকি কোরায়শের ক্রমাগত চাপের মুখে প্রাণপ্রিয় চাচা আবু তালিবও যখন দ্বিধাগ্রস্ত হয়ে পড়লেন তখন তিনি নবুয়তের পূর্ণ জালাল ও প্রতাপ নিয়ে বলতে পেরেছেন–

يا عم لو وضعت الشمس في يميني والقمر في يساري ما تركت هذا الأمر حتى يظهره الله أو أهلك في طلبه

'হে চাচা, আল্লাহর কসম, যদি আমার ডান হাতে সূর্য এবং বাম হাতে চাঁদ রাখা হয় তবু আমি এ কাজ ছাড়বো না, যতক্ষণ না আল্লাহ আমাকে জয়ী করেন, কিংবা এ পথেই আমার জীবন চলে যায়।'[১]

দীর্ঘ তের বছর মক্কায় অবস্থান করে মানুষকে তিনি আল্লাহর পথে ডেকেছেন। তাওহীদ, রিসালাত ও আখেরাতের প্রতি ঈমানের দাওয়াত দিয়েছেন। তাঁর দাওয়াত ছিলো সুস্পষ্ট, নির্দ্বিধ এবং আপন বিশ্বাসে বলীয়ান। তাঁর আচরণে ও বক্তব্যে দরদ ছিলো, ব্যথা ছিলো, আবেদন ও নিবেদন ছিলো; ছিলো পরম ক্ষমাসুন্দরতা, কিন্তু ছিলো না বিন্দুমাত্র শিথিলতা, নমনীয়তা ও আপোসকামিতা। কোন বিষয়ে সমাজ ও সমাজপতিদের কোনরকম ছাড় দেয়ার কথা তিনি কল্পনাও করেননি। কারণ তাওহীদ ও রিসালাতের প্রতি ঈমান ও বিশ্বাসের এ দাওয়াতকেই তিনি মনে করতেন সর্বরোগের একমাত্র চিকিৎসা।

---

[১] البداية والنهاية، المجلد الثاني والصفحة الثالثة والأربعون

একদিকে কাওমের প্রতি তাঁর দরদ-ব্যথা ও অস্থির মমতা এমন ছিলো যে, আলকোরআনের ভাষায়–

فَلَعَلَّكَ بَٰخِعٌ نَّفْسَكَ عَلَىٰٓ ءَاثَٰرِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا۟ بِهَٰذَا ٱلْحَدِيثِ أَسَفًا ﴿٦﴾

তো আপনি বুঝি দুঃখে কষ্টে তাদের পিছনে জান দিয়ে দেবেন? যদি তারা এই কথার উপর ঈমান না আনে! (কাহফ, ১৮ : ৬)

অন্যদিকে নীতি ও বিশ্বাসের প্রতি দৃঢ়তা ও অনমনীয়তা! কোরায়শ-প্রতিনিধি ওতবা যখন সম্পদ ও রাজত্বের এবং ভোগ ও সৌন্দর্যের মোহনীয় প্রস্তাব নিয়ে এলো তখন তিনি মৃদুমধুর হেসে শুধু আলকোরআনের আয়াত শুনিয়ে দিলেন–

حمٓ ﴿١﴾ تَنزِيلٌ مِّنَ ٱلرَّحْمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ ﴿٢﴾ كِتَٰبٌ فُصِّلَتْ ءَايَٰتُهُۥ قُرْءَانًا عَرَبِيًّا لِّقَوْمٍ يَعْلَمُونَ ﴿٣﴾ بَشِيرًا وَنَذِيرًا فَأَعْرَضَ أَكْثَرُهُمْ فَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ ﴿٤﴾ وَقَالُوا۟ قُلُوبُنَا فِىٓ أَكِنَّةٍ مِّمَّا تَدْعُونَآ إِلَيْهِ وَفِىٓ ءَاذَانِنَا وَقْرٌ وَمِنۢ بَيْنِنَا وَبَيْنِكَ حِجَابٌ فَٱعْمَلْ إِنَّنَا عَٰمِلُونَ ﴿٥﴾ قُلْ إِنَّمَآ أَنَا۠ بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ يُوحَىٰٓ إِلَىَّ أَنَّمَآ إِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَٰحِدٌ فَٱسْتَقِيمُوٓا۟ إِلَيْهِ وَٱسْتَغْفِرُوهُ ۗ وَوَيْلٌ لِّلْمُشْرِكِينَ ﴿٦﴾ ٱلَّذِينَ لَا يُؤْتُونَ ٱلزَّكَوٰةَ وَهُم بِٱلْءَاخِرَةِ هُمْ كَٰفِرُونَ ﴿٧﴾ إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ وَعَمِلُوا۟ ٱلصَّٰلِحَٰتِ لَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونٍ ﴿٨﴾

'হা–মীম, এ তো রাহমান-রাহীমের অবতারিত কিতাব, যার আয়াতগুলো আরবী পাঠরূপে বিশদভাবে পরিবেশন করা হয়েছে এমন সম্প্রদায়ের জন্য যারা জ্ঞান ধারণ করে। তা সুসংবাদ দেয় এবং সতর্ক করে। কিন্তু তাদের বেশীর ভাগ তা উপেক্ষা করে, শুনতেও চায় না। তারা বলে, তুমি যেদিকে আমাদের ডাকছো সে বিষয়ে তো আমাদের হৃদয় বহু আবরণে সুরক্ষিত। আর আমাদের কানে রয়েছে বধিরতা, আর আমাদের মধ্যে এবং তোমার মধ্যে রয়েছে একটি অন্তরায়। সুতরাং তুমি কাজ করো (তোমার মতে), আমরা কাজ করবো (আমাদের মতে)

আপনি বলুন, আমি তো একজন মানুষ তোমাদের মত; (তবে) আমার কাছে ওহী পাঠানো হয় যে, তোমাদের ইলাহ হচ্ছেন একমাত্র ইলাহ, সুতরাং তোমরা

তাঁর অভিমুখে ঋজু হও এবং তাঁর কাছে ক্ষমাপ্রার্থনা করো; আর ধ্বংস হোক মুশরিকদের, যারা যাকাত দেয় না, আর তারাই হলো আখেরাতের প্রতি অবিশ্বাসী। নিঃসন্দেহে যারা ঈমান এনেছে এবং সৎকর্মসমূহ সম্পন্ন করেছে, তাদেরই জন্য রয়েছে এমন প্রতিদান যা বিঘ্নিত হবে না।' (হা-মীম সিজদাহ, ৪১ : ১-৮)

এভাবে তিনি সিজদার আয়াত পর্যন্ত তিলাওয়াত করে সিজদায় গেলেন–

وَمِنْ ءَايَٰتِهِ ٱلَّيْلُ وَٱلنَّهَارُ وَٱلشَّمْسُ وَٱلْقَمَرُ ۚ لَا تَسْجُدُوا۟ لِلشَّمْسِ وَلَا لِلْقَمَرِ وَٱسْجُدُوا۟ لِلَّهِ ٱلَّذِى خَلَقَهُنَّ إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ ﴿٣٧﴾ فَإِنِ ٱسْتَكْبَرُوا۟ فَٱلَّذِينَ عِندَ رَبِّكَ يُسَبِّحُونَ لَهُۥ بِٱلَّيْلِ وَٱلنَّهَارِ وَهُمْ لَا يَسْـَٔمُونَ ۩ ﴿٣٨﴾

আর তাঁর নিদর্শনসমূহের অন্যতম হলো রাত ও দিন, আর সূর্য ও চন্দ্র। (সুতরাং) সিজদা করো না তোমরা সূর্যের উদ্দেশ্যে, আর না চাঁদের উদ্দেশ্যে। বরং সিজদা করো ঐ সত্তার উদ্দেশ্যে যিনি ঐগুলো সৃষ্টি করেছেন, যদি তোমরা শুধু তাঁরই ইবাদত করতে চাও। অনন্তর যদি তারা অহঙ্কার করে তাহলে (শুনুন, যারা আপনার প্রতিপালকের নিকটে রয়েছে তারা রাত-দিন তাঁর তাসবীহ পাঠ করে, আর ক্লান্তি বোধ করে না। (হা-মীম সিজদাহ, ৪১ : ৩৭-৩৮)

এপর্যন্ত পাঠ করে তিনি সিজদায় গেলেন; তারপর বললেন, দেখো ওতবা, তুমি তোমার কথা বলেছো, আমি আমার জওয়াব দিয়েছি, এখন তোমার যা খুশি।

কোরায়শের এমনও প্রস্তাব ছিলো যে, তারা কিছু ছাড় দেবে, আল্লাহর নবী কিছু ছাড় দেবেন, যাতে সমঝোতার মধ্যবর্তী কোন পথ বেরিয়ে আসে। আল-কোরআনের ভাষায়–

وَدُّوا۟ لَوْ تُدْهِنُ فَيُدْهِنُونَ ﴿٩﴾

'তাদের কামনা, আপনি নমনীয় হবেন তাহলে তারাও নমনীয় হবে। (আপনি তাদের মূর্তিপূজা গ্রহণ করবেন, তারাও আল্লাহর ইবাদত করবে)। (নূন ওয়াল-কালাম, ৬৮ : ৯)

আল্লাহর নবীর পক্ষ হতে এর জবাব এসেছে সূরাতুল কাফিরূনে যে, তোমরা যার পূজা করো আমি তার পূজা করতে পারি না, আর তোমরাও এক আল্লাহর ইবাদতে রাজী নও, সুতরাং সমঝোতার কোন সুযোগ নেই।

ভিন্ন লোভ ও প্রলোভন এবং সমঝোতার সব আয়োজন যখন ব্যর্থ হলো তখন ক্রোধে আত্মহারা কোরায়শ নবী ও তাঁর দাওয়াতের বিরুদ্ধে একযোগে ঝাঁপিয়ে পড়লো এবং গোটা মক্কায় হিংস্রতা ও পাশবিকতার যেন আগুন জ্বলে উঠলো যাতে ঈমান ও তাওহীদ এবং রিসালাত ও আখেরাতের দাওয়াত থেকে মানুষকে দূরে রাখা সম্ভব হয় এবং যারা দাওয়াত কবুল করেছে তারা অন্তত জানের ভয়ে তাঁর সঙ্গ ত্যাগ করতে বাধ্য হয়।

পরিস্থিতি তখন এমনই ভয়াবহ ছিলো যে, আল্লাহর নবীর প্রতি ঈমান আনা এবং তাঁর কাফিলায় শামিল হওয়া সত্যি সত্যি ছিলো অসম সাহসিকতার কাজ। এমন কারো পক্ষেই শুধু এটা সম্ভব ছিলো যে প্রাণের মায়া ত্যাগ করে আগুনে ঝাঁপ দিতে পারে, কিংবা পারে জ্বলন্ত অঙ্গার হাতে নিতে।

কিন্তু এটা তো ছিলো আল্লাহর হুকুমে আল্লাহর নবীর দাওয়াত! তাই আগুন ও অঙ্গারের মধ্য দিয়েও সে তার পথ করে নিলো। ধীরে ধীরে কোরায়শের কিছু নির্ভীক ও সত্যপিপাসু যুবক এগিয়ে এলো যাদের সামনে না অন্তরায় হতে পেরেছে যৌবনের ভোগলিপ্সা এবং জাগতিক লোভ-লালসা, না তাদের ফিরিয়ে রাখতে পেরেছে জ্বলন্ত অঙ্গার ও আগুন, আর না পাশবিক নির্যাতন ও নিপীড়নের বিভীষিকা। কারণ তাদের তো চিন্তা ছিলো শুধু আখেরাত এবং একমাত্র কাম্য ছিলো জান্নাত। তাদের কানে যখন ঈমান ও তাওহীদের এ উদাত্ত আহ্বান প্রবেশ করলো–

হে লোকসকল! বলো লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ, লাভ করবে সফলতা ও ফালাহ

তখন যাবতীয় চাকচিক্য ও চমক-ঝলক সত্ত্বেও জাহেলি জীবন তাদের কাছে মনে হলো দুর্বিষহ। এত দিনের সুখশয্যা তাদের কাছে হয়ে গেলো কণ্টকশয্যা! এমনকি প্রাণ ও প্রাণপ্রিয় সবকিছু মনে হলো তুচ্ছ। দ্বীন ও দুনিয়ার হাকীকত এবং জীবন ও জগতের প্রকৃত সত্য তাদের সামনে তখন আলোক-উদ্ভাসিত হয়ে গিয়েছে। তাই হৃদয় ও আত্মার আকুতি উপেক্ষা করা এবং বুদ্ধি ও বিবেকের দাবী প্রত্যাখ্যান করা তাদের পক্ষে আর সম্ভব ছিলো না। পথ ও পথের মান্‌যিল যারা পেয়ে যায় ভয় ও বাধা তাদের মন থেকে মুছে যায়; সাহস ও উদ্দীপনা তখন তাদের আকাশচুম্বী হয়ে যায়। হামযা-ওমর ও বেলাল-আম্মার এবং আরো অনেকের ক্ষেত্রে তাই হলো। সকল দ্বিধাদ্বন্দ্ব ঝেড়ে ফেলে, আগুন ও অঙ্গারের বাধা অতিক্রম করে আল্লাহর নবীর কাছে তারা হাযির হলেন এবং পরিপূর্ণ উপলব্ধি ও প্রত্যয়ের সঙ্গে ঈমান আনলেন।

আল্লাহর নবী তো তাদেরই শহর মক্কায় তাদেরই প্রতিবেশী ছিলেন। মাঝখানে কতটুকুই বা পথ! কিন্তু কোরায়শের হিংস্রতা ও পাশবিকতায় সেটাই ছিলো এমন ঝুঁকিবহুল ও বিপদসঙ্কুল যে, তাঁর ডাকে সাড়া দিয়ে তাঁর কাছে পৌঁছা, দূরের দুর্গম পথ পাড়ি দেয়ার চেয়েও কঠিন ছিলো। মরুভূমির রাহযানদের রাহাযানি থেকে জান বাঁচিয়ে শাম ও ইয়ামানে তেজারতি কাফেলা নিয়ে যাওয়া এত কঠিন ছিলো না, যত কঠিন ছিলো মক্কায় কারো পক্ষে আল্লাহর নবী মুহাম্মাদ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে যাওয়া। কিন্তু জোর-জুলুমের কোন ঝড়তুফান এবং মৃত্যুর কোন ঝুঁকি-হুমকি আত্মার জগতে মহামুক্তির এই অভিযাত্রা থেকে তাদের বিরত রাখতে পারেনি। সবকিছু জয় করে এবং সবকিছু তুচ্ছ করে তারা এগিয়ে এসেছিলেন এবং লাব্বাইক বলে তাঁর দাওয়াত কবুল করেছিলেন। তাঁর পবিত্র হাতে হাত রেখে তাঁরা ঘোষণা করেছিলেন, আমরা সাক্ষ্য দিচ্ছি, আল্লাহ ছাড়া কোন ইলাহ নেই এবং আপনি আল্লাহর রাসূল। এ উদাত্ত ঘোষণার মাধ্যমে তাঁরা নিজেদের জীবন এবং জীবনের প্রতিটি শ্বাস-প্রশ্বাস আল্লাহর নবীকে উৎসর্গ করেছিলেন।

তারা জানতেন, এর পরিণতি কী হতে পারে! পথে পথে কত বিপদ আসতে পারে! পদে পদে মৃত্যু ছোবল দিতে পারে। এমনকি এজন্য তাদের সামনে মৃত্যুর চেয়েও কঠিন পরীক্ষা আসতে পারে। আর সেজন্য তারা প্রস্তুত ছিলেন। কারণ তাদের সামনে ছিলো আল-কোরনের ঘোষণা—

الٓمٓ ۝ أَحَسِبَ ٱلنَّاسُ أَن يُتْرَكُوٓا۟ أَن يَقُولُوٓا۟ ءَامَنَّا وَهُمْ لَا يُفْتَنُونَ ۝ وَلَقَدْ فَتَنَّا ٱلَّذِينَ

مِن قَبْلِهِمْ ۖ فَلَيَعْلَمَنَّ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ صَدَقُوا۟ وَلَيَعْلَمَنَّ ٱلْكَـٰذِبِينَ ۝

আলিফ-লাম-মীম, মানুষ কি ধরে নিয়েছে যে, 'ঈমান এনেছি' বললেই তাদের ছেড়ে দেয়া হবে, কোন পরীক্ষা করা হবে না! অথচ পরীক্ষা করেছি আমি তাদের পূর্ববর্তীদের! তো অবশ্যই আল্লাহ জেনে নেবেন তাদেরকে যারা সত্য বলেছে এবং জেনে নেবেন মিথ্যাবাদীদের। (আল-আনকাবূত, ২৯ : ১-৩)

أَمْ حَسِبْتُمْ أَن تَدْخُلُوا۟ ٱلْجَنَّةَ وَلَمَّا يَأْتِكُم مَّثَلُ ٱلَّذِينَ خَلَوْا۟ مِن قَبْلِكُم ۖ مَّسَّتْهُمُ ٱلْبَأْسَآءُ

وَٱلضَّرَّآءُ وَزُلْزِلُوا۟ حَتَّىٰ يَقُولَ ٱلرَّسُولُ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ مَعَهُۥ مَتَىٰ نَصْرُ ٱللَّهِ ۗ أَلَآ إِنَّ نَصْرَ ٱللَّهِ

قَرِيبٌ ۝

'নাকি ধরে নিয়েছো যে, তোমরা জান্নাতে চলে যাবে অথচ এখনো আসেনি তোমাদের কাছে তাদের মত পরীক্ষা যারা তোমাদের পূর্বে বিগত হয়েছে! তাদের তো ঘিরে ধরেছিলো বিভিন্ন কষ্ট ও দুর্দশা। আর তারা প্রকম্পিত হয়ে পড়েছিলো, এমনকি রাসূল এবং তাঁর সঙ্গী মুমিনরা বলতে শুরু করেছিলো, কবে আসবে আল্লাহর সাহায্য! শোনো, আল্লাহর সাহায্য অবশ্যই নিকটবর্তী।'

মোটকথা, যে কোন কঠিন পরিস্থিতি এবং যে কোন ভয়ঙ্কর পরিণতির জন্য তাঁরা প্রস্তুত ছিলেন, আর কোরায়শও ঝাঁপিয়ে পড়েছিলো নেকড়ের হিংস্রতা নিয়ে। নির্যাতন ও নিপীড়নের যত কৌশল জানা ছিলো সবই তারা প্রয়োগ করেছিলো এই দুর্বল অসহায় মুসলিমদের উপর। তাদের তূণীরে যত তীর ছিলো সবই তারা নিক্ষেপ করেছিলো। কিন্তু হিংস্রতা ও বর্বরতা যত ভয়ঙ্কর হলো তাঁদের ঈমান ও বিশ্বাসের দৃঢ়তা ও অবিচলতা ততই বৃদ্ধি পেলো। আলকোরআন যেন তাদের অবস্থাকেই ভাষা দিয়েছে এভাবে—

وَلَمَّا رَءَا ٱلْمُؤْمِنُونَ ٱلْأَحْزَابَ قَالُوا۟ هَـٰذَا مَا وَعَدَنَا ٱللَّهُ وَرَسُولُهُۥ وَصَدَقَ ٱللَّهُ

وَرَسُولُهُۥ ۚ وَمَا زَادَهُمْ إِلَّآ إِيمَـٰنًا وَتَسْلِيمًا ۝

'আর মুমিনগণ যখন দেখলো শত্রুদলগুলোকে তখন তারা বলে উঠলো, এরই তো ওয়াদা করেছেন আল্লাহ ও তাঁর রাসূল আমাদের সঙ্গে, আর আল্লাহ ও তাঁর রাসূল সত্য বলেছেন। আর তা তো তাদের ঈমান ও আত্মসমর্পণকেই শুধু বৃদ্ধি করেছে।' (আল-আহযাব, ৩৩ : ২২)

দ্বীনের পথে নির্যাতন ও নিপীড়নের এই যে অগ্নিপরীক্ষা, একদিকে তা ছাহাবা কেরামের ঈমান ও আকীদা এবং দ্বীনী গায়রত ও ধর্মীয় চেতনাকে যেমন দৃঢ় থেকে দৃঢ়তর করেছে তেমনি অন্যদিকে শিরক, কুফুরি ও জাহেলিয়াতের প্রতি তাঁদের অন্তরের ঘৃণাকে তীব্র থেকে তীব্রতর করেছে। একদিকে তাঁরা হৃদয় ও আত্মার পরম পরিশুদ্ধি অর্জন করেছেন অন্যদিকে অর্জন করেছেন আখলাক ও চরিত্রের পূর্ণতম উজ্জ্বলতা। এককথায় আল্লাহর জন্য নিপীড়ন-ভোগের এই অগ্নিকুণ্ড থেকে তারা খাঁটি সোনা হয়ে বেরিয়ে এসেছিলেন, কিংবা তাদের তুলনা ছিলো সেই ঝকমকে তরবারি, এই মাত্র যাকে তুলে আনা হয়েছে উত্তপ্ত ভাট্টি থেকে।

ছাহাবাগণের ঈমানি তারবিয়াত

নির্যাতন ও নিপীড়নের এই অগ্নিপরীক্ষার মধ্যেও আল্লাহর নবী ছাহাবা কেরামের দ্বীনী তা'লীম ও ঈমানী তারবিয়াতের প্রতিও পূর্ণ যত্নবান ছিলেন। তাঁদের কলব ও রূহকে তিনি নিয়মিত কোরআনের গিযা ও খোরাক দান করছিলেন এবং ঈমান-ইয়াকীনের নিরন্তর দীক্ষা দানের মাধ্যমে তাঁদের হৃদয় আত্মার সংশোধন ও উৎকর্ষ সাধন করে চলেছিলেন। ফলে নিরন্তর তাঁরা ছবর ও ধৈর্য, শোকর ও কৃতজ্ঞতা এবং সম্বরণ ও সহনশীলতার মহৎ চেতনায় তাঁরা উজ্জীবিত হয়ে চলেছিলেন।

প্রতিদিন পাঁচবার রাব্বুল আলামীনের সামনে তিনি তাঁদের দাঁড় করাতেন দেহের পবিত্রতা, হৃদয়ের সমর্পিতি এবং চিন্তার একাগ্রতার সঙ্গে। ফলে আধ্যাত্মিক সিদ্ধি ও নৈতিক পরিশুদ্ধির ক্ষেত্রে উচ্চ থেকে উচ্চতর স্তরে প্রতিনিয়ত তাঁদের উত্তোরণ ঘটছিলো। এভাবে ক্রমশ তাঁরা প্রবৃত্তির বাঁধন ও জড়জাগতিক বন্ধন থেকে মুক্তি অর্জন করছিলেন। সর্বোপরি আসমান-যমিনের মালিক ও বিশ্বজগতের স্রষ্টা যিনি তাঁর প্রতি তাঁদের প্রেম ও ভালোবাসা এবং সমর্পণ ও আত্মনিবেদন নিরন্তর গভীরতা লাভ করছিলো। ফলে একসময় তাঁরা এমন বিশুদ্ধ ও আদর্শ মানবরূপে আত্মপ্রকাশ করলেন যে, মাটির মানুষ হয়েও ছাড়িয়ে গেলেন নূরের ফিরেশতাদের। জীবনে তাঁদের এমন আশ্চর্য সুন্দর পরিবর্তন এলো, মানবজাতির ইতিহাসে যার কোন তুলনা নেই।

ভেবে দেখুন, জাহেলিয়াতের জীবনে কী ছিলো তাঁদের অবস্থা! শুধু প্রতিহিংসা ও প্রতিশোধস্পৃহা এবং তলোয়ারচালনা ও যুদ্ধোন্মাদনা। কারণে অকারণে খুন-খারাবি ছিলো তাঁদের মজ্জাগত। একেকটি যুদ্ধে রক্ত বয়ে যেতো পানির মত। তাঁরা তো ছিলো সেই কাওমের সন্তান যাদের গর্বের বিষয় ছিলো বাসূস ও দাহিস যুদ্ধের খুনি দাস্তান। আর আলফিজারের যুদ্ধও তো খুব দূরের ঘটনা ছিলো না! কিন্তু এই জঙ্গ ও জঙ্গি স্বভাবকে এবং তাঁদের আরবীয় অহমিকাকে আল্লাহর নবী এমনই অবদমিত করে এনেছিলেন যে, ক্রোধ ও প্রতিশোধের কথা যেন তাঁরা ভুলেই গেলেন। তিনি বললেন, সংযত করো তোমাদের হাত এবং কায়েম করো ছালাত। সঙ্গে সঙ্গে তারা সংযত হলেন এবং কোরায়শের জুলুমাত অম্লান বদনে সয়ে গেলেন। এটা কিন্তু ভীরুতা ও কাপুরুষতার কারণে নয়; কেননা মানবস্বভাবে ভীরুতা ও কাপুরুষতা এবং অনমনীয়তা ও অবিচলতা কখনো সহাবস্থান করে না, বরং এটা ছিলো নবীর আদেশ ও শিক্ষা মাথা পেতে নেয়ার কারণে। গোটা মক্কী

জীবনে কেউ এমন একটি ঘটনাও দেখাতে পারবে না যে, কোন মুসলাম যুলুম নির্যাতনের প্রতিবাদ করেছেন এবং আত্মরক্ষার জন্য তলোয়ার তুলেছেন, অথচ জ্বলে ওঠার স্বভাব-অনুঘটকের অভাব ছিলো না তাঁদের মধ্যে। কিন্তু স্বভাবেরই যে পরিবর্তন ঘটে গিয়েছিলো! বস্তুত ছাহাবা কেরামের মক্কার জীবন ছিলো সংযম ও সহনশীলতার এমন চূড়ান্ত প্রকাশ যার উদাহরণ খুঁজে পাওয়া যাবে না বিশ্বাস ও আদর্শের জগতে কোন জাতি ও সম্প্রদায়ের ইতিহাসে।

অবশেষে সবকিছু যখন সহ্যের সব সীমা ছাড়িয়ে গেলো এবং ঢলের পানি মাথার উপর দিয়ে বয়ে গেলো, আর আল্লাহর নবী তাঁদের হিজরতের অনুমতি দিলেন তখন দ্বীন ও ঈমানের হেফাযতের জন্য তাঁরা ইয়াছরিবে হিজরত করলেন, যেখানে আগেই ইসলামের আলো পৌঁছে গিয়েছিলো।

আল্লাহর নবীর শহর মদীনায়

জীবনের সর্বস্ব ত্যাগ করে মক্কা থেকে যারা এলেন, ইয়াছরিবের অধিবাসীরা তাঁদের আপন বলে বরণ করে নিলেন। অথচ নতুন ধর্ম ইসলাম ছাড়া আর কোন বন্ধন ছিলো না তাঁদের মধ্যে। বস্তুত এটা ছিলো দ্বীন ও ধর্মের বন্ধনশক্তির এক মধুরতম প্রকাশ, যা মানবজাতির ইতিহাস এই প্রথম প্রত্যক্ষ করেছিলো।

ইয়াছরিবের অবস্থাও তো শোচনীয় ছিলো। আওস ও খাযরাজ ছিলো পরস্পরের চিরশত্রু, একে অন্যের রক্তের পিপাসু। বু'আছ যুদ্ধের ধুলিমাখা পোশাক তখনো ছিলো তাঁদের দেহে; তখনো ফোঁটা ফোঁটা রক্ত ঝরছে তাঁদের তলোয়ার থেকে। এমন প্রতিহিংসার পরিবেশেও ইসলাম তাঁদের অন্তরে সৃষ্টি করেছিলো প্রীতি ও সম্প্রীতির সুমধুর বন্ধন। ফলে এমনভাবে তাঁরা বুকে বুক মিলালেন, যেন যুদ্ধের মাঠে কখনো তাদের মুখোমুখি হয়নি। আলকোরআনের ভাষায়–

وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ لَوْ أَنفَقْتَ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مَّا أَلَّفْتَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ
وَلَٰكِنَّ اللَّهَ أَلَّفَ بَيْنَهُمْ إِنَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

'আর তিনি বন্ধন সৃষ্টি করেছেন তাদের হৃদয়ের মধ্যে। যদি তুমি ব্যয় করতে পৃথিবীর যাবতীয় সম্পদ তাহলেও পারতে না তাদের হৃদয়ের মধ্যে বন্ধন সৃষ্টি করতে, আসলে আল্লাহ তাদের মধ্যে বন্ধন সৃষ্টি করেছেন। নিঃসন্দেহে তিনি মহাপরাক্রমশালী, মহাপ্রজ্ঞাবান।' (আনফাল, ৮ : ৬৩)

তারপর একদিকে মক্কার মুহাজির, অন্যদিকে মদীনার আউস ও খাযরাজের আনসার– তাঁদের মধ্যে আল্লাহর নবী ভাই-ভাই সম্পর্ক স্থাপন করে দিলেন, এমন ভ্রাতৃত্ব যা রক্তের ভ্রাতৃত্বকেও ম্লান করে দেয়, দুনিয়ার সকল বন্ধুত্বের বন্ধন যার সামনে লজ্জা পেয়ে যায়। আত্মার আত্মীয়তার এবং ভ্রাতৃত্ব ও ভালোবাসার এমন অনুপম উদাহরণ মানবজাতির ইতিহাসে কে কবে কোথায় দেখেছে?!

আনসার-মুহাজির ভ্রাতৃত্বের মাধ্যমে গড়ে ওঠা এই যে নতুন জামাত মূলত তারাই ছিলো ইসলামের আসল সম্পদ এবং ইসলামী উম্মাহর বুনিয়াদ, যে উম্মাহ উত্থিত হয়েছে মানবজাতির কল্যাণের জন্য। তাদেরই মাধ্যমে কঠিনতম সংকটসন্ধিক্ষণে পৃথিবী রক্ষা পেয়েছে অবশ্যম্ভাবী বিপর্যয়ের হাত থেকে এবং মানবতা উদ্ধার পেয়েছে ঘনায়মান বিপদ-দুর্যোগের কবল থেকে। বস্তুত মানব ও মানবতার অস্তিত্বের জন্যই অপরিহার্য ছিলো এই সুমহান জামাতটির আত্মপ্রকাশ এবং স্থিতি ও বিকাশ। এজন্যই আনসার-মুহাজিরদের ভ্রাতৃত্ব ও সম্প্রীতির বিষয়ে জোর দিতে গিয়ে আল্লাহ্ তা'আলা বলেছেন–

إِلَّا تَفْعَلُوهُ تَكُن فِتْنَةٌ فِي الْأَرْضِ وَفَسَادٌ كَبِيرٌ ﴿٧٣﴾

'যদি তোমরা তা না করো তাহলে দুনিয়াতে দেখা দেবে ফেতনা এবং বিরাট ফাসাদ।' (আনফাল, ৮ : ৭৩)

খুলে গেলো আসল জট

অনুকূল-প্রতিকূল সমগ্র পরিবেশ পরিস্থিতির ভিতরেও আল্লাহর রাসূল ছাহাবা কেরামের প্রতি তাঁর হাকীমানা ও প্রজ্ঞাপূর্ণ ঈমানী ও আখলাকী তারবিয়াত জারি রেখেছিলেন। আলকোরআন অব্যাহতরূপে তাদেরকে আত্মিক উৎকর্ষের পথে পরিচালিত করছিলো এবং তাদের হৃদয়ে ঈমান ও বিশ্বাসের তাপ ও উত্তাপ সৃষ্টি করে চলেছিলো।

বস্তুত নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নূরানি মজলিস ও ছোহবত এবং সঙ্গ ও সাহচর্য ছিলো ছাহাবা কেরামের জন্য জ্ঞান ও ঈমান, প্রজ্ঞা ও অভিজ্ঞান এবং মহৎ চিন্তা ও উন্নত চরিত্র অর্জনের এক আদর্শ শিক্ষাঙ্গন। সেখান থেকে একদিকে তাঁরা যেমন লাভ করছিলেন দ্বীনের প্রতি ইস্তিকামাত ও অবিচলতা, অন্যদিকে তেমনি অর্জন করছিলেন প্রবৃত্তির সংযম ও আত্মশাসন এবং আল্লাহর সন্তুষ্টির প্রতি পরিপূর্ণ আত্মনিবেদন। তাঁদের পার্থিব জীবনের একমাত্র লক্ষ্যই

হয়ে উঠেছিলো আল্লাহর নবীর প্রতি নিরঙ্কুশ আনুগত্যের মাধ্যমে জান্নাতের চিরস্থায়ী সুখের অধিকারী হওয়া। তাই যখনই আল্লাহর পথে জিহাদের ডাক আসতো, পরিস্থিতি অনুকূল হোক বা প্রতিকূল, তাঁরা লাব্বাইক বলে ছুটে যেতেন। আল্লাহর নবীর আদেশে তাঁরা তো সাগরে ঝাঁপ দিতে এবং আগুনে ঝাঁপিয়ে পড়তেও প্রস্তুত ছিলেন। তাঁরা বলতেন, 'মুসার কাওমের মত আমরা বলবো না, যান আপনি ও আপনার রাব্ব এবং লড়াই করুন; আমরা তো এখানেই বসে থাকবো। না, আমরা বরং লড়াই করবো আপনার ডানে বামে, সামনে ও পিছনে দাঁড়িয়ে।'

মাত্র দশবছরের মাদানী যিন্দেগিতে আল্লাহর রাসূলের সঙ্গে তাঁরা একে একে সাতাশটি জিহাদ ও গাযওয়ায় শরীক হয়েছেন এবং তাঁর আদেশে একশরও বেশী বার শত্রুর বিরুদ্ধে অভিযানে বের হয়েছেন।

এটা তো ছিলো বাইরের যাহিরি জিহাদ, সেই সঙ্গে ছিলো নফসের বিরুদ্ধে তাঁদের বাতিনি জিহাদ। গাযওয়া থেকে ফেরার পর আল্লাহর নবী ছাহাবা কেরামকে বলতেন, 'আমরা ছোট জিহাদ থেকে বড় জিহাদের দিকে প্রত্যাবর্তন করলাম।'

মোট কথা শত্রুর বিরুদ্ধে এবং নফসের বিরুদ্ধে, নিরন্তর এই দুই জিহাদের মাধ্যমে তাঁরা এমনই খাঁটি মানুষ হয়ে উঠলেন যে, পার্থিব জগতের যে কোন পদ ও সম্পদ এবং লোভ ও প্রলোভন ত্যাগ করা, এমনকি প্রাণ ও সন্তানের মায়া বিসর্জন দেয়া তাদের জন্য ছিলো খুবই সহজ। বিভিন্ন লক্ষ্যে ও উপলক্ষে এমনসব আয়াত ও আহকাম নাযিল হতো যা তাঁদের আচার-অভ্যাসের অনুকূল ছিলো না এবং তাতে তাঁরা অভ্যস্ত ছিলেন না। কখনো তাঁদের জানের উপর, মালের উপর, কখনো বা সন্তানসন্ততি ও পরিবার-পরিজন সম্পর্কে এমন আদেশ জারি হতো, মানবস্বভাবের জন্য যা পালন করা ছিলো কঠিন, বরং অসম্ভব, কিন্তু তাঁরা তাতে স্বতঃস্ফূর্ত সাড়া দিতেন এবং অম্লান বদনে মেনে নিতেন। কীভাবে সম্ভব হয়েছিলো এ বিস্ময়কর পরিবর্তন?!

ঘটনা এই যে, চিন্তা-চেতনার এবং ভাব ও ভাবনার সবচে' কঠিন ও জটিল যে জট সেটাই খুলে গিয়েছিলো নবীর দাওয়াত ও তারবিয়াত এবং শিক্ষা ও দীক্ষার কল্যাণে। আর তা হলো হৃদয় ও বিশ্বাসের জগতে শিরক ও কুফুরির জট। ফলে জীবনের ছোট-বড় অন্য সব জট ও জটিলতা আলাদা করে আর খুলতে হয়নি, নিজে নিজেই খুলে গিয়েছিলো। শিরক ও কুফুরির এই জট ও জটিলতার

বিরুদ্ধেই ছিলো আল্লাহর নবীর প্রথম দাওয়াত এবং প্রথম জিহাদ। তিনি শুধু বলেছেন 'ঈমান আনো এবং তাওহীদে বিশ্বাস করো।'
আর বলেছেন, 'জান্নাত-জাহান্নাম, শাস্তি-পুরস্কার এবং মৃত্যুর পর অনন্ত জীবনের অস্তিত্ব স্বীকার করো। শিরক ও কুফুরি বর্জন করো, মূর্তিপূজা ত্যাগ করো।' এককথায় শিরক ও কুফুরির বিরুদ্ধে ঈমান ও তাওহীদের দওয়াতই ছিলো তাঁর একমাত্র মেহনত, ফলে প্রতিটি আদেশ-নিষেধের জন্য তাঁকে আলাদা আলাদা মেহনত করতে হয়নি। আদেশ এসেছে, নিষেধ এসেছে, ছাহাবা কেরাম অম্লান বদনে তা পালন করেছেন। এভাবে প্রথম যুদ্ধেই জাহেলিয়াতের বিরুদ্ধে ইসলাম নিরঙ্কুশ বিজয় অর্জন করেছে, ফলে প্রতিটি ক্ষেত্রে যুদ্ধ ছাড়াই বিজয় তাঁর অনুগামী হয়েছে। তাঁদের বলা হলো—

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ ٱدْخُلُوا۟ فِى ٱلسِّلْمِ كَآفَّةً وَلَا تَتَّبِعُوا۟ خُطُوَٰتِ ٱلشَّيْطَٰنِ ۚ إِنَّهُۥ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ

'হে ঐ লোকেরা যারা ঈমান এনেছো, শোনো, প্রবেশ করো তোমরা ইসলামে সমগ্ররূপে, আর অনুসরণ করো না শয়তানের পদাঙ্কসমূহ। নিঃসন্দেহে সে তোমাদের শত্রু।' (বাকারাহ, ১ : ২০৮)

তারা শুনলেন এবং সমগ্ররূপেই ইসলামের গণ্ডীতে প্রবেশ করলেন, দেহসত্তায়, সর্বাঙ্গে এবং মনে-প্রাণে ও চিন্তাচেতনায়। শয়তানকে তাঁর খোল্লামখোল্লা দুশমন-রূপেই চিনে নিলেন এবং জীবনের সর্বক্ষেত্র থেকে শয়তানিয়াতকে তাঁরা উৎখাত করলেন।
সত্য যখন তাদের সামনে উদ্ভাসিত হলো এবং সরল পথ যখন তাদের সামনে সুপ্রকাশিত হলো তখন তাঁরা না বিলম্ব করলেন, না কোন দ্বিধা-জড়তা প্রকাশ করলেন, বরং সঙ্গে সঙ্গে সত্যকে বরণ করে নিলেন এবং সরল পথের পথিক হলেন। আনন্দে বেদনায় ও হর্ষে বিসাদে কোন বিষয়ে আল্লাহর রাসুলের প্রতি তাঁরা সামান্যতম অমান্যতা প্রদর্শন করেননি। তাঁর কোন আদেশে, নিষেধে, কোন ফায়ছালা ও সিদ্ধান্তে তাদের পরিশুদ্ধ অন্তরে কখনো কোন অপ্রষণ্ণতা জাগেনি। কারণ নবীর আদেশ বা নিষেধের পর তো তাঁদের ইচ্ছা-অনিচ্ছার কোন অধিকার ছিলো না। সে অধিকার তো তাঁর স্বেচ্ছায় স্বচ্ছন্দে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের জন্য উৎসর্গ করেছেন।

শুধু তাই নয়, নফসের প্ররোচনে লোকচক্ষুর অন্তরালে একান্ত নির্জনে যখন কারো কোন স্খলন ঘটেছে তিনি অস্থির হয়ে ছুটে এসেছেন এবং আল্লাহর নবীর গোচরে এনে তার শাস্তি ও প্রতিকার প্রার্থনা করেছেন। তারপর হদ ও রজমের মত কঠিন দণ্ডও মাথা পেতে নিয়েছেন।
মদ হারামের আয়াত যখন নাযিল হলো, তখন উপচে পড়া পানপাত্র ছিলো তাঁদের হাতে, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে আল্লাহর বিধান আড়াল হয়ে গেলো মদের পেয়ালা ও উন্মুখ ঠোঁটের মাঝে। মদের মটকা এমনভাবে ভাঙ্গা হলো যে, মদীনার গলিতে বয়ে গেলো মদের ঢল।
এভাবে যখন তাঁরা শয়তানের প্রভাব ও নফসের প্ররোচনা থেকে মুক্ত এবং নিষ্কাম ও নিষ্কলুষ চরিত্রের অধিকারী এক মানব-জামা'আতরূপে আত্মপ্রকাশ করলেন; বিপদে দুর্যোগে ও অভাবে দারিদ্র্যে যারা বিচলিত নন, আবার সম্পদে ও প্রাচুর্যে এবং ক্ষমতা ও প্রতিপত্তিতে নন দুর্বিনীত; নিজের প্রতি এবং আপন-পর সবার প্রতি যাদের আচরণ অভিন্ন এবং ন্যায় ও ইনসাফের প্রতি যাদের অবিচল নিষ্ঠা; যারা সত্যসাক্ষ্য দান করেন, হোক তা নিজের এবং পিতা-মাতা ও আত্মীয়-স্বজনের বিপক্ষে; ব্যবসা-বাণিজ্য ও বেচা-কেনা আল্লাহর যিকির থেকে যাদের অন্যমনস্ক করে না; বাতিলের বিক্রম ও পরাক্রমের সামনে যারা মাথা নত করেন না, আবার যমিনে ফাসাদ ও গোলযোগ-বিবাদ পছন্দ করেন না; যাদের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যই হলো মানবজাতির কল্যাণ; এককথায় দুনিয়াতে বাস করেও যখন তারা হয়ে গেলেন আখেরাতের বাসিন্দা তখন পৃথিবীকে আল্লাহ তা'আলা তাঁদের করতলে এনে দিলেন, আর তাঁরা হলেন পৃথিবীর অভিভাবক, মানবতার রক্ষক, সত্যের বাণীবাহক এবং আল্লাহর দ্বীনের আহ্বায়ক। আল্লাহর রাসূল তখন তাঁদেরকে আপনার স্থলাভিষিক্ত করে পৃথিবী থেকে বিদায় গ্রহণ করলেন এবং উম্মতের প্রতি চক্ষুশীতল করা প্রশান্তি নিয়ে পরম বন্ধুর সান্নিধ্যে গমন করলেন।

মানবেতিহাসের আশ্চর্যতম বিপ্লব

এই যে মহাবিপ্লব, যা আল্লাহর নবী তাঁর 'ছাহাবা-জামাতের' স্বভাব-প্রকৃতিতে সাধন করেছিলেন এবং তাঁদের মাধ্যমে মানবসমাজে তার সুপ্রভাব প্রকাশ পেয়েছিলো, সত্যিকার অর্থেই তা ছিলো মানবজাতির ইতিহাসে অভিনবতম এক বিপ্লব। এ বিপ্লবের অভিনবত্ব ছিলো প্রতিটি ক্ষেত্রে; তার গতিময়তায়, গভীরতা

ও ব্যাপকতায়, ব্যাপ্তিতে ও সহজ-সরলতায় এবং বোধগম্যতায়। এতে কোন দুর্বোধ্যতা যেমন ছিলো না তেমনি ছিলো না কোন ধাঁধা ও রহস্যময়তা; যেমন হয়ে থাকে জগতের অতিপ্রাকৃতিক বহু ঘটনা-মহাঘটনার ক্ষেত্রে। আপনি যদি এ মহাবিপ্লবের বিভিন্ন দিক সম্পর্কে বুদ্ধিবৃত্তিক পর্যালোচনা করেন এবং মানবসমাজ ও মানব-ইতিহাসে এর প্রভাব-প্রতিক্রিয়ার ব্যাপ্তি ও ব্যাপকতা পরীক্ষা করে দেখেন তাহলেই আমাদের বক্তব্যের সারবত্তা অনুধাবন করতে পারবেন।

চরিত্র ও প্রকৃতিতে ঈমানের প্রভাব

সে যুগে আরব-আজম সমগ্র মানবগোষ্ঠী আগাগোড়া একটি জাহেলিয়াতের জীবনে আবদ্ধ ছিলো এবং সে জীবনের সবকিছুই ছিলো স্বভাব থেকে বিচ্যুত, চূড়ান্ত বিকৃতির শিকার। এমনকি মানব-স্বভাবের মৌলিকতম যে চাহিদা, প্রার্থনা ও উপাসনা, তাতেও ঘটেছিলো চরম বিচ্যুতি ও বিকৃতি। যা কিছু নিয়োজিত ছিলো মানুষের সেবায় এবং যা কিছু ন্যস্ত ছিলো তাদের কর্তৃত্বে ও নিয়ন্ত্রণে সেগুলোরই তারা পূজা শুরু করেছিলো এবং সেগুলোরই সামনে প্রার্থনার হাত যুক্ত করা শুরু করেছিলো। অথচ এসব পূজ্য দেবতার না ছিলো আদেশ-নিষেধের শক্তি, না ছিলো অনুগতকে পুরস্কৃত এবং অবাধ্যকে তিরস্কৃত করার ক্ষমতা। তাদের ধর্মীয় আচরণ ও বিশ্বাস ছিলো খুবই অস্পষ্ট, ঝাপসা ও অগভীর, জীবনের উপর যার কোন নিয়ন্ত্রণ এবং স্বভাবের উপর যার কোন প্রভাব ছিলো না, এমনকি হৃদয় ও আত্মার কাছেও ছিলো না যার কোন আবেদন। আল্লাহর প্রতি তাদের বিশ্বাস বা ধারণা ছিলো অনেকটা এরকম– একজন নির্মাতা, যিনি তার নির্মাণকর্ম সম্পন্ন করে অবসরে চলে গিয়েছেন এবং কিছু মানুষকে রাব ও প্রতিপালক-মর্যাদায় অভিষিক্ত করে তাদের অনুকূলে আপন রাজত্ব ত্যাগ করেছেন। এখন যা কিছু ক্ষমতা ও মমতা, তা এই মানবপ্রভুদের হাতে নিয়ন্ত্রিত। সবকিছু চলবে শুধু তাদের ইচ্ছায়; রাজ্য ও শাসনকার্য থেকে শুরু করে খাদ্য বিতরণ ও ক্ষমতা বন্টন পর্যন্ত সবকিছু। এককথায় একটি সুসংগঠিত ও সুশৃঙ্খল শাসনব্যবস্থার প্রতিটি শাখা ও বিভাগ চলবে মানবশাসকের নিঃশর্ত ও নিরঙ্কুশ নিয়ন্ত্রণে। বুদ্ধিবৃত্তিক ভাষায় বলতে গেলে তাদের ঈশ্বরীয় ধারণা ও বিশ্বাস নিছক একটি ইতিহাসগত তথ্য-অবগতির বেশী কিছু ছিলো না। জগত ও বিশ্বজগতের সৃষ্টি সম্পর্কে প্রশ্ন করা হলে তাদের অবস্থা হতো ইতিহাসের সেই ছাত্রের মত, যার কাছে কোন প্রাচীন রাজপ্রাসাদের নির্মাতা সম্পর্কে জানতে

চাওয়া হলো? আর সে ভয়-ভীতি, ভক্তি-সমীহ ও আশা-প্রত্যাশা ছাড়া নির্লিপ্ত-ভাবে বলে দিলো, অমুক মহাপরাক্রমশালী সম্রাট এটি নির্মাণ করেছেন (এবং অমুক সনে তার মৃত্যু হয়েছে)। অর্থাৎ তাদের ধর্মবিশ্বাস ও ধর্মাচরণ দু'টোই ছিলো আল্লাহ তা'আলার প্রতি ভয়-ভীতি এবং আশা ও প্রত্যাশার অনুভব-অনুভূতি থেকে সম্পূর্ণ বঞ্চিত।
(আশা ও প্রত্যাশা এবং শঙ্কা ও আশঙ্কা যা কিছু, তা ছিলো মানবীয় ও অতি-মানবীয় বিভিন্ন শক্তির প্রতি।) আল্লাহর গুণ ও ছিফাত সম্পর্কে এমন কিছুই তাদের জানা ছিলো না যা অন্তরে প্রেম ও ভক্তি এবং অনুরাগ ও কৃতজ্ঞতার উন্মেষ ঘটাবে। স্রষ্টা ও তাঁর গুণাবলীর সমগ্র ধারণাটাই তাদের অন্তরে ছিলো একেবারে অস্পষ্ট, অনির্দিষ্ট, ঝাপসা, আচ্ছন্ন, দুর্বোধ্য ও হেয়ালিপূর্ণ; তাতে না ছিলো কোন ভাব ও প্রভাব, না ছিলো কোন শক্তি ও উদ্দীপ্তি।
গ্রীকদর্শনের কথাই ধরুন; তারা তাদের 'অবধারিত সত্তা' ও স্রষ্টার পরিচয় উপস্থাপনের ক্ষেত্রে আগাগোড়া নঞর্থক পন্থা অনুসরণ করেছে। তাতে ইতিবাচক কোন গুণের উল্লেখমাত্র নেই; যেমন, তত্ত্বাবধান ও প্রতিপালন, দান ও বাধাদান, দয়া ও করুণা প্রভৃতি। তারা তাদের বিশ্বাসিত 'অবধারিত সত্তা'টির জন্য শুধু 'প্রথম সৃষ্টি' সাব্যস্ত করেছিলো। পক্ষান্তরে নিরন্তর ইচ্ছা, ক্ষমতা, অধিকার, জ্ঞান, প্রজ্ঞা ইত্যাদি যাবতীয় গুণের অস্তিত্ব অস্বীকার করেছিলো। এক্ষেত্রে তারা এমন কতিপয় মূল দর্শন উপস্থাপন করেছিলো যা গড়ে উঠেছে নিছক স্রষ্টাকে সৃষ্টির উপর অনুমান করার ভিত্তিতে, যা স্রষ্টার 'শান ও মান'-এর সম্পূর্ণ পরিপন্থী। কারণ বলাই বাহুল্য যে, বহু 'না' যেমন একটিমাত্র 'হাঁ'-এর সমান হতে পারে না, তেমনি হৃদয়ে অনুরাগ ও আবেদন সৃষ্টির ক্ষেত্রে স্রষ্টার বহু নেতিবাচক গুণ তাঁর একটিমাত্র ইতিবাচক গুণের সমকক্ষ হতে পারে না, যেমন দয়া-মায়া, ক্ষমা ও অনুকম্পা।
আমাদের জানামতে মানবজাতির ইতিহাসে আজ পর্যন্ত শুধু 'নঞর্থকতা'র উপর ভিত্তি করে কোন সভ্যতা, সমাজব্যবস্থা এবং নীতি ও নৈতিকতা অস্তিত্ব লাভ করেনি, করতেই পারে না। ফল এই দাঁড়িয়েছিলো যে, গ্রীকদর্শনের প্রভাববলয়ে ধর্মাচরণ ও ধর্মবিশ্বাসের সম্পূর্ণ বিষয়টি হয়ে পড়েছিলো আল্লাহর প্রতি প্রেম ও ভক্তি এবং বিপদে প্রার্থনা ও আকুতির সৌকুমার্য থেকে সম্পূর্ণ বঞ্চিত। একই ভাবে তদানীন্তন বিশ্বের সব ধর্মই স্রষ্টা ও সৃষ্টির মাঝে সেতুবন্ধনের মূল প্রাণ-শক্তিটি হারিয়ে নিছক আচার-অনুষ্ঠানের গণ্ডিতে আবদ্ধ হয়ে পড়েছিলো, যেখানে ঈমান ও বিশ্বাসের কঙ্কাল-কাঠামো ছাড়া আর কিছুই ছিলো না।

পক্ষান্তরে আরবজাতি, যারা তাদের নবীর হাতে ইসলাম গ্রহণ করেছিলো, তারা জাহেলিয়াতের রুগ্ন-নিষ্প্রাণ ও ছিন্নমূল-দুর্বোধ্য চিন্তা-সংস্কারের ঘেরাটোপ থেকে বের হয়ে ঈমান ও বিশ্বাসের এক নতুন জগতে প্রবেশ করেছিলো, যা যেমন ছিলো গভীর ও দৃঢ়মূল তেমনি ছিলো সহজ-সরল ও সুস্পষ্ট। হৃদয় ও আত্মার এবং দেহসত্তার উপর তার যেমন পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ ছিলো তেমনি জীবন, সমাজ ও চরিত্রের উপর ছিলো তার অপ্রতিহত প্রভাব। তারা ঈমান এনেছিলো আল্লাহর উপর, যার রয়েছে উত্তম উত্তম নাম ও সর্বোচ্চ মহত্ত্ব, যিনি রাব্বুল আলামীন, রাহমান, রাহীম–অনন্ত অসীম দয়া ও করুণার অধিকারী, যিনি বিচারদিবসের একচ্ছত্র অধিপতি। আলকোরআনের আয়াত–

هُوَ ٱللَّهُ ٱلَّذِى لَآ إِلَـٰهَ إِلَّا هُوَ ۖ عَـٰلِمُ ٱلْغَيْبِ وَٱلشَّهَـٰدَةِ ۖ هُوَ ٱلرَّحْمَـٰنُ ٱلرَّحِيمُ ﴿٢٢﴾ هُوَ ٱللَّهُ ٱلَّذِى لَآ إِلَـٰهَ إِلَّا هُوَ ٱلْمَلِكُ ٱلْقُدُّوسُ ٱلسَّلَـٰمُ ٱلْمُؤْمِنُ ٱلْمُهَيْمِنُ ٱلْعَزِيزُ ٱلْجَبَّارُ ٱلْمُتَكَبِّرُ ۚ سُبْحَـٰنَ ٱللَّهِ عَمَّا يُشْرِكُونَ ﴿٢٣﴾ هُوَ ٱللَّهُ ٱلْخَـٰلِقُ ٱلْبَارِئُ ٱلْمُصَوِّرُ ۖ لَهُ ٱلْأَسْمَآءُ ٱلْحُسْنَىٰ ۚ يُسَبِّحُ لَهُۥ مَا فِى ٱلسَّمَـٰوَٰتِ وَٱلْأَرْضِ ۖ وَهُوَ ٱلْعَزِيزُ ٱلْحَكِيمُ ﴿٢٤﴾

'তিনিই আল্লাহ, যিনি ছাড়া নেই কোন ইলাহ, অপ্রকাশ্য ও প্রকাশ্য বিষয়ের মহাজ্ঞানী। তিনিই পরম দয়ালু, চিরকরুণাময়। তিনিই আল্লাহ, যিনি ছাড়া নেই কোন ইলাহ। (তিনিই) অধিপতি, চিরপবিত্র, (তিনিই) শান্তি, নিরাপত্তা, রক্ষক, প্রতাপান্বিত, পরাক্রমশালী, বড়ত্বের অধিকারী। তারা যা কিছুকে শরীক স্থির করে, তিনি তা থেকে মুক্ত। তিনিই আল্লাহ, সৃজনকারী, উদ্ভাবনকারী, রূপদানকারী; তাঁরই জন্য রয়েছে সকল উত্তম নাম। আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীতে যা কিছু রয়েছে তা তাঁর মহিমা কীর্তন করে। তিনিই প্রবল-প্রতাপান্বিত, প্রজ্ঞাময়।' (আল-হাশর, ২৮ : ২২ : ২৪)

যিনি এ বিশ্বজগতের যুগপৎ স্রষ্টা ও নিয়ন্তা। তাঁরই কুদরতের হাতে রয়েছে সবকিছুর পরিণাম-পরিণতি। যিনি একমাত্র আশ্রয়দাতা, যার মোকাবেলায় কেউ কাউকে আশ্রয় দিতে পারে না। জান্নাত হলো তাঁর পুরস্কার এবং জাহান্নাম হলো তাঁর সাজা। যার জন্য ইচ্ছা করেন রিযিক প্রশস্ত বা সঙ্কীর্ণ করেন। আসমান-যমিনের সমস্ত গুপ্ত বিষয় সম্পর্কে তিনি পূর্ণ অবগত। তিনি জানেন চোখের

অপাঙ্গ দৃষ্টিকে এবং বুকের গোপন কথাকে। সকল সৌন্দর্য ও মহিমার তিনি আধার, তাঁর দয়া ও করুণা অপার।

তাঁরা যে মহান সত্তার প্রতি ঈমান এনেছিলেন তিনি এমনি আরো বহু গুণের অধিকারী যার বিশদ বিবরণ এসেছে আলকোরআনের বিভিন্ন স্থানে।

এই সুব্যাপ্ত, সুগভীর, সুস্পষ্ট ও সুদৃপ্ত ঈমান ও বিশ্বাসের কল্যাণে তাঁদের চিন্তা-চেতনা, মন-মানস ও স্বভাব-চরিত্রে অভাবিতপূর্ব এমনই এক বিপ্লব এসেছিলো যে, যখনই কেউ আল্লাহর প্রতি ঈমান এনে 'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ'-র সাক্ষ্য দিতো সঙ্গে সঙ্গে তাঁর জীবনে আমূল পরিবর্তন এসে যেতো। ঈমান তাঁদের আত্মার গভীরে এবং হৃদয়ের পরতে পরতে প্রবেশ করতো এবং তাঁদের ভিতর থেকে জাহেলিয়াতের সমস্ত শিকড় উপড়ে ফেলতো। শিরক ও কুফুরির যাবতীয় চিহ্ন তাদের জীবন থেকে সম্পূর্ণ মুছে যেতো এবং তাঁরা এক অন্য মানুষরূপে নবজীবন লাভ করতেন। ঈমান ও বিশ্বাসের সরোবরে তাঁদের হৃদয় ও বুদ্ধি এমনভাবে অবগাহন করতো যে, সর্বসত্তা তাতে সুসিক্ত হয়ে যেতো। তখন তাঁরা ঈমান ও বিশ্বাস, ছবর ও ধৈর্য, সাহস ও শৌর্য, ত্যাগ ও আত্মত্যাগ এবং উন্নত চরিত্র ও নৈতিকতার এমন গৌরবময় দৃষ্টান্ত স্থাপন করতেন যে, নীতি ও নৈতিকতার ইতিহাসে সত্যি তার কোন তুলনা নেই। মানবজাতি অনন্তকাল মুগ্ধ-বিস্ময়ে এবং সশ্রদ্ধ চিত্তে তা স্মরণ করবে। বস্তুত মানুষের জ্ঞান ও বুদ্ধিবৃত্তি এ বিস্ময়কর বিপ্লবের এছাড়া আর কোন ব্যাখ্যাই খুঁজে পায় না যে, আল্লাহর প্রতি ঈমানে কামিল ও ইয়াকীনে মুকাম্মালই ছিলো তাঁদের মূল শক্তি।

বিবেকের শাসন

বস্তুত এই ঈমানই ছিলো ছাহাবা কেরামের জন্য এক শ্রেষ্ঠ নৈতিক ও আধ্যাত্মিক শিক্ষাঙ্গন যা তার শিক্ষার্থীকে সুউন্নত নৈতিকতা শিক্ষা দিতো এবং তাকে ইচ্ছার দৃঢ়তা, আত্মশক্তি, আত্মশাসন ও আত্মসুবিচারের মত বিরল গুণ ও যোগ্যতা দান করতো। মনস্তত্ত্ব ও নৈতিকতার ইতিহাস মানুষের মধ্যে মানবিক বিচ্যুতি ও নৈতিক স্খলনের পথে যতগুলো প্রতিরোধকের সাথে পরিচিত হয়েছে তন্মধ্যে ঈমানই হচ্ছে সবচে' কার্যকর ও শক্তিশালী প্রতিরোধক। সেই ঈমানই ছাহাবা কেরাম অর্জন করেছিলেন নবীর ছোহবত ও তারবিয়াত থেকে; সজীব, জীবন্ত ও জাগ্রত ঈমান। তাই দেখা যায়, মানবীয় দুর্বলতার কোন শিথিল মুহূর্তে যদি ভিতরের পশুপ্রবৃত্তি মাথাচাড়া দিয়ে উঠতো এবং কোন স্খলন ঘটে যেতো, অথচ

সেখানে ছিলো না চোখের কোন পাহারা এবং আইনের কোন টহলদারি, তখন ঈমানই তাঁর ভিতরের নফসে লাওয়ামাকে এমনভাবে জাগ্রত করতো এবং তাঁর অন্তরে অনুশোচনার এমন দহন ও বিবেকের এমন দংশন সৃষ্টি করতো যে, সাজা ও শাস্তির জন্য কানুনের হাতে নিজেকে তুলে না দিয়ে স্থির থাকা সম্ভব হতো না। এভাবে আল্লাহর গযব এবং আখেরাতের আযাব থেকে বাঁচার জন্য দুনিয়ার কঠিন থেকে কঠিন শাস্তি তাঁরা অম্লান বদনে মাথা পেতে নিতেন।

নির্ভরযোগ্য ঐতিহাসিকগণ এ বিষয়ে এমন অভূতপূর্ব কতিপয় ঘটনা বর্ণনা করেছেন যার নমুনা ইসলামের ধর্মনৈতিক ইতিহাস ছাড়া অন্য কোথাও পাওয়া যাবে না। মাইয বিন মালিক আসলামীর ঘটনা দেখুন। মুসলিম শরীফে নিজস্ব সনদে আব্দুল্লাহ বিন বোরায়দা হতে বর্ণিত, তিনি তাঁর আব্বা হতে যে, মাইয বিন মালিক আসলামী রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খিদমতে হাযির হয়ে আরয করলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ, নিজের উপর যুলুম করে যিনায় লিপ্ত হয়ে পড়েছি। এখন আমি চাই, আপনি আমাকে (এই গোনাহ থেকে) পবিত্র করুন। নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁকে ফিরিয়ে দিলেন। পরদিন তিনি আবার আরয করলেন। দ্বিতীয়বারও তিনি তাঁকে ফিরিয়ে দিলেন। তারপর তাঁর গোত্রে লোক পাঠিয়ে খোঁজ নিলেন, 'তোমরা কি তার মস্তিষ্কে কোন ত্রুটির কথা জানো? তোমরা তার থেকে কোন অস্বাভাবিক আচরণ দেখেছো?' তারা জানালো, 'আমরা কোন ত্রুটির কথা জানি না, বরং তিনি তো আমাদের সমঝদার লোকদের একজন'।

মাইয তৃতীয়বার এলেন, আর আল্লাহর রাসূল পুনরায় তাঁর সম্পর্কে খোঁজ নিলেন। তারা জানালো, 'তার আকলে কোন ত্রুটি নেই।' চতুর্থবার যখন একই কথা হলো তখন তাঁর জন্য গর্ত খোঁড়া হলো এবং আদেশ মোতাবেক তাঁকে রজম করা হলো।[১]

পরবর্তী ঘটনা গামিদিয়ানাম্নী এক ছাহাবীয়ার। তিনি বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ আমাকে যিনার গোনাহ থেকে পাক করুন। কিন্তু তিনি তাঁকে ফিরিয়ে দিলেন। পরের দিন গামিদিয়া বললেন, 'ইয়া রাসূলাল্লাহ কেন আমাকে ফিরিয়ে দিচ্ছেন? সম্ভবত যে কারণে মাইযকে সেই কারণে! অথচ আল্লাহর কসম, আমি তো গর্ভবতী!'

[১] رواه مسلم في كتاب الحدود

রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, 'তাহলে যাও, প্রসব পর্যন্ত অপেক্ষা করো।'

প্রসবের পর কাপড়ে জড়ানো নবজাতককে উপস্থিত করে বললেন, এই যে আমি সন্তান প্রসব করেছি। (এবার তো আমাকে পাপের যন্ত্রণা থেকে উদ্ধার করুন!) তিনি বললেন, যাও, দুধ ছাড়ানো পর্যন্ত স্তন্য দান করো।

দুধ ছাড়ানোর পর তিনি বাচ্চা নিয়ে হাযির হলেন, যার হাতে ছিলো রুটির টুকরো। তিনি বললেন, 'ইয়া রাসূলাল্লাহ, এই যে তাকে দুধ ছাড়িয়েছি, এখন সে অন্য খাবারে অভ্যস্ত।' তখন তিনি বাচ্চাকে (প্রতিপালনের জন্য) জনৈক ছাহাবীর হাতে তুলে দিলেন। আর বুক পর্যন্ত গর্ত খোঁড়ার আদেশ দিলেন। তারপর লোকেরা তাঁর আদেশে তাঁকে রজম করলো।

হযরত খালেদ (রা) আগে বেড়ে মাথা লক্ষ্য করে একটি পাথর ছুঁড়লেন, আর তাঁর মুখে রক্তের ছিটা লাগলো। তিনি (বিরক্ত হয়ে) কটূক্তি করলেন। নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তা শুনে বললেন, থামো খালিদ, ঐ যাতের কসম, যার হাতে আমার জান, সে তো এমন তাওবা করেছে, যদি (খেয়ানতকারী) কোন রাজস্বকর্তা করতো, তাকেও মাফ করে দেয়া হতো। তারপর তাঁর আদেশে গামিদিয়ার জানাযা ও দাফন সম্পন্ন হলো।[১]

প্রবৃত্তি ও প্রলোভনের মুখে সংযম

এই ঈমানই ছিলো লোভ ও প্রলোভন এবং প্রবৃত্তির প্রবল প্ররোচনার মুখে তাঁদের আত্মসংযম, সততা, নৈতিক শুচিতা ও চারিত্রিক পবিত্রতা রক্ষার আসল রক্ষা-কবচ। একা নির্জনে লোকচক্ষুর আড়ালে, যেখানে কেউ দেখে না সেখানেও তাঁরা আল্লাহকে লজ্জা করতেন। এমনকি আপন প্রভাব-প্রতিপত্তির স্থানে, যেখানে কোন মানুষকে ভয় করার প্রশ্ন নেই সেখানেও তাঁরা আল্লাহকে ভয় করতেন। ইসলামের বিজয়াভিযানের দীর্ঘ ইতিহাসে ইখলাছ ও আমানতদারি এবং সংযম ও আত্মসম্বরণের এমন সব ঘটনা ঘটেছে যার নযির সমগ্র মানব-ইতিহাসে খুব কমই পাওয়া যাবে। এটা কিসের ফল! আল্লাহর প্রতি পরিপূর্ণ ঈমান ও আত্ম-সমর্পণ এবং সর্বত্র-সর্বক্ষণ 'আল্লাহ দেখছেন' এ বিশ্বাসেরই ফল।

তাবারী বলেন, মাদায়েন বিজিত হওয়ার পর মুসলিম বাহিনী যখন মালে গনীমত জমা করতে লাগলো তখন জনৈক মুজাহিদ নিজের হিস্সার গনীমত এনে

[১] رواه مسلم في كتاب الحدود হাদীছ নম্বর, ৩৩৮

তত্ত্বাবধায়কের কাছে সোপর্দ করলো। লোকেরা বললো, এত মূল্যবান গনীমত! এর সামনে তো আমাদেরগুলো কিছুই না!
তারা জিজ্ঞাসা করলো, তুমি কি কিছু রেখে দিয়েছো? তিনি বললেন, শোনো, আল্লাহর কসম, যদি আল্লাহর ভয় না হতো তাহলে তো আমি তোমাদের কাছে আসতামই না। তোমরা এর খবরই পেতে না।
তখন তাদের বুঝতে বাকি থাকলো না যে, ইনি সাধারণ কেউ নন, তারা তাঁর পরিচয় জিজ্ঞাসা করলে তিনি বললেন, না, আল্লাহর কসম, আমি পরিচয় প্রকাশ করবো না। কারণ, হয়ত তোমরা আমার প্রশংসা করবে, অথচ সকল প্রশংসা আল্লাহর! সুতরাং আমি আল্লাহর প্রশংসা করবো এবং তাঁর প্রতিদানে সন্তুষ্ট থাকবো। লোকেরা তাঁর পরিচয় উদ্ধারে তৎপর হলো। তখন জানা গেলো, তিনি আবদে কায়স গোত্রের আমের।

নির্ভয় ও নির্ভীকতা

এক আল্লাহর প্রতি ছাহাবা কেরামের এই যে অবিচল ঈমান ও বিশ্বাস এবং ইয়াকীন ও নির্ভরতা, এটা তাঁদের অন্তর থেকে মাখলূকের ভয়-ভীতি এবং শঙ্কা ও আশঙ্কা সম্পূর্ণরূপে মুছে দিয়েছিলো এবং পাথরের সামনে তাদের এতদিনের অবনত মস্তককে করে তুলেছিলো চিরউন্নত শির। তারপর কখনো তা কোন গায়রুল্লাহর সামনে আর নত হয়নি; হোক তা কোন প্রাকৃতিক শক্তি বা কোন পার্থিব শক্তি; হোক তা কোন রাজশক্তি, কিংবা কোন 'ধর্মশক্তি'। এমনকি ঈমানের নূরে নূরান্বিত ও বিশ্বাসের আলোয় দীপান্বিত তাদের হৃদয় সমকালীন বিশ্বের প্রতাপশালী কোন রাজার রাজকীয় আড়ম্বর ও জাঁকজমক দ্বারাও বিন্দুমাত্র প্রভাবিত হয়নি। কারণ তাঁদের অন্তর ছিলো আল্লাহর বড়ত্ব ও মহত্ত্বের অনুভব-অনুভূতিতে পরিপূর্ণ এবং তাদের দৃষ্টি ছিলো জান্নাতের অফুরন্ত নেয়ামত ও তার সাজ-সৌন্দর্যের প্রতি নিবদ্ধ। তাই দুনিয়ার জাঁকজমক, আড়ম্বর ও জৌলুস তাদের কাছে ছিলো একেবারেই তুচ্ছ ও মূল্যহীন। তাঁরা যখন কোন রাজ-দরবারে যেতেন এবং অকল্পনীয় ধনদৌলত ও শানশওকত এবং শক্তি ও দম্ভের আড়ম্বর অবলোকন করতেন তখন মনে হতো, তাঁরা প্রাণহীন কোন ছবি বা মূর্তির সামনে দাঁড়িয়ে আছেন, যাকে মানুষের পোশাকে সিংহাসনে সাজিয়ে রাখা হয়েছে।
হযরত আবু মূসা বলেন, আমরা নাজ্জাসীর কাছে গেলাম। তিনি তখন দরবার সাজিয়ে পূর্ণ জাঁকজমকে সিংহাসনে সমাসীন। (কোরায়শের দূত) আমর ইবনুল

আছ ও আম্মারাহ ছিলো তার ডানে ও বামে। আর (সভাসদ) ও ধর্মনেতাগণ ছিলেন দুই সারিতে উপবিষ্ট। আমর ও আম্মারা একফাঁকে বলে উঠলো, এরা তো বাদশাহকে সিজদা করে না। ধর্মনেতাগণ বললেন, 'বাদশাহকে সিজদা করো'।
জা'ফর বিন আবু তালিব সঙ্গে সঙ্গে বললেন, 'আমরা আল্লাহকে সিজদা করি, আল্লাহ ছাড়া অন্য কোন সত্তাকে সিজদা করি না।'[১]
কাদেসিয়া-যুদ্ধের পূর্বে হযরত সা'আদ (রা) আপন দূতরূপে রাব'ঈ বিন আমিরকে সেনাপতি রুস্তমের কাছে পাঠালেন। ইতিহাসের কিংবদন্তিতুল্য বীরপুরুষ রুস্তম ছিলেন পারস্যসম্রাটের প্রধান সেনাপতি। রাব'ঈ বিন আমির সেনাপতি রুস্তমের সাক্ষাতে উপস্থিত হলেন। তার দরবার অতি মূল্যবান গালিচা ও অন্যান্য উপকরণে এমন সজ্জিত ছিলো যে, যে কোন রাজপুরুষের চোখ ধাঁধিয়ে দেয়ার জন্য যথেষ্ট। স্বয়ং সেনাপতি রুস্তম মূল্যবান মণিমুক্তাখচিত পোশাক এবং ঝলমলে মুকুট পরিধান করে স্বর্ণাসনে উপবিষ্ট ছিলেন। রাব'ঈ বিন আমির দরবারে এসেছিলেন ছিন্ন, জীর্ণ ও সস্তা লেবাসে, সাধারণ ঢাল হাতে একটি খর্বাকৃতি ঘোড়ায় চড়ে। তিনি ঘোড়া নিয়ে মূল্যবান গালিচা মাড়িয়ে এগিয়ে গেলেন এবং নামলেন। তারপর কোন একটি তাকিয়ার সাথে ঘোড়াটি বেঁধে রুস্তমের দিকে অগ্রসর হলেন। হাতে অস্ত্র, দেহে বর্ম, মাথায় শিরোস্ত্রাণ, একেবারে পূর্ণ যুদ্ধসাজ! দরবারের লোকেরা বিরক্ত কণ্ঠে বললো, অন্তত যুদ্ধের পোশাক তো খুলে ফেলো! তিনি নির্লিপ্ত কণ্ঠে বললেন, দেখো, আমি নিজে আসিনি, তোমাদের ডাকে এসেছি। যদি তোমাদের পছন্দ হয়, ভালো; নচেৎ আমি ফিরে যাই। রুস্তম বললেন, 'আসতে দাও।' তিনি হাতের বর্শার উপর ভর দিয়ে অগ্রসর হলেন, আর বর্শার ফলায় পায়ের তলার গালিচা ছিদ্র হতে লাগলো। (সম্ভবত তাতে তাদের অন্তরের ভূমিও ছিদ্র হচ্ছিলো এবং সেটাই ছিলো হযরত রাব'ঈ বিন 'আমিরের এ আচরণের উদ্দেশ্য।)
তারা জানতে চাইলো, কী উদ্দেশ্যে তোমাদের আগমন?
তিনি বললেন–

الله ابتعثنا لنخرج من شاء من عبادة العباد إلى عبادة الله و من ضيق الدنيا إلى سعتها ومن جور الأديان إلى عدل الإسلام

---

[১] البداية والنهاية الجلد الثالث الصفحة السابعة والستون

'আল্লাহ আমাদের প্রেরণ করেছেন, যেন আমরা–যাকে তিনি ইচ্ছা করেন– বের করে আনি মানবের দাসত্ব থেকে এক আল্লাহর দাসত্বের দিকে এবং জাগতিক সঙ্কীর্ণতা থেকে পরকালীন প্রশস্ততার দিকে এবং সকল ধর্মের অনাচার থেকে ইসলামের সুবিচারের দিকে।'[১]

এধরনের চমকপ্রদ ঘটনায় ইতিহাসের পাতা তো ভরপুর, তবে উদাহরণের জন্য এতটুকুই যথেষ্ট।

বীরত্ব ও জীবনের তুচ্ছতাবোধ

আখেরাতের প্রতি ঈমান ও ইয়াকীন এবং বিশ্বাস ও প্রত্যয় তাঁদের অন্তরে এমন সাহস. বীরত্ব ও নির্ভীকতা এবং আখেরাত ও জান্নাতের প্রতি এমন প্রেম, অনুরাগ ও আকুতি এবং জীবনের প্রতি এমন নির্মোহতা, বিতৃষ্ণা ও তুচ্ছতাবোধ সৃষ্টি করেছিলো, এককথায় যা ছিলো নযিরবিহীন। আখেরাতের ভাবনা ও জান্নাতের কল্পনা তাঁদের সামনে এমন মূর্তরূপ ধারণ করতো যেন তাঁরা চোখে দেখছেন এবং এমনভাবে সেদিকে ধাবিত হতেন যেন পাখী ডানা মেলে উড়ে যায় সন্ধ্যা-নীড়ের দিকে।

ওহুদের যুদ্ধে যখন আকস্মিক বিপর্যয় নেমে এলো এবং মুসলিম বাহিনী ছত্রভঙ্গ হয়ে গেলো, হযরত আনাস বিন নযর তখন দুশমনের দিকে এগিয়ে গেলেন, আর হযরত সা'আদকে দেখতে পেয়ে বলে উঠলেন–

يا سعد بن معاذ، الجنة ورب الكعبة، إني أجد ريحها من دون أحد

'হে সা'আদ বিন মু'আয! জান্নাতে চলো, রাব্বুল কা'বার কসম, আমি তো ওহুদের পিছনে জান্নাতের খোশবু পেয়েছি।'

সেই খোশবু পেয়ে শাহাদাতের সিঁড়ি বেয়ে তিনি পৌঁছে গেলেন জান্নাতে। হযরত আনাস বিন মালিক বলেন, যুদ্ধের পর আমরা তার দেহে আশিটির বেশি তীর-তলোয়ার ও বর্শা-বল্লমের যখম পেয়েছি। মুশরিকরা তার দেহ এমন বিকৃত করেছিলো যে, শুধু তাঁর বোন আঙ্গুলের নিশান দ্বারা তাঁকে সনাক্ত করেছেন।[২]
বদরযুদ্ধের দিন রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন–

[১] আল-বিদায়া ওয়ান-নিহায়া, খ. ৭. পৃ. ৪০
[২] বুখারী, কিতাবুল জিহাদ ওয়াস-সিয়ার, হাদীছ নম্বর ২৫৯৫ এবং কিতাবুল মাগাযী, হাদীছ নম্বর ৩৭৪২

قوموا إلى جنة عرضها السموات والأرض

'এগিয়ে যাও জান্নাতের দিকে, যার প্রশস্ততা আসমান-যমিনের মত।'

ওমায়র ইবনুল হাম্মাম আলআনছারী আরয করলেন, 'ইয়া রাসূলাল্লাহ, আসমান-যমিনের প্রশস্ততার মত জান্নাত!' তিনি বললেন, 'হাঁ।' আনন্দের আতিশয্যে ওমায়র তখন 'বাখ্ বাখ্' বলে উঠলেন। রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জিজ্ঞাসা করলেন, বাখ্ বাখ্ বলছো কেন? তিনি বললেন, আর কিছু নয় ইয়া রাসূলাল্লাহ, শুধু এ আশায় যে, আমি আহলে জান্নাতের কাতারে শামিল হবো।
আল্লাহর নবী বললেন, তুমি তো আহলে জান্নাতের একজন!
ওমায়র থলি থেকে কয়েকটি খেজুর বের করে খেতে লাগলেন। কিন্তু একদু'টো কামড় দিয়েই বলে উঠলেন, খেজুর খাওয়া পর্যন্ত যদি বেঁচে থাকতে হয় তাহলে তো যিন্দেগি অনেক লম্বা হয়ে যাবে! তিনি খেজুরগুলো ছুঁড়ে দুশমনের উপর ঝাঁপিয়ে পড়লেন এবং লড়তে লড়তে শহীদ হয়ে গেলেন।[১]

আবু বকর বিন আবু মূসা আল-আশ'আরী রহ. বলেন, আব্বাকে আমি দুশমনের মুখোমুখি অবস্থায় বলতে শুনেছি; 'রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, জান্নাত তো তরবারির ছায়াতলে!'
তখন অতি জীর্ণদশার একলোক দাঁড়িয়ে বললো, হে আবু মূসা! আপনি নিজে তাঁকে তা বলতে শুনেছেন? তিনি বললেন, হাঁ। তখন সে তার সাথীদের কাছে ফিরে গিয়ে বললো, 'আমি তোমাদের (বিদায়) সালাম জানাচ্ছি।' তারপর সে খাপ ছিঁড়ে তলোয়ার বের করলো এবং শত্রুর উদ্দেশ্যে ছুটে গেলো, আর শহীদ হওয়া পর্যন্ত তলোয়ার চালিয়ে গেলো।[২]

হযরত আমর ইবনুল জামূহ (রা) মারাত্মক রকমের পঙ্গু ছিলেন। তাঁর চার যুবক পুত্র ছিলো, যারা রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সঙ্গে গাযওয়ায়

[১] মুসলিম, আনাস বিন মালিক, কিতাবুল ইমারাহ, হাদীছ নম্বর, ৩৫২০
[২] মুসলিম, আনাস বিন মালিক রা. হতে, কিতাবুল ইমারাহ, হাদীছ নম্বর, ৩৫২১, তিরমিযি, কিতাবু ফাযাইলিল জিহাদ, হাদীছ নম্বর, ১৫৮৩, ইমাম আহমদ, মুসনাদুল কুফিয়্যীন, হাদীছ নম্বর, ১৮৭১৭ ও ১৮৮৪৯
(হায়, আমাদের কপালে কি আছে শুধু কলমের কালিতে সেই শহীদানের খুনের কাহিনী লিখে যাওয়া! –অনুবাদক)

শরীক হতো। আল্লাহর নবী যখন ওহুদের গাযওয়ায় রওয়ানা হলেন তখন আমর ইবনুল জামূহ (রা) তাঁর সঙ্গে শরীক হতে মনস্থ করলেন। পুত্ররা বাধা দিয়ে বললো, আল্লাহ তো (ওযরের কারণে) আপনার জন্য 'রোখছত' রেখেছেন। সুতরাং আপনার ঘরে থাকাই ভালো, আমরাই আপনার পক্ষ হতে যথেষ্ট।

হযরত আমর ইবনুল জামূহ (রা) দরবারে রিসালাতে হাযির হয়ে আরয করলেন, 'ইয়া রাসূলাল্লাহ! এই পুত্ররা আমাকে আপনার সঙ্গে বের হতে বাধা দিচ্ছে। অথচ আল্লাহর কসম, আমি আশা করি, শহীদ হয়ে এই পঙ্গু পা নিয়ে জান্নাতে বিচরণ করবো।'

রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, দেখো, আল্লাহ তো তোমার উপর থেকে জিহাদের আবশ্যকতা রহিত করেছেন। তারপর পুত্রদের বললেন, তোমরা তাকে বাধা না দিলে ক্ষতি কী! হয়ত আল্লাহ তাকে শাহাদাত নছীব করবেন!

তিনি রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সঙ্গে বের হলেন এবং ওহুদের ময়দানে– যেমন তিনি আকাঙ্ক্ষা করেছিলেন–শহীদ হলেন।[১]

শাদ্দাদ ইবনুল হাদ বলেন, জনৈক বেদুঈন নবীজীর খেদমতে হাযির হলেন, ঈমান আনলেন এবং তাঁর অনুগামী হলেন, আর বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ, আমি আপনার সঙ্গে হিজরত করবো। তিনি এক ছাহাবীকে তার প্রতি খেয়াল রাখার দায়িত্ব দিলেন। খায়বারের গাযওয়ার পর গনীমত বণ্টনকালে রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ঐ বেদুঈনের জন্যও হিস্সা নির্ধারণ করলেন এবং তা ছাহাবাদের হাওয়ালা করলেন। সে সবার পশু চরাতো। (সন্ধ্যায়) সে ফিরে আসার পর ছাহাবা কেরাম তাকে মালে গনীমত দিলেন। সে তো অবাক, 'এটা কী?!' তাঁরা বললেন, 'এটা গনীমতের হিস্সা, যা আল্লাহর রাসূল তোমার জন্য নির্ধারণ করেছেন।'

সে মালে গনীমতসহ নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খেদমতে হাযির হয়ে আরয করলো, 'ইয়া রাসূলাল্লাহ এটা কী?' তিনি বললেন, মালে গনীমতের হিস্সা, তোমার জন্য নির্ধারণ করেছি। সে আরয করলো, আমি তো এজন্য আপনার অনুগমন করিনি, বরং করেছি এজন্য যে, এখানে – কণ্ঠনালীর দিকে ইশারা করে– একটি তীর এসে লাগবে, আর আমি শহীদ হয়ে জান্নাতে দাখেল হবো!

[১] যাদুল মা'আদ, খ. ৩ পৃ. ১৩৫

নবীজী বললেন, 'তুমি যদি আল্লাহর সঙ্গে সত্য বলে থাকো তাহলে তিনি তোমার কথা সত্য করে দেখাবেন।' তারপর ছাহাবা কেরাম দুশমনের বিরুদ্ধে লড়াই করলেন, আর বেদুঈনকে নিহত অবস্থায় নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সামনে হাযির করা হলো। তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, এ কি সে? তাঁরা বললেন, জ্বি। তিনি বললেন, সে আল্লাহর সঙ্গে সত্য বলেছে, তিনিও তার কথা সত্য করে দিয়েছেন।[১]

আমিত্বের অহং থেকে দাসত্বের দীনতার দিকে

ঈমান ও ইসলাম গ্রহণের পূর্বে এ লোকগুলোই গলিয-গান্দা ও অশ্লীল-উশৃঙ্খল জীবন যাপন করতো। কর্মে, চরিত্রে, আচরণে, লেনদেনে এবং সমাজের শাসনে, সবকিছুতেই তাদের মধ্যে ছিলো শুধু নৈরাজ্য আর নৈরাজ্য। আপন-পর কোন শক্তির কাছে তারা মাথা নোয়াতো না এবং কোন শাসনব্যবস্থা ও জীবনবিধানের প্রতি তাদের আনুগত্য ছিলো না; আনুগত্য ছিলো শুধু খাহেশাত ও প্রবৃত্তির। যখন যা ইচ্ছা তাই করতো; স্বেচ্ছাচার ও ভ্রষ্টাচারই ছিলো তাদের ধর্ম। এককথায় জাহেলিয়াতের যত রকম অন্ধকার যত বীভৎসরূপে কল্পনা করা যায় তাতে তারা ছিলো নিমজ্জিত।

এমন মানুষ যারা তাদের জীবনে হঠাৎ করে যেন এক বিপ্লব সাধিত হলো। ঈমান ও বন্দেগির বৃত্তে তাঁরা এমনভাবে প্রবেশ করলেন, যেন কখনো এ বৃত্তের বাইরে ছিলেনই না এবং এর বাইরে যাওয়া তাঁদের পক্ষে কল্পনা করাও সম্ভব হবে না। আল্লাহ তা'আলার সার্বভৌম রাজত্ব ও নিরঙ্কুশ ক্ষমতা এবং একক শাসন ও নিয়ন্ত্রণ তাঁরা স্বতঃস্ফূর্তভাবে স্বীকার করে নিয়েছিলেন এবং তাঁর পরিপূর্ণ দাসত্ব ও নিঃশর্ত আনুগত্য গ্রহণ করে নিয়েছিলেন। আত্মশাসন ও আত্মকর্তৃত্ব সম্পূর্ণ বিলুপ্ত করে আল্লাহর ইচ্ছা ও আদেশের কাছে তাঁরা এমন আত্মসমর্পণ করেছিলেন এবং আত্মইচ্ছা ও আত্মচাহিদা এমন বিসর্জন দিয়েছিলেন যে, আল্লাহর ইচ্ছাই ছিলো তাঁদের ইচ্ছা এবং শরীয়তের আহকাম ও বিধানই ছিলো তাঁদের পছন্দ। এতদিনের আত্মদাসত্বের পর এখন তাঁদের বিশ্বাস ছিলো এই যে, তাঁদের জানমালের মালিক তাঁরা নন, আল্লাহ! তাঁদের জীবন এবং জীবনের কোন পদক্ষেপের অধিকার আর তাঁদের নিজেদের নয়, একমাত্র আল্লাহর। কারো সাথে তাঁরা যুদ্ধ বা সন্ধি করেন না আল্লাহর আদেশ

[১] যাদুল মা'আদ, খ. ৩ পৃ. ১৯০

ছাড়া। কারো প্রতি তাঁরা সন্তুষ্ট বা অসন্তুষ্ট হন না এবং কারো সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপন বা কর্তন করেন না আল্লাহর অনুমতি ছাড়া। তাঁরা দান বা বাধা দান করেন না এবং হাঁ বা না বলেন না আল্লাহর অনুমোদন ছাড়া। এককথায় তাঁদের জীবনের শুরু থেকে শেষ, ক্ষুদ্র থেকে বৃহৎ সবকিছু আল্লাহর জন্য, অন্য কারো জন্য নয়।

যে ভাষায় আল্লাহর কিতাব নাযিল হয়েছিলো এবং যে ভাষায় আল্লাহর রাসূল কালাম করতেন তা তাঁরা উত্তমরূপে জানতেন। জাহেলিয়াতের পূর্ণ পরিচয় তাঁদের জানা ছিলো, কারণ জাহেলিয়াতের পরিমণ্ডলেই তো ছিলো তাঁদের প্রতিপালন! তারপর পরিচিত জাহেলিয়াতকে বর্জন করে নতুন যে ইসলাম তাঁরা গ্রহণ করেছিলেন তার হাকীকত ও মর্ম সম্পর্কেও তারা পরিপূর্ণ জ্ঞান ও অনুভব অর্জন করেছিলেন। সুতরাং যথার্থরূপেই তাঁদের এ উপলব্ধি ছিলো যে, ঈমান অর্থ একটি জীবন থেকে অন্য একটি জীবনে এবং একটি জগত থেকে ভিন্ন একটি জগতে পরিপূর্ণরূপে প্রবেশ করা, অর্থাৎ বিশৃঙ্খলা থেকে শৃঙ্খলা, যুদ্ধ থেকে সন্ধি, বিদ্রোহ থেকে আত্মসমর্পণ এবং আমিত্ব থেকে পরিপূর্ণ দাসত্বে উত্তরণ।

ঈমান ও ইসলামের গণ্ডিতে প্রবেশ করার পর নিজস্ব মত প্রয়োগের এবং ঐশী বিধান লঙ্ঘনের যেমন কোন অধিকার থাকে না, তেমনি অধিকার থাকে না আল্লাহর রাসূলের কোন সিদ্ধান্তে দ্বিধা প্রকাশের এবং অন্য কোন বিচারকের দ্বারস্থ হওয়ার। এমনকি শরীয়তবহির্ভূত কোন আচার-প্রথা ও সংস্কার-সংস্কৃতি অনুসরণেরও থাকে না কোন অবকাশ। এগুলো তাঁরা পূর্ণরূপে উপলব্ধি ও বিশ্বাস করতেন। তাই যখন তাঁরা ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন তখন জাহেলিয়াতের সমস্ত স্বভাব, বৈশিষ্ট্য, রীতি-নীতি ও সংস্কার-সংস্কৃতি পরিত্যাগ করে ইসলামের সকল স্বভাব, বৈশিষ্ট্য ও সমগ্র বিধি-বিধানকেই তাঁরা গ্রহণ করেছিলেন। জাহেলিয়াতের কোন কিছু তাঁরা বাকি রাখেননি এবং ইসলামের কোন কিছু বাদ রাখেননি। আর এ জীবনবিপ্লব তাঁদের মধ্যে ঘটে যেতো ইসলাম গ্রহণ করার পরই, কোন বিলম্ব ছাড়াই।

ফোযালাহ বিন ওমায়র রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে হত্যা করতে উদ্যত হলো। তিনি তখন বাইতুল্লাহ তাওয়াফ করছেন। ফোযালাহ যখন নিকটবর্তী হলো তখন তিনি বললেন, কে? ফোযালাহ! সে বললো, হাঁ, ইয়া রাসূলাল্লাহ! তিনি বললেন, মনে মনে কী মতলব আঁটছো? সে বললো, কিছু না, আল্লাহর যিকির করছি। তখন তিনি হেসে দিয়ে বললেন, ইস্‌তিগফার করো।

তারপর তিনি আপন পবিত্র হাত তার বুকে স্থাপন করলেন। তখন তার কলব শান্ত ও স্থির হয়ে গেলো।

পরে হযরত ফোযালাহ বলতেন, আল্লাহর কসম, তিনি আমার বুক থেকে তাঁর হাত সরানোর আগেই মনের অবস্থা এমন হলো যে, আল্লাহ আমার কাছে তাঁর চেয়ে প্রিয় কোন মানুষ সৃষ্টি করেননি।

ফোযালাহ আরো বলেন, আমি স্বগোত্রে ফিরে গেলাম; পথে ঐ নারীর দেখা পেলাম যার সঙ্গে আমার 'আলাপ' ছিলো। সে বললো, এসো না আলাপ করি! আমি বললাম, না; কারণ 'আল্লাহ এবং ইসলাম এটা প্রত্যাখ্যান করে।'[১]

ঐশ্বরিক জ্ঞানের চিরন্তনতা

যুগে যুগে নবী-রাসূলগণ মানুষকে আল্লাহর যাত ও সত্তা, গুণ ও ছিফাত এবং শান ও কর্ম সম্পর্কে নির্ভুল ও নিশ্চিত জ্ঞান দান করেছেন। বিশ্বজগতের সূচনা ও পরিণতি, মানবজীবনের ব্যাপ্তি ও মৃত্যু এবং মৃত্যুপরবর্তী অনন্ত জীবন সম্পর্কে যাবতীয় জ্ঞান তাঁদেরই মাধ্যমে মানুষের কাছে এসেছে। এ জ্ঞান ও অন্তর্জ্ঞান অর্জনের জন্য মানুষকে সাধনা, অধ্যয়ন ও চিন্তা-গবেষণার কোন কষ্ট স্বীকার করতে হয়নি, শুধু শ্রবণ ও বিশ্বাস গ্রহণ করতে হয়েছে। নবী-রাসূলগণের মাধ্যম ছাড়া এ মহাজ্ঞান অর্জন করা মানুষের পক্ষে সম্ভবও ছিলো না। কেননা জ্ঞান অর্জনের অর্থ কতিপয় স্বতঃসিদ্ধ নীতি ও মূলনীতির উপর ভিত্তি করে জানা থেকে অজানায় উপনীত হওয়া। অথচ 'ইলাহতত্ত্ব' বা আল্লাহসম্পর্কিত জ্ঞান হচ্ছে মানুষের ইন্দ্রিয় শক্তি ও দৃশ্য প্রকৃতির সীমানার ঊর্ধ্বে। মানুষের বিচার-বুদ্ধি ও চিন্তাশক্তি ঐ জ্ঞানের প্রান্তটুকুও স্পর্শ করতে পারে না। সুতরাং ঐ জ্ঞান অর্জনের একমাত্র উপায় হলো নবুওয়াতের পথপ্রদর্শন। তো নবী-রাসূলগণ আল্লাহর আদেশে সেই মহান দায়িত্বই পালন করেছেন পরম নিষ্ঠার সঙ্গে। মানুষকে তাঁরা অতিপ্রাকৃত জ্ঞান অন্বেষণের নিষ্ফল ও ভ্রান্তিকর প্রয়াসে লিপ্ত হওয়া থেকে দূরে রেখেছেন এবং মানুষের সময়, মেধা ও চিন্তাকে অপচয় ও অপব্যবহারের হাত থেকে রক্ষা করেছেন। কারণ যেখানে ইন্দ্রিয় শক্তি কাজ করে না, চিন্তাশক্তি পথ খুঁজে পায় না এবং স্বতঃসিদ্ধ প্রাথমিক জ্ঞান সাহায্য করে না সেখানে অহির আলো ছাড়া সত্যলাভের আর কোন মাধ্যম থাকে না। কিন্তু মানুষ নবী ও নবুওয়তের মাধ্যমে 'সহজলব্ধ' এত বড় নেয়ামত কৃতজ্ঞচিত্তে গ্রহণ করলো না,

---

[১] যাদুল মা'আদ, খ. ২ পৃ. ৩৩২

বরং নিজের অতি সীমাবদ্ধ জ্ঞান-বুদ্ধি ও চিন্তাশক্তির সাহায্যে নিজস্ব অন্বেষণে প্রবৃত্ত হলো। এভাবে সে এমন এক অজানা অঞ্চলের উদ্দেশ্যে যাত্রা শুরু করলো যেখানে না আছে পথ, না আছে পথপ্রদর্শক। ফলে তাদের পরিণতি হলো সেই অভিযাত্রীর চেয়ে শোচনীয় যার অহঙ্কার হলো, সবকিছু সে নিজের বুদ্ধিতে করবে। মানুষের যুগ যুগের সাধনা ও চিন্তা-গবেষণা দ্বারা অর্জিত ভৌগোলিক জ্ঞান এবং তিলে তিলে সঞ্চিত অভিজ্ঞতা দ্বারা অঙ্কিত মানচিত্রের সাহায্য সে নেবে না, বরং পাহাড়ের উচ্চতা ও সাগরের গভীরতা সে নতুনভাবে পরিমাপ করবে এবং মরুভূমির সীমানা ও পথের দূরত্ব নিজেই নির্ধারণ করবে, অথচ জীবন সংক্ষিপ্ত, সাধ্য সীমিত এবং উপায়-উপকরণ অপর্যাপ্ত। অনেক দৌড়ঝাঁপ করে নতুন কিছু পরিমাপ ও পরিসংখ্যান অবশ্য সে প্রস্তুত করলো, কিন্তু তাতে যেমন ছিলো অসংখ্য ভুলভ্রান্তি তেমনি ছিলো সংশয়-অনিশ্চিতি। ফল তাই হলো যা হওয়া অবধারিত ছিলো। অহঙ্কারী অভিযাত্রী কিছু দূর গিয়ে পথ হারালো, পাথেয় খোয়ালো এবং তার সাহস ও মনোবল ভেঙ্গে পড়লো। পথের শেষ প্রান্তে উপনীত হওয়া দূরের কথা, যাত্রা শুরুর স্থানেও নিরাপদে ফিরে আসা আর সম্ভব হলো না।

তো পথ ও পাথেয় এবং দিক ও দিকনির্দেশ ছাড়া ইলাহতত্ত্বের সীমাহীন মরুভূমি যারা পাড়ি দেয়ার দুঃসাহস করলো তারা অনিবার্য বিপর্যয়ের শিকার হলো এবং সত্যের আলো ও আলোকরেখা থেকে বঞ্চিত হলো। হাতড়ে পেলো শুধু অপরিণত ও অসম্পূর্ণ কিছু ধ্যান-ধারণা, অস্পষ্ট ও অস্বচ্ছ কিছু চিন্তা-ভাবনা এবং অমূলক ও ত্বরিত কিছু সিদ্ধান্ত। ফলে তারা নিজেরাও পথ হারালো, অন্যদেরও পথভ্রষ্ট করলো।

কত দুর্ভাগা মানুষ এরা! অহির মাধ্যমে প্রাপ্ত জ্ঞানের আলোকে আম্বিয়া কেরাম তাদের সামনে তুলে ধরলেন এমন সুস্থির ও সুস্থিত কিছু তত্ত্ব ও সত্য যা হতে পারে সর্বযুগে সর্বদেশে আদর্শ জীবন ও আলোকিত সভ্যতার ভিত্তিমূল। কিন্তু যুগের বিবর্তনে নিজেরাই তারা নিজেদের তা থেকে বঞ্চিত করলো। তারপর কোন গভীর খাদের পাশে, আন্দায-অনুমানের দুর্বল ভিত্তির উপর তারা গড়ে তুললো জীবন ও সভ্যতার আপাত জাঁকজমকপূর্ণ এক ইমারত। কিন্তু দেখতে না দেখতে সভ্যতার ভিত্তিমূল নড়ে উঠলো, জীবনের বিশাল সৌধ পড়ো পড়ো হলো এবং একসময় ছাদসহ তা ধ্বসে পড়লো।

পক্ষান্তরে ছাহাবা কেরাম ছিলেন গায়ব থেকে তাওফীকপ্রাপ্ত অতি সৌভাগ্যবান

এক সম্প্রদায়। আল্লাহ, আখেরাত, হাশর-নাশর, জান্নাত-জাহান্নাম ইত্যাদি যাবতীয় বিষয়ে আল্লাহর রাসূলের প্রতিটি 'সংবাদ' পরম নির্ভরতার সঙ্গে তারা বিশ্বাস করলেন। কারণ তারা জানতেন, তিনি ছাদিক, আমীন– চিরসত্যবাদী, চিরবিশ্বস্ত! তাঁর জীবনে কখনো ঘটেনি মিথ্যার সামান্য ছায়াপাত। তিনি যা বলেন, 'উর্ধ্বজগত' থেকে অবগত হয়ে বলেন। সুতরাং এটা বুদ্ধি ও যুক্তি প্রয়োগের ক্ষেত্র নয়, বিশ্বাস ও আত্মসমর্পণের ক্ষেত্র। তারা ঈমান আনলেন এবং বিশ্বাস স্থাপন করলেন। অর্থাৎ বীজ ও মাঠের কষ্ট-ক্লেশের পরিবর্তে তারা শুধু ফল ও ফসলের প্রতি মনোযোগ নিবদ্ধ করলেন। নিজেদের সময়, মেধা ও শক্তির অপচয় ও অপব্যবহার না করে সেগুলো তারা নিয়োজিত করলেন দ্বীন ও দুনিয়ার ফলদায়ক ও কল্যাণপ্রসূ কাজে। দ্বীনের মযবূত রজ্জুকে তাঁরা আঁকড়ে ধরলেন এবং খোসার পরিবর্তে সারবস্তু গ্রহণ করলেন। এভাবে দুর্গম পথ অক্লেশে পাড়ি দিয়ে তারা মনযিলে পৌঁছে গেলেন।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

নববী তারবিয়াতে আদর্শ ইসলামী সমাজ

যেন মানব-ফুলের তোড়া

আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের প্রতি ঈমান ও বিশ্বাস এবং আখেরাত ও তার পূর্ণ তাফসীলের প্রতি ইয়াকীন ও প্রত্যয়, সর্বোপরি দ্বীন ও শরীয়াতের প্রতি পরিপূর্ণ আনুগত্য ও আত্মসমর্পণের ভিত্তিমূলের উপর এমন একটি আদর্শসমাজ গড়ে উঠলো যেখানে অন্যায় ও অসুন্দর এবং অসত্য ও অস্বচ্ছ কোন কিছুর অস্তিত্ব ছিলো না। জীবনের সকল বক্রতা ও জটিলতা, অসমতা ও অমসৃণতা এবং মলিনতা ও আবিলতা সম্পূর্ণরূপে অপসৃত হয়েছিলো। সমাজের প্রতিটি মানুষ এবং আদমের প্রত্যেক সন্তান সেখানে সঠিক অবস্থা ও অবস্থান লাভ করেছিলো। কারো সম্মানহানি যেমন ঘটেনি, তেমনি ঘটেনি কারো অতিমর্যাদাপ্রাপ্তি। যেমন ছিলো মানবসাম্যের অপূর্ব প্রকাশ তেমনি ছিলো নিজস্ব গুণ ও বৈশিষ্ট্যের স্বাভাবিক স্বীকৃতি। গোটা সমাজ যেন কণ্টকমুক্ত ও সুবিন্যস্ত একটি পুষ্পস্তবক, প্রতিটি ফুল ও প্রতিটি পাপড়ি যেখানে শোভাবর্ধক ও দৃষ্টিনন্দন। সমগ্র জনবসতি সেখানে ছিলো অভিন্ন এক পরিবার। সবাই এক আদমের সন্তান, আর আদম হলেন 'মাটির সন্তান'। আরবের সেখানে শ্রেষ্ঠত্ব ছিলো না আজমের উপর এবং আজমের ছিলো না প্রাধান্য আরবের উপর, তবে তাকওয়ার মানদণ্ডে। অর্থাৎ যিনি যত মুত্তাকী তিনি তত মর্যাদাবান এবং তত বিনয়ী। আল্লাহকে যিনি যত ভয় করেন, মানুষ তাকে তত শ্রদ্ধা করে, আর মানুষকে তিনি তত ভালোবাসেন। শ্রেষ্ঠত্বের জাহেলী সংস্কারের মূলে কুঠারাঘাত করে আল্লাহর নবী প্রথমেই ঘোষণা করেছিলেন—

كلكم بنو آدم، وآدم خلق من تراب، ولينتهين قوم يفخرون بآبائهم أو ليكونن أهون على الله تعالى من الجعلان

তোমরা সবাই আদমের সন্তান, আর আদমকে সৃষ্টি করা হয়েছে মাটি থেকে। যারা পূর্বপুরুষের কৌলীন্যে গর্ব করে তারা যেন নিবৃত্ত হয়, নতুবা আল্লাহর কাছে তারা হয়ে যাবে গুবরে পোকার চেয়ে হীন।[১]

মানুষ তাঁর পবিত্র মুখে আরো শুনতে পেলো আরব-চিন্তাচেতনায় মহাবিপ্লব সৃষ্টি-কারী এ মহান বাণী–

يا أيها الناس! إن الله قد أذهب عنكم عبية الجاهلية وتعظمها بآبائها، فالناس رجلان، رجل بر تقي كريم على الله، ورجل فاجر شقي هين على الله

হে লোকসকল! আল্লাহ তোমাদের থেকে দূর করে দিয়েছেন জাহেলিয়াতের নীচতা এবং বংশ-গর্বের কুপ্রথা। মানুষের শ্রেণী এখন শুধু দু'টি; নেক ও মুত্তাকী, যারা আল্লাহর কাছে মর্যাদাবান এবং মন্দ ও দুর্ভাগা, যারা আল্লাহর কাছে মর্যাদাহীন।[২]

হযরত আবু যর (রা) হতে বর্ণিত, নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একদিন তাঁকে বললেন,

انظر، فإنك ليس بخير من أحمر ولا أسود، إلا أن تفضله بتقوى الله

'দেখো, তুমি কিন্তু সাদা ও কালো, কারো চেয়ে উত্তম নও এবং নও অভিজাত, তবে আল্লাহর ভয় ও তাকওয়া দ্বারা যদি কারো চেয়ে অগ্রগামী হতে পারো।'[৩]

রাতের শেষ প্রহরে যখন তিনি আপন প্রতিপালকের সান্নিধ্যে মুনাজাতে মগ্ন হতেন তখন আর সবকিছুর মধ্যে একথাও নিবেদন করতেন–

وأنا شهيد أن العباد كلهم إخوة

'আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, তোমার বান্দারা সকলে ভাই ভাই।'[৪]

জাহেলিয়াতের শেষ শিকড়টি পর্যন্ত তিনি উপড়ে ফেলেছিলেন এবং ইসলামী সমাজে তার অনুপ্রবেশের সকল ছিদ্রপথ বন্ধ করে দিয়েছিলেন এই উদাত্ত ঘোষণার মাধ্যমে–

---

[১] তাফসীরে ইবনে কাছীর, সূরাতুল হুজুরাত

[২] তিরমিযি, হযরত আবু হোরায়রা রা. হতে, কিতাবু তাফসীরিল কোরআন, হাদীছ নম্বর ৩১৯৩

[৩] মুসনাদের আহমাদ, (মুসনাদুল আনছার) হাদীছ নম্বর, ২০৪৩৮

[৪] رواه أبو داود عن زيد بن أرقم رضي الله عنه في كتاب الصلاة হাদীছ নম্বর, ১২৮৯

ليس منا من دعا إلى عصبية، وليس منا من قاتل على عصبية، وليس منا من مات على عصبية

'সম্প্রদায়প্রীতির ডাক দেবে যে, সে আমাদের দলভুক্ত নয় এবং সাম্প্রদায়িকতার উপর লড়াই করবে যে সেও আমাদের দলভুক্ত নয় এবং আমাদের দলভুক্ত নয়, যে সাম্প্রদায়িকতার উপর মারা যাবে।'[১]

হযরত জাবির বিন আব্দুল্লাহ (রা) বলেন, আমরা কোন এক যুদ্ধে ছিলাম, হঠাৎ এক মুহাজির এক আনছারীকে কিছু একটা বলে বসলেন, আর আনছারী চিৎকার দিলেন, ইয়া লালআনছার! (কোথায় আনছারীদল), মুহাজিরও চিৎকার করে উঠলেন, ইয়া লালমুহাজিরীন!
এ ডাক-চিৎকার শুনে আল্লাহর নবী বললেন–

دعوها، فإنها منتنة

'সাম্প্রদায়িকতার শ্লোগান বর্জন করো, এ তো শুধু দুর্গন্ধ!'[২]

ন্যায়-অন্যায় নির্বিশেষে আপন গোত্র-গোষ্ঠী ও বেরাদারির পক্ষাবলম্বন করা ছিলো জাহেলিয়াতের যুগযুগের সংস্কার। এটা ছিলো জাহেলিয়াতের হামিয়্যাত বা অন্ধগোত্রপ্রীতি। বস্তুত জাহেলিয়াতের সমগ্র জীবনের আবর্তন ছিলো এই একটি নীতির উপর, 'যালিম হোক বা মযলূম, সাহায্য করো তোমার ভাইকে।' আল্লাহর নবী এখানেও আঘাত হানলেন এবং একমাত্র ন্যায় ও সত্যকে পক্ষ গ্রহণের মাপকাঠি ঘোষণা করলেন। তিনি বললেন–

من نصر قومه على غير الحق فهو كالبعير الذي ردي فهو ينزع بذنبه

'যারা অন্যায়ের উপর আপন কাউমের পক্ষাবলম্বন করবে তাদের উদাহরণ হলো সেই উট যা কুয়ার ভিতরে ঝাঁপ দিতে চায়, আর তার লেজ ধরে তাকে ধরে রাখার চেষ্টা করা হয়।' (অর্থাৎ লেজ টেনে যেমন পতন থেকে রক্ষা করা সম্ভব নয় তেমনি ঐ ব্যক্তির ধ্বংস অনিবার্য।)[৩]

---

[১] رواه أبو داود عن جبير بن مطعم في كتاب الأدب হাদীছ নম্বর, ৪৪৫৬

[২] ورواه مسلم في كتاب البر والصلة হাদীছ নম্বর, ৫৪২৫ এবং ৪৫২৭ رواه البخاري في كتاب تفسير القرآن ورواه أحمد في مسنده হাদীছ নম্বর, ৩২৩৭ ورواه الترمذي في كتاب تفسير القرآن হাদীছ নম্বর, ৪৬৮২ والأداب (في باقي مسند المكثرين) হাদীছ নম্বর, ১৪১০৫ এবং ১৪৫৯৭ এবং ১৪৬৮৮

[৩] تفسير ابن كثير، ورواه أحمد بسنده بمعناه عن شعبة (في مسند المكثرين من الصحابة) হাদীছ নম্বর, ৩৫৪০

এই নববী দীক্ষা ও তারবিয়াতের ফলে আরবদের স্বভাব ও মানসিকতার এমনই মৌলিক পরিবর্তন ঘটেছিলো যে, এখন তাদের রুচি ও বোধ ঐ জাহেলী শ্লোগান কোনভাবেই গ্রহণ করতে প্রস্তুত ছিলো না। এমনকি কোন একপ্রসঙ্গে নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন বললেন–

انصر أخـــاك ظالمـــا أو مظلومـــا

'তোমার ভাইকে সাহায্য করো, হোক সে যালিম বা মযলূম',

ছাহাবা কেরাম তখন হয়রান হয়ে বলে উঠলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! মযলূমকে তো সাহায্য করবো, কিন্তু যালিমের সাহায্য? তখন তিনি বুঝিয়ে বললেন–

تمنـــعه من الظلم، فذلك نصرك إيـــاه

তাকে যুলুম থেকে বিরত রাখবে, এটাই হবে তাকে সাহায্য করা।[১]

এভাবে মদীনার ইসলামী সমাজ এমন এক শান্তিসমাজরূপে আত্মপ্রকাশ করলো, যেখানে সকল শ্রেণী মিলে-মিশে দুধ-চিনির মত একাকার। যেখানে আছে শুধু সহমর্মিতা ও কল্যাণকামিতা; নেই কারো প্রতি কারো সীমালঙ্ঘন ও বিদ্বেষ-আচরণ। পুরুষ সেখানে নারীর পরিচালক এবং নারীর প্রতি দায়িত্ববান, আর নারীসমাজ সততা, বিশ্বস্ততা ও আনুগত্যে মহীয়ান।

দায়িত্বশীল ও সত্যানুগত সমাজ

সমাজের সর্বস্তরে কর্তব্যবোধ ও দায়িত্বশীলতা এমন জাগ্রত ছিলো যে, নিজের গণ্ডিতে প্রত্যেকে ছিলো শাসক ও পরিচালক এবং প্রত্যেকে তার শাসিত ও পরিচালিতদের বিষয়ে ছিলো পূর্ণ দায়বদ্ধ। পুরো সমাজ গড়ে উঠেছিলো আল্লাহর নবীর এই সুমহান শিক্ষার উপর–

ألا كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيـــته، فالإمام راع ومسؤول عن رعيـــته، والرجل راع في أهله ومسؤول عن رعيـــته، والمرأة راعيـــة في بيت زوجها ومسؤولـــة عن رعيتها، والخادم راع في مال سيده ومسؤول عن رعيـــته

'শোনো, তোমরা প্রত্যেকে শাসক এবং আপন শাসিতদের বিষয়ে জিজ্ঞাসিত (ও দায়বদ্ধ)। সুতরাং ইমাম তার জনগণের শাসক এবং আপন শাসিতদের বিষয়ে

[১] বুখারী ও মুসলিম।

জিজ্ঞাসিত এবং স্বামী তার পরিবার-পরিজনের শাসক এবং আপন শাসিতদের বিষয়ে জিজ্ঞাসিত, আর স্ত্রী তার স্বামীগৃহের শাসক এবং আপন শাসিতদের বিষয়ে জিজ্ঞাসিত। তদ্রূপ সেবক তার মনিবের সম্পদের ব্যবস্থাপক এবং তার অধীন বিষয় সম্পর্কে জিজ্ঞাসিত।'[১]

এভাবে সেযুগের ইসলামী সমাজ গড়ে উঠেছিলো এক সত্যিকারের সুশীল ও দায়িত্বসচেতন সমাজরূপে। সেখানে কর্তব্যবোধ যেমন ছিলো তেমনি ছিলো জবাবদেহির অনুভূতি। সবাই সত্যের প্রতি পূর্ণ অনুগত এবং আজীবন সত্যের রক্ষক। মশওয়ারা ও পরামর্শ ছিলো (রাষ্ট্রীয়, সামাজিক ও পারিবারিক) সমস্ত কাজের ভিত্তি। খলীফার প্রতি ছিলো তাদের পূর্ণ আনুগত্য, তবে তার ভিত্তি ছিলো আল্লাহর প্রতি খলীফার আনুগত্য। অর্থাৎ মুসলমানদের আনুগত্য তিনি লাভ করবেন, যতক্ষণ তিনি নিজে থাকবেন আল্লাহর পূর্ণ অনুগত। কখনো তিনি আল্লাহর অবাধ্য হলে তার প্রতি আনুগত্যের কোন অবকাশ নেই। কারণ শাসক ও শাসিতের সম্পর্কের মূলভিত্তি ছিলো আল্লাহর প্রিয় নবীর এই শাশ্বত বাণী–

لاطاعة لمخلوق في معصيـــة الخالق

'খালিকের অবাধ্যতায় কোন মাখলূকের আনুগত্য নেই।'[২]

দেশের সম্পদ, যা একসময় ছিলো শুধু রাজা ও রাজপুরুষদের 'নরম লোকমা' ও সুস্বাদু গ্রাস; যে সম্পদের আবর্তন ছিলো শুধু অভিজাত ও ধনীদের বৃত্তে, তা এখন খলীফার হাতে আল্লাহর আমানত বলে গণ্য হলো, যা ব্যয় হতো শুধু আল্লাহর নির্দেশিত পথে এবং বণ্টিত হতো শুধু হকদারদের মধ্যে। খলীফার ভূমিকা ছিলো শুধু 'মালে ইয়াতীমের' যিম্মাদারের মত, যিনি সাচ্ছলতার ক্ষেত্রে বিরত থাকতেন, আর প্রয়োজনের ক্ষেত্রে সতর্কতার সঙ্গে পরিমিত পরিমাণে

[১] رواه البخاري عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما في كتاب الجمعة হাদীছ নম্বর, ৮৪৪, وفي كتاب الاستقراض وأداء الديون হাদীছ নম্বর, ২২৩২ وفي كتاب العتق হাদীছ নম্বর, ২৩৬৮ এবং ২৩৭১ وفي كتاب الوصايا হাদীছ নম্বর, ২৫৪৬ وفي كتاب النكاح হাদীছ নম্বর, ৪৮০১ وفي كتاب الأحكام হাদীছ নম্বর ৬৬০৫ ورواه مسلم في كتاب الإمارة হাদীছ নম্বর, ১৬৩৭ ورواه أبو داود في كتاب الخراج والإمارة والفيء হাদীছ নম্বর,২৩৫৯ ورواه أحمد في مسنده (مسند المكثرين من الصحابة) হাদীছ নম্বর, ৪৯২০, ৫৬৩৫, ৫৭৫৩

[২] انظر صحيح البخاري، كتاب الجهاد، باب ماجاء لاطاعة لمخلوق في ...

গ্রহণ করতেন। দেশের জমি ও ভূমি, যা ছিলো রাজা ও রাজপুরুষদের ব্যক্তিগত জায়গীর, আর অবস্থা ছিলো এই, তুষ্ট হলে দান করো বিশাল ভূমি, আর রুষ্ট হলে যা আছে তাও ছিনিয়ে নাও, বরং ভূমিকে তার জন্য এমন সঙ্কীর্ণ করে দাও যেন বেঁচে থাকাই হয়ে পড়ে কঠিন। কয়েকজন ছিলো ভূস্বামী, আর সবাই ছিলো অসহায় ভূমিদাস। যারা ভূস্বামী তারাই ছিলো ভূমিদাসদের ভাগ্যবিধাতা। তাদের ঘামঝরা ফসল নিয়ে তারা ছিনিমিনি খেলতো; কারো কিছু বলার ছিলো না; কিন্তু এখন যমীন হয়ে গেলো আল্লাহর। যমিনের প্রতিটি টুকরার এবং ভূমির প্রতিটি অংশের হিসাব দেয়া খলিফার জন্য এবং তাঁর অধীন সবার জন্য হলো বাধ্যতামূলক। কারণ আল্লাহর নবী তাঁদের এ বিশ্বাস দান করেছিলেন যে, যুলুমের বলে একবিঘত জমি যে গ্রাস করবে কেয়ামতের দিন তার গলায় সাত তবক যমিনের বেড়ী পরানো হবে। তিনি তাঁদের এ ভয় ও বিশ্বাস দান করেছিলেন, আর তাঁরা হৃদয়ের গভীরে তা গ্রহণ করেছিলেন।

রাসূল হলেন সমাজের প্রাণ

বহুদিন থেকে মানবসমাজ জীবনের সকল উদ্যোগ-ইচ্ছা এবং উদ্যম-স্পৃহা হারিয়ে ফেলেছিলো। ত্যাগ ও ভোগ এবং গ্রহণ ও বর্জন কিছুই মানুষের স্বাধীন ইচ্ছায় হতো না। গোটা সমাজ যেন এক শ্বাসরুদ্ধকর পরিবেশে ছটফট করছিলো। লাঞ্ছিত, অপদস্থ ও স্বাধীনতাবঞ্চিত এক সমাজ, যার নিজস্ব কোন কণ্ঠ ও কণ্ঠস্বর ছিলো না। মানুষ জানতো না, দু'টি দেশে কেন যুদ্ধ হয়, কেনই বা সন্ধি হয়? সবকিছু হতো তাদের অজ্ঞাতে, অথচ তারাই ছিলো যুদ্ধ বা শান্তির প্রথম বলি! রাজা ও রাজ্যের কোন কিছুতে তাদের না ছিলো আকর্ষণ, না ছিলো বিকর্ষণ; তবু রাজ্যের জন্য তারা যুদ্ধ করতো এবং রাজার জন্য প্রাণ দিতো; দিতে বাধ্য হতো।

সমাজের সুবিধাভোগী শ্রেণীর লোকেরাও যুলুম ও স্বেচ্ছাচারের চূড়ান্ত করতো। সাধারণ মানুষের জান-মাল ও ইজ্জত-আবরু ছিলো তাদের খেলার বস্তু। বড় থেকে বড় কষ্ট এবং কঠিন থেকে কঠিন কাজ করতে মানুষকে তারা বাধ্য করতো। তারপর ইচ্ছে হলে দাও একমুষ্টি খাবার, কিংবা একটি মুষ্টাঘাত। অনন্যোপায় মানুষ সবকিছু করে যেতো এবং সবকিছু সয়ে যেতো। রাজশক্তি ও তার আশীর্বাদপুষ্ট অন্যান্য শক্তির হাতে তারা ছিলো এমনই অসহায় ও মজবূর। রাজা ও রাজপুরুষদের প্রতি অন্তরে তাদের ভালোবাসা ও আনুগত্য কিছুই ছিলো

না, ছিলো শুধু হিংসা, ঘৃণা ও বিদ্বেষ; ছিলো ধিকিধিকি আগুন। প্রভুদেরও মনে অনুগত প্রজাদের প্রতি দয়া-মায়ার কোন অনুভূতি ছিলো না; ছিলো ঘৃণা ও তাচ্ছিল্যের অনুভূতি।

যার প্রতি নেই অন্তরের ভালোবাসা, যদি তারই আনুগত্য করতে মানুষ বাধ্য হয়; বরং যার প্রতি রয়েছে ঘৃণা ও বিদ্বেষ, যদি তারই জন্য ধন-জন বিসর্জন দিতে হয় তাহলে কী হতে পারে এর পরিণতি! যা হতে পারে তাই হলো। হৃদয়ের প্রেরণা-স্ফুলিঙ্গ নিভে গেলো, আবেগ-অনুভূতি এবং উদ্যম-উদ্দীপনা শীতল হয়ে গেলো। কপটতা, প্রতারণা ও লৌকিকতা স্বভাবে পরিণত হলো। অবজ্ঞা ও হীনতা এবং লাঞ্ছনা ও বঞ্চনার জীবনে মানুষ এমনই অভ্যস্ত হয়ে পড়লো যে এর বিপরীত কিছু কল্পনা করতেও তারা অক্ষম ছিলো।

মানবহৃদয়ের যে সহজাত আবেগ মানুষকে সর্বদা কল্যাণের পথে অনুপ্রাণিত করেছে এবং ইতিহাসের সব অধ্যায়ে অবিস্মরণীয় সব কীর্তি ও কর্মের গৌরব দান করেছে, তার নাম প্রেম ও ভালোবাসা। কিন্তু বহুদিন থেকে মানবহৃদয়ে প্রেম-ভালোবাসার স্রোতধারা শুকিয়ে গিয়েছিলো, কিংবা মানবকল্যাণের পরিবর্তে তা অন্যখাতে প্রবাহিত হয়েছিলো। ফলে মানুষ ধীরে ধীরে পশুর স্তরে নেমে গিয়েছিলো। এভাবেই যুগের পর যুগ বিগত হয়েছে। রাজার পর রাজা এসেছে, বহু রাজ্যের ভাঙ্গা-গড়া হয়েছে, কিন্তু ইতিহাসের মঞ্চে এমন কোন মহামানবের আবির্ভাব ঘটেনি, যিনি হৃদয়ের শুকিয়ে যাওয়া এ 'প্রেমধারা' নতুনভাবে প্রবাহিত করতে পারেন এবং মানবতার কল্যাণের জন্য তা ব্যবহার করতে পারেন; যিনি তাঁর পরিপূর্ণ গুণ ও সৌন্দর্য এবং সমুন্নত স্বভাব ও চরিত্র দ্বারা মানুষের হৃদয়রাজ্য জয় করতে পারেন এবং মানবহৃদয়ের প্রেম, ভালোবাসা ও ভক্তি-শ্রদ্ধার অধিকারী হতে পারেন। এই যে শূন্যতা, এর ফলে মানুষের হৃদয়ে প্রেম ও ভালোবাসার যা কিছু অবশিষ্ট ছিলো তার একমাত্র আরাধ্য বিষয় হয়ে পড়েছিলো প্রকৃতির সৌন্দর্য, নারীর রূপঐশ্বর্য এবং ক্ষণস্থায়ী জীবনের কৃত্রিম উচ্ছ্বাস-উচ্ছলতা। একারণেই আমরা দেখি, নারী ও প্রকৃতি এবং জীবন ও যৌবনই হলো প্রাচীন কাল থেকে আধুনিক যুগ পর্যন্ত কবিদের কবিতার প্রধান উপজীব্য।

এমন একটি দিকভ্রান্ত, লাঞ্ছিত, বঞ্চিত ও নির্যাতিত সমাজে আল্লাহর আখেরি রাসূলরূপে শ্রেষ্ঠ মানব মুহাম্মদ ইবনে আব্দুল্লাহ আবির্ভূত হলেন। তিনি সব বেড়াজাল ছিন্ন করলেন এবং সব জঞ্জাল সাফ করলেন। মানবসমাজকে তিনি

সত্য-ন্যায়ের আলো দান করলেন এবং হৃদয়ের জগতে নতুন করে প্রেম ও ভালোবাসার ঝর্ণাধারা উৎসারিত করলেন এবং সঠিক খাতে তা প্রবাহিত করলেন। মানুষকে তিনি শুভ্র-সুন্দর ও সফল-সার্থক জীবনের পথ দেখালেন এবং অনন্ত সৌভাগ্য লাভের সুসংবাদ দান করলেন। তাঁর মহান ব্যক্তিসত্তায় আল্লাহ তা'আলা গুণ ও সৌন্দর্যের এবং জ্ঞান ও ঐশ্বর্যের এমন সর্বোত্তম সমাবেশ ঘটিয়েছিলেন, যার তুলনা মানবজাতির মাঝে দ্বিতীয়টি আর নেই। দূর থেকে মানুষ তাঁকে ভয় করতো, কিন্তু নিকটসান্নিধ্যে এসে শুধু হৃদয় দিয়ে নয়, প্রাণ দিয়ে ভালোবাসতো। তাঁর রূপ-গুণের 'বয়ানী' শুধু বলতে পেরেছেন, 'তাঁর আগে ও পরে তাঁর কোন তুলনা আমি দেখিনি।'

তাঁর আগমনে মানবহৃদয়ে বিশুদ্ধ প্রেমের বিশুদ্ধ ঝর্ণাধারা আবার প্রবাহিত হলো এবং হৃদয় ও আত্মা তাঁর প্রতি এমন আকৃষ্ট হতে লাগলো যেন আছে চুম্বকের কোন আকর্ষণ, যেন তৃষিত আত্মা তাঁরই প্রতীক্ষায় ছিলো ব্যাকুল। তাঁর সম্প্রদায় তাঁর প্রতি ভালোবাসা ও আনুগত্যের এমন অনুপম প্রদর্শন করেছে যার তুলনা প্রেম ও প্রেমিকদের ইতিহাসে নেই। বিশ্বাস ও বিশ্বস্ততার, ত্যাগ ও আত্মত্যাগের এবং আনুগত্য ও আত্মনিবেদনের এমন সব ঘটনা ঘটেছে এবং সম্পদ, সন্তান, পরিবার ও আপন প্রাণ উৎসর্গ করার এমনসব দৃষ্টান্ত স্থাপিত হয়েছে যা না আগে কখনো ছিলো, না পরে কখনো হবে।

অপূর্ব প্রেম ও প্রাণনিবেদন

হযরত আবু বকর ইবনে আবু কোহাফা (রা)-এর ইসলাম গ্রহণের পরের ঘটনা। কোরাইশ-নেতারা একদিন মক্কায় তাঁর উপর হামলে পড়লো ও নির্দয়ভাবে প্রহার করলো। আঘাতে আঘাতে শরীর-চেহারা এমন বিধ্বস্ত হলো যে, চেনা যায় না!

তাঁর স্বগোত্র বনু তাইমের লোকেরা মৃত্যু নিশ্চিত জেনে কাপড়ে পেঁচিয়ে তাঁকে বহন করে বাড়িতে নিয়ে গেলো। কিন্তু শেষ বিকেলে তিনি কথা বলে উঠলেন এবং প্রথম যে কথাটি বললেন তা হলো, 'আল্লাহর রাসূল কেমন আছেন? তাঁর কী অবস্থা?' লোকেরা তখন রাগ ঝেড়ে বকাঝকা করলো যে, যার জন্য আজ এ দুর্দশা, এ অবস্থায়ও তাকেই স্মরণ করা! তারা উঠে চলে গেলো এবং তাঁর মা উম্মে খায়রকে বলে গেলো, মুখে কিছু খানা-পানি দিতে চেষ্টা করুন।

মা যখন একান্ত হলেন এবং কিছু মুখে দিতে পীড়াপীড়ি করলেন তখনো তাঁর একই কথা, আল্লাহর রাসূল কেমন আছেন? তাঁর কী অবস্থা?

মা বললেন, 'আল্লাহর কসম, তোমার সঙ্গীর কোন খবর আমি জানি না।' তিনি বললেন, খাত্তাবের কন্যা উম্মে জামীলের কাছে গিয়ে তাঁর খোঁজ নিন।

(মায়েরা সন্তানের কথা কবে ফেলতে পেরেছে!) বাধ্য হয়ে তিনি উম্মে জামীলের কাছে গেলেন, বললেন, 'আবু বকর তোমার কাছে মুহম্মদ বিন আব্দুল্লাহর কুশল জিজ্ঞাসা করছে।' হায়, কী কঠিন দিন ছিলো! কেমন কোরবানির দ্বীন কত সহজে আমরা পেয়েছি! উম্মে জামীল হুঁশিয়ার হয়ে বললেন, 'কে আবু বকর, কে মুহম্মদ, আমি জানি না; তবে আপনি চাইলে আপনার পুত্রের কাছে যেতে পারি।' উম্মে খায়র বললেন, 'চলো'।

উম্মে জামীল হযরত আবু বকরের করুণ অবস্থা দেখে অস্থির কণ্ঠে বললেন, 'আল্লাহর কসম, আপনার মত মানুষের যারা এ দুরবস্থা করেছে তারা অবশ্যই পাপাচারী, কাফির। আমার বিশ্বাস, আল্লাহ আপনার পক্ষ হতে এর প্রতিশোধ নেবেন।'

আবু বকর শুধু বললেন, 'আল্লাহর রাসূল কেমন আছেন? তাঁর কী খবর?'

উম্মে জামীল বললেন, 'এই যে আপনার আম্মা শুনছেন!'

তিনি বললেন, 'তার দিক থেকে তোমার কোন আশঙ্কা নেই।'

উম্মে জামীল বললেন, 'তিনি ইবনুল আরকামের বাড়ীতে সুস্থ নিরাপদ আছেন।'

তখন হযরত আবু বকর বললেন, 'তাহলে আল্লাহর কসম, আল্লাহর নবীকে নিজের চোখে না দেখে আমি খানা-পানি গ্রহণ করবো না।'

উম্মে খায়র এবং উম্মে জামীল অপেক্ষায় থাকলেন; যখন রাত হলো এবং লোকচলাচল বন্ধ হলো তখন তাঁরা কাঁধের সাহারা দিয়ে তাঁকে নিয়ে বের হলেন এবং বহু কষ্টে তাঁকে রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খিদমতে হাজির করলেন। আর হযরত আবু বকর আল্লাহর নবীকে নিজের চোখে দেখার পরই শুধু শান্ত হলেন এবং খানা-পানি গ্রহণ করলেন।[১]

অহুদের বিপর্যয়ের দিন এক আনছারিয়া অস্থির-পেরেশান অবস্থায় বের হলেন। তার বাপ-ভাই ও স্বামী রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সঙ্গে ছিলেন এবং সবাই শহীদ হয়েছেন, কিন্তু তিনি যাকে দেখেন শুধু জিজ্ঞাসা করেন, আল্লাহর রাসূল কী অবস্থায় আছেন? লোকেরা বললো, আলহামদু লিল্লাহ, তিনি তেমনই আছেন যেমন তুমি কামনা করো। তিনি বললেন, 'আমাকে দেখাও, আমি নিজের চোখে তাঁকে দেখতে চাই।'

---

[১] আল-বিদায়া ওয়ান-নিহায়া, খ. ৩ পৃ. ৩০

তিনি দেখলেন, আর বললেন, 'হে আল্লাহর রাসূল! আপনার (নিরাপদ থাকার) পর সব বিপদই আমার কাছে তুচ্ছ।'[১]

হযরত খোবায়ব (রা)-এর হৃদয়বিদারক ঘটনা তো সবাই জানে! এই মযলূম শহীদের স্মরণে যুগে যুগে কত হৃদয় থেকে রক্ত এবং কত চোখ থেকে অশ্রু ঝরেছে তা কে বলতে পারে! তাঁকে যখন শূলে চড়ানো হলো তখন কোরাইশ আমোদ করে জিজ্ঞাসা করলো, তুমি কি চাইবে যে, মুহম্মদ তোমার স্থানে হোন? তিনি বললেন, 'না, আল্লাহর কসম, না! আমি তো এমনও চাইবো না যে, আমার মুক্তির জন্য তাঁর পায়ে সামান্য কাঁটা বিঁধবে!'
একথা শুনে লোকেরা তাঁকে উপহাস করতে লাগলো,[২] আর (কাফের অবস্থায়) সেখানে উপস্থিত আবু সুফয়ান বলে উঠলেন, 'আল্লাহর কসম, কেউ কাউকে এমন ভালোবাসতে আমি দেখিনি যেমন মুহম্মদের সঙ্গীরা তাকে ভালোবাসে!'

হযরত যায়দ ইবনে ছাবিত (রা) বলেন, অহুদের দিন রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে সা'দ বিন রাবী'-এর খোঁজে পাঠালেন, আর বললেন, যদি তার দেখা পাও, তাকে আমার সালাম বলো, আর বলো, আল্লাহর রাসূল বলছেন, নিজেকে তুমি কী অবস্থায় পাচ্ছো?
যায়দ বিন ছাবিত রা. বলেন, আমি নিহতদের মধ্যে ঘুরে ঘুরে তাঁর কাছে পৌঁছলাম। তীর-তলোয়ারের অসংখ্য যখম নিয়ে তিনি তখন শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করছেন। আমি বললাম, হে সা'দ, রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আপনাকে সালাম বলছেন, আর বলছেন, 'আমাকে জানাও নিজেকে তুমি কী অবস্থায় পাচ্ছো?'
তিনি বললেন, আল্লাহর রাসূলকে সালাম বলো, আর বলো, 'ইয়া রাসূলাল্লাহ, জান্নাতের ঘ্রাণ পাচ্ছি।'
আর আমার আনছারী কাউমকে বলবে, 'আল্লাহর কাছে তোমাদের কোন কৈফিয়ত থাকবে না, যদি তোমাদের একজনেরও চক্ষু খোলা থাকে, আর আল্লাহর রাসূলের কিছু হয়।' একথা বলেই তিনি প্রাণ ত্যাগ করলেন।[৩]
অহুদের যুদ্ধে আবু দোজানা ছিলেন আল্লাহর রাসূলের জন্য ঢাল। তীর এসে

[১] رواه ابن إسحاق إمام المغازي، ورواه البيهقي مرسلا
[২] আল-বিদায়া ওয়ান-নিহায়া, খ. ৪ পৃ. ৬৩
[৩] যাদুল মা'আদ, খ. ২ পৃ. ১৩৪

বিঁধতো তার পিঠে, আর তিনি ভাবতেন, আমার পিঠ ঝাঁঝরা হয়ে যাক, আল্লাহর রাসূল নিরাপদ থাকুন।[১]

হযরত মালিক আলখুদরী (রা) রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের যখম থেকে রক্ত চুষে নিয়েছিলেন। আল্লাহর রাসূল যখন বললেন, 'থুথু করে রক্তটা ফেলে দাও।' তিনি বললেন, 'আল্লাহর কসম, আমি থুথু ফেলবো না।'[২]
হোদায়বিয়ার সন্ধিকালে আবু সুফয়ান মদিনায় এলেন এবং আপন কন্যা (উম্মুল মুমিনীন) উম্মে হাবীবাহ (রা.)-এর ঘরে গেলেন। তিনি যখন রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বিছানায় বসতে গেলেন, উম্মে হাবীবাহ (রা) সঙ্গে সঙ্গে বিছানা গুটিয়ে ফেললেন। আবু সুফয়ান অবাক হয়ে বললেন, 'হে কন্যা, জানি না, বিছানাকে আমার অনুপযুক্ত ভেবেছো, না আমাকে বিছানার!'
তিনি বললেন, 'এটি আল্লাহর রাসূলের বিছানা, আর আপনি নাপাক মুশরিক।'[৩]

হোদায়বিয়ার সন্ধি-আলোচনা থেকে ফিরে গিয়ে ওরওয়া ইবনে মাসঊদ ছাকাফী তার কাউমকে বলেছিলেন, 'হে কাউম, আল্লাহর কসম, বহু রাজদরবারে আমি প্রতিনিধিত্ব করেছি। কিসরা, কায়সার, নাজ্জাসীর দরবার দেখেছি। আল্লাহর কসম, আমি দেখিনি, কোন রাজাকে তার সভাসদ এতটা ভক্তি-শ্রদ্ধা করে যতটা মুহম্মদকে তাঁর সঙ্গীরা করে। আল্লাহর কসম, তিনি নাক ঝাড়লে তা তাদের কারো না কারো প্রসারিত হাতের উপর পড়ে, আর সে তা চেহারায় শরীরে মেখে ফেলে। তিনি আদেশ করেন, তারা ছুটে আসে। তিনি অযু করেন, আর লাড়াই শুরু হয় অযুর পানি গ্রহণ করার জন্য। তিনি কথা বলেন, আর পূর্ণ নীরবতা নেমে আসে। আদবের প্রাবল্যে তারা তাঁর প্রতি পূর্ণ নযরে তাকাতেও পারে না।[৪]

তুলনাহীন আনুগত্য

জীবন ও সভ্যতার শুরু থেকেই মানুষ যাকে ভালোবেসেছে তার আনুগত্য করে এসেছে; আচরণে, বিচরণে, কর্মে, কর্তব্যে এবং জীবনযাপনের সর্বক্ষেত্রে। আনুগত্যই হলো প্রেম ও ভালোবাসার স্বভাবপ্রকাশ। তো আল্লাহর নবীর অনুসারীরা যখন সর্ব-অন্তকরণে তাঁকে ভালোবাসলেন তখন নিজেদের সর্বসত্তা ও

[১] ঐ খ. ২ পৃ. ১৩০
[২] ঐ খ. ২ পৃ. ১৩৬
[৩] سيرة ابن هشام، ذكر الأسباب الموجبة للمسير إلى مكة
[৪] যাদুল মা'আদ, খ. ৩ পৃ. ১২৫

সর্বশক্তি তাঁর নিরঙ্কুশ আনুগত্যে সঁপে দিলেন। কেমন ছিলো তাঁর প্রতি তাঁদের আনুগত্য ও 'আত্মসমর্পণ', এর কিছুটা ঝলক দেখতে হলে শুনুন হযরত সা'দ ইবনে মু'আয (রা)-এর মর্মস্পর্শী বক্তব্য। বদরযুদ্ধের পূর্বে নিজের এবং স্বগোত্রের পক্ষ হতে তিনি বলেছিলেন–

'আমি আনছারদের পক্ষ হতে পূর্ণ আত্মপ্রত্যয়ের সঙ্গে বলছি, আপনি যেখানে ইচ্ছা যাত্রা করুন, যার সঙ্গে ইচ্ছা সম্পর্ক গড়ুন বা ছিন্ন করুন। আমাদের সম্পদ যা ইচ্ছা গ্রহণ করুন, যা ইচ্ছা আমাদের জন্য রাখুন; তবে আপনার রেখে দেওয়া অংশের চেয়ে গ্রহণ করা অংশই হবে আমাদের কাছে অধিক প্রিয়। আর যে বিষয়ে আপনি যে আদেশ করবেন, আমাদের সবকিছু হবে আপনার আদেশের অনুগত। আল্লাহর কসম, আপনি যদি (সুদূর) বারকে গামাদানে যেতে চান, আমরা সঙ্গে যাবো; আল্লাহর কসম, আপনি যদি আমাদের নিয়ে এই সাগরে ঝাঁপ দিতে চান, আমরা ঝাঁপ দেবো।'[১]

তাঁদের নিরঙ্কুশ আনুগত্য ও আত্মসমর্পণের আরেকটি উদাহরণ হলো–

তাবুকের গাযওয়া থেকে পিছিয়ে থাকা তিনজনের সঙ্গে যখন কথা বলতে নিষেধ করা হলো, ছাহাবা কেরাম তা এমনভাবে পালন করলেন যে, শাব্দিক অর্থেই মদীনা তাঁদের জন্য হয়ে গেলো কবরের নীরবতার শহর; না কেউ ডাক দেয়, না সাড়া দেয়! পরবর্তী জীবনে সেই তিনজনের একজন হযরত কা'ব নিজেই ঘটনার বিবরণ দিয়েছেন–

'(তাবুকের গাযওয়ায়) তাঁর সঙ্গ গ্রহণ থেকে যারা পিছিয়ে ছিলো তাদের মধ্য হতে আমাদের তিনজনের সঙ্গে তিনি কথা বলা নিষিদ্ধ করলেন। ব্যস, লোকেরা আমাদের এড়িয়ে চলতে লাগলো এবং আমাদের জন্য অন্যরকম হয়ে গেলো। ফলে এই যমিন আমাদের জন্য হয়ে গেলো একেবারে 'আনজান'। এ যেন আমাদের পরিচিত সেই প্রিয় ভূমি নয়! ...

হতে হতে মানুষের উপেক্ষা যখন আমার জন্য অসহনীয় দীর্ঘ হয়ে গেলো তখন (একদিন) আবু কাতাদার বাগানের দেয়াল টপকে ভিতরে ঢুকলাম। সে ছিলো আমার চাচাত ভাই এবং আমার সবচে' প্রিয় মানুষ। তাকে সালাম দিলাম, আল্লাহর কসম, সে জবাব দিলো না। আমি বললাম, হে আবু কাতাদা, আল্লাহর

[১] যাদুল মা'আদ, খ. ৩ পৃ. ১৩০

দোহাই দিয়ে জানতে চাই, তুমি কি জানো যে, আমি আল্লাহ ও তাঁর রাসূলকে ভালোবাসি?

সে নীরব, আবার দোহাই দিলাম, এবারও নীরব। তৃতীয়বার সে বললো, আল্লাহ ও তাঁর রাসূলই ভালো জানেন। তখন আমার চোখে অশ্রুর ঢল নামলো এবং আমি আবার দেয়াল টপকে বের হয়ে এলাম।'[১]

নিষেধাজ্ঞার শাস্তিতে দগ্ধ হওয়ার সময় হযরত কা'আব (রা)-এর আনুগত্যের একটি অপূর্ব দৃষ্টান্ত এই যে, এক পর্যায়ে আল্লাহর রাসূলের আদেশবাহক তাঁর কাছে এসে বললেন, আল্লাহর রাসূল আপনাকে স্ত্রী থেকে পৃথক হওয়ার আদেশ করছেন।

তিনি বললেন, তালাক দেবো, না কী করবো? বলা হলো, শুধু পৃথক থাকুন, 'কাছে' যাবেন না। তখন তিনি স্ত্রীকে বললেন, তুমি তোমার পরিবারের কাছে চলে যাও, এবিষয়ে আল্লাহ কোন ফায়ছালা করা পর্যন্ত সেখানেই থাকো।[২]

এই হযরত কা'আবেরই দুনিয়ার সবকিছুর উপর রাসূলের ভালোবাসাকে অগ্রাধিকার প্রদানের একটি দৃষ্টান্ত এই যে, উপরোক্ত ঘটনায় গাস্সানের বাদশাহ তাঁকে সহানুভূতির প্ররোচনা দিয়ে তার কাছে চলে আসার প্রস্তাব দিলো। আপনজনের বিরূপতার সময় এ সত্যি এক কঠিন পরীক্ষা, কিন্তু তিনি ঘৃণাভরে সে প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করলেন। তাঁর নিজের ভাষায় শুনুন–

'মদীনার বাজারে হাঁটছি, এমন সময় সিরিয়াবাসী এক নিবতীকে, যে মদীনায় খাদ্যপণ্য বিক্রি করতে এসেছে, বলতে শুনলাম, কে আমাকে কা'আব ইবনে মালিকের খোঁজ দেবে? লোকেরা আমাকে দেখিয়ে দিলো, আর সে কাছে এসে গাস্সানী বাদশাহর পত্র দিলো। আমি পড়া জানতাম এবং পত্রটি পড়লাম। তাতে ছিলো–

আমি জানতে পেরেছি, তোমার মনিব তোমার প্রতি বিরূপ। আল্লাহ তো তোমাকে হীনতা ও বঞ্চনার ভূমিতে থাকার জন্য সৃষ্টি করেননি। আমার কাছে চলে এসো, যোগ্য সমাদর পাবে।'

[১] رواه البخاري عن عبد الرحمن بن عبد الله بن كعب بن مالك في كتاب المغازي হাদীছ নম্বর ৪০৬৬ ورواه مسلم في كتاب التوبة হাদীছ নম্বর, ৪৯৭৩ ورواه أبو داود في كتاب الجهاد হাদীছ নম্বর, ২৩৯২ ورواه أحمد في مسنده (مسند المكيين) হাদীছ নম্বর, ১৫২২৯

[২] প্রাগুক্ত

আমি ভাবলাম, এ আরেক পরীক্ষা। তাই পত্রটি চুলায় নিক্ষেপ করলাম।[১]

আদেশ পাওয়ামাত্র আনুগত্য করার এবং মাথা পেতে গ্রহণ করার একটি উদাহরণ হলো পানমজলিসে মদের নিষিদ্ধতার আয়াত শ্রবণের ঘটনা। হযরত আবু বোরায়দা তাঁর আব্বা হতে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, শরাবের মজলিসে আমরা শরাব পানে মগ্ন ছিলাম। একসময় আমি উঠলাম যে, আল্লাহর রাসূলের খিদমতে হাযির হয়ে সালাম পেশ করবো। এরই মধ্যে মদ হারাম হওয়ার এই আয়াত নাযিল হয়ে গিয়েছিলো–

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓا۟ إِنَّمَا ٱلْخَمْرُ وَٱلْمَيْسِرُ وَٱلْأَنصَابُ وَٱلْأَزْلَٰمُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ ٱلشَّيْطَٰنِ فَٱجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ۝ إِنَّمَا يُرِيدُ ٱلشَّيْطَٰنُ أَن يُوقِعَ بَيْنَكُمُ ٱلْعَدَٰوَةَ وَٱلْبَغْضَآءَ فِى ٱلْخَمْرِ وَٱلْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَن ذِكْرِ ٱللَّهِ وَعَنِ ٱلصَّلَوٰةِ ۖ فَهَلْ أَنتُم مُّنتَهُونَ ۝

হে ঈমানদারগণ, নিঃসন্দেহে মদ, জুয়া, পূজার বেদী ও ভাগ্য-শর, এগুলো হচ্ছে শয়তানের কাজ, সুতরাং এগুলো পরিহার করো, যাতে সফলকাম হতে পারো। শয়তান তো চায় তোমাদের মধ্যে শত্রুতা ও বিদ্বেষ সৃষ্টি করতে মদ ও জুয়ার মাধ্যমে, আর (চায়) আল্লাহর স্মরণ থেকে এবং নামায থেকে তোমাদের বাধা দিতে। সুতরাং তোমরা কি (মন্দ থেকে) বিরত হবে'?। (মাইদা, ৯০-৯১)

তখন আমি বন্ধুদের কাছে ফিরে এসে ঐ পর্যন্ত আয়াতটি তিলাওয়াত করে শুনালাম। বর্ণনাকারী বলেন, কেউ কেউ পানরত ছিলো। কিছুটা মুখে, কিছুটা ঠোঁটে, কিছুটা পেয়ালায়, এমন অবস্থা! তো তারা মুখের ও ঠোঁটের মদ থুথিয়ে ফেলে দিলো এবং পেয়ালার মদ উপুড় করে দিলো, আর বলতে লাগলো, বিরত হলাম ইয়া রাব্ব! বিরত হলাম![২]

আল্লাহর রাসূলের প্রতি নিঃশর্ত আনুগত্য এবং সম্পদ-প্রাণ ও পরিবার পরিজনের উপর তাঁকে অগ্রগণ্য করার একটি অনুপম দৃষ্টান্ত হচ্ছে মুনাফিক-সরদার আব্দুল্লাহ বিন উবাইয়ের পুত্র হযরত আব্দুল্লাহ (রা) এর ঘটনা। ইবনে জারীর তাঁর নিজস্ব সনদে ইবনে যায়দ হতে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ

---

[১] প্রাগুক্ত

[২] رواه ابن جرير بسنده في التفسير عند قوله : إنما الخمر والميسر ، تفسير الطبري، المجلد السابع

ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আব্দুল্লাহ বিন উবাইয়ের পুত্র আব্দুল্লাহকে ডেকে বললেন, শোনছো না তোমার বাবা কী বলছে? তিনি আরয করলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আপনার প্রতি আমার মা-বাবা কোরবান, কী বলেন তিনি?

তিনি বললেন, সে বলে, 'যদি আমরা মদীনায় ফিরে যাই, তখন অবশ্যই অভিজাত লোকেরা সেখান থেকে ইতর লোকদের বের করে দেবে।'

আব্দুল্লাহ বললেন, 'ইয়া রাসূলাল্লাহ, অবশ্যই সে সত্য বলেছে। আল্লাহর কসম, আপনিই অভিজাত, আর সেই যলীল। ইয়া রাসূলাল্লাহ, আপনি তো মদীনায় এসে পড়েছেন। আহলে ইয়াছরিব জানে যে, তাদের মধ্যে আমার চেয়ে পিতানুগত কেউ নেই। তো যদি আল্লাহ ও তাঁর রাসূল সন্তুষ্ট হন যে, আমি তার মাথা কেটে আনি, তাহলে অবশ্যই আমি তার মাথা হাযির করবো।' তিনি বললেন, 'না, এটা করো না।'

যখন লোকেরা মদীনায় উপনীত হলো তখন হযরত আব্দুল্লাহ মদীনার প্রবেশ-পথে তলোয়ার হাতে পিতার সামনে দাঁড়ালেন আর বললেন, 'তুমিই কি বলেছো, যদি আমরা মদীনায় ফিরে যেতে পারি, তাহলে অবশ্যই অভিজাত লোকেরা সেখান থেকে যলীল লোকদের বের করে দেবে? আল্লাহর কসম, এখনই তুমি জানতে পারবে যে, মর্যাদা তোমার জন্য নাকি আল্লাহর রাসূলের জন্য? আল্লাহর কসম, আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের অনুমতি ছাড়া তুমি মদীনায় তোমার ঘরের ছায়া পর্যন্ত পাবে না।'

তখন সে চিৎকার করে বলতে লাগলো, 'হে আহলে খাযরাজ, দেখো, আমার পুত্র আমাকে ঘরে যেতে বাধা দেয়! হে আহলে খাযরাজ, দেখো আমার পুত্রের কাণ্ড!'

লোকেরা তাঁকে বুঝালো, কিন্তু তাঁর একই কথা, আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের ইজাযত ছাড়া সে মদীনায় দাখেল হতে পারবে না। লোকেরা রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে ঘটনা জানালো। তিনি বললেন, গিয়ে বলো, সে যেন তাকে আসতে দেয়। লোকেরা এসে তাঁকে নবীর ফরমান শুনালো। তখন তিনি বললেন, হাঁ নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আদেশ যখন এসেছে তখন ঠিক আছে।[১]

---

[১] তাফসীরে তাবারী,

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

জাহেলিয়াতের কাঁচামাল থেকে মানবতার শ্রেষ্ঠ সম্পদ

নতুন ব্যক্তি, নতুন জাতি

এই সুব্যাপ্ত ও সুগভীর ঈমান, এই মহাপ্রজ্ঞাপূর্ণ নববী শিক্ষা ও দীক্ষা, এই অতুলনীয় ছোহবত ও সাহচর্য, এবং এই অলৌকিক গ্রন্থ আলকোরআন, যা চিরসজীব, যার বিস্ময় অনিঃশেষ– এগুলোর মাধ্যমে নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মুমূর্ষু মানবতাকে নতুন প্রাণ ও নতুন জীবন দান করলেন। মানবতার যে বিপুল অব্যবহৃত কাঁচা সম্পদ বিনষ্ট হচ্ছিলো এবং কারোই জানা ছিলো না, এগুলোর গুণ কী এবং সঠিক ব্যবহারক্ষেত্র কোনটি, বরং জাহেলিয়াতের ঘোর অমানিশায় সব হারিয়ে যাচ্ছিলো, তিনি সেই কাঁচা মানবসম্পদে নতুন প্রাণ সঞ্চার করলেন; সুপ্ত সকল প্রতিভা জাগ্রত করলেন এবং চাপা পড়া যোগ্যতার বিকাশ ঘটালেন। প্রতিটি প্রতিভা ও যোগ্যতাকে তিনি যথাস্থানে নিয়োজিত করলেন। তখন মনে হলো জীবনের শূন্য ক্ষেত্রগুলো এত দিন এই সব প্রতিভা ও যোগ্যতারই অপেক্ষায় ছিলো। সব যেন প্রস্তর-মূর্তির মত নিষ্প্রাণ ছিলো, আর তিনি সেগুলোকে জীবন্ত মানবে রূপান্তরিত করলেন, কিংবা সব যেন মৃতদেহ ছিলো, আর তাঁর প্রাণস্পর্শে সেগুলো প্রাণ লাভ করলো এবং সমাজকে জীবনের বার্তা শোনাতে লাগলো। যারা নিজেরাই ছিলো অন্ধ এবং অন্ধকারে নিমজ্জিত, এখন তারাই মনবতাকে আলো দিয়ে পথ দেখাতে লাগলো। কোরআনের ভাষায়–

أَوَمَن كَانَ مَيْتًا فَأَحْيَيْنَـٰهُ وَجَعَلْنَا لَهُۥ نُورًا يَمْشِى بِهِۦ فِى ٱلنَّاسِ كَمَن مَّثَلُهُۥ فِى
ٱلظُّلُمَـٰتِ لَيْسَ بِخَارِجٍ مِّنْهَا

'যারা মৃত ছিলো, অনন্তর তাদের আমি জীবন দান করলাম এবং তাদের নূর দান করলাম, যা দ্বারা তারা মানবসমাজে পথ চলতে লাগলো, তারা কি হতে পারে ঐ ব্যক্তির মত যে হারিয়ে গেছে বিভিন্ন অন্ধকারে, আর তা থেকে বের হতেই পারছে না!' (আন'আম, ৬ : ১২২)

তাঁর নূরানী ছোহবত ও জ্যোতির্ময় সাহচর্য এবং হাকীমানা তারবিয়াত ও প্রজ্ঞাপূর্ণ দীক্ষার গুণে ধ্বংসের প্রান্তে উপনীত জাতির মধ্যে এমন এক বিপ্লব সৃষ্টি হলো যে, অল্প সময়ের মধ্যেই এমন সব ব্যক্তি ও ব্যক্তিত্বের আবির্ভাব হলো, যারা সত্যিকার অর্থেই ছিলেন ইতিহাসের মহাবিস্ময় এবং মানবতার অমূল্য সম্পদ।

ওমর (রা), যিনি পিতা খাত্তাবের বকরিপাল চরাতেন, আর 'অকর্মন্য, অপদার্থ' ইত্যাদি তিরস্কার শুনতেন, শক্তি, মর্যাদা ও আভিজাত্যে যিনি কোরায়শের মধ্যস্তরের ছিলেন; সমাজে ও সমবয়সীদের মধ্যে যার আলাদা কোন বৈশিষ্ট্য ছিলো না, সেই সাধারণ একজন ওমর হঠাৎ সারা বিশ্বকে আপন প্রতিভা, যোগ্যতা, গুণ ও বৈশিষ্ট্য দ্বারা তাক লাগিয়ে দিচ্ছেন, কায়সার ও কিসরার সাম্রাজ্য তছনছ করে তাদের রাজমুকুট ছিনিয়ে আনছেন এবং এমন এক ইসলামী সালতানাত গড়ে তুলছেন যা যুগপৎ উভয় সাম্রাজ্যের উপর বিস্তৃত, অথচ সুশাসনে ও সুব্যবস্থায় উভয় সাম্রাজ্যের উর্ধ্বে যার অবস্থান। পক্ষান্তরে তাকওয়া ও ধার্মিকতা এবং ইনছাফ ও সুবিচারের ক্ষেত্রে তো তুলনার কোন প্রশ্নই আসে না; এমনকি ছাহাবা কেরামের মধ্যেও এসব বিষয়ে তিনি ছিলেন বিশিষ্ট।

খালিদ বিন ওলীদের কথা ধরুন; কী ছিলেন তিনি?! খুব বেশী হলে কোরায়শের উচ্চাকাঙ্ক্ষী এক যুবক, স্থানীয় ও গোত্রীয় যুদ্ধে যার যথেষ্ট খ্যাতি। সেই সুবাদে গোত্রে ও গোত্রপতির কাছে আলাদা কদর আছে, কিন্তু গোত্রীয় গণ্ডি পেরিয়ে আরব উপদ্বীপেও তার বিশেষ কোন পরিচিতি নেই, সেই সাধারণ একযোদ্ধা খালেদ বিন ওয়ালীদ 'আসমানি তলোয়ার' হয়ে এমন ঝলসে উঠলেন, যা সামনে আসে টুকরো টুকরো হয়ে যায়। এই খোদায়ি তলোয়ার রোম সাম্রাজ্যের উপর বিজলী হয়ে এমন চমকালো যে, ইতিহাসের দৈর্ঘ্যে, প্রস্থে ছড়িয়ে থাকলো শুধু তারই খ্যাতি ও সুখ্যাতি ।

আবু ওবায়দা ইবনুল জাররাহ, যার সততা, বিশ্বস্ততা ও কোমলতার প্রশংসা ছিলো, ছিলো ক্ষুদ্র বাহিনীপরিচালনার অভিজ্ঞতা, হঠাৎ তিনি হয়ে গেলেন

আমীনুল উম্মাহ! উম্মতের বিশ্বস্ততম ব্যক্তি! মুসলমানদের বৃহত্তম বাহিনী-পরিচালনার গুরু দায়িত্ব অর্পিত হলো তাঁর উপর, আর তিনি এমন বিস্ময়কর যোগ্যতার পরিচয় দিলেন যে, রোমকবাহিনী ছিন্নভিন্ন হয়ে গেলো! এমনকি সমগ্র সিরিয়ায় রোমান সাম্রাজ্যের পতন ঘটলো, আর বিদায়কালে রোমসম্রাট সিরিয়ার উপর অসহায় দৃষ্টি বুলিয়ে বলে ওঠেন, 'হে সিরিয়া, তোমাকে বিদায় সালাম, এমন বিদায় যার পর নেই কোন মিলন।'

আমর ইবনুল আছ, কোরায়শে যার বুদ্ধির খ্যাতি ছিলো, কিন্তু তার কীর্তি শুধু এই যে, হাবশার রাজদরবারে দূতরূপে গিয়েছেন হিজরতকারী মুসলমানদের ফেরত আনতে, কিন্তু ফিরে এসেছেন ব্যর্থতার লজ্জা নিয়ে; ইসলাম গ্রহণের পর সেই তিনি হলেন ফাতিহে মিছর- মিশরবিজয়ী এবং অখণ্ড ক্ষমতা ও প্রতিপত্তির অধিকারী।

সা'আদ বিন আবী ওয়াক্কাছ, ইসলামপূর্ব জীবনে যার বড় কোন যুদ্ধের খবর কেউ জানে না, তিনি হলেন কাদেসিয়ার বিজয়ী বীর। মাদায়েনের চাবি শোভা পেলো তাঁর হাতে। ইরাক ও ইরানকে ইসলামী সালতানাতের সবুজ মানচিত্রের অন্তর্ভুক্ত করে পেলেন 'ফাতিহে আ'যম'- এ অনন্য উপাধি।

সালমান ফারসী, যিনি ছিলেন পারস্যের কোন বস্তির ধর্মীয় নেতার পুত্র। নিজের এলাকার বাইরে যার কোন পরিচিতি ছিলো না। তিনি পারস্য থেকে বের হলেন। দাসত্বের পর দাসত্ব এবং বিপদের পর বিপদ বরণ করে অবশেষে মদীনায় এলেন এবং ইসলাম গ্রহণ করলেন, আর স্বদেশভূমি পারস্যের রাজধানী মাদায়েনের আমীর ও প্রশাসক হলেন! কালকের সাধারণ এক প্রজা, আজ হলেন সর্বোচ্চ ক্ষমতার অধিকারী শাসক! তার চেয়ে আশ্চর্যের বিষয়, এমন শাসন-ক্ষমতার অধিকারী হয়েও তাঁর তাকওয়া ও ধার্মিকতায় এবং নির্মোহতা ও অনাড়ম্বরতায় আসেনি সামান্যতম পরিবর্তন! পারস্যের বিমুগ্ধ মানুষ অবাক হয়ে দেখে, তাদের শাসক ঝুপড়িতে বাস করেন এবং বোঝা মাথায় বাজারে আসা-যাওয়া করেন।

হাবশী দাস বেলাল, যার কোন মূল্য ছিলো না এমনকি বেচাকেনার বাজারেও, গুণ ও যোগ্যতায় এবং সততা ও ধার্মিকতায় তিনি এমন উচ্চস্তরে উপনীত হলেন যে, আমীরুল মুমিনীন ওমর ইবনুল খাত্তাব পর্যন্ত তাঁকে বলতেন, সাইয়িদুনা বিলাল!

আবু হোযায়ফা (রা)-এর আযাদকৃত গোলাম সালিম, আরব জাহিলিয়াতে যার আলাদা কোন পরিচয় ছিলো না, ইসলাম তাকে এমনই অত্যুচ্চ মর্যাদায় অভিষিক্ত করলো যে, খলীফা ওমর (রা) তাকে খেলাফতের গুরু দায়িত্ব বহনেরও উপযুক্ত মনে করেছেন। তিনি বলেছেন, 'আবু হোযায়ফার আযাদকৃত গোলাম সালিম যদি বেঁচে থাকতো, তাকে আমার স্থলবর্তী করে যেতাম।'

যায়দ ইবনে হারিছা, যিনি লুণ্ঠিত কাফেলা থেকে দাসবাজারে গিয়ে বিক্রি হয়েছেন, মুতার যুদ্ধে ছিলেন মুসলিম বাহিনীর সেনাপতি, যেখানে ছিলেন জা'ফর বিন আবু তালিব ও খালিদ ইবনে ওয়ালীদের মত অভিজাত কোরায়শ-বীর; আর তাঁর পুত্র উসামা ছিলেন সেই বাহিনীর প্রধান যাতে ছিলেন আবু বকর ও ওমর (রা)-এর মত ছাহাবী।

আবু যর, আলমিকদাদ, আবুদ্-দারদা, আম্মার বিন ইয়াসির, মু'আয বিন জাবাল ও উবাই ইবনে কা'আব– জাহেলী যুগের এই সাধারণ মানুষগুলোর উপর দিয়ে যখন ইসলামের সুরভিত বায়ু প্রবাহিত হলো, তাঁরা হয়ে গেলেন যুহদ ও তাকওয়ার আদর্শ এবং জ্ঞান ও প্রজ্ঞার জগতে উজ্জ্বল জ্যোতিষ্ক।

আলী ইবনে আবু তালিব, আয়েশা বিনতে আবু বকর, আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ, যায়দ ইবেন ছাবিত ও আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস– উম্মী নবীর ক্রোড়ে প্রতিপালিত হয়ে এঁরা প্রত্যেকে হয়ে গেলেন মুসলিম উম্মাহর এমন জ্ঞানপ্রদীপ যার আলোতে উদ্ভাসিত হলো সারা বিশ্ব। তাঁদের কলব থেকে প্রবাহিত হলো ইলমের এমন ঝর্ণাধারা এবং তাদের যবান থেকে নিঃসৃত হলো হিকমত ও প্রজ্ঞার এমন অমীয় বাণী, যার তুলনা হতে পারে শুধু যমযমের ঝর্ণাধারা।

তাঁরা এবং অন্যসকল ছাহাবা– এককথায় তাঁদের পরিচয় হলো, হৃদয়ের দিক থেকে মানবসমাজে পবিত্রতম, ইলম ও প্রজ্ঞার দিক থেকে গভীরতম এবং লৌকিকতার দিক থেকে সহজতম। তাঁরা যখন কথা বলতেন, যামানা নিশ্চুপ হয়ে তাঁদের কথা শুনতো এবং ইতিহাসের কলম তা লিখে রাখতো।

ভারসাম্যপূর্ণ মানবগোষ্ঠী

দেখতে দেখতে সবকিছু বিস্ময়কর ভাবে পরিবর্তিত হয়ে গেলো! জাহেলিয়াতের এখানে সেখানে ছড়িয়ে ছিটিয়ে পড়ে থাকা এই যে 'মানবকাঁচাপণ্য', সমসাময়িক জাতি যাদের দিকে তাচ্ছিল্যের দৃষ্টিতে তাকাতো এবং প্রতিবেশী দেশ যাদের অবজ্ঞা করতো, হঠাৎ তারা দেখে, সেই তুচ্ছ কাঁচাপণ্য থেকে তৈরী হয়ে গেছে

এমন মহামূল্যবান মানবসম্পদ যার চেয়ে উত্তম কিছু সভ্যতার ইতিহাসে কখনো ছিলো না, কখনো হবে না। যেমন সুষম ও সুসংহত তেমনি সুবিন্যস্ত ও ভারসাম্যপূর্ণ, যেন গোল আঙটা, যার প্রান্ত বোঝা যায় না, কিংবা যেন একপশলা বৃষ্টি, যার শুরুতে বেশী কল্যাণ না শেষে, বলা যায় না। এমন এক মানবগোষ্ঠী, যা মানবজাতি ও মানবসভ্যতার প্রয়োজনের সকল দিকে পরিপূর্ণ ও সুসম্পূর্ণ। কোথাও কোন খুঁত নেই এবং কমবেশী করার সুযোগ নেই। বিশ্বের কাছে তাদের নেই কোন প্রয়োজন, অথচ তাদের কাছে বিশ্বের আছে প্রয়োজন এবং তা সর্ববিষয়ে।

এই নতুন মানবগোষ্ঠী পৃথিবীতে এক নতুন সভ্যতার ভিত্তি স্থাপন করলো এবং নতুন রাষ্ট্র ও শাসনব্যবস্থার গোড়াপত্তন করলো, অথচ আধুনিক সভ্যতা ও রাষ্ট্র-ব্যবস্থার সঙ্গে তাদের কোন পরিচয়ই ছিলো না। তবু কোন জাতির কাছ থেকে তাঁদের মেধা ও মানুষ ধার করতে হয়নি এবং কোন রাজা ও রাজ্যের সাহায্য নিতে হয়নি। সম্পূর্ণ আত্মশক্তি ও আত্মযোগ্যতায় তারা এমন এক সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা করলেন যা বিস্তৃত ছিলো দুই মহাদেশের বিশাল এলাকায়। প্রতিটি স্থান ও অবস্থান এবং প্রতিটি আসন ও উপবেশন এমন সব মানুষ দ্বারা পূর্ণ করা হলো যারা যোগ্যতা ও ধার্মিকতা এবং শক্তি ও সততার মধ্যে অপূর্ব সমন্বয় সাধন করেছিলেন।

এই বিশাল বিস্তৃত সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠার পর স্বভাবতই তা রক্ষা ও পরিচালনার জন্য প্রয়োজন ছিলো সর্বোচ্চ যোগ্যতার অসংখ্য মানুষের। অথচ উম্মাহর তখন মাত্র আবির্ভাবকাল; কয়েকটি দশক মাত্র তার বয়স এবং সেটাও পার হয়েছে শুধু প্রতিরোধ ও প্রতিরক্ষা এবং জিহাদ ও সংগ্রামের মধ্যে। কিন্তু বিশ্ব অবাক বিস্ময়ে দেখতে পেলো নব-আবির্ভূত উম্মাহ কীভাবে সমাজ, রাষ্ট্র ও শাসনযন্ত্রের প্রতিটি ক্ষেত্রে, প্রতিটি স্তরে কেমন যোগ্যতম মানুষ সরবরাহ করেছে! যেমন আদর্শ শাসক ও প্রশাসক, তেমনি সুদক্ষ পরিচালক ও ব্যবস্থাপক; যেমন বিশ্বস্ত কোষাগার ও হিসাবরক্ষক, তেমনি ন্যায়পরায়ণ কাজী ও বিচারক এবং সুদক্ষ সেনাপতি ও একনিষ্ঠ সৈনিক। সর্বোপরি ধার্মিকতা ও সাধুতায় এবং সরলতা ও উদারতায় অতুলনীয়। সর্ববিষয়ে অন্তরে তাঁদের আল্লাহর ভয় এবং আল্লাহর কাছে জবাবদেহির চিন্তা।

যেহেতু দ্বীনী তারবিয়াত ও ইসলামী দাওয়াতের ধারা অব্যাহত ছিলো সেহেতু সদাপ্রবহমান ঝর্ণার মত উম্মাহ তার রাষ্ট্রব্যবস্থা ও শাসনযন্ত্রকে যোগ্য, দক্ষ,

দায়িত্ববান ও নিবেদিতপ্রাণ এবং মুত্তাকী ও ধর্মপ্রাণ কর্মী ও কর্মকর্তা সরবরাহ করে যেতে পেরেছে। কখনোই উম্মাহ যোগ্যতা, দক্ষতা, মেধা, প্রতিভা, সততা ও ধার্মিকতার সঙ্কটে পড়েনি। শাসনক্ষমতা সবসময় তাদেরই হাতে ছিলো যারা বিশ্বাস করতেন, এ ক্ষমতা খাজনা উশুল করার জন্য নয়, বরং মানুষকে আল্লাহর দ্বীনের পথে হিদায়াত করার জন্য। চরিত্রে ও ব্যক্তিত্বে যারা সততা ও যোগ্যতার একত্র সমাবেশ ঘটিয়েছেন। ফলে ইসলামী সভ্যতা ও শাসনব্যবস্থা স্বরূপে আত্মপ্রকাশ করতে পেরেছে এবং সামাজিক ও ধর্মীয় জীবনে ঐ সকল গুণ ও বৈশিষ্ট্য উদ্ভাসিত হতে পেরেছে যা মানবজাতির ইতিহাসের কোন অধ্যায়ে হয়নি।

বস্তুত এত অল্প সময়ে এমন অসাধ্য সাধন হতে পেরেছে শুধু এজন্য যে, আল্লাহর নবী মুহম্মদ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মানবস্বভাবের বন্ধ তালা খোলার জন্য সঠিক চাবিটি ব্যবহার করেছেন। ফলে প্রথম প্রচেষ্টাতেই তা খুলে গিয়েছে এবং মানবস্বভাবের লুকায়িত সকল সম্পদ ও শক্তি, গুণ ও বৈশিষ্ট্য এবং প্রতিভা ও সম্ভাবনা দুনিয়ার সামনে চলে এসেছে। জাহেলিয়াতের মর্মমূলে তিনি সঠিকভাবে আঘাত হেনেছিলেন এবং প্রথম আঘাতেই তা ধরাশায়ী হয়েছিলো। আল্লাহ প্রদত্ত শক্তিতে, অবাধ্য বিশ্বকে তিনি নতুন দিকে এবং সহজ সরল পথে চলতে বাধ্য করেছিলেন, যাতে মানবজাতি তার সৌভাগ্যের নতুন যুগের শুভ উদ্বোধন করতে পারে, আর তা হলো ইসলামী সভ্যতার সেই স্বর্ণালী যুগ, যা মানবতার ললাটে একমাত্র শুভ্র তিলকরূপে এখনো জ্বলজ্বল করছে।

তৃতীয় অধ্যায়

ইসলামের সোনালী যুগ

প্রথম পরিচ্ছেদ

মুসলিম উম্মাহর নেতৃত্বের যুগ

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

মুসলিম জীবনে পতনের সূচনা

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

উছমানী খেলাফতের যুগ

প্রথম পরিচ্ছেদ

মুসলিম উম্মাহর নেতৃত্বের যুগ

মুসলিম শাসকদের বৈশিষ্ট্য

উপরে বর্ণিত সকল গুণ ও বৈশিষ্ট্য নিয়ে জীবনের বিস্তৃত অঙ্গনে মুসলিম উম্মাহ যখন আত্মপ্রকাশ করলো তখন স্বাভাবিকভাবেই বিশ্বের শাসন ও নেতৃত্বের ভার তাদেরই হাতে অর্পিত হলো এবং জরাগ্রস্ত জাতিসমূহ নেতৃত্বের আসন থেকে অপসারিত হলো। কারণ তারা শক্তি ও ক্ষমতার অপব্যবহার করেছিলো এবং নেতৃত্ব ও কর্তৃত্বকে অনাচার-পাপাচার, যুলুম-অত্যাচার ও শোষণ-স্বেচ্ছাচারের বাহন বানিয়েছিলো। আর জাতি ও সভ্যতার ইতিহাসের শুরু থেকেই আসমানের বিধান হলো, জরাগ্রস্ত জাতিকে নেতৃত্বের আসন থেকে ছুঁড়ে ফেলা এবং উদীয়মান জাতিকে তাদের স্থলবর্তী করা।

তো আসমানী বিধানের শাশ্বত ধারায় মুসলিম উম্মাহ যখন বিশ্বনেতৃত্বের আসনে সমাসীন হলো তখন মানবজাতিকে সে ন্যায় ও সত্যের পথে সঠিক ও ভারসাম্য -পূর্ণ গতিতে পরিচালিত করলো। আর উম্মাহর জন্য তা সহজেই সম্ভব হয়েছিলো। কারণ ঐসব গুণ ও বৈশিষ্ট্য তাদের স্বভাব-চরিত্রে তখন পরিপূর্ণরূপে বিকশিত ছিলো, যা কোন জাতিকে বিশ্বনেতৃত্বের যোগ্যতা দান করে এবং যাদের পরিচালনা ও ছত্রচ্ছায়ায় বিশ্বের সুখ-শান্তি, সফলতা ও সৌভাগ্য সুনিশ্চিত হয়। কী ছিলো সেই গুণ ও যোগ্যতা?

প্রথমত তারা ছিলো আসমানী কিতাব ও আসমানী শরীয়াতের অধিকারী। তাই তাদের নিজেদের আইন ও বিধান তৈরী করার প্রশ্ন ছিলো না। ফলে চলমান অভিজ্ঞতা ও পরিস্থিতির তাগিদে আইন ও বিধানের অব্যাহত রদবদল এবং

অনিবার্য ভ্রান্তি, বিচ্যুতি ও বিপর্যয় থেকে তারা নিরাপদ ছিলো, যা মানবরচিত যে কোন আইনের অবধারিত দোষ ও দুর্বলতা। তারা তাদের আচরণ-বিচরণ ও শাসন-প্রশাসনের ক্ষেত্রে অন্ধকারে অন্ধ পথিকের মত ছিলো না। তাদের কাছে ছিলো আল্লাহপ্রদত্ত সেই চিরসমুজ্জ্বল আলো, যা জীবনের সকল পথ ও পথের বাঁক আলোকিত করে রেখেছিলো। ফলে তাদের প্রতিটি পদক্ষেপ ছিলো আলোর সাহায্যে আলোরই মধ্যে। তাদের চলার পথ যেমন ছিলো উদ্ভাসিত তেমনি গন্তব্য ছিলো সুস্পষ্ট। আলকোরআনের ভাষায়–

أَوَمَن كَانَ مَيْتًا فَأَحْيَيْنَٰهُ وَجَعَلْنَا لَهُۥ نُورًا يَمْشِى بِهِۦ فِى ٱلنَّاسِ كَمَن مَّثَلُهُۥ فِى ٱلظُّلُمَٰتِ لَيْسَ بِخَارِجٍ مِّنْهَا

'যারা মৃত ছিলো, অনন্তর আমি তাদের জীবন দান করেছি এবং তাদের জন্য নির্ধারণ করেছি নূর, যার সাহায্যে তারা বিচরণ করে মানুষের মাঝে, তারা কি হতে পারে ঐ ব্যক্তির মত যে নিমজ্জিত বিভিন্ন অন্ধকারে, যা থেকে সে বের হতে পারে না!' (আন'আম, ৬ : ১২২)

মানুষকে শাসন এবং মানুষের মাঝে সুবিচার করার জন্য তাদের কাছে ছিলো আসমানী শরীয়াত ও জীবনবিধান। আল্লাহ তাদেরকে বানিয়েছিলেন হক ও ইনছাফের ধারক এবং ন্যায় ও সত্যের বাহক। তাই চরম ক্রোধ ও অসন্তোষের মুহূর্তে এবং শত্রুতা ও বিদ্বেষের চূড়ান্ত মানবীয় দুর্বলতার সময়ও ন্যায় ও সুবিচার থেকে তারা তিলপরিমাণ বিচ্যুত হতো না এবং প্রতিশোধের পাশবিকতায় গা ভাসিয়ে দিতো না। তাদের প্রতি আল্লাহর নির্দেশ ছিলো এবং সে নির্দেশ তারা অক্ষরে অক্ষরে পালনও করতো–

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ كُونُوا۟ قَوَّٰمِينَ لِلَّهِ شُهَدَآءَ بِٱلْقِسْطِ ۖ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَـَٔانُ قَوْمٍ عَلَىٰٓ أَلَّا تَعْدِلُوا۟ ۚ ٱعْدِلُوا۟ هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ ۖ وَٱتَّقُوا۟ ٱللَّهَ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ خَبِيرٌۢ بِمَا تَعْمَلُونَ ﴿٨﴾

'হে ঈমানদারগণ! তোমরা আল্লাহর প্রতি অবিচল থাকো (এবং) ন্যায়পরতার সাথে সাক্ষ্যদানকারী হও। আর কোন দলের প্রতি শত্রুতা যেন ইনছাফ না করার

অপরাধে তোমাদের লিপ্ত না করে। (বরং) তোমরা ইনছাফ করো। (কারণ) সেটাই হলো তাকওয়া (ও আল্লাহভীতির) অধিকতর নিকটবর্তী। আর তোমরা আল্লাহকে ভয় করো। নিঃসন্দেহে আল্লাহ তা'আলা তোমাদের কৃতকর্ম সম্পর্কে সম্যক অবগত। (আল-মাইদাহ, ৫ : ৮)

দ্বিতীয়ত তারা শাসন ও নেতৃত্বের গুরুভার গ্রহণ করেছিলো নৈতিক ও আধ্যাত্মিক তারবিয়াত ও সংশোধনের মাধ্যমে যথাযথ যোগ্যতা অর্জন করার পর। পক্ষান্তরে অন্যান্য জাতি ক্ষমতা ও শাসনক্ষমতা কুক্ষিগত করেছিলো নৈতিক ও চারিত্রিক এবং আত্মিক ও আধ্যাত্মিক কোন রকম তারবিয়াত ও সংশোধন ছাড়া। ফলে ন্যায় ও কল্যাণের উৎস হওয়ার পরিবর্তে পৃথিবীর জন্য তারা হয়ে পড়েছিলো মন্দ ও অকল্যাণ এবং অনাচার ও দুষ্কৃতির প্রজননক্ষেত্র। এটা অতীতের সমাজ-পতি, সেনাপতি, 'রাষ্ট্রপতি' ও শাসক-প্রশাসকদের ক্ষেত্রে যেমন সত্য ছিলো, তেমনি সত্য বর্তমানের ক্ষেত্রেও। কিন্তু ছাহাবা কেরামের বিষয়টি ছিলো সম্পূর্ণ ভিন্ন। তাঁরা দীর্ঘ একটা সময় ছিলেন আল্লাহর নবী মুহম্মদ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হাকীমানা তারবিয়াত ও প্রজ্ঞাপূর্ণ তত্ত্বাবধানে। তিনি তাঁদের শিক্ষা দিয়েছেন, তাঁদের নাফসের তাযকিয়া এবং হৃদয় ও আত্মার সংশোধন করেছেন এবং নির্মোহতা, ধার্মিকতা, নৈতিক পবিত্রতা, সততা, সত্যবাদিতা, আত্মত্যাগ ও আল্লাহভীতির উপর তাদের গড়ে তুলেছেন এবং ক্ষমতার লোভ ও নেতৃত্বের মোহ তাদের অন্তর থেকে বিলুপ্ত করেছেন। তিনি বলতেন–

إنا والله لانولي على هذا العمل أحدا سأله، ولا أحدا حرص عليه

আল্লাহর কসম, এই শাসনক্ষমতা আমি এমন কাউকে দেবো না যে দাবী করে, বা লোভ করে।[১]

আলকোরআনের এ আয়াত বারবার তাঁদের কানে পড়েছে এবং হৃদয়ের গভীরে এর মর্মবাণী বদ্ধমূল হয়েছে–

تِلْكَ ٱلدَّارُ ٱلْءَاخِرَةُ نَجْعَلُهَا لِلَّذِينَ لَا يُرِيدُونَ عُلُوًّا فِى ٱلْأَرْضِ وَلَا فَسَادًا ۚ وَٱلْعَٰقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ ﴿٨٣﴾

[১] বুখারী, কিতাবুল আহকাম, আবু মূসা আশ'আরী রা. হতে, হাদীছ নম্বর, ৬৬১৬, মুসলিম, কিতাবুল ইমারাহ, হাদীছ নম্বর, ৩৪০২

ঐ আখেরাত আমি তাদেরই জন্য নির্ধারণ করবো যারা যমিনে বড়ত্ব অর্জন করতে চায় না এবং ছড়াতে চায় না ফাসাদ। আর সুপরিণতি রয়েছে মুত্তাকীদের জন্য। (কাছাছ, ২৮ : ৮৩)

এই বরকতপূর্ণ নববী তারবিয়াতের ফল হলো এই যে, পদ ও সম্পদ এবং ক্ষমতা ও নেতৃত্বের মোহ তাদের অন্তর থেকে একেবারে মুছে গেলো, এমনকি তার চিহ্নমাত্র বাকি ছিলো না, মানুষ যেমন এগুলোর মোহে ছুটে যায় আগুনের দিকে পতঙ্গের মত, তাঁরা ছিলেন এর সম্পূর্ণ বিপরীত। তাঁরা বরং অন্যকে এগিয়ে দিয়ে নিজেরা পিছিয়ে থাকতেন এবং সভয়ে তা এড়িয়ে যেতে চাইতেন, নিজে প্রার্থী হওয়া এবং দৌড়ঝাঁপ ও চেষ্টা-তদবীর করা তো দূরের কথা। অনন্যোপায় হয়ে কখনো কোন পদ বা ক্ষমতা গ্রহণ করলে সেটাকে তারা দুধেল গাভী ও গাছপাকা ফল ভাবতেন না, বরং অর্পিত কঠিন আমানত এবং আল্লাহর পক্ষ হতে বিরাট পরীক্ষা মনে করতেন। তারা বিশ্বাস করতেন, এজন্য একদিন আল্লাহর সামনে তাদের দাঁড়াতে হবে এবং ছোট-বড় সব বিষয়ের পুঙ্খানুপুঙ্খ হিসাব দিতে হবে। পরিবার, সমাজ ও রাষ্ট্রের শাসক ও বিচারক হিসাবে এ আয়াত সবসময় ছিলো তাঁদের সামনে, তাঁদের চিন্তায় চেতনায়–

إِنَّ ٱللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تُؤَدُّوا ٱلْأَمَـٰنَـٰتِ إِلَىٰٓ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُم بَيْنَ ٱلنَّاسِ أَن تَحْكُمُوا

بِٱلْعَدْلِ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُم بِهِۦٓ ۗ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ سَمِيعًۢا بَصِيرًا ﴿٥٨﴾

অবশ্যই আল্লাহ তোমাদের আদেশ করছেন যেন তোমরা আমানতসমূহ সেগুলোর হকদারদের কাছে পৌঁছে দাও। আর যখন তোমরা মানুষের মধ্যে বিচার করো, যেন ইনছাফের সঙ্গে বিচার করো। (নিসা, ৪ : ৫৮)

যখনই তাঁরা যা বলতেন এবং যা করতেন, আলকোরআনের এ আয়াত স্মরণ রেখে করতেন–

وَهُوَ ٱلَّذِى جَعَلَكُمْ خَلَـٰٓئِفَ ٱلْأَرْضِ وَرَفَعَ بَعْضَكُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَـٰتٍ لِّيَبْلُوَكُمْ فِى مَآ

ءَاتَىٰكُمْ ۗ إِنَّ رَبَّكَ سَرِيعُ ٱلْعِقَابِ وَإِنَّهُۥ لَغَفُورٌ رَّحِيمٌۢ ﴿١٦٥﴾

তিনিই ঐ সত্তা যিনি তোমাদেরকে পৃথিবীতে 'স্থলবর্তী' বানিয়েছেন এবং তোমাদের কাউকে কারো উপর বিভিন্ন মর্যাদা দান করেছেন, যাতে তিনি

তোমাদের পরীক্ষা করেন ঐ সকল বিষয়ে যা তিনি তোমাদের দান করেছেন। নিঃসন্দেহে তোমার প্রতিপালক দ্রুত শাস্তিদানকারী, আর অতিঅবশ্যই তিনি পরম ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু। (আন'আম, ৬ : ১৬৫)

তৃতীয়ত তাঁরা বিশেষ কোন শ্রেণী ও গোষ্ঠী এবং বিশেষ কোন দেশ ও অঞ্চলের সেবক বা প্রতিনিধি ছিলেন না, যারা শুধু ঐ শ্রেণী ও গোষ্ঠীর কল্যাণচিন্তা করবে এবং শুধু ঐ দেশ বা অঞ্চলের স্বার্থ রক্ষা করবে; কিংবা বিশেষ কোন সম্প্রদায় বা দেশের শ্রেষ্ঠত্বে বিশ্বাস করবে।

কখনো তাঁরা এমন ধারণা দ্বারা আক্রান্ত হননি যে, শাসক হওয়ার জন্য তাদের সৃষ্টি, আর অন্যান্য জনগোষ্ঠীর সৃষ্টি শাসিত বা শোষিত হওয়ার জন্য। তাঁরা জানতেন, বিশ্বমঞ্চে তাদের আবির্ভাব এজন্য নয় যে, তাঁরা আরবসাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা করবেন এবং তার ছত্রচ্ছায়ায় ভোগ-উপভোগ ও স্বেচ্ছাচার চালিয়ে যাবেন, আর পৃথিবীতে আরব-রক্তের গর্ব ও দম্ভ প্রচার করে বেড়াবেন। ইসলামের ঝাণ্ডা নিয়ে তাঁদের দেশ-মহাদেশের অভিযান এজন্য নয় যে, মানবসম্প্রদায়কে রোম ও পারস্যের দাসত্ব থেকে বের করে আরবদের গোলামির জিঞ্জিরে আবদ্ধ করবেন। না, তাঁদের অভিযান তো ছিলো মানবকে মানবের দাসত্ব থেকে বের করে এক আল্লাহর ইবাদতে নিয়োজিত করার জন্য। যেমন ইরানের রাজদরবারে মুসলিম দূত হযরত রাবঈ বিন আমির বলেছিলেন–

الله ابتعثنا لنخرج من شاء من عبادة العباد إلى عبادة الله وحده، ومن ضيق الدنيا إلى سعتها،

ومن جور الأديان إلى عدل الإسلام

'আল্লাহ আমাদের প্রেরণ করেছেন যেন মানুষকে বের করে আনি বান্দার বান্দেগি থেকে এক আল্লাহর বান্দেগির দিকে এবং দুনিয়ার সঙ্কীর্ণতা থেকে আখেরাতের প্রশস্ততার দিকে এবং সব ধর্মের অনাচার থেকে ইসলামের সুবিচারের দিকে।'[১]

তাঁদের দৃষ্টিতে দেশ-ভাষা-বর্ণ নির্বিশেষে সমস্ত মানুষ অভিন্ন এক জাতি। কারণ নবীর ছোহবত থেকে তাঁরা শিক্ষা পেয়েছেন, সমগ্র মানবজাতি দু'টি একত্বের বন্ধনে আবদ্ধ, রব্ ও আব্-এর একত্ববন্ধন। অর্থাৎ সাদা-কালো, আরব-আজম সবার রব্ ও প্রতিপালক এক আল্লাহ এবং সবার আব্ ও পিতা এক আদম। নবীর পাক যবানে শুনে শুনে এ সত্য তারা আত্মস্থ করেছেন–

---

১ البداية والنهاية لابن كثير

الناس كلهم من آدم، وآدم من تراب، لافضل لعربي على عجمي، ولا لعجمي على عربي إلا بالتقوى!

মানুষে মানুষে কোন ভেদ নেই, সকলে সমান, সকলে আদমসন্তান, আর আদম হলেন মাটির তৈরী। আরবের কোন শ্রেষ্ঠত্ব নেই আজমের উপর এবং আজমের কোন কৌলীন্য নেই আরবের উপর, তবে তাকওয়ার ভিত্তিতে।[১]

মানবসভ্যতার সুদীর্ঘ ইতিহাসে এটাই ছিলো সবচে' বড় মর্মান্তিকতা। একারণেই স্বয়ং আলকোরআনও 'খায়রে উম্মত'কে এভাবে তারবিয়াত করেছে–

يَٰٓأَيُّهَا ٱلنَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَٰكُم مِّن ذَكَرٍ وَأُنثَىٰ وَجَعَلْنَٰكُمْ شُعُوبًا وَقَبَآئِلَ لِتَعَارَفُوٓا۟ ۚ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ ٱللَّهِ أَتْقَىٰكُمْ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ ۝١٣

হে লোকসকল! নিশ্চয় তোমাদের আমি সৃষ্টি করেছি একজন নর ও একজন নারী হতে এবং তোমাদের ভাগ করেছি বিভিন্ন জাতি ও গোত্রে, যাতে তোমরা পরস্পর পরিচিত হতে পারো। নিঃসন্দেহে আল্লাহর নিকট তোমাদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ সম্মানী সে-ই যে তোমাদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ মোত্তাকী। নিঃসন্দেহে আল্লাহ সর্বজ্ঞ, সর্ববিষয়ে অবগত। (আলহুজুরাত, ৪৯ : ১৩)

এভাবেই তাঁরা গড়ে উঠেছিলেন আলকোরআনের অঙ্গনে রহমতের নবীর তারবিয়াতের ছায়ায়। বস্তুত মুসলিম উম্মাহর সমগ্র ইতিহাসই মানবসাম্য ও মানবভ্রাতৃত্বের ইতিহাস। তবে এখানে আমি শুধু শোনাবো সোনালী যুগের সেই অনন্য ঘটনা, ইতিহাস যা আজো সংরক্ষণ করে রেখেছে। মিসরের শাসক হযরত আমর ইবনুল আছ (রা)-এর এক পুত্র কোন এক ঘটনায় জনৈক মিসরীয় কিবতীকে চাবুক মেরেছিলো বংশকৌলীন্যের গর্ব করে একথা বলে– নাও, কুলীন ও অভিজাতবর্গের সন্তানের পক্ষ হতে চাবুকের স্বাদ গ্রহণ করো।

ফরিয়াদ নিয়ে সেই কিবতী মিসর থেকে সোজা মদীনায় খলীফাতুল মুসলিমীন ওমর ইবনুল খাত্তাব (রা)-এর দরবারে হাযির। তিনি শুনলেন এবং কিছাছের হুকুম দিয়ে বললেন–

---

[১] من خطبة النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع، وقد تلا صلى الله عليه وسلم بعد هذا القول هذه الآية : يايها الناس إنا خلقنكم من ذكر وأنثى

متى استعبدتم الناس وقد ولدتهم أمهاتهم أحرارا؟!

কবে থেকে মানুষকে তোমরা গোলাম বানাতে শুরু করলে, অথচ মায়েরা তাদের স্বাধীন অবস্থায় জন্ম দিয়েছে?[১]

তো এই মহান ব্যক্তিগণ, তাঁদের নিকট দ্বীন ও ইলমের যে সম্পদ ছিলো তা বিতরণের ক্ষেত্রে কোন কৃপণতা করেননি এবং দেশ, ভাষা, বর্ণ ও বংশের কোন পার্থক্য করেননি, তেমনি শাসনপরিচালনার ক্ষেত্রেও মানুষে মানুষে তাদের কাছে কোন ফরক-তমিয ছিলো না। মানবজাতির জন্য তারা যেন ছিলেন সেই 'করুণাবৃষ্টি' যা সর্বত্র বর্ষিত হয় এবং সর্বজনে সিক্ত করে। যে মেঘ-বৃষ্টিকে পৃথিবীর প্রতিটি ভূখণ্ড স্বাগত জানায় এবং স্ব স্ব যোগ্যতা অনুসারে তা থেকে কল্যাণ ও উর্বরতা গ্রহণ করে। এই সকল 'মেঘমানবের' শীতল ছায়ায় এবং তাদের কল্যাণশাসনের ছত্রচ্ছায়ায় পৃথিবীর সকল জাতি ও জনগোষ্ঠী, এমনকি প্রাচীন কাল থেকে যারা শুধু যুলুম-নির্যাতনের শিকার হয়ে এসেছে, তারা সকলে 'আত্মনির্মাণ' ও বিশ্বের বিনির্মাণের মহান কর্মযজ্ঞে শরীকদার হতে পেরেছিলো। ইলমচর্চা ও জ্ঞান-সাধনা এবং ধর্ম-কর্ম ও শাসন-পরিচালনা, সবকিছুতে তারা আরবদের সমান অংশীদার হতে পেরেছিলো, বরং কোন কোন গুণ ও বৈশিষ্ট্যে এবং প্রতিভা ও যোগ্যতায় অনেকে আরবদেরও ছাড়িয়ে গিয়েছিলো এবং আরবরা তাদের সাদরে বরণ করে নিয়েছিলো। তাদের মধ্য হতে এমন এমন ইমাম, ফকীহ, মুহাদ্দিছ ও মুফাস্‌সির আত্মপ্রকাশ করেছেন যারা ছিলেন আরবদেরও মাথার মুকুট এবং সমগ্র মুসলিম উম্মাহর গর্ব ও গৌরবের পাত্র। এমনকি ইবনে খালদূনের মতে–

'বিস্ময়কর বাস্তবতা এই যে, ইসলামী উম্মাহর ইলমের ধারক ও জ্ঞানসাধকদের অধিকাংশই হলেন আজমী, অনারব; আর তা দ্বীন ও শরীয়াতের ইলম এবং যুক্তি ও বুদ্ধিবৃত্তিক জ্ঞান উভয় ক্ষেত্রেই। এর ব্যতিক্রম খুবই বিরল। এমনকি কেউ কেউ নসব ও বংশপরিচয়ে আরব হলেও ভাষায় অনারব, অন্তত শিক্ষাদীক্ষায় এবং শিক্ষকসূত্রে অনারব। (অর্থাৎ আরব হয়েও জ্ঞান ও শিক্ষা-দীক্ষা তারা গ্রহণ করেছেন অনারব শায়খ থেকে।) অথচ মিল্লাত ও মাযহাব ছিলো আরবীয় এবং শরীয়তের বাহক ছিলেন আরব।[২]

---

[১] ঘটনাটি বিস্তারিতভাবে রয়েছে ইবনুল জাওযীকৃত تاريخ عمر بن الخطاب কিতাবে

[২] ইবনে খালদুনের আল-মুকাদ্দিমা, পৃ. ৪৯৯

পরবর্তী শতাব্দীগুলোতেও অনারব মুসলিম জনগোষ্ঠীতে এমন এমন শাসক ও প্রশাসক, সিপাহি ও সিপাহসালার, উযির ও নাযিম, জ্ঞানী-গুণী ও বিদগ্ধজন এবং আলিম-ওলামা ও আইম্মা-মাশায়েখের আবির্ভাব ঘটেছে, সত্যিকার অর্থেই যারা ছিলেন মানবতার অলঙ্কার এবং মানবজাতির ভূষণ। জ্ঞানে গুণে, ভদ্রতা ও আভিজাত্যে, ধার্মিকতা ও নৈতিকতায় এবং যোগ্যতা ও প্রতিভায় তাঁরা ছিলেন উজ্জ্বলতম একেকটি নক্ষত্র, আর তাঁদের সঠিক সংখ্যা আল্লাহ্ ছাড়া কেউ জানে না।

চতুর্থত মানুষ হচ্ছে দেহ ও আত্মা, হৃদয় ও বুদ্ধি এবং আবেগ ও রক্তের সমন্বিত অস্তিত্ব। সুতরাং মানুষ প্রকৃত সুখ-শান্তি ও সৌভাগ্য এবং জীবনের সফলতা ও সার্থকতা ততক্ষণ অর্জন করতে পারে না এবং মানবজাতি ও মানবতা ততক্ষণ ভারসাম্যপূর্ণ উন্নতি ও সমৃদ্ধি লাভ করতে পারে না যতক্ষণ না মানুষের এ সকল গুণ ও বৈশিষ্ট্য এবং শক্তি ও যোগ্যতা সুসমন্বিতরূপে এবং যথাযথভাবে বিকশিত ও প্রতিপালিত হবে।

পৃথিবীতে একটি আদর্শ ও কল্যাণকর সভ্যতার অস্তিত্ব ততক্ষণ কল্পনা করা সম্ভব নয় যতক্ষণ না এমন একটি ধর্মীয়, নৈতিক, বুদ্ধি-বৃত্তিক ও বৈষয়িক পরিবেশ সৃষ্টি করা হবে যেখানে সহজে ও স্বতঃস্ফূর্তভাবে যে কারো পক্ষে মানবীয় পূর্ণতার শিখরে আরোহণ করা সম্ভব। আর সভ্যতার পথে মানবজাতির সুদীর্ঘ প্রয়াস-প্রচেষ্টা এবং অর্জিত অভিজ্ঞতা এটা সন্দেহাতীতরূপে প্রমাণ করেছে যে, আদর্শ সভ্যতার এ সুন্দর স্বপ্নের বাস্তবায়ন কখনোই সম্ভব নয়, যদি না জীবনের নিয়ন্ত্রণ এবং সভ্যতার গতিনির্ধারণের ক্ষমতা এমন লোকদের হাতে থাকে যারা আত্মা ও জড়তা এবং হৃদয় ও বুদ্ধির অবিচ্ছেদ্যতায় বিশ্বাস রাখে, যারা যুগপৎ ধর্মীয়, নৈতিক ও জাগতিক জীবনের আদর্শ উদাহরণ হতে পারে এবং যারা সুস্থ বুদ্ধি, জাগ্রত বিবেক এবং কল্যাণকর জ্ঞানের অধিকারী। সুতরাং যদি তাদের শিক্ষা-দীক্ষায়, আকীদা-বিশ্বাসে এবং তারবিয়াত ও প্রতিপালনে কোন ত্রুটি থেকে যায় তাহলে অবধারিতভাবেই সে ত্রুটি তাদের হাতে গড়ে ওঠা সভ্যতায়ও সংক্রমিত হবে, হতে বাধ্য এবং তার প্রতিক্রিয়া বিভিন্নরূপে ও বিচিত্রভাবে প্রকট হয়ে দেখা দেবে।

এভাবে যদি সভ্যতার পথযাত্রায় এমন মানবগোষ্ঠীর আধিপত্য ও নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠিত হয়, যারা শুধু বস্তুর পূজায় বিশ্বাসী এবং শুধু স্থূল ভোগ-বিলাস ও জাগতিক লাভলোকসানের চিন্তায় বিভোর; যারা দৃশ্যমান জীবন ও জগত ছাড়া

ঊর্ধ্বজাগতিক অন্য কিছুতে বিশ্বাসী নয়; যারা মনে করে, ভোগ-উপভোগের এই জড়জীবনের পর মানুষ মাটির নীচে মিশে যাবে এবং সবকিছু অস্তিত্বহীন হয়ে যাবে, তো তাদের স্বভাব, মন-মানস ও চিন্তাচেতনার প্রভাব অবধারিতভাবেই সভ্যতার আকৃতি ও প্রকৃতিতে পড়বে। তারপর সেই ছাঁচেই তা গড়ে ওঠবে ও বিকশিত হবে। ফলে মানবতার কিছু কিছু দিক যেমন পূর্ণতা লাভ করবে তেমনি কিছু কিছু দিক বিনষ্ট হবে।

এমন সভ্যতা হয়ত ইট-পাথরে, লোহা-তামায়, কাগজে-বস্ত্রে ও সোনায়-মুদ্রায় উন্নতির শিখরে পৌঁছে যাবে এবং বিজ্ঞানে, প্রযুক্তিতে, সমরকৌশলে ও যুদ্ধাস্ত্রে সময় থেকেও এগিয়ে যাবে এবং আনন্দ-বিনোদন ও পাপাচারের রূপবৈচিত্র্যে কল্পনাকেও হার মানাবে, কিন্তু কলব ও রূহ এবং হৃদয় ও আত্মার জগত পরিণত হবে উষরমরুতে। মানুষে মানুষে সম্পর্কের ক্ষেত্রে তারা হয়ে পড়বে বিপর্যস্ত। স্বামী-স্ত্রী, পিতা-মাতা ও সন্তান এবং ভাই-বোন ও বন্ধুর সম্পর্ক ছিন্ন হয়ে যাবে সুবিধা ও স্বার্থের টানে। এককথায় সেই সভ্যতা পরিণত হবে এমন ফোলা-ফাঁপা দেহে যা দেখতে হবে আকর্ষণীয়, কিন্তু স্বাস্থ্য ও সুস্থতা থেকে বঞ্চিত এবং তার হৃদয় ও আত্মা হবে ব্যথা-বেদনায় জর্জরিত।

পক্ষান্তরে সভ্যতার চালকের আসনে বসা সেই মানবগোষ্ঠী যদি জড় ও বস্তুকে অস্বীকার বা অবহেলা করে এবং শুধু হৃদয়, আত্মা ও ঊর্ধ্বজাগতিক বিষয়কেই গুরুত্ব প্রদান করে এবং জীবন ও জীবনের স্বাভাবিক চাহিদার প্রতি বীতশ্রদ্ধ হয় তাহলে পরিণাম কী হবে?

সভ্যতার বৃক্ষ সজীবতা হারিয়ে শুকিয়ে যাবে। মানুষের ভিতরের স্বভাবশক্তি ও সহজাত যোগ্যতা দুর্বল হয়ে ঝিমিয়ে পড়বে এবং স্বভাব ও প্রকৃতির সঙ্গে সাংঘর্ষিক এই নেতৃত্বের প্রভাবে মানুষ জীবনের আলোকিত মঞ্চ থেকে পালিয়ে আশ্রয় নেবে অরণ্যে, প্রান্তরে, পর্বতে ও গুহার অন্ধকার নির্জনতায়। বিবাহ ও পারিবারিক জীবনের পরিবর্তে তারা বরণ করবে কৌমার্যের ব্রত ও সাধনা এবং সেটাকেই মনে করবে মোক্ষ লাভের স্বর্ণদ্বার। আত্মাকে পবিত্র করার জন্য দেহের উপর তারা চালাবে এমন আত্মনির্যাতন যে, দেহের সব ক্ষমতা ও সক্ষমতা বিধ্বস্ত হয়ে যাবে। এককথায় জীবনকে হরণ করে তারা মৃত্যুকে বরণ করে নেবে, যাতে তারা পৌঁছে যেতে পারে নোংরা জড়জগত থেকে আত্মার পূতপবিত্র জগতে, যেখানে ঘটবে তাদের প্রকৃত শক্তির পরিপূর্ণ বিকাশ। কারণ তাদের তো বিশ্বাস, জড়জগতের স্থূলতায় মানবশক্তির পূর্ণতা অর্জন সম্ভব নয়।

এ আত্মঘাতী চিন্তা-চেতনার ফল এছাড়া আর কী হতে পারে যে, সভ্যতার অপমৃত্যু ঘটবে, নগর-শহর বিপর্যস্ত হবে এবং পুরো জীবনব্যবস্থা বিক্ষিপ্ত হয়ে যাবে!

যেহেতু এটা মানবের স্বভাব ও ফিতরতের সাথে সঙ্ঘর্ষপূর্ণ চিন্তাধারা সেহেতু তা গ্রহণযোগ্য হওয়া কিছুতেই সম্ভব নয়, বরং তার বিরুদ্ধে বিদ্রোহের উত্থান হবে অবশ্যম্ভাবী। মানুষের বাইরের জড়সত্তা ও ভিতরের পাশবিকতা একসঙ্গে এমনই প্রতিশোধপরায়ণ হয়ে ওঠবে যে, নীতি ও নৈতিকতা এবং আত্মা ও আধ্যাত্মিকতার প্রতি কোন দয়া-মায়া ও কোমলতার অবকাশ থাকবে না। এককথায় মানবতার ঘটবে অপমৃত্যু এবং পাশবিকতা ও হিংস্রতার হবে জয়জয়কার। কিংবা খুব কম করে যদি হয় তাহলে সন্ন্যাসপ্রবণ এই গোষ্ঠীর উপর জড়বাদী একটি শক্তিশালী গোষ্ঠী এমনভাবে ঝাঁপিয়ে পড়বে যে, প্রকৃতিগত দুর্বলতার কারণেই তারা তা প্রতিরোধ করতে ব্যর্থ হবে এবং পরাজয় মেনে অসহায়ভাবে আত্মসমর্পণ করবে, অথবা জীবন ও জগতের সমস্যার প্রতিকার করতে গিয়ে কঠিন পরিস্থিতির সম্মুখীন হয়ে সে নিজেই আগবাড়িয়ে জড়বাদী শক্তির সঙ্গে সমঝোতা করতে চাইবে। সমাজ ও রাষ্ট্র পরিচালনা এবং রাজনীতি ও অর্থনীতির দায়দায়িত্ব তাদের হাতে ছেড়ে দিয়ে নিজেদের তারা গুটিয়ে নেবে প্রথাগত ধর্মকর্ম ও আচার-অনুষ্ঠানের ক্ষুদ্র বৃত্তে।

এভাবে জীবন ও ধর্ম এবং দ্বীন ও যিন্দেগির বিচ্ছিন্নতা সামনে আসবে। নৈতিকতা ও আধ্যাত্মিকতা ধীরে ধীরে দুর্বল হয়ে পড়বে এবং জীবন থেকে তার ছায়া ক্রমে সঙ্কুচিত হতে থাকবে, আর মানবসমাজে ও ব্যবহারিক জীবনে তার নিয়ন্ত্রণ একেবারে শিথিল হয়ে পড়বে। একসময় এগুলো হয়ে যাবে ভাবনা ও কল্পনার বিষয়, যা জীবনের অঙ্গন থেকে নির্বাসিত হয়ে আশ্রয় নেবে দর্শন ও মতবাদ হিসাবে বুদ্ধিজীবীদের গবেষণাপত্রে। পৃথিবীর যেসব জাতি ও জনগোষ্ঠী মানবজাতি ও মানবসভ্যতার নেতৃত্ব দান করেছে তাদের মধ্যে খুব কমই এমন ছিলো যারা প্রান্তিকতার এ ভয়ানক দোষ ও বিচ্যুতি থেকে মুক্ত ছিলো। হয় তারা ছিলো ভোগবিলাসে মত্ত আগাগোড়া জড়বাদের পূজারী, কিংবা জীবন ও তার চাহিদার প্রতি বীতশ্রদ্ধ নিছক আত্মার পূজারী ও সন্ন্যাসবাদী। একারণেই জীবন ও সভ্যতার তরী সবসময় ছিলো দোলায়মান। কখনো তা কাত হয়ে পড়তো জড়বাদের দিকে, কখনো সন্ন্যাসবাদের দিকে। সর্বাঙ্গীণতা ও ভারসাম্যপূর্ণতা বলতে গেলে ছিলো না কোথাও কখনো।

পক্ষান্তরে ছাহাবা কেরামের বৈশিষ্ট্য ছিলো এই যে, তাঁরা ধার্মিকতা ও নৈতিকতা, নির্মোহতা ও জীবনবাদিতা, বস্তুশক্তি ও আত্মিক শক্তি এবং নীতি ও রাজনীতির মধ্যে অপূর্ব সমন্বয় সাধন করেছিলেন। সভ্যতার জন্য অপরিহার্য সমস্ত দিক তাঁদের মধ্যে পূর্ণরূপে বিদ্যমান ছিলো এবং মানবতার যেসমস্ত গুণ বিলুপ্ত হয়ে গিয়েছিলো, কিংবা বিক্ষিপ্তভাবে বিভিন্ন জাতির মধ্যে ছিলো সেগুলোর একত্র সমাবেশ ঘটেছিলো তাঁদের জীবনে।

সমগ্র মানবজাতির মধ্যে তাঁরাই ছিলেন একমাত্র জনগোষ্ঠী যারা নৈতিকতা ও আধ্যাত্মিকতার সর্বোচ্চ স্তরে যেমন ছিলেন তেমনি দেহ ও আত্মার স্বাভাবিক চাহিদার মধ্যে এমন সুন্দর ভারসাম্য এবং সমকালীন জীবনের সর্বক্ষেত্রে এমন বিস্ময়কর সর্বাঙ্গীণতা অর্জন করেছিলেন যার দৃষ্টান্ত কোন জাতির ইতিহাসে খুব কমই পাওয়া যায়। তদুপরি তাঁদের ছিলো পরিপূর্ণ জাগতিক ও বস্তুগত প্রস্তুতি এবং জ্ঞান ও বুদ্ধির অনন্যসাধারণ ব্যাপ্তি– এসবের কল্যাণে একমাত্র তাঁদে পক্ষেই সম্ভব ছিলো মানবতা ও মানব-সভ্যতাকে সফলতা, সার্থকতা, সৌভাগ্যের পথ দেখানো এবং আত্মিক, নৈতিক ও জড়জাগতিক লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যের চূড়ান্ত স্তরে পৌঁছে দেয়া।

খেলাফাতে রাশেদাই হলো সর্বোত্তম আদর্শ

নবুয়তে মুহম্মদীর মাধ্যমে মানবজাতির সেই স্বপ্ন ও প্রত্যাশাই পূর্ণ হলো। আসমানী তত্ত্বাবধানে এবং নববী তারবিয়াত ও প্রতিপালনে ছাহাবা কেরামের এক আদর্শ জামা'আত তৈরী হলো। খেলাফাতে রাশেদার মাধ্যমে মানবজাতি ধর্ম, কর্ম, চরিত্র ও নৈতিকতা এবং প্রজ্ঞা, প্রতিভা ও যোগ্যতার সুসমন্বয়ে এমন এক সুন্দর, সুপরিণত ও সুসমৃদ্ধ সমাজ, সভ্যতা ও শাসনব্যবস্থা লাভ করলো, যার ন্যূনতম তুলনা মানব-ইতিহাসের কোন অধ্যায়ে আমরা দেখতে পাই না। এককথায়, আদর্শ মানব তৈরী এবং আদর্শ সভ্যতা গড়ে তোলার ক্ষেত্রে আধ্যাত্মিক, জাগতিক, নৈতিক ও বুদ্ধিবৃত্তিক এবং জ্ঞান ও ধর্মীয় শক্তিগুলো সেখানে পরস্পর সহায়করূপে পূর্ণ সক্রিয় ছিলো। সেটা ছিলো তদানীন্তন বিশ্বের শ্রেষ্ঠ রাষ্ট্রব্যবস্থা। রাজনৈতিক ও জাগতিক শক্তির বিচারে তা সমকালীন সব শক্তিকে ছাড়িয়ে গিয়েছিলো। সমাজজীবনে ও শাসনব্যবস্থায় উন্নত নৈতিকতা ও আদর্শ চরিত্রেরই পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ ছিলো। ব্যবসা-বাণিজ্য, পেশা-শিল্প, লেনদেন ও সামাজিক সম্পর্ক, আচার-বিচার, এককথায় জীবনের সর্বক্ষেত্রে উন্নত মানবিক

মূল্যবোধের একচ্ছত্র শাসন ছিলো। বিজয়াভিযানের বিস্তার ও সভ্যতার ব্যাপ্তির পাশাপাশি নৈতিক ও আধ্যাত্মিক উন্নতিও অব্যাহত ছিলো। ব্যক্তির সঙ্গে ব্যক্তির, সমাজের সঙ্গে ব্যক্তির এবং ব্যক্তির সঙ্গে সমাজের সম্পর্ক ছিলো আস্থা ও দায়িত্ব -শীলতা এবং ভালোবাসা ও কল্যাণকামিতার বুনিয়াদের উপর সুপ্রতিষ্ঠিত। ফলে সাম্রাজ্যের বিশালতা ও জনসংখ্যার স্ফীতির তুলনায় অপরাধ ও দুস্কৃতির পরিমাণ ছিলো খুবই কম, প্রায় শূন্যের কোঠায়; অথচ পরিবেশ-পরিস্থিতি ও কার্যকারণ সবই ছিলো অপরাধপ্রবণতার অনুকূল।

এককথায়, খেলাফাতে রাশেদা ছিলো এমনই এক আদর্শ শাসনযুগ, যার চেয়ে উত্তম ও সমৃদ্ধতর আর কিছু কল্পনা করারও উপায় ছিলো না। আর তা সম্ভব হয়েছিলো শুধু তাঁদের জীবন ও চরিত্রের সৌন্দর্যের কারণে যারা শাসন পরিচালনা করতেন এবং নাগরিক জীবন ও সভ্যতার পরিচর্যা করতেন। সম্ভব হয়েছিলো তাঁদের আকীদা-বিশ্বাস, শিক্ষা-দীক্ষা এবং রাজনীতি ও শাসননীতির মহত্ত্বের কারণে। যেখানে যে কাজে ও যে দায়িত্বেই তাঁরা ছিলেন, চরিত্র ও ধার্মিকতায় সবার আদর্শ হয়েই ছিলেন। শাসক ও শাসিত, কর্মী ও কর্মকর্তা, পরিচালক ও পরিচালিত, সৈনিক ও সেনাপতি, এককথায় সর্বাবস্থায় সততা ও সত্যবাদিতা, বিনয় ও 'ভীতি', ত্যাগ ও আত্মত্যাগ এবং সহমর্মিতা ও কল্যাণ-কামিতাই ছিলো তাঁদের বৈশিষ্ট্য। রোমের জনৈক বিশিষ্ট ব্যক্তি একবার মুসলিম সৈনিকদের অবস্থা বর্ণনাপ্রসঙ্গে বলেছেন–

'রাতে তারা ইবাদতগুজার এবং দিনে রোযাদার। তারা ওয়াদা পূর্ণ করে, সৎ কাজে আদেশ করে এবং মন্দ কাজে নিষেধ করে। আর পরস্পর ইনসাফপূর্ণ আচরণ করে।'[১]

অন্য একজনের মতে, 'দিনে তারা ঘোড়সওয়ার, রাতে ইবাদতগুজার। অধিকৃত এলাকায়ও তারা বিনামূল্যে কিছু গ্রহণ করে না এবং বিনাসালামে কোথাও প্রবেশ করে না। অন্যদিকে তাদের বিরুদ্ধে যারা মাথা তোলে তাদের শেষ না করে তারা ক্ষান্ত হয় না।'[২]

তৃতীয়জনের মতে, 'রজনীতে তারা সংসারত্যাগী, দিবসে অশ্বারোহী, তীরচালনায় পারদর্শী এবং বর্শানিক্ষেপে কুশলী। তুমি যদি পাশের ব্যক্তির সঙ্গে

১ ذكره أحمد بن مروان المالكي في ' المجالسة '

২ البداية والنهاية المجلد السابع الصفحة الثالثة والخمسون

কথা বলতে চাও, সে তোমার কথা বুঝতে পারবে না; কারণ চারপাশে শুধু তিলাওয়াত ও যিকিরের গুঞ্জন।'[১]

এ নববী দীক্ষা ও তারবিয়াতেরই ফল ছিলো এই যে, মাদায়েন বিজয়কালে পারস্যসম্রাটের রাজমুকুট এবং ঐতিহ্যবাহী ফরাস সৈনিকদের হস্তগত হলো, যার মূল্য ছিলো কয়েক লাখ দীনার। কিন্তু লোভে পড়ে কেউ তাতে তসরুফ করলো না, বরং অক্ষত অবস্থায় সেনাপতির হাতে তুলে দিলো, আর তিনি তা খলীফাতুল মুসলিমীনের কাছে পাঠিয়ে দিলেন। খলীফা সন্তোষ প্রকাশ করে বললেন, এ আমানত যারা রক্ষা করেছে তারা অবশ্যই আমানতদার![২]

জীবনের উপর ইসলামী নেতৃত্বের প্রভাব

নবীর অনুসারীদের এই যে প্রথম জামা'আত, তাঁদের সুশাসনের সুস্নিগ্ধ ছায়ায় মানবজাতি পরম সুখ-শান্তির অধিকারী হবে এবং তাঁদের সুপ্রাজ্ঞ নেতৃত্বের কল্যাণে সোজা-সরল পথে সঠিক গন্তব্যে পরিচালিত হবে, আর পৃথিবী হবে ফলে, ফুলে, ফসলে পরিপূর্ণ এবং আনন্দরসে সুসিক্ত 'জান্নাত-নমুনা' এক শান্তি-উদ্যান, এটাই ছিলো স্বাভাবিক এবং তাই হয়েছিলো। কেননা তাঁরা ছিলেন পৃথিবীর সুখ-শান্তি ও নিরাপত্তার উত্তম ব্যবস্থাপক এবং উত্তম প্রহরী। জীবনের প্রতি তাঁদের দৃষ্টি ও দৃষ্টিভঙ্গি ছিলো অত্যন্ত ভারসাম্যপূর্ণ। জীবন তাঁদের কাছে লোহার খাঁচা, কিংবা পায়ের বেড়ী ছিলো না, চরম আক্রোশে যা ভেঙ্গে ফেলার ইচ্ছে হবে; তদ্রূপ তা ছিলো না ভোগ-উপভোগের এমন বিরল সুযোগ, যা আর ফিরে আসবে না বলে এখনই লুটে নিতে হবে এবং চেটেপুটে খেয়ে ফেলতে হবে। একই ভাবে জীবন তাঁদের কাছে ছিলো না কোন জন্মগত পাপের শাস্তি, যা থেকে মুক্তি লাভের জন্য অস্থির বে-কারার হতে হবে, তদ্রূপ ছিলো না সাজানো বিছানো ও সুস্বাদু খাবারে পরিপূর্ণ কোন দস্তরখান, যার উপর এখনই ঝাঁপিয়ে পড়তে হবে এবং ভোগের ভাগ বাড়ানোর উন্মত্ত প্রতিযোগিতায় লিপ্ত হতে হবে। দুর্বল জাতিবর্গ তাদের দৃষ্টিতে কোন লোভনীয় শিকার ছিলো না যে, 'কে কার আগে' তাদের উপর হামলে পড়তে হবে।

না, এমন ছিলো না, বরং তাঁদের দৃষ্টিতে জীবন ছিলো আল্লাহর নেয়ামত, যা সকল পুণ্য ও সকল কল্যাণের উৎস; জীবন ছিলো তাঁদের কাছে আল্লাহর নৈকট্য

১ أيضا، والصفحة السادسة عشرة

২ انظر سيرة عمر بن الخطاب لابن الجوزي

অর্জনের মাধ্যম এবং আল্লাহর পক্ষ হতে নির্ধারিত মানবীয় পূর্ণতায় উত্তরণের সোপান; জীবন ছিলো তাঁদের কাছে কর্মের এবং অর্জনের সংগ্রামসাধনার একমাত্র সুযোগ যা দ্বিতীয় বার ফিরে আসবে না।

تَبَٰرَكَ ٱلَّذِى بِيَدِهِ ٱلْمُلْكُ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَىْءٍ قَدِيرٌ ﴿١﴾ ٱلَّذِى خَلَقَ ٱلْمَوْتَ وَٱلْحَيَوٰةَ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا ۚ وَهُوَ ٱلْعَزِيزُ ٱلْغَفُورُ ﴿٢﴾

'বরকতপূর্ণ হয়েছেন ঐ সত্তা যার হাতেই রয়েছে রাজত্ব, আর তিনি সর্ববিষয়ের উপর ক্ষমতাবান; যিনি সৃষ্টি করেছেন মৃত্যুকে এবং জীবনকে, যেন তোমাদের পরীক্ষা করেন যে, তোমাদের মধ্যে কে অধিক উত্তম কর্মে ও আচরণে।'
(সূরাতুল মুলক, ৬৭ : ১)

إِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى ٱلْأَرْضِ زِينَةً لَّهَا لِنَبْلُوَهُمْ أَيُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا ﴿٧﴾ وَإِنَّا لَجَٰعِلُونَ مَا عَلَيْهَا صَعِيدًا جُرُزًا ﴿٨﴾

'নিঃসন্দেহে বানিয়েছি আমি পৃথিবীস্থ সকল কিছুকে পৃথিবীর জন্য শোভা, যেন তিনি তোমাদের পরীক্ষা করেন যে, তোমাদের মধ্যে কে উত্তম, কর্মে ও আচরণে। তবে পৃথিবীর বুকে যা কিছু আছে সেগুলোকে অবশ্যই আমি বানাব উষর ভূমি।' (কাহফ, ১৮ : ৭)

বিশ্বজগতের প্রতি তাঁদের দৃষ্টিভঙ্গি ছিলো এই যে, তা আল্লাহর রাজত্ব, তাদেরকে তিনি তাতে স্থলাভিষিক্ত করেছেন, প্রথমত মানবসত্তাগত দিক থেকে; কারণ মানবজাতিকে তিনি পৃথিবীতে খলীফারূপে সৃষ্টি করেছেন। ইরশাদ হয়েছে–

وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَٰٓئِكَةِ إِنِّى جَاعِلٌ فِى ٱلْأَرْضِ خَلِيفَةً

' আর (স্মরণ করুন ঐ সময়কে) যখন বললেন আপনার প্রতিপালক, অবশ্যই আমি পৃথিবীতে সৃষ্টি করবো একজন খলীফা।'

هُوَ ٱلَّذِى خَلَقَ لَكُم مَّا فِى ٱلْأَرْضِ جَمِيعًا ثُمَّ ٱسْتَوَىٰٓ إِلَى ٱلسَّمَآءِ فَسَوَّىٰهُنَّ سَبْعَ سَمَٰوَٰتٍ ۚ وَهُوَ بِكُلِّ شَىْءٍ عَلِيمٌ ﴿٢٩﴾

'তিনি ঐ সত্তা যিনি সৃষ্টি করেছেন তোমাদের জন্য যা কিছু আছে পৃথিবীতে, তা সকলই। তারপর তিনি অভিমুখী হলেন আকাশের দিকে, অনন্তর তাকে সপ্তআকাশে সুবিন্যস্ত করলেন, আর সর্ববিষয়ে তিনি সর্বজ্ঞ।' (বাকারাহ, ২ :২৯)

وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِىٓ ءَادَمَ وَحَمَلْنَٰهُمْ فِى ٱلْبَرِّ وَٱلْبَحْرِ وَرَزَقْنَٰهُم مِّنَ ٱلطَّيِّبَٰتِ وَفَضَّلْنَٰهُمْ عَلَىٰ كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا ﴿٧٠﴾

'আর অবশ্যই মর্যাদাবান করেছি আমি বনী আদমকে এবং বহন করিয়েছি তাদেরকে স্থলে ও জলে এবং রিযিক দান করেছি তাদেরকে উত্তম বস্তুসকল হতে এবং বিরাট শ্রেষ্ঠত্ব দান করেছি তাদেরকে আমার বহু সৃষ্টির উপর।'
(আল-ইসরা, ১৭ : ৭০)

দ্বিতীয়ত এদিক থেকে যে, তাঁরা সেই পুণ্যবান জামা'আত যারা আল্লাহর কাছে আত্মসমর্পণ করেছে এবং আল্লাহর আদেশের অনুগত হয়েছে। তাই তাঁদের তিনি পৃথিবীতে খেলাফাত দান করেছেন এবং পৃথিবীর অধিবাসীদের শাসক নির্বাচন করেছেন। ইরশাদ হয়েছে–

وَعَدَ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ مِنكُمْ وَعَمِلُوا۟ ٱلصَّٰلِحَٰتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِى ٱلْأَرْضِ كَمَا ٱسْتَخْلَفَ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ ٱلَّذِى ٱرْتَضَىٰ لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُم مِّنۢ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا ۚ يَعْبُدُونَنِى لَا يُشْرِكُونَ بِى شَيْـًٔا ۚ وَمَن كَفَرَ بَعْدَ ذَٰلِكَ فَأُو۟لَٰٓئِكَ هُمُ ٱلْفَٰسِقُونَ ﴿٥٥﴾

'ওয়াদা করেছেন আল্লাহ তাদের প্রতি যারা ঈমান এনেছে এবং নেক 'আমল করেছে যে, অতি অবশ্যই তিনি তাদের পৃথিবীতে স্থলাভিষিক্ত করবেন, যেমন স্থলাভিষিক্ত করেছেন তাদেরকে যারা তাদের পূর্বে বিগত হয়েছে এবং তাদের অনুকূলে প্রতিষ্ঠা দান করবেন তাদের দ্বীনকে যা তিনি তাদের জন্য মনোনীত করেছেন এবং তারা ভয়তাড়িত হওয়ার পর পরিবর্তে তাদের স্বস্তি দান করবেন। কারণ তারা আমার ইবাদত করে, আর কোন কিছুকে আমার সাথে শরীক করে না। আর যে কুফুরি করবে এরপর, তো তারাই হলো পাপাচারী।'
(আন-নূর, ২৪ : ৫৫)

আর তাদেরকে তিনি পৃথিবীর যাবতীয় নেয়ামত ভোগ করার অধিকার দান করেছেন, তবে অপচয় ও অপব্যয়ের সাথে নয়। ইরশাদ হয়েছে–

خَلَقَ لَكُم مَّا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا

'তিনি সৃষ্টি করেছেন তোমাদের জন্য যা কিছু রয়েছে পৃথিবীতে।' (বাকারাহ, ২ : ২৯)

أَلَمْ تَرَوْا أَنَّ اللَّهَ سَخَّرَ لَكُم مَّا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ

তোমরা কি দেখোনি যে আল্লাহ তোমাদের বশীভূত করেছেন আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীতে যা আছে সেগুলোকে। (লুকমান, ৩১ : ২০)

يَا بَنِي آدَمَ خُذُوا زِينَتَكُمْ عِندَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا ۚ إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ

'হে আদমের পুত্রগণ, গ্রহণ করো তোমরা তোমাদের সাজ প্রত্যেক সিজদার সময়। আর আহার করো এবং পান করো, তবে অপচয় করো না। নিঃসন্দেহে তিনি অপচয়কারীদের পছন্দ করেন না।' (আল-আ'রাফ, ৭ : ৩১)

قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللَّهِ الَّتِي أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ وَالطَّيِّبَاتِ مِنَ الرِّزْقِ ۚ قُلْ هِيَ لِلَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا خَالِصَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ ۗ كَذَٰلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ

'আপনি বলুন, কে হারাম করেছে, আল্লাহর (দেয়া) যীনাত (ও শোভা), যা তিনি তাঁর বান্দাদের জন্য বের করেছেন এবং (কে হারাম করেছে) উত্তম রিযিকসমূহ? বলুন, তা তো ঐ লোকদের জন্য যারা ঈমান এনেছে দুনিয়ার জীবনে, কেয়ামত-দিবসের জন্য নিজেদের নিবিষ্ট করে। এভাবেই আমি বিশদরূপে বর্ণনা করি আয়াতসমূহ এমন কাউমের জন্য যারা জ্ঞান রাখে।' (আল-আ'রাফ, ৭ : ৩২)

আর তিনি তাঁদেরকে পৃথিবীর সকল জাতি ও জনগোষ্ঠীর উপর কর্তৃত্ব দান করেছেন, যাতে তাঁরা তাদেরকে সঠিক পথে পরিচালিত করে এবং তাদের জীবন ও চরিত্র, গতি ও গতিবিধি এবং ঝোঁক ও প্রবণতাকে কল্যাণের পথে সুনিয়ন্ত্রিত রাখে; যেন তাঁরা ভ্রষ্টকে পথ প্রদর্শন করে এবং বিনষ্টকে সংশোধন

করে এবং যাবতীয় ফাটল মেরামত করে; যেন তাঁরা সবল থেকে দুর্বলকে রক্ষা করে এবং যালিমের কাছ থেকে মযলুমের অধিকার উদ্ধার করে; যেন তাঁরা পৃথিবীতে সুবিচার প্রতিষ্ঠা করে এবং সারা বিশ্বে শান্তি, স্বস্তি ও স্থিতির ছায়া বিস্তার করে।

كُنتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ

'তোমরা হলে সর্বোত্তম জাতি, যাদের উত্থিত করা হয়েছে মানবজাতির জন্য, তোমরা সৎ কাজের আদেশ করবে এবং অসৎ কাজের নিষেধ করবে, আর তোমরা আল্লাহর প্রতি ঈমান আনবে।' (আলে ইমরান, ৩ : ১১০)

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ

'হে ঐ লোকেরা যারা ঈমান এনেছো, তোমরা সুবিচারে অবিচল থাকো, আল্লাহর জন্য সাক্ষ্যদানকারী হও; হোক তা তোমাদের নিজেদের বিপক্ষে, বা পিতা-মাতার এবং নিকট স্বজনদের বিপক্ষে।' (আন-নিসা, ৪ : ১৩৫)

জার্মান নওমুসলিম পণ্ডিত মুহম্মদ আসাদ মুসলিম ব্যক্তিত্বের এ বৈশিষ্টের একটি খুব নিখুঁত ও বাস্তবানুগ চিত্র এঁকেছেন। তিনি বলেন–

'খৃস্টবাদের মত ইসলাম জীবন ও জগতের প্রতি কালো চশমার ভিতর দিয়ে দৃষ্টিপাত করে না, বরং একদিকে ইসলাম আমাদের শিক্ষা দেয়, যেন আমরা পার্থিব জীবনের মূল্যায়নে অতিকৃচ্ছ্র ও বৈরাগ্যের শিকার না হই, অন্যদিকে আধুনিক পাশ্চাত্য সভ্যতার মত জীবনের ভোগবাদিতা ও স্বেচ্ছাচারে নিমজ্জিত না হই।

খৃস্টধর্ম জীবনকে ঘৃণা করে এবং জীবনের প্রতি বিতৃষ্ণা পোষণ করে। পক্ষান্তরে খৃস্টীয় দৃষ্টিভঙ্গির সম্পূর্ণ বিপরীতে পাশ্চাত্য সভ্যতা জীবনের প্রতি লোভাতুর আচরণ করে, যেমন ভোজনলোভী গোগ্রাসে খাবার গিলতে থাকে, অথচ খাবারের প্রতি তার কোন সম্মানবোধ থাকে না। কিন্তু ইসলামের দৃষ্টিভঙ্গি সম্পূর্ণ ভিন্ন। জীবন ও জগতকে ইসলাম শ্রদ্ধার দৃষ্টিতে দেখে এবং তার প্রতি প্রশান্ত

অনুভূতি পোষণ করে। জীবনকে ইসলাম পূজা করে না, বরং উর্ধ্বজাগতিক জীবনের অভিযাত্রার পথে এমন একটি পর্যায় বলে গণ্য করে, যা তাকে যোগ্যতা ও কুশলতার সঙ্গে অতিক্রম করতে হবে। যেহেতু এটি মহাজীবনের একটি পর্যায় এবং অপরিহার্য পর্যায়, সেহেতু মানুষের অধিকার নেই এর অবমূল্যায়ন করার।

আমাদের মহাজীবনের এ সফরে ইহজীবনের এই পথটুকু অতিক্রম করতেই হবে, এটাই আল্লাহর পক্ষ হতে নির্ধারিত তাকদীর। সুতরাং পারলৌকিক জীবনের সফলতা অর্জনে পৃথিবীর মানবজীবনের বিরাট মূল্য ও ভূমিকা রয়েছে; তবে আমাদের ভুলে গেলে চলবে না যে, এ জীবন অন্য জীবনে উত্তরণের জন্য নিছক মাধ্যম; পার হওয়ার সংক্ষিপ্ত অথচ অপরিহার্য এক সেতু। পার্থিব জীবনের মূল্য এর চেয়ে কমও নয়, বেশীও নয়।

ইসলাম এই জড়বাদী চিন্তাকে কখনো অনুমোদন করে না যে, আমার চাওয়া-পাওয়া শুধু দৃশ্য জীবন ও দৃশ্য জগত। তদ্রূপ জীবনের প্রতি চরম তাচ্ছিল্যপূর্ণ এই চিন্তাকেও স্বীকার করে না যে, এই পাপপূর্ণ জীবনের কাছে আমার কোন চাওয়া-পাওয়া নেই। ইসলামের চলার পথ হলো এ দুয়ের মধ্যবর্তী পথ। ইসলাম আমাদের শিক্ষা দেয়, তোমার প্রতিপালকের কাছে এভাবে দু'আ করো−

رَبَّنَآ ءَاتِنَا فِى ٱلدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِى ٱلْءَاخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ ٱلنَّارِ

'হে আমাদের প্রতিপালক! দান করুন আমাদেরকে দুনিয়াতে কল্যাণ এবং আখেরাতে কল্যাণ, আর রক্ষা করুন আমাদেরকে আগুনের আযাব থেকে।'
(আল-বাকারাহ, ২ : ২০১)

সুতরাং জীবন এবং জীবনের সাথে সম্পর্কিত বস্তুসকল আমাদের আধ্যাত্মিক জীবনের সাধনার পথে হোঁচট খাওয়ার জন্য পড়ে থাকা প্রস্তরখণ্ড নয়, বরং জাগতিক উন্নতি ও বস্তুগত সমৃদ্ধি অর্জন করা হচ্ছে জীবনের কাঙ্ক্ষিত বিষয়, তবে নিজস্ব সত্তাগতভাবে তা কখনোই লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য নয়। আমাদের সকল চেষ্টা-সাধনার লক্ষ্য হওয়া উচিত এই যে, ব্যক্তিপর্যায়ে ও সামাজিক স্তরে আমরা এমন অবস্থা ও পরিবেশ সৃষ্টি করবো এবং পরবর্তী পর্যায়ে তা রক্ষার চেষ্টা করবো যা ইসলামের জীবনদর্শন অনুযায়ী মানুষের নৈতিক ও আধ্যাত্মিক শক্তি অর্জনের ক্ষেত্রে সহায়ক হয়। জীবনের বিস্তৃত অঙ্গনে মানুষ ছোট বড় যে কোন

কাজ করুক ইসলাম তাকে নৈতিক দায়িত্ববোধ অর্জনের প্রতি অনুপ্রাণিত করে। ইসলামের জীবনব্যবস্থা কখনোই তা অনুমোদন করে না যা (বর্তমান) ইঞ্জিল তার অনুসারীকে শিক্ষা দেয়− 'সিজারকে দাও যা তার প্রাপ্য এবং ঈশ্বরকে দাও যা তার প্রাপ্য।'

ইসলামের দৃষ্টিতে কোন সিজারের নিজস্ব পাওনা বলে কিছু নেই। সবই আল্লাহর প্রাপ্য। সেই প্রাপ্যের আলোকে সিজারের প্রতি আমাদের অবশ্যই কিছু দায় ও দায়িত্ব রয়েছে। জীবনের প্রয়োজনগুলোকে আধ্যাত্মিক ও জাগতিক এবং নৈতিক ও বস্তুগত− এই বিভাজনে ইসলাম বিশ্বাস করে না। ইসলামের দৃষ্টিতে মানুষের দেহ ও আত্মার সকল প্রয়োজনই জীবনের প্রয়োজন। জীবনের কাছে ইসলামের একমাত্র দাবী হলো হক ও বাতিলের মধ্যে একটিকে বেছে নেয়া। হক ও বাতিলের মধ্যবর্তী কোন পথ ও পন্থা ইসলামের কাছে নেই। তাই ইসলামের জোরদার আদেশ হলো কর্মময় জীবনের। কেননা কর্ম জীবনের অবিচ্ছেদ্য অংশ, যা থেকে দূরে থাকার কোন সুযোগ নেই। প্রত্যেক মুসলিমের অবশ্যকর্তব্য হলো নিজেকে দায়বদ্ধ মনে করা তার চারপাশের পরিবেশ সম্পর্কে এবং তার সামনে, পিছনে ও ডানে-বামে যা কিছু ঘটছে সে সম্পর্কে। তাকে নিয়োজিত থাকতে হবে হকের প্রতিষ্ঠা এবং বাতিলের বিলুপ্তির নিরন্তর জিহাদে। কারণ তার প্রতি কোরআনের সম্বোধন হলো−

كُنتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِٱلْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ ٱلْمُنكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِٱللَّهِ

'তোমরা হলে শ্রেষ্ঠ উম্মত, যাদের উত্থিত করা হয়েছে মানবের (কল্যাণের) জন্য। তোমরা সৎ কাজের আদেশ করবে এবং অসৎ কাজের নিষেধ করবে, আর আল্লাহর প্রতি ঈমান আনবে।' (আলে ইমরান, ৩ : ১১০)

এটাই হচ্ছে ইসলামী জিহাদের, প্রারম্ভিক যুগের ইসলামী বিজয়াভিযানের এবং আধুনিক যুগের পরিভাষায় ইসলামী উপনিবেশবাদের নৈতিক বৈধতার ভিত্তি। হ্যাঁ, এ পরিভাষা ব্যবহার করা যদি অপরিহার্যই হয় তবে আমি বলবো, ইসলাম অবশ্যই উপনিবেশবাদী, তবে ঐ উপনিবেশবাদ নয়, যার উৎস হলো ক্ষমতা ও আধিপত্য এবং সম্পদ লুণ্ঠন ও স্বাধীনতা হরণ। প্রথম যুগের মুজাহিদগণ

নিজেদের এবং প্রতিপক্ষের সামরিক শক্তির অনুপাতের পরোয়া না করে যেভাবে জিহাদের ময়দানে ঝাঁপিয়ে পড়তেন তার পিছনে বিজিত জাতির সম্পদ লুন্ঠন ও ক্ষমতা দখল এবং জীবনের সুখ-সচ্ছলতা নিশ্চিত করার আকাঙ্ক্ষা ক্রিয়াশীল ছিলো না, বরং তাদের একমাত্র উদ্দেশ্য ছিলো মানবজাতির আধ্যাত্মিক উন্নতির সম্ভাব্য সর্বোত্তম বিশ্বপরিবেশের বিনির্মাণ। যেমন ইসলামের শিক্ষা অনুযায়ী মহত্ত্ব-এর জ্ঞান মানুষের উপর মহত্ত্বকে গ্রহণ ও প্রতিপালন করার দায় আরোপ করে। মহত্ত্ব ও নীচতার নিছক তাত্ত্বিক বিভাজন এবং দার্শনিক দৃষ্টিভঙ্গি গ্রহণ করার প্লেটোবাদকে ইসলাম মোটেই সমর্থন করে না। বরং ইসলাম এটাকে অতি নীচতা বলেই গণ্য করে যে, মানুষ হক ও বাতিলের মধ্যে তাত্ত্বিক পার্থক্য তো অনুধাবন করবে কিন্তু হকের প্রতিষ্ঠা ও পৃষ্ঠপোষকতা এবং বাতিলের অপসারণ ও মূলোৎপাটনের জন্য জিহাদ করবে না। কেননা ইসলাম তার অনুসারীকে এ শিক্ষা দেয় যে, মহত্ত্ব ততক্ষণই জীবন্ত থাকবে যতক্ষণ মানুষ পৃথিবীতে মহত্ত্বের বিস্তারের জন্য জিহাদ ও মোজাহাদা করবে। পক্ষান্তরে যখনই সে মহত্ত্বের পৃষ্ঠপোষকতা পরিত্যাগ করবে মহত্ত্ব নির্জীব হয়ে যাবে এবং একসময় তার অপমৃত্যু ঘটবে।[১]

মানবজাতির গতিধারায় ইসলামী সভ্যতার প্রভাব

হিজরী প্রথম শতকে ইসলামী সভ্যতা নিজস্ব প্রাণপ্রাচুর্য এবং স্বকীয় গুণ ও বৈশিষ্ট্যসহ আত্মপ্রকাশ করেছিলো এবং ইসলামী সালতানাত ও সাম্রাজ্য তার বিশুদ্ধ আকৃতি ও প্রকৃতিসহ সুপ্রতিষ্ঠিত হয়ে গিয়েছিলো। মানবজাতির ধর্মনীতি ও চরিত্রনীতির ইতিহাসে সেটা ছিলো এক নতুন অধ্যায় এবং রাজনীতি ও সমাজনীতির জগতে ছিলো এক নতুন ঘটনা, যার ফলে মানবসভ্যতার গতিধারা পরিবর্তিত হয়ে গিয়েছিলো এবং পৃথিবী ও তার জীবন এক নতুন মোড় গ্রহণ করেছিলো।

এমনিতে ইসলামী দাওয়াত তো যুগে যুগে নবী-রাসূলগণের মাধ্যমে আসমান থেকে নাযিল হয়ে আসছিলো এবং তাঁদের শিষ্য-অনুসারিগণ সুসমাচার প্রচার করে আসছিলেন এবং দাওয়াতের পথে পূর্ণ ইখলাছের সঙ্গে জিহাদ ও মুজাহাদা চালিয়ে যাচ্ছিলেন, কিন্তু তাদের পক্ষে কখনো সম্ভব হয়নি দাওয়াতের ভিত্তি ও

[১] islam at the cross roads, fifth edition. p. 29

বুনিয়াদ এবং চিন্তা ও দর্শনের উপর কোন রাষ্ট্রব্যবস্থা এবং সভ্যতার গোড়াপত্তন করা, যেমনটি সম্ভব হয়েছিলো আখেরী নবী হযরত মুহম্মদ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও তাঁর অনুসারিদের পক্ষে। বস্তুত এক্ষেত্রে খোলাফায়ে রাশেদীনের সফলতা ছিলো অতুলনীয় ও নযিরবিহীন। ফলে ইসলামের এ অনন্যসাধারণ বিজয় ছিলো জাহিলিয়াতের জন্য সম্পূর্ণ নতুন এক চ্যালেঞ্জ, যার সঙ্গে ইতিপূর্বে তার কোন পরিচয় ছিলো না এবং কীভাবে এর মোকাবেলা করা সম্ভব তা সে বুঝেই উঠতে পারছিলো না।

প্রথমে সে ইসলামের মুখোমুখি হয়েছিলো নিছক একটি ধর্মীয় ও আধ্যাত্মিক দাওয়াত মনে করে, কিন্তু দেখতে দেখতে তা পরিণত হলো ইহকালীন ও পরকালীন শান্তি ও মুক্তির একমাত্র পথরূপে, যেখানে দেহসত্তা ও অন্তর্সত্তার সুসমন্বয় ঘটেছে এবং সমাজ, সভ্যতা, শাসননীতি ও রাজনীতি এবং নৈতিকতা ও ধার্মিকতার অপূর্ব সংমিশ্রণ ঘটেছে। ইসলাম ছিলো আসমানি ওহী ও ঐশী-বিধানসম্বলিত একটি ধর্ম যা সর্বোতভাবে বুদ্ধি ও যুক্তির সমর্থনপুষ্ট এবং পূর্ণ প্রজ্ঞা ও স্বতঃসিদ্ধতার অধিকারী; অন্যদিকে জাহিলিয়াত ছিলো নিছক কতিপয় কুসংস্কার, আজগুবি চিন্তা-বিশ্বাস ও কল্পকাহিনী, মানবীয় বিদ্যাবুদ্ধি ও অভিজ্ঞতা -প্রসূত কতিপয় জীবনাচারের সমষ্টি। সুতরাং জাহিলিয়াত কীভাবে তার মোকাবেলা করতে পারে?

ইসলামী রাষ্ট্র ও সভ্যতা ছিলো মযবূত বুনিয়াদের উপর প্রতিষ্ঠিত এবং সুসংহত একটি আদর্শ রাষ্ট্র ও সভ্যতা, যেখানে তাকওয়া, পবিত্রতা, সততা ও সত্যবাদিতাই ছিলো সবকিছুর মাপকাঠি, যেখানে নীতি ও নৈতিকতার মূল্য ছিলো পদ ও সম্পদের উপরে এবং আত্মা ও আত্মিকতার মূল্য ছিলো প্রদর্শনবাদিতা ও বাহ্যিকতার ঊর্ধ্বে।

সমাজের সর্বস্তরের সকল মানুষ, মানুষ হিসাবে সমান; কেউ কারো চেয়ে বড় নয় কোন বিচারে। সেখানে মানুষে মানুষে যা কিছু পার্থক্য তা শুধু তাকওয়ার ভিত্তিতে। সেখানে মানুষের একমাত্র চিন্তা ও ধ্যান-জ্ঞান হলো আখেরাত। তাই পার্থিববিষয়ে হৃদয় ও আত্মা ছিলো প্রশান্ত এবং আখেরাতের বিষয়ে কলব ও রূহ ছিলো খুশু-খুযুতে আচ্ছন্ন।

দুনিয়ার 'মুরদার' নিয়ে তাদের মধ্যে কুকুরের কামড়াকামড়ি ছিলো না, এমনকি ছিলো না কোন পার্থিব প্রতিযোগিতা। হিংসা-বিদ্বেষ ও রেষারেষি, লোভ-লালসা ও কৃপণতা এবং ইতরতা ও স্বার্থপরতা ছিলো সম্পূর্ণরূপে অনুপস্থিত।

পক্ষান্তরে জাহিলিয়াতের কাছে ছিলো ঘুণে ধরা ও জরাগ্রস্ত এক সমাজ ও সভ্যতা, যেখানে ছিলো শুধু কোলাহল ও গোলযোগ, হানাহানি ও রেষারেষি এবং সীমাহীন অশান্তি ও নৈরাজ্য; সবল যেখানে দুর্বলের উপর যুলুম করে; শাসক যেখানে শুধু শোষণ করে, অথচ শোষণের শিকার যারা তারা করতে পারে না ফরিয়াদ, করে শুধু আর্তনাদ। সমাজের উচ্চস্তর ও অভিজাত শ্রেণীর লোকেরা মেতে থাকে ভোগ-বিলাস ও অনাচার-পাপাচারে, আর পদ ও সম্পদ এবং প্রতিষ্ঠা ও প্রতিপত্তি অর্জনের উন্মত্ত প্রতিযোগিতায়। তাদের দিন-রাতের চিন্তা, কে কাকে ছাড়িয়ে যাবে ভোগের আয়োজনে ও বিলাস-প্রাচুর্যে। ফলে সমাজ ও সভ্যতা মানুষের জন্য ছিলো যেন এক 'কুরুক্ষেত্র' এবং জীবন ও জীবনব্যবস্থা ছিলো এক জ্বলন্ত অভিশাপ ও মূর্তিমান আযাব। কোরআনের ভাষায়–

وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ ٱلْعَذَابِ ٱلْأَدْنَىٰ دُونَ ٱلْعَذَابِ ٱلْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ ﴿٢١﴾

'আর অতি অবশ্যই ভোগ করাবোই আমি তাদেরকে বড় আযাবের আগে ছোট আযাব, যাতে তারা ফিরে আসে।' (আস-সিজদাহ, ৩২ : ২১)

ইসলাম মানুষকে দান করেছিলো এমন এক ন্যায়ভিত্তিক শাসনব্যবস্থা, যা ছোট-বড়, ধনী-গরীব ও সাধারণ-অভিজাত সর্বশ্রেণীর মধ্যে ইনসাফ ও সাম্য প্রতিষ্ঠা করে এবং সবলের হাত থেকে দুর্বলকে রক্ষা করে। মানুষের জান-মাল ও ইয্যত-আবরু যেমন হিফাযত করে তেমনি স্বভাব-চরিত্র ও নীতি-নৈতিকতা রক্ষার নিশ্চয়তা বিধান করে। সেখানে সমাজের সর্বোত্তম লোকেরাই হলো শাসক এবং যার যত সম্পদ ও প্রাচুর্য সে তত সংযমী ও ভোগবিমুখ; পক্ষান্তরে জাহিলিয়াতের পুরো শাসন-ব্যবস্থায় ছিলো নির্যাতন-নিপীড়ন ও শোষণ-লুণ্ঠনের আধিপত্য। শাসক, কর্তা ও কর্মকর্তা সবাই যেন জোট বেঁধেছে দুষ্কৃতি, দুর্নীতি ও আত্মসাতের উপর। যেন এক উন্মত্ত প্রতিযোগিতা ছিলো যে, মানুষের জান-মাল ও ইয্যত-আবরুর উপর কে কত 'হাতসাফ' করতে পারে। সমাজের সামনে তারা ছিলো যাবতীয় অন্যায় ও দুষ্কর্মের নিকৃষ্টতম উদাহরণ। ফলে সমাজের নৈতিক পচন ও চারিত্রিক অধঃপতনের জন্য তারাই ছিলো দায়ী। সম্প্রদায়ের নিকৃষ্টতম লোকেরা ছিলো সমাজের 'মাথা ও ব্যথা'। তাদের পশু ও কুকুরের তো উদরপূর্তির ব্যবস্থা ছিলো, কিন্তু প্রজাদের ছিলো না ক্ষুধার অন্ন। তাদের প্রাসাদে ছিলো মূল্যবান গালিচা ও দামী পর্দা, অথচ প্রজাদের ঘরে ছিলো না স্ত্রী-কন্যার লজ্জা ঢাকার আবরণ।

তাই পরবর্তী যুগে মানুষের সামনে ইসলামের সত্য ও জাহিলিয়াতের মিথ্যা ছিলো আলো-অন্ধকারের মতই সুস্পষ্ট। ইসলামের দিকে এগিয়ে যাওয়ার এবং ইসলামকে আলিঙ্গন করার পথে তাদের সামনে কোন প্রতিকূলতা, প্রতিবন্ধকতা ও নির্যাতনের হুমকি ছিলো না এবং ছিলো না জাহিলিয়াতের দিক থেকে কোন পিছুটান।

ইসলাম গ্রহণ করে মানুষ কিছুমাত্র ক্ষতিগ্রস্ত হতো না, বা কোন কিছু হারাতো না; না পারিবারিক অবস্থা, না সামাজিক অবস্থান। বরং হৃদয় ও আত্মার জগতে সে লাভ করতো চেতনা ও বিশ্বাসের প্রশান্তি এবং ঈমান ও ইয়াকীনের স্বাদ ও লজ্জত। লাভ করতো ইসলামের প্রভাব ও প্রতাপ এবং একটি অপ্রতিহত রাষ্ট্রশক্তির ছত্রচ্ছায়া। সর্বোপরি সে অর্জন করতো এমন একটি জাতির ভ্রাতৃত্ব-বন্ধন যারা জান-মাল ও সর্বশক্তি দিয়ে তাকে রক্ষা করার জন্য ছিলো প্রস্তুত। মৃত্যুর পর অনন্ত জীবনের সুখ–শান্তির নিশ্চিন্ততা তাদের অন্তর্সত্তায় এনে দিতো এমন এক প্রশান্তি ও স্নিগ্ধতা এবং স্বস্তি ও ইতমিনান যে, তখন মৃত্যুকে মনে হতো জীবনের চেয়ে প্রিয়। তাই মানুষ স্বেচ্ছায় ও স্বতঃস্ফূর্তভাবে জাহিলিয়াতের কাঁটাবন ত্যাগ করে ইসলামের পুষ্পোদ্যানে প্রবেশ করতো। ফলে জাহিলিয়াতের ভূমি চারদিক থেকে সঙ্কুচিত হয়ে আসছিলো, আর ইসলামের ভূমি ক্রমশ সম্প্রসারিত হচ্ছিলো।

কালিমার আওয়ায উচ্চ থেকে উচ্চ এবং সবুজ বৃক্ষের সুশীতল ছায়া আরো সুবিস্তৃত হয়ে চলেছিলো। এভাবে একসময় যাবতীয় ফিতনা বিলুপ্ত হয়ে গেলো এবং আল্লাহর দ্বীন একচ্ছত্র হয়ে গেলো। সব সমাজে ও সব জনপদে ইসলামের এ মহাবিপ্লবের প্রভাব ছিলো ব্যাপক ও বিস্তৃত। যখন জাহিলিয়াতের শক্তি ও প্রতাপ ছিলো, আর ইসলাম ছিলো দুর্বল ও শক্তিহীন তখন আল্লাহর দিকে অগ্রসর হওয়ার পথ ছিলো কঠিন ও বিপদসঙ্কুল এবং দুর্গম ও ঝুঁকিবহুল। সেই পথ এখন হয়ে গেলো সহজ-সুগম, নিরাপদ ও শান্তিপূর্ণ। জাহেলি সমাজে আল্লাহর আনুগত্য করা যেমন কঠিন ছিলো, এখন ইসলামী সমাজে তেমনি কঠিন হলো আল্লাহর নাফরমানি করা। তখন পাপাচার ও জাহান্নামিয়াতের প্রচার হতো প্রকাশ্যে, এখন তা গোপনে ও সঙ্গোপনে করাও হয়ে গেলো কঠিন। তখন দাওয়াত ইলাল্লাহ ছিলো মহাঅপরাধ, যা চলতো সঙ্গোপনে এবং যার পরিণাম ছিলো ভয়াবহ, কিন্তু এখন দাওয়াত চলতে লাগলো প্রকাশ্যে ও স্বাধীনভাবে; না ছিলো কোন বাদ-প্রতিবাদ, না ছিলো ঘাত-সঙ্ঘাত, না ছিলো নির্যাতন-নিপীড়ন,

না ছিলো অন্যকিছু। দাওয়াত দেয়া হতো যেমন নির্বিঘ্নে তেমনি তা কবুল করা হতো নির্ভয়ে। কোরআনের ভাষায়–

وَٱذْكُرُوٓا۟ إِذْ أَنتُمْ قَلِيلٌ مُّسْتَضْعَفُونَ فِى ٱلْأَرْضِ تَخَافُونَ أَن يَتَخَطَّفَكُمُ ٱلنَّاسُ فَـَٔاوَىٰكُمْ وَأَيَّدَكُم بِنَصْرِهِۦ وَرَزَقَكُم مِّنَ ٱلطَّيِّبَٰتِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ

'স্মরণ করো তোমরা ঐ সময়কে যখন ছিলে (সংখ্যায়) অল্প (এবং শক্তিতে) দুর্বল। তোমরা আশঙ্কা করতে যে, মানুষ তোমাদের ছোঁ মেরে নিয়ে যাবে, অনন্তর তিনি আশ্রয় দান করেছেন এবং আপন সাহায্য দ্বারা তোমাদের সুদৃঢ় করেছেন, আর উত্তম বস্তুসমূহ হতে তোমাদের রিযিক দান করেছেন।' (আনফাল, ৮ : ২৬)

মানুষকে তাঁরা নির্ভয়ে সৎ কাজের আদেশ দিতেন এবং অসৎ কাজের নিষেধ করতেন; যথার্থ আদেশ-নিষেধ, যা কার্যকর করার শক্তি ও সক্ষমতা ছিলো তাদের।

মানুষের স্বভাব ও চিন্তা-বুদ্ধিও পরিবর্তিত হতে লাগলো চেতনে, বা অবচেতনে। এবং জীবনের সবকিছু ইসলামের আলো দ্বারা উদ্ভাসিত হতে লাগলো, যেমন বসন্তের আগমনে সবুজ-সজীব হয় গাছের পাতা এবং মানুষের হৃদয়। একসময় যে হৃদয় ছিলো নিষ্ঠুর ও নির্দয়, এখন তা হয়ে গেলো কোমল ও সদয়। ইসলামের আদর্শ, বিশ্বাস ও চেতনা হৃদয়ের গভীরে প্রবেশ করলো এবং মানুষের অন্তর্সত্তায় মিশে গেলো।

মূল্যবোধ পরিবর্তিত হলো এবং পুরোনো চিন্তা-চেতনা ও মানদণ্ডের স্থান গ্রহণ করলো নতুন চিন্তা-চেতনা ও নতুন মানদণ্ড। জাহিলিয়াত ও তার জীবনদর্শন হয়ে গেলো পশ্চাদমুখিতা, স্থবিরতা ও বুদ্ধিবৃত্তিক দৈন্যের আলামত। পক্ষান্তরে ইসলাম ও ইসলামী জীবনদর্শন হয়ে গেলো আধুনিকতা, প্রগতিশীলতা ও প্রাগ্রসরতার প্রমাণ এবং গর্ব ও গৌরবের বিষয়। ফলে সকল জাতি এবং সমগ্র পৃথিবী ধীরে ধীরে ইসলামের নিকটবর্তী হতে লাগলো, যদিও তা ছিলো অননুভূতভাবে, যেমন পৃথিবীর মানুষ পারে না তাদের গ্রহের গতি অনুভব করতে। ইসলামের অপ্রতিহত এ প্রভাব প্রকাশ পেয়েছিলো জাতিবর্গের ধর্মে, দর্শনে, সাহিত্যে, সংস্কৃতিতে এবং সভ্যতার সকল অঙ্গনে। মানুষের চিন্তা, বিবেক ও অন্তর্জগতেও এ প্রভাবের সুস্পষ্ট স্বাক্ষর ছিলো; এমনকি মুসলিম

সালতানাতের পতন ও অধঃপতনের পর বিভিন্ন জাতির জীবনে যেসব সংস্কার আন্দোলনের আবির্ভাব ঘটেছে তাতেও ইসলামের প্রভাব ছিলো সুস্পষ্ট।

ইসলামের মূল প্রাণ ছিলো তাওহীদ ও আল্লাহর একত্বে বিশ্বাস। তাই শিরক ও মূর্তিপূজার নিন্দা-সমালোচনায় সে এমন কঠোর ছিলো এবং এর গোড়ায় এমন জোরদার আঘাত হেনেছিলো যে, শিরক ও মূর্তিপূজার 'ভাবমূর্তি'ই গুঁড়িয়ে গিয়েছিলো। এমনকি মুশরিকদের কাছেও তা হয়ে পড়েছিলো লজ্জার বিষয়। ফলে একসময় যেখানে তারা মহাউৎসাহে শিরক ও মূর্তিপূজার পক্ষে যুক্তি-দর্শন উপস্থাপন করে বলতো–

أَجَعَلَ ٱلْءَالِهَةَ إِلَٰهًا وَٰحِدًا ۖ إِنَّ هَٰذَا لَشَىْءٌ عُجَابٌ ۝

'তিনি কি উপাস্যসকল (প্রত্যাখ্যান করে) এক উপাস্য সাব্যস্ত করছেন! এ তো বড় অদ্ভুত কথা! (ছোয়াদ, ৩৮ : ৫)

সেখানে তারাই মূর্তিপূজার কথা স্বীকার করতে লজ্জাবোধ করতো। ফলে প্রতিটি ধর্মব্যবস্থায় বিদ্যমান প্রতিমাপূজার যাবতীয় আচার-বিশ্বাসের 'তাওহীদ-আশ্রয়ী' বিকল্প ব্যাখ্যা দিতে শুরু করলো। আহমদ আমীন বলেন–

'খৃস্টধর্মের অনুসারীদের মধ্যে এমন কিছু ঝোঁক ও প্রবণতা প্রকাশ পেয়েছিলো যাতে ইসলামের প্রভাব ছিলো সুস্পষ্ট। যেমন একটি সম্প্রদায় যিশুর ঈশ্বরত্ব অস্বীকার করে ত্রিত্ববাদের প্রায় তাওহীদমুখী ব্যাখ্যা পেশ করতো। সেখানে একসময় এমন সংস্কারকও এসেছেন যিনি ঈশ্বর ও মানবের মধ্যে গীর্জার বিশেষ মধ্যস্থতা-অধিকারের ধারণা কঠোরভাবে প্রত্যাখ্যান করেছেন। অষ্টম শতাব্দী তথা হিজরী দ্বিতীয় ও তৃতীয় শতকে ফ্রান্সের সিপ্টিমানিয়ায় (septimania) একটি আন্দোলনের অভ্যুদয় ঘটেছিলো যার মূল কথা ছিলো, পাদ্রীদের অধিকার নেই পাপের স্বীকৃতি গ্রহণের। মানুষ মানুষের সামনে পাপ স্বীকার করবে, এর কোন ধর্মীয় ভিত্তি নেই; মানুষ শুধু আল্লাহর সামনে পাপস্বীকার ও ক্ষমা প্রার্থনা করবে। বলাবাহুল্য যে, ইসলামে যেহেতু 'পোপ' নেই সেহেতু 'পাপ স্বীকারের'ও অবকাশ নেই।'[১]

একই ভাবে খৃস্টীয় অষ্টম-নবম শতাব্দীতে (হিজরী তৃতীয়-চতুর্থ শতক) ধর্মীয় চিত্র ও মূর্তি অপসারণের একটি আন্দোলন প্রবলভাবে দানাবেঁধে ওঠে। তারা

১ আহমদ আমীন যোহাল ইসলাম (ছালাহুদ্দীন খোদাবখস, এর বরাতে)

চিত্র ও প্রতিমার পবিত্রায়ণের কঠোর বিরোধী ছিলো। এ আন্দোলন একসময় এতই শক্তি ও প্রতিপত্তি অর্জন করে যে, তৃতীয় লুই, পঞ্চম কনস্টানটাইন ও চতুর্থ লুই-এর মত প্রবল প্রতাপান্বিত রোমান সম্রাটগণও এর সমর্থন ও পৃষ্ঠ-পোষকতায় এগিয়ে আসেন।

৭২৬ ও ৩০ খৃস্টাব্দে রোমান সম্রাট তৃতীয় লুই সরকারীভাবে চিত্র ও মূর্তির পবিত্রায়ণ নিষিদ্ধ করে ফরমান জারি করেন এবং এটিকে মূর্তিপূজা বলে অভিহিত করেন। পক্ষান্তরে পোপ দ্বিতীয় ও তৃতীয় গ্রেগরী, কনস্টান্টিনোপলের পাদ্রী গ্রেম্যান্স ও সম্রাজ্ঞী ইরীনী ছিলেন চিত্র-উপাসনার সমর্থক। উভয় পক্ষের মধ্যে এবিষয়ে যে তীব্র দ্বন্দ্ব-বিবাদ হয়েছিলো তার বিশদ আলোচনার অবকাশ এখানে নেই। আমরা শুধু বলতে চাই, রোমান ও গ্রীক সভ্যতার প্রতীমাপ্রেম ও ভাস্কর্যপ্রীতির খ্যাতি তো জগৎ-জোড়া এবং সেখান থেকেই খৃস্টধর্মে মূর্তিপূজার অনুপ্রবেশ, এমনকি একসময় তা প্রবলভাবে শিকড় গেড়ে বসেছিলো। সুতরাং সেখানে প্রতীমাবিরোধী এই প্রবল আন্দোলন নিঃসন্দেহে একথা প্রমাণ করে যে, এটা ছিলো ইসলামের মূর্তিবিনাশী ভূমিকা ও তাওহীদী চেতনারই প্রতিধ্বনি, যা ইসলামের দাওয়াত ও তাবলীগের মাধ্যমে মুসলিম স্পেন থেকে পাশ্চাত্যে পৌঁছেছিলো।

বেশ কিছু ঐতিহাসিক এ সত্য স্বীকারও করেছেন যে, চিত্র ও প্রতীমাবিরোধী আন্দোলন ছিলো ইসলাম দ্বারা প্রভাবিত। এ বক্তব্যের সমর্থনে তারা উল্লেখ করেছেন, টুরীনের বিশপ ক্লেডিয়াস (claadius) যিনি ৮২৮ খৃস্টাব্দ মোতাবেক ২১৩ হিজরীতে নিযুক্তি লাভ করেন এবং যিনি তার বিশপ-অঞ্চলে ক্রশ উপাসনা কঠোরভাবে নিষিদ্ধ করেন এবং সমস্ত ক্রশ জ্বালিয়ে দেয়ার আদেশ জারি করেন তার জন্ম ও প্রতি-পালন হয়েছিলো মুসলিম স্পেনে। এটা হলো হিজরী দ্বিতীয় শতকের কথা, যা ছিলো স্পেনে মুসলিম শাসন ও মুসলিম সভ্যতার উত্থানকাল। আর চিত্র ও মূর্তিসংস্কৃতির প্রতি ইসলামী শরী'আতের বিদ্বেষ তো সর্বস্বীকৃত।

বুখারী ও মুসলিম হযরত আয়েশা (রা) হতে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এক সফর থেকে ফিরে এলেন, আমি জানালায় ছবিওয়ালা পর্দা টানিয়েছিলাম। তিনি তা দেখে ছিঁড়ে ফেললেন, তাঁর মুখমণ্ডল বিবর্ণ হয়ে গেলো। তিনি বললেন, হে আয়েশা, কেয়ামতের দিন কঠিনতম আযাব হবে তাদের যারা আল্লাহর সৃজন-এ সাদৃশ্য গ্রহণ করবে।

হযরত আয়েশা (রা) বলেন, তখন আমি তা কেটে একটি বা দু'টি বালিশ বানালাম।[1] এসম্পর্কিত হাদীছ প্রচুর।

ধর্মীয় ছবি ও মূর্তি সম্পর্কে প্রখ্যাত ইউরোপীয় ঐতিহাসিক গীবন যথেষ্ট বিশদ আলোচনা করেছেন। তিনি বলেন–

'গীর্জায় ছবিপূজা বেশ জনপ্রিয়তা লাভ করেছিলো। দুর্বল বিশ্বাসের খৃস্টানরা ধীরে ধীরে তা গ্রহণ করেছে এবং এর পবিত্রতা ও নিষ্পাপতার ধারণা মেনে নিয়েছে। অষ্টম শতকের শুরুতে, যখন এই 'ধর্মীয় উপসর্গ' চরমে পৌঁছে গেছে, তখন গ্রীকরা হঠাৎ আবিষ্কার করলো যে, খৃস্টধর্মের ছদ্মাবরণে তারা নতুন ভাবে তাদের পূর্বপুরুষদের ধর্মের পুনরুত্থান ঘটিয়ে ফেলেছে। এ বিষয়ে ইহুদি ও মুসলিমরা তাদের প্রতি অগ্রগণ্য ছিলো, যারা তাওরাত ও কোরআন থেকে প্রতিমা -শিল্প ও মূর্তিপূজার আচার-প্রথার বিরুদ্ধে তীব্র ঘৃণা ও বিদ্বেষের অনুভূতি আহরণ করেছিলো। তো বিষয়টি গীর্জার লোকদের ভাবিয়ে তুললো এবং বেশ উৎকণ্ঠায় ফেলে দিলো। কারণ শুধু ইহুদিদের কথা হলে তাদের হীনতা ও দুর্বলতার কারণে বিষয়টি তারা উপেক্ষা করতে পারতো, কিন্তু বিজেতা মুসলিম জাতি, যারা দামেস্ক শাসন করছিলো এবং কনস্টান্টিনোপল অধিকার করার কাছাকাছি এসে পড়েছিলো, তাদের নিন্দা-অসন্তোষের বিষয়টি তাদেরকে অত্যন্ত গুরুত্বের সঙ্গে গ্রহণ করতে হয়েছিলো।'

গীবন আরো বলেন, 'যিনি ছবি ও প্রতিমাপূজার বিরুদ্ধে প্রচেষ্টা গ্রহণ করেন তিনি হলেন (প্রতিমা ধ্বংসকারী উপাধিপ্রাপ্ত) সম্রাট লীও এবং তার পুত্র পঞ্চম কনস্টান্টাইন। সাতশ' চুয়ান্নতে কনস্টান্টিনোপলে অনুষ্ঠিত synod সভায় দীর্ঘ ছয়মাস আলোচনা পর্যালোচনার পর সিদ্ধান্ত হলো যে, যিশুখৃস্টের ছবি ও প্রতিমা পূজা করা হচ্ছে ধর্মীয় নব-উদ্ভাবন। তবে পূর্বাঞ্চল এ সিদ্ধান্ত প্রত্যাখ্যান করেছিলো, যদিও পরে মেনে নিতে বাধ্য হয়েছে। ইটালীয়রা সাতশ' আটাশ সনে এ সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেছিলো।'[2]

ইউরোপের ধর্মীয় ইতিহাস এবং খৃস্টীয় গীর্জার সমগ্র কার্যক্রম যদি গভীরভাবে

[1] বুখারী, কিতাবুল-লিবাস, হাদীছ নম্বর, ৫৪৯৮, মুসলিম, কিতাবুল-লিবাসি ওয়াযযীনাহ, হাদীছ নম্বর ৩৯৩৭, নাসাঈ কিতাবুয্‌-যীনাহ, হাদীছ নম্বর, ৫২৬১ এবং ৫২৬৮, মসনাদের আহমদ (বাকী মুসনাদিল আনছার, হাদীছ নম্বর, ২২৯৫২ এবং ২৩৩৯৫ এবং ২৪৬৫৫

[2] গীবন p. 255 _ 256

অধ্যয়ন করা হয় তাহলে সমকালের সুসংহত বিশপীয় ব্যবস্থার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণাকারী সংস্কারকদের উপর ইসলামের বুদ্ধিবৃত্তিক প্রভাব সুস্পষ্টরূপেই অনুভব করা যায়। স্বয়ং মার্টিন লুথারের সংস্কার-আন্দোলন ছিলো ইসলামের প্রভাব গ্রহণের স্পষ্টতম প্রমাণ, যদিও তাতে যথেষ্ট ত্রুটি-বিচ্যুতি ছিলো। ঐতিহাসিকগণ পরিষ্কার ভাষায় স্বীকার করেছেন যে, আন্দোলনের প্রাণপুরুষ লুথারের জীবনে ইসলামের বিভিন্ন নীতি ও শিক্ষার প্রভাব ছিলো।

শুধু ধর্মই নয়, বরং ইউরোপের সমগ্র জীবন ও সভ্যতার উপর ইসলামের বিপুল প্রভাব ছিলো। রবার্ট ব্রিফল্ট (robert brifault) the making of humanity গ্রন্থে বলেন–

'ইউরোপের উন্নতি-অগ্রগতির এমন কোন অঙ্গন নেই যেখানে ইসলামী সভ্যতার বিরাট অবদান নেই। বস্তুত ইউরোপীয় জীবনের উপর ইসলামের বিপুল প্রভাবক ভূমিকা রয়েছে।' (p. 190)

একই গ্রন্থের অন্যত্র তিনি বলেন–

'প্রকৃতি বিজ্ঞান (যাতে, স্বীকার করতেই হবে, মূল অবদান আরবদের), এটাই শুধু ইউরোপে নবজাগরণ সৃষ্টি করেনি, বরং সামগ্রিকরূপেই ইসলামী সভ্যতা ইউরোপের জীবনে সুগভীর ও বহুমুখী প্রভাব বিস্তার করেছে এবং এর শুভ সূচনা হয়েছে তখন থেকে যখন ইসলামী সভ্যতার প্রথম আলোকরশ্মি ইউরোপের উপর পড়েছে।' (p. 202)

একই ভাবে মূর্তিপূজক ভারতীয় জাতিবর্গের নীতি ও চরিত্র, সমাজ ও সংস্কৃতি এবং আইন ও বিধানের ক্ষেত্রেও ইসলামী শরিয়া ও বুদ্ধিবৃত্তির বিপুল প্রভাব পরিলক্ষিত হয়। এক্ষেত্রে নারীর অধিকার ও মর্যাদার স্বীকৃতি এবং বিভিন্ন শ্রেণী ও সম্প্রদায়ের মধ্যে সাম্যনীতির কথা বিশেষভাবে উল্লেখ্য, যা ইসলামী সভ্যতা ও জীবনবিধানের একক বৈশিষ্ট্য এবং ইসলামই যা সর্বপ্রথম ঘোষণা করেছে। ভারতবর্ষে যখন ইসলামের বিজয়াভিযান শুরু হয় এবং ভারতীয় জাতিবর্গ মুসলিম জাতির সংস্পর্শে আসতে শুরু করে তখন থেকেই ভারতীয় সমাজজীবনে এর প্রভাব অব্যাহতরূপে বৃদ্ধি পেয়ে এসেছে।[১]

প্রসিদ্ধ ভারতীয় গবেষক এবং মিসরে ভারতের সফল রাষ্ট্রদূত k.m. panikkar

[১] influence of Islam on indian cultur, by tara chand.

ভারতীয় জনগোষ্ঠীর মনমানস এবং তাদের ধর্মবিশ্বাসে ইসলামের তাওহীদ ও একত্ববাদের প্রভাব সম্পর্কে আলোচনাপ্রসঙ্গে বলেন–

'এটা সুস্পষ্ট ও সুস্বীকৃত যে, হিন্দুধর্মে তখন ইসলামের প্রভাব ছিলো সুগভীর এবং হিন্দুমানসে ঈশ্বর-উপাসনার চিন্তা ইসলামেরই অবদান। তখনকার চিন্তা-নায়ক ও ধর্মপুরুষগণ উপাস্যদের বিভিন্ন নাম দিলেও তারা ঈশ্বরের উপাসনার আহ্বান জানিয়েছেন এবং স্পষ্ট ভাষায় ঘোষণা করেছেন উপাস্য মাত্র একজন এবং তিনিই উপাসনার একক অধিকারী। তাঁরই কাছে মুক্তি ও সৌভাগ্য প্রার্থনা করতে হবে। ইসলামী যুগে ভারতবর্ষে যেসব ধর্ম ও সংস্কারপ্রচেষ্টা আত্মপ্রকাশ করেছে সেগুলোতে উপরোক্ত প্রভাব ছিলো সুপ্রকাশিত। যেমন ভক্তিধর্ম (Bhagti) এবং গুরু কবিরের ধর্মমত।'[১]

ভারতের প্রধানমন্ত্রী জওয়াহেরলাল নেহরু তার Discovary of India গ্রন্থে বলেন–

'উত্তর-পশ্চিম ভারতের দিক থেকে বিজেতাদের আগমন এবং ইসলামের প্রবেশ, ভারতের ইতিহাসে এর গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে। ভারতীয় সমাজে যে ব্যাধি ও পচন ছড়িয়ে পড়েছিলো, ইসলামই তা প্রকাশ করেছে। বর্ণভেদ ও অচ্ছুত প্রথা এবং বিশ্ব থেকে বিচ্ছিন্ন থাকার প্রবণতা, যাতে ভারতবর্ষ তখন আচ্ছন্ন ছিলো, ইসলামই তা চিহ্নিত করেছে। ইসলামের সাম্য ও ভ্রাতৃত্ব যা মুসলিম জাতির জীবন ও বিশ্বাসের অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ ছিলো তা ভারতীয়দের মনমানসে গভীর প্রভাব বিস্তার করেছে এবং এ প্রভাব ঐসব হতভাগ্য জনগোষ্ঠীর মধ্যেই ছিলো সর্বাধিক, ভারতীয় সমাজ যাদের সাম্য ও মানবিক অধিকার থেকে বঞ্চিত করে রেখেছিলো।

আধুনিক যুগের বিদগ্ধ লেখক N. C. Mehta, Indian Civilization And Islam গ্রন্থে বলেন–

'ভারতবর্ষে ইসলাম এমন এক আলোর মশাল নিয়ে এসেছিলো যা মানুষের জীবন থেকে অন্ধকার দূর করেছে, যে অন্ধকার প্রাচীন সভ্যতাগুলোর পতনকালে জেঁকে বসেছিলো। কিছু উত্তম আদর্শ তখন চিন্তানৈতিক বিশ্বাসের রূপ লাভ করেছিলো। বস্তুত ইসলামের বিজয়াভিযানের প্রভাব রাজনৈতিক ক্ষেত্রের চেয়ে চিন্তার জগতেই ছিলো অধিকতর ব্যাপক ও শক্তিশালী, যেমনটি হয়েছিলো

[১] A Sarvey of Indian History, p 132

অন্যান্য ভূখণ্ডেও। কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে এখানে (ভারতবর্ষে) ইসলামের ইতিহাস রাজশাসনের সাথে যুক্তরূপে পরিচিত হয়ে এসেছে। ফলে ইসলামের মূল সত্য এবং ইসলামের মহান দান ও অবদান লোকচক্ষুর আড়ালে রয়ে গেছে।'

মোটকথা, ইসলাম ও নবুয়তে মুহম্মদির আবির্ভাবের পর সভ্য পৃথিবীর কোন ধর্ম ও সমাজ এ দাবী করতে পারবে না যে, তা ইসলাম দ্বারা কমবেশী প্রভাবিত হয়নি।

জীবন ও সভ্যতা এবং ইসলাম ও মুসলিম উম্মাহ মহাকালের পথে যেভাবে চলছিলো সেভাবেই যদি চলতে থাকতো এবং মানবজাতি যদি সেই মহান জামা'আতের নেতৃত্বেই পরিচালিত হতে থাকতো যাদের উত্থানই হয়েছিলো কল্যাণের পথে মানবসভ্যতার নেতৃত্বদানের জন্য তাহলে মানবজাতির ইতিহাস অবশ্যই এই কলঙ্কিত রূপ থেকে অনেক ভিন্ন হতো যা এখন আমাদের সামনে রয়েছে, যাতে লেখা আছে শুধু মানবতার দুর্ভোগ ও দুর্যোগের মর্মন্তুদ কাহিনী। তখন আমাদের সামনে থাকতো এমন এক সুন্দর সমুজ্জ্বল ইতিহাস যা নিয়ে গোটা মানবজাতি গর্ব করতো এবং যা মানবতার চক্ষু জুড়িয়ে দিতো। কিন্তু তাকদীরের লিখন অন্যকিছু লিখে দিলো এবং স্বয়ং মুসলিম উম্মাহর জীবনেই শুরু হয়ে গেলো অবক্ষয় ও অধঃপতন।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

মুসলিম উম্মাহর অধঃপতন

দু'টি যুগের মধ্যে পার্থক্য-রেখা

জনৈক সাহিত্যিক বলেন, দু'টি ক্ষেত্রে নিখুঁত সূচনাকাল নির্ধারণ করা সম্ভব নয়; ব্যক্তিজীবনে নিদ্রা এবং জাতীয় জীবনে অধঃপতন।' আসলেও তাই। কোন জাগ্রত ব্যক্তি সম্পর্কে সুনির্দিষ্টভাবে একথা বলা সম্ভব নয় যে, ঠিক কখন সে ঘুমিয়ে পড়েছে। তদ্রূপ কোন জাতি সম্পর্কেও একথা বলা সম্ভব নয় যে, ঠিক কোন্ সময়টাতে জাতির অধঃপতন শুরু হয়েছে। বস্তুত এদু'টি বিষয় তখনই পূর্ণ উপলব্ধিতে আসে যখন তা ভালোভাবে জেঁকে বসে। তবে অধিকাংশ জাতির ইতিহাসে এটা সত্য হলেও মুসলিম উম্মাহর জীবনে অবক্ষয় ও অধঃপতনের সূচনা ছিলো বেশ স্পষ্ট। এমনকি যদি উন্নতি ও অবনতির এই মধ্যবর্তী পার্থক্য-রেখাটির উপর অঙ্গুলিনির্দেশ করতে বলা হয় তাহলে অতি সহজেই আমরা সেই ঐতিহাসিক রেখাটি চিহ্নিত করতে পারবো যা খিলাফাতে রাশেদা ও আরব-মুসলিম শাসনকে পৃথক করে রেখেছে।

আমরা যদি একনজরে মুসলিম উম্মাহর উত্থানের কারণসমূহ পর্যালোচনা করতে চাই তাহলে দেখতে পাবো যে, সূচনাকালে প্রত্যক্ষভাবে মুসলিম শাসন এবং পরোক্ষভাবে বিশ্বশাসনের দায়িত্বভার এমন একদল মানুষের হাতে ছিলো যারা প্রত্যেকে ঈমান ও বিশ্বাস, জীবন ও চরিত্র, নীতি ও নৈতিকতা, মহত্ত্ব ও মহানুভবতা, আত্মশুদ্ধি ও আধ্যাত্মিকতা এবং পূর্ণতা ও ভারসাম্যপূর্ণতার ক্ষেত্রে মুহম্মদ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জীবন্ত মু'জিযা ছিলেন। ইসলামের ছাঁচে তাঁদের তিনি এমন পরিপূর্ণরূপে গড়ে তুলেছিলেন যে, দেহসত্তা ছাড়া অন্যকোন ক্ষেত্রে অতীতের সঙ্গে তাদের কোন সম্পর্ক ছিলো না; না চিন্তা-চেতনায়, না

ভাবে ও স্বভাবে এবং না চাওয়া ও চাহিদার ক্ষেত্রে। সূক্ষ্ম বিচারকের দৃষ্টিতে পর্যালোচনা করেও তাঁদের জীবন ও চরিত্রে ইসলামের প্রাণ ও চেতনার পরিপন্থী জাহিলিয়াতের সামান্য কোন চিহ্নও খুঁজে পাওয়া যেতো না। বরং নির্দ্বিধায় বলা যায়, ইসলামকে মানবরূপে উপস্থিত করা হলে তা হুবহু তাঁদেরই যে কোন একজনের মতই হতো। আগেও যেমন বলেছি, তাঁরা ছিলেন দ্বীন ও দুনিয়ার সুসমন্বয়ের যিন্দা নমুনা ও আদর্শ উদাহরণ।

একদিকে তাঁরা ছিলেন মসজিদের মাননীয় ইমাম, অন্যদিকে আদালতের মহামান্য বিচারক। মসজিদে তাঁরা দ্বীন ও ইলম শিক্ষা দিতেন এবং আদালতে বিচারকের আসনে ইনছাফ কায়েম করতেন।

একদিকে তাঁরা ছিলেন বাইতুল মালের আমানতদার ও পাহারাদার, অন্যদিকে রণাঙ্গনের যোগ্য সেনাপতি ও কুশলী যুদ্ধ-পরিচালক। রাজ্যশাসন ও প্রজাপালনে যেমন তাঁদের কোন তুলনা ছিলো না, তেমনি ইকামাতে দ্বীন ও আল্লাহর আইন প্রতিষ্ঠায়ও তাঁরা ছিলেন তুলনাহীন।

এককথায় তাঁদের প্রত্যেকে একই সঙ্গে ছিলেন মুত্তাকী, পরহেযগার ও আল্লাহ-ভীরু ধার্মিক এবং সাহসী মুজাহিদ, ফকীহ মুজতাহিদ, বিজ্ঞ বিচারক, সুদক্ষ শাসক ও কুশলী রাজনীতিক। তাঁদের একই ব্যক্তি ছিলেন দ্বীন ও দুনিয়া এবং ধর্ম ও রাজনীতির ধারক, আর তিনি হলেন খলীফাতুল মুসলিমীন ও আমীরুল মুমিনীন। তাঁর চারপাশে ছিলো এমন এক জামা'আত, যারা মসজিদে নববীতে এবং নববী শিক্ষাঙ্গনে শিক্ষা অর্জন করে অভিন্ন ছাঁচে গড়ে উঠেছেন। তাঁরা অভিন্ন চিন্তা-চেতনা এবং আত্মা ও আত্মিক-তার অধিকারী ছিলেন। তাঁদের শিক্ষা, দীক্ষা ও তারবিয়াত ছিলো এক ও অভিন্ন। শাসনকার্যে ও অন্যান্য বিষয়ে খলীফা তাঁদের সঙ্গে পরামর্শ করতেন এবং তাঁদের সাহায্য নিতেন। তাঁদের উপস্থিতি ও পরামর্শ ছাড়া উম্মাহর কোন গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে তিনি সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতেন না। ফলে তাঁদের চিন্তা-ভাবনা ও প্রাণ-চেতনা সমাজে ও প্রশাসনে এবং মানুষের জীবন ও চরিত্রে গভীরভাবে প্রতিফলিত হতো এবং তাঁদের স্বভাব-বৈশিষ্ট্য ও চাহিদা-প্রবণতা সর্বত্র পূর্ণরূপে প্রতিবিম্বিত হতো। তাই মানুষের আত্মা ও জড়সত্তা, ইহজীবন ও পরজীবন এবং ধর্ম ও রাজনীতির মধ্যে কোন দ্বন্দ্ব-সঙ্ঘাত ছিলো না। তদ্রূপ নীতি ও প্রবৃত্তি এবং উদ্দেশ্য ও নৈতিকতার মধ্যে ছিলো না কোন রেষারেষি; এমনকি বিভিন্ন সমাজশ্রেণীর মধ্যেও ছিলো না কোন সঙ্ঘর্ষ।

এককথায় ইসলামী সালতানাত ও মুসলিম সমাজ ছিলো তার পুরোধাপুরুষদের আখলাক ও চরিত্র, স্বভাব ও বৈশিষ্ট্য এবং পূর্ণতা ও ভারসাম্যপূর্ণতার আদর্শ প্রতিচ্ছবি।

জিহাদ ও ইজতিহাদ থেকে বিচ্যুতি

বস্তুত বিশ্বের বুকে ইসলামী ইমামাত ও নেতৃত্ব এবং শাসন ও রাজত্ব প্রতিষ্ঠার জন্য বেশ কিছু সংবেদনশীল ও সুবিস্তৃত গুণ ও যোগ্যতার অনিবার্য প্রয়োজন। সংক্ষেপে সেগুলোকে আমরা জিহাদ ও ইজতিহাদ, এদু'টি শব্দে প্রকাশ করতে পারি। যে কোন ব্যক্তি বা দল ইসলামী ইমামাতের মহান মর্যাদায় অভিষিক্ত হওয়ার অভিলাষী হবে তাদেরকে অবশ্যই সততা, সত্যবাদিতা এবং তাকওয়া ও ন্যায়পরতার পাশাপাশি জিহাদ ও ইজতিহাদেরও পূর্ণ যোগ্যতার অধিকারী হতে হবে।

বাহ্যত শব্দদু'টি খুব সহজ-সরল, কিন্তু কার্যত তা অত্যন্ত ব্যাপক ও মর্মসমৃদ্ধ। জিহাদ অর্থ জীবনের প্রিয়তম ও মূল্যবানতম উদ্দেশ্য অর্জনের জন্য চূড়ান্ত প্রচেষ্টা ও সর্বশক্তি ব্যয় করা। মুসলিম জীবনের একমাত্র লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য হলো আল্লাহর পূর্ণ আনুগত্য ও সন্তুষ্টি অর্জন এবং আল্লাহর আদেশ-নিষেধ ও বিধানের সামনে পরিপূর্ণ আত্মসমর্পণ। আর সেজন্য প্রয়োজন এক সুদীর্ঘ জিহাদ ও সুকঠিন সংগ্রামের। এই জিহাদ ও সংগ্রাম হবে ঐসব চিন্তা-বিশ্বাস, চাহিদা ও প্রবৃত্তি এবং শিক্ষা-দীক্ষা ও আদর্শের বিরুদ্ধে যা আল্লাহর প্রতি আনুগত্যের পথে প্রতিবন্ধক হয়; তদ্রূপ ভিতরের ও বাইরের ঐসব মিথ্যা উপাস্যের বিরুদ্ধে যারা আল্লাহর ইবাদত ও বন্দেগীর ক্ষেত্রে প্রতিদ্বন্দ্বী হয়ে দাঁড়ায়। পরিপূর্ণ আনুগত্য ও আত্মসমর্পণের এ মহৎ গুণ অর্জনের পর একজন মুসলিমের অবশ্যকর্তব্য হবে আপন সমাজে, চারপাশের জনপদে এবং পর্যায়ক্রমে সারা পৃথিবীতে আল্লাহর আদেশ, বিধান ও শাসন প্রতিষ্ঠার জিহাদে আত্মনিয়োগ করা এবং সর্বাত্মক প্রচেষ্টায় নিয়োজিত হওয়া। এটা হলো আল্লাহর পক্ষ হতে তার উপর অর্পিত অপরিহার্য দায়িত্ব, তদুপরি মানবজাতির প্রতি দয়া ও সহৃদয়তারও এটাই দাবী। কেননা মানবতা ও সভ্যতাকে রক্ষা করার এটাই একমাত্র পথ, এমনকি তার আত্মকল্যাণের জন্যও এটা অপরিহার্য। কারণ এই জিহাদ ও মুজাহাদা ছাড়া ব্যক্তিজীবনের ইবাদত ও আনুগত্যও দুসাধ্য, বরং অসম্ভব হয়ে পড়ে। আল-কোরআনের পরিভাষায় এটাকেই বলা হয়েছে 'ফিতনা'।

বলাবাহুল্য যে, মানুষ ও পশু-প্রাণী এবং উদ্ভিদ ও জড়বস্তুসহ সমগ্র বিশ্বজগত আল্লাহর ইচ্ছার অধীন এবং তাঁর জাগতিক নিয়ম ও প্রাকৃতিক বিধানের পূর্ণ অনুগত। ইরশাদ হয়েছে–

أَفَغَيْرَ دِينِ ٱللَّهِ يَبْغُونَ وَلَهُۥٓ أَسْلَمَ مَن فِى ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَٱلْأَرْضِ طَوْعًا وَكَرْهًا وَإِلَيْهِ يُرْجَعُونَ ﴿٨٣﴾

তো তারা কি আল্লাহর দ্বীন ছাড়া অন্যকিছু চায়, অথচ তাঁরই আনুগত্য গ্রহণ করেছে যা কিছু রয়েছে আকাশমণ্ডলীতে এবং পৃথিবীতে, ইচ্ছায় বা অনিচ্ছায়, আর তারা তাঁরই সমীপে প্রত্যাবর্তিত হবে।' (আলে ইমরান, ৩ : ৮৩)

আরো ইরশাদ হয়েছে–

أَلَمْ تَرَ أَنَّ ٱللَّهَ يَسْجُدُ لَهُۥ مَن فِى ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَمَن فِى ٱلْأَرْضِ وَٱلشَّمْسُ وَٱلْقَمَرُ وَٱلنُّجُومُ وَٱلْجِبَالُ وَٱلشَّجَرُ وَٱلدَّوَآبُّ وَكَثِيرٌ مِّنَ ٱلنَّاسِ ۖ وَكَثِيرٌ حَقَّ عَلَيْهِ ٱلْعَذَابُ ۗ وَمَن يُهِنِ ٱللَّهُ فَمَا لَهُۥ مِن مُّكْرِمٍ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ يَفْعَلُ مَا يَشَآءُ ۩ ﴿١٨﴾

তুমি কি দেখো না যে, আল্লাহর সামনেই সিজদাবনত রয়েছে যারা আছে আকাশমণ্ডলে ও পৃথিবীতে এবং (সিজদাবনত) সূর্য, চন্দ্র, তারকারাজি, পাহাড়পর্বত, বৃক্ষ ও পশু-প্রাণী এবং বহু মানুষ; আর অনেকের উপর অবধারিত হয়ে গেছে আযাব। আর আল্লাহ যাকে অপদস্থ করেন, তার জন্য নেই কোন মর্যাদা-দানকারী। অবশ্যই আল্লাহ যা ইচ্ছা করেন তা করেন।' (আল-হাজ্জ, ২২ : ১৮)

এট হলো প্রাকৃতিক ও বিশ্বজাগতিক বিধান, যাতে মানুষের প্রয়াস-প্রচেষ্টার কোন ভূমিকা নেই। সৃষ্টিজগতে জীবন-মৃত্যু এবং উন্মেষ- বিকাশের যে বিধান আল্লাহ নির্বাচন করেছেন এবং প্রত্যেক শরীর ও স্বভাবের জন্য যে ব্যবস্থা নির্ধারণ করেছেন সেই নিয়ম ও বিধানের বৃত্তেই সবাই বিচরণ করছে এবং করতেই থাকবে; তা থেকে চুল পরিমাণ বিচ্যুত হওয়ার ক্ষমতা ক্ষুদ্র-বৃহৎ কোন সৃষ্টিরই নেই। সুতরাং এক্ষেত্রে মানুষের চেষ্টা-মেহনতের না প্রয়োজন আছে, না অবকাশ। মুসলিম উম্মাহকে যে জিহাদ ও মুজাহাদার আদেশ করা হয়েছে তা

হলো আল্লাহর বিধান ও শারী'আত প্রতিষ্ঠার জিহাদ এবং ইকামাতে দ্বীন ও ই'লায়ে কালিমাতুল্লাহ-এর মুজাহাদা, যা নবী-রাসূলগণ নিয়ে এসেছেন। যেহেতু ঐশী বিধান ও আসমানী শারী'আতের বিপক্ষ শক্তি ও তার আন্দোলন পৃথিবীতে সবসময় আছে এবং থাকবে সেহেতু জিহাদ ও মুজাহাদাও কিয়ামত পর্যন্ত অব্যাহত থাকবে। অবশ্য জিহাদ ও মুজাহাদার অসংখ্য শ্রেণী ও প্রকার রয়েছে, যার মধ্যে একটি হলো যুদ্ধ ও লড়াই এবং পরিবেশ-পরিস্থিতির প্রেক্ষিতে কখনো তা সর্বশ্রেষ্ঠ জিহাদ বলেও গণ্য হয়, যার উদ্দেশ্য হলো, ইসলামের সমকক্ষ ও প্রতিদ্বন্দ্বী কোন শক্তির অস্তিত্ব যেন পৃথিবীতে না থাকে, যা মানুষকে খাহেশাত ও কুপ্রবৃত্তি এবং শিরক ও কুফুরির দিকে টেনে নিতে পারে। তাই ইরশাদ হয়েছে–

وَقَٰتِلُوهُمْ حَتَّىٰ لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ ٱلدِّينُ لِلَّهِ ۖ

'আর 'কিতাল' করো তাদের বিরুদ্ধে, যেন না থাকে কোন ফিতনা এবং (যেন) হয়ে যায় পূর্ণ আনুগত্য আল্লাহর জন্য।' (বাকারাহ, ২ : ১৯৩)

এই জিহাদ ফী সাবীলিল্লাহর অন্যতম দাবী এই যে, মানুষ ইসলামের পূর্ণ পরিচয় ও পরিপূর্ণ জ্ঞান অর্জন করবে, যার প্রতিষ্ঠা ও বাস্তবায়নের জন্য সে জিহাদ করতে চায়, তদ্রূপ কুফর ও জাহিলিয়াত সম্পর্কেও তার পূর্ণ অবগতি থাকবে, যার মূলোৎপাটনের জন্য সে লড়াই করতে চায়। ইসলাম সম্পর্কে তার জ্ঞান হবে সঠিক ও নির্ভুল এবং কুফুর সম্পর্কেও তার অবগতি হবে পুঙ্খানুপুঙ্খ, যাতে বাহ্যিকতার বর্ণচ্ছটা দ্বারা কখনো সে প্রতারিত না হয়। হক-বাতিল এবং সত্য-মিথ্যা যখন যেরূপেই তার সামনে আসুক, সে যেন তা চিনতে পারে। এজন্যই হযরত ওমর ইবনুল খাত্তাব (রা) বলেছেন–

إنما ينقض الإسلام عروة عروة من نشأ فـــي الإسلام ولم يعرف الجاهليـــة

'আমার আশঙ্কা হয় যে, যার জন্ম ও প্রতিপালন হয়েছে ইসলামের পরিমণ্ডলে, অথচ জাহিলিয়াতের পূর্ণ অবগতি অর্জন করেনি, সে একটি একটি করে ইসলামের অঙ্গচ্ছেদন করে ফেলবে।'

এটা অবশ্য ঠিক যে, কুফুর ও জাহিলিয়াতের যাবতীয় প্রকার ও প্রকৃতি এবং প্রকাশ ও অভিপ্রকাশ সম্পর্কে সূক্ষ্ম-নির্খুত ও পরিপূর্ণ অবগতি প্রত্যেক সাধারণ মুসলমানের জন্য জরুরি নয় এবং সম্ভবও নয়, তবে কুফুর ও জাহিলিয়াতের

বিরুদ্ধে জিহাদে যারা নেতৃত্ব দেবে এবং সামনের কাতারে দাঁড়িয়ে লড়াই করবে তাদের জ্ঞান ও অবগতি অবশ্যই সাধারণ ও মধ্যস্তরের মানুষের চেয়ে বেশী হতে হবে এবং ইসলাম ও কুফুর উভয় সম্পর্কেই তাদের জ্ঞান হতে হবে পরিপূর্ণ ও পূর্ণাঙ্গ।

তদ্রূপ কুফুর ও জাহিলিয়াতের বিরুদ্ধে জিহাদ ও সংগ্রামের ক্ষেত্রে তাদের সর্বপ্রকার শক্তি ও প্রস্তুতিও থাকতে হবে এবং তা হতে হবে সাধ্যের ভিতরে চূড়ান্ত স্তরে, যাতে তারা লোহার মুকাবেলায় লোহা হয়ে, এমনকি সম্ভব হলে ইস্পাত হয়ে এবং বাতাসের বিরুদ্ধে ঝড় হয়ে ময়দানে আসতে পারে এবং যুগের বাতিল শক্তির বিরুদ্ধে সর্বশক্তি দিয়ে লড়াই করতে পারে। সম্ভাব্য সকল উপায়-উপকরণ যেন তারা অর্জন করে এবং মানুষের জ্ঞান-প্রযুক্তি যত অস্ত্র ও যন্ত্র এবং কল ও কৌশল উদ্ভাবন করেছে সবই যেন তারা আয়ত্ত করে। কারণ আল্লাহ তা'আলার সুস্পষ্ট আদেশ হলো–

وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ وَآخَرِينَ مِن دُونِهِمْ لَا تَعْلَمُونَهُمُ اللَّهُ يَعْلَمُهُمْ وَمَا تُنفِقُوا مِن شَيْءٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يُوَفَّ إِلَيْكُمْ وَأَنتُمْ لَا تُظْلَمُونَ ۝

'আর তোমরা প্রস্তুত করো তাদের মুকাবেলার জন্য তোমাদের সাধ্যের সকল শক্তি এবং অশ্বদল। তা দ্বারা ভীত-সন্ত্রস্ত করবে তোমরা আল্লাহর শত্রুকে এবং তোমাদের শত্রুকে এবং তাদেরকে ছাড়া আরো কিছু লোককে, যাদের তোমরা চেনো না, আল্লাহ তাদের চেনেন। আর আল্লাহর রাস্তায় (জিহাদের প্রস্তুতিতে) যা কিছু তোমরা ব্যয় করবে তার প্রতিদান তোমাদের পূর্ণরূপে দান করা হবে, আর তোমাদের প্রতি কোন অবিচার করা হবে না।' (আনফাল, ৮ : ৬০)

আর ইজতিহাদ দ্বারা উদ্দেশ্য এই যে, মুসলিম উম্মাহর ইমামাত ও নেতৃত্ব এমন সুযোগ্য মানুষের হাতে থাকবে যারা উম্মাহর জীবনে, বিশ্বের অঙ্গনে এবং মুসলিম শাসিত অঞ্চলে নব-উদ্ভূত সকল সমস্যার সঠিক সমাধান দিতে পারেন, যেগুলোর উত্তর বিধিবদ্ধ মাযহাব ও সঙ্কলিত ফিকাহগ্রন্থে পাওয়া যায় না। শারী'আতের নিগূঢ় তত্ত্ব এবং ইসলামী আইনের মূলনীতিমালা সম্পর্কে তাদের থাকতে হবে পূর্ণ জ্ঞান এবং থাকতে হবে– একক বা সমষ্টিগত– এমন উদ্ভাবনী

ও ইজতিহাদী যোগ্যতা, যাতে নতুন যে কোন সমস্যার যথার্থ ইসলামী সমাধান তারা নির্ধারণ করতে পারেন এবং সঙ্কটকালে মুসলিম উম্মাহকে নির্ভুলভাবে পথপ্রদর্শন করতে পারেন।

তাঁরা হবেন এমন মেধা ও উদ্যম এবং জ্ঞান ও প্রজ্ঞার অধিকারী যাতে আল্লাহর সৃষ্ট সকল প্রাকৃতিক শক্তিকে কাজে লাগাতে পারেন এবং ঐসব সম্পদ ব্যবহার করতে পারেন যা আল্লাহ ভূমিতে ও ভূগর্ভে লুকিয়ে রেখেছেন। তাদেরকে এটা নিশ্চিত করতে হবে যেন সমস্ত শক্তি ও সম্পদ ইসলাম ও মুসলিম উম্মাহর সেবায় নিয়োজিত হয়; শয়তান ও তাগুতি শক্তি যেন তাদের অশুভ উদ্দেশ্যে এবং পৃথিবীতে অনাচার-পাপাচার সৃষ্টির কাজে ঐগুলো ব্যবহার করতে না পারে।

উম্মাহর জীবনে রাজতন্ত্রের অশুভ প্রভাব (যোগ্য হাত থেকে অযোগ্য হাতে উম্মাহর ইমামাত)

কিন্তু মানবজাতির দুর্ভাগ্য এই যে, খিলাফাতে রাশেদার পর ইসলামী উম্মাহর ইমামাতের মহাগুরুত্বপূর্ণ দায়িত্বভার ক্রমে এমন লোকদের দখলে চলে গেলো যারা কোনভাবেই এর যোগ্য ছিলো না এবং এজন্য তাদের যথাযথ প্রস্তুতিও ছিলো না। তাদের পূর্ববর্তীগণ, এমনকি তাদের সমকালীন অনেকে যে দ্বীনী তারবিয়াত ও আধ্যাত্মিক দীক্ষা গ্রহণ করেছিলেন তা থেকে তারা বঞ্চিত ছিলো, বরং আরবদের প্রাচীন গোত্রীয় চিন্তা-চেতনা ও ঝোঁক-প্রবণতা থেকেও তাদের মন-মস্তিষ্ক সম্পূর্ণ মুক্ত ছিলো না। ইসলামের শিক্ষা, আদর্শ ও ভাবধারায় তারা এতটা আত্মস্থ ছিলো না, ইসলামী উম্মাহর নেতৃত্বদানের জন্য যা ছিলো অপরিহার্য। জিহাদী চেতনা ও ইজতিহাদী যোগ্যতা কোনটাই তাদের ছিলো না, যা ইসলামী খিলাফাতের গুরু-দায়িত্ব বহন এবং বিশ্বের নেতৃত্ব গ্রহণের জন্য ছিলো জরুরী। আর এটা উমাইয়া ও আব্বাসী উভয় খিলাফাতের ক্ষেত্রেই ছিলো প্রায় সমান সত্য। পূর্ণ ব্যতিক্রম ছিলেন শুধু আদর্শ খলীফা হযরত ওমর বিন আব্দুল আযীয (রহ)।

এর ফলে ইসলামের মযবুত দেয়ালে এমন এমন ফাটল দেখা দিলো, যা আর বন্ধ করা সম্ভব হয়নি এবং ইসলামী উম্মাহর জীবনে এমন বিচ্যুতি ও বিকৃতি ঘটলো এবং একের পর এক এমন সব ফিতনা ও দুর্যোগ ধেয়ে আসতে লাগলো যা রোধ করা কারো পক্ষেই সম্ভব হয়নি। এখানে আমরা খুব সংক্ষেপে এগুলোর বিবরণ তুলে ধরছি।

রাজনীতি থেকে ধর্মের নির্বাসন

ইসলাম তো সাধারণ অর্থে একটি ধর্মমাত্র ছিলো না; ইসলাম তো ছিলো মানবজাতির ইহকালীন ও পরকালীন একটি পূর্ণাঙ্গ জীবনবিধান। মানুষের ব্যক্তিজীবন, পারিবারিক জীবন, সমাজজীবন ও আন্তর্জাতিক জীবন, সবকিছুকে ইসলাম সম্পূর্ণরূপে নিয়ন্ত্রণ করে। ইসলামের দ্ব্যর্থহীন দাবী হলো, সবকিছুতে শুধু আল্লাহর আদেশ নিষেধ কার্যকর হবে, অন্যকারো নির্দেশ নয়। সুতরাং রাজনীতি ও দেশশাসনের ক্ষেত্রেও রয়েছে ইসলামের নিজস্ব আদেশ-নিষেধ ও বিধিবিধান। খিলাফতে রাশিদার দায়িত্ব ছিলো ব্যক্তিজীবন থেকে শুরু করে রাজ্যশাসন পর্যন্ত সর্বত্র আল্লাহর আদেশ-নিষেধের পরিপূর্ণ বাস্তবায়ন এবং খোলাফায়ে রাশিদীন পূর্ণ আমানতদারির সঙ্গে সে দায়িত্ব পালন করেছেন। কিন্তু পরবর্তীকালে দ্বীন ও সিয়াসাত তথা ধর্ম ও রাজনীতির মধ্যে কার্যত বিভাজন সৃষ্টি হয়ে গিয়েছিলো।

শাসনক্ষমতা এমন লোকদের হাতে চলে গিয়েছিলো যাদের না দ্বীন ও শারী'আতের প্রয়োজনীয় জ্ঞান ও প্রজ্ঞা ছিলো, না তারা ওলামায়ে উম্মতের পৃষ্ঠপোষকতা গ্রহণ করেছিলো। রাজনীতি ও রাজ্যশাসনে তাদের ছিলো একচ্ছত্র ক্ষমতা। খেয়াল-খুশিতে, বা স্বার্থ-সুবিধার তাগাদায় তারা ওলামায়ে উম্মত ও ফোকাহায়ে দ্বীন-এর সাহায্য নিতো এবং রাজনৈতিক ও সামাজিক স্বার্থে নিজেদের মত করে তাঁদের ব্যবহার করতো, অর্থাৎ ওলামায়ে উম্মতের পরামর্শ যতটুকু ইচ্ছা গ্রহণ করতো, যতটুকু ইচ্ছে বর্জন করতো। আবার সুযোগ হলে একেবারেই মুখ ফিরিয়ে নিতো। এমনকি অনেক সময় তাঁদের উপর নির্মম নির্যাতন চালাতো। এভাবে রাজনীতি ও রাজ্যশাসন দ্বীনের নিয়ন্ত্রণ থেকে মুক্ত হয়ে গিয়েছিলো এবং ইসলামী খিলাফত রোম ও পারস্যের মত নিছক স্বেচ্ছাচারী রাজতন্ত্রে পরিণত হয়েছিলো। খলীফা ও তার খিলাফত তখন যেন ছিলো লাগামহীন অবাধ্য উট।

পরিস্থিতি যখন এমন গুরুতর, তখন ওলামায়ে উম্মতের অবস্থা ছিলো এই যে, কেউ হুকুমতের প্রকাশ্য বিরোধিতায় অবতীর্ণ হতেন এবং কখনো বিদ্রোহ ঘোষণা করতেন। কেউ সংশোধনের চেষ্টায় কখনো কঠোর, কখনো কোমল ভাষায় তিরস্কার করতেন এবং উপদেশ দিতেন। তাঁরা সব দেখতেন, শোনতেন, আর নীরবে দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলতেন; কার্যত তাঁদের করার কিছুই ছিলো না। আরেকদল সংশোধনে হতাশ হয়ে সবকিছু থেকে নিজেদের গুটিয়ে নিয়েছিলেন।

রাজনীতি থেকে স্বেচ্ছানির্বাসনে গিয়ে তাঁরা আত্মশোধন ও ব্যক্তিসংশোধনের প্রচেষ্টায় নিয়োজিত হয়েছিলেন। হয়ত তাঁরা ভাবতেন, এভাবে যদি নিজেকে ও অল্পসংখ্যক অনুসারীকে দুনিয়ার ফিতনা থেকে বাঁচানো যায়, সেটাও অনেক বড় কামিয়াবি।

কেউ দ্বীনের কল্যাণ ভেবে শাসক ও সরকারের সঙ্গে সহযোগিতার নীতি গ্রহণ করেছিলেন। একদল এমনও ছিলো যারা শুধু হালুয়া-রুটির জন্য শাহী দরবারে হাজিরা দিতো। সব মিলিয়ে ফলাফল এই ছিলো যে, তত্ত্বে ও বিশ্বাসে না হলেও কার্যত দ্বীন ও সিয়াসাত এবং ধর্ম ও রাজনীতি সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছিলো। আরো সরল ভাষায় যদি বলি, খিলাফতে রাশেদা-পূর্ব দুনিয়ার শাসনব্যবস্থার মত নামসর্বস্ব খিলাফতও তেমনি ধর্মহীন ও চরিত্রহীন অবয়ব লাভ করেছিলো। দ্বীন ও শরী'আত যেন ছিলো ডানাকাটা পাখী, কিংবা শেকলপরা বন্দী, আর রাজনীতি ছিলো অবাধ ও মুক্ত-স্বাধীন। ধর্মের বাঁধন ও নিয়ন্ত্রণ শিথিল হতেই থাকলো, আর রাজনীতির ভ্রষ্টাচার ও স্বেচ্ছাচার বেড়েই চললো। শেষ পর্যন্ত আহলে ইলম ও আহলে সিয়াসাত দু'টি বিপরীত শ্রেণীরূপে আত্মপ্রকাশ করলো, যাদের অপরিচয় ও দূরত্ব কখনো কখনো বিরোধ ও বিদ্বেষের রূপ নিতো।

শাসকদের মধ্যে জাহিলিয়াতের ভাবধারা

শাসকবর্গ, এমনকি খিলাফাতের 'আমানতদার' ব্যক্তিটিও দ্বীন ও আখলাক এবং ধর্ম ও নৈতিকতার আদর্শ ছিলেন না, বরং অনেকেই জাহেলিয়াতের চিন্তা-চেতনা ও রোগজীবাণু বহন করতো। ফলে স্বভাবতই জীবন ও সমাজের সর্বত্র তা সংক্রমিত হয়ে পড়েছিলো এবং মানুষ তাদের স্বভাব-চরিত্র ও নীতি-নৈতিকতাকেই অনুসরণ করতে শুরু করেছিলো। এটাই মানুষের স্বভাব ও ফিতরাত। তাই বলা হয়, 'আন্নাসু আলা দ্বীনি মুলূকিহিম'— রাজার চালে রাজ্য চলে।

দ্বীনের নিয়ন্ত্রণ, নৈতিকতার শাসন এবং বিবেকের অনুশাসন একেবারে শিথিল হয়ে পড়েছিলো। '*আমর বিল মা'রূফ ও নাহী আনিল মুনকার*' হয়ে পড়েছিলো নিষ্ক্রিয় ও নিষ্ফল। কারণ তার পিছনে ছিলো না সরকারি ব্যক্তি ও শক্তি। দ্বীনদার শ্রেণীর স্ব-উদ্যোগের আদেশ-নিষেধের কেউ পরোয়া করতো না। কেননা তাদের না ছিলো তিরস্কারের ক্ষমতা, না পুরস্কারের সামর্থ্য। অথচ খাহেশাত ও প্রবৃত্তির উপকরণ ছিলো প্রচুর এবং অনাচার ও পাপাচারের হাতছানি ছিলো প্রবল। ফলে

ইসলামী সমাজ ও মুসলিম জীবনে জাহিলিয়াত আবার মাথাচাড়া দিয়ে উঠলো এবং দ্রুত শক্তি বিস্তার করতে লাগলো। আর দ্বীন ও দ্বীনিয়াত ভুলে মানুষ ডুবে গেলো ভোগ-বিলাস, খেল-বিনোদন ও খাহেশাতের গলীয গান্দেগিতে। চিরস্থায়ী আখেরাতের পরিবর্তে মানুষের তখন লক্ষ্য ছিলো দুনিয়ার ধনদৌলত এবং ক্ষণস্থায়ী যিন্দেগির শানশৌকত। নফস ও নফসানিয়াতের বাজার ছিলো গরম। নাচ-গান এবং সুর ও সুরার মায়ফিল ছিলো জমজমাট। একথায় সমাজের প্রায় সবমানুষ সবকিছু ভুলে সবকিছুতে ডুবে গিয়েছিলো।

ইছফাহানীর কিতাবুল আগানী এবং জাহিযের কিতাবুল হায়াওয়ান খুলুন; এদু'টোই আপনাকে খুলে খুলে বলে দেবে, মানুষ তখন কতটা ভোগবাদী ও প্রবৃত্তিপরায়ণ হয়ে পড়েছিলো! কেমন সর্বগ্রাসী ছিলো দুনিয়ার লোভ-লালসা এবং পাপসর্বস্ব জীবনের আসক্তি! জীবন ও চরিত্রের এত দূর অধঃপতনের পর এবং অনাচার, পাপাচার ও ভোগ-বিলাসের এমন অতলে ডুবে যাওয়ার পর কোন জাতির পক্ষে আর যাই হোক, ইসলামের প্রতিনিধিত্ব করা এবং নবুয়তের স্থলবর্তী হয়ে আল্লাহ ও আখেরাতের পথে দাওয়াত দেয়া এবং তাকওয়া ও তাহারাতের প্রতি উদ্বুদ্ধ করা এবং জীবন ও চরিত্রে মানুষের জন্য আদর্শ হওয়া কিছুতেই সম্ভব নয়, এমনকি দীর্ঘকাল স্বাধীন জীবনের স্বাদ গ্রহণ করাও তাদের পক্ষে সম্ভব নয়। যিল্লতি ও বরবাদি এবং লাঞ্ছনা ও অপদস্থতাই শুধু হতে পারে তাদের ভাগ্যলিপি। আলকোরআনের ভাষায়–

سُنَّةَ ٱللَّهِ فِى ٱلَّذِينَ خَلَوْا۟ مِن قَبْلُ ۖ وَلَن تَجِدَ لِسُنَّةِ ٱللَّهِ تَبْدِيلًا ﴿٦٢﴾

'এটাই ছিলো আল্লাহর শাশ্বত বিধান ঐসকল জাতির ক্ষেত্রে যারা বিগত হয়েছে, আর কিছুতেই পাবে না তুমি আল্লাহর বিধানে কোন পরিবর্তন।' (আহযাব, ৩৩ : ৬২)

ইসলামের মন্দ প্রতিনিধিত্ব

এই অপদার্থ শাসকবর্গ তাদের যাবতীয় আচরণে উচ্চারণে প্রকৃতপক্ষে নিজেদের ভ্রান্ত চিন্তা-চেতনা এবং ভ্রষ্ট রাজনীতি ও শাসনব্যবস্থারই শুধু প্রতিনিধিত্ব করছিলো; ইসলামের শিক্ষা ও আদর্শ, ইসলামের রাজনীতি ও সমরনীতি এবং ইসলামের সভ্যতা ও শাসনব্যবস্থার খুব কম প্রতিফলনই ছিলো তাদের জীবনে। ফলে অমুসলিমদের সামনে ইসলামের বাণী ও বার্তা এবং দাওয়াত ও আহ্বান তার সব আবেদন হারিয়ে ফেলেছিলো, বরং ইসলামের প্রতি তাদের আস্থা ও

আশ্বস্তিই দুর্বল হয়ে পড়েছিলো। জনৈক ইউরোপীয় ঐতিহাসিকের ভাষায়– 'ইসলামের অবনতি শুরু হয়েছিলো এজন্য যে, মানবজাতি তাদের সততা ও সত্যতায় সন্দিহান হয়ে পড়েছিলো যারা এই নতুন ধর্মটির প্রতিনিধিত্ব করছিলো।'

জ্ঞানচর্চার মৌলিক ভ্রান্তি

আরেকটি বড় বেদনাদায়ক বিষয় ছিলো এই যে, অবনতি ও অবক্ষয়ের ঐ যুগে মুসলিম জ্ঞানী-মনীষিগণ যে গভীর অধ্যবসায় ও অনুসন্ধিৎসা নিয়ে অতিপ্রাকৃতিক জ্ঞান ও গ্রীক ঈশ্বরতত্ত্ব চর্চা করেছেন, প্রাকৃতিক ও প্রায়োগিক বিজ্ঞানের চর্চা-গবেষণা সেই পরিমাণ করেননি, অথচ জীবন ও জগতের নেতৃত্বদানের জন্য সেগুলোই ছিলো কার্যকর ও ফলপ্রসূ জ্ঞান। পক্ষান্তরে গ্রীক ঈশ্বরতত্ত্ব ছিলো শুধু গ্রীকদের জাতীয় প্রতিমাতত্ত্ব, যা তারা দার্শনিক পরিভাষা ও শাস্ত্রীয় পোশাকে উপস্থাপন করেছিলোমাত্র। তাতে তত্ত্ব ও সত্য এবং সার ও সর বলতে কিছুই ছিলো না, ছিলো শুধু ধারণা ও অনুমান এবং শব্দজৌলুস ও বাক্য-ঝিলিক। অথচ মুসলিম উম্মাহর বুদ্ধিবৃত্তিক জীবনে এসবের না ছিলো প্রয়োজনীয়তা, না ছিলো কোন সার্থকতা। কেননা নবী ও নবুয়তের মাধ্যমে উম্মাহকে আল্লাহ তা'আলা যাত ও ছিফাত এবং ইলাহিয়্যাত সম্পর্কে সুসংহত ও সুনিশ্চিত জ্ঞান দান করেছিলেন, যার পর ঈশ্বরতত্ত্বীয় এসব চুলচেরা দার্শনিক আলোচনা-পর্যালোচনা ও 'রাসায়নিক' বিশ্লেষণে যাওয়া ছিলো নিরর্থক, বরং ধ্বংসাত্মক। আল্লাহ তো তাদের দান করেছিলেন 'আল-ফোরকান' নামে সুস্পষ্ট হিদায়াত ও নূর। কিন্তু মুসলিম চিন্তানায়কেরা এ মহান নিয়ামতের 'শায়ানে শান' শোকর এবং যথাযোগ্য কদর করেনি, বরং দীর্ঘ কয়েক শতাব্দী তারা গ্রীক-চিন্তাপ্রসূত এসকল জ্ঞান ও শাস্ত্র নিয়েই মাথা ঘামিয়েছে এবং দার্শনিক ও কালামশাস্ত্রীয় এসকল অর্থহীন ও নিষ্ফল জটিলতায় মেধা ও বুদ্ধির অপচয় ঘটিয়েছে। এককথায় জিহাদের প্রকৃত ক্ষেত্র ত্যাগ করে তারা 'বীরবিক্রমে বুদ্ধিবৃত্তিক জিহাদ' করেছে এবং নিজেদের হাতে নিজেদের বিপর্যয় ডেকে এনেছে। এই নির্বোধ বুদ্ধিবিলাস তাদেরকে ঐসব প্রায়োগিক জ্ঞান-গবেষণা ও শাস্ত্রচর্চা থেকে দূরে সরিয়ে রেখেছে, যা দ্বারা প্রকৃতির যাবতীয় শক্তি ও সম্ভাবনা করায়ত্ত করে ইসলাম ও মুসলিম উম্মাহর কল্যাণে সেগুলো নিয়োজিত করা যায় এবং সমগ্র বিশ্বের উপর ইসলামের জাগতিক ও আধ্যাত্মিক প্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত করা যায়।

একই ভাবে তারা রূহ ও আত্মা, ফালসাফাতুল ইশরাক ও নবপ্লেটো-দর্শন এবং ওয়াহদাতুল ওজূদ ও এককসত্তাবাদ-এর জটিল আলোচনায় আত্মনিয়োগ করেছে এবং সময়, শ্রম, মেধা ও প্রতিভার বিপুল অংশ তাতেই ব্যয় করেছে।

একথা অবশ্য সত্য যে, মুসলিম মনীষিগণ প্রায়োগিক জ্ঞান ও প্রকৃতি বিজ্ঞানে যথেষ্ট অবদান রেখেছেন এবং তাদের কীর্তি ও কর্ম, গবেষণা ও উদ্ভাবনা পূর্ববর্তী-দের তুলনায় অনেক বেশী ছিলো; কিন্তু সত্য এই যে, জ্ঞানের অন্যান্য শাখায় তাদের সুবিস্তৃত অবদানের সঙ্গে এর তুলনাই হয় না। তদ্রূপ ইতিহাসের যে সুদীর্ঘ সময়কাল তারা ভোগ করেছে সেদিক থেকেও তা সন্তোষজনক ছিলো না। এসময় প্রকৃতি বিজ্ঞানের শাখায় ঐ পরিমাণ প্রতিভা ও মনীষার আবির্ভাব ঘটেনি, জ্ঞান ও শাস্ত্রের অন্যান শাখায় যেমন ঘটেছে।

পক্ষান্তরে পরবর্তী যুগের সঙ্গে যদি তুলনা করি তাহলেও বলতে হবে, প্রকৃতি বিজ্ঞান ও মহাজাগতিক বিজ্ঞানের উপর যে পরিমাণ গবেষণা ও গ্রন্থনা তারা রেখে গেছেন যদিও উত্থানকালের ইউরোপ তা থেকে বিরাটভাবে উপকৃত হয়েছে এবং মোটামুটি মূল্যায়নও করেছে; কিন্তু মাত্র সতের ও আঠারো শতকের সময়সীমায় ইউরোপের জ্ঞানী-বিজ্ঞানিগণ যে বিশাল ও সুসমৃদ্ধ গ্রন্থাগার তৈরী করেছেন তার তুলনায় সেগুলো একেবারেই নগণ্য। স্পেন ও প্রাচ্যের মুসলিম বিজ্ঞানীদের আবিষ্কার-উদ্ভাবন ও গবেষণাকর্ম নিয়ে আমরা যতই গর্ব করি পাশ্চাত্যের কীর্তি ও কর্মের পাশে তা উল্লেখযোগ্যই নয়। মানে ও পরিমাণেও নয়, নতুনত্ব ও সৃজনশীলতায়ও নয় এবং বৈজ্ঞানিক সূক্ষ্মতা ও শাস্ত্রীয় উৎকর্ষেও নয়। প্রাকৃতিক ও প্রায়োগিক জ্ঞান-বিজ্ঞানের তুলনায় আধ্যাত্মিক বিষয়াদির প্রতি ইসলামী প্রাচ্য কত বেশী যত্নবান ছিলো তা যদি বুঝতে চান তাহলে উদাহরণস্বরূপ শায়খ ইবনুল আরাবী-এর আলফুতূহাতুল মাক্কিয়্যাহ এবং প্রকৃতি বিজ্ঞানের শ্রেষ্ট গ্রন্থটির মধ্যে তুলনা করে দেখুন; প্রথমটির তত্ত্ব ও তথ্যের বিপুলতায় এবং বিষয়বস্তুর প্রতি সযত্ন প্রয়াস ও আত্মনিবেদনের গভীরতায় আপনি হতবাক হবেন এবং তা থেকেই বুঝে যাবেন, প্রাচ্যের রুচি, ঝোঁক ও প্রবণতা মূলত কী ছিলো!

শিরক ও বিদ'আতের ছড়াছড়ি

মুসলিম উম্মাহর অবক্ষয় ও অধঃপতনের এ চরম সময়কালে বিভিন্ন প্রকার শিরক ও বিদ'আত এমনভাবে ছড়িয়ে পড়েছিলো যে, আকল হতবাক হয়ে যায়!

বিশ্বাস করতেই কষ্ট হয়, এ উম্মাহ হযরত ইবরাহীমের অনুসারী তাওহীদবাদী উম্মাহ, যার নাম তিনি রেখেছেন 'মুসলিমীন'। শিরক ও বিদ'আত এবং মূর্খতা ও গোমরাহীর ঘোর অন্ধকারে ইসলামের পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন তাওহীদ প্রায় আচ্ছন্ন হয়ে পড়েছিলো এবং জাহিলিয়াতের ভ্রান্তি ও বিভ্রান্তি, চিন্তা-চেতনা ও কুসংস্কার মুসলিম জীবনের গভীরে অনুপ্রবেশ করেছিলো এবং শিকড় গেড়ে বসেছিলো। বলা যায়, সমাজজীবন ও ধর্মীয় জীবনের এক বিরাট অংশ জাহিলিয়াতের কবলে চলে গিয়েছিলো এবং মুসলিম জাতি সঠিক দ্বীন থেকে যেমন বিচ্যুত ছিলো তেমনি বাস্তব দুনিয়া থেকেও বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছিলো। অথচ বিশ্বের জাতিবর্গের মধ্যে মুসলিম উম্মাহর যা কিছু বৈশিষ্ট্য ও বিশেষত্ব তার মূল হচ্ছে এই আসমানী দ্বীন যা আল্লাহর নবী মুহম্মদ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিয়ে এসেছেন এবং উম্মাহর কাছে আমানত রেখে গেছেন। আর মৌলিকতা, নির্ভুলতা, নির্ভেজালতা ও সংরক্ষণীয়তাই হলো এই দ্বীনের একক বৈশিষ্ট্য ও অলৌকিকত্ব। এই দ্বীন হচ্ছে আল্লাহর অহী, যা চিরসংরক্ষিত–

إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ

'আমিই নাযিল করেছি এই যিকির এবং অবশ্যই আমিই তার হিফাযাতকারী।'
(সূরাতুল হাজর, ১৫ :)

এই দ্বীন হচ্ছে আল্লাহর পক্ষ হতে অবতারিত মহাপ্রজ্ঞাপূর্ণ শরী'আত যার প্রতিটি আদেশ, উপদেশ এবং প্রতিটি হুকুম বিধান পরিপূর্ণ ও নিখুঁত।–

صُنْعَ اللَّهِ الَّذِي أَتْقَنَ كُلَّ شَيْءٍ

সেই আল্লাহর কীর্তি যিনি সকল কিছুকে নিখুঁত করেছেন।' (আন-নামল, ২৭ : ৮৮)

এই দ্বীন হচ্ছে আল্লাহর পক্ষ হতে নির্ধারিত এমন এক সত্যপথ, যাতে মিথ্যা ও ভ্রান্তির সামান্যতম অনুপ্রবেশেরও অবকাশ নেই–

لَا يَأْتِيهِ الْبَاطِلُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَلَا مِنْ خَلْفِهِ تَنْزِيلٌ مِنْ حَكِيمٍ حَمِيدٍ

'তাতে আসতে পারে না বাতিল তার সম্মুখ থেকে এবং না তার পশ্চাত থেকে। (তা তো) মহাপ্রজ্ঞার অধিকারী, চিরপ্রশংসিত-এর অবতারণ।' (ফুছ্ছিলাত, ৪১ : ৪২)

সুতরাং আল্লাহ না করুন, অন্যান্য ধর্মের মত এখানেও যদি মানব-মস্তিষ্কের অনুপ্রবেশ ঘটে; খাহেশাত ও প্রবৃত্তির চাহিদা চরিতার্থ করার জন্য এখানেও যদি মানুষ হস্তক্ষেপ করে তাহলে অন্যান্য ধর্মের উপর তার কোন বৈশিষ্ট্য ও শ্রেষ্ঠত্বই তো আর বাকি থাকে না এবং এ ধর্ম উম্মাহর দুনিয়া ও আখিরাতের সৌভাগ্য ও সফলতার যামিন হতে পারে না, এমনকি এ যোগ্যতাও আর থাকে না, যাতে মানুষের বুদ্ধি ও মস্তিষ্ককে অনুগত করতে হৃদয় ও আত্মার জগতে সে কোন আবেদন সৃষ্টি করতে পারে।

দ্বীনের দাওয়াত ও তাজদীদের চিরন্তনতা

উপরে যে চিত্র তুলে ধরা হলো তারপরো একথা অবশ্যই মনে রাখতে হবে যে, অবক্ষয় ও অধঃপতনের এ দীর্ঘ সময়কালেও আল্লাহর প্রেরিত 'দ্বীনুল ইসলাম' ছিলো পূর্ণ জীবন্ত এবং সর্বপ্রকার পরিবর্তন ও বিকৃতি থেকে সম্পূর্ণ সুরক্ষিত। দ্বীন ও শরী'আত মুসলমানদের কোন ভ্রান্তি ও বিচ্যুতিতে কখনো সঙ্গ দান করেনি, বরং সতর্ক করেছে, তিরস্কার করেছে এবং অন্ধকার থেকে আলোতে ফিরে আসার আহ্বান অব্যাহত রেখেছে। এ আলোর মিনার থেকে আলোর বিচ্ছুরণ কখনো বন্ধ হয়নি। তখনো মানুষ দ্বীনের আলোতে সত্যের পথ দেখতে পেতো এবং সত্যের পতে চলতে থাকতো–

يَهْدِي بِهِ اللَّهُ مَنِ اتَّبَعَ رِضْوَانَهُ سُبُلَ السَّلَامِ وَيُخْرِجُهُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ بِإِذْنِهِ وَيَهْدِيهِمْ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ

'প্রদর্শন করেন তা দ্বারা আল্লাহ শান্তির পথ ঐ লোকদেরকে যারা তাঁর সন্তুষ্টি অনুসরণ করে এবং বের করে আনেন তিনি তাঁর ইচ্ছায় তাদেরকে যাবতীয় অন্ধকার থেকে নূরের দিকে এবং পথপ্রদর্শন করেন তাদেরকে সরল পথের দিকে।' (আল-মাইদাহ, ৫ : ১৬)

কিতাব ও সুন্নাহ তখনো মুসলিম-হৃদয়ে শিরক ও বিদ'আত এবং গোমরাহি ও জাহিলিয়াতের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ সৃষ্টি করতো। কোরআন ও সুন্নাহর উদাত্ত আহ্বানে তখনো মানুষ ভোগবাদ ও স্বেচ্ছাচারের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াতো এবং দ্বীন ও শরী'আতের যে কোন অবমাননায় ক্রুদ্ধ হতো। তখনো বহু মানুষের দিলে জাযবায়ে জিহাদ ও তামান্নায়ে শাহাদাত যিন্দা ছিলো। একারণেই ইসলামী

ইতিহাসের প্রত্যেক যুগে এবং মুসলিম বিশ্বের প্রতিটি অংশে এমন অসংখ্য মহান ব্যক্তি ও সাহসী ব্যক্তিত্বের আবির্ভাব ঘটেছে, শত প্রতিকূলতার মুখেও উম্মাহর জীবনে যারা নবীর নেয়াবাত ও প্রতিনিধিত্বের হক আদায় করেছেন এবং দ্বীনের তাজদীদ ও নবায়ন এবং পুনর্জাগরণের সুকঠিন দায়িত্ব পূর্ণ নিষ্ঠা ও প্রজ্ঞার সঙ্গে পালন করেছেন।

একদিকে তাঁরা উম্মাহর মুর্দা দিলে জিহাদের রূহ ফুঁকেছেন এবং বহু যুগের শান্ত সমুদ্রে তরঙ্গদোলা সৃষ্টি করেছেন; অন্যদিকে তাদের সামনে ইজতিহাদের বন্ধ দুয়ার খুলে দিয়েছেন এবং স্বকীয় যোগ্যতা দ্বারা মুসলিম সমাজে চিন্তার বন্ধ্যাত্ব দূর করে নতুন ইলমি চেতনা ও বুদ্ধিবৃত্তিক জাগরণ সৃষ্টি করেছেন। এমন মর্দে মুজাহিদেরও তখন অভাব ছিলো না যারা খিলাফাতে রাশেদার অনুসরণে ইসলামী হুকুমত প্রতিষ্ঠার জন্য জীবন উৎসর্গ করেছেন। এ মহান উদ্দেশ্যের পথে অনেকে যেমন শাহাদাত বরণ করেছেন তেমনি কেউ কেউ খিলাফাতে রাশেদার নূরানি যামানার ছায়াস্বরূপ স্বল্পকালীন শাসন প্রতিষ্ঠায়ও সক্ষম হয়েছেন। কোরআনের ভাষায়–

مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ رِجَالٌ صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا اللَّهَ عَلَيْهِ فَمِنْهُم مَّن قَضَىٰ نَحْبَهُ وَمِنْهُم مَّن يَنتَظِرُ وَمَا بَدَّلُوا تَبْدِيلًا

'মুমিনদের মধ্যে রয়েছে এমন কিছু লোক যারা আল্লাহর সঙ্গে কৃত তাদের ওয়াদাকে সত্য সাব্যস্ত করেছে; তারপর তাদের একদল নিজ নিজ সময় পূর্ণ করেছে, আর একদল অপেক্ষা করছে; তারা কোন প্রকার পরিবর্তন আনয়ন করেনি।' (আহযাব, ৩৩ : ২৩)

উম্মাহর এই সুনির্বাচিত জামা'আত সম্পর্কেই হাদীছ শরীফে বলা হয়েছে–

لاتزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق، لايضرهم من خذلهم حتى يأتي أمر الله وهم كذلك (رواه مسلم عن ثوبان رضي الله عنه في كتاب الإمارة)

'আমার উম্মতের একটি দল সর্বদা হকের উপর অবিচল থাকবে, তাদের কোন ক্ষতি করতে পারবে না তারা, যারা তাদের সঙ্গ পরিত্যাগ করবে, এমনকি এসে যাবে আল্লাহর ফায়ছালা, আর তারা ঐ অবস্থারই উপর অবিচল থাকবে।'

মোটকথা, জিহাদ ও তাজদীদের ইতিহাস ছিলো ধারাবাহিক ও নিরবচ্ছিন্ন; তাতে কখনো কোন শূন্যতা ছিলো না। ইছলাহ ও সংশোধন এবং তাজদীদ ও সংস্কারের মশাল সবসময় সমুজ্জ্বল ছিলো, যা এক হাত থেকে অন্য হাতে প্রজ্বলিত হয়ে এসেছে। উম্মাহর জীবনে প্রবল থেকে প্রবল ঝড়ঝঞ্ঝার সময়ও তাগূত ও বাতিল ইসলামী জাহানের এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্ত পর্যন্ত সর্বব্যাপী অন্ধকার ছড়াতে পারেনি। কোথাও না কোথাও, কেউ না কেউ দ্বীনের ঝাণ্ডা এবং সত্যের মশাল সমুচ্চ রেখেছেন। তদ্রূপ ইসলাম ও ইসলামী জাহানের সামনে যখন নতুন কোন ফেতনা ও খাতরা এবং বিপদ ও দুর্যোগ দেখা দিয়েছে তখনই কোন না কোন শেরদিল মর্দে মুজাহিদ হুঙ্কার দিয়ে ময়দানে এসেছেন এবং বিপদ-দুর্যোগের শুধু মুকাবেলাই করেননি, বরং ইসলামী উম্মাহ ও মুসলিম জাহানকে নতুন প্রাণ ও নতুন জীবন দান করেছেন।[১] ইসলামী ইতিহাসের মহান শাসক নূরুদ্দীন ও ছালাহুদ্দীন হচ্ছেন তেমনি দু'টি আলোকিত উদাহরণ।

ক্রুশেডের প্রতিরোধে মুসলিম জাহান

কয়েক শতাব্দী ধরেই খৃস্টান ইউরোপ ইসলামের বিরুদ্ধে বিদ্বেষে টগবগ করছিলো। মুসলিম উম্মাহ খৃস্টানদের সমগ্র পূর্বসাম্রাজ্য অধিকার করে রেখেছে। বাইতুল মাকদিসসহ তাদের সকল পবিত্র ভূমি তখন মুসলিম-নিয়ন্ত্রণে। কিন্তু বিভিন্ন শক্তিশালী সালতানাতের উপস্থিতি এবং তাদের অব্যাহত অগ্রাভিযানের কারণে এদিকে চোখ তুলে তাকাবারও খৃস্টানবিশ্বের সাহস ছিলো না, হামলা করা তো দূরের কথা। কিন্তু হিজরী ষষ্ঠ শতকে সেলজুকীদের পতনের পর মুসলিম জাহান দুর্বলতার চরমে পৌঁছে যায়, বরং বলা ভালো, অল্প সময়ের মধ্যেই যেন জরাবার্ধক্যে আক্রান্ত হয়ে পড়ে। বিশাল বিস্তৃত মসলিম জাহান তখন খণ্ডবিখণ্ড। 'বড় বড়' শাসক যাকে বলে 'প্রবল প্রতাপে' ছোট ছোট রাজ্য শাসন করছেন।

অবস্থা এমনই নাযুক হয়ে পড়ে যে, ইউরোপের ধর্মোন্মাদ ক্রুশেডবাহিনী হামলা ও আগ্রাসন শুরু করে দেয়। তাদের প্রথম লক্ষ্য তো ছিলো মুসলিম-দখল থেকে পবিত্র- ভূমিগুলো উদ্ধার করা। কিন্তু একসময় তারা, ইসলাম ও মুসলিম উম্মাহর জন্যই চ্যালেঞ্জ এবং সিরিয়ার পার্শ্ববর্তী রাজ্যগুলোসহ ইসলামের প্রাণকেন্দ্র

---

[১] اقرأ في هذا الموضوع سلسلي كتب العلامة المؤلف "رجال الفكر والدعوة في الإسلام"

জাযিরাতুল আরবের জন্য হুমকি হয়ে দাঁড়ালো। ক্রুশেডবাহিনী ঝড়-তুফানের মত সিরিয়া ও ফিলিস্তিনের দিকে ধেয়ে এলো এবং ৪৯২ হিজরীতে (১০৯৯ ঈসায়ী) বাইতুল মাকদিস দখল করে নিলো। যত সহজ করে বলা হলো তত সহজেই! কারণ মুসলিম জাহানের পক্ষ হতে তেমন কোন প্রতিরোধের মুখেই পড়তে হয়নি ক্রুশেডশক্তিকে। মাত্র কয়েক বছরের মধ্যে সিরিয়া ও ফিলিস্তিনের প্রায় সব শহর-জনপদ তাদের দখলে চলে গেলো, এমনকি তারা মদীনাতুর-রাসূল (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের) দিকেও নাপাক দৃষ্টি দেয়ার আস্পর্ধা দেখাতে লাগলো।

প্রসিদ্ধ ইংরেজ ঐতিহাসিক stanley lan poel লিখেছেন–

'ক্রুশেড বাহিনী দেশের গভীরে এমনভাবে ঢুকে পড়লো যেমন পচা কাঠে পেরেক ঢুকে যায়। কিছু সময়ের জন্য এমনই মনে হচ্ছিলো যে, তারা ইসলাম-বৃক্ষের কাণ্ড চিরে ফালি ফালি করে ফেলবে।'[১]

যত খারাপই লাগুক, লেনপোল সাহেব কিন্তু ভুল উপমা দেননি। আসলেই তখন আমাদের অবস্থা ছিলো পচা কাঠ, আর ক্রুশেডবাহিনী লোহার পেরেকের মতই আরামসে ঢুকে যাচ্ছিলো আমাদের শরীরের গভীর অংশে। ইংরেজদের একটা প্রিয় উপমা হলো, 'ছুরি দিয়ে নরম কেক কাটা'; ইচ্ছে করলে লেনপোল এটা ব্যবহার করতে পারতেন। কিন্তু তাচ্ছিল্যের চূড়ান্ত প্রকাশের জন্যই সম্ভবত তিনি 'পচা কাঠ' বেছে নিয়েছেন। অবস্থাটাও হয়েছিলো তেমনই। বিজয়োল্লাসে উন্মাদ ক্রুশেডাররা বাইতুল মাকদিসের অসহায় মুসলিম জনগোষ্ঠীর উপর যে চরম পাশবিকতা ও হিংস্রতা চালিয়েছিলো তা কিছুটা দায়িত্বশীল এক খৃস্টান ঐতিহাসিক এভাবে তুলে ধরেছেন–

'বাইতুল মাকদিসে বিজয়ী বেশে প্রবেশের পর ধর্মযোদ্ধারা এমন ব্যাপক গণহত্যা চালিয়েছিলো যে, বলা হয়, মসজিদে ওমরে যাওয়ার পথে তাদের ঘোড়া হাঁটু পর্যন্ত রক্তে ডুবে গিয়েছিলো। দেয়ালে আছড়ে আছড়ে শিশুদের হত্যা করা হয়েছে, অথবা নগর-প্রাচীর থেকে চরকির মত ঘুরিয়ে ছুঁড়ে ফেলা হয়েছে।'[২]

---

[১] লেন পোলকৃত saladin, তরজমা, মওলভী মুহম্মদ ইনায়াতুল্লাহ, সুলতান ছালাহুদ্দীন, পৃ. ২১

[২] encyclopaedia britannica, (9th edition) vol. 6, art. crusades

বস্তুত বাইতুল মাকদিসের 'পতন' ছিলো ইসলামী সালতানাতের চরম দুর্বলতা এবং নতুন শক্তিরূপে খৃস্টজগতের উত্থানের প্রতীক এবং ইসলামী জাহানের জন্য বিপদ-ঘণ্টা।

খৃস্টানদের সাহস তখন এতটাই বেড়েছিলো যে, কর্ক-এর শাসন-কর্তা রেজিনাল্ড পবিত্র মক্কা-মদীনায় হামলা চালানোর চিন্তা পর্যন্ত করেছিলো। বস্তুত হযরত আবু বকর (রা)-এর খিলাফাতের শুরুতে 'ফিতনায়ে ইরতিদাদ' নামে যে ব্যাপক ধর্মত্যাগ ঘটেছিলো তারপর ইসলামের ইতিহাসে এর চেয়ে ভয়াবহ ও বিপজ্জনক ফিতনা আর কখনো আসেনি। এই নাযুকতম মুহূর্তে হতাশার অন্ধকারে প্রায় ডুবে যাওয়া ইসলামী উম্মাহর প্রতি আল্লাহ তা'আলা বিরাট অনুগ্রহ করলেন এবং এমন কতিপয় মর্দে মুজাহিদের আবির্ভাব ঘটালেন যারা আল্লাহর রহমতের ছায়া হয়ে মুসলিম উম্মাহকে রক্ষা করলেন এবং ইসলামী জাহানে নবজাগরণ সৃষ্টি করলেন। তাদেরই একজন হলেন ইমাদুদ্-দীন আতাবেক যাঙ্গী (মৃ ৫৪১ হিজরী)। তিনি বিপুল বিক্রমে লড়াই করে বহু রণক্ষেত্রে ক্রুশেড বাহিনীকে পর্যুদস্ত করেন এবং অবশেষে রাহা অধিকার করেন। তারপর তাঁর সুযোগ্য পুত্র আলমালিকুল আদিল (ন্যায়পরায়ণ বাদশাহ) নুরুদ্-দীন যাঙ্গী জিহাদের ঝাণ্ডা হাতে নেন এবং সিরিয়া-ফিলিস্তিন থেকে খৃস্টানদের উৎখাত করে বাইতুল মাকদিস মুসলিম-অধিকারে ফিরিয়ে আনার প্রতিজ্ঞা গ্রহণ করেন। তিনি বাইতুল মাকদিস ছাড়া ফিলিস্তিনের প্রায় সমগ্র ভূখণ্ড থেকে খৃস্টান বাহিনীকে বিতাড়িত করতে সক্ষম হন। বাইতুল মাকদিস পুনরুদ্ধারের স্বপ্ন পূর্ণ হওয়ার আগেই তাঁর ইনতেকাল হয়ে যায়। আসলে এ মহাসৌভাগ্য আল্লাহ তা'আলা সুলতান ছালাহুদ্-দীন আইয়ূবী (রহ)-এর ভাগ্যে লিখে রেখেছিলেন।

সুলতান নূরুদ্দীনের যতই প্রশংসা করা হবে, কম হবে। বস্তুত মহত্ত্ব ও মহানুভবতায়, ধার্মিকতা ও নির্মোহতায়, সুবিচার ও শাসনকুশলতায়, বিনয় ও সরলতায়, জিহাদী চেতনা ও শাহাদাতের আকাঙ্ক্ষায় এবং ঈমান ও বিশ্বাসের দৃঢ়তায় তিনি ছিলেন ইসলামী ইতিহাসের উজ্জ্বলতম ব্যক্তিদের একজন। সুপ্রসিদ্ধ ঐতিহাসিক ইবনুল আছীর ছিলেন তাঁর কনিষ্ঠ সমসাময়িক। তিনি বলেন, 'বিগত শাসকদের জীবনচরিত আমি অধ্যয়ন করেছি। খোলাফায়ে রাশেদীন এবং হযরত ওমর বিন আব্দুল আযীয (রহ)-এর পর নূরুদ্-দীনের চেয়ে উত্তম চরিত্রের এবং অধিক ন্যায়পরায়ণ শাসক আমার নযরে আসেনি।'[১]

[১] তারীখুল কামিল, খ. ১১ পৃ. ১৬৪

নূরুদ্-দীনের পর তাঁরই প্রিয়পাত্র ও মনোনীত ব্যক্তি সুলতান ছালাহুদ্-দীন ইউসুফ বিন আইয়ুব (রহ) মিশরের শাসনক্ষমতা গ্রহণ করেন, আর তিনিই হলেন সেই মহান ব্যক্তি যাকে আল্লাহ তা'আলা বাইতুল মাকদিস পুনরুদ্ধারের মহাসৌভাগ্যের জন্য নির্বাচন করেছেন। ক্রুশেডবিশ্বের মুকাবেলার জন্য তিনি ইসলামী জাহানের নেতৃত্ব গ্রহণ করেন এবং বেশকিছু রণাঙ্গণে রক্তক্ষয়ী যুদ্ধ-পরিচালনা করেন। তারপর ১৪ই রবিউল আখির ৫৮৩ হিজরীতে (৪ঠা জুলাই ১১৮৭ ঈসায়ী) হিত্তীনের ভাগ্যনির্ধারণী যুদ্ধে ক্রুশেডবাহিনীকে এমন পর্যুদস্ত করেন যে, তাদের কোমর ভেঙ্গে যায় এবং ভাগ্যবিপর্যয় অবধারিত হয়ে পড়ে। লেনপোল রণাঙ্গনের যুদ্ধপরবর্তী চিত্র এভাবে এঁকেছেন (এবং বোঝাই যায়, কত কষ্টে এঁকেছেন)–

'একেকজন মুসলিম সৈনিক ত্রিশ ত্রিশজন বন্দীকে রশি-বেঁধে নিয়ে যাচ্ছে। ভাঙ্গা ক্রুশ ও কর্তিত অঙ্গ ছড়িয়ে ছিটিয়ে ছিলো। ধড়গুলো এমন স্তূপ হয়ে ছিলো, যেন থরে থরে রাখা বৃক্ষকাণ্ড। ছিন্ন মস্তকগুলো যেন ক্ষেতে সাজানো তরবুজ। এ খুনি লড়াই যেখানে হয়েছিলো, যেখানে ত্রিশ হাজার সৈন্য নিহত হয়েছিলো তা হিত্তীনের ময়দান বলে এখনো ইতিহাসে প্রসিদ্ধ হয়ে আছে।'[১]

হিত্তীনের বিজয়ের পর গাজী সালাহুদ্-দীন আইয়ূবী ২৭শে রজব ৫৮৩ হিজরীতে (১১৮৭ ঈসায়ী) দ্বিতীয়বার বাইতুল মাকদিস আযাদ করেন এবং মুসলিম উম্মাহর সেই স্বপ্নকে পূর্ণতা দান করেন, যা দীর্ঘ নব্বই বছর প্রতিটি মুসলিম-হৃদয় ব্যাকুল বে-করার করে রেখেছিলো। সুলতানের আস্থাভাজন সহচর কাজী শাদ্দাদ লিখেছেন–

'চারদিকে শোনা যাচ্ছে শুধু তাকবীর ও দু'আর গুঞ্জন। (নব্বই বছর পর) বাইতুল মাকদিসে জুমু'আর নামায হলো। সাখরা গম্বুজের উপর যে ক্রুশ স্থাপন করা হয়েছিলো তা নামিয়ে ফেলা হলো। চোখের সামনে অভাবিতপূর্ব সব দৃশ্য। আল্লাহর সাহায্য এবং ইসলামের বিজয় সবাই স্বচক্ষে দেখতে পাচ্ছে।'[২]

বাইতুল মাকদিস বিজয়কালে গাজী ছালাহুদ্-দীন যে উদারতা, মহানুভবতা ও মহোত্তম ইসলামী চরিত্র প্রদর্শন করেছিলেন সে সম্পর্কে লেনপোলকে লিখতে হয়েছে–

[১] লেন পোলকৃত saladin, তরজমা, মওলভী মুহম্মদ ইনায়াতুল্লাহ, সুলতান ছালাহুদ্দীন, পৃ. ১৮৯

[২] تاريخ أبي الفداء الحموي

'মানুষ যদি ছালাহুদ্-দীনের অন্যান্য কীর্তির মধ্যে শুধু এই একটি কীর্তির কথা সঠিকভাবে জানতে পারতো যে, কীভাবে তিনি জেরুযালেম পুনরুদ্ধার করেছেন তাহলে এটাই যথেষ্ট ছিলো একথা প্রমাণ করার জন্য যে, তিনি শুধু তাঁর যুগের নন, বরং সর্বকালের শ্রেষ্ঠ মহানুভব ব্যক্তি ছিলেন। আভিজাত্যে ও মহত্ত্বে সত্যি তিনি অনন্য ও অতুলনীয় ছিলেন।'[১]

হিত্তীনের শোচনীয় পরাজয়ের পর বাইতুল মাকদিসও হাতছাড়া! গোটা ইউরোপ যেন ক্রোধের আগুনে জ্বলে উঠলো এবং সমগ্র খৃস্টজগত একজোটে সিরিয়ার উপর ঝাঁপিয়ে পড়লো, কিন্তু তিনি ছিলেন গাজী ছালাহুদ্-দীন, পাহাড়ের মত অটল, অবিচল! সারা ইসলামী জাহানের পক্ষ হতে তিনি ও তাঁর কতিপয় সহযোগী একা লড়াই চালিয়ে গেলেন।

শেষ পর্যন্ত দীর্ঘ পাঁচ বছরের লাগাতার যুদ্ধের পর ১১৯৩ ঈসায়ীতে ক্লান্ত-শ্রান্ত ও বিধ্বস্ত উভয় পক্ষের মধ্যে সন্ধি হলো। বাইতুল মাকদিস এবং অন্যান্য বিজিত শহর ও দুর্গ বদস্তুর মুসলিম-দখলেই থাকলো। উপকূলীয় এলাকায় একটি ক্ষুদ্র রাজ্য আক্কা শুধু খৃস্টানদের দখলে ছিলো। এছাড়া বিস্তীর্ণ সমগ্র রাজ্য ছিলো সুলতান ছালাহুদ্-দীনের কব্জায়।

যে মহান দায়িত্ব সুলতান ছালাহুদ্দীন নিজের কাঁধে তুলে নিয়েছিলেন, আরো সঠিক ভাষায়, আল্লাহ তা'আলা তাঁর কাঁধে অর্পণ করেছিলেন, তা তিনি সুচারুরূপে সম্পন্ন করেই ক্ষান্ত হলেন।

লেনপোল লিখেছেন– 'পবিত্র ধর্মযুদ্ধ শেষ হলো। পাঁচ বছরের অব্যাহত হানাহানি ও রক্তপাত বন্ধ হলো। জুলাই ১১৮৭ খৃস্টাব্দে হিত্তীন রণাঙ্গনে মুসলমানদের মহাবিজয়ের পূর্বে জর্দাননদীর পশ্চিম তীরে তাদের নিয়ন্ত্রণে একইঞ্চি ভূমিও ছিলো না; পক্ষান্তরে সেপ্টেম্বর ১১৯২-এ যখন রামলায় সন্ধি হলো তখন সমগ্র ভূভাগ মুসলিম-অধিকারে চলে গিয়েছে, ছোর থেকে ইয়াফা পর্যন্ত একচিলতে উপকূলীয় ভূখণ্ড ছাড়া, যেখানে তখনো খৃস্টানদের নিয়ন্ত্রণ বজায় ছিলো। সুতরাং এই সন্ধিতে ছালাহুদ্-দীনের জন্য লজ্জার কিছু ছিলো না। কারণ ক্রুশেডারদের ক্ষয়ক্ষতি ছিলো বিপুল, অথচ অর্জন ছিলো অতি সামান্য। পোপের ধর্মযুদ্ধের আহ্বানে গোটা ইউরোপ ও সমগ্র খৃস্টশক্তি পবিত্র ভূমির

[১] লেন পোলকৃত saladin, তরজমা, মওলভী মুহম্মদ ইনায়াতুল্লাহ, সুলতান ছালাহুদ্দীন, পৃ. ২০৫

অভিযানে ঝাঁপিয়ে পড়েছিলো। তাদের লক্ষ্য ছিলো জেরুযালেম দখলে রাখা এবং পতনোন্মুখ খৃস্টানরাজ্য রক্ষা করা। কিন্তু এ বিপুল আয়োজন, তোড়জোর ও সংগ্রামের ফল কী হলো? কাইজার ফ্রেডারিক এসময় মারা গেলেন। ইংলেণ্ড ও ফ্রান্সের সম্রাটদ্বয় স্ব-স্ব দেশে ফিরে গেলেন। তাদের অনুগামী অসংখ্য নাইট ও বীর যোদ্ধা ইলিয়ার মাটিতে দাফন হলো। জেরুযালেম যেমন ছিলো তেমনি ছালাহুদ্-দীনের দখলে থেকে গেলো। খৃস্টানদের ভাগে ছিলো শুধু উপকূলীয় এলাকায় ক্ষুদ্র আক্কা রাজ্য।'[১]

সুলতান গাজী ছালাহুদ্-দীন যেমন ছিলেন অতি উচ্চ প্রশাসনিক যোগ্যতা ও দুর্লভ নেতৃত্বগুণের অধিকারী শাসক তেমনি মানুষ হিসাবে ছিলেন সততা, ধার্মিকতা, আভিজাত্য, মহানুভবতা ও মহোত্তম চরিত্রের অধিকারী। এত অসংখ্য মানবীয় গুণ ও বৈশিষ্ট্যের সমাবেশ আল্লাহ তাঁর মধ্যে ঘটিয়েছিলেন, যা বিশ্ব-ইতিহাসের বিরল ব্যক্তি ও ব্যক্তিত্বের মধ্যেই শুধু ঘটে থাকে। বস্তুত তিনি ছিলেন ইসলামের অসংখ্য অলৌকিকতার একটি এবং একথার প্রমাণ যে, বিশ্বের মানবমঞ্চে ইসলামের ভূমিকা এখনো শেষ হয়ে যায়নি এবং মুসলিম উম্মাহ তার প্রাণশক্তি ও উৎপাদনশীলতা এখনো হারিয়ে ফেলেনি।

দীর্ঘকাল পর এই প্রথমবার ফুরাত ও নীলনদের মধ্যবর্তী মুসলিম ভূখণ্ড সুলতান ছালাহুদ্-দীনের নেতৃত্বে ঐক্যবদ্ধ হয়েছিলো এবং ইসলামী জাহানের উপর ঝাঁপিয়ে পড়া ইউরোপের ধর্মোন্মাদ বাহিনীর বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়িয়েছিলো। মুসলিম উম্মাহর বহু জাতি ও জনগোষ্ঠী জিহাদের উদ্দেশ্যে গাজী ছালাহুদ্-দীনের পতাক-তলে সমবেত হয়েছিলো, যা ইতিপূর্বে কখনো হয়নি। দীর্ঘকাল পর ইসলামী গায়রত ও জিহাদী চেতনা প্রজ্বলিত হয়েছিলো। সে যুগে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি এবং সমরশিল্পে ইসলামী বিশ্ব যা কিছু অগ্রগতি অর্জন করেছিলো গাজী ছালাহুদ্দীন তা সবই খৃস্টান শক্তির বিরুদ্ধে ব্যবহার করেছিলেন।

তিনি শুধু একজন বিজয়ী সেনাপতিই ছিলেন না, বরং ছিলেন প্রত্যেক মুসলিম সিপাহীর প্রাণপ্রিয় নেতা।[২] বিভিন্ন জাতিগোষ্ঠী নিয়ে গঠিত তাঁর বিশাল বাহিনী এক দীর্ঘ, ক্লান্তিকর ও রক্তক্ষয়ী জিহাদে নিয়োজিত ছিলো। বছরের পর বছর প্রবল শক্তিশালী এক শত্রুবাহিনীর বিরুদ্ধে লড়াই চালিয়ে যেতে হচ্ছিলো, কিন্তু

[১] লেন পোলকৃত saladin, তরজমা, মওলভী মুহম্মদ ইনায়াতুল্লাহ, সুলতান ছালাহুদ্দীন, পৃ. ৩১০
[২] এসম্পর্কে বিস্তারিত জানতে হলে দেখুন, 'কাযী শাদ্দাদ লিখিত তারীখ।

সেনা-পরিচালক থেকে সাধারণ সৈনিক, কারো মুখে কখনো সামান্য অনুযোগের শব্দ উচ্চারিত হতে শোনা যায়নি। যখনই তিনি জিহাদ ও যুদ্ধের ডাক দিয়েছেন 'জানহাতে' তারা তাতে ঝাঁপিয়ে পড়েছে। বাহিনীর বড় বড় আরব-অনারব পরিচালক পরম আনুগত্যে তাঁর ডাকে লাব্বাইক বলেছে। বিভিন্ন জাতি ও জনগোষ্ঠীর লোক ছিলো। ভাষা ও জাতীয়তার যেমন পার্থক্য ছিলো তেমনি ছিলো দ্বন্দ্ব ও প্রতিদ্বন্দ্বিতা এবং জাতিগত সংঘাত ও গোত্রীয় কোন্দল, কিন্তু তিনি তাঁর বিরল ব্যক্তিত্বগুণে বিপরীতমুখী বিভিন্ন শ্রেণীর মধ্যে আশ্চর্য এক সমন্বয় সাধন করেছিলেন এবং এমন সম্প্রীতির বন্ধনে আবদ্ধ করেছিলেন, যেন এক দেহ, এক আত্মা। সকলে মনে প্রাণে বিশ্বাস করতো, সুলতান ছালাহুদ্‌-দীনই তাদের নেতা ও পরিচালক। বিভিন্ন সঙ্কটে, কঠিন থেকে কঠিন মুহূর্তে, ঘোরতর যুদ্ধে একটিমাত্র হৃদয় এবং একটি মাত্র ইচ্ছা তাদের নিয়ন্ত্রণ করতো, আর তা হলো গাজী ছালাহুদ্‌-দীনের সবল হৃদয় ও লৌহকঠিন ইচ্ছা। কারণ তারা জানতো, তাঁর উদ্দেশ্য ইসলামের হিফাযত এবং জিহাদ ফী সাবীলিল্লাহ ছাড়া আর কিছু নয়। লেনপোল সঠিক মন্তব্যই করেছেন–

'তৃতীয় ক্রুশেডযুদ্ধে সম্মিলিত খৃস্টানশক্তি মুকাবেলায় নেমেছিলো, কিন্তু তারা গাজী ছালাহুদ্‌-দীনের শক্তি ও মনোবলে সামান্যতম চির ধরাতে পারেনি এবং পারেনি তার বাহিনীতে কোন ফাটল সৃষ্টি করতে। শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত প্রতিটি সৈনিক তার জন্য জীবন দিতে প্রস্তুত ছিলো।'[১]

ছালাহুদ্‌-দীনের পর নেতৃত্বসঙ্কট

২৭শে ছফর ৫৮৯ হিজরীতে ইসলামের এই ওয়াফাদার ও নিবেদিতপ্রাণ মুজাহিদ দুনিয়া থেকে বিদায় গ্রহণ করলেন। তিনি তাঁর উপর অর্পিত দায়িত্ব বহুদূর পর্যন্ত সম্পন্ন করে গিয়েছিলেন। যে মহাদুর্যোগ ইসলামের অস্তিত্বের জন্য ছিলো বিরাট হুমকি, তা অনেকটা দূর হয়ে গিয়েছিলো এবং ক্রুশেড-হামলার ঢল থেমে গিয়েছিলো। তবে খৃস্টানজগত তাদের তিক্ত পরাজয় থেকে যথেষ্ট শিক্ষা নিয়েছিলো এবং বিস্তর চিন্তা-গবেষণার মাধ্যমে উভয়পক্ষের শক্তি ও দুর্বলতা চিহ্নিত করতে পেরেছিলো। তারা আসলে ফিরে গিয়েছিলো নতুন ক্রুশেডের প্রস্তুতি নিতে, যা উনিশ শতকে সঙ্ঘটিত হয়েছিলো। কিন্তু মুসলিম উম্মাহ?!

[১] লেন পোলকৃত saladin, তরজমা, মওলভী মুহম্মদ ইনায়াতুল্লাহ, সুলতান ছালাহুদ্দীন, পৃ. ৩১০-১১

হায়, তারা ফিরে গিয়েছিলো তাদের পুরোনো চরিত্রে; সেই বিভাজন-বিভক্তি, আত্মকলহ ও দ্বন্দ্ব-সংঘাত এবং সেই গাফলত ও তন্দ্রালুতা! এরপর ইসলামী বিশ্বে এমন কোন নেতার অবির্ভাব ঘটেনি যিনি ইসলামের প্রতি হবেন নিবেদিত-প্রাণ, যিনি ব্যক্তিগত লোভ ও লাভ এবং স্বার্থ ও চাহিদার উপর ইসলাম ও মুসলিম উম্মাহকে অগ্রাধিকার প্রদান করবেন, যিনি শুধু জিহাদ ফী সাবীলিল্লাহর জন্য নিজেকে কোরবান করবেন, যিনি আপন ব্যক্তিত্বের আকর্ষণে সর্বহৃদয় জয় করে নেবেন এবং যাকে কেন্দ্র করে সমস্ত বিভক্ত শক্তি আবার ঐক্যবদ্ধ হবে, যেমন ছিলেন সুলতান গাজী ছালাহুদ্‌-দীন, যিনি আল্লাহ-প্রদত্ত শক্তি ও প্রতিভা-বলে মুসলিম উম্মাহকে জিহাদের পতাকাতলে এক করেছিলেন এবং গোটা ইউরোপকে পর্যুদস্ত করেছিলেন; যিনি 'প্রবলপ্রতাপ' শত্রুর কবল থেকে ইসলামের সাম্রাজ্য ও মর্যাদা রক্ষা করেছিলেন।

এসব কিছুই হলো না, বরং মুসলিম উম্মাহ ও ইসলামী জাহান আরেকবার গৃহবিবাদ ও হানাহানি এবং স্বার্থান্ধ ও কুচক্রী নেতৃবর্গের অবাধ শিকারভূমিতে পরিণত হলো। বিশাল বিস্তৃত মুসলিম জাহানের একপ্রান্ত থেকে অপর প্রান্ত পর্যন্ত অবক্ষয় ও অধঃপতনের মেঘ ছেয়ে গেলো এবং ক্রমশ পরিস্থিতি আরো গুরুতর হতে লাগলো।

তবে এই ব্যাপক অবক্ষয়ের যুগে যাবতীয় বিচ্যুতি ও দুর্বলতা সত্ত্বেও ইসলামের অন্তর্নিহিত শক্তি সতত সক্রিয় ছিলো। কখনো কখনো এমন শাসক ও সেনাপতি সামনে আসছিলেন, যারা তাঁদের জীবন ও চরিত্রে এবং ধার্মিকতা ও নৈতিকতায় ছাহাবা কেরাম ও মহান পূর্ববর্তীদের কিছু না কিছু নমুনা ছিলেন।

এখানে সেখানে এমন ব্যক্তি ও ব্যক্তিত্বের আবির্ভাব ঘটছিলো যাদের আলোক-ছটায় ইতিহাস এখনো সমুজ্জ্বল।

মুসলিম উম্মাহ যদিও তাদের মহান পূর্ববর্তীদের আদর্শ পথ ও পন্থা থেকে বিচ্যুত হয়ে পড়েছিলো তবু সমকালীন জাহিলী জাতিগোষ্ঠীর মুকাবেলায় তারাই ছিলো আম্বিয়ায়ে কেরামের জীবনাদর্শের অধিকতর নিকটবর্তী এবং আল্লাহর প্রতি অধিকতর অনুগত। তাদের নিছক অস্তিত্ব এবং বিপর্যস্ত সাম্রাজ্যের অবশিষ্ট প্রতাপ জাহেলিয়াতের গতি ও অগ্রগতির পথে ছিলো সবচে' বড় বাধা ও প্রতিবন্ধক। এখনো ইসলামী সাম্রাজ্য ছিলো সমকালীন বিশ্বের একটি বড় শক্তি, যাকে হিসাব করে চলতো সব জাতি এবং যার ভয়ে কম্পমান ছিলো সকল সাম্রাজ্য। কিন্তু প্রকৃত সত্য ছিলো এই যে, বাইরের অগোচরে ভিতরে ভিতরে

এই শক্তি তার প্রাণশক্তি হারিয়ে ফেলছিলো। অবশেষে হিজরী সপ্তম শতকের মধ্যভাগে ইসলামী উম্মাহর রাজনৈতিক অরাজকতা ও নৈতিক অবক্ষয় হয়ে গেলো খোলামেলা বিষয়, যা আর লুকিয়ে রাখার উপায় ছিলো না। ফলে ইসলামী শক্তির যে 'ত্রাশছায়া' দূর থেকে দৃশ্যমান ছিলো এবং সবার সন্ত্রস্ততার কারণ ছিলো তা অদৃশ্য হয়ে গেলো এবং যা ঘটার তাই ঘটলো। শত্রুজাতি এবং অসভ্য ও বন্য জনগোষ্ঠী মুসলিম উম্মাহর উপর উন্মত্ত উল্লাসে ঝাঁপিয়ে পড়লো। বিশাল বিস্তৃত ইসলামী সাম্রাজ্য যেন হয়ে গেলো এক লাওয়ারিছ সম্পত্তি, যা বিজেতাদের খেয়াল-খুশি মত বণ্টিত হতে লাগলো।

খাওয়ারেযম শাহ-এর হুকুমতই শেষ ইসলামী সাম্রাজ্য, যাকে শত্রুরা কিছুটা ভয় করে চলতো, কিন্তু সপ্তম শতকে তাতারীদের হাতে যখন খাওয়ারেযম সাম্রাজ্য ছিন্নভিন্ন হয়ে গেলো এবং বাগদাদেরও পতন হলো তখন শত্রুর সব ভয়ভীতি একেবারে দূর হয়ে গেলো। যেন বিরাট ফসলের ক্ষেতে ছিলো এক কাকতাড়ুয়া, তাই পশু-পাখী কাছে আসতে ভয় পেতো। একসময় উই পোকা লাঠির গোড়া খেয়ে ফেললো, আর কাকতাড়ুয়া পড়ে গেলো। তখন পশু পাখী সব যেন একযোগে ক্ষেতের ফসলের উপর ঝাঁপিয়ে পড়লো।

চেঙ্গিজ খানের তাতারী ফেতনা

মুসলিম উম্মাহর উপর ঐসময় যত বিপদ ও দুর্যোগ নেমে এসেছে তার মধ্যে বর্বর তাতারীজাতির হামলাই ছিলো সবচে' ভয়াবহ ও মর্মন্তুদ। তাতারীরা পূর্ব দিক থেকে পঙ্গপালের মত ধেয়ে এসেছিলো এবং দেখতে দেখতে সমগ্র মুসলিম জাহানে ছেয়ে গিয়েছিলো। বস্তুত তাতারী হামলা ছিলো মুসলিম উম্মাহর সুদীর্ঘ ইতিহাসের সবচে' বড় ফেতনা ও দুর্যোগ, যা বলতে গেলে উম্মাহর অস্তিত্বকেই কাঁপিয়ে দিয়েছিলো। পরিস্থিতির ভয়াবহতায় সমস্ত মুসলিম জাহান যেন একেবারে দিশেহারা হয়ে পড়েছিলো। চারদিকে শুধু হতাশা, নৈরাশ্যের অন্ধকার। একপর্যায়ে প্রায় সমগ্র মুসলিম জাহান, বিশেষত তার পূর্ব-অংশ তাতারী আগ্রাসনের সর্বনাশা থাবায় এসে গিয়েছিলো। ঐতিহাসিক ইবনে আছীর তাতারী হামলার ইতিহাস লিখতে গিয়ে তাঁর মনোবেদনা ও হৃদয়-যন্ত্রণা চেপে রাখতে পারেননি। তিনি বলেন–

'এ ঘটনা এমনই লোমহর্ষক ও হৃদয়বিদারক যে, কয়েক বছর আমি 'লিখবো কি লিখবো না' এ দ্বিধাদ্বন্দ্বেই ছিলাম! এখনো বড় দ্বিধা-বেদনার মধ্যেই লিখছি।

আসলে ইসলামের দুর্দশা এবং মুসলিম উম্মাহর সর্বনাশের কাহিনী শোনাতে পারে এমন দিলগুর্দা কারই বা আছে! হায়, আমি যদি পয়দাই না হতাম, কিংবা এর আগেই মরে যেতাম এবং আমার অস্তিত্ব বিস্মৃত হয়ে যেতো। কিন্তু কিছু বন্ধুর দাবী, এ ঘটনা আমি যেন ইতিহাসের পাতায় সংরক্ষণ করি, তবু দ্বিধাগ্রস্ত ছিলাম, কিন্তু শেষ পর্যন্ত ভেবে দেখলাম, না লেখার মধ্যেও কোন ফায়দা নেই!

এ ছিলো এমন এক কেয়ামতি বিপদ ও দুর্যোগ যার নযীর দুনিয়ার ইতিহাসে আর নেই। যদিও এর প্রধান শিকার ছিলো মুসলিম উম্মাহ তবু এর বিস্তার ছিলো অন্যান্য জাতি পর্যন্ত। কেউ যদি দাবী করে যে, আদম থেকে 'এইদম' এমন ঘটনা দুনিয়ায় আর ঘটেনি তাহলে তার দাবী মিথ্যা হবে না। কারণ এর ধারেকাছের ঘটনাও ইতিহাসের পাতায় নেই এবং সম্ভবত কেয়ামত পর্যন্ত দুনিয়া এমন ঘটনা আর দেখবে না, ইয়াজূজ-মাজুজের ঘটনা ছাড়া। নারী-পুরুষ ও শিশু-বৃদ্ধ, কারো প্রতি এই পশুরা কোন দয়া করেনি। যাকে পেয়েছে তাকেই খুন করেছে; পেট ফেড়ে গর্ভের সন্তান পর্যন্ত।

(ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজি'উন, ওয়া লা হাওলা ওয়া লা কুওয়াতা ইল্লা বিল্লাহিল 'আলিয়্যিল 'আযীম।)

এ ফিতনা ছিলো বিশ্বব্যাপী ও সর্বগ্রাসী, যা এক ভয়ঙ্কর তুফানের মত ধেয়ে এসেছিলো এবং সারা পৃথিবীতে ছড়িয়ে পড়েছিলো।'[১]

৬৫৬ হিজরীতে তাতারীরা দারুল খিলাফাহ বাগদাদে বিজয়ীবেশে ঢুকেছিলো এবং তা গুঁড়িয়ে দিয়েছিলো। ঐতিহাসিক ইবনে কাছীর বাগদাদের বরবাদী ও তাতারীদের 'হালাকাতি' সম্পর্কে যে মর্মন্তুদ বিবরণ দিয়েছেন, তা বিশ্বাস করা করা সত্যি কঠিন। এজন্য নয় যে, শেষ পর্যন্ত তাতারীরা তো মানুষ ছিলো, তাদের পক্ষে এমন পাশবিক বর্বরতা কী করে সম্ভব হলো! তা নয়, বরং বিশ্বাস করা কঠিন এজন্য যে, মুসলিম উম্মাহর বড় বড় 'লকব বহনকারী' সুলতানরা কোথায় ছিলো? বাগদাদ কীভাবে তাতারীদের এমন সহজ লোকমায় পরিণত হলো! ইবনে কাছীর বলেন–

'বাগদাদে চল্লিশদিন পর্যন্ত গণহত্যা ও লুটতরাজ অব্যাহত ছিলো। চল্লিশদিন পর এই উদ্যান-নগর, যা পৃথিবীর সুন্দরতম ও সমৃদ্ধতম নগর ছিলো, এমন বরবাদ ও বিরান হলো যে, অল্প ক'জন মানুষই শুধু বেঁচে ছিলো। বাজারে ও অলিগলিতে

[১] ইবনুল আছীর-রচিত আল-কামিল, খ. ১৩ পৃ. ২০২-২০৩

গলিত লাশের স্তূপ ছিলো। সেই লাশের উপর বৃষ্টি হয়ে সারা শহরে দুর্গন্ধ ছড়িয়ে পড়লো এবং শহরের পরিবেশ দুর্বিষহ হয়ে উঠলো। মহামরি এমন ছড়িয়ে পড়লো যে, সুদূর সিরিয়া পর্যন্ত তার প্রভাব দেখা গেলো। অসংখ্য মানুষ রোগ-ব্যাধিতে মারা গেলো। দুর্মূল্য, মহামারি ও বরবাদি–বাগদাদে যেন এই তিনেরই রাজত্ব ছিলো।[১]

তাতারীদের পরাজয়

ইরাক ও সিরিয়ার বরবাদির পর স্বাভাবিকভাবেই তাতারীদের রোখ ছিলো মিশর, যা তখন তাতারী-ধ্বংসযজ্ঞ থেকে নিরাপদ একমাত্র মুসলিম দেশ। মিশরের সাহসী শাসক সাইফুদ্দীন কুতুয বুঝতে পেরেছিলেন, এখন মিশরের পালা, আর তাতারীরা চড়াও হলে দেশ ও দেশের মানুষকে বাঁচানো কঠিন হবে। তাই তিনি ভাবলেন, মিশরে আত্মরক্ষামূলক যুদ্ধ করার চেয়ে বিজ্ঞতার পরিচয় হবে আগে বেড়ে তাতারীদের উপর হামলা করা। মউত যদি হয় তাকদীর, তাহলে হোক শাহাদাতের মউত এবং লড়াইয়ের ময়দানে।

যত সহজে বলা হলো, তখনকার পরিস্থিতিতে এরূপ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা তত সহজ ছিলো না। রীতিমত দুঃসাহসী, আর অন্যান্য 'বিচক্ষণ' মুসলিম শাসকের দৃষ্টিতে আত্মঘাতী সিদ্ধান্ত ছিলো। কিন্তু আল্লাহ যখন কাউকে কবুল করেন তখন এমনই হয়। বদরের সুন্নত অনুসরণ করে আল্লাহর বান্দা সাইফুদ্দীন কুতুয তার বাহিনী নিয়ে মিশর থেকে বের হলেন। সতেরই রামাযানের আটদিন পর ২৫শে রামাযান সিরিয়ার নিকটবর্তী আইনে জালূত নামক স্থানে তাতারীদের সঙ্গে ইসলামী বাহিনীর 'মুলাকাত' হলো। এবং .. এবং অতীতের সকল অভিজ্ঞতার সম্পূর্ণ বিপরীত তাতারীরা চরম পরাজয় বরণ করলো। আমাদের জানা নেই, আইনে জালুতে আসমান থেকে ফিরেশতারা নেমেছিলেন কি না! তবে শুধু অস্ত্রবলে এ যুদ্ধ জয় করা যে সম্ভব ছিলো না, তাতে কারো দ্বিমত নেই। যুদ্ধ যখন শেষ হলো তখন দৃশ্যটা ছিলো এই, ময়দান ছেড়ে তাতারীরা পালায়, আর মুসলিম বাহিনী পিছু ধাওয়া করে তাদের কচুকাটা করে, কিংবা বেশুমার গ্রেফতার করে।

সুলতান সাইফুদ্দীন কুতুয শুরুটা করে দিয়েছিলেন। তারপর আলমালিকুয্যাহির বাইবার্স বেশ কয়েকবার তাতারীদের পরাজিত করেন এবং সমগ্র সিরিয়া অঞ্চল

---

[১] আল-বিদায়া ওয়ান-নিহায়া

থেকে তাদের বিতাড়িত করেন। ফলে প্রচলিত সেই বিশ্বাস থেকে মানুষ মুক্তি পেলো যে, তাতারীরা অপরাজেয়, তাদের পরাজিত করা সম্ভব নয়। বাগদাদের খলিফা ঘর থেকে বের হতে চাননি, তাই যিল্লতির মউত ছিলো তার ভাগ্য, আর বরবাদি ছিলো বাগদাদের তাকদীর। মিশরের সুলতান জিহাদের ডাক দিয়ে তলোয়ার হাতে মিশর থেকে বের হয়েছিলেন, তাই তাকদীর তাকে এবং মিশরকে দিয়েছে ইয্যতের যিন্দেগি।

মুসলমানদের উপর বিজয়ী, ইসলামের কাছে পরাজিত

মিশর ও সিরিয়ায় শোচনীয় পরাজয়ের পরও তাতারীরা ইরাক থেকে শুরু করে ইরান ও তুর্কিস্তান পর্যন্ত বিস্তীর্ণ ভূখণ্ডের উপর দখল কায়েম রেখেছিলো। খোদ দারুল খিলাফাহ বাগদাদ ছিলো তাদের হাতে। অর্ধসভ্য মূর্তিপূজক একটি জাতির ইসলামী জাহানের জ্ঞান ও সভ্যতার কেন্দ্রস্থল দখল করে রাখা ছিলো যথার্থই এক হৃদয়বিদারক ঘটনা, যার সুদূরপ্রসারী প্রভাব পড়ছিলো ইসলামী উম্মাহর সমগ্র জীবন, সভ্যতা ও চরিত্রের উপর। ইসলামী বিশ্বে তখন এমন কোন শক্তি ছিলো না যা বাগদাদ থেকে তাতারীদের উৎখাত করতে পারে। এমন কঠিন পরিস্থিতিতে ইসলামের আত্মিক ও আধ্যাত্মিক শক্তির অলৌকিকতা প্রকাশ পেলো।

কতিপয় অজ্ঞাত, অখ্যাত ও নিবেদিতপ্রাণ মুবাল্লিগের দাওয়াতি মেহনতে এবং তাতারী দরবারের কতিপয় মুসলিম আমির-ওমরার আন্তরিক প্রচেষ্টায় তাতারী শাসকদের ইসলাম গ্রহণের ধারা শুরু হয়ে গেলো। এভাবে ইসলাম ঐ অপরাজেয় জাতির উপর বিজয় অর্জন করলো যারা একবার সমগ্র মুসলিম বিশ্বকে জয় করেছিলো।

৬৯৪ সনের ঘটনা লিখতে গিয়ে ইবনে কাছীর বলেন– 'এবছর চেঙ্গিজখানের প্রপৌত্র কাযান তাতারীদের সম্রাট মনোনীত হলেন এবং আমীর তুযান (রহ)-এর হাতে প্রকাশ্যে ইসলাম গ্রহণ করলেন। ফলে সমগ্র তাতারী জাতি, বা তাদের সিংহভাগ ইসলামের গণ্ডিতে প্রবেশ করলো। সেদিন লোকদের মধ্যে সোনাচাঁদি ও মণিমুক্তা ছিটানো হলো এবং সম্রাট নিজের নাম রাখলেন মাহমূদ। পরবর্তী শুক্রবার তিনি জুমু'আর জামা'আতে শরীক হলেন। বহু মূর্তিঘর তিনি ধ্বংস করলেন এবং মূর্তিপূজকদের উপর জিযিয়া আরোপ করলেন। বাগদাদ ও অন্যান্য শহরের লুণ্ঠিত মূল্যবান দ্রব্যাদি ফিরিয়ে দেয়া হলো এবং ন্যায় ও

সুবিচার নিশ্চিত করা হলো। এরপর লোকেরা তাতারীদের হাতে তাসবীহ শোভা পেতে দেখলো এবং তারা আল্লাহ তা'আলার দয়া ও অনুগ্রহের শোকর আদায় করলো।[১]

মুসলিম জাহানে তাতারী হামলার প্রভাব

তাতারীদের হামলায় মুসলিম জাহান এমনই ধ্বস্ত-বিধ্বস্ত হয়েছিলো যে, আবার উঠে দাঁড়ানোর জন্য দীর্ঘ সময়ের প্রয়োজন ছিলো। কারণ মুসলিম উম্মাহর সমর-শক্তি ও সৈন্যবল যেমন নিশ্চিহ্ন হয়ে গিয়েছিলো তেমনি বুদ্ধিবৃত্তিক ও চিন্তানৈতিক শক্তি, উদ্যম ও চেতনা স্থবির হয়ে পড়েছিলো। এমন এক সর্বগ্রাসী হতাশা ও নৈরাশ্য ঘিরে ধরেছিলো যে, অতি বড় আশাবাদী ব্যক্তিও আশার কোন আলো দেখতে পাচ্ছিলো না। জ্ঞান, সাহিত্য ও কাব্যসাধনা এবং চিন্তা-গবেষণা ও গ্রন্থরচনা, এমনকি সামাজিক আচরণ এবং নীতি ও নৈতিকতা, এককথায় জীবনের সর্বক্ষেত্রে এর মারাত্মক প্রভাব পড়েছিলো। সুতরাং জ্ঞান ও সাহিত্যের অঙ্গনে সংযোজন ও সৃজন এবং বিনির্মাণ ও উৎকর্ষসাধন তো দূরের কথা, আহলে ইলম ও চিন্তাশীল সমাজের তখন একমাত্র চিন্তা ছিলো ইলম ও ফিকাহ এবং জ্ঞান ও সাহিত্যের বর্তমান সম্পদকে কোন না কোনভাবে হিফাযত করা এবং ধ্বংস ও বিলুপ্তির হাত থেকে রক্ষা করা। কারণ এগুলো ছিলো তাদের হাতে মহান পূর্ববর্তীদের পবিত্র আমানত।

মানবজাতি ও মানবসভ্যতার চরম দুর্ভাগ্য এই যে, বিশ্বের নেতৃত্ব ও নিয়ন্ত্রণ তখন চলে এসেছিলো এই মূর্খ, অসভ্য ও বর্বর জাতির হাতে, যাদের না ছিলো কোন আসমানী ধর্ম ও আসমানী কিতাব, না ছিলো কোন সভ্যতা ও সংস্কৃতি এবং জ্ঞান ও বুদ্ধিবৃত্তি। সুতরাং তাদের নেতৃত্বে জ্ঞান, ধর্ম, সাহিত্য ও বুদ্ধিবৃত্তির ক্ষেত্রে উন্নতি ও অগ্রগতির কথা চিন্তা করাও ছিলো অবান্তর। তাতারীদের ইসলাম গ্রহণের পর যদিও মুসলিম উম্মাহ তাদের হিংস্রতা ও রক্তোন্মাদনা থেকে বেঁচে গিয়েছিলো এবং দ্বীনী আযাদী ও ধর্মীয় স্বাধীনতা ফিরে পেয়েছিলো, এমনকি ইসলাম রাষ্ট্রীয় ধর্মের মর্যাদাও লাভ করেছিলো, কিন্তু নওমুসলিম তাতারীদের মধ্যে ধর্মীয় ও বুদ্ধিবৃত্তিক নেতৃত্বদান এবং ইসলামী ইমামাতের গুরুদায়িত্ব বহনের ন্যূনতম যোগ্যতাও ছিলো না। সেজন্য প্রয়োজন ছিলো সুদীর্ঘ

[১] আল-বিদায়া ওয়ান-নিহায়া, খ. ১৩ পৃ. ৩৪০

সময়ের অব্যাহত চর্চা ও অনুশীলন। তখন প্রয়োজন ছিলো এমন এক তাজাদম ও সতেজ-সজীব জনগোষ্ঠীর, যাদের মধ্যে রয়েছে শৌর্যবীর্য ও জিহাদী চেতনা, যারা মুসলিম জাহানকে পতন ও অধঃপতনের গহ্বর থেকে তুলে আনতে পারে এবং তাদের নির্জীব দেহে নতুন প্রাণ সঞ্চার করতে পারে, সর্বোপরি মুসলিম বিশ্বের নেতৃত্বের গুরু দায়িত্ব পালন করতে পারে, সাহসের সঙ্গে, যোগ্যতার সঙ্গে।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

আলমে ইসলামে ওছমানী খেলাফতের উত্থান

ইতিহাসের মঞ্চে তুর্কী শক্তির আগমন

অষ্টম শতাব্দীর ঐ সঙ্কট-সন্ধিক্ষণে ইতিহাসের মঞ্চে একটি অপ্রতিহত শক্তিরূপে ওছমানিদের আবির্ভাব ঘটলো এবং তারা ইতিহাসের গতিধারার পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ গ্রহণ করলো। সাতশ তেপ্পান্ন হিজরীতে (১৪৫৩ খৃঃ) খলীফা মুহম্মদ ছানী বিশাল বাইজান্টাইন সাম্রাজ্যের অপরাজেয় রাজধানী কনস্টান্টিনোপল পদানত করলেন। তখন তিনি 'সতের বছরের তরুণ' না হলেও মাত্র চব্বিশ বছরের টগবগে যুবক। কনস্টান্টিনোপল জয়ের মাধ্যমেই তিনি মুহম্মদ আলফাতিহ বা বিজয়ী মুহম্মদ উপাধিতে প্রসিদ্ধি লাভ করেন।

এই অভাবিতপূর্ব বিজয়ের ফলে মুসলিম উম্মাহর নির্জীব দেহে নতুন করে আশা-উদ্দীপনা ও প্রাণচাঞ্চল্য সৃষ্টি হলো। ইসলামও যেন নতুন গতি ও শক্তি লাভ করলো। মুসলিম উম্মাহর অন্তরে আস্থা ও বিশ্বাস সৃষ্টি হলো যে, ওছমানী খেলাফাতের নেতৃত্বে তুর্কী জাতি বিশ্বের বুকে মুসলিম উম্মাহর হারানো শক্তি ও গৌরব পুনরুদ্ধার করতে পারবে, আর মুসলিম উম্মাহ বিশ্বনেতৃত্বের আসনে পুনঃসমাসীম হবে। সাহসে ও শৌর্যবীর্যে তুর্কীরা যেমন ছিলো অতুলনীয় তেমনি যুদ্ধাস্ত্র ও সমরকুশলতায় তাদের উদ্ভাবনী প্রতিভা ছিলো ঈর্ষণীয়। বস্তুত বাইজান্টাইন রাজধানী কনস্টান্টিনোপল, যা সুদীর্ঘ আটশ বছর মুসলিমশক্তির সামনে ছিলো অপরাজেয়,[১] তুর্কীরা তা পদানত করে তাদের যোগ্যতা ও

---

[১] হযরত বুসর বিন আরতাত-এর নেতৃত্বে ৪৪ হিজরীতে (৬৬৪ খৃ) আরবনৌবহর কনস্টান্টিনোপল জয়ের চেষ্টা করে। ইয়াযীদ বিন মু'আবিয়া ৫২ হিজরীতে কনস্টান্টিনোপল অবরোধ করেও ব্যর্থ হন। সেই অভিযানে নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মেযবান ছাহাবী হযরত আবু আইয়ুব আনছারী রাদিয়াল্লাহু আনহু শরীক ছিলেন এবং মৃত্যুবরণ করেছিলেন। তিনি ওয়াছীয়ত করেছিলেন, আমার

শক্তিমত্তার বাস্তব প্রমাণও রেখেছিলো। সমর-নেতৃত্ব ও যুদ্ধপরিচালনায় তাদের কুশলতা ও সৃজনশীলতা দূরের কাছের সবাই দেখতে পেয়েছিলো। ফলে সমকালীন বিশ্ব সর্বক্ষেত্রে তাদের শ্রেষ্ঠত্ব স্বীকার করে নিতে বাধ্য হয়েছিলো। লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য অর্জনের পথে জ্ঞান ও কর্মশক্তিকে তারা সর্বোচ্চরূপেই ব্যবহার করেছিলো, যা বিশ্বে কোন জাতির শ্রেষ্ঠত্ব অর্জনের অপরিহার্য শর্ত।

সুপ্রসিদ্ধ ঐতিহাসিক ড্রপার মুহম্মদ আলফাতিহ-এর সমরকুশলতাকে শ্রদ্ধা নিবেদন করে বলেছেন, 'গণিতশাস্ত্র (ও অন্যান্য জ্ঞানে) তিনি পারদর্শী ছিলেন এবং যুদ্ধবিদ্যায় সেগুলোর সুপ্রয়োগ জানতেন। বস্তুত এ বিজয়ের জন্য তাঁর পূর্ণ প্রস্তুতি ছিলো এবং যুদ্ধের সকল আধুনিক সরঞ্জাম তিনি পূর্ণ কুশলতার সঙ্গে ব্যবহার করেছিলেন।'

জনৈক পর্যটক কনস্টান্টিনোপলজয়ের কাছাকাছি সময়ে মুহম্মদ আলফাতিহ-এর সঙ্গে সাক্ষাৎ করেছিলেন। তিনি তাঁর দেহাবয়ব, মহামানবোচিত চরিত্র এবং তাঁর বিস্তৃত জ্ঞান ও সংস্কৃতি সম্পর্কে আলোচনার পর বলেন–

'মাত্র ছাব্বিশ বছরের যুবক', কিন্তু ইটালী, তার রাজধানী এবং সম্রাট সম্পর্কে তাঁর আলোচনা অত্যন্ত বাস্তবানুগ ও নিখুঁত তথ্যভিত্তিক! ইউরোপে কত শত দেশ! অথচ তাঁর সামনে রয়েছে সেগুলোর বিস্তারিত মানচিত্র, প্রতিটি দেশ-অঞ্চল তাতে সুস্পষ্ট। বিশ্বপরিস্থিতি ও যুদ্ধশাস্ত্রের মত প্রিয় ও আনন্দদায়ক আর কোন আলোচনার বিষয় তাঁর কাছে নেই। বিষয় ও পরিস্থিতি সম্পর্কে খুবই বিচক্ষণ ও সুবিজ্ঞ। শাসনকার্যে একনিষ্ঠ ও টগবগে। দেখো, ইনি সেই ব্যক্তি, যার মোকাবেলা করতে হবে আমাদের খৃস্টান-বিশ্বকে! অত্যন্ত সতর্ক, অত্যন্ত তীক্ষ্ণ তাঁর পর্যবেক্ষণ। শীত-গরম, ক্ষুধা-পিপাসা ও সর্বপ্রকার কষ্ট সহ্য করতে সক্ষম। তাঁর ভাষায়, সময় এখন গতি পরিবর্তন করেছে; তাই তিনি পূর্ব থেকে পশ্চিমে যাত্রা করছেন, অতীতে যেমন পশ্চিমারা পূর্বদিকে যাত্রা করেছিলো। তিনি বলেন, বিশ্বের সাম্রাজ্য একটিমাত্র হওয়া উচিত; একটিমাত্র ধর্ম এবং

জানাযা যত দূর নিয়ে যেতে পারো যাও, তারপর সেখানে দাফন করো। তার অছিয়ত পূর্ণ করা হয়েছিলো এবং নগর-প্রাচীরের পাশে তাঁকে দাফন করা হয়েছিলো।
এর পর আরো অন্তত চারবার আরব-বাহিনী কনস্টান্টিনোপল অবরোধ করে, কিন্তু তা এমনই সুরক্ষিত ছিলো যে, কোন সেনাপতির পক্ষেই ঐ শহর পদানত করা সম্ভব হয়নি।
[১] প্রকৃতপক্ষে তাঁর বয়স তখন ছাব্বিশ নয়, বরং চব্বিশ বছরও অতিক্রম করেনি (আরবী অনুবাদক)

একটিমাত্র দেশ। আর এই ঐক্য সম্পন্ন করার জন্য পৃথিবীতে কনস্টান্টি-নোপলের চেয়ে উপযুক্ত স্থান আর কোনটি নেই।'[১]

পশ্চিমা লখক baron carra de vaux তার সুবিখ্যাত islamic thinkers গ্রন্থে বলেন, 'মুহম্মদ আলফাতিহ-এর এ বিজয় নিছক ভাগ্যের উপহার ছিলো না, কিংবা ছিলো না শুধু প্রতিপক্ষ শক্তির দুর্বলতার ফল, বরং এজন্য দীর্ঘকাল তিনি প্রয়োজনীয় প্রস্তুতি গ্রহণ করেছেন এবং সমকালীন বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির সব শক্তি ব্যবহার করেছেন। কামান ছিলো তখন সদ্য-উদ্ভাবিত যুদ্ধাস্ত্র। আর তিনি জনৈক হাঙ্গেরীয় প্রকৌশলীর সাহায্যে বিশ্বের সর্ববৃহৎ কামান তৈরী করেছিলেন, যাতে তিনশ কিলোগ্রাম ওজনের গোলা এক মাইলের বেশী দূরে নিক্ষেপ করা যেতো। বলা হয়, ঐ কামান চালাতো সাতশ লোক, আর তা বারুদবোঝাই হতো দু'ঘণ্টায়।

কনস্টান্টিনোপল অভিযানকালে মুহম্মদ আলফাতিহ-এর অধীনে ছিলো তিন লাখ সৈন্যের বিশাল বাহিনী এবং অতি শক্তিশালী কামানবহর। আর সমুদ্রের দিক থেকে শহর অবরোধকারী নৌ-বহরে যুদ্ধজাহায ছিলো একশ বিশটি। তিনিই সেই মহান সমরকুশলী যিনি আপন উদ্ভাবনী প্রতিভাবলে স্থলপথে নৌজাহায চালিয়ে উপসাগরে নামানোর পরিকল্পনা গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করেছিলেন, শত্রু-পক্ষের কাছে যা ছিলো অকল্পনীয়। বহুকাষ্ঠখণ্ড চর্বিত করে তার উপর দিয়ে সত্তরটি জাহায টেনে নিয়ে তিনি 'কাসিমপাশা'র সাগরজলে নামিয়েছিলেন। পরিখাযুদ্ধে কোরায়শ বাহিনী যেমন মদীনার তিনদিকের পরিখা দেখে হতবাক হয়েছিলো, প্রায় তেমনি হতবাক হয়েছিলো বাইজান্টাইন বাহিনী কাসিম-পাশার সাগরজলে তুর্কীদের নৌবহর দেখে! হাঁ, এই অভাবিতপূর্ব সমরকৌশলের কোন জবাব তাদের কাছে ছিলো না, শুধু দেখে থাকা ছাড়া।

তুর্কী জাতির কতিপয় গুণ ও বৈশিষ্ট্য

সমগ্র মুসলিম উম্মাহর মধ্যে তুর্কী জনগোষ্ঠী তখন এমন কিছু গুণ ও বৈশিষ্ট্যের অধিকারী ছিলো, যাতে সঙ্গত কারণেই তারা হয়ে উঠেছিলো মুসলিমবিশ্বের নেতৃত্ব লাভের যোগ্য হকদার।

---

[১] বক্তব্যটি নেয়া হয়েছে استنبول وحضارة الإمبراطورية العثمانية থেকে, লেখক বার্নাড লুয়েস, আরবী অনুবাদ রিযওয়ান আলী নাদবী, পৃ. ৩৬, ৩৭

প্রথমত তারা ছিলো উদীয়মান, উচ্চাভিলাষী ও প্রাণচাঞ্চল্যে পরিপূর্ণ একটি জাতি। তাদের মধ্যে ছিলো সত্যিকার জিহাদী চেতনা। তাছাড়া জীবনযাপনের ক্ষেত্রে স্বভাব ও প্রকৃতির নিকটবর্তী হওয়ার কারণে তারা ঐ সমস্ত নৈতিক ও সামাজিক ব্যাধি থেকে মুক্ত ছিলো, যাতে প্রাচ্যের মুসলিম জনগোষ্ঠীগুলো ছিলো আক্রান্ত।

দ্বিতীয়ত তাদের সামরিক শক্তি ছিলো এমন পর্যাপ্ত যার সাহায্যে তারা ইসলামের জাগতিক ও আধ্যাত্মিক বিস্তার ঘটাতে এবং যে কোন শত্রুর আগ্রাসন প্রতিরোধ করতে সক্ষম ছিলো। এককথায় মুসলিম উম্মাহর পক্ষ হতে সমগ্র বিশ্বের নেতৃত্ব গ্রহণের জন্য তারা ছিলো যোগ্যতম এক জনগোষ্ঠী। সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠার শুরু থেকেই ওছমানীরা আধুনিক যুদ্ধাস্ত্র, বিশেষত আগ্নেয়াস্ত্র ব্যবহার করার প্রতি মনোযোগী ছিলো। তাদের কামানগুলো ছিলো অধিকতর দূরপাল্লার। আর অস্ত্রাগারে ছিলো সর্বাধুনিক অস্ত্রশস্ত্র। সামরিক প্রশিক্ষণ, যুদ্ধকৌশল উদ্ভাবন, সেনা-বাহিনীর আধুনিক বিন্যাস ইত্যাদি সকল বিষয়ে তারা পূর্ণ যত্নবান ছিলো। ফলে যুদ্ধবিদ্যা ও সমরবিজ্ঞানে তারাই ছিলো শ্রেষ্ঠ এবং ইউরোপের আদর্শ। তাদের সামরিক শ্রেষ্ঠত্ব অস্বীকার করার সাধ্য ছিলো না কারো।

তাদের সাম্রাজ্য বিস্তৃত ছিলো ইউরোপ, এশিয়া, আফ্রিকা– এই তিন মহাদেশে। ইসলামী প্রাচ্যের পারস্য থেকে মরক্কো পর্যন্ত ছিলো তাদের শাসন এবং এশিয়া মাইনর ছিলো তাদের অধিকারে। অন্যদিকে ইউরোপে তাদের অগ্রাভিযান ভিয়েনার প্রাচীরে আঘাত হেনেছিলো। সমগ্র ভূমধ্যসাগরে তারাই ছিলো অপ্রতিদ্বন্দ্বী নৌশক্তি; অন্য কোন নৌশক্তির সেখানে প্রবেশাধিকার ছিলো না। তুর্কী খলীফার দরবার 'আলবাবুল আলী'তে নিযুক্ত পিটার দ্যা গ্রেট-এর প্রতিনিধি এক পত্রে বলেন, 'সুলতান কৃষ্ণসাগরকে মনে করেন তার নিজস্ব অধিকার, যেখানে নেই অন্য কারো প্রবেশাধিকার।'

তাদের নৌবহর ছিলো এত বিশাল, যা ইউরোপের সম্মিলিত শক্তির কাছেও ছিলো না। ৯৪৫ (১৫৪৭ খৃঃ) হিজরীতে পোপের আহ্বানে ভেনিস, স্পেন, পুর্তগাল ও মাল্টার সম্মিলিত নৌশক্তি তুর্কী নৌবহরকে পরাস্ত করার অপপ্রয়াস চালিয়ে উল্টো পর্যুদস্ত হয়েছিলো। তুর্কী নৌসেনাদের নিক্ষিপ্ত গোলার আঘাতে শত্রুপক্ষের অধিকাংশ জাহায সাগরে ডুবে গিয়েছিলো, আর বহু সৈন্য 'সাগর-সমাধি' লাভ করেছিলো।

খলীফা সোলায়মান আলকানূনী-এর শাসনকালে তুর্কিদের যেমন জলভাগ ও স্থল-

-ভাগে ছিলো নিরঙ্কুশ কর্তৃত্ব, তেমনি ছিলো অখণ্ড রাজনৈতিক ও আধ্যাত্মিক প্রভাব-প্রতিপত্তি।

ওছমানী সালতানাত তখন উত্তরে সাভা নদী, দক্ষিণে নীলনদের উৎসমুখ ও ভারতসাগর, পূর্বে ককেসাস পর্বতশ্রেণী এবং পশ্চিমে আটলাস পর্বতমালা পর্যন্ত বিস্তৃত ছিলো। তুর্কী নৌবহরে জঙ্গিজাহাযের সংখ্যা ছিলো তিন হাজারের বেশী। একমাত্র রোম ছাড়া প্রাচীন বিশ্বের সমস্ত প্রসিদ্ধ শহর ছিলো 'আলবাবুল আলী'র অধীন।[১]

তুর্কিদের ভয়ে সমগ্র ইউরোপ এমনই কম্পমান ছিলো যে, বড় বড় প্রতাপশালী শাসক তুর্কী সুলতানের ছত্রচ্ছায়ায় থাকাই নিরাপদ মনে করতো। তুর্কী সুলতানদের সম্মানে এমনকি গীর্জার ঘণ্টাধ্বনিও বন্ধ রাখা হতো। মুহম্মদ আলফাতিহ-এর মৃত্যুসংবাদে পোপ তিনদিনব্যাপী জাতীয় আনন্দ ঘোষণা করেছিলেন এবং ঈশ্বরের প্রতি কৃতজ্ঞতা নিবেদনের জন্য প্রার্থনা অনুষ্ঠানের ব্যবস্থা করেছিলেন। শত্রুপক্ষের সম্রাটের মৃত্যুতে ধর্মীয় পর্যায়ে আনন্দ-অনুষ্ঠানের আয়োজন, সম্ভবত এটা ছিলো ইতিহাসের একমাত্র ঘটনা। এতেই বোঝা যায়, কী পরিমাণ তুর্কীভীতি কাজ করছিলো সমগ্র ইউরোপে এবং স্বয়ং পোপের 'অন্তর-গীর্জায়'।

তৃতীয়ত ভৌগলিক ও কৌশলগত বিচারে তাদের অবস্থান ছিলো তদানীন্তন বিশ্বমানচিত্রের সবচে' গুরুত্বপূর্ণ কেন্দ্রে, যা বিশ্বকে শাসন করার জন্য ছিলো অতি উপযোগী। কেননা তাতে বলকান উপসাগর থেকে যুগপৎ এশিয়া ও ইউরোপের উপর নজরদারি করা সম্ভব ছিলো। তাদের রাজধানী ইস্তাম্বুল (কনস্টান্টিনোপল) ছিলো ইউরোপ ও এশিয়ার সঙ্গমস্থলে, যেখান থেকে একই সঙ্গে তারা তিন মহাদেশের উপর সহজে নিয়ন্ত্রণ বজায় রাখতে পারতো। তাই নেপোলিয়ান বলেছেন, 'কনস্টান্টিনোপলই হচ্ছে কল্পিত 'বিশ্বসাম্রাজ্যের' আদর্শ রাজধানী।'[২]

if a world-government ever came to be established, constantinople alone would be an ideal capital for it.

ইউরোপে তুর্কিদের শাসন সুপ্রতিষ্ঠিত ছিলো, আর নিকট ভবিষ্যতে ইউরোপ হতে যাচ্ছিলো 'নবসম্ভাবনা'র অধিকারী। ইউরোপের বুকে তখন নতুন

---

[১] فلسفة التاريخ العثماني لمحمد جميل بيهم পৃ. ২৮০-৮১
[২] ঐ পৃ. ১৫৬

জীবনীশক্তি টগবগ করছিলো এবং উন্নতি-অগ্রগতির যাবতীয় উপকরণ ও কার্যকারণ বিকাশ লাভ করছিলো। তাকদীর যদি চাইতো তাহলে তুর্কিদের জন্য সহজেই সম্ভব ছিলো জ্ঞান, বিজ্ঞান, চিন্তা ও বুদ্ধিবৃত্তির অঙ্গনে অগ্রসর হওয়া এবং খৃস্টীয় ইউরোপকে ছাড়িয়ে যাওয়া। এমনকি সম্ভব ছিলো বিশ্বনেতৃত্বের নিয়ন্ত্রণ গ্রহণ করা এবং বিশ্বকে ইউরোপীয় ধ্বংসযজ্ঞের হাত থেকে রক্ষা করে ন্যায় ও সত্যের পথে পরিচালিত করা, যার বার্তা তারা ইসলামের কল্যাণে আগেই লাভ করেছে।

উত্থানের মধ্যকালেই তুর্কীজাতির পতন

কনস্টান্টিনোপল জয়ের মাধ্যমে মহান বিজেতা মুহম্মদ আলফাতিহ ইতিহাসের গতিধারা তো ঠিক করে দিয়েছিলেন, কিন্তু তাঁর উত্তরসূরীদের অযোগ্যতা ও অবহেলায় ইতিহাসের গতি আবার চলে গিয়েছিলো অন্যদিকে। এটা শুধু তুর্কীজাতিরই দুর্ভাগ্য ছিলো না, বরং গোটা মুসলিম উম্মাহর দুর্ভাগ্য ছিলো যে, উত্থান ও উন্নতির মধ্যকালেই তুর্কীরা অধঃপতনের শিকার হলো এবং পূর্ববর্তী জাতিসমূহের রোগ-ব্যাধি তাদেরও মধ্যে ছড়িয়ে পড়লো। পারস্পরিক হিংসা-বিদ্বেষ ও বিবাদ-কোন্দল মাথাচাড়া দিয়ে উঠলো। শাসকদের মধ্যে দেখা দিলো দ্বন্দ্ব ও অন্তর্দ্বন্দ্ব এবং স্বেচ্ছাচার ও ভোগের অনাচার। যুবরাজদের শিক্ষা-দীক্ষা ও প্রশিক্ষণ ব্যবস্থা নড়বড়ে হয়ে পড়লো। চরিত্র ও নৈতিকতায় মারাত্মক অবক্ষয় দেখা দিলো। শাসক, সেনানায়ক ও রাজকর্মচারী, সবার মধ্যে দুর্নীতি ছড়িয়ে পড়লো। দেশ ও জাতি এবং রাজ্য ও সাম্রাজ্যের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতাই হলো তাদের নীতি। এমনকি রাজপুরুষদের অনুগমনে গোটা জাতি বিলাসিতা ও ভোগবাদিতার মানসিকতায় আক্রান্ত হলো। এভাবে একটি পতনশীল জাতির যাবতীয় দোষ-ব্যাধি ও স্বভাবনষ্টতা তুর্কিদের মধ্যেও দেখা দিলো, যার বিশদ বিবরণ রয়েছে 'তুর্কীজাতির ইতিহাস'গ্রন্থে। এখানে সে আলোচনার অবকাশ নেই।[১]

সবচে' ভয়ঙ্কর যে ব্যাধি তুর্কীজাতির গভীরে শিকড় গেড়ে বসেছিলো তা হলো নির্জীবতা ও স্থবিরতা। এটা যেমন ছিলো জ্ঞান ও শিক্ষার ক্ষেত্রে তেমনি ছিলো যুদ্ধবিদ্যা, সামরিক প্রশিক্ষণ এবং সেনাবাহিনীর আধুনিকায়নের ক্ষেত্রেও। তারা যেন ভুলেই গিয়েছিলো আসমানের এই অমোঘ নির্দেশ–

---

১ فلسفة التاريخ العثماني لمحمد جميل بيهم

وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا ٱسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ ٱلْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِۦ عَدُوَّ ٱللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ وَءَاخَرِينَ مِن دُونِهِمْ لَا تَعْلَمُونَهُمُ ٱللَّهُ يَعْلَمُهُمْ ۚ وَمَا تُنفِقُوا مِن شَيْءٍ فِى سَبِيلِ ٱللَّهِ يُوَفَّ إِلَيْكُمْ وَأَنتُمْ لَا تُظْلَمُونَ ﴿٦٠﴾

'আর তোমরা প্রস্তুত করো তাদের মুকাবেলার জন্য তোমাদের সাধ্যের সকল শক্তি এবং অশ্বদল। তা দ্বারা ভীত-সন্ত্রস্ত করবে তোমরা আল্লাহর শত্রুকে এবং তোমাদের শত্রুকে এবং তাদেরকে ছাড়া আরো কিছু লোককে, যাদের তোমরা চেনো না, আল্লাহ তাদের চেনেন। আর আল্লাহর রাস্তায় (জিহাদের প্রস্তুতিতে) যা কিছু তোমরা ব্যয় করবে তার প্রতিদান তোমাদের পূর্ণরূপে দান করা হবে, আর তোমাদের প্রতি কোন অবিচার করা হবে না।' (আনফাল, ৮ : ৬০)

এবং ভুলে গিয়েছিলো নবুওয়তের সেই চিরন্তন বাণী–

الحكمة ضالة المؤمن حيث وجدها فهو أحق بها

'জ্ঞান ও প্রজ্ঞা মুমিনের হারানো সম্পদ, যেখানেই সে তা পাবে, সেই হবে তার অধিক হকদার।'[১]

আর যেহেতু তাদের রাজনৈতিক ও ভৌগোলিক অবস্থান ছিলো খুবই নাযুক এবং ইউরোপীয় রাষ্ট্রবর্গ দ্বারা পরিবেষ্টিত সেহেতু সবসময় তাদের স্মরণ রাখা কর্তব্য ছিলো মিশরবিজয়ী ছাহাবী হযরত আমর ইবনুল আছ (রা)-এর সেই শাশ্বত উপদেশ, যা তিনি মিশরে মুসলিম গাজীদের উদ্দেশ্যে প্রদান করেছিলেন। তিনি বলেছিলেন–

واعلموا أنكم في رباط إلى يوم القيامة لكثرة الأعداء حولكم، وتشوف قلوبهم إليكم وإلى داركم

'মনে রেখো, কেয়ামত পর্যন্ত তোমরা বিপদ ও ঝুঁকির মুখে রয়েছো। তোমাদের অবস্থান হচ্ছে নাযুক এক মোর্চায় সতর্ক প্রহরার অবস্থায়। তোমাদের থাকতে হবে সদাসশস্ত্র। কেননা চারপাশে তোমাদের বিপুল শত্রু, আর তাদের লোলুপ দৃষ্টি রয়েছে তোমাদের উপর এবং তোমাদের ভূখণ্ডের উপর।'[২]

---

১ رواه الترمذي عن أبي هريرة رضي الله عنه في كتاب العلم، وابن ماجه في كتاب الزهد

২ تاريخ مصر لجرجي زيدان

কিন্তু আফসোস, তুর্কীজাতি বসে থাকলো, আর সময় এগিয়ে গেলো। তারা পিছিয়ে পড়লো, আর ইউরোপ তাদের ছাড়িয়ে বহুদূর চলে গেলো। তুরস্কের বিদুষী লেখিকা খালিদা এদীব খানম তার জাতির বুদ্ধিবৃত্তিক স্থবিরতার যে চিত্র এঁকেছেন এখানে তা তুলে ধরা বেশ উপযুক্ত ও যুক্তিযুক্ত বলে মনে হয়। 'তুরস্কে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের সঙ্ঘাত' গ্রন্থে তিনি বলেন–

'জ্ঞান ও বুদ্ধিবৃত্তির জগতে যত দিন কালামশাস্ত্রীয় দর্শনের কর্তৃত্ব ছিলো তত দিন ওলামা ও জ্ঞানী সমাজ তুরস্কে তাদের দায়িত্ব ও কর্তব্য সুচারুরূপেই পালন করেছেন। সোলায়মানিয়া মাদরাসা ও মাদরাসাতুল ফাতিহ ছিলো সমকালীন যাবতীয় জ্ঞান ও শাস্ত্রের কেন্দ্র। কিন্তু পাশ্চাত্য যখন ঈশ্বরতত্ত্ব ও ধর্মতত্ত্বের বৃত্ত ভেঙ্গে বের হয়ে এলো এবং আধুনিক বিজ্ঞান ও নতুন দর্শনের ভিত্তি নির্মাণ করলো, যার ফলে বিশ্বে এক নতুন বিপ্লব সৃষ্টি হলো তখন মুসলিম ওলামা ও জ্ঞানীসমাজ আধুনিক শিক্ষার দায়িত্ব ও আদর্শ শিক্ষকের কর্তব্যপালনে সম্পূর্ণ ব্যর্থ হলেন। তারা ভাবতেন, জ্ঞান ও বুদ্ধিবৃত্তি এখনো সেখানেই নিশ্চল আছে যেখানে ছিলো খৃস্টীয় ত্রয়োদশ শতাব্দীতে। এই মারাত্মক ভ্রান্তিকর চিন্তা খৃস্টীয় উনিশ শতক পর্যন্ত তাদের শিক্ষাব্যবস্থায় প্রভাব বিস্তার করে ছিলো।

তুরস্ক ও অন্যান্য মুসলিম দেশের বিদ্বানসমাজের এ চিন্তাধারার সঙ্গে ইসলাম ও ইসলামী চেতনার কোন সম্পর্ক ছিলো না। কারণ খৃস্টীয় ঈশ্বরতত্ত্ব বা মুসলিম ইলমুল কালাম, মূলত এর ভিত্তি ছিলো গ্রীক দর্শনের উপর, যাতে এরিস্টটলীয় দর্শনেরই ছাপ ছিলো প্রধান, আর এরিস্টটল ছিলেন পৌত্তলিক দার্শনিক। এখানে সংক্ষেপে আমরা খৃস্টান পণ্ডিত ও মুসলিম ওলামা সমাজের চিন্তাধারার একটি তুলনামূলক পর্যালোচনা তুলে ধরবো।

কোরআনুল কারীম কখনো প্রকৃতি ও বিশ্বজগতের সৃষ্টিপ্রসঙ্গ বিশদ আলোচনায় আনেনি। কারণ কোরআনী শিক্ষার আসল গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো নৈতিক ও সামাজিক জীবন। কোরআনের মূল উদ্দেশ্যই হলো ভালো-মন্দ, ন্যায়-অন্যায় এবং কল্যাণ-অকল্যাণের মধ্যে পার্থক্য সুস্পষ্ট করে দেয়া। কারণ কোরআন এসেছে মানুষের জন্য একটি জীবনবিধানরূপে, নিছক জ্ঞান ও শাস্ত্রগ্রন্থরূপে নয়। তাই কোরআন যখনই কোন আধ্যাত্মিক বা অতিপ্রাকৃতিক বিষয় আলোচনা করেছে সেখানে বলতে গেলে কোন জটিলতা বা অস্পষ্টতাই আমাদের চোখে পড়ে না। কোরআনী শিক্ষার ভিত্তিই হলো তাওহীদ বা একত্ববাদ। তাই

(বিশ্বাসগত দিক থেকেও) ইসলাম একটি সহজ-সরল, নির্জটিল ও উদার ধর্মরূপে পরিচিত হয়েছে।

বিশ্বজগত সম্পর্কে নতুন নতুন চিন্তাধারা গ্রহণ করার ক্ষেত্রে ইসলাম অন্যান্য ধর্মের চেয়ে অনেক উদার ছিলো। কিন্তু এই সরলতা ও উদারতা, যা নতুন জ্ঞান-গবেষণার জন্য সহায়ক হতে পারতো মুসলিমদের জীবনে তা দীর্ঘ সময় বহাল ছিলো না। হিজরী নবম শতকে মুসলিম ওলামা ও কালামবিদগণ ফিকাহ তো বটেই, এমনকি ঈশ্বরতত্ত্বীয় আলোচনাকেও বিচিত্র নিয়ম-নীতি ও বিধি-বন্ধনের বেড়াজালে আবদ্ধ করে ফেলেছিলেন। ফলে ইজতিহাদ ও গবেষণার দুয়ার বন্ধ হয়ে গিয়েছিলো। আর ঐ সময়কালেই ইসলামী দর্শনের গভীরে এরিস্টেটলীয় ধ্যান-ধারণার অনুপ্রবেশ ঘটেছিলো।

পক্ষান্তরে সম্পূর্ণ বিপরীত অবস্থা ছিলো ঈসায়ী ধর্মের, যাকে সেন্ট পল-এর ধর্ম বলাই অধিক যুক্তিযুক্ত। সেখানে ধর্মগ্রন্থের সৃষ্টিপর্বে বিশ্বসৃষ্টি সম্পর্কে বিশদ বিবরণ রয়েছে। খৃস্টানদের কাছে যেহেতু এটা ছিলো আল্লাহর কালাম সেহেতু তাদের বিশ্বাসগত অপরিহার্য কর্তব্য ছিলো তার সত্যতা সাব্যস্ত করা। কিন্তু বাস্তব পর্যবেক্ষণ যেহেতু তাদের ব্যাখ্যা-বক্তব্যের সমর্থনে ছিলো না সেহেতু তারা তাত্ত্বিক প্রমাণের আশ্রয় গ্রহণ করতে বাধ্য হয়েছিলো। আর এক্ষেত্রে তারা এরিস্টেটলের আঁচল ধরেছিলো এজন্য যে, তার দর্শনে তখন ছিলো আশ্চর্যরকম জাদুশক্তি।

এর মধ্যে পাশ্চাত্যজগত যখন মুক্তমনে গবেষণা ও পর্যবেক্ষণ এবং পরীক্ষণ ও নিরীক্ষণের মাধ্যমে বিশ্বজগতের নতুন অধ্যয়ন শুরু করলো এবং বাস্তব প্রমাণের ভিত্তিতে জ্ঞানের নতুন নতুন তত্ত্ব ও সত্য আবিস্কৃত হতে লাগলো তখন গীর্জার ভিত কেঁপে উঠলো। ধর্মনেতা ও ধর্মপণ্ডিতগণ বিচলিত ও সন্ত্রস্ত হয়ে পড়লেন যে, গীর্জার প্রভাব-প্রতিপত্তির বুঝি 'ঘন্টা বেজে গেলো'। এভাবে শুরু হয়ে গেলো বিজ্ঞান ও ধর্মের ভয়াবহ সঙ্ঘাত।

বহু বিজ্ঞানী, যারা জ্ঞান-গবেষণা ও বিজ্ঞান-সাধনায় নিবেদিত ছিলেন, তাদের হতে হলো জ্ঞান-বিজ্ঞানের প্রতি বিশ্বস্ততার বলি,। কিন্তু বহু রক্ত ঝরিয়ে শেষ পর্যন্ত গীর্জার কর্ণধারগণ বাস্তবতার মুখোমুখি হতে বাধ্য হলেন এবং গীর্জার বিদ্যালয়গুলোর পাঠ্যসূচীতে বিজ্ঞান অন্তর্ভুক্ত করলেন। ফলে তাদের বিদ্যালয়-গুলো, যা নিকট অতীতেও মুসলিম বিদ্যালয়গুলোর প্রতিবিম্ব ছিলো, হঠাৎ আধুনিক জ্ঞান-বিজ্ঞানের শিক্ষাকেন্দ্রে পরিণত হলো (এবং সমাজে গ্রহণযোগ্যতাও

অর্জন করলো) তবে তারা তাদের ঈশ্বরতত্ত্ব ও ধর্মদর্শন ত্যাগ করেনি। ফল এই দাঁড়ালো যে, আধুনিক সমাজের অন্তত কিছু অংশের উপর গীর্জার প্রভাব আগের মতই রয়ে গেলো। ক্যাথলিক ও প্রোটেস্টান্ট পাদ্রিগণ আধুনিক জ্ঞান-বিজ্ঞানেও পারদর্শী হলেন এবং সর্ববিষয়ে নতুন প্রজন্মের সঙ্গে কথা বলার যোগ্যতা অর্জন করলেন।

পক্ষান্তরে তুরস্কে মুসলিম ওলামা-সমাজের অবস্থা ছিলো সম্পূর্ণ বিপরীত। আধুনিক জ্ঞান-বিজ্ঞানে তারা মনোযোগী হবেন কি, বরং তাদের এলাকায় নতুন চিন্তার প্রবেশও নিষিদ্ধ করে দিলেন। আর যেহেতু মুসলিম উম্মাহর শিক্ষার নিয়ন্ত্রণ ছিলো তাদেরই হাতে সেহেতু একই স্থবিরতা শিক্ষাব্যবস্থায়ও চেপে বসলো। তদুপরি অবক্ষয়যুগে বিভিন্ন কারণে আলিমদের রাজনৈতিক তৎপরতা ছিলো দ্রুত বর্ধমান। (আর রাজনীতি ও জ্ঞানচর্চা একই মস্তিষ্ক খুব কমই ধারণ করতে পারে।) তাই গবেষণা ও পরীক্ষা-নিরীক্ষার গুরুভার বহন করা তাদের পক্ষে সম্ভবও ছিলো না। এজন্য সহজ নোসখা হিসাবে বাধ্য হয়েই তারা এরিস্টেটলের দর্শন আঁকড়ে ধরলেন এবং তাত্ত্বিক প্রমাণকেই জ্ঞানের ভিত্তিরূপে বহাল রাখলেন। ফলে তের শতকে মুসলিম শিক্ষাব্যবস্থার যে হাল ছিলো, উনিশ শতকে এসেও তা বহাল ছিলো।[১]

মুসলিমবিশ্বব্যাপী স্থবিরতা

জ্ঞান ও চিন্তার এ স্থবিরতা ও বন্ধ্যাত্ব শুধু তুরস্কে এবং ধর্মীয় শিক্ষার মহলেই সীমাবদ্ধ ছিলো না, বরং পূর্ব থেকে পশ্চিম গোটা মুসলিমবিশ্বই এর শিকার ছিলো। মস্তিষ্ক যেন নিশ্চল, চিন্তা যেন নির্জীব এবং শরীর যেন অবশ। অষ্টম শতকের কথা নাও যদি বলি, কোন সন্দেহ নেই যে, নবম শতকই ছিলো শেষ যুগ, যেখানে দ্বীন ও ইলম এবং জ্ঞান ও চিন্তার ক্ষেত্রে ইজতিহাদ ও গবেষণার এবং কবিতা ও সাহিত্যের ক্ষেত্রে উদ্ভাবন ও সৃজনশীলতার কিছু না কিছু স্বাক্ষর ছিলো। এ শতকেই ইবনে খালদূনের আলমুকাদ্দিমার মত চিন্তাসমৃদ্ধ গ্রন্থ মুসলিম বিশ্বের গ্রন্থাগারে সংযোজিত হয়েছে। পক্ষান্তরে দশম শতাব্দী ছিলো নিশ্চলতা, স্থবিরতা ও অনুকরণের সূচনাযুগ। এবং এটা যেমন ছিলো ধর্মীয় জ্ঞানের সকল শাখার চিত্র, তেমনি ছিলো জ্ঞান, সাহিত্য, ইতিহাস, দর্শন ও শিক্ষাব্যবস্থার ছবি।

[১] conflict 0︎ ︎t and west in turkey, p. 40-43

তখনকার জ্ঞান-গবেষণার ইতিহাস দেখুন, এমন একটি নামও খুঁজে পাবেন না যাকে বলা যায় 'প্রতিভা', কিংবা অন্তত 'মনীষা', যিনি জ্ঞান ও শাস্ত্রের কোন শাখায় সৃজনশীলতার পরিচয় দিয়েছেন এবং প্রশংসা করার মত নতুন কোন মাত্রা যোগ করেছেন। এক্ষেত্রে ব্যতিক্রম শুধু কয়েকটি নাম, যারা তাদের যুগের চিন্তা ও বুদ্ধিবৃত্তির স্তর থেকে অনেক উর্ধ্বে ছিলেন, যারা দ্বীনী ও ইলমী পরিমণ্ডলে কোন 'কারনামা' বা বুদ্ধিবৃত্তিক কীর্তি উপহার দিয়েছেন। সৌভাগ্যক্রমে প্রায় সব ব্যতিক্রমই ছিলো ভারতবর্ষে। যেমন শায়খ আহমদ সারহিন্দী মুজাদ্দিদে আলফে ছানী (রহ, মৃঃ ১০৩৪ হিঃ), যার '*মাকতূবাত*' দ্বীনী ও ইলমী খাজানায় একটি মূল্যবান সংযোজন বলে সর্বস্বীকৃত।

এবং শাহ ওয়ালিউল্লাহ দেহলবী (রহ, মৃ. ১১৭৬ হি.), যার গ্রন্থত্রয় *হুজ্জাতুল্লাহিল বালিগাহ, ইযালাতুল খাফা* ও *রিসালাতুল ইনছাফ* হচ্ছে স্ব-স্ব বিষয়ে সত্যি অনন্য কীর্তি!

তদ্রূপ শাহ ছাহেবের সুযোগ্য পুত্র শাহ রফীউদ্দীন দেহলবী (রহ, মৃ. ১২৩৩ হি.), যিনি '*তাকমীলুল আযহান*' ও '*রিসালাতুল মাহাব্বাহ*' কিতাবে কিছু নতুন ও চমকপ্রদ চিন্তা উপস্থাপন করেছেন।

তদ্রূপ শাহ ইসমাঈল শহীদ দেহলবী (রহ, শাহাদাত, ১২৪৬ হি.) যার '*মানছিবে ইমামত* ও *আকাবাত*' গ্রন্থদু'টি বিস্ময়কর ইজতিহাদি শানের অধিকারী এবং স্ব-স্ব বিষয়ে অতুলনীয়।

একই ভাবে বলা যায় ওলামায়ে ফিরিঙ্গি মহল-এর কথা এবং পূর্বাঞ্চলের কতিপয় শিক্ষাঙ্গন ও চিন্তাকেন্দ্রের কথা। মেধায়, মননে ও সৃজনশীলতায় তারা অত্যন্ত বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত ছিলেন এবং আপন আপন সময়কালের শিক্ষাধারায় সুগভীর প্রভাব বিস্তার করেছেন; তবে তাদের মেধা ও প্রতিভা এবং চিন্তা ও বুদ্ধিবৃত্তির কীর্তি-কর্ম পাঠ্যবিষয়ের গণ্ডি খুব কমই অতিক্রম করেছে।

শুধু দ্বীনী ইলমের কথা বলি কেন, কবিতা ও সাহিত্যের অঙ্গনও ছিলো একই রকম বন্ধ্যাত্বের শিকার। কাব্যকর্ম পরিমাণে প্রচুর হলেও তাতে জীবন ও সজীবতার ছাপ ছিলো না, ছিলো শুধু প্রথামনস্কতা, স্থূলতা ও অনুকরণ-সর্বস্বতা। সাধারণভাবে কবিতার বিষয়বস্তু ছিলো রাজতোষামোদ, সস্তা চাটুকারিতা ও আত্মপ্রশস্তি।

গদ্যসাহিত্যও ছিলো আড়ম্বর, কৃত্রিমতা, ছান্দিকতা ও অন্তসারশূন্য শব্দজৌলুসে আকীর্ণ। এমনকি ইতিহাসগ্রন্থ, দাপ্তরিক লেখা, প্রশাসনিক ফরমান এবং

বন্ধুমহলীয় পত্রাবলীও এ দোষ থেকে মুক্ত ছিলো না। বিচ্ছিন্ন দু'একটি সাহিত্যকর্মে অবশ্য এমন কিছু নমুনা পাওয়া যায়, যা তখনকার সাধারণ রুচি ও প্রবণতা থেকে কিছুটা উপরে এবং পতিত স্তর থেকে কিছুটা উর্ধ্বে।

মাদরাসা ও শিক্ষাকেন্দ্রগুলোও চরম স্থবিরতা, নির্জীবতা ও বন্ধ্যাত্বের শিকার হয়ে পড়েছিলো। সেখানেও ছিলো জ্ঞানদৈন্য ও চিন্তানৈতিক অবক্ষয়ের ছাপ। পূর্ববর্তিদের সমৃদ্ধ গ্রন্থাবলী, যা জ্ঞান, শিক্ষা ও রুচিপ্রদ ছিলো, সেগুলোকে ক্রমান্বয়ে পাঠ্যসূচী থেকে সরিয়ে পরবর্তিদের রচনাবলীর অনুপ্রবেশ ঘটানো হচ্ছিলো, নিজ নিজ বিষয়ে যাদের ইজতিহাদি যোগ্যতা ছিলো না। তারা শুধু পূর্ববর্তিদের ব্যাখ্যাকারী ও ভাষ্যকার ছিলেন। সমগ্র পাঠ্যসূচী ব্যাখ্যা, টীকা, সারসঙ্কলন ও 'মতন'-এ পূর্ণ ছিলো, যেখানে বিজ্ঞ লেখকগণ কাগজ-কালিতে কৃচ্ছ্র করে বোধগম্য সরল ও বিশদ ভাষার পরিবর্তে 'সঙ্কেতভাষা' ব্যবহার করেছেন, যা বোঝার জন্য আবার বিশদ ব্যাখ্যার প্রয়োজন হতো। এভাবে ব্যাখ্যার উপর ব্যাখ্যা, তার উপর আবার টীকা-এর সিলসিলা জারি থাকতো। অর্থাৎ একবার করা হতো কাগজ-কালির সাশ্রয়, আবার করা হতো কালি-কাগজের অপচয়।

উপরের চিত্র থেকে মোটামুটি বোঝা যায়, মুসলিম বিশ্বের উপর তখন জ্ঞান-বন্ধ্যাত্ব ও বুদ্ধিবৃত্তিক স্থবিরতা কেমন কঠিনভাবে চেপে বসেছিলো, যা থেকে জীবনের কোন অঙ্গন মুক্ত ছিলো না।

তুর্কী সালতানাতের সমকালীন পূর্বাঞ্চল

তুর্কী সালতানাতের সমকালে পূর্বাঞ্চলে দু'টি শক্তিশালী মুসলিম সাম্রাজ্য ছিলো। প্রথমটি হলো তৈমুর বংশীয় যহীরুদ্দীন বাবর (৯৩৩ হিঃ ১৫৪৬ খৃঃ) কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত মোঘল সাম্রাজ্য। বাবর ছিলেন তুর্কী খলিফা সুলতান সেলীম প্রথম-এর সমসাময়িক। শুরুতে যারা মোঘল সিংহাসন অলঙ্কৃত করেছেন, সাহস ও প্রতাপে এবং সামরিক শক্তি ও সাম্রাজ্যের বিস্তারে তারা মুসলিমবিশ্বে শ্রেষ্ঠত্বের অধিকারী ছিলেন। তাদের মধ্যে আবার শ্রেষ্ঠ ছিলেন আওরঙ্গযেব রহ.। তিনিই ছিলেন প্রতাপশালী শেষ মোঘলসম্রাট। তাঁর শ্রেষ্ঠত্ব যেমন ছিলো একের পর এক বিজয়াভিযান ও সাম্রাজ্য বিস্তারে এবং পূর্ণ দক্ষতা ও বিচক্ষণতার সঙ্গে রাজ্যপরিচালনার ক্ষেত্রে তেমনি ছিলো কিতাব ও সুন্নাহর জ্ঞানে এবং নৈতিকতা ও ধার্মিকতায়। তিনি সুদীর্ঘ পঞ্চাশ বছর সাম্রাজ্য শাসন করেছেন এবং নব্বই

বছরেরও বেশী বয়সে ১১১৮ হিজরীতে (খৃস্টীয় অষ্টাদশ শতকের শুরুর দিকে) ইন্তিকাল করেছেন।

সেটা ছিলো ইউরোপের ইতিহাসে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ সময়কাল। ইউরোপ তখন আড়মোড়া ভেঙ্গে জেগে উঠেছে এবং চারদিকে সাজ সাজ রব পড়ে গেছে। কিন্তু আশ্চর্য এবং দুর্ভাগ্য, খোদ আওরঙ্গযেব বা তাঁর পূর্বসূরী কারোই ইউরোপ সম্পর্কে কোন ধারণাই ছিলো না। সেখানে তখন কী বিরাট পরিবর্তন শুরু হয়েছে এবং নবজাগরণের কার্যকারণগুলো কত দ্রুত শক্তি অর্জন করছে সে সম্পর্কে তারা ছিলেন সম্পূর্ণ অন্ধকারে। তাই ইউরোপ থেকে যে সামান্যসংখ্যক বণিক, চিকিৎসক ও পর্যটক মোঘল দরবারে এসেছে, তাদের তারা দয়া ও অবজ্ঞার দৃষ্টিতেই দেখেছেন।

ভাবতে সত্যি অবাক লাগে, এত বিশাল-বিস্তৃত এবং এমন জটিল জনগোষ্ঠী-অধ্যুষিত সাম্রাজ্যের শাসনভার যাদের হাতে তারা সমকাল সম্পর্কে এতটা বেখবর কীভাবে থাকতে পারেন! কিন্তু এটাই ছিলো বাস্তবতা। আরো দুর্ভাগ্য যে, আওরঙ্গযেবের উত্তরসূরীরা ছিলো ভীরু, দুর্বল, অযোগ্য ও আরামপ্রিয় শাসক। ইউরোপ থেকে ধেয়ে আসা বিপদ-দুর্যোগের মোকাবেলায় ইসলামী উম্মাহকে রক্ষা করা দূরের কথা, তাদের তো পৈতৃক রাজত্ব ও সিংহাসন রক্ষা করারও যোগ্যতা ছিলো না। শেষ ফল এই দাঁড়ালো, তাদের অনৈক্য ও অন্তর্কলহ, ভীরুতা ও দুর্বলতা এবং অন্তহীন অযোগ্যতার কারণে বিশাল ভারতবর্ষে বৃটিশ রাজত্ব কায়েম হয়ে গেলো, যা ছিলো গ্রেট বৃটেনের সুসমৃদ্ধি ও সফল শিল্প-বিপ্লবের বুনিয়াদ।[১]

---

[১] এ প্রসঙ্গে brooks adams বলেন, ১৭৫৭ সালে পলাশী-যুদ্ধের পর বাংলার সম্পদ লণ্ডনে আসা শুরু হয় এবং তার সুফলও খুব দ্রুত দেখা দেয়। এই যে এত বড় শিল্পবিপ্লব, যার প্রভাব এখন পৃথিবীর সর্বত্র দৃশ্যমান, হয়ত তার অস্তিত্বই হতো না যদি পলাশীর যুদ্ধ না হতো। বস্তুত ভারতবর্ষের অঢেল সম্পদই ছিলো শিল্পবিপ্লবের সহায়ক ও চালিকাশক্তি।

ভারতবর্ষ থেকে সম্পদের ঢল যখন লণ্ডনে এসে আছড়ে পড়তে শুরু করলো এবং বিশাল পুঁজি তৈরী হলো তখন আবিষ্কার-উদ্ভাবনের ক্ষেত্রেও বিরাট প্রতিযোগিতা শুরু হলো। একথা নির্দ্বিধায় বলা যায়, পৃথিবীতে আজ পর্যন্ত সম্পদ দ্বারা এত অধিক মুনাফা অর্জিত হয়নি, যতটা হয়েছে ভারত থেকে লব্ধ (লুণ্ঠিত!) সম্পদ দ্বারা। কেননা পঞ্চাশ বছর পর্যন্ত এ ক্ষেত্রে ইংল্যেণ্ডের কোন প্রতিদ্বন্দ্বী ছিলো না। (the law of civilgzation and decay, london, 1889, p. 313-17)

একই প্রসঙ্গে sir william digby বলেন, ইংল্যেণ্ডের শিল্পসমৃদ্ধি মূলত বাংলা ও কর্নাটকের সম্পদভাণ্ডারের কারণেই সম্ভব হয়েছে। পলাশীর পূর্বে যখন ভারতবর্ষের সম্পদ ইংল্যেণ্ডে আসা

প্রাচ্যের দ্বিতীয় বৃহৎ সাম্রাজ্য ছিলো ইরানের ছাফাভী সালতানাত। এটি ছিলো সত্যিকার অর্থেই একটি সুউন্নত ও সুসমৃদ্ধ দেশ। কিন্তু শাসকবর্গ শিয়াবাদ ও উগ্রসাম্প্রদায়িকতায় এতই মেতে ছিলো এবং ওছমানী সালতানাতের সঙ্গে সজ্ঘাত-সঙ্ঘর্ষে এমনই ব্যতিব্যস্ত ছিলো যে, অন্য বিষয়ে চিন্তা-ভাবনার ফুরসতই তাদের ছিলো না। ফলে ইউরোপ যখন উন্নতির পথে শনৈঃশনৈঃ এগিয়ে চলেছে, সেই সুবর্ণ সময়কালটি তারা অপচয় করেছে কখনো তুর্কী সীমান্তে হামলা চালিয়ে, কখনো আত্মরক্ষার যুদ্ধে জড়িয়ে।

বস্তুত প্রাচ্যের এদু'টি বৃহৎ সাম্রাজ্য নিজ নিজ সমস্যায় এমনই নাজেহাল ছিলো এবং বাইরের দুনিয়া থেকে এতটাই বিচ্ছিন্ন ছিলো যে, ইউরোপের মত দূর-দূরাঞ্চল তো অনেক পরে, নিকটবর্তী মুসলিম দেশগুলোর পরিবেশ-পরিস্থিতি ও ঘটনাপ্রবাহ সম্পর্কেও তাদের কোন 'জানাজানি' ছিলো না। আর ইসলামী ভ্রাতৃত্ব, বা আন্ত-মুসলিম ঐক্য গড়ে তোলা, এগুলো তো সম্ভবত শাসকবর্গের চিন্তায়ও কখনো আসেনি। এমনকি ইউরোপের শিক্ষা-জাগরণ ও বিজ্ঞানসাধনা এবং শিল্পবিপ্লব ও সামরিক অগ্রগতি সম্পর্কে নিকট পর্যবেক্ষণ এবং তা থেকে যথাসাধ্য উপকৃত হওয়ার প্রচেষ্টাটুকুও তাদের মধ্যে ছিলো না; ছিলো শুধু অন্তর্কলহে মেতে থাকা, আর ভোগ-বিলাসে গা ভাসিয়ে দেয়া। এককথায়, 'ইউরোপে যখন জাগরণের শোর, মুসলিম জাহানে তখন ঘুমের ঘোর! কিংবা আমরা যখন 'তাজ ও মমতাজ' নিয়ে ব্যস্ত, ইউরোপ তখণ 'পথ ও পাথেয়'র সন্ধানে ব্যতিব্যস্ত। আমাদের হাজার হাজার শ্রমিক যখন তাজমহল তৈরী করছে, ওরা তখন তৈরী করছে কল-কারখানা এবং সাগরে ভাসার মত বড় বড় জাহাজ! এসব কথা স্মরণ করেই হয়ত কবি ইকবালের চোখ থেকে ঝরেছে অশ্রু, আর কলম থেকে ঝরেছে কবিতা—

ম্যাঁয় তুম কো বাতাতা হূঁ তাকদীরে উমাম কেয়া হ্যয়
শামশের ও সেনাঁ আওয়াল, তাঊস ও রবাব আখের!

শোনো, বলি তোমাকে কোন জাতির উত্থান পতনের তাকদীর
শুরুতে তীর-তলোয়ার, শেষে পায়েল-সেতারের মধুর ঝঙ্কার

শুরু হয়নি তখন আমাদের দেশে শিল্প বলতে কিছুই ছিলো না। (prosperous india: a revolution. p.30)
এমনকি এটাই ছিলো মুসলিম বিশ্বের পরাধীনতা ও দাসত্ব-শৃঙ্খলের পরোক্ষ কারণ।

হেমন্তেও বসন্তের কিছু আভাস

একথা সত্য যে, মুসলিম উম্মাহর সবুজ-সজীব উদ্যান, যেখানে নিরন্তর প্রস্ফুটিত হতো প্রতিভার অসংখ্য ফুল, তা তখন উজাড় হয়ে গিয়েছিলো এবং বসন্ত-বাহার বিদায় নিয়েছিলো। তবে একথাও সত্য যে, ঐ অবস্থায়ও মাঝে মধ্যে এখানে সেখানে ইসলামবৃক্ষে কিছু সবুজ কিশলয়ের উন্মেষ ঘটেছে এবং হেমন্তকালেও তা এমন কিছু ফুল ও ফল উপহার দিয়েছে, যার তুলনা পৃথিবীর অন্যান্য জাতির ইতিহাসের বসন্তকালেও খুব বেশী পাওয়া যায় না। সোজা করে বলতে পারি, 'জাতীয় পর্যায়ে যুগটা ছিলো অবক্ষয় ও অধঃপতনের, তবে ব্যক্তিপর্যায়ে কিছু অবিস্মরণীয় কীর্তি ও কর্মের।

মুসলিমবিশ্বের বিভিন্ন অঞ্চলে তখন উচ্চ মনোবল, উদ্দীপ্ত চেতনা ও জাগ্রত মস্তিষ্কের অধিকারী এমন কতিপয় ব্যক্তি ও ব্যক্তিত্বের আবির্ভাব ঘটেছে, যারা কিছু সময়ের জন্য হলেও পতনোন্মুখ জাতি ও জনগোষ্ঠীর মধ্যে নবজীবনের সঞ্চার করেছেন।

ভারতবর্ষে সুলতান ফতহে আলী খান টিপুর মত সাহসী, দূরদর্শী ও সিংহহৃদয় শাসক জন্মগ্রহণ করেছেন, হিন্দুস্তানকে যিনি নতুন আযাদীর ও নয়া যিন্দেগির প্রায় দোরগোড়ায় নিয়ে এসেছিলেন, যদি না কতিপয় 'মীর সাদিক'-এর জন্ম হতো!

অন্যদিকে হযরত সৈয়দ আহমদ শহীদ (রহ)-এর মত জাদুকরী ব্যক্তিত্বের দাঈ ও মুজাহিদ জন্মগ্রহণ করেছেন, যিনি খেলাফতে রাশেদার আলোকে ইসলামী হুকুমত কায়েমের জিহাদ শুরু করেছিলেন, তাঁর কল্পনা ও পরিকল্পনায় যার সীমানা বিস্তৃত ছিলো হিন্দুস্তান থেকে বোখারা পর্যন্ত; তাঁর মহান তারবিয়াতের ফলে উন্নতচরিত্র অসংখ্য মুজাহিদ এবং নিবেদিত প্রাণ দাঈ ও সিপাহী তৈরী হয়েছিলো, যাদের ঈমান ও ইয়াকীন, ইখলাছ ও লিল্লাহিয়াত এবং জোশ ও জাযবা সেই 'কুরূনে উলা'র ঝলক দেখিয়েছিলো। বলতে গেলে ঐ পতনমুখী যুগে তিনি এক অসাধ্যই সাধন করেছিলেন। কিন্তু সামাজিক অবক্ষয়, রাজনৈতিক অরাজকতা, চারিত্রিক অধঃপতন এবং জাতীয় তন্দ্রাচ্ছন্নতা এমনই চূড়ান্ত ছিলো যে, বিশাল বটবৃক্ষের মত এসকল ব্যক্তিত্বও মুসলমানদের পতন ও অধঃপতনের গতিমাত্রায় বিশেষ কোন 'রোকথাম' আনতে পারেননি এবং উম্মাহ সামগ্রিকভাবে তাঁদের জিহাদ ও মুজাহাদা, ত্যাগ ও আত্মত্যাগ এবং তাজদীদী মেহনত থেকে তেমন কিছু সুফল অর্জন করতে পারেনি।

শিল্প ও জ্ঞান-বিজ্ঞানে ইউরোপের উত্থান

ষোড়শ শতাব্দীর শেষ এবং সপ্তদশ শতাব্দীর শুরু থেকেই তুর্কীরা নীতি ও নৈতিকতার ক্ষেত্রে অবক্ষয় এবং জ্ঞান ও বুদ্ধিবৃত্তির ক্ষেত্রে পশ্চাদ্‌পদতার শিকার হয়ে পড়েছিলো। মানবজাতির ইতিহাসে এটা ছিলো এমনই এক গুরুত্বপূর্ণ ও ভাগ্যনির্ধারণকারী যুগ, যার সুস্পষ্ট ছাপ ও প্রভাব আমরা দেখতে পাই পরবর্তী শতাব্দীগুলোতে।

ইউরোপ তখন দীর্ঘ নিদ্রা থেকে জেগে উঠেছে এবং বিপুল উদ্দীপনা ও উন্মাদনা নিয়ে এগিয়ে চলেছে, যাতে দ্রুততম সময়ে পিছনের অজ্ঞতা ও মূর্খতার ক্ষতিপূরণ হতে পারে। জীবনের প্রতিটি অঙ্গনে তাদের উন্নতির গতি ছিলো বিস্ময়কর। আপন লক্ষ্যের পথে তারা শুধু দৌড়ে যাচ্ছিলো না, বরং ডানা মেলে উড়ে চলেছিলো। প্রকৃতির বিভিন্ন শক্তি তারা আয়ত্ত করছিলো এবং সৃষ্টিজগতের রহস্যরাজি উন্মোচিত করছিলো। অজানা দেশ-মহাদেশ ও সাগর-পথ আবিষ্কৃত হচ্ছিলো। জ্ঞান-বিজ্ঞানের প্রতিটি শাখায় তাদের অগ্রযাত্রা এবং জীবনের প্রতিটি অঙ্গনে তাদের শোভাযাত্রা অব্যাহত ছিলো। এই সংক্ষিপ্ত সময়কালে সেখানে অনন্যসাধারণ বহু বিজ্ঞান-প্রতিভার আবির্ভাব ঘটেছিলো। সংক্ষিপ্ত উদাহরণে যাদের নাম আসে তারা হলেন কোপার্নিকাস, ব্রুনো, গ্যালিলিও, কেপলার, নিউটন ও অন্যান্য। বস্তুত এই মহাবিজ্ঞানিগণ জ্যোতির্বিদ্যা, পদার্থবিজ্ঞান ও প্রকৃতিবিজ্ঞানের জগতে প্রাচীন ব্যবস্থা ভেঙ্গে নতুন ব্যবস্থা প্রবর্তন করেছেন এবং জ্ঞানের নতুন নতুন দিগন্ত উন্মোচন করেছেন। অভিযাত্রী ও নাবিকদের মধ্যে ছিলেন কলোম্বাস, ভাসকো ডি গামা ও ম্যাগলিন-এর মত সাহসী, উদ্যমী ও দৃঢ়চেতা ব্যক্তি, যারা অজানা দেশ-মহাদেশ এবং নতুন সাগর-পথ আবিষ্কার করেছেন।

উপরোক্ত সময়কালে ইতিহাসের পাতায় বিভিন্ন জাতি ও জনগোষ্ঠীর স্থান ও অবস্থান নতুনভাবে বিন্যস্ত হচ্ছিলো। কারো ভাগ্যতারকা ছিলো উদয়ের পথে, কারো ভাগ্যতারকা ছিলো অস্তাচলে। তখনকার একটি মুহূর্ত ছিলো কয়েক দিন এবং একটি দিন ছিলো কয়েক বছরের সমান। সুতরাং এ যুগসন্ধিক্ষণে সামান্য সময়ও নষ্ট করার অর্থ ছিলো বহু দীর্ঘকাল নষ্ট করা। কিন্তু হায় আফসোস, মুসলিম উম্মাহ তখন শুধু দিন, মাস ও বছর নয়, বরং বহু যুগ ও বহু প্রজন্মের অপচয় করেছে। পক্ষান্তরে ইউরোপের জাতিবর্গ প্রতিটি মুহূর্তের সদ্ব্যবহার

করেছে এবং জ্ঞান-গবেষণা ও বিজ্ঞানসাধনার সকল অঙ্গনে বছরে যুগের পথ অতিক্রম করেছে।

জ্ঞান-বিজ্ঞান ও শিল্পোন্নয়নের ক্ষেত্রে তুর্কিদের পশ্চাদ্‌পদতার একটা সাধারণ ধারণা পেতে হলে এতটুকু জানাই যথেষ্ট যে, ষোড়শ শতাব্দীর আগে সেখানে জাহাজনির্মাণ শিল্পের কোন অস্তিত্বই ছিলো না। পক্ষান্তরে ছাপাখানা, স্বাস্থ্যকেন্দ্র এবং ইউরোপীয় পদ্ধতির সামরিক একাডেমির সাথে পরিচয় ঘটেছে মাত্র অষ্টাদশ শতকে। এই শতাব্দীর শেষ পর্যন্ত তুরস্ক শিল্প, প্রযুক্তি, আবিষ্কার ও উদ্ভাবনার জগত থেকে এত দূরে ছিলো যে, রাজধানীর আকাশে উড়ন্ত বেলুন দেখে মানুষ ভেবেছে, জাদুমন্তর কিছু! ইউরোপের ছোট ছোট দেশগুলোও এক্ষেত্রে তুরস্ককে ছাড়িয়ে গিয়েছিলো। এমনকি মিশরও তুরস্কের চার বছর আগে রেলযোগাযোগ প্রতিষ্ঠা করেছিলো, আর ডাকটিকেট চালু হয়েছিলো তুরস্কের কয়েক মাস আগে।

এই যখন ছিলো মুসলিম উম্মাহর নেতৃত্বদানকারী তুরস্কের অবস্থা তখন তার শাসনাধীন বা প্রভাবাধীন আরব-অনারব দেশগুলোর অবস্থা কী হতে পারে তা তো সহজেই বোঝা যায়। মাঝারি তো নয়ই, এমনকি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র শিল্পেরও প্রচলন সেসব দেশে ছিলো না। ফরাসী পর্যটক মঁসিয়ে ভলনে– যিনি অষ্টাদশ শতকে মিশর ভ্রমণ করেন এবং চার বছর সিরিয়ায় অবস্থান করেন– তার সফরনামায় লিখেছেন, 'শিল্পে এদেশ (সিরিয়া) এতই অনগ্রসর যে, তোমার ঘড়ি নষ্ট হলে মেরামতের জন্য বিদেশী কারিগরের কাছে যেতে হবে।'[১]

তদুপরি মুসলমানদের এই পিছিয়ে পড়া শুধু বিজ্ঞান-দর্শন, তত্ত্বীয় জ্ঞান, শিল্প ও কারিগরি ক্ষেত্রেই ছিলো না, বরং ছিলো সর্বব্যাপী। এমনকি যুদ্ধবিদ্যা ও সমরশিল্পেও তারা ইউরোপ থেকে পিছিয়ে পড়েছিলো। অথচ শেষ দিকেও এক্ষেত্রে তুরস্কের শ্রেষ্ঠত্ব ছিলো সর্বস্বীকৃত। কিন্তু দেখতে দেখতে ইউরোপ অস্ত্রনির্মাণ, যুদ্ধকৌশল উদ্ভাবন এবং উন্নত সামরিক ব্যবস্থাপনায় তুরস্ককে ছাড়িয়ে গিয়েছিলো। ফলে ১৭৭৪ সালে তুরস্ক ইউরোপীয় বাহিনীর হাতে শোচনীয় পরাজয় বরণ করে।

এভাবে যুদ্ধের মাঠেও যখন ইউরোপের শ্রেষ্ঠত্ব সুপ্রমাণিত হলো তখন গিয়ে ওছমানী সালতানাতের টনক কিছুটা নড়লো এবং খলীফার আদেশে সামরিক

---

[১] زعماء الإصلاح في العصر الحديث (الصفحة السادسة

প্রশিক্ষণ ও বাহিনী পুনর্গঠনের জন্য কতিপয় ইউরোপীয় বিশেষজ্ঞ ডেকে আনা হলো। সুলতান তৃতীয় সেলিম উনিশ শতকের শুরুর দিকে আরো ব্যাপক সংস্কারের উদ্যোগ গ্রহণ করেন। তিনি যেমন বাস্তববাদী ও দূরদর্শী ছিলেন তেমনি ছিলেন দৃঢ়চেতা ও কুশলী। শাহী ঐতিহ্যের বিপরীতে তার শিক্ষা-দীক্ষা হয়েছিলো রাজপ্রাসাদের বাইরে রুক্ষ-কঠিন পরিবেশে। তিনি আধুনিক ধারার নতুন নতুন বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করেন। প্রকৌশল মহাবিদ্যালয়ে তিনি নিজে শিক্ষা দান করতেন। এছাড়া তিনি আধুনিক পদ্ধতির একটি সেনাবাহিনী গড়ে তোলেন এবং রাজনৈতিক ব্যবস্থায়ও বেশ কিছু সংস্কার সাধন করেন। কিন্তু তুর্কীজাতি ও তার সমাজব্যবস্থা এতটাই স্থবির ও রক্ষণশীল ছিলো যে, কোন প্রকার পরিবর্তন, আধুনিকায়ন ও সংস্কারপ্রচেষ্টা গ্রহণ করার যোগ্যতা তাদের ছিলো না। ফলে সেনাবাহিনীর পুরোনো অংশ বিদ্রোহ করে বসে এবং তিনি মর্মান্তিকভাবে নিহত হন।

পরে সুলতান দ্বিতীয় মাহমূদ তার স্থলাভিষিক্ত হন, যার শাসকাল ছিলো ১৮০৭ থেকে ৩৯ সাল পর্যন্ত। তারপর সিংহাসনে আসেন সুলতান প্রথম আব্দুল মজীদ, যার শাসনকাল ছিলো ৩৯ থেকে ৫১ সাল পর্যন্ত। তারা উভয়ে শহীদ সুলতান তৃতীয় সেলিমের মিশন অব্যাহত রাখেন। ফলে তুরস্ক কিছুটা উন্নতি-অগ্রগতি লাভ করতে সক্ষম হয়। কিন্তু তিক্ত সত্য এই যে, আলোচ্য সময়কালে মুসলিম তুরস্কের উন্নতি-অগ্রগতির সঙ্গে ইউরোপীয় জাতিবর্গের তুলনা করলে হতবাক হতে হয়। ইউরো-তুরস্কের প্রতিযোগিতা যেন ছিলো গল্পের খরগোশ ও কচ্ছপের দৌড় প্রতিযোগিতা, তবে পার্থক্য এই যে, ক্ষিপ্রগতির খরগোশ এখানে জাগ্রত, আর ধীরকচ্ছপ এই জাগে, এই ঘুমিয়ে পড়ে।

আঠারো ও উনিশ শতকে মরক্কো, আলজিরিয়া, মিসর, হিন্দুস্তান, তুর্কিস্তান ও অন্যান্য অঞ্চলে প্রাচ্যের মুসলিম জনগোষ্ঠীর এবং পাশ্চাত্যের বিভিন্ন জাতি ও শক্তির মধ্যে যে ভয়াবহ সঙ্ঘাত-সঙ্ঘর্ষ ঘটেছে তাতে জয়-পরাজয়ের ফায়ছালা আসলে ষোল ও সতের শতকেই হয়ে গিয়েছিলো এবং সাধারণ 'সমঝ-বুঝ' আছে, এমন যে কারো পক্ষে তখনই এর ফলাফল সম্পর্কে ভবিষ্যদ্বাণী করা সম্ভব ছিলো। অর্থাৎ যা ঘটেছে ইতিহাসের গতিধারায় তা ঘটা অনিবার্য ছিলো।

চতুর্থ অধ্যায়

ইউরোপীয় যুগ

প্রথম পরিচ্ছেদ
জড়বাদী ও বস্তুবাদী ইউরোপ

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ
ইউরোপে স্বদেশবাদ ও জাতীয়তাবাদ

তৃতীয় পরিচ্ছেদ
আত্মহত্যার পথে ইউরোপ

চতুর্থ পরিচ্ছেদ
ইউরোপীয় সাম্রাজ্যবাদের যুগে মানবতার আত্মিক বিপর্যয়

প্রথম পরিচ্ছেদ

জড়বাদী ও বস্তুবাদী ইউরোপ

পাশ্চাত্য সভ্যতার স্বভাব-প্রকৃতি ও ইতিহাস

তুর্কী সালতানাতের পতনের পর ইতিহাসের অমোঘ নিয়মে বিশ্বের শাসনক্ষমতা এবং চিন্তানৈতিক ও বুদ্ধিবৃত্তিক নেতৃত্ব মুসলিম জাতির হাত থেকে ইউরোপের অমুসলিম জাতিবর্গের হাতে চলে গিয়েছিলো; কারণ এর জন্য তাদের দীর্ঘকালের প্রস্তুতি ছিলো। তাছাড়া জীবনের 'কর্মমঞ্চে' তখন তাদের সমস্তরের কোন প্রতিদ্বন্দ্বী শক্তি ছিলো না। শেষে অবস্থা এই হলো যে, পূর্ব থেকে পশ্চিম কোন দেশ ও জনপদ তাদের প্রভাব ও নিয়ন্ত্রণ থেকে মুক্ত ছিলো না। হয় রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক শাসন-শোষণের শিকার ছিলো, না হয় সাংস্কৃতিক ও বুদ্ধিবৃত্তিক আগ্রাসনের শিকার; এমনকি জ্ঞান-বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির ক্ষেত্রেও তারা হয়ে পড়েছিলো ইউরোপের উচ্ছিষ্টভোজী।

ক্ষমতা ও নেতৃত্বের এই যে হাতবদল, এর ফলে সমকালীন পৃথিবীর চিন্তা-চেতনায়, সমাজ-সভ্যতায়, বিভিন্ন জাতির চরিত্র ও নৈতিকতায়, রুচি, চাহিদা ও প্রবণতায় কী প্রভাব পড়েছিলো? এবং এই বিপ্লব ও পরিবর্তন দ্বারা মানবজাতি ও মানবসভ্যতা উপকৃত হয়েছে না ক্ষতিগ্রস্ত? এসম্পর্কে বিচার-পর্যালোচনার পূর্বে আমরা দেখতে চাই পাশ্চাত্য সভ্যতার স্বভাব ও প্রকৃতি এবং তার গঠনকাঠামো কী? এবং এই সভ্যতার কোলে প্রতিপালিত জাতিসমূহের জীবনদর্শনই বা কী এবং কীভাবে তার বিকাশ ঘটেছে?

অনেকের ধারণা, বিশ শতকের পাশ্চাত্য সভ্যতা হচ্ছে ইউরোপের অন্ধকারাচ্ছন্ন মধ্যযুগের পরবর্তী 'জাগরণযুগে' সৃষ্ট একটি অল্পবয়স্ক সভ্যতা। আসলে তা নয়,

বরং এ সভ্যতার ইতিহাসের শিকড় বহু হাজার বছর অতীতের মাটিতে প্রোথিত। অর্থাৎ এটি গ্রীক ও রোমান উভয় সভ্যতার সন্তান। উভয় সভ্যতা যে রাজনৈতিক ব্যবস্থা, সমাজদর্শন এবং চিন্তানৈতিক ও বুদ্ধিবৃত্তিক ফল ও ফসল রেখে গেছে, পাশ্চাত্য সভ্যতা উত্তরাধিকারসূত্রেই সেগুলো ধারণ করেছে এবং উভয় সভ্যতার স্বভাব ও বৈশিষ্ট্য এবং ঝোঁক ও প্রবণতার সুগভীর ছাপ প্রজন্মপরম্পরায় রক্তসূত্রেই তাতে প্রতিফলিত হয়েছে।

গ্রীকসভ্যতাই হলো ইউরোপীয় চিন্তা-চেতনা ও স্বভাব-প্রবণতার প্রথম সর্বোত্তম প্রকাশক্ষেত্র, যা ইতিহাস আমাদের জন্য সংরক্ষণ করে রেখেছে। এটাই হলো প্রথম সভ্যতা যা ইউরোপীয় দর্শনের ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত হয়েছে এবং তাতে ইউরোপীয় মনস্তত্ত্বের পরিপূর্ণ প্রকাশ ঘটেছে। পরবর্তীকালে গ্রীকসভ্যতার ধ্বংসাবশেষেরই উপর রোমান সভ্যতার সৌধ গড়ে উঠেছে এবং এরও প্রাণ-প্রেরণা ছিলো অভিন্ন, অর্থাৎ ইউরোপীয় প্রাণ-প্রেরণা। ইউরোপীয় জাতিগোষ্ঠীগুলো বহু শতাব্দীর পথপরিক্রমায় তাদের স্বভাব-বৈশিষ্ট্য, রীতি-নীতি, চিন্তা-চেতনা, দর্শন ও বুদ্ধিবৃত্তি সযত্নে নিজেদের মধ্যে লালন-প্রতিপালন করে এসেছে। অবশেষে উনিশ শতকে এক নতুন ঝলমলে ও জাঁকজমকপূর্ণ পোশাকে তা আত্মপ্রকাশ করেছে। পোশাকের চোখধাঁধানো চাকচিক্য ও মনকাড়া ফুল নকশার কারণে আপনার মনে হতে পারে, এটা বুঝি আলাদা বুননের নতুন পোশাক, অথচ প্রকৃতপক্ষে, প্রাচীন গ্রীক-রোমান সভ্যতাই হচ্ছে এর 'তানা-বানা'র উৎস। সুতরাং আমাদের জন্য ভালো হবে প্রথমে গ্রীক ও রোমান সভ্যতার পরিচয়, স্বভাব-বৈশিষ্ট্য ও প্রাণ-প্রেরণা সম্পর্কে সম্যক অবগতি অর্জন করা, যাতে আমরা পূর্ণ অন্তর্দৃষ্টির সঙ্গে বিশ শতকের পাশ্চাত্য সভ্যতার বস্তুনিষ্ঠ সমালোচনা করতে পারি এবং সঠিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে পারি।

গ্রীকসভ্যতার বৈশিষ্ট্য

এটা অস্বীকার করার উপায় নেই যে, মানব-ইতিহাসের সুদীর্ঘ পথপরিক্রমায় গ্রীকজাতি হচ্ছে এক স্বর্ণপ্রসবা জাতি। জ্ঞান, শিল্প ও সাহিত্যের যোগ্যতায়; চিন্তা, চেতনা ও বুদ্ধির উর্বরতায় এবং দর্শনে, মননে ও অবদানে তাদের শীর্ষ অবস্থান সর্বস্বীকৃত। বিরল প্রতিভার অধিকারী বহু জ্ঞানী, বিজ্ঞানী ও দার্শনিকের আবির্ভাব ঘটেছে তাদের মধ্যে, যাদের অবদানে বিশ্বের জ্ঞানভাণ্ডার যথেষ্ট সমৃদ্ধ হয়েছে।

আমরা জানি, গ্রীকদর্শন ও সাহিত্য বিশ্ব-ইতিহাসে দীর্ঘকাল যথেষ্ট অগ্রণী ভূমিকা পালন করেছে, কিন্তু সেটা এখানে আমাদের আলোচ্যবিষয় নয়। আমরা এখানে শুধু দেখতে চাইবো, গ্রীকরা যে সভ্যতা জন্মদান করেছে তার স্বভাব ও বৈশিষ্ট্য এবং প্রাণ ও প্রেরণা কী ছিলো?

এখনকার বিচার-পর্যালোচনায় আমরা ঐসব বিষয় এড়িয়ে যাবো, যা গ্রীকসভ্যতার মূল উপাদান নয়, বরং পার্শ্ব-উপাদান, কিংবা যা সকল সভ্যতারই সাধারণ উপাদান। আমরা শুধু ঐসব বিষয়ের উপর আলোকপাত করবো, যা গ্রীকসভ্যতার মূল বৈশিষ্ট্য এবং যা তাকে অন্যান্য সভ্যতা থেকে, বিশেষত প্রাচ্য সভ্যতা থেকে পৃথক করে। বিষয়গুলো এই–

(ক) যা কিছু ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য তাতে বিশ্বাস এবং যা কিছু ইন্দ্রিয়াতীত তাতে অবিশ্বাস ও সংশয়।

(খ) ধার্মিকতা ও আধ্যাত্মিকতায় নিরাসক্তি এবং পার্থিব জীবন ও ভোগবিলাসে অতিআসক্তি।

(গ) উগ্র জাতীয়তাবাদী মানসিকতা।

গ্রীকসভ্যতার এই যে বিভিন্ন মৌলিক উপাদান, এগুলোকে আমরা যদি এক শব্দে প্রকাশ করতে চাই তাহলে 'বস্তুবাদিতা' হলো সবচে' যথার্থ শব্দ এবং এটাই হচ্ছে গ্রীকসভ্যতার মূল পরিচয়।

গ্রীকদের যা কিছু জ্ঞান, শিল্প, সাহিত্য, দর্শন, সংস্কৃতি, এমনকি তাদের ধর্ম, সর্বত্র বস্তুবাদিতার ছাপ ও প্রভাব অতি প্রকট। আল্লাহ তা'আলার ছিফাত ও গুণাবলীকে তারা দেবদেবীর আকার ছাড়া কল্পনা করতে পারেনি। যেমন খাদ্যের দেবতা, দয়া ও করুণার দেবতা, ক্রোধ ও শাস্তির দেবতা। এভাবে তারা বহু দেবদেবীর মূর্তি তৈরী করে বিভিন্ন মন্দিরে সেগুলোর অধিষ্ঠান করেছে। তারা তাদের দেব-দেবীর প্রতি জড়দেহের যাবতীয় স্বভাব ও বৈশিষ্ট্য আরোপ করেছে এবং সেগুলোকে কেন্দ্র করে রূপকথার এক দীর্ঘ জাল বিস্তার করেছে। সৌন্দর্য ও ভালোবাসার মত বস্তুনিরপেক্ষ ভাব ও মর্মকেও তারা স্থূল আকার দান করেছে। তাই তাদের রয়েছে সৌন্দর্যের দেবী ও ভালোবাসার দেবী। এরিস্টেটলীয় দর্শনে এই যে, 'দশবুদ্ধি ও নয় আকাশ'-এর ধারণা, তাও মূলত এই বস্তুবাদিতারই কারিশমা, যার প্রভাব থেকে গ্রীকমানস কখনো মুক্ত হতে পারে না।

ইউরোপের বুদ্ধিজীবী ও চিন্তানায়কগণও গ্রীকসভ্যতায় বস্তুবাদের প্রাধান্যের কথা স্বীকার করে নিয়েছেন এবং বিভিন্ন গ্রন্থ ও গবেষণাপত্রে সেদিকে অঙ্গুলিনির্দেশ করেছেন। কয়েক বছর আগে জার্মান পণ্ডিত ডক্টর হ্যাস জেনেভায় 'ইউরোপীয় সভ্যতার স্বরূপ' শিরোনামে তিনটি ভাষণ প্রদান করেছেন। প্রসঙ্গত, তিনি সেই বুদ্ধিজীবীসমাজের একজন যারা মনে করেন, পাশ্চাত্য সভ্যতা প্রাচ্যের সভ্যতা দ্বারা প্রভাবিত হয়নি, বরং তা সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র ও স্বকীয়তাপূর্ণ একটি সভ্যতা। এখানে আমরা আমাদের প্রাসঙ্গিক বিষয়ে তার বক্তব্যের সারসংক্ষেপ পেশ করছি। তিনি বলেন–

'প্রাচীন গ্রীক সভ্যতাই হলো বর্তমান ইউরোপীয় সভ্যতার মূল উৎস। গ্রীক-সভ্যতার কর্ণধার যারা তাদের মূল লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যই ছিলো মানুষের সকল শক্তির সুসঙ্গত ও সুসমন্বিত বিকাশ। এক্ষেত্রে একটি সুদর্শন ও সুঠাম দেহকেই মনে করা হতো আদর্শ উদাহরণ। বলাবাহুল্য যে, এ চিন্তাধারায় ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বিষয়গুলোই ছিলো মুখ্য। তাই শরীরচর্চা, শারীরিক খেলাধূলা, নৃত্যকলা ইত্যাদির গুরুত্ব ছিলো সবচে' বেশী। পক্ষান্তরে বুদ্ধিবৃত্তিক প্রতিপালন তথা গান, কবিতা, সাহিত্য ও নাটক, এমনকি দর্শন ও বিজ্ঞানচর্চাও একটি নির্ধারিত সীমা থেকে অগ্রসর হতে পারেনি। এদিকে তাদের বেশ সতর্ক দৃষ্টি ছিলো যে, বুদ্ধিবৃত্তিক উৎকর্ষ দ্বারা শারীরিক উন্নতি যেন ক্ষতিগ্রস্ত না হয়। আর আত্মা ও আধ্যাত্মিকতা এবং হৃদয় ও অন্তর্বাদিতা! সত্য এই যে, গ্রীকদের ধর্মব্যবস্থায় এসবের কোন স্থান ছিলো না। তাতে না ছিলো ধর্মবিষয়ক জ্ঞান, না ছিলো কোন ধর্মীয় শ্রেণীর উপস্থিতি। এর পরো বিভিন্ন আচার-অনুষ্ঠানে আধ্যাত্মিকতার যা কিছু ছাপ ও প্রভাব দেখা যায় তা মূলত প্রাচ্য থেকে ধার করা। সেগুলোকে গ্রীক -সভ্যতার অঙ্গ মনে করা ঠিক নয়।'

বহু ইউরোপীয় পণ্ডিত গ্রীক সমাজে ধর্মের প্রভাবহীনতা, ঐশী ভীতির অনুপস্থিতি এবং ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠানে ভাবগাম্ভীর্যের অভাব, সেই সঙ্গে খেলাধূলা ও আনন্দ -বিনোদনের অতিশয়তার কথা উল্লেখ করেছেন। এখানে আমরা বিভিন্ন উদ্ধৃতির পরিবর্তে শুধু history of european morals-এর লেখক লেকী-এর মন্তব্য তুলে ধরছি। তিনি বলেন–

'গ্রীক চেতনা ছিলো নিছক বুদ্ধি ও মস্তিষ্কনির্ভর, পক্ষান্তরে মিসরীয় চেতনা ছিলো সম্পূর্ণ আত্মিক ও আধ্যাত্মিক। তাই রোমান লেখক এ্যাপিউলিয়াস বলেছেন,

'মিসরীয় দেবতারা সন্তুষ্ট হন কাকুতি-মিনতি ও কান্নাকাটিতে, পক্ষান্তরে গ্রীক দেবতারা খুশী নাচ-গান ও নৃত্যগীতে।'[১]

এ্যাপিউলিয়াসের এ মন্তব্যের দ্বিতীয় অংশের সত্যতা, কোন সন্দেহ নেই গ্রীক-ইতিহাসে প্রচুর পাওয়া যায়। বস্তুত কোন জাতির ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠানে আনন্দ-উৎসব ও ক্রীড়া-কৌতুকের এতটা 'বাড়বাড়ন্তি' এবং ঈশ্বরভীতির এতটা ঘাটতি নেই যতটা রয়েছে গ্রীকসমাজে। ঈশ্বরের প্রতি ভয় ও ভক্তি গ্রীকদের ধর্মজীবনে ততটুকুই ছিলো যতটা থাকে সমাজের বড় ও বয়োবৃদ্ধদের প্রতি। প্রচলিত কিছু আচার-আনুষ্ঠানিকতাকেই ঈশ্বরের প্রতি ভক্তি নিবেদনের পক্ষে যথেষ্ট মনে করা হতো।[২]

এতে অবশ্য অবাক হওয়ার কিছু নেই। কারণ গ্রীকদের ঈশ্বরতত্ত্ব ও ধর্মদর্শনই এমন যে, তারপর অন্তরে ঈশ্বরের প্রতি ভয়ভীতি, আনুগত্য ও আত্মনিবেদনের ভাব জাগ্রত হওয়ার কোন অবকাশই থাকে না। ঈশ্বরসত্তা থেকে সকল গুণ ও ক্ষমতা বিযুক্ত করে যখন ঘোষণা করা হবে, সৃষ্টিজগতের পরিচালনায় তাঁর কোন ইচ্ছা ও নিয়ন্ত্রণ নেই এবং নেই নিরন্তর সৃজনক্রিয়া ও আদেশ-নিষেধ, অর্থাৎ ঈশ্বর হলেন অবসরপ্রাপ্ত একটি নিষ্ক্রিয় সত্তা; এখন নিয়ন্ত্রকশক্তি হচ্ছে তথাকথিত 'সতত সক্রিয় বুদ্ধি ও মহাশূন্যীয় নিরন্তর গতি'।

এ-ই যখন হবে কারো বোধ ও বিশ্বাস তখন স্বভাবতই প্রথাসর্বস্বতার বাইরে বাস্তব জীবনে এবং কর্মমুখর অঙ্গনে ঈশ্বরচিন্তার কোন প্রয়োজন এবং ঈশ্বরের প্রতি আত্মনিবেদনের কোন প্রেরণা সে অনুভব করবে না। ভয় ও ভালোবাসা এবং প্রত্যাশা ও প্রার্থনার কথা তার চিন্তায়ও আসবে না। ঈশ্বরের শক্তি ও বড়ত্বের সামনে সে অবনত হবে না; বিপদে, দুর্যোগে, সমস্যা ও সঙ্কটে ঈশ্বর-সমীপে তার কোন কাকুতি-মিনতি থাকবে না এবং অভিভূত হৃদয়ে ঈশ্বর-বন্দনায় সে নিমগ্ন হবে না।

কেন হবে?! তার তো বিশ্বাস, ঈশ্বর হচ্ছেন যাবতীয় গুণ ও শক্তি থেকে বিচ্যুত এবং বিশ্বজগতের পরিচালনা থেকে নির্বাসিত সম্পূর্ণ নিষ্ক্রিয় একটি সত্তা; কোন কিছুতে হস্তক্ষেপের ইচ্ছা ও ক্ষমতা যার নেই; যিনি 'প্রথম বুদ্ধি' সৃষ্টি করার পর

---

[১] w. e. h. lecky, history of european morals, london, 1869, vol,1, pp. 344-45

[২] প্রাগুক্ত

বিশ্বজগতের পরিচালনা ও ব্যবস্থাপনা থেকে পূর্ণ অবসর গ্রহণ করেছেন। এমন বিশ্বাসে যারা 'আক্রান্ত' তাদের জীবন তো ঈশ্বরহীনরূপেই যাপিত হবে এবং হওয়া উচিত। আচরণগত দিক থেকে তাদের জীবন ঈশ্বরের অস্তিত্ব অস্বীকারকারী নাস্তিক থেকে মোটেই ভিন্ন হতে পারে না; শুধু এইটুকু ঐতিহাসিক তথ্যবিবরণ ছাড়া যে, ঈশ্বর 'প্রথম বুদ্ধি' সৃষ্টি করেছেন; তারপর অবসর গ্রহণ করেছেন।

সুতরাং আমরা যখন শুনি, গ্রীকদের জীবনাচরণে ঈশ্বরচিন্তা ও আল্লাহভীতির কোন ছাপ ছিলো না, বরং তাদের উপাসনা ও ধর্মানুষ্ঠান ছিলো যেন প্রাণহীন দেহ, কিংবা কাগজের ছবি; তদ্রূপ যখন শুনি, তাদের ঈশ্বরভক্তি ছিলো নিছক আচার-প্রথায় সীমাবদ্ধ যেমন হয় সমাজের জ্ঞানবৃদ্ধ ও বয়োবৃদ্ধদের প্রতি; যখন এসব শুনি তখন অবাক হওয়ার কিছু থাকে না; বরং এর বিপরীত কিছু শুনলেই আমরা অবাক হতাম। কেননা ইতিহাসের পাতায় মানুষ বহু শিল্পী, কবি, আবিষ্কারক ও বিজয়ী বীরের আলোচনা পড়ে, কিন্তু তাদের সঙ্গে ভয় ও ভীতি, ভক্তি ও প্রীতি এবং উপাসনা ও প্রার্থনার সম্পর্ক গড়ে ওঠে না। এটা তো শুধু তখনই হতে পারে যখন মানুষ এমন এক পরম সত্তা ও পরম শক্তিতে বিশ্বাস করবে, যিনি বিশ্বজগতের স্রষ্টা ও নিয়ন্তা; যিনি সবকিছু দেখেন, শোনেন, জানেন এবং নিজস্ব ইচ্ছা ও শক্তি দ্বারা পরিচালনা করেন; যিনি সর্বশক্তিমান, সর্ববিষয়ে সকলে যার মুখাপেক্ষী; যিনি কারো মুখাপেক্ষী নন; যিনি দয়াময়, করুণাময় ও মহাপ্রজ্ঞার অধিকারী।

গ্রীকদর্শন ও সমাজব্যবস্থায় যেহেতু পার্থিব জীবনই ছিলো মুখ্য এবং ভাস্কর্যপ্রীতি, নৃত্যগীত ও সঙ্গীত তথা ললিতকলার প্রতি আসক্তি ছিলো চরম, সর্বোপরি লেখক, সাহিত্যিক, কবি ও দার্শনিকসমাজ ছিলো বাধাবন্ধনহীন ব্যক্তিস্বাধীনতায় বিশ্বাসী সেহেতু গ্রীকদের জীবন ও চরিত্রে এর নেতিবাচক প্রভাব ছিলো খুবই ভয়ঙ্কর। নীতি ও নৈতিকতায় দেখা দিয়েছিলো সীমাহীন নৈরাজ্য। প্রতিষ্ঠিত সব ব্যবস্থা ও মূল্যবোধের বিরুদ্ধে দেখা দিয়েছিলো মহাবিদ্রোহ। প্রবৃত্তির পিছনে ছুটে চলা, জীবন ও যৌবনকে যথেচ্ছা ভোগ করে যাওয়া এবং ক্ষুধার্ত হায়েনার মত সবকিছুর উপর ঝাঁপিয়ে পড়া– এই ছিলো তখনকার ফ্যাশন এবং মুক্তবুদ্ধি ও আলোকিত চিন্তার প্রতীক।

প্লেটো তাঁর বিখ্যাত 'রিপাবলিক' গ্রন্থে সক্রেটিসের পক্ষ হতে একজন গণতান্ত্রিক যুবকের যে চিত্র এঁকেছেন তাতে মনে হতে পারে, বিশ শতকের কোন বোদ্ধা

সমালোচক যেন আধুনিক পাশ্চাত্য সভ্যতার কোন আলোকিত যুবকের চরিত্র তুলে ধরছেন। সক্রেটিসের গণতান্ত্রিক যুবকের চিত্র এবং আজকের আলোকিত যুবকের চরিত্র যেন একই মুদ্রার এপিঠ-ওপিঠ । সক্রেটিস বলেছেন–

'যদি তাকে বলা হয়, মানুষের সব ইচ্ছা ও চাহিদা সমান গ্রহণযোগ্য নয়। কিছু আনন্দ ও বিনোদন আছে যা উত্তম ও সম্মানযোগ্য, যা সাদরে গ্রহণ করা যায়। আবার কিছু আছে অনুত্তম ও অসঙ্গত, যা পরিহার করা এবং বিধি-নিষেধের আওতায় রাখাই কর্তব্য, তখন এই সুসঙ্গত নীতিকথা সে মানতে চায় না, এমন -কি শুনতেও চায় না; বরং উপহাস করে মাথা দোলায় এবং জোরদার বয়ান দিয়ে বলে, ভালো-মন্দ ও সুন্দর-অসুন্দরের পার্থক্য ছাড়া সব চাহিদাই সমান সমাদরযোগ্য।

এভাবেই সে জীবন কাটায়; মাথাচাড়া দেয়া প্রতিটি চাহিদা চরিতার্থ করে, করতেই থাকে। কখনো মদে চুর হয়ে গানের সুরে ডুবে থাকে, কখনো খেয়ালের বসে উপবাস পালন করে; তখন পানি ছাড়া কিছু মুখে দেয় না। কখনো সামরিক প্রশিক্ষণ গ্রহণে খুব উৎসাহী, কখনো এমন অলস যে, সবকিছু শিকায় তুলে রেখে বসে আছে। কখনো দার্শনিকের আলখেল্লা ধারণ করে, কখনো রাজনীতির মঞ্চে সময়মুখী বক্তৃতা ঝাড়ে। কখনো যুদ্ধবাদী সেজে সেনা-অধিনায়কের স্তুতি গায়, কখনো (শান্তিবাদী সেজে) সফল ব্যবসায়ী হওয়ার বাসনায় বাণিজ্য করে। এককথায় জীবনে তার কোন উদ্দেশ্য ও নিয়ম-শৃঙ্খলা নেই, কিন্তু এটাকেই সে মনে করে সুখী-সুন্দর ও কুসুমাস্তীর্ণ জীবন। এভাবেই সে জীবনের শেষ সীমায় উপনীত হয়।'[১]

পাশ্চাত্য মানসিকতার আরেকটি বড় উপসর্গ হলো উগ্র ও সঙ্কীর্ণ জাতীয়তাবাদ। এশিয়ার তুলনায় ইউরোপে জাতীয়তাবাদী চেতনা অনেক বেশী ব্যাপক ও প্রকট। অবশ্য এর পিছনে ভৌগোলিক প্রকৃতিরও যথেষ্ট ভূমিকা রয়েছে। কেননা এশিয়ায় প্রাকৃতিক অঞ্চল অতি বিস্তৃত। এখানে রয়েছে বৈচিত্র্যপূর্ণ আবহাওয়া এবং বহু ভাষা ও জনগোষ্ঠী। এশিয়ায় যেমন রয়েছে ভূমি-উর্বরতা, তেমনি রয়েছে জীবনোপকরণের প্রাচুর্য। একারণেই প্রকৃতিগতভাবেই এশিয়ার সাম্রাজ্য -গুলো হয়ে থাকে সুবিস্তৃত। এখানেই প্রতিষ্ঠিত হয়েছে ইতিহাসের বিস্তৃততম ও সমৃদ্ধতম বিভিন্ন সাম্রাজ্য। পক্ষান্তরে ইউরোপে বেঁচে থাকার প্রতিযোগিতা খুবই

---

[১] republic, book vII

তীব্র। সেখানে সকল জনগোষ্ঠীকে নিরন্তর জীবনসংগ্রামে ব্যতিব্যস্ত থাকতে হয়। কারণ একদিকে ভূমি ও আয়তন অল্প, অন্যদিকে আবাদি ও জনবসতি খুব ঘন, তদুপরি জীবন ধারণের উপায়-উপকরণ অতি সীমিত। পর্বতশ্রেণী ও নদনদীর প্রাকৃতিক সীমারেখা ইউরোপীয় জনগোষ্ঠীগুলোকে একটি স্থায়ী প্রাকৃতিক বেষ্টনীতে ঘিরে রেখেছে। বিশেষ করে ইউরোপের পশ্চিম-মধ্য অঞ্চল ও দক্ষিণাঞ্চল বিস্তৃত সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠার মোটেই উপযোগী নয়। সুতরাং ভৌগোলিক প্রকৃতির কারণেই ইউরোপে ছোট ছোট রাজ্য গড়ে উঠেছে এবং প্রাচীনকাল থেকেই সেখানকার রাজনৈতিক ধারণা নগররাষ্ট্রকে অতিক্রম করতে পারেনি, যার সীমানা হতো খুব বেশী হলে কয়েক মাইল; তবে সেগুলো ছিলো সম্পূর্ণ স্বাধীন ও স্বশাসিত। নগররাষ্ট্রীয় এই রাজনৈতিক ধারণার আদর্শ উদাহরণ হলো গ্রীকদেশ, যেখানে ইতিহাসের শুরু থেকেই 'বহুদশ' ক্ষুদ্র নগররাষ্ট্রের অস্তিত্ব ছিলো।

এই প্রেক্ষাপটে গ্রীকজাতি যদি জাতীয়তাবাদী ধ্যানধারণার প্রবক্তা হয়ে থাকে তাহলে অবাক হওয়ার কিছুই নেই। সুপ্রসিদ্ধ লেখক লেকী স্বীকার করেছেন, গ্রীসে জাতীয়তাবাদই ছিলো মূল চিন্তাধারা, পক্ষান্তরে সক্রেটিস, ইপাগোরিউস ও অন্যান্য দার্শনিক মাঝেমধ্যে যে আন্তর্জাতিকতার ধ্যানধারণা ব্যক্ত করেছেন, তা কখনো গ্রহণযোগ্যতা পায়নি। এমনকি এরিস্টেটলীয় নীতিব্যবস্থা (system of ethics)ও গ্রীক-অগ্রীক বিভেদ-রেখার উপরই গড়ে উঠেছিলো এবং স্বদেশপ্রেমের মর্যাদা ছিলো ঐসকল নৈতিক গুণাবলীর উপরে, যা গ্রীক দার্শনিকগণ সম্মিলিতভাবে নির্ধারণ করেছিলেন। এমনকি এরিস্টেটল শুধু স্বদেশপ্রেম ও স্বদেশানুগত্যেই সন্তুষ্ট ছিলেন না, তার চিন্তার সঙ্কীর্ণতা ছিলো এত দূর যে, তিনি বলতে পেরেছেন, 'গ্রীকদের উচিত অগ্রীকদের সাথে জীবজন্তুর মত আচরণ করা।'

এই সঙ্কীর্ণ জাতীয়তাবাদ গ্রীকসমাজে বেশ জনপ্রিয় ছিলো এবং তাদের চিন্তা-চেতনার গভীরে প্রবেশ করেছিলো। এমনকি যখন জনৈক দার্শনিক বললেন, 'তিনি তার সহমর্মিতা শুধু স্বদেশে সীমাবদ্ধ রাখতে চান না, বরং তা ব্যাপ্ত হবে সমগ্র গ্রীসে', তখন তার স্বদেশবাসীর জন্য তা বিস্ময় ও অসন্তোষের কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছিলো।[১]

[১] lecky, history of european morals, london, 1869, vol,1, pp. 243

রোমকজাতির অভ্যুদয়

ইতিহাসের অনিবার্য ধারায় রোমকজাতি একসময় গ্রীকদের স্থান দখল করে নেয় এবং শক্তি ও প্রতিপত্তি, সমরকুশলতা ও সৈনিকতা এবং সাম্রাজ্যের বিস্তার ও শাসন-ব্যবস্থায় গ্রীকদের ছাড়িয়ে যায়, তবে জ্ঞান-বিজ্ঞান ও দর্শন; শিল্প-সাহিত্য ও কাব্যপ্রতিভা এবং নাগরিক সভ্যতা ও সুশীলতায় তারা গ্রীকদের সমকক্ষতা অর্জন করতে পারেনি। এসব ক্ষেত্রে তখনকার সমস্ত জাতি, এমনকি রোমকদেরও মোকাবেলায় গ্রীকদের শ্রেষ্ঠত্ব ছিলো স্বীকৃত। এর স্বাভাবিক যে কারণটি আমরা চিহ্নিত করতে পারি তা এই যে, রোমকরা তখনো ছিলো সামরিকতার যুগে। তাই বুদ্ধিবৃত্তিক দিক থেকে গ্রীকদের সামনে তারা ছিলো অবনত এবং তাদেরই উচ্ছিষ্টভোজী। গ্রীকদের জ্ঞান, দর্শন এবং চিন্তা ও বুদ্ধিবৃত্তিরই তারা 'খোশাচর্বন' করেছে দীর্ঘকাল। লেকী বলেন–

'গ্রীকদের ছিলো বিপুল জ্ঞানসম্পদ, যা তারা যুগযুগের সাধনায় সৃষ্টি করেছে এবং তার সমৃদ্ধিসাধন করেছে। অথচ রোম তখনো সামরিকতার স্তরেই পড়ে ছিলো। জাতীয়ভাবে যেমন তাদের কোন জ্ঞানসম্পদ ও সহিত্যকর্ম ছিলো না, তেমনি তাদের ভাষাসম্পদও ভাব, চিন্তা ও উচ্চাঙ্গ অনুভব প্রকাশে সক্ষম ছিলো না। জ্ঞান-দৈন্য ও বুদ্ধিবৃত্তিক পশ্চাদ্‌পদতার কারণে স্বাভাবিকভাবেই গ্রীকদের কাছে তারা মার খেয়েছে এবং রাজনৈতিক ও সামরিক বিজয় অর্জন করেও গ্রীকসভ্যতার কাছে তাদের নতি স্বীকার করতে হয়েছে। জ্ঞান-বিজ্ঞান ও শিল্প-সাহিত্যের সবক্ষেত্রে গ্রীক-প্রতিভার জাদুপ্রভাব তাদের আচ্ছন্ন করে রেখেছিলো। তাই দেখা যায়, গ্রীকভাষাই ছিলো রোমের প্রাচীন ঐতিহাসিকদের লেখার ভাষা। রোমান কবিগণ ল্যাটিন ভাষায় কাব্যচর্চা শুরু করার পূর্বপর্যন্ত গ্রীকই ছিলো জ্ঞান-গবেষণা ও গ্রন্থনার ভাষা।'[১]

রোমকদের এ অনুকরণ ও আনুগত্য শুধু জ্ঞান-গবেষণা এবং ভাষা ও সাহিত্যের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিলো না, বরং ভাব ও স্বভাব, নীতি ও নৈতিকতা, সমাজ ও সামাজিকতা, আবেগ ও প্রবণতা এবং সাধারণ জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রেই গ্রীক-সভ্যতা রোমান সভ্যতার উপর আধিপত্য বিস্তার করেছিলো। ফলে গ্রীকদের অনুকরণ-আনুগত্যকেই তারা আভিজাত্য ও চৌকশতার প্রতীক মনে করতো।

[১]. lecky, history of european morals.

এভাবেই গ্রীকদের দর্শন ও সংস্কৃতি এবং চিন্তা-চেতনা ও মনমানস রোমকদের আচ্ছন্ন করে ফেলেছিলো, বরং সত্য এই যে, তাদের মন-মস্তিষ্ক ও রক্ত-মাংসে তা মিশে গিয়েছিলো। অবশ্য রোমকরা তাদের ইউরোপীয় প্রবণতা ও প্রকৃতির কারণে স্বভাবগত বৈশিষ্ট্যে গ্রীকদের থেকে খুব একটা আলাদা ছিলো না, বরং উভয়ের মধ্যে বিরাট সাদৃশ্য ছিলো। অর্থাৎ ইন্দ্রিয়নির্ভর বিশ্বাস, অতিজীবনবাদিতা, ধর্ম ও ধর্মবিশ্বাসের ক্ষেত্রে দ্বিধা-দ্বন্দ্ব ও সংশয়, ধর্মীয় রীতি-নীতি ও আচার-ব্যবস্থার প্রতি নিস্পৃহা, উগ্র জাতীয়তাবাদ ও স্বদেশপ্রেম এবং অন্যান্য বিষয়ে গ্রীক-রোমক উভয় জাতি ছিলো একই কাতারে। সর্বোপরি শক্তি ও শক্তিমানের প্রতি আনুগত্য ছিলো পূজার সমতুল্য।

ইতিহাস থেকে বোঝা যায়, স্বধর্মে রোমকদের বিশ্বাস তেমন প্রগাঢ় ছিলো না এবং তা হওয়ার উপায়ও ছিলো না। কেননা সেখানে ধর্মের নামে যে অলীকতা ও পৌত্তলিকতার ছড়াছড়ি ছিলো তাতে দ্বিধা-দ্বন্দ্ব ও সংশয়-সন্দেহ সৃষ্ট হওয়া ছিলো অনিবার্য। ফলে জ্ঞান ও বুদ্ধির চর্চায় তারা যতই অগ্রসর হয়েছে এবং চিন্তা-চেতনায় যতই তাদের উৎকর্ষ ঘটেছে, যুক্তিবর্জিত ধর্মবিশ্বাসে ততই তারা শ্রদ্ধাহীন হয়ে পড়েছে। আর এ বিষয়ে তো প্রথম দিন থেকেই তাদের সিদ্ধান্ত ছিলো যে, জীবন-নীতি ও রাজনীতিতে ধর্ম-দেবতার কোন ভূমিকা নেই। সিসিরো বলেন—

'নাট্যমঞ্চে অভিনেতারা যখন আবৃত্তি করতো, 'জাগতিক বিষয়ে দেবতাদের কোন ভূমিকা নেই', শ্রোতারা তাতে উল্লাস প্রকাশ করতো।'[১]

সাধু অগাস্টিন বিস্ময় প্রকাশ করে বলেন—

'প্রতিমাপূজক রোমানরা উপাসনা-মন্দিরে দেবতাদের পূজা করতো, আবার নাট্যমন্দিরে দেবতাদের উপহাস করে রচিত নাটক মহাউৎসাহে উপভোগ করতো।'[২]

রোমানধর্মের আধ্যাত্মিক প্রভাব তার অনুসারীদের উপর এতই শিথিল এবং অন্তরে ধর্মীয় ভাব ও আবেগ এতই শীতল হয়ে পড়েছিলো যে, কখনো কখনো নির্দ্বিধায় দেবতাদের অবমাননা করা হতো। ইতিহাস থেকে জানা যায়, সম্রাট অগাস্টাস-এর নৌবহর যখন ডুবে গেলো তখন ক্রোধে আত্মহারা হয়ে তিনি

[১] المصدر السابق পৃ. ১৭৮
[২] প্রাগুক্ত, পৃ. ১৭৯

সমুদ্রদেবতা নেপচুনের মূর্তি ভেঙ্গে ফেলেন। একইভাবে জিরমিনেক্স-এর মৃত্যুতে মানুষ দেবতাদের বলির বেদিগুলো ভাঙ্গচুর করে।[১]

মোটকথা, রোমান জাতির চরিত্র ও নৈতিকতা এবং শাসন-প্রশাসন ও সমাজ-জীবনে ধর্মের কোন প্রভাব ছিলো না এবং তাদের চিন্তা-চেতনা, আবেগ-উচ্ছ্বাস ও ঝোঁক-প্রবণতার উপর ধর্মের কোন নিয়ন্ত্রণ ছিলো না। আর তা আধ্যাত্মিক শক্তিতে বলীয়ান এমন কোন ধর্মও ছিলো না, যা হৃদয়ের গভীর থেকে উৎসারিত হয়ে আত্মার জগতকে শাসন করবে, বরং তা ছিলো নিছক কিছু রীতি-প্রথা ও আচার-আনুষ্ঠানিকতা। শাসকশ্রেণী ও রাজপুরুষদের স্বার্থের দাবী ছিলো শুধু নামে ও রসমে ধর্মকে টিকিয়ে রাখা, তাই তা টিকে ছিলো। এ সম্পর্কে লেকীর মন্তব্য—

'আত্মকেন্দ্রিকতাই ছিলো রোমান ধর্মের মূল ভিত্তি। ব্যক্তিজীবনে মানুষ সুখে শান্তিতে এবং বিপদ-দুর্যোগ থেকে নিরাপদে থাকুক, এছাড়া এ ধর্মের আর কোন লক্ষ্য ছিলো না। এর জ্বলন্ত প্রমাণ এই যে, রোমে অসংখ্য বীর-প্রতিভার আবির্ভাব ঘটেছে এবং বহু নায়কপুরুষ জন্মলাভ করেছেন, কিন্তু এমন কোন আধ্যাত্মিক সাধক পুরুষের আবির্ভাব ঘটেনি, যিনি তার আত্মদমন ও নির্মোহ জীবন দ্বারা জাগতিক ভোগ-বিলাসে ডুবে থাকা মানুষকে প্রভাবিত করতে পারেন। সমগ্র রোমান ইতিহাসে ত্যাগ ও আত্মত্যাগের যা কিছু উদাহরণ আমরা পাই, তার একটিও ধর্মের ভিত্তিতে নয়, বরং জাতীয়তাবাদের ভিত্তিতে।'[২]

সমসাময়িক জাতিবর্গের মধ্যে, এমনকি পরবর্তী যুগেও রোমানজাতির যে পৃথক বৈশিষ্ট্য ছিলো তা হচ্ছে সাম্রাজ্যবাদী স্বভাব এবং জীবনের প্রতি আগাগোড়া জড়বাদী ও বস্তুবাদী দৃষ্টিভঙ্গি। বস্তুত এই জড়বাদ ও বস্তুবাদই ছিলো রোমান-জাতির ধর্ম এবং তাদের পরিচয়-প্রকৃতি। আজকের ইউরোপ রোমানদের কাছ থেকে এটাই উত্তরাধিকার সূত্রে লাভ করেছে।

জার্মান নও মুসলিম বিদগ্ধ পণ্ডিত মুহম্মদ আসাদ তার সুবিখ্যাত ও সুসমৃদ্ধ গ্রন্থ 'সঙ্ঘাতের মুখে ইসলাম'-এ বিষয়টি খুব সুন্দরভাবে তুলে ধরেছেন—

'রোমানসাম্রাজ্যের উপর যে চিন্তা-চেতনা ও স্বভাবপ্রবণতার নিরঙ্কুশ প্রভাব ছিলো তা হচ্ছে সাম্রাজ্যের অনুকূলে সর্বপ্রকার শক্তি ব্যবহার করা এবং অন্যান্য

[১] history of european morals (the pagan empire) p. 178
[২] ঐ পৃ. ১৭৭

জাতিকে রোমানস্বার্থের সেবাদাসে পরিণত করা। রোমান শাসক ও প্রশাসকগণ অভিজাত সমাজের আরাম-আয়েশ ও সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের জন্য যে কোন ধরনের যুলুম-অত্যাচার ও শোষণ-নিপীড়নে দ্বিধাবোধ করতো না। পক্ষান্তরে রোমান শাসনের যে সুবিচার-খ্যাতি শোনা যায় সেটা ছিলো শুধু রোমকদের জন্য। আর এই নীতি ও চরিত্র প্রতিষ্ঠিত হতে পারে শুধু জীবন ও সভ্যতার নিছক বস্তুবাদি ধ্যান-ধারণার উপর, যদিও তাদের বস্তুবাদিতাকে বুদ্ধিবৃত্তিক রুচি দ্বারা যথেষ্ট পরিমার্জিত করা হয়েছিলো, তবে তা সর্বপ্রকার আত্মিক মূল্যবোধ থেকে ছিলো অনেক দূরে।

ধর্ম ও ধার্মিকতা রোমকরা কখনোই নিষ্ঠা ও আন্তরিকতার সঙ্গে গ্রহণ করেনি। তাদের সনাতন উপাস্য দেবতারা ছিলো গ্রীকদের অলীক কল্প-কথারই উপচ্ছায়ামাত্র। তারা শুধু নিজেদের সামাজিক বন্ধন ও জাতীয় ঐক্য টিকিয়ে রাখার জন্য দেবতাদের প্রতি বিশ্বাসকে ব্যবহার করেছে, কিন্তু বাস্তব জীবনে তাদের কোনপ্রকার হস্তক্ষেপ অনুমোদন করেনি। দেবতাদের শুধু অনুমতি ছিলো যে, জিজ্ঞাসিত হলে তারা 'সেবক' ও গণকদের যবানিতে গায়ব সম্পর্কে কিছু ভবিষ্যদ্বাণী করবে, কিন্তু মানুষের উপর নৈতিক ও চারিত্রিক কোন বিধি-বিধান প্রবর্তন করার অধিকার তাদের ছিলো না।[১]

রোমান প্রজাতন্ত্রে নৈতিক অধঃপতন

গণতান্ত্রিক শাসনের শেষ দিকে রোমে নৈতিক অবক্ষয়, পাশবিক স্বেচ্ছাচার ও অবাধ ভোগ-বিলাসের এমন ঢল নেমেছিলো যে, তার তোড়ে সবকিছু ভেসে গিয়েছিলো এবং গোটা জাতি পাপাচারের কাদাজলে ডুবে গিয়েছিলো। ফলে ঐসব নৈতিক বিধি-বিধান ও চারিত্রিক বন্ধন তছনছ হয়ে গিয়েছিলো যা কখনো রোমানদের স্বভাব-বৈশিষ্ট্য বলে মনে করা হতো। ফলে সমাজ-জীবনের ভিত্তিমূল এমনভাবে কেঁপে উঠেছিলো যে, গোটা ইমারতই যেন ধ্বসে পড়ে। মার্কিন চিন্তাবিদ ডক্টর ড্রেপার তার 'ধর্ম ও বিজ্ঞানের সঙ্ঘাত' গ্রন্থে এর সুন্দর চিত্র এঁকেছেন এভাবে–

'রোমান সাম্রাজ্য যখন সামরিক ও রাজনৈতিক শক্তির চরমে উপনীত হলো এবং সভ্যতার উন্নতি ও অগ্রগতি চূড়ান্ত সীমায় পৌঁছলো তখন রোমান জাতি নৈতিক অবক্ষয় ও ধর্মীয় অধঃপতনের একেবারে শেষ সীমায় পৌঁছে গেলো। আমোদ-প্রমোদ ও ভোগবিলাসে তারা সীমা ছাড়িয়ে গেলো এবং স্বেচ্ছাচারের চূড়ান্ত করে ছাড়লো। তাদের নীতি ও দর্শন যেন ছিলো এই, 'জীবন শুধু ভোগের জন্য, যেখানে মানুষ আয়েশ থেকে ফূর্তিতে এবং ফুর্তি থেকে স্ফূর্তিতে গড়াগড়ি খাবে।' এভাবে জীবনটা ছিলো তাদের কাছে ভোগ-উপভোগের এক অন্তহীন ধারা। সংযম ও উপবাসের ছিটেফোঁটা যা কিছু পালন করা হতো তারও উদ্দেশ্য ছিলো ভোগের চাহিদা আরো চাগিয়ে তোলা এবং সেটাকে আরো দীর্ঘায়ু করা।

তাদের টেবিল সাজানো হতো মণিমুক্তাখচিত স্বর্ণ ও রৌপ্যপাত্র দ্বারা। সুদর্শন পরিচারক ঝলমলে পোশাকে সেবাকার্যে নিয়োজিত থাকতো। রোমের নগ্ন সৌন্দর্যের প্রতীক গায়িকা ও নর্তকীদের দল, শ্লীলতা ও সম্ভ্রম থেকে যারা ছিলো মুক্ত, পুরুষদের মনোরঞ্জনে সদা প্রস্তুত থাকতো। তাদের লাস্যতা ও নৃত্যগীত পুরুষের আমোদ-প্রমোদের জন্য ছিলো যেন ঘৃতাহুতি।

সুবিশাল ক্রীড়াঙ্গনে বিভিন্ন খেলা-ধূলার আকর্ষণীয় অনুষ্ঠান ছিলো রোমকদের চিত্তবিনোদনের আরেকটি মাধ্যম; তবে সবচে' বীভৎস ব্যাপার ছিলো মানুষে মানুষে, পশুতে পশুতে, এমনকি মানুষ ও হিংস্রপশুর মধ্যে লড়াই, যা রক্তাক্ত মৃত্যু পর্যন্ত চলতে থাকতো, আর পাশবিক উল্লাসে সেই বীভৎস দৃশ্য দর্শক উপভোগ করতো।[১]

বিশ্বজয়ের গর্বে গর্বিত এ জাতি বুঝতে পেরেছিলো, যদি তাদের পূজা লাভ করার উপযুক্ত কিছু থেকে থাকে তাহলে সেটা হচ্ছে শক্তি। কারণ শক্তি দ্বারাই একজন মানুষ অনায়াসে সম্পদের পাহাড় গড়ে তুলতে পারে, সাধারণ মানুষকে যা মাথার ঘাম পায়ে ফেলে তিলে তিলে অর্জন করতে হয়। বাহুবলে যুদ্ধজয়ের ফলেই তো বিত্ত-সম্পদের উপর অধিকার অর্জন এবং রাজস্ব নির্ধারণ ও আহরণ সম্ভব হয়। সুতরাং শক্তির চেয়ে বড় উপাস্য আর কী হতে পারে! আর রোম-সাম্রাজ্যের অধিপতি ও সম্রাটই হলেন সেই সর্বজয়ী শক্তির একক প্রতীক। রোমের সভ্যতা ও নাগরিকতায় সেই রাজশক্তির বাহ্যস্ফূরণ অবশ্যই দেখা যেতো, কিন্তু সেটা ছিলো চাকচিক্যের প্রতারণা, যেমন আমরা দেখতে পেয়েছি গ্রীক সভ্যতার পতনযুগে।

[১] islam at the cross roade, p. 38-39

[১] history of the conflict between religion and science, london, 1927, p.312

রোমে খৃস্টধর্মের আত্মপ্রকাশ

ঐ সময় এমন একটা বিরাট বিপ্লবাত্মক ঘটনা ঘটে যার সুদূর প্রসারী প্রভাব সম্পর্কে পূর্ণ গুরুত্বের সঙ্গে পর্যালোচনা করা প্রত্যেক দায়িত্বশীল ঐতিহাসিকের কর্তব্য। সেটা হলো প্রতিমাপূজক রোমের সিংহাসনে খৃস্টধর্মের অধিষ্ঠান। ঘটনাটি এভাবে ঘটেছিলো; কনস্টান্টাইন, যিনি ধারাবাহিক ঘটনার অনিবার্যতায় আগেই খৃস্টধর্ম গ্রহণ করেছিলেন, ৩০৫ খৃস্টাব্দে তিনি রোমের সিংহাসনে সমাসীন হন। ফলে হঠাৎ করেই প্রতিমাপূজার উপর খৃস্টধর্মের বিজয় অর্জিত হয় এবং এমন এক বিশাল সাম্রাজ্য ও অপ্রতিহত রাজশক্তি তার হাতে চলে আসে, যা আগে সে কল্পনাও করতে পারেনি। কনস্টান্টাইন সিংহাসনে আরোহণ করতে সক্ষম হয়েছিলেন বস্তুত খৃস্টধর্মের অনুসারীদের অতুলনীয় ত্যাগ ও আত্ম-ত্যাগের বিনিময়ে এবং রক্তের নদীর উপর তৈরী তাদের লাশের সেতু পার হয়ে। কৃতজ্ঞ সম্রাট তাদের এ অবদানের পূর্ণ প্রতিদান দিয়েছিলেন এবং সাম্রাজ্য-শাসনে তাদের পূর্ণ অংশীদার করে নিয়েছিলেন।

খৃস্টধর্মের আত্মবিপর্যয়

কিন্তু এই সামরিক ও রাজনৈতিক বিজয় ছিলো প্রকৃতপক্ষে খৃস্টধর্মের জন্য চরম আত্মবিপর্যয়ের সূচনা। অস্ত্র-যুদ্ধে জয়লাভ করলেও আন্তধর্ম যুদ্ধে তারা পরাস্ত হয়েছিলো এবং বিরাট সাম্রাজ্যের দখল অর্জন করলেও একটি মহান ধর্ম তাদের হারাতে হয়েছিলো। কেননা রোমের মূর্তিপূজকরা এবং স্বয়ং খৃস্টের অনুসারীরা খৃস্টধর্মকে বিকৃত করে ফেলেছিলো। আর সবচে' ভয়াবহ বিকৃতি ঘটেছিলো স্বয়ং কনস্টান্টাইন দ্য গ্রেট-এর হাতে, যিনি খৃস্টধর্মের রক্ষক ও পতাকাধারকের ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়েছিলেন। ড্রপার লিখেছেন–

'বিজয়ী ও ক্ষমতলাভকারী দলের সঙ্গে যারাই যোগ দিলো তারা বড় বড় পদ ও রাজমর্যাদার অধিকারী হতে লাগলো। ফলে ধর্মের বিষয়ে যাদের বিন্দুমাত্র উৎসাহ ছিলো না এবং খৃস্টধর্মের প্রতি কখনো কোন আন্তরিকতা ছিলো না তারাই খৃস্টধর্মের সেবক সেজে সামনের কাতারে চলে এলো। প্রকাশ্যত খৃস্টান, অথচ অন্তর্গতভাবে মূর্তিপূজক এই সুবিধাবাদীদের দুষ্টপ্রভাবে খৃস্টধর্মে ভয়াবহরূপে শিরক ও মূর্তিপূজার অবাধ অনুপ্রবেশ ঘটতে লাগলো। কনস্টান্টাইন নিজেই ছিলেন তাদের সমর্থক ও পৃষ্ঠপোষক। তাই তিনি এই কপট ও মতলবী ধার্মিকদের প্রতিহত করার কোন ব্যবস্থাই গ্রহণ করেননি। বাস্তবতা ছিলো এই

যে, কনস্টান্টাইনের সারাটা জীবন কেটেছে স্বেচ্ছাচার ও পাপাচারের মধ্যে। যদিও ৩৩৭ খৃস্টাব্দে জীবনের সায়াহ্নকালে কিছুটা ধর্মমুখী হয়েছিলেন এবং গীর্জার রীতি-নীতি ও বিধি-বিধান অল্প-বিস্তর পালন করেছিলেন।

যদিও খৃস্টান সম্প্রদায় তখন কনস্টান্টাইনকে ক্ষমতায় আনার মত শক্তির অধিকারী ছিলো, কিন্তু তারা প্রতিমাপূজার মূলোৎপাটন করতে সক্ষম হয়নি, বরং উভয় ধর্মের দ্বন্দ্ব-সজ্ঘাতের ফল এই হলো যে, বিপরীতমুখী দু'টি বিশ্বাসের মৌলিক উপাদানের মিশ্রণে একটি নতুন ধর্মের উদ্ভব ঘটলো, যেখানে খৃস্টধর্ম ও প্রতিমাপূজার সমান সমান প্রভাব ছিলো।

এক্ষেত্রে ইসলাম ছিলো খৃস্টধর্মের ঠিক বিপরীত, কারণ ইসলাম মূর্তিপূজার মূলোৎপাটন করে ছেড়েছিলো এবং বিভিন্ন জাতির মধ্যে আপন আকীদা-বিশ্বাসকে অবিকৃত ও নির্ভেজালরূপে প্রচার করতে সক্ষম হয়েছিলো।

বস্তুত রোমের এই সম্রাট, যিনি ছিলেন আগাগোড়া বস্তুবাদী ও বাস্তববাদী, যার কাছে ধর্মবিশ্বাসের চেয়ে রাজস্বার্থের মূল্য ছিলো অনেক বেশী, তিনি দ্বন্দ্বরত খৃস্টান ও মূর্তিপূজক উভয় পক্ষের স্বার্থের বিচারে উভয় ধর্মের মধ্যে কোনভাবে সমন্বয়সাধন করাকেই উপযুক্ত ও যুক্তিযুক্ত মনে করেছেন। এমনকি আপন ধর্মের প্রতি অনুগত খৃস্টানরাও তার পরিকল্পনায় আপত্তির কিছু দেখতে পায়নি। সম্ভবত তাদের বিশ্বাস ছিলো, প্রাচীন পৌত্তলিক বিশ্বাসের মিশ্রণ গ্রহণের মাধ্যমে এই নতুন ধর্মটি সমৃদ্ধি ও প্রসার লাভ করবে, তারপর চূড়ান্ত পর্যায়ে খৃস্টধর্ম পৌত্তলিকতার আবিলতা থেকে মুক্ত হয়ে স্বরূপে ফিরে আসতে সক্ষম হবে।[১] যদি তাই হয় তাহলে বলতেই হবে, এটা ছিলো কল্পনাবিলাসীদের কল্পনাবিলাস, বা দিবাস্বপ্ন। এরা সুবিধাবাদী হতে পারে, ধর্মের সেবক কিছুতেই নয়।

চরম বৈরাগ্যবাদের আত্মপ্রকাশ

কিন্তু প্রতিমাপূজা ও পৌত্তলিকতার পরাগায়নের ফলে খৃস্টধর্ম এমনই বিকৃত হয়ে পড়েছিলো এবং তার নিজস্ব সৌন্দর্য ও আত্মশক্তি এমনই বিনষ্ট হয়ে গিয়েছিলো যে, অধঃপতনশীল রোমকজাতির মধ্যে এ ধর্ম কোন পরিবর্তনই আনতে পারেনি এবং তাদের মুমূর্ষু জাতিসত্তায় নবপ্রাণের সঞ্চার ঘটাতে পারেনি,

---

[১] history of the conflict between religion and science, london, 1927, p.40-41

যাতে জীবনের অঙ্গনে তারা ধার্মিকতা ও পবিত্রতার কিছুটা ছায়া ও ছোঁয়া লাভ করতে পারে এবং জাতির ইতিহাসে একটি সমুদ্ভাসিত অধ্যায়ের উন্মোধন হতে পারে।

তা তো হলোই না, বরং এ ধর্মের জঠরে অভাবিতপূর্ব এমন এক চরম বৈরাগ্যবাদের জন্ম হলো, মানবতা ও সভ্যতার জন্য যা মূর্তিপূজারী রোমকদের পাশবিকতার চেয়ে নিকৃষ্ট ছিলো। খৃস্টজগতে এ বৈরাগ্যবাদ এমনই এক সর্বগ্রাসী উন্মাদনার রূপ নিয়েছিলো যা কল্পনা করাও এযুগে সম্ভব নয়। এখানে আমরা 'ইউরোপের নৈতিকতার ইতিহাস' থেকে কয়েকটি উদাহরণ তুলে ধরছি, যাতে অবস্থার নাযুকতা কিছুটা বোঝা যায়। বলাবাহুল্য, এ উদাহরণগুলো হচ্ছে 'অনেক বেশী থেকে অতি অল্প'।

'সাধু-সন্ন্যাসীদের সংখ্যা অতিমাত্রায় বেড়ে গেলো এবং সমাজে তাদের প্রভাব ও প্রতাপ সকল সীমা ছাড়িয়ে গেলো। ইতিহাসের পরস্পরবিরোধী বর্ণনা থেকে তাদের সঠিক সংখ্যা নির্ধারণ করা এখন যদিও সম্ভব নয়, তবু নীচের বিবরণ থেকে কিছুটা আন্দায করা যায় যে, সন্ন্যাস-আন্দোলন ও তার বিস্তার সমকালীন সমাজে কী ভয়াবহ রূপ ধারণ করেছিলো। ইতিহাস থেকে জানা যায়, সেন্ট জারমের আমলে স্টার-উৎসবে প্রায় পঞ্চাশ হাজার সাধু-সন্ন্যাসীর সমাবেশ ঘটতো। খৃস্টীয় চতুর্থ শতকে নেতৃস্থানীয় একজন সাধুর অধীনে পাঁচ হাজার সাধু-সন্ন্যাসী ছিলো, আর সাধু সেরাপীনের অধীনে ছিলো দশ হাজার। পক্ষান্তরে চতুর্থ শতকের শেষ দিকে সাধু-সন্ন্যাসীদের সংখ্যা মিশরের মোট জনসংখ্যাকেও প্রায় ছাড়িয়ে গিয়েছিলো।

দীর্ঘ দুই শতাব্দী পর্যন্ত সন্ন্যাসব্রতের নামে আত্মপীড়ন ও দেহ-নির্যাতনই ছিলো ধর্ম ও নৈতিকতার সর্বোত্তম আদর্শ। ইতিহাসে এ বিষয়ে বহু অবিশ্বাস্য ঘটনার উল্লেখ পাওয়া যায়। আলেকজান্দ্রিয়ার সাধু ম্যাকারিউস নাকি দীর্ঘ ছয়মাস নোংরা জলাভূমিতে বাস করেছেন, যাতে বিষাক্ত মাছি ও কীটপতঙ্গ তার নগ্নদেহ দংশন করতে পারে। অধিকন্তু সারাক্ষণ তিনি এক মন ভারী লৌহদণ্ড বহন করে বেড়াতেন। তার শিষ্য সাধু ইউসিবিউসের লৌহদণ্ডের ওজন ছিলো দুই মন। কথিত আছে, তিনি একাধারে তিন বছর একটি পরিত্যক্ত কূপে বাস করেছেন। বিখ্যাত সাধু যোহন সম্পর্কে বলা হয়, তিনবছর তিনি এক পায়ে দাঁড়িয়ে উপাসনা করেছেন। এ দীর্ঘ সময় না তার ঘুম ছিলো, না বসে একটু বিশ্রাম। চরম ক্লান্তির সময় পাথরের গায়ে শুধু হেলান দিতেন। এটাই ছিলো তার আরাম

ও বিশ্রাম। বিশ্বাস হয়! কিন্তু ইতিহাসের তথ্যমতে এমনই হয়েছে এবং তা ধর্মতপস্যার নামে!

কারো আবার পছন্দ ছিলো বিবস্ত্রতা। তারা লজ্জা ঢাকতো মাথার লম্বা চুল দিয়ে, আর চলাফেরা করতো চতুষ্পদ জন্তুর মত হাতে পায়ে ভর দিয়ে।

সাধু-সন্ন্যাসীরা সাধারণত শহরে ও জনপদে থাকতেন না, বন-জঙ্গলে, গুহা-গহ্বরে হিংস্র জীবজন্তুর সঙ্গে বাস করতেন। পরিত্যক্ত কুয়া ও কবরস্তানও ছিলো অনেকের 'বাসস্থান'। ঘাস-পাতা ও বৃক্ষের ছাল-বাকলই ছিলো তাদের জীবন ধারণের অবলম্বন।

তাদের মতে শারীরিক পরিচ্ছন্নতা আত্মার পবিত্রতার জন্য ক্ষতিকর। তাই গোসল বা অঙ্গ ধোয়া ছিলো বড় পাপ। ধার্মিকতা ও বৈরাগ্যের যিনি যত ঊর্ধ্বস্তরে উপনীত হতেন তিনি তত বেশী ময়লা-আবর্জনায় মেখে থাকতেন। সাধু এ্যাথিনিউস গর্ব করে বলেন, সাধু এ্যান্থিনিউ সারা জীবনে একবারও পা ধোয়ার পাপ করেননি, আর সাধু আব্রাহাম দীর্ঘ পঞ্চাশ বছর কখনো পায়ে ও হাতে মুখে পানির ছোঁয়া নেননি। সাধু আলেকজান্ডার দুঃখ করে বলেন, একটা সময় ছিলো, যখন মুখ ধোয়াও পাপ ছিলো, আর এখন আমরা গোসল করি হাম্মামে! কোথায় আমাদের ধার্মিকতা ও সন্ন্যাসব্রত!

আরেকটা ভয়াবহ পরিস্থিতি ছিলো এই যে, সাধু-সন্ন্যাসীরা জনপদে ছদ্মবেশে ঘুরে বেড়াতো এবং শিশুদের অপহরণ করে সুরক্ষিত মঠে বা মরুভূমিতে নিয়ে যেতো। কখনো বা প্রকাশ্যে মায়ের কোল থেকে সন্তান ছিনিয়ে নেয়া হতো এবং বৈরাগ্যবাদ ও সন্ন্যাসব্রতের তালিম দেয়া হতো। মা-বাবা, এমনকি নগর-প্রশাসনেরও কিছু করার ক্ষমতা ছিলো না। সমাজপতিরাও তাদের সমর্থন যোগাতো। আর যেসব সন্তান মা-বাবাকে ত্যাগ করে বৈরাগ্য ও সাধুব্রত গ্রহণ করতো সাধারণ মানুষ সাধুবাদ জানিয়ে তাদের নামে শ্লোগান দিতো। খৃস্ট-সম্প্রদায়ের ইতিহাসে বহু সাধু-সন্ন্যাসী 'অপহরণ-খ্যাতি' অর্জন করেছিলেন। কথিত আছে, মায়েরা সাধু এ্যামব্রোজকে দেখামাত্র ছেলে নিয়ে দৌড় দিতো এবং ঘরে গিয়ে দুয়ারে খিল দিতো। সন্তানের উপর পিতা ও পরিবারপ্রধানের যে অধিকার, তা সাধু-পাদ্রীদের হাতে চলে গিয়েছিলো। কোন সাধু-পাদ্রী কোন পরিবারের সন্তান দাবী করে বসলে তার পছন্দকে প্রত্যাখ্যান করার ক্ষমতা কারো ছিলো না।[১]

---

[১] history of european morals, chapter 1v

চরিত্র ও নৈতিকতার উপর বৈরাগ্যবাদের প্রভাব এই পড়েছিলো যে, বীরত্ব ও পৌরুষের যাবতীয় গুণ-বৈশিষ্ট্য দোষণীয় ও নিন্দনীয় বলে গণ্য হতে লাগলো। সাধু-সন্ন্যাসীদের চরিত্রে নির্দোষ আনন্দ-বিনোদন, মহত্ত্ব ও উদারতা এবং আভিজাত্য ও সাহসিকতার নামগন্ধও ছিলো না। সজীবতা ও প্রাণচাঞ্চল্যের পরিবর্তে ছিলো নির্জীবতা ও স্থবিরতা এবং সহানুভূতি ও সহমর্মিতার পরিবর্তে ছিলো নির্দয়তা ও নির্লিপ্ততা। ফলে পারিবারিক ভিত্তি নড়বড়ে হয়ে পড়েছিলো। পরিবার-পরিজনের প্রতি নির্দয়তা ও নিষ্ঠুরতা ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে পড়েছিলো। সাধু-সন্ন্যাসীরা, ধর্মচিন্তায় যাদের হৃদয় হতো কোমল এবং চোখ হতো অশ্রুসিক্ত, পিতা-মাতা ও সন্তানের প্রতি তাদেরই হৃদয় হতো দয়াশূন্য এবং চোখ হতো অশ্রুশূন্য।

পরিবারে বড়দের প্রতি সম্মান-সম্ভ্রম সম্পূর্ণ বিলীন হয়ে গিয়েছিলো। পারিবারিক দায়দায়িত্ব মানুষ একেবারে ভুলে গিয়েছিলো। মা-বাবা ও স্ত্রী-সন্তানের প্রতি উপেক্ষা ও নির্দয়তার ঘটনা তখন এত বেশী ঘটেছে যে, তা অনুমান করাও এখন সম্ভব নয়। পরকালের চিন্তায় যাদের চোখ থেকে অশ্রু ঝরতো তারা নির্দ্বিধায় মা-বাবা ও স্ত্রী-সন্তানদের মনে কষ্ট দিতো। একবারও ভেবে দেখতো না যে, তাদের অনুপস্থিতিতে পরিবারের কী দুর্দশা হতে পারে! পরকালের মুক্তির আশায় তারা তো আত্ম-পীড়নের নিষ্ঠুর সাধনায় মগ্ন হতো, এদিকে তাদের পোষ্যপরিজন প্রাণধারণের জন্য দুয়ারে দুয়ারে দয়া ভিক্ষা করতো। তাদের একমাত্র চিন্তা ছিলো, নিজেদের পরকালের মুক্তি। এ বিষয়ে কোন ভ্রূক্ষেপ ছিলো না যে, ফেলে আসা পরিবারে মা-বাবা ও স্ত্রী-সন্তান বাঁচবে কী মরবে! এ প্রসঙ্গে লেকী এমন কিছু ঘটনা লিখেছেন যা পড়তে গিয়ে কান্না সম্বরণ করা সত্যি কঠিন। নারীদের ছায়া থেকেও তারা দূরে থাকতো। তাদের ধারণা ছিলো, কোনভাবে কোন নারীর ছায়াও যদি তাদের উপর পড়ে যায়, তাহলে এত দিনের আত্মপীড়নের নিষ্ঠুর সাধনা মাটি হয়ে যাবে। এমনকি কন্যা-জায়া ও জননীর সঙ্গে কথা বলাও ছিলো আত্মিক কলুষতার কারণ। এ প্রসঙ্গেও লেকী এমন অকল্পনীয় সব ঘটনা লিখেছেন যা পড়ে কখনো হাসি আসে, কখনো আসে কান্না।[১]

[১] lecky, history of european morals, part 11 chapter 1v. form constantin to charlemagne

বিরুদ্ধেও বড় বড় নৈতিক অপরাধের অভিযোগ উঠতে শুরু করেছিলো। সাধু জ্যারুম বলেন–

'গীর্জার পাদ্রীদের ভোগবিলাস ও প্রবৃত্তিপরায়ণতার তুলনায় অভিজাত, বিত্তশালী ও রাজপুরুষদের স্বেচ্ছাচার ও ভোগবাদিতাও ছিলো নস্যি। স্বয়ং ধর্মপ্রধান পোপ মারাত্মক নৈতিক স্খলনের শিকার হয়ে পড়েছিলেন। অর্থলোভ ও সম্পদলিপ্সা এমনভাবে পেয়ে বসেছিলো যে, ধর্মীয় পদ ও পদমর্যাদাকে তারা সাধারণ পণ্যের মত নিলামে তুলেছিলেন। স্বর্গের টিকেট ও ক্ষমার সার্টিফিকেট বিক্রি করে দেদার পয়সা কামানো হতো। আইনভঙ্গ করার অনুমোদনপত্র এবং হালাল-হারামের সনদ জারি করা হতো যেমন কাগুজে মুদ্রা বা ডাকটিকেট জারি করা হয়। ঘুষ ও সুদের কারবার ছিলো যাকে বলে 'ওপেন সিক্রেট'। অপচয় ও অপব্যয় ছিলো এমন যে, পোপ সপ্তম ইনোসেন্ট তার পোপীয় মুকুট পর্যন্ত বন্ধক রাখতে বাধ্য হয়েছিলেন। আর পোপ দশম লিউ সম্পর্কে কথিত আছে, তিনি পূর্ববর্তী পোপের রেখে যাওয়া সমস্ত সম্পদ এবং নিজের অংশের সম্পদ শেষ করে ফেলেছিলেন। এখানেই শেষ নয়, বরং ভাবি পোপের আয়ও আগাম উশুল করে তাও উড়িয়েছিলেন। এভাবে তিন পোপের সম্পদ লেগেছিলো তার একার ভোগে। একটি পরিসংখ্যানমতে, সমগ্র ফ্রান্সের আমদানিও পোপ সাহেবের ভোগ-চাহিদা চরিতার্থ করার জন্য যথেষ্ট হতো না।'[১]

মোটকথা, গীর্জার ইতিহাস এবং গীর্জাপতিদের জীবনাচার ছিলো কোরআনের নিম্নোক্ত আয়াতের বাস্তব ব্যাখ্যা–

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓا۟ إِنَّ كَثِيرًا مِّنَ ٱلْأَحْبَارِ وَٱلرُّهْبَانِ لَيَأْكُلُونَ أَمْوَٰلَ ٱلنَّاسِ
بِٱلْبَٰطِلِ وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ ۗ وَٱلَّذِينَ يَكْنِزُونَ ٱلذَّهَبَ وَٱلْفِضَّةَ وَلَا
يُنفِقُونَهَا فِى سَبِيلِ ٱللَّهِ فَبَشِّرْهُم بِعَذَابٍ أَلِيمٍ ﴿٣٤﴾

'হে ঈমানদারগণ, ইহুদী ও ঈসায়ীদের বহু ধর্মনেতা ও সাধু অন্যায়ভাবে লোকের সম্পদ আত্মসাৎ করে, আর আল্লাহর পথ থেকে মানুষকে ফিরিয়ে

[১] history of the conflict between religion and science, p. 230

রাখে। আর যারা সোনা-রূপা সঞ্চয় করে, আল্লাহর রাস্তায় খরচ করে না, তাদেরকে যন্ত্রণাদায়ক আযাবের খোশখবর দাও।' (তাওবা, ৯ : ৩৪)

গীর্জা ও রাষ্ট্রের দ্বন্দ্ব

একাদশ শতাব্দীতে গীর্জা ও রাষ্ট্রের দ্বন্দ্ব শুরু হয় এবং ধীরে ধীরে তা ভয়াবহ রূপ ধারণ করে। প্রথম দিকে অবশ্য গীর্জারই জয়জয়কার ছিলো। পোপের তাপ ও প্রতাপ তখন এমনই একচ্ছত্র ছিলো যে, ১০৭৭ খৃস্টাব্দে পোপ হিল্ডার ব্রান্ড সম্রাট চতুর্থ হেনরীর উদ্দেশ্যে তলব জারি করেন, যেন তিনি ক্যানোসা দুর্গে তার বরাবরে হাজিরা দেন। উপায়ান্তরহীন সম্রাটও তলব কবুল করে অবনত মস্তকে ও নগ্নপদে পোপের দরবারে হাজির হন, আর তিনি সম্রাটকে দর্শন দিতে অস্বীকার করেন। পরে বিশিষ্টজনদের সুপারিশে দেখা দেন। 'অনুতপ্ত' সম্রাট পোপের হাতে তওবা করেন, আর তিনি কৃপাবশত সম্রাটের অপরাধ ক্ষমা করেন।

সময়ের সঙ্গে এ দ্বন্দ্ব-সঙ্ঘাতের তীব্রতা বাড়তেই থাকে। তবে জয়-পরাজয়ের পাল্লা ছিলো দু'দিকেই। কখনো গীর্জার দিকে, কখনো রাষ্ট্রের দিকে। বিজয়ের হাসি কখনো হাসতেন পোপ, কখনো সম্রাট। শেষ পর্যন্ত গীর্জার প্রভাব ও প্রতাপ দুর্বল হয়ে আসে এবং ধর্ম ও গীর্জার বিরুদ্ধে রাষ্ট্র ও সম্রাট চূড়ান্ত বিজয় অর্জন করেন। দ্বন্দ্ব-সঙ্ঘাতের এ দীর্ঘ সময় জনসাধারণ যুগপৎ ধর্ম ও রাজনীতির নিপীড়ন এবং গীর্জা ও রাষ্ট্রের দ্বৈত দাসত্বের শিকার ছিলো।

ধর্মীয় ক্ষমতার অপব্যবহার ও ইউরোপীয় সভ্যতার দুর্ভাগ্য

গীর্জার অধিপতি হিসাবে পোপ মধ্যযুগে এমন সীমাহীন ক্ষমতা ও প্রতিপত্তির অধিকারী ছিলেন যা স্বয়ং রোমসম্রাটেরও ছিলো না। এ কারণে তাদের পক্ষে সহজেই সম্ভব ছিলো ধর্মের ছায়াতলে ইউরোপকে জ্ঞান ও সভ্যতার পথে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া। তারা যদি ক্ষমতার সদ্ব্যবহার করতেন তাহলে ইউরোপ জাগতিক ও আধ্যাত্মিক ক্ষেত্রে অবশ্যই বিরাট উন্নতি ও অগ্রগতি অর্জন করতে পারতো।

ড্রেপার লিখেছেন−

'রোমের পোপগণ বিষয়াসক্তি ও প্রবৃত্তিপরায়ণতার শিকার না হলে তাদের এতটা শক্তি-সামর্থ্য ছিলো যে, তাদের এক ইশারায় ইউরোপ একযোগে এমন উন্নতি ও অগ্রগতি লাভ করতো যা দেখে পৃথিবী অবাক হয়ে যেতো। তাদের প্রতিনিধিগণ

অবাধে ইউরোপের সব দেশে যাতায়াত করতে পারতেন এবং যেখানেই যেতেন সাদর সম্বর্ধনা লাভ করতেন। একদিকে আয়ারল্যান্ড থেকে বোহিমিয়া পর্যন্ত, অন্যদিকে ইটালি থেকে স্কটল্যান্ড পর্যন্ত যে কোন অঞ্চলের যে কোন সম্প্রদায়ের সঙ্গে তারা স্বতঃস্ফূর্তভাবে মতবিনিময় করতে পারতেন এবং আন্তর্জাতিকভাবে গুরুত্বপূর্ণ বিভিন্ন রাজনৈতিক বিষয়ে হস্তক্ষেপ করতে পারতেন। কারণ তাদের ভাববিনিময়ের ভাষা ছিলো অভিন্ন। প্রত্যেক দেশেই তারা এমন বিচক্ষণ ও চৌকশ মিত্র ও সহযোগী পেয়েছিলেন যারা একই ভাষায় কথা বলতো এবং রাষ্ট্রিয় বিষয়ে যে কোন সহযোগিতা প্রদানে প্রস্তুত ছিলো।'

কিন্তু খৃস্টধর্মের দুর্ভাগ্য এবং যে সব জনগোষ্ঠী এ ধর্ম গ্রহণ করেছিলো তাদেরও দুর্ভাগ্য যে, গীর্জার অধিপতি ও ধর্মনেতাগণ তাদের বিপুল ক্ষমতার অন্যায় ব্যবহার করেছেন। জাতীয় স্বার্থ ও জাতীয় চেতনার অনুকূলে ব্যবহার না করে ব্যক্তিস্বার্থে কাজে লাগিয়েছেন। ফলে ইউরোপ যেমন ছিলো তেমনি মূর্খতা ও কুসংস্কার এবং পাপাচার, অনাচার ও প্রবৃত্তিপূজার আবর্তেই ডুবে থাকলো এবং উন্নতি ও অগ্রগতির পরিবর্তে নগর-সভ্যতা ধীরে ধীরে অধঃপতনেরই শিকার হতে থাকলো।

দীর্ঘ একহাজার বছরেও মহাদেশ ইউরোপ এবং পাঁচশ বছরেও ইংল্যান্ডের জনবসতি দ্বিগুণ হতে পারেনি। কোন সন্দেহ নেই যে, এর পিছনে সবচে' বড় ভূমিকা ছিলো পাদ্রী ও সাধু-সন্ন্যাসীদের অদূরদর্শিতা ও স্বার্থবাদিতা। কারণ তাদের অব্যাহতভাবে অবিবাহিত জীবনের মাহাত্ম্য প্রচার করার কারণে সমাজে ব্যাপকভাবে বিবাহবিমুখতা সৃষ্টি হয়েছিলো। তদুপরি গীর্জা এ বিষয়ে খুবই তৎপর ছিলো যে, কোন অবস্থাতেই মানুষ যেন চিকিৎসকের চিকিৎসা নিতে উৎসাহ বোধ না করে। কারণ ঝাড়ফুঁকের মাধ্যমে গীর্জার যে রোযগার হতো তাতে ভাটা পড়তে পারে এবং আধুনিক চিকিৎসা-ব্যবস্থা ও চিকিৎসকসমাজ গীর্জার আর্থিক স্বার্থের প্রতিপক্ষ হয়ে দাঁড়াতে পারে। এক্ষেত্রেও তারা ধর্মকে ব্যবহার করেছিলো। ফল এই হলো যে, ইউরোপজুড়ে ব্যাপক রোগ-ব্যাধি ও ভয়াবহ মহামারি দেখা দিতো এবং মানুষ বিনা চিকিৎসায় বা অপচিকিৎসায় মারা যেতো। বরং বলা যায়, কখনো কখনো মৃত্যুর ধুম লেগে যেতো। এনিয়াস সিলভিয়াস চৌদ্দশ ত্রিশ খৃস্টাব্দে তার বৃটেন সফরের যে বিবরণ লিখেছেন তা থেকে সেখানকার নাগরিক অবক্ষয় এবং ক্ষুধা ও দারিদ্র্যপীড়িত জীবন সম্পর্কে কিছুটা অনুমান করা যায়।

ধর্মগ্রন্থের বিকৃতি ও পরিণাম

এ সময় গীর্জার কর্ণধাররা চরম মূর্খতার পরিচয় দিয়ে এমন এক ভয়ঙ্কর অপরাধ করলেন, যার কারণে তারা যে ধর্মের প্রতিনিধিত্ব করছিলেন তার ভিত্তিমূলে যেমন আঘাত লাগলো, তেমনি তাদের নিজেদের অস্তিত্বও বিপন্ন হয়ে পড়লো। আর তা হলো ধর্মগ্রন্থে হস্তক্ষেপের মহাঅপরাধ। হাঁ, উপস্থিত প্রয়োজন ও সাময়িক স্বার্থের তাড়নায় তারা পবিত্র ধর্মগ্রন্থে হস্তক্ষেপ শুরু করলেন এবং তাতে বিভিন্ন ঐতিহাসিক, ভৌগোলিক ও প্রাকৃতিক তথ্য ও তত্ত্বের অনুপ্রবেশ ঘটালেন যা ঐ সময়ের জ্ঞান-গবেষণার বিচারে স্বীকৃত ছিলো। কারণ মানুষের জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা তখন ঐ সীমা পর্যন্তই পৌঁছেছিলো এবং সেটাকেই চূড়ান্ত সত্য বলে ধরে নিয়েছিলো। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে সেটা মানবজ্ঞানের শেষ সীমা ছিলো না। কারণ মানুষের জ্ঞান ও অভিজ্ঞতার মূল কথাই হচ্ছে পরিবর্তনশীলতা ও ক্রমোন্নতি। মানুষের জ্ঞান হচ্ছে সদা উদ্যমী ও আগুয়ান এক অভিযাত্রী, যে কখনো কোন স্থানে হয়ত থামে, কিন্তু কখনো থেমে থাকে না। সুতরাং মানবজ্ঞানের অস্থিতিশীল ভিত্তির উপর কখনো স্থায়ী কোন ইমারত তৈয়ার করা যায় না। এমন কিছু করলে ভিত্তির তল থেকে বালু সরে যায় এবং পুরো ইমারত ধ্বসে পড়ে।

গীর্জার কর্ণধারেরা নির্বোধের মত সেই মারাত্মক ভুলটিই করেছিলেন। তারা যা করেছেন হয়ত খোশনিয়তেই করেছেন এবং ভেবেছেন, এভাবে আসমানী কিতাব ও ধর্মগ্রন্থের মাহাত্ম্য ও অলৌকিকত্ব আরো সুপ্রতিষ্ঠিত হবে এবং তার জনপ্রিয়তা আরো সমৃদ্ধ হবে। কিন্তু পরবর্তীকালে দেখা গেলো, এ নির্বুদ্ধিতাই তাদের জন্য মহাবিপর্যয় ডেকে এনেছে এবং এটাই ছিলো ঈমান ও বিজ্ঞান এবং ধর্ম ও যুক্তির সঙ্ঘাতের মূল কারণ, যেখানে ধর্ম, (যাতে ছিলো মানবজ্ঞানের মিশ্রণ) বারবার পরাস্ত হয়েছে এবং শেষ পর্যন্ত চূড়ান্তরূপে পরাভূত হয়েছে, যার পর ইউরোপের মাটিতে গীর্জা ও ধর্ম আর কখনো মাথা তুলে এবং কোমর সোজা করে দাঁড়াতে পারেনি। তার চেয়ে মর্মান্তিক বিষয় এই যে, অপরাধ করলো গীর্জা, কিংবা খুব বেশী হলে খৃস্টধর্ম, কিন্তু এর প্রতিক্রিয়ায় ইউরোপ ধর্ম নামে যা কিছু আছে সবকিছুরই প্রতি বীতশ্রদ্ধ হয়ে পড়লো এবং এভাবে একটি ধর্মহীন ও ধর্মবিদ্বেষী ইউরোপ আত্মপ্রকাশ করলো।

ধর্মনেতারা আসমানি কিতাবে শুধু হস্তক্ষেপ করেই ক্ষান্ত হলো না, বরং যে সব ঐতিহাসিক, ভৌগোলিক ও প্রাকৃতিক তথ্য ও তত্ত্ব লোকমুখে প্রচার লাভ করেছে

ভোগবাদের বিরুদ্ধে বৈরাগ্যবাদের ব্যর্থতা

কেউ যেন মনে না করে, নিষ্ঠুর আত্মপীড়নের এ চরম বৈরাগ্যবাদ ও সন্ন্যাস-আন্দোলন রোমকদের লাগামহীন ভোগবাদ ও বস্তুবাদিতা কিছুমাত্র নিয়ন্ত্রণ করতে পেরেছিলো এবং তাদের সর্বগ্রাসী পাশবিকতা ও জৈবিকতার মুখে সামান্য বাঁধ দিতে পেরেছিলো। না, মোটেও তা পারেনি এবং পারা যায় না। কারণ তা মানবস্বভাবের সম্পূর্ণ পরিপন্থী এবং ধর্ম ও সমাজ-সভ্যতার সুদীর্ঘ ইতিহাসও তা প্রত্যাখ্যান করে। বস্তুত যে জিনিসটি সর্বগ্রাসী ভোগবাদ ও বস্তুবাদ এবং পাশবিকতা ও জৈবিকতাকে নিয়ন্ত্রণে এনে মানবজাতিকে একটি ভারসাম্যপূর্ণ জীবন উপহার দিতে পারে তা হলো এমন এক নৈতিক, আধ্যাত্মিক ও ধর্মীয় ব্যবস্থা যা সুস্থ মানবস্বভাবের সঙ্গে পূর্ণ সঙ্গতিপূর্ণ; যা মানুষের স্বভাব ও ফিতরতকে আমূল পরিবর্তনের চেষ্টা করে না, বরং সঠিক খাতে প্রবাহিত করার চেষ্টা করে; (ইসলামের আধ্যাত্মিক পরিভাষায়) যা 'ইযালা' করে না, 'ইমালা' করে, অর্থাৎ মিটিয়ে ফেলে না, ঘুরিয়ে দেয় (অকল্যাণ থেকে কল্যাণের অভিমুখে)। ইসলাম এটাই করেছে এবং এটাই ছিলো ইসলামের নবী হযরত মুহম্মদ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের তারীকা ও সুন্নাহ।

আরবরা ছিলো স্বভাবসাহসী ও যুদ্ধপ্রিয় জাতি। তো তিনি তাদের এই স্বভাব-সাহস ও শৌর্যবীর্যকে মিটিয়ে ফেলেননি, বরং সর্বনাশা গোত্রীয় সঙ্ঘাত ও প্রতিশোধ-প্রতিহিংসা থেকে জাযবায়ে জিহাদের দিকে ঘুরিয়ে দিয়েছেন। তাদের অন্তরে তিনি আল্লাহর দ্বীনকে বুলন্দ করার, আল্লাহর পথে জিহাদ করার এবং বিজয়ের গৌরব, কিংবা শাহাদাতের মর্যাদা লাভ করার দুর্দমনীয় আকাঙ্ক্ষা জাগ্রত করে দিয়েছেন।

তদ্রূপ বদান্যতা ও মহানুভবতা ছিলো আরবদের স্বভাব, কিন্তু তা ব্যয় হতো গর্ব ও গৌরব এবং যশ ও খ্যাতি অর্জনের পিছনে। তিনি তাদের এই স্বভাববদান্যতা ও মহানুভবতাকে শুধু আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য আল্লাহর পথে ব্যয় করার আকুতিতে রূপান্তরিত করেছেন।

মোটকথা জাহেলিয়াতের যুগে তাদের যা কিছু নৈতিক ও চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য ছিলো, ইসলামের স্বচ্ছ সুন্দর জীবনব্যবস্থার পরিমণ্ডলে তিনি তার পূর্ণ সদ্ব্যবহার করেছেন এবং সেগুলোকে উপকারী ও কল্যাণকর বানিয়েছেন। জাহিলিয়াতের পরিবর্তে তাদের তিনি ইসলামের পূর্ণাঙ্গ একটি নেযাম ও ব্যবস্থা দান করেছেন এবং স্বভাব ও চরিত্রের অভিপ্রকাশের প্রতিটি ক্ষেত্রে বিকল্প এবং সর্বোত্তম বিকল্প

দান করেছেন। তাদের সামনে তিনি বড় বড় দায়দায়িত্ব ও কর্মযজ্ঞ যেমন রেখেছেন তেমনি নির্দোষ আনন্দ-বিনোদনের মাধ্যমে দেহমনের সজীবতা লাভের ব্যবস্থাও দিয়েছেন। কেননা মানুষের স্বভাব ও প্রকৃতি– যেমন ইসলামী উম্মাহর বরেণ্য আলিম ইমাম ইবনে তায়মিয়া বলেছেন– উপযুক্ত বিকল্প ছাড়া কোন কিছু ত্যাগ করতে প্রস্তুত নয়। কোন কিছু ত্যাগ করতে তখনই সে প্রস্তুত হবে যখন উত্তম কোন পরিবর্ত তাকে দান করা হবে। মানুষ কিছু না কিছু করার স্বভাব নিয়ে পৃথিবীতে এসেছে। কর্ম ও কর্মব্যস্ততাই হলো তার স্বভাবের দাবী, নিষ্কর্মতা ও নির্জীবতা তার স্বভাবের বিরোধী।[১] আম্বিয়া আলাইহিমুস-সালামও প্রেরিত হয়েছেন স্বভাব ও ফিতরতের পরিবর্তন ঘটানোর জন্য নয়, বরং স্বভাব ও ফিতরতকে পূর্ণতা দান করার জন্য।[২] হাদীছ ও সীরাতের কিতাবে এর বহু উদাহরণ পাওয়া যাবে।

মদীনায় নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের শুভাগমনের সময় তাদের আনন্দ-বিনোদনের দু'টি উৎসবদিবস ছিলো। তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, এ কিসের দিন? তারা বললো, জাহিলিয়াতের যুগে আমরা এ দিন দু'টিতে আনন্দ-বিনোদন করতাম। তিনি বললেন, আল্লাহ তা'আলা এর বিনিময়ে তোমাদের আরো উত্তম দু'টি দিন দান করেছেন, ঈদুল আযহা ও ঈদুল ফিতর।[৩]

আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহা হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, ঈদের দিন আবু বকর (আমার ঘরে) দাখেল হলেন। তখন আমার কাছে দুই আনছারী তরুণী ছিলো এবং তারা সেই গীত গাইছিলো যা বুগাছ যুদ্ধের দিন আনছার গেয়েছিলো। আয়েশা (রাদিয়াল্লাহু আনহা) বলেন, তারা তেমন কোন গায়িকা ছিলো না। আবুবকর গান শুনে বললেন, আল্লাহর রাসূলের ঘরে শয়তানের গীত!?

তখন রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, হে আবুবকর, প্রত্যেক সম্প্রদায়ের জন্য উৎসবের দিন রয়েছে, আর এটা হলো আমাদের উৎসবের দিন।[৪]

---

[১] من كلام شيخ الإسلام الحافظ ابن تيمية في كتابه "اقتضاء الصراط المستقيم ومخالفة أصحاب الجحيم" পৃ. ১৪৩

[২] ابن تيمية في كتابه النبوات

[৩] رواه النسائي عن أنس رضي الله عنه في كتاب صلاة العيدين، وأبو داود في كتاب الصلاة

[৪] رواه البخاري عن عائشة رضي الله عنها، في كتاب الجمعة، وفي كتاب المناقب، ومسلم في كتاب صلاة العيدين، وابن ماجه في كتاب النكاح

অন্য বর্ণনায় আছে, তিনি বললেন, হে আবুবকর, তাদেরকে তাদের অবস্থার উপর ছেড়ে দাও; কারণ আজ ঈদের (উৎসবের) দিন।[১]

পক্ষান্তরে রোমান খৃস্টধর্ম স্বভাব ও ফিতরতের বিলুপ্তির ব্যর্থ চেষ্টা চালিয়েছিলো এবং আগাগোড়া এমন একটি স্বভাববিরোধী ব্যবস্থা প্রবর্তন করতে চেয়েছিলো, বাস্তবে যা কিছুতেই সম্ভব নয়। মানুষের উপর খৃস্টধর্ম এমন একটি গুরুভার চাপিয়ে দিয়েছিলো যা বহন করার শক্তি মানুষের ছিলো না। রোমকদের চরম বস্তুবাদিতার বিরুদ্ধে প্রতিক্রিয়া হিসাবে মানুষ প্রথমে এর প্রতি কিঞ্চিৎ আকৃষ্ট হয়েছিলো এবং ইচ্ছায়, অনিচ্ছায় তা মেনে নিয়েছিলো, কিন্তু খুব দ্রুতই মোহ-মুক্তি ঘটেছিলো এবং বিদ্রোহ দেখা দিয়েছিলো। মানুষের, অন্যায়ভাবে অবদমিত স্বভাব ও প্রকৃতি রুখে দাঁড়িয়ে চরম প্রতিশোধ গ্রহণ করেছিলো। স্বভাব ও ফিতরতের দাবী ও চাহিদা অস্বীকার করে খৃস্টধর্মের প্রবর্তিত এই অতিবৈরাগ্য-বাদ মানুষের দৃষ্টি ও দৃষ্টিভঙ্গি এবং চরিত্র ও নৈতিকতায় কোন পরিবর্তনই আনতে পারেনি এবং পারেনি মানবসভ্যতাকে ধ্বংসের গহ্বরে পতন থেকে রক্ষা করতে। ফলে সকল খৃস্টানজনপদে ভোগবাদ ও বৈরাগ্যবাদের বিপরীতমুখী দু'টি আন্দোলন পাশাপাশি অবস্থান করছিলো, বরং সঠিকভাবে বলতে গেলে, বৈরাগ্যবাদ পড়ে ছিলো মরুভূমিতে ও নির্জন উপাসনাগৃহে, শহর-নগরের গতিময় জীবনের উপর যার কোন প্রভাব ও নিয়ন্ত্রণ ছিলো না। পক্ষান্তরে নগর-জনপদে ছিলো লাগামহীন ভোগবাদেরই অপ্রতিহত প্রভাব। সে যুগে খৃস্টজগত ভোগবাদ ও বৈরাগ্যবাদের মাঝখানে কেমন খাবি খাচ্ছিলো এবং তার নৈতিক অধঃপতন কী মর্মান্তিক পর্যায়ে উপনীত হয়েছিলো তার একটি বাস্তব চিত্র ঐতিহাসিক লেকী এভাবে এঁকেছেন–

'মানুষের চরিত্রে ও সমাজ-জীবনে অবক্ষয় ছিলো চরমে। চারদিকে ছিলো ভোগ-বিলাস, জৈবিকতা ও পাপাচারের জোয়ার। রাজসভায় এবং অভিজাত শ্রেণীর জলসায় ছিলো চাটুকারিতা ও তোষামোদের নগ্ন প্রতিযোগিতা, আর ছিলো সাজ-অলঙ্কার ও বেশভূষার বাড়াবাড়ি প্রদর্শনী। অন্যদিকে কিছু লোক লোকালয় ছেড়ে নির্জনে ডুবে ছিলো বৈরাগ্যবাদের আত্মপীড়নের নিষ্ঠুর সাধনায়। এভাবে জীবন ও সমাজ একই সময়ে চরম বৈরাগ্যবাদ ও চরম ভোগবাদের দোলায় দোল খেয়ে চলেছিলো। আশ্চর্যের বিষয় তো এই যে, যেসব জনপদে সাধু-সন্ন্যাসীর

---

[১] رواه أحمد في مسنده (في باقي مسند الأنصار)

আবির্ভাব বেশী ঘটেছে সেখানেই অনাচার ও পাপাচারের বাজার ছিলো বেশী গরম। মানুষের জীবনে তখন পাপাচার ও কুসংস্কার একাকার হয়ে গিয়েছিলো, আর পাপাচার ও কুসংস্কারই হলো মানুষের মহত্ত্ব ও আভিজাত্যের বড় শত্রু। সাধারণ বিবেক ও চেতনা এতটাই নির্জীব হয়ে পড়েছিলো যে, লোকলজ্জা ও নিন্দা-কলঙ্কের কোন ভয় আর অবশিষ্ট ছিলো না। ধর্মভীতি হয়ত বিবেককে কিছুটা নাড়া দিতে পারতো, কিন্তু তাও চাপা পড়ে ছিলো এই বিশ্বাসের নীচে যে, প্রার্থনা মুছে ফেলে পাপের সকল কালিমা। প্রতারণা ও মিথ্যাচারের বাজার এমনই গরম ছিলো যে, সিজারদের আমলেও তা ছিলো না। অবশ্য যুলুম-নির্যাতন ও নগ্নতা-বেহায়াপনা ছিলো সে যুগের চেয়ে কম, তবে মুক্তবুদ্ধি ও চিন্তার স্বাধীনতা এবং জাতীয় চেতনা ও উদ্দীপনার ক্ষেত্রেও ছিলো অবক্ষয়।[১]

গীর্জায় ধর্মনেতাদের ভোগবাদ

খৃস্টধর্ম বৈরাগ্যবাদের যে নেতিবাচক ব্যবস্থা প্রবর্তন করেছিলো তা মানব-স্বভাবের সঙ্গে সঙ্ঘর্ষপূর্ণ অবশ্যই ছিলো, তবে নতুন ধর্মের নিজস্ব প্রভাব ও আধ্যাত্মিক শক্তির কারণে এবং তার সঙ্গে যুক্ত অন্যান্য কার্যকারণের আনুকূল্যে কিছু কালের জন্য তা ফিতরত ও প্রকৃতিকে দাবিয়ে রাখতে পেরেছিলো। কিন্তু অল্প সময়ের মধ্যেই মানুষের স্বভাব ও প্রকৃতি এর বিরুদ্ধে ফুঁসে উঠেছিলো এবং সেটাই ছিলো স্বাভাবিক। কারণ যা স্বভাববিরোধী তা শুরুতে যতই সাফল্যের চমক দেখাক, তার পরাজয় অবশ্যম্ভাবী। এমনকি একসময় দেখা গেলো, ধর্মের প্রাণকেন্দ্র খোদ গীর্জায়ও সেই বস্তুপূজা ও ভোগবাদের অনুপ্রবেশ শুরু হয়েছে, যার বিরুদ্ধে ছিলো বৈরাগ্যবাদের আন্দোলন। হতে হতে গীর্জাই একসময় জাগতিক কেন্দ্রগুলোর প্রতিদ্বন্দ্বী হয়ে দাঁড়ালো। শুধু তাই নয়, অনাচার-পাপাচার ও নৈতিক অবক্ষয়ে ভোগবাদের প্রবক্তাদেরও তারা ছাড়িয়ে গেলো, যার কারণে সরকার একসময় ধর্মীয় ভোজসভার প্রচলিত রীতি নিষিদ্ধ করতে বাধ্য হলো। অথচ সেগুলোর উদ্দেশ্য ছিলো খৃস্টসম্প্রদায়ের মধ্যে প্রীতি ও সম্প্রীতি জোরদার করা। তদ্রূপ শহীদান ও ধর্মীয়পুরুষদের স্মৃতিসভা ও মৃত্যুবার্ষিকীর উপরও নিষেধাজ্ঞা আরোপ করতে হলো। কেননা সেগুলোই তখন হয়ে উঠেছিলো ধর্মের নামে অনাচার ও পাপাচারের আখড়া। বড় বড় পাদ্রীদের

---

[১] lecky, history of european morals, vol. 11. pp. 162-3

দিকে ছিলো আখেরাত ও পরকাল এবং মৃত্যু ও মৃত্যুপরবর্তী জীবন সম্পর্কে চরম নিস্পৃহা এবং নতুন ধর্ম সম্পর্কে অতলস্পর্শী জ্ঞান আহরণের কষ্ট স্বীকারে অনীহা। সেই সঙ্গে এটাও বিবেচনায় রাখুন যে, ইউরোপের বুকে ইসলামের প্রচার-প্রসারের বিষয়ে মুসলিম জাতিও চরম অবহেলা ও দায়িত্বহীনতার পরিচয় দিয়েছে। অথচ মুসলিম বিশ্বে বিভিন্ন রাষ্ট্রের উত্থান এবং ইউরোপীয় রাষ্ট্রবর্গের সঙ্গে সমতা ও সমসাময়িকতার সম্পর্কের কারণে কাজের খুব অনুকূল সুযোগ ছিলো, কিন্তু আমরা তা কাজে লাগাইনি। মোটকথা সঙ্গত অসঙ্গত বিভিন্ন কারণে ইউরোপ ইসলামের সঙ্গ ও সান্নিধ্য থেকে এবং ইসলামের সঞ্জিবনী সুধা থেকে বঞ্চিত রয়ে গিয়েছিলো, অথচ তাদের জীবনে তখন ইসলামের তেমনই প্রয়োজন ছিলো, সর্পবিষে আক্রান্ত ব্যক্তির যতটা প্রয়োজন হয় প্রতিষেধক গ্রহণের।

বস্তুবাদের দিকে ইউরোপ

কারণ এটা হোক বা সেটা, যা আশঙ্কা করা হয়েছিলো তা শেষ পর্যন্ত ঘটেই গেলো, অর্থাৎ জড়বাদ ও বস্তুবাদ শব্দদু'টি যত ব্যাপক অর্থ ও মর্ম ধারণ করে সে ব্যাপকতা নিয়েই ইউরোপ জড়বাদ ও বস্তুবাদের দিকে ধাবিত হলো। বিশ্বাস ও দৃষ্টিভঙ্গি, বুদ্ধিবৃত্তি ও মনস্তত্ত্ব, নীতি ও চরিত্র, সমাজ ও সামাজিক বন্ধন, জ্ঞান, শিল্প ও সাহিত্য, শাসন ও রাজনীতি– এককথায় জীবনের সকল অঙ্গনে জড়বাদ ও বস্তুবাদের নিরঙ্কুশ প্রভাব প্রতিষ্ঠিত হয়ে গেলো। বস্তুবাদের দিকে ইউরোপের অভিযাত্রা যদিও পর্যায়ক্রমেই হয়েছে এবং প্রথমে তার গতি ছিলো ধীর, তবে প্রতিজ্ঞা ছিলো সুদৃঢ় এবং পদক্ষেপ ছিলো সুসংহত। দার্শনিক ও বিজ্ঞানীগণ এই 'নিশ্চিত ভিত্তি'র উপর সৃষ্টিজগত সম্পর্কে চিন্তাভাবনা শুরু করলেন যে, স্রষ্টা ও নিয়ন্তা এবং পরিচালক ও ব্যবস্থাপক বলে কোন সত্তার অস্তিত্ব নেই। প্রকৃতি ও বস্তুজগতের উর্ধ্বে এমন কোন শক্তি নেই যার পরিচালনা ও ব্যবস্থাপনায় সবকিছু চলছে। তারা জগত ও প্রকৃতির যাবতীয় আবর্তন-বিবর্তনের আগাগোড়া যান্ত্রিক ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ উপস্থাপন করতে লাগলেন এবং এর নাম দিলেন নিরপেক্ষ ও বৈজ্ঞানিক গবেষণা। পক্ষান্তরে স্রষ্টার অস্তিত্বের প্রতি বিশ্বাসকে স্পর্শ করে এমন যে কোন চিন্তা-গবেষণাকে অবজ্ঞাভরে তারা অভিহিত করলেন প্রাচীন ও অবৈজ্ঞানিক বলে, যা জ্ঞান ও যুক্তির ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত নয়। চিন্তা-গবেষণা ও বিচার-পর্যবেক্ষণের যে পথ ও পন্থা তারা অনুসরণ করেছিলেন, তা তাদেরকে গতি ও শক্তি এবং বস্তু ও পদার্থ ছাড়া অন্য সবকিছুর অস্তিত্ব অস্বীকার করার

দিকে নিয়ে গেলো। কারণ তা ইন্দ্রিয় গ্রাহ্য ও পরীক্ষাযোগ্য নয় এবং মাপ ও পরিমাপ, কিংবা গণনা ও আয়তনের অধীন নয়। এর স্বাভাবিক ও যৌক্তিক পরিণতি এই হলো যে, আল্লাহর অস্তিত্ব এবং উর্ধ্বজাগতিক সকল সত্য কাল্পনিক বিষয় বলে সাব্যস্ত হলো, যার পক্ষে (তথাকথিত) জ্ঞান ও যুক্তির কোন সমর্থন নেই।

এ সকল দার্শনিক ও বিজ্ঞানী স্বাভাবিক কারণেই দীর্ঘকাল আল্লাহর অস্তিত্ব অস্বীকার এবং ধর্মের প্রতি প্রকাশ্য বিদ্রোহ ঘোষণা করার দুঃসাহস করেননি। তাছাড়া শুরুতে সবাই অস্বীকারবাদী ছিলেনও না, তবে জ্ঞান-গবেষণার ক্ষেত্রে যে চিন্তাপদ্ধতি ও অবস্থান তারা গ্রহণ করেছিলেন, ধর্মের সঙ্গে তার সঙ্গতি রক্ষা করা কিছুতেই সম্ভব ছিলো না। কারণ ধর্মের ভিত্তিই হলো ঈমান বিলগায়ব এবং অহী ও নবুয়তের উপর; আখেরাত ও পরকালই হলো এর আবর্তনকেন্দ্র। অথচ এগুলোর কোনটিই তো ইন্দ্রিয় শক্তি দ্বারা অনুভবযোগ্য নয় এবং মাপ, পরিমাপ, গণনা ও আয়তন দ্বারা প্রমাণযোগ্য নয়। তাই ধর্মবিশ্বাসের প্রতি তাদের দ্বিধা-দ্বন্দ্ব ও সংশয়-সন্দেহ দিন দিন বেড়েই চলেছিলো।

ইউরোপীয় রেনেসাঁর অনুসারীরা দীর্ঘকাল ধরে জড়বাদী দর্শন ও বস্তুবাদী জীবন এবং খৃস্টধর্মের বোধ, বিশ্বাস ও সংস্কৃতির মধ্যে সঙ্গতি রক্ষা করে চলার যথা-সাধ্য চেষ্টা করে যাচ্ছিলো। কারণ ধর্মের বন্ধন থেকে তখনো তারা মুক্ত হতে পারেনি। খৃস্টজগতে তখনো ধর্মীয় প্রভাব বিদ্যমান ছিলো। তাছাড়া নৈতিক ও সামাজিক স্বার্থেরও দাবী ছিলো খুব শিথিলভাবে হলেও একটি ধর্মীয় ব্যবস্থা বহাল রাখা, যা সম্প্রদায়ের সকলকে একসূত্রে বেঁধে রাখবে এবং দেশ ও জাতিকে নৈতিক ও সামাজিক অবক্ষয় থেকে রক্ষা করবে। কিন্তু শেষ পর্যন্ত তাদের লজ্জাই পেতে হলো। কারণ বস্তুবাদী সভ্যতার গতি এত প্রবল ছিলো যে, ধর্ম ও ধর্মীয় রীতি-নীতিগুলো তার সাথে পাল্লা দিয়ে উঠতে পারেনি। ফলে জড়বাদ ও আধ্যাত্মিকতার সহাবস্থান নিশ্চিত করা তখন প্রায় অসম্ভব হয়ে পড়ে এবং সেজন্য এমন কষ্টকর কৃত্রিমতার আশ্রয় নিতে হয়, যাতে মেধা, শক্তি ও সময়ের শুধু অপচয় ঘটছিলো, যার কোন প্রয়োজন ও সার্থকতা তারা দেখতে পায়নি। তাই শেষ পর্যন্ত তারা লোকলজ্জা ও কপটতার বেড়াজাল থেকে বেরিয়ে আসে এবং প্রকাশ্যে ধর্মহীনতা ও বস্তুবাদকে জীবনের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যরূপে গ্রহণ করে নেয়।

এই সময়সন্ধিক্ষণে সমগ্র ইউরোপে বিপুল সংখ্যায় কবি, লেখক, সাহিত্যিক,

শিক্ষক, সমাজ ও রাষ্ট্রবিজ্ঞানীর আবির্ভাব ঘটে, যারা সমতালে জড়বাদের শিঙ্গায় ফুঁক দিতে শুরু করেন এবং কলমের জাদুময়তা দ্বারা মনমস্তিষ্কে বস্তুবাদের বিষ ছড়াতে থাকেন। নীতি ও নৈতিকতা এবং জীবন ও সামাজিক মূল্যবোধ সব-কিছুরই তাদের কাছে ছিলো বস্তুবাদী ব্যাখ্যা। কখনো তারা প্রচার করতেন আত্ম-স্বার্থদর্শনের মাহাত্ম্য, কখনো বা অবাধ ভোগবাদের মহিমা।

মেকিয়াভেলি (১৪৬৯-১৫২৭ খৃঃ) ও অন্যান্য রাষ্ট্রবিজ্ঞানী আরো আগেই ধর্ম ও রাষ্ট্রের বিভাজন এবং সামাজিক ও ব্যক্তিক চরিত্রের ভিন্নতার দর্শন প্রচার করেছিলেন। তাদের চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত ছিলো, ধর্ম যদি মানতেই হয় তাহলে তার সীমানা হবে ব্যক্তির ব্যক্তিজীবন। রাষ্ট্র ও রাজনীতিতে তার প্রবেশাধিকার থাকবে না।

তাদের মতে জীবনে রাষ্ট্রের ভূমিকা ও গুরুত্ব হবে সবকিছুর উর্ধ্বে। পরকাল বলে যদি কিছু থাকে তাহলে খৃস্টধর্মের সম্পর্ক হলো পরকালের সঙ্গে। সুতরাং ধার্মিক লোকেরা গীর্জা ও ধর্মব্যবস্থার জন্য প্রয়োজনীয় হলেও সমাজ ও রাষ্ট্রের পক্ষে উপযোগী ও কল্যাণকর হতে পারেন না। কেননা ধর্মীয় বিধিবন্ধন ও বাধ্যবাধক-তার ঘেরাটোপে আবদ্ধ থাকতেই তারা ভালোবাসে। তাই রাষ্ট্র ও জনস্বার্থের জন্য অপরিহার্য হলেও ধর্মীয় বিধান ও নৈতিক মূল্যবোধ থেকে তারা সরে আসতে পারে না।

শাসক ও রাষ্ট্রনায়ককে প্রয়োজনে শৃগালের ধূর্ততা ও শঠতা দেখাতে হয়। দেশ, রাষ্ট্র ও জনগণের সামান্য স্বার্থও যদি নিহিত থাকে তাহলে নির্দ্বিধায় তাকে মিথ্যা, কপটতা, ধোকা ও প্রতারণার আশ্রয় নিতে হবে। এ নতুন আহ্বান অত্যন্ত জন-প্রিয়তা লাভ করে এবং ভৌগোলিকতাবাদ ও জাতীয়তাবাদ (যা প্রাচীন ধর্মের স্থান দখল করেছিলো) এ নতুন দর্শনকে পূর্ণ পৃষ্ঠপোষকতা দান করে। ইউরোপের কবি-সাহিত্যিক, লেখক-শিল্পী ও বুদ্ধিজীবী-সমাজ, বিশেষ করে ফরাসিবিপ্লব ও তার পরবর্তী সময়ে নীতি ও নৈতিকতার সকল শাশ্বত মূল্যবোধ এবং প্রতিষ্ঠিত সমাজ-ব্যবস্থার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করেন, তদুপরি তারা পাপ ও পাপাচারের সৌন্দর্য মানুষের সামনে চিত্তাকর্ষক ভাষায় তুলে ধরেন।

ভোগস্বাধীনতার এই প্রবক্তাদের মূল বক্তব্য ছিলো, ব্যক্তিজীবনে মানুষ যাবতীয় নৈতিক দায়দায়িত্ব থেকে মুক্ত এবং তার পূর্ণ অধিকার রয়েছে অবাধ আনন্দ-বিনোদনের এবং জীবন ও যৌবনের পরিপূর্ণ উপভোগের। এ জীবন, এ যৌবন খুব অল্প সময়ের। সুতরাং জীবনের স্বাদ ও যৌবনের আনন্দ যত পারো ভোগ

করো। ইন্দ্রিয় আনন্দ ও বস্তুগত লাভ ছাড়া জীবনের অন্য সবকিছু তারা অস্বীকার করতো। এককথায় পশুবৃত্তি ও পাশবপ্রবৃত্তির চরিতার্থতাই ছিলো ভোগবাদী ও বস্তুবাদী জীবনের মূল কথা।

এভাবে উনিশ ও বিশশতকের ইউরোপীয় জীবন মূলত মূর্তিপূজক গ্রীক ও রোমকদের বস্তুবাদী জীবনেরই এক জীবন্ত প্রতিচ্ছবি হয়ে ওঠে। বস্তুত এটা ছিলো প্রাচীন গ্রীক ও রোমান জাহেলিয়াতের নতুন সংস্করণ যা উনিশশতকে খুব যত্নের সঙ্গে তৈরী করা হয়েছিলো। প্রাচ্যের খৃস্টধর্ম গ্রীক ও রোমক সংস্কৃতির যেসকল রেখা ও চিত্র মুছে ফেলেছিলো উনিশশতকের ইউরোপীয় চিত্রকরেরা সেগুলো যেন আরো উজ্জ্বল ও উদ্ভাসিতরূপে পরিবেশন করেছেন। প্রাচ্যসংস্কৃতির প্রভাবে ইউরোপের যে অবদমিত স্বভাব, সেটা যেন নতুন করে আরো শক্তি নিয়ে মাথাচাড়া দিয়ে উঠেছে।

এতে অবশ্য অবাক হওয়ার কিছু নেই। কেননা আজকের ইউরোপীয় জাতিবর্গ মূলত গ্রীক ও রোমকদেরই সুযোগ্য বংশধর। বর্তমান পাশ্চাত্য সভ্যতা এবং প্রাচীন গ্রীক ও রোমান সভ্যতার মধ্যেও রয়েছে অতি নিকটসাদৃশ্য। ইউরোপের বর্তমান ধর্মীয় জীবনও আত্মিকতা ও আধ্যাত্মিকতা থেকে ততটাই মুক্ত যতটা ছিলো প্রাচীন গ্রীক ও রোমকদের ধর্মীয় জীবন; যেমন ডক্টর হ্যাশ গ্রীক সভ্যতার আলোচনা প্রসঙ্গে উল্লেখ করেছেন।

আত্মশুদ্ধি ও আত্মসংযম, নৈতিকতা ও ধার্মিকতা, ইশ্বরভীতি ও পরকালপ্রীতির অনুপস্থিতি এবং বিনোদন ও ক্রীড়াসক্তির প্রাবল্যের যে চিত্র ঐতিহাসিক লেকী গ্রীকদের ধর্মবোধ প্রসঙ্গে উল্লেখ করেছেন তা একই ভাবে এবং আরো চড়া মাত্রায় আধুনিক ইউরোপের জীবনেও ছিলো। এবং তা ঐ ধর্মব্যবস্থার স্বাভাবিক ফল যা ইউরোপ গ্রহণ করেছিলো, কারণ আল্লাহর প্রতি পূর্ণ আত্ম- নিবেদন এবং তার উপাসনায় পরিপূর্ণ আত্মনিমগ্নতার সঙ্গে এ ধর্মব্যবস্থা কিছুতেই খাপ খেতে পারে না। তদ্রূপ তা ছিলো বিজ্ঞানী ও দার্শনিকদের বিভিন্ন ধ্যান-ধারণা ও বাদ-মতবাদ প্রচারের অনিবার্য ফল, যা ইউরোপে বিপুল জনপ্রিয়তা অর্জন করেছিলো এবং এমনকি তা ধর্মের স্থান দখল করে নিয়েছিলো।

ইউরোপের বস্তুবাদী সমাজে আপনি দেখতে পাবেন, মানুষ বস্তুগত স্বাদ-আনন্দ ভোগ করার এবং জীবন ও যৌবনের মজা লুটে নেয়ার জন্য ঝাঁপিয়ে পড়ে যেমন পিপাসার্ত পানিতে ঝাঁপ দেয় কিংবা যেমন পতঙ্গ আগুনে ঝাঁপ দেয়, ঠিক যেমনটি সক্রেটিস তার সময়ের গ্রীক গণতান্ত্রিক আদর্শ যুবকের চিত্র অঙ্কন

এবং তাওরাত ও ইঞ্জিলের প্রাচীন ভাষ্যকারদের আলোচনায় এসেছে সেগুলোকে তারা মূল ধর্মগ্রন্থে সংযোজন করে অলঙ্ঘনীয় ধর্মীয় পবিত্রতা দান করলেন। ফলে তা খৃস্টধর্মের প্রত্যেক অনুসারীর মৌল ধর্মবিশ্বাসের অপরিহার্য অংশে পরিণত হলো

এ সকল ভৌগোলিক তথ্য, যার স্বপক্ষে আসমানি কোন সনদ ছিলো না, খৃস্টীয় ভৌগোলিক সত্য বা Christian topography নামে অভিহিত হলো। এবং তাতে শুধু সন্দেহ প্রকাশ করার অর্থ ছিলো ধর্মের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করা।

ধর্ম ও বিজ্ঞানের দ্বন্দ্ব এবং গীর্জার নিষ্ঠুরতা

গীর্জা এ মহানির্বুদ্ধিতা এমন এক সময় করেছে যখন ইসলাম ও মুসলিম বিজ্ঞানী -দের প্রভাবে ইউরোপে জ্ঞান-বিজ্ঞান ও মুক্তবুদ্ধির আগ্নেয়গিরির বিস্ফোরণ ঘটেছে। ইউরোপের চিন্তানায়ক ও বিজ্ঞানীগণ প্রথমেই ধর্মের অন্ধ আনুগত্য এবং গীর্জার বুদ্ধিবৃত্তিক দাসত্বের শিকল ছিন্ন করে ফেললেন; তারপর তারা ইতিহাস, ভূগোল ও বিজ্ঞানের তথাকথিত ধর্মগ্রন্থীয় তথ্য ও তত্ত্বগুলো বিনা প্রমাণে 'ঈমান বিলগায়ব' বলে মেনে নেয়ার দাবী প্রত্যাখ্যান করলেন এবং যুক্তি-প্রমাণের আলোকে সুস্পষ্ট ও জোরালো ভাষায় সেগুলোর সমালোচনা করলেন। সেই সঙ্গে তারা তাদের পরীক্ষা-নিরীক্ষা ও গবেষণা দ্বারা অর্জিত তথ্য ও তত্ত্ব প্রকাশ করতে শুরু করলেন, যা ছিলো 'গীর্জার সত্যের' সঙ্গে সঙ্ঘর্ষপূর্ণ। আর তাতেই যেন গীর্জায় কেয়ামত কায়েম হয়ে গেলো।

ধর্মনেতারা– ইউরোপে তখন যারা ছিলেন ক্ষমতার মূল নিয়ন্তা– বিজ্ঞানী ও দার্শনিকদের ধর্মদ্রোহী আখ্যা দিলেন এবং খৃস্টধর্মের নামে তাদের হত্যা করার এবং সম্পদ বাজেয়াপ্ত করার বৈধতা ঘোষণা করলেন। গীর্জার পক্ষ হতে Court of Inquisition বা তদন্ত আদালত গঠন করা হলো, পোপের ভাষায় যাদের দায়িত্ব ছিলো, 'ঐসব অবিশ্বাসী ও ধর্মদ্রোহীকে ধরে এনে শাস্তি দেয়া যারা ছড়িয়ে আছে বিভিন্ন শহরে ও জনপদে এবং লুকিয়ে আছে বাড়ীঘরে ও গুহায়-গহ্বরে।'

বলাবাহুল্য, আদালত ও তার পেয়াদারা রাত-দিন এক করে, আরাম-ঘুম হারাম করে খুব উৎসাহের সঙ্গেই তাদের দায়িত্ব পালন করেছে। ইউরোপের সর্বত্র গুপ্তচর ছড়িয়ে দেয়া হলো, যারা ঘরের গোপন কুঠুরি থেকে এবং পাহাড়ের গুহা থেকে 'গীর্জার গোনাগার'দের ধরে আনতো। অবস্থা এমনই ভয়াবহ ছিলো যে,

মনের চিন্তা এবং নাকের শ্বাস-প্রশ্বাসেরও যেন হিসাব নেয়া হতো। গীর্জা ও তার আদালত দস্তুর-মত কোমর বেঁধে মাঠে নেমেছিলো, যাতে এমন কেউ পৃথিবীতে বেঁচে থাকতে না পারে যার মস্তিষ্ক গীর্জার বিরুদ্ধে চিন্তা করে এবং যার হৃদয় গীর্জার বিরুদ্ধে স্পন্দিত হয়। জনৈক খৃস্টান পণ্ডিতের ভাষায়, 'এটা একেবারেই অসম্ভব ছিলো যে, কোন মানুষ খৃস্টান হবে, আর সে তার বিছানায় স্বাভাবিক মৃত্যুবরণ করবে।'

অনুমান করা হয়, গীর্জার তদন্ত আদালতে যাদের সাজা হয়েছিলো তাদের সংখ্যা তিন লাখ ছাড়িয়ে গিয়েছিলো। আর আগুনে পুড়িয়ে মারা হয়েছিলো বত্রিশ হাজার। বিশ্বাস করুন, তাদের সংখ্যা ছিলো বত্রিশ হাজার এবং তা গীর্জার কাছ থেকেই প্রাপ্ত হিসাব। আগুনে পুড়ে ছাই হয়ে যাওয়া এই হতভাগ্যদের মধ্যে ছিলেন সুপ্রসিদ্ধ বিজ্ঞানী ব্রুনো, গীর্জার চোখে যার সবচে' বড় অপরাধ, তিনি জগতের একাধিকতায় বিশ্বাস করে বলতেন, 'পৃথিবীর বাইরেও প্রাণীর বসবাস থাকতে পারে।'

তদন্ত আদালত এই সুপারিশসহ তাকে রাষ্ট্রীয় প্রশাসনের হাতে সোপর্দ করে যে, তাকে যেন লঘু শাস্তি দেয়া হয় এবং তার শরীরের একফোঁটা রক্তও যেন বাইরে বের না হয়, যার ইঙ্গিতার্থ, তাকে যেন আগুনে পুড়িয়ে মারা হয়।

জ্যোতির্বিজ্ঞানী গ্যালিলিওকে শুধু এ কারণে মৃত্যুদণ্ড দেয়া হয় যে, তিনি বিশ্বাস করতেন, 'পৃথিবী সূর্যকে প্রদক্ষিণ করে।'

ভয়ঙ্কর প্রতিক্রিয়া

ধর্মের নামে সঙ্ঘটিত এ চরম নিষ্ঠুরতা গীর্জার শেষরক্ষা করতে পারেনি। কারণ দেয়ালে যখন পিঠ ঠেকে গেলো তখন ধৈর্যের বাঁধ ভেঙ্গে গেলো এবং মুক্তবুদ্ধি ও প্রগতিশীল চিন্তার প্রবক্তারা রুখে দাঁড়ালেন। সাধারণ মানুষও তাদের পক্ষে ঐক্য-বদ্ধ হলো। মুক্তবুদ্ধির অধিকারী প্রগতিশীল লোকদের বিদ্রোহ প্রথমে ছিলো গীর্জার নির্যাতন-নিপীড়ন ও ধর্মনেতাদের প্রাচীনবাদিতার বিরুদ্ধে। কিন্তু শেষ পর্যন্ত তারা ঐ সব বিশ্বাস ও সংস্কৃতি, জ্ঞান ও শিক্ষা এবং নীতি ও নৈতিকতার প্রতিও বিদ্বেষী হয়ে ওঠে যার সঙ্গে গীর্জা ও ধর্মনেতাদের যোগসূত্র ছিলো। শুধু তাই নয়, ইউরোপের বুদ্ধিজীবী ও বিদগ্ধ সমাজ প্রথমে তো শুধু খৃস্টধর্মের বিরুদ্ধে, কিন্তু ধীরে ধীরে ধর্মমাত্রেরই বিরুদ্ধে ঘৃণা ও শত্রুতা পোষণ করতে শুরু করে। ফলে প্রগতিশীলদের যে যুদ্ধ ছিলো খৃস্টান ধর্মনেতাদের (আরো সঠিক-

ভাবে, সাধু পল-এর ধর্মমতের) বিরুদ্ধে সেটাই আশ্চর্যজনকভাবে বিজ্ঞান ও ধর্মের যুদ্ধে পরিণত হলো। মুক্তবুদ্ধির প্রবক্তারা চিন্তা ও যুক্তি ছাড়াই এ সিদ্ধান্তে পৌঁছে গেলেন যে, ধর্ম নামে যা কিছু আছে বিজ্ঞানের বিরোধী এবং বুদ্ধি ও ধর্মের অবস্থান দুই বিপরীত প্রান্তে। সুতরাং বিজ্ঞান ও ধর্মের প্রীতিপূর্ণ সহাবস্থান কোনভাবেই সম্ভব নয়। একটির অভিমুখী হলে অন্যটির পিছনমুখী হওয়া অনিবার্য। যুক্তি ও বুদ্ধিতে যে বিশ্বাস করবে, ধর্ম ও ধর্মগ্রন্থে তাকে অবিশ্বাস করতেই হবে।

যখনই তাদের সামনে ধর্মের (যে কোন ধর্মের) প্রসঙ্গ আসতো, তাদের অন্তরে সেই সব পবিত্র ও নির্দোষ রক্তের স্মৃতি ভেসে উঠতো যা ধর্মের নামে প্রবাহিত হয়েছে, ভেসে উঠতো জ্ঞান ও বিজ্ঞানের সাধনায় নিবেদিতপ্রাণ সেই সকল মহাত্মাদের স্মৃতি যারা গীর্জার পাদ্রীদের নিষ্ঠুরতা ও বর্বরতার বলি হয়েছেন। তাদের চোখের সামনে ভেসে উঠতো জল্লাদরূপী সেই সব নরপশুদের বীভৎস চেহারা যাদের চোখ থেকে ঠিকরে বের হতো শুধু প্রতিহিংসার আগুন, যাদের হৃদয় ছিলো দয়া-মায়া, ক্ষমা ও মমতাশূন্য এবং যাদের মস্তিষ্ক ছিলো বুদ্ধি ও যুক্তি থেকে বঞ্চিত। তাই মানুষরূপী ঐ পশুদের প্রতি তাদের হৃদয়ে জমে উঠেছিলো সারা দুনিয়ার ক্রোধ ও বিদ্বেষ এবং ঘৃণা ও বিতৃষ্ণা। শুধু তাদের বিরুদ্ধেই নয়, বরং তারা যে ধর্মের প্রতিনিধিত্ব করে তারও বিরুদ্ধে, এমনকি অন্যান্য ধর্মেরও বিরুদ্ধে। এ অন্ধ ধর্মবিদ্বেষই ছিলো তাদের জীবনের মূলমন্ত্র। এমনকি পরবর্তী বংশধরদের জন্যও তারা তা উত্তরাধিকাররূপে রেখে গিয়েছেন।

চিন্তানায়কদের চিন্তার দৈন্য

ধর্মের বিরুদ্ধে বিদ্রোহকারী এ সকল বুদ্ধিবাদী ও চিন্তানায়কের প্রতি আমরা এখন শুধু করুণাই করতে পারি যে, তাদের মধ্যে এতটুকু ধৈর্য ও স্থিরতা ছিলো না এবং এই পরিমাণ অধ্যয়নমনস্কতা ও বুদ্ধিবৃত্তিক যোগ্যতা ছিলো না, যাতে তারা ধীর-শান্ত মস্তিষ্কে গভীর চিন্তা-পর্যালোচনার মাধ্যমে ধর্ম ও ধর্মব্যবসায়ীদের মধ্যে পার্থক্য করতে পারে এবং নির্ধারণ করতে পারে, যা কিছু হয়েছে তাতে ধর্মের দায়-দায়িত্ব কতটুকু, আর ধর্মনেতাদের মূঢ়তা, মূর্খতা, স্বেচ্ছাচার ও ভ্রান্ত প্রতিনিধিত্ব কতটা দায়ী। তাহলে ধর্মকে কাঁধের জোয়াল ভেবে ছুঁড়ে ফেলার পরিস্থিতি সৃষ্টি হতো না এবং মানবসভ্যতারও এত বড় সর্বনাশ হতো না। কিন্তু তাই ঘটলো যা ঘটা উচিত ছিলো না। গীর্জার প্রতি তাদের ক্রোধ ও প্রতিহিংসা

এতই চরম এবং অস্থিরতা ও ক্ষিপ্রতা এমনই বাঁধভাঙ্গা ছিলো যে, ধর্মের বিষয়ে সুস্থ চিন্তা করার কোন সুযোগই তাদের ছিলো না। অবশ্য ইতিহাস বলে, দেশে দেশে যুগে যুগে এটাই ছিলো অধিকাংশ বিপ্লবী ও বিদ্রোহী দলের স্বভাব-প্রবণতা। সুতরাং এক্ষেত্রেও ইতিহাসের সিদ্ধান্ত এটাই যে, এ অঘটনের জন্য প্রথম দল যদি হয় প্রধান আসামী এবং অবশ্যই তারা তাই, তবে সে জন্য ধর্মকে কাঠগড়ায় এনে ধর্মনেতাদের শাস্তি ধর্মের উপর চাপানো এবং জীবন ও সভ্যতার অঙ্গন থেকে ধর্মকে নির্বাসিত করা ছিলো দ্বিতীয় দলের অনেক বড় অবিচার এবং এ অবিচার শুধু তাদের নিজেদের প্রতি ছিলো না, বরং ছিলো গোটা মানবজাতিরও প্রতি।

বস্তুত তাদের মধ্যে সত্যের প্রতি এতটা আত্মনিবেদন এবং স্বজাতি ও মানবজাতির প্রতি এই পরিমাণ কল্যাণকামনা ছিলো না যাতে তারা ধর্মের প্রয়োজন অনুভব করতে পারে। সর্বোপরি এতটা চিত্তঔদার্যও ছিলো না যাতে তারা ইসলাম ধর্মের প্রতি আগ্রহী ও অনুসন্ধিৎসু হতে পারে, যে ধর্মের অনুসারী ছিলো তাদেরই সমসাময়িক জাতিবর্গ, যে ধর্ম খুব সহজেই বিপর্যয়কর এ দ্বন্দ্ব-সঙ্ঘাত থেকে তাদের মুক্তির পথ দেখাতে পারতো। কারণ ইসলামের মূল কথাই হলো কোরআনের ভাষায়–

يَأْمُرُهُم بِٱلْمَعْرُوفِ وَيَنْهَىٰهُمْ عَنِ ٱلْمُنكَرِ وَيُحِلُّ لَهُمُ ٱلطَّيِّبَٰتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ ٱلْخَبَٰٓئِثَ
وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَٱلْأَغْلَٰلَ ٱلَّتِى كَانَتْ عَلَيْهِمْ

'তাদেরকে ন্যায় ও কল্যাণের আদেশ করে এবং অন্যায় ও অকল্যাণ থেকে বাধা দেয় এবং মানুষের জন্য উত্তম ও উৎকৃষ্ট বস্তুকে হালাল সাব্যস্ত করে এবং মন্দ ও নিকৃষ্ট বস্তুকে হারাম সাব্যস্ত করে এবং অন্যায়-অনাচারের যে বেড়ী ও শেকল মানুষের উপর চাপিয়ে দেয়া হয়েছে তা তাদের থেকে নামিয়ে দেয়।'

(আল-আ'রাফ, ৭ : ১৫৭)

কিন্তু জাহিলিয়াতের সম্প্রদায়-প্রীতি এবং ক্রুশেডযুদ্ধের অন্তহীন উন্মাদনা খৃস্টীয় পাশ্চাত্য ও ইসলামী প্রাচ্যের মাঝখানে বিভেদের এমনই এক দুর্লঙ্ঘ্য প্রাচীর তৈরী করে দিয়েছিলো যে, শান্তির ধর্ম ইসলামের সুমহান শিক্ষা ও আদর্শের প্রতি ভ্রূক্ষেপ করারও তাদের সুযোগ হয়নি। তদুপরি একদিকে ছিলো ইসলাম ও তার নবীর বিরুদ্ধে গীর্জা ও পাদ্রীসমাজের অব্যাহত বিষোদ্গার ও অপপ্রচার, অন্য-

করেছিলেন। তদ্রূপ এখানে আপনি দেখতে পাবেন ধর্মবিশ্বাসে দ্বিধা-সংশয় এবং ধর্মীয় বিধি-বিধান ও জীবনব্যবস্থার প্রতি একই অনাস্থা ও উপহাস, যা ছিলো রোমে মুক্তবুদ্ধির চর্চা শুরু হওয়ার পর।

খৃস্টবাদ নয়, ইউরোপের ধর্ম বস্তুবাদ

এতে কোন সন্দেহ নেই যে, আধুনিক ইউরোপের ধর্ম, যা তার হৃদয় ও আত্মাকে এবং আবেগ ও চিন্তাসত্তাকে নিয়ন্ত্রণ করে সেটা খৃস্টধর্ম নয়, বরং জড়বাদ ও বস্তুবাদ। যিনি খুব নিকট থেকে ইউরোপকে অবলোকন করেছেন এবং বইয়ের পাতা ছেড়ে জীবনের পাতায় ইউরোপীয়দের মানস ও মানসিকতা অধ্যয়ন করেছেন, এ সত্য তিনি অবশ্যই উপলব্ধি করবেন; এমনকি বইয়ের পাতা থেকেও তা বোঝা যাবে, যদি কেউ ধর্মীয় বাহ্যিকতা দ্বারা প্রতারিত না হয়, যা রাষ্ট্রগুলো নিছক ঐতিহ্যের প্রতীকরূপে গ্রহণ করে থাকে; তদ্রূপ যদি কেউ গীর্জার ধর্মীয় অনুষ্ঠানে ব্যাপক অংশগ্রহণ দ্বারা বিভ্রান্ত না হয়, যা মানুষ শুধু জীবনবৈচিত্র্য ও আত্মিক বিনোদনরূপে করে থাকে। জার্মান নও মুসলিম মুহম্মদ আসাদ তার 'সঙ্ঘাতের মুখে ইসলাম' গ্রন্থে সুস্পষ্ট ভাষায় তা উল্লেখ করেছেন। তিনি বলেন–

'এটা অবশ্য ঠিক যে, পাশ্চাত্যে এখনো কিছু লোক ধর্মীয় আবহে চিন্তা করে এবং জীবন যাপন করে। তাদের যথাসাধ্য চেষ্টা থাকে ধর্মীয় চিন্তা ও বিশ্বাসকে সভ্যতার মূল চেতনার সঙ্গে খাপ খাইয়ে নেয়ার। কিন্তু তারা বিরল ব্যতিক্রম। সাধারণভাবে একজন ইউরোপীয়, সে গণতান্ত্রিক হোক বা ফ্যাসিবাদী, পুঁজিবাদী হোক বা সমাজতন্ত্রী, শ্রমজীবী হোক বা বুদ্ধিজীবী, জীবনে সে একটিমাত্র ধর্মের সঙ্গেই পরিচিত, আর তা হলো জড়বাদ ও বস্তুবাদ। জড়জাগতিক উন্নতিই হলো এ ধর্মের একমাত্র উপাসনা এবং এ চিন্তা-চেতনাই হলো এর মূলমন্ত্র যে, জীবন যেন হয় আরো সহজ, ভোগের আনন্দে আরো পরিপূর্ণ এবং স্বভাব ও প্রকৃতির সকল বাধাবন্ধন থেকে মুক্ত-স্বাধীন। শিল্পকারখানা, প্রেক্ষাগৃহ, নৃত্যালয় এবং বিদ্যুৎকেন্দ্র ও রাসায়নিক গবেষণাগার হলো এ ধর্মের গীর্জাঘর, আর পুরোহিত হলেন ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানের কর্ণধার, পুঁজিপতি, শিল্পপতি, চিত্রতারকা ও ক্রীড়াবিদ, যারা রেকর্ড ভাঙ্গেন এবং গড়েন। শক্তির এই বাঁধভাঙ্গা উন্মত্ততা ও ভোগ-আনন্দের এই বে-লাগাম উন্মাদনার অনিবার্য ফল এই হলো যে, সমাজ ও সভ্যতায় পরস্পর প্রতিদ্বন্দ্বী বিভিন্ন দলের উদ্ভব হলো এবং প্রতিটি দল

অস্ত্রসজ্জিত হয়ে চাহিদা ও স্বার্থগত সজ্ঘাতের কারণে প্রতিপক্ষকে ধ্বংস করার নেশায় মেতে উঠলো। পক্ষান্তরে সভ্যতার অঙ্গনে মানুষের এমন এক নতুন সংস্করণ তৈরী হলো যারা বিশ্বাস করে, লাভ ও মুনাফাই হলো সুনীতি ও সুচরিত্র, আর বস্তুবাদী সফলতাই হলো জীবনের একমাত্র আদর্শ মানদণ্ড এবং ন্যায় ও অন্যায়ের মাঝে পার্থক্যরেখা।'[১]

তিনি আরো বলেন– 'পাশ্চাত্যসভ্যতা আল্লাহর অস্তিত্ব খোল্লামখোল্লা অস্বীকার করে না, কিন্তু বাস্তবত এ সভ্যতার চিন্তা-ব্যবস্থায় আল্লাহর কোন স্থান এবং ঈশ্বরচিন্তার কোন অর্থবহতা নেই।'[২]

ইউরোপের সমাজসভ্যতা ও ধর্মব্যবস্থার এ বিপর্যস্ত চিত্র এমন এক ব্যক্তি পরিবেশন করছেন যিনি খৃস্টধর্ম (সম্ভবত ইহুদিধর্ম, অনুবাদক) ত্যাগ করে ইসলাম গ্রহণ করেছেন এবং পাশ্চাত্যের বস্তুবাদী জীবনের কাঁটাবন থেকে ইসলামের আধ্যাত্মবাদী জীবন-উদ্যানের ছায়ায় আশ্রয় গ্রহণ করেছেন, এটা যদি তাঁর বক্তব্যের মূল্যায়নের পথে বাধা হয় তাহলে আমাদের কাছে আরো জোরালো সাক্ষ্য রয়েছে, যা বুঝিয়ে দেবে যে, সত্যি সত্যি এ রাষ্ট্রধর্মটি তার প্রধানতম কেন্দ্রে প্রভাব ও প্রতাপ এবং সজীবতা ও প্রাণশক্তি হারিয়ে ফেলেছিলো। ফলে নতুন প্রজন্ম ধর্মের সঙ্গে সম্পর্ক ও সম্পৃক্তির ধারণাই প্রত্যাখ্যান করে বসেছিলো। আমরা এখানে যার সাক্ষ্য তুলে ধরবো তিনি ইউরোপের বরেণ্য শিক্ষাবিদ এবং ইংরেজীভাষার শীর্ষস্থানীয় লেখক-গবেষক। লন্ডন বিশ্ববিদ্যা-লয়ের দর্শন ও মনস্তত্ত্ব বিভাগের প্রধান প্রফেসর C.E.M joad তার সুবিখ্যাত গ্রন্থ Guide to Modern Wickedness এ বলেন–

'বিশোর্ধ্ব বিশজন ছাত্র-ছাত্রীর কাছে আমার প্রশ্ন ছিলো, তাদের কতজন ন্যূনতম অর্থে খৃস্টান? মাত্র তিনজনের উত্তর, হ্যাঁ। সাত-জনের মন্তব্য, বিষয়টি নিয়ে তারা কখনো ভাবেনি। বাকি দশজন পরিষ্কার ভাষায় বলেছে, খৃস্টধর্মের প্রতি তাদের বৈরী মনোভাব রয়েছে।

আমি মনে করি, খৃস্টধর্ম যারা মানে, আর মানে না তাদের মধ্যে এই যে অনুপাত, এ ভূখণ্ডে তা বিচ্ছিন্ন নয় এবং অস্বাভাবিকও নয়। তবে এটা ঠিক যে, পঞ্চাশ বা বিশবছর আগে এ প্রশ্ন একই ধরনের কোন দলকে করা হলে

[১] islam at the cross roads, p.50
[২] ঐ, প. ৪০

অনুপাতগত দিক থেকে উত্তর অনেক ভিন্ন হতো। সুতরাং বলা যায়, যারা ক্যানন ব্যারির সঙ্গে একমত যে, খৃস্টধর্মের কোন নবজাগরণ বিশ্বকে উদ্ধার করতে পারে, তাদের সংখ্যা কমতেই থাকবে। বস্তুত এ মতের পক্ষে আমি যুক্তির শক্তি দেখতে পাচ্ছি না। হতে পারে, এটা তার স্বপ্ন ও আকাঙ্ক্ষা। তবে বুঝতে হবে যে, স্বপ্ন চিন্তা ও ভাবনার জন্ম দিতে পারে; তথ্য, সাক্ষ্য ও যুক্তি সৃষ্টি করতে পারে না। পরিস্থিতি ও পূর্বলক্ষণ বরং এটাই প্রমাণ করে যে, আগামী শতকে খৃস্টীয় গীর্জার মৃত্যু ঘটবে। এ মতের সমর্থনে দৈনিক পত্রিকার একটি খবর তুলে ধরছি–

'সাতাত্তর বছর বয়সের এক ব্যক্তি একটি পদ্ধতি উদ্ভাবন করেছে, যা পবিত্র ধর্মগ্রন্থের প্রাচীন কপিগুলো কার্তুস, কৃত্রিম রেশম ও কাগজে মুদ্রার কাঁচামালে রূপান্তরিত করতে পারে। এ যন্ত্রটি কার্ডিফ ও অন্য আটটি কারখানায় স্থাপন করা হয়েছে এবং তাওরাতের প্রাচীন কপি দ্বারা রীতিমত যুদ্ধের অস্ত্র তৈরী করা শুরু হয়ে গেছে। আর উদ্ভাবক ভদ্রলোক, যিনি ছিলেন ফকীর, এ সুবাদে হয়ে গেলেন আমীর।'

মাননীয় প্রফেসর তার বক্তব্যের সমাপ্তি টেনেছেন তাওরাতেরই একটি বাক্য দ্বারা, আর আমার ধারণায় ক্যানন ব্যারির মত যাজক ও ধর্মনেতাদের সম্বোধন করার জন্য এর চেয়ে সুন্দর বাক্য আর হতে পারে না। বাক্যটি হলো, 'যার দু'টি কান আছে সে যেন শ্রবণ করে'।[১]

একই লেখক তার দ্বিতীয় গ্রন্থ Philosophy of Our Times-এ লিখেছেন–

'কয়েক শতাব্দী ধরে ইংল্যান্ডের চিন্তা-চেতনায় অর্থচাহিদা ও সম্পদ-লিপ্সা জেঁকে বসেছে। বস্তুত বিগত দু'শবছর সম্পদ অর্জনের চাহিদাই ছিলো এ দেশের কর্মোদ্যমের মূল চালিকাশক্তি ও প্রধান অনুঘটক। এখনো মানুষ রাজনীতি, শিল্প-সাহিত্য, চলচ্চিত্র ও বেতার প্রচার থেকে, এমনকি কখনো কখনো গীর্জার ধর্মীয় মঞ্চ থেকেও অর্থোপার্জন ও সম্পদসঞ্চয়ের প্রণোদনা ও প্ররোচনা পেয়ে আসছে। সর্বসূত্রে এখনো তাদের এ শিক্ষাই দেয়া হচ্ছে যে, সুসভ্য ও সমুন্নত জাতি তারাই যাদের মধ্যে সম্পদস্পৃহা চরমোৎকর্ষ লাভ করেছে।

এই যে সম্পদপূজা ও অর্থলিপ্সা, এটা আমাদের ধর্মবিশ্বাস ও ধর্মীয় চেতনার বিরোধী। কারণ ধর্ম হচ্ছে দারিদ্র্য-অনুরাগী এবং বিত্তপ্রাচুর্যের নিন্দাকারী। ধর্ম

[১] Guide to Modern Wickedness, p. 114-115

বলে, সততা ও পুণ্যমনস্কতায় একজন গরীব একজন ধনীর চেয়ে অগ্রগামী। এভাবে যদিও ধর্মপ্রজ্ঞা ও ধর্মীয় সুনীতির দৃষ্টিতে ঈশ্বর-উপাসনা ও স্বর্গপ্রবেশের জন্য দারিদ্র্যই অধিকতর উপযোগী, কিন্তু মানুষ 'ধর্মকথা' ও গীর্জীয় সুবচন অনুসরণে আগ্রহী নয়। এখনো তারা প্রতিশ্রুত স্বর্গীয় সম্পদের চেয়ে নগদ জাগতিক সম্পদেই বেশী আগ্রহী। সম্ভবত তাদের ধারণা, জীবনের শেষভাগে পাপস্বীকারের মাধ্যমেই তাদের পরকাল নিরাপদ হয়ে যাবে, যেমন স্ফীত 'ব্যাংকব্যালেন্স' দ্বারা জাগতিক জীবন ও ভোগ-উপভোগ নিশ্চিত হয়ে আছে। সমকালের এই সাধারণ চিন্তাকে স্যামুয়েল বাটলার তার গ্রন্থে এভাবে প্রকাশ করেছেন–

'কতিপয় অর্বাচীন লেখক-চিন্তাবিদ ভাবেন, একই মস্তিষ্কে যুগপৎ আমরা ঈশ্বর-চিন্তা ও বিত্তচিন্তা করতে পারি না। আমিও স্বীকার করি, তা সহজ নয়। কিন্তু পৃথিবীর কোন কাজটি কবে সহজ হয়েছে?!

মোটকথা, আমাদের নীতি ও বোধ যাই হোক, বিদ্যমান বাস্তবতা এটাই যে, আমরা বাটলার ও তার সমমতীদের জোরালো সমর্থক। অর্থলিপ্সা ও সম্পদা-সক্তিতে আমরা আকণ্ঠ নিমজ্জিত এবং আমাদের কার্যত বিশ্বাস, সম্পদই হচ্ছে ব্যক্তি ও রাষ্ট্রের বড়ত্বের সঠিক মানদণ্ড।

এই চিন্তা-চেতনা থেকেই পৃথিবীতে দু'টি চালিকানীতি জন্মলাভ করেছে এবং তাদের বিরাট ঐতিহাসিক গুরুত্ব রয়েছে। প্রথমত হস্তক্ষেপমুক্ত অর্থনীতির মৌলধারণা, যা উনিশশতকে অতি প্রবল ছিলো। এ মূলনীতির প্রবক্তারা দাবী করেন, সর্বোত্তম মুনাফাই হচ্ছে মানুষের যাবতীয় কর্মোদ্যোগের ভিত্তি। তাদের মতে হৃদয়ের আনন্দাবেগ কর্মের উৎস নয়, বরং সম্পদভোগের আনন্দই হচ্ছে মূল চালিকাশক্তি। দ্বিতীয় মূলনীতিটি বিশশতকে প্রায় অপ্রতিহত গতিতে ধেয়ে এসেছিলো, যা মার্কসীয় মতবাদরূপে পরিচিত। এ মূলনীতির শিরোনাম হলো অর্থবণ্টনব্যবস্থা এবং এর মূলকথা হলো, মানবসমাজে অর্থনৈতিক ব্যবস্থার উদ্ভবের মূল ভিত্তি হলো জীবনে অর্থের অনিবার্য প্রয়োজন। বস্তুত অর্থ-প্রয়োজন ও অর্থব্যবস্থাই ধর্ম, সাহিত্য, নীতি, চরিত্র, জ্ঞান ও যুক্তি এবং শাসন ও প্রশাসন-ব্যবস্থার জন্ম দেয়।

বলাবাহুল্য যে, এ দুই মতবাদের এ বিপুল জনপ্রিয়তা কিছুতেই সম্ভব হতো না, যদি নারী-পুরুষ নির্বিশেষে আমাদের দেশবাসী অতিসম্পদমুখী ও অর্থলিপ্সু না হতো। হাঁ, এটা এজন্যই সম্ভব হয়েছে যে, নারী-পুরুষ সবাই লক্ষণীয়ভাবে বিত্ত-

প্রাচুর্যকেই সৌন্দর্য ও জৌলুসের ভিত্তিরূপে গ্রহণ করেছে।'[১]

একই গ্রন্থের অন্যত্র তিনি বলেন–

'যে জীবনবোধ এ যুগের চিন্তা-চেতনাকে আচ্ছন্ন করে রেখেছে তা এই যে, জীবন ও জগতের সবকিছু 'পকেট ও পাকস্থলী'র দৃষ্টিকোণ থেকে বিচার্য। সুপ্রসিদ্ধ মার্কিন সাংবাদিক মিস্টার জনগুন্থার তার Inside Europe গ্রন্থে এ চরম বস্তুবাদী মানসিকতা বড় সুন্দরভাবে তুলে ধরেছেন, তিনি বলেন– 'ইংরেজজাতি সপ্তাহের ছয়দিন পূজা করে ব্যাংক অব ইংল্যান্ডের, আর সপ্তম দিন হাজিরা দেয় গীর্জায়।'

ইউরোপের বস্তুবাদী স্বভাব ও পরিণতি

এটা তো খুবই স্বাভাবিক যে, যারা অনন্ত জীবনে বিশ্বাসী নয়, তদুপরি ক্ষণস্থায়ী জীবনের ক্ষণিক ভোগ-বিলাস এবং ব্যক্তিগত ও জাতীয় উচ্চাভিলাষ ছাড়া যাদের মহৎ কোন লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য নেই এবং যাদের অন্তরে আল্লাহর প্রতি ভয় ও ভালোবাসা নেই তাদের কাছে কীভাবে আশা করা যায় যে, বিপদে দুর্যোগে ও ঝড়তুফানের মুখে তারা আল্লাহকে ডাকবে এবং আল্লাহর কাছে কাকুতি-মিনতি ও আত্মনিবেদন করবে! দেখুন, আল্লাহকে বিশ্বাস করতো বলে মুশরিকরাও বিপদে যেভাবেই হোক আল্লাহকে ডাকতো। কোরআন বলছে–

وَإِذَا غَشِيَهُم مَّوْجٌ كَالظُّلَلِ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ فَلَمَّا نَجَّاهُمْ إِلَى الْبَرِّ

فَمِنْهُم مُّقْتَصِدٌ ۚ وَمَا يَجْحَدُ بِآيَاتِنَا إِلَّا كُلُّ خَتَّارٍ كَفُورٍ ﴿٣٢﴾

'আর যখন বিশাল ঢেউ মেঘের মত তাদের ঢেকে ফেলে তখন তারা আল্লাহকে ডাকে শুধু তাঁর প্রতি নিবেদিত হয়ে, অনন্তর যখন তিনি তাদের স্থলভাগের দিকে উদ্ধার করেন, তখন তাদের একদল হয় সংযমী, আর আমার আয়াতসমূহ অস্বীকার করতে পারে না বিশ্বাসঘাতক, অকৃতজ্ঞ ছাড়া কেউ।' (লুকমান, ৩১ : ৩২)

কিন্তু ইউরোপের এ জনগোষ্ঠী বস্তুবাদী চিন্তা-চেতনায় এতই আচ্ছন্ন এবং জড়-জাগতিক 'কার্যকারণ-দর্শন'-এ এমনই অভ্যস্ত, সর্বোপরি তাদের অন্তর এতই

[১] philosophy for our times, pp. 338-40

আল্লাহবিমুখ, এতই রুক্ষ-কঠিন ও অনুভূতিহীন যে, কোরআনের এ আয়াতের তারাই যেন বাস্তব চিত্র, বরং তাদেরই সম্পর্কে যেন তা নাযিল হয়েছে। আল্লাহ বলছেন–

وَلَقَدْ أَرْسَلْنَآ إِلَىٰٓ أُمَمٍ مِّن قَبْلِكَ فَأَخَذْنَٰهُم بِٱلْبَأْسَآءِ وَٱلضَّرَّآءِ لَعَلَّهُمْ يَتَضَرَّعُونَ ﴿٤٢﴾ فَلَوْلَآ إِذْ جَآءَهُم بَأْسُنَا تَضَرَّعُوا۟ وَلَٰكِن قَسَتْ قُلُوبُهُمْ وَزَيَّنَ لَهُمُ ٱلشَّيْطَٰنُ مَا كَانُوا۟ يَعْمَلُونَ ﴿٤٣﴾

'আর আপনার পূর্বে বিভিন্ন জাতির কাছে আমি অহী প্রেরণ করেছি (কিন্তু তারা তা গ্রহণ করেনি), অনন্তর তাদের আমি পাকড়াও করেছি বিপদ ও দুর্যোগ দ্বারা, যাতে তারা কাকুতি-মিনতি করে। তো কত না ভালো হতো, যদি তারা বিগলিত হতো তাদের কাছে আমার 'পরাক্রম' নেমে আসার পর, কিন্তু হৃদয় তাদের কঠিন হয়ে গিয়েছিলো, আর তারা যা করতো, শয়তান তাদের সামনে তা মনোহররূপে তুলে ধরেছিলো।' (আল-আন'আম, ৬ :৪২-৪৩)

অন্য আয়াতে–

وَلَقَدْ أَخَذْنَٰهُم بِٱلْعَذَابِ فَمَا ٱسْتَكَانُوا۟ لِرَبِّهِمْ وَمَا يَتَضَرَّعُونَ ﴿٧٦﴾ حَتَّىٰٓ إِذَا فَتَحْنَا عَلَيْهِم بَابًا ذَا عَذَابٍ شَدِيدٍ إِذَا هُمْ فِيهِ مُبْلِسُونَ ﴿٧٧﴾

'আর অবশ্যই পাকড়াও করেছিলাম তাদেরকে আযাব দ্বারা, কিন্তু তারা বিনীত হয়নি তাদের প্রতিপালকের প্রতি এবং কাকুতি-মিনতি করেনি। এমনকি যখন আমি কঠিন আযাবের একটি দরজা তাদের উপর খুলে দেই, তখন তারা দিশেহারা হয়ে পড়ে।' (আল-মুমিনূন, ২৩ : ৭৫-৭৬)

উপরের আয়াতদু'টির আয়নায় ইউরোপের চিত্র ও চরিত্র অবলোকন করুন। বিশ্বযুদ্ধের কঠিন সঙ্কটকালে ইউরোপের বিভিন্ন দেশের শাসক ও রাষ্ট্রনায়ক জাতির উদ্দেশ্যে যেসব ভাষণ ও বক্তব্য-বিবৃতি দিতেন তাতে বিগলিত হৃদয়ে সাহায্যের জন্য আল্লাহর প্রতি আত্মনিবেদন ও কাকুতি-মিনতির কোন ভাব ও ছাপ আপনি দেখতে পাবেন না। একই ভাবে জাতি ও জনগোষ্ঠীর চরিত্র ও কর্ম-কাণ্ডেও এর কোন ছোঁয়া ও চিহ্ন খুঁজে পাবেন না। সবসময় তারা মত্ত ছিলো

মওজ ও মজা, ফুর্তি ও স্ফূর্তি এবং গরম হৈহুল্লোড়ে; এমনকি তখনো যখন নেমে আসতো মৃত্যুর বিভীষিকা। পাশ্চাত্যের লেখক, সাহিত্যিক ও চিন্তাবিদগণ এটাকে চরম প্রতিকূলতার মুখে অদম্য সাহস ও মনোবল বলে গর্ব ও গৌরব বোধ করেন। ব্রিটিশ পার্লামেন্টে শীর্ষস্থানীয় জনৈক নেতা গর্বভরে বলেছেন, 'ব্রিটিশ-জাতি কোন পরিস্থিতি ও দুর্যোগের সামনে কখনো ভাঙেনি এবং মচকায়ওনি। তারা সটান দাঁড়িয়ে থেকেছে মাথা উঁচু করে।' প্রমাণরূপে তিনি বলেন– 'সিঙ্গাপুরের আকাশ থেকে যখন ঝাঁকে ঝাঁকে জাপানী বোমা পড়েছে তখনো সেখানে বৃটিশদের নাচগান ও আনন্দ-বিনোদনে ছেদ পড়েনি এবং কোন অনুষ্ঠান বন্ধ হয়নি।'
কিন্তু আল্লাহর প্রতি বিশ্বাসে নিবেদিত একজন মুমিনের দৃষ্টিতে এটা সাহস ও সাহসিকতা এবং মন ও মনোবলের দৃঢ়তা নয়, বরং এটা মুর্দাদিলের কঠিনতা, আত্ম-বিস্মৃতি ও ভোগস্ফূর্তির উন্মত্ততা।

ইউরোপপ্রবাসী জনৈক ভারতীয় 'লণ্ডনের একটি রাত' শিরোনামে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে বিমানহামলাকালীন স্মৃতিকথায় লিখেছেন–

'দিন-রাতের লাগাতার বিমানহামলায় অতিষ্ঠ হয়ে আমি ও বন্ধুরা ঐ রাতে নাচগানের একটি জমকালো জলসার আয়োজন করলাম। আমরা যখন উদ্দাম আনন্দে উন্মত্ত তখন হঠাৎ বিমান হামলার সাইরেনে জলসা স্তব্ধ হয়ে গেলো। বিহ্বলতা কাটিয়ে ওঠার পর একজন জানতে চাইল, 'চলবে, না বন্ধ?' সবার আগে ফুর্তিবাজ এক তরুণী বলে উঠলো, 'মরতে হয় নেচে-গেয়ে হেসে-খেলেই মরি!' ব্যস, নাচে-গানে, উদ্দাম আনন্দে জলসা আবার উন্মাতাল হয়ে উঠলো। জলসা তো জলসা, পুরো এলাকা যেন উল্লাসে উচ্ছ্বাসে ফেটে পড়লো।'[১]
লেখক আরো বলেন, 'এর পর তো রেওয়াজ হয়ে গিয়েছিলো যে, সন্ধ্যায় সাইরেন বাজতো, বিমান আসতো, আলো নিভতো, কামান গর্জে উঠতো এবং অন্ধকার আকাশে আতশবাজির ফুলঝুরি শুরু হতো। তখন প্রেক্ষাগৃহে ছবিপ্রদর্শনের মাঝখানে পর্দায় লেখা ভেসে উঠতো, 'বিমানহামলা চলছে, ছবিও চলবে, কেউ আশ্রয়কেন্দ্রে যেতে চাইলে রাস্তা বামে নীচের দিকে।' কিন্তু কেউ উঠতো না, ছবির প্রদর্শন যথারীতি চলতে থাকতো।'[২]

---

[১] الغارات الجوية، للأستاذ آغا محمد أشرف الدهلوي পৃ.৭১
[২] ঐ, পৃ. ৭০

রঙ্গতামাশা ও ফুর্তিবাজির এই উন্মাদনা এবং গাফলত ও আত্মবিস্মৃতির এই নির্জীবতার নমুনা প্রাচীন গ্রীস ও রোমের সমাজজীবনেই শুধু পাওয়া যায়। ইতিহাসের পাতায় আছে, পাম্পেই নগরীর জেগে ওঠা আগ্নেয়গিরি যখন লাভা উদ্গীরণ শুরু করলো তখন একদিকে আকাশ থেকে অগ্নিবৃষ্টি হচ্ছে, অন্যদিকে গলিত লাভার প্রবাহ ধেয়ে আসছে। সময় তখন বিকেল। বিশহাজার দর্শক-ধারণক্ষমতার বিশাল এমফি থিয়েটার পরিপূর্ণ। হিংস্র পশুর দন্ত-নখরের আঘাতে জীবন্ত মানুষের ছিন্নভিন্ন হওয়ার বীভৎস দৃশ্য সবাই পাশবিক আনন্দে উপভোগ করছে। ঠিক তখন হলো ভূমিকম্প। যে যেখানে ছিলো, ভস্ম হয়ে গেলো। যারা বের হতে পারলো তারা ধাক্কাধাক্কি ও ঠোকাঠুকিতে এবং পদপিষ্ট হয়ে খতম হলো। অল্পক'জন ভাগ্যবান শুধু নৌকা ও জলযানে করে প্রাণ বাঁচাতে পেরেছিলো। সুদীর্ঘ আঠারোশ বছর শহরটি পৃথিবীর মানচিত্র থেকে অপসৃত ছিলো। উনিশ শতকে এসে জানা গেলো, শহরটি নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়নি, গলিত লাভার নীচে চাপা পড়েছে শুধু। দীর্ঘ খননকার্যের পর কুদরতের ইনতিকাম ও প্রতিশোধের জীবন্ত নমুনারূপে পুরো শহরটি আবার যেমন ছিলো, পৃথিবীর মানচিত্রে ভেসে উঠলো। আলকোরআনের সতর্কবাণী–

أَوَأَمِنَ أَهْلُ ٱلْقُرَىٰٓ أَن يَأْتِيَهُم بَأْسُنَا ضُحًى وَهُمْ يَلْعَبُونَ ۝ أَفَأَمِنُوا۟ مَكْرَ ٱللَّهِ ۚ فَلَا يَأْمَنُ مَكْرَ ٱللَّهِ إِلَّا ٱلْقَوْمُ ٱلْخَٰسِرُونَ ۝

'জনপদের অধিবাসীরা কি এ বিষয়ে নির্ভয় যে, তাদের কাছে আসবে না আমার আযাব পূর্বাহ্ণবেলা, যখন তারা খেলাধূলায় মশগুল থাকবে! তারা কি নির্ভয় হয়ে গেছে আল্লাহর 'মকর' থেকে! তো নির্ভয় হয় না আল্লাহর মকর থেকে ক্ষতিগ্রস্ত সম্প্রদায় ছাড়া কেউ।' (আল-আ'রাফ, ৭ : ৯৮-৯৯)

যুদ্ধের বিভীষিকার সময়, যখন মাতালেরও নেশা কেটে যায় এবং পাষাণ হৃদয়ও বিগলিত হয়ে আল্লাহকে স্মরণ করে, তখন ব্রিটেনের প্রধানমন্ত্রী মিস্টার চার্চিল যেভাবে বর্ষবিদায় ও বর্ষবরণ উদ্‌যাপন করেছেন তার বিবরণ রয়টারের সংবাদদাতার মতে–

'ওয়াশিংটন। পয়লা জানুয়ারী, ১৯৪২। গত রাতে বিদায়ী বছর ও নতুন বছর যখন এক বিন্দুতে, মিস্টার চার্চিল তখন সরকারি ট্রেনে কানাডা থেকে যুক্তরাষ্ট্রের পথে। মিস্টার চার্চিল স্যার সারলিস বারটালকে সঙ্গে করে অকস্মাৎ ট্রেনের রেস্টুরেন্টে প্রবেশ করলেন। মুখে সিগার, হাতে শ্যাম্পেন। সফরসঙ্গীরা দেখে অবাক! কারণ যুদ্ধ তখন ঘোরতর। মিস্টার চার্চিল মৃদু হেসে গ্লাসে চুমুক দিয়ে বললেন, 'বিদায়ী বছর ১৯৪১-এর নামে পান করছি; সেই বছর যা আমাদের নিয়ে এসেছে পরিশ্রম, ক্লান্তি ও বিজয়ের দিকে।' তখনই ঘড়িতে বিদায়ী বছর শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করলো এবং নতুন বছর প্রথম শ্বাসটি গ্রহণ করলো। সবাই চার্চিলকে অভিনন্দন জানালো। আর তিনি দুই সফরসঙ্গীকে দু'হাতে ধরে নৃত্যের তালে তালে গান গাইলেন। পরে দরজার দিকে অগ্রসর হয়ে বললেন, আপনারা আনন্দিত থাকুন। ঈশ্বর আমাদের বিজয় দান করুন। সকলে তখন তুমুল করতালি ও উদ্দাম নৃত্যের মধ্যে গান গাইতে লাগলো, আর মিস্টার চার্চিল ভি চিহ্ন প্রদর্শন করে উৎফুল্লচিত্তে আপন কম্পার্টমেন্টে ফিরে গেলেন।'

ধর্মহীন ও বস্তুবাদী স্বভাব ও প্রবণতার এই যে নগ্ন প্রকাশ ইউরোপীয় জীবনের সবত্র, এর সঙ্গে ধর্মীয় শিক্ষা ও চিন্তা-চেতনাকে তুলনা করুন। আল্লাহকে যারা বিশ্বাস করে এবং ভয় করে, যুদ্ধবিগ্রহ ও বিপদ-দুর্যোগের সময় তাদের আচরণ ও কর্মপন্থা কত ভিন্ন তা কিছুটা হলেও বোঝা যায় কোরআনের এই আয়াতে–

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓا۟ إِذَا لَقِيتُمْ فِئَةً فَٱثْبُتُوا۟ وَٱذْكُرُوا۟ ٱللَّهَ كَثِيرًا لَّعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ۝

'হে ঈমানদারগণ, যখন তোমরা কোন দুশমনদলের সম্মুখীন হও তখন অবিচল থেকো, আর আল্লাহকে বেশী করে স্মরণ করো, যাতে তোমরা সফলকাম হও।' (আল-আনফাল, ৪৫)

ছাহাবা কেরাম বলেন, 'যখন কোন পেরেশানির বিষয় ঘটতো, নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সঙ্গে সঙ্গে নামাযে দাঁড়িয়ে যেতেন। সীরাতে ইবনে হিশামে গাযওয়ায়ে বদরপ্রসঙ্গে আছে, নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ছাহাবা কেরামের সারি সোজা করলেন, তারপর 'আরীশ'-এ দাখেল হলেন। সেখানে তাঁর সঙ্গে শুধু আবু বকর (রা) ছিলেন, অন্য কেউ ছিলো না। তিনি তখন জারজার কাঁদলেন এবং আল্লাহ তা'আলা বিজয়ের যে ওয়াদা করেছেন তা পূর্ণ করার মিনতি জানালেন। তাঁর একটি নিবেদন ছিলো–

اللهم إن تهلك هذه العصابة اليوم لا تعبد

'হে আল্লাহ, যদি আজ এই জামা'আত হালাক হয়ে যায় তাহলে তো তোমার ইবাদত হবে না!'[১]

বিভিন্ন ঐতিহাসিক, বুদ্ধিবৃত্তিক ও স্বভাবগত অনিবার্য কারণে ইতিহাসের প্রাচীনতম সময় থেকেই জড়বাদ ও বস্তুবাদই হয়ে পড়েছিলো পাশ্চাত্যের জীবন ও সভ্যতার প্রতীক। ইউরোপের রাজনৈতিক ও বুদ্ধিবৃত্তিক নব-উত্থান সেটাকে নতুন গতি ও শক্তি দান করেছে মাত্র। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের বহু বিদগ্ধ পণ্ডিত পাশ্চাত্যসভ্যতার এ বস্তুবাদী বৈশিষ্ট্যটি সম্যক অনুধাবন করতে পেরেছেন। প্রাচ্যের বিদগ্ধ জ্ঞানী ও দূরদর্শী পর্যটক আব্দুর রহমান আলকাওয়াকিবী বর্তমান শতাব্দীর শুরুতে রচিত طبائع الاستبداد গ্রন্থে লিখেছেন–

'পাশ্চাত্যের জীবন আগাগোড়া বস্তুবাদী জীবন। মানুষ সেখানে নিছক বস্তুবাদের পূজারী। স্বভাবে কঠোর, আচরণে কঠিন, সম্পর্কে বিষয়ী, অতি আত্মকেন্দ্রিক এবং অতি প্রতিশোধপরায়ণ। প্রাচ্যের খৃস্টবাদ যে সকল উচ্চতর মানবিক গুণ ও বৈশিষ্ট্য এবং ভাব ও আবেগ তাকে দান করেছিলো তার কিছুই যেন এখন অবশিষ্ট নেই।

জার্মানদের কথা বলি; স্বভাবে প্রকৃতিতে খুবই নিষ্ঠুর। তারা মনে করে, দুর্বলের বেঁচে থাকার অধিকার নেই; মৃত্যুই তার প্রাপ্য। তাদের দৃষ্টিতে সকল মহত্ত্বের মূলে হচ্ছে 'শক্তি', আর শক্তির উৎস সম্পদ। জ্ঞান ও বুদ্ধিচর্চায় তারা আগ্রহী এবং গৌরব ও মর্যাদা অর্জনে বদ্ধপরিকর, তবে সম্পদ লাভের জন্য।

ল্যাটিন ও ইটালীয়রা স্বভাবতঃ আত্মতুষ্ট ও রগচটা। তারা ভাবে, বুদ্ধির পরিচয় হলো বাধাবন্ধনহীনতায়, জীবনের সার্থকতা হলো লজ্জাহীনতায় এবং মর্যাদা হলো পোশাক-সৌন্দর্যে, আর প্রতিপত্তি হলো প্রাধান্য অর্জনের মধ্যে।'

পাশ্চাত্যের স্বভাব ও প্রকৃতি এবং ভাবধারা ও মনস্তত্ত্বের এটি হচ্ছে সবচে' নির্ভুল ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ ও নিখুঁত চিত্রাঙ্কন। আমরা মনে করি, মরহূম আলকাওয়াকিবী নিছক উদাহরণ হিসাবে জার্মান-ইটালী দুই জনগোষ্ঠীর কথা বলেছেন, অন্যথায়

---

[১] راجع زاد المعاد و كتب السيرة، ورواه مسلم عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه في كتاب الجهاد والسير، والترمذي في كتاب تفسير القرآن، وأحمد في مسنده (مسند العشرة المبشرين بالجنة

কিছু পার্শ্ববিষয় ও কিছু জাতীয় বৈশিষ্ট্য বাদে বস্তুপূজা, সম্পদলিপ্সা, আত্মকেন্দ্রিকতা, স্বার্থপরতা, আচরণের কঠোরতা ইত্যাদি ক্ষেত্রে পাশ্চাত্যের সমস্ত জাতি অভিন্ন।

আধ্যাত্মিক ও বুদ্ধিবৃত্তিক আন্দোলনেও বস্তুবাদী চিন্তাচেতনা!

এই যে বস্তুবাদী চেতনা, এটা আপনি ইউরোপের ঐসব রাজনৈতিক, সামাজিক ও নৈতিক ব্যবস্থার মধ্যেই দেখতে পাবেন, যা এ যুগে ইউরোপীয় জনগোষ্ঠীর হাতে অস্তিত্ব লাভ করেছে; এমনকি যে আধ্যাত্মিক আন্দোলন সম্প্রতি ইউরোপে বিরাট চমক ও আলোড়ন সৃষ্টি করেছে সেটারও মূল প্রাণ হচ্ছে সেই একই বস্তুবাদী মানসিকতা। অন্যসব শিল্প ও বিজ্ঞানের মত এটাও হয়ে পড়েছে নিছক একটি আর্ট ও সাইন্স, যার আসল উদ্দেশ্য হচ্ছে আত্মজগতের রহস্য ও বিস্ময় উদ্ঘাটন এবং আত্মিক বিনোদনরূপে 'মৃত-আত্মা'র সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপন ও কথোপকথন, যা প্ল্যানচেট নামে ইউরোপে এখন খুবই জনপ্রিয় একটি আদি-ভৌতিক বিজ্ঞান, যাতে রয়েছে হিমালয়ের উচ্চতা জয় করার মত অভিযান-রোমাঞ্চ।

হৃদয় ও আত্মার সংশোধন, আল্লাহর ভয় ধারণ, সততা ও পুণ্যের পথ অবলম্বন, মৃত্যুর প্রস্তুতি গ্রহণ এবং আল্লাহর প্রতি আত্মনিবেদনের মাধ্যমে জীবনের বেদনা ও যন্ত্রণা এবং বিপদ-প্রতিকূলতার মুখে ধৈর্য ও স্থৈর্যের শিক্ষা গ্রহণ করার সঙ্গে এর দূরতম সম্পর্কও নেই। পক্ষান্তরে ইসলামী প্রাচ্যের তাসাওউফ ও আধ্যাত্মবাদের মূল প্রাণ ও প্রেরণাই হচ্ছে আত্মসংযম ও আত্মসংশোধনের মাধ্যমে স্রষ্টার নৈকট্য অর্জন।

একই ভাবে পাশ্চাত্যের মানুষ যেসকল কাজে প্রাণ ও সম্পদ বিসর্জন দেয়, দু'একটি ব্যতিক্রম বাদে সেগুলোর পিছনেও বস্তুবাদী চিন্তা-চেতনা ও জাগতিক লক্ষ্য-উদ্দেশ্য ক্রিয়াশীল থাকে। যেমন স্তুতি ও সুখ্যাতি অর্জন করা, জাতির গর্ব ও গৌরবের পাত্র হওয়া এবং ইতিহাসের পাতায় অমরত্ব লাভ করা, এমনকি লোকলজ্জা ও নিন্দাভয়ও এর কারণ হতে পারে। পক্ষান্তরে ইসলামী প্রাচ্যে যে কোন ত্যাগ ও আত্মত্যাগের উদ্দেশ্য হয় আল্লাহর সন্তুষ্টি ও আখেরাতের মুক্তি। তাই একজন মুসলিম সবসময় এ আশঙ্কায় থাকে যে, তার আমল যেন কোন জাগতিক চাহিদার দোষে দূষিত এবং রিয়া ও যশলিপ্সার কলঙ্কে কলঙ্কিত না হয়ে পড়ে। তাহলে তো বরবাদিই হবে একমাত্র পরিণতি। তার চিন্তায় আল্লাহ তা'আলার এ সতর্কবাণী সর্বদা জাগরূক থাকে –

قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُم بِٱلْأَخْسَرِينَ أَعْمَٰلًا ﴿١٠٣﴾ ٱلَّذِينَ ضَلَّ سَعْيُهُمْ فِى ٱلْحَيَوٰةِ ٱلدُّنْيَا وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا ﴿١٠٤﴾ أُو۟لَٰٓئِكَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا۟ بِـَٔايَٰتِ رَبِّهِمْ وَلِقَآئِهِۦ فَحَبِطَتْ أَعْمَٰلُهُمْ فَلَا نُقِيمُ لَهُمْ يَوْمَ ٱلْقِيَٰمَةِ وَزْنًا ﴿١٠٥﴾

'আপনি বলুন, আমি কি তোমাদের অবহিত করবো ঐ লোকদের সম্পর্কে যারা আমলের দিক থেকে অধিকতর ক্ষতিগ্রস্ত! (ওরা তারাই) দুনিয়ার জীবনে যাদের কর্মপ্রচেষ্টা ব্যর্থ হয়ে গেছে, অথচ তারা ভাবে যে, তারা উত্তম আমল করছে। ওরাই তারা যারা অস্বীকার করেছে তাদের প্রতিপালকের আয়াতসমূহ এবং (অস্বীকার করেছে) তাদের প্রতিপালকের সঙ্গে সাক্ষাতের বিষয়টি। ফলে বরবাদ হয়ে গেছে তাদের আমল। তাই কেয়ামতের দিন তাদের (আমলকে) আমি কোনই মূল্যদান করবো না।' (সূরাতুল কাহফ, ১৮ : ১০৩ – ১০৫)

তাদের চিন্তায় আরো জাগরূক থাকে এই আয়াত–

وَقَدِمْنَآ إِلَىٰ مَا عَمِلُوا۟ مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَٰهُ هَبَآءً مَّنثُورًا ﴿٢٣﴾

'এবং (দুনিয়াতে) এরা যে কোন আমল করেছে, আমি সেগুলোর দিকে অগ্রসর হবো, অনন্তর বানিয়ে দেবো সেগুলোকে উড়ন্ত ধূলিকণা।' (আল-ফোরকান, ২৫ : ২৩)

নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জিজ্ঞাসা করা হলো যে, কেউ লড়াই করে বীরত্বের কারণে, কেউ লড়াই করে জোশ ও জাযবার কারণে, আর কেউ লড়াই করে খ্যাতি ও সুখ্যাতির জন্য। এগুলোর কোনটি আল্লাহর রাস্তায় বলে গণ্য হবে? তিনি বললেন–

من قاتل لتكون كلمـــة الله هي العليا فهو في سبيل الله

যে লড়াই করবে শুধু এ জন্য যে, আল্লাহর কালিমা বুলন্দ হোক, সেটাই শুধু আল্লাহর রাস্তায় বলে গণ্য হবে।[১]

---

[১] رواه البخاري في كتاب العلم، وفي كتاب الجهاد والسير، وفي كتاب فرض الخمس، وفي كتاب التوحيد، ومسلم في كتاب الإمارة، والترمذي في كتاب فضائل الجهاد، وابن ماجه في كتاب الجهاد

হযরত ওমর (রা.) এভাবে দু'আ করতেন–

اللهم اجعل عملي كله صالحا، واجعلـــه كلـــه لوجهك خالصا، ولا تجعل لغيرك فيـــه شيئا .

'হে আল্লাহ, আমার সব আমলকে তুমি নেক আমল বানিয়ে দাও এবং আমার সব আমলকে তুমি তোমার সন্তুষ্টির জন্য খালিছ করে নাও; তাতে তোমার গায়রের জন্য কিছুই রেখো না।'

এছাড়া যুগে যুগে উম্মাহর নেককার লোকদের যে প্রাণান্ত প্রচেষ্টা ছিলো নিজেদের আমল-ইবাদাত, দান-ছাদাকা ও সদাচার গোপন রাখার, সেসব কাহিনী তো ইতিহাসের পাতায় ভরপুর!

অর্থনীতির সর্বগ্রাসিতা

জড়বাদী চিন্তা ও বস্তুবাদী চেতনা ইউরোপে এমনই এক সর্বগ্রাসী রূপ ধারণ করেছিলো যে, এরই যূপকাষ্ঠে তারা নিজেদের হৃদয় ও আত্মা এবং প্রাণ ও প্রাণ-সত্তাকে বলি দিয়েছিলো। ফলে জীবনের সর্বক্ষেত্রে বস্তুগত মূল্যবোধ ছাড়া আর সবকিছু তারা সম্পূর্ণ বিস্মৃত হয়েছিলো। তাসাওউফের পরিভাষা 'ফানা ফিল্লাহ'-এর অনুকরণে বলা যায়, ইউরোপ ও তার সমস্ত জনগোষ্ঠী এক্ষেত্রে 'ফানা ফিল মাদ্দাহ'- (জড়বস্তুর জন্য আত্মবিলীনতা)-এর স্তরে উপনীত হয়েছিলো। এককথায় অর্থ ও অর্থনীতিই ছিলো তাদের জীবনের সর্বেশ্বরবাদ বা 'ওয়াহদাতুল অজূদ'।

উদাহরণ হিসাবে আমরা সমাজতান্ত্রিক দর্শনের জনক কার্লমার্ক্স-এর কথা বলতে পারি। তিনি মনে করেন, অর্থব্যবস্থাই হলো সমাজব্যবস্থার মূল প্রাণ। এছাড়া ধর্ম, দর্শন, সভ্যতা, শিল্প, ললিতকলা ইত্যাদি, জীবনের অঙ্গনে আর যা কিছু আছে সব এই অর্থব্যবস্থারই প্রতিবিম্ব ও প্রতিক্রিয়া মাত্র। তিনি বলেন, মানব-ইতিহাসের প্রতিটি যুগে, প্রতিটি অধ্যায়ে পণ্য উৎপাদনের নিজস্ব পন্থা ও পদ্ধতি ছিলো এবং সে আলোকেই সামাজিক সম্পর্কসমূহ নির্ধারিত হয়েছে। কিন্তু কিছু দূর গিয়ে সম্পর্কগুলো উৎপাদনব্যবস্থার সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ থাকে না, (বৈষম্যপূর্ণ হয়ে যায়)। তখন একদল (স্বাভাবিকভাবেই ক্ষতিগ্রস্ত দল) সামাজিক সম্পর্ক-গুলোকে নতুন বিন্যাসদানের প্রচেষ্টা চালায়, ইতিহাসে যা বিভিন্ন বিপ্লব ও বিদ্রোহ নামে পরিচিত, কিন্তু ঐতিহাসিকরা এসব বিপ্লব-বিদ্রোহের রূপ ও স্বরূপ

বুঝতে ব্যর্থ হয়েছেন। তবে তাতে আশ্চর্যের কিছু নেই। কেননা যারা এসব বিপ্লব-বিদ্রোহ করেছেন, বা তাতে অংশ নিয়েছেন, হয়ত তারাও সেগুলোর উদ্দেশ্যটি অনুধাবন করতে পারেননি। তবে পরবর্তীকালে আমাদের পক্ষে এই ধাঁধার সমাধান বের করা সম্ভব। অর্থাৎ আমরা বুঝতে পারি যে, সমগ্র রাজনৈতিক বিবর্তন এবং বিভিন্ন রাজনৈতিক ব্যবস্থার অব্যাহত পরিবর্তন ও সংশোধন, এগুলো মূলত সামাজিক সম্পর্কসমূহের পুনর্বিন্যাসেরই নব নব রূপ, যার অভ্যুদয় ঘটেছে শুধু এজন্য যে, নতুন উৎপাদন ব্যবস্থার সঙ্গে এই সম্পর্ক-গুলোকে যেন নতুনরূপে সুসঙ্গত ও সুবিন্যস্ত করা যায়। আর যেহেতু পণ্য উৎপাদনের ব্যবস্থা এবং তার ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত সামাজিক সম্পর্ক– এ দু'য়ের মধ্যে পার্থক্য ও ভিন্নতা অব্যাহত রয়েছে সেহেতু এ দু'য়ের মধ্যে সঙ্গতি-বিধানের প্রয়াস-প্রচেষ্টাও অব্যাহত রয়েছে। তবে পার্থক্য যখনই সীমা ছাড়িয়ে যায় এবং বিভেদ তীব্র হয়ে ওঠে তখন প্রতিক্রিয়াটিও বিপ্লব-বিদ্রোহের রূপ ধারণ করে। কিন্তু বিভেদ ও পার্থক্য স্পষ্ট না হলেই তার অস্তিত্ব অস্বীকার করা সঙ্গত হবে না।

পণ্য-উৎপাদনের বিভিন্ন ব্যবস্থা এবং বিভিন্ন সামাজিক সম্পর্কের মধ্যে এই যে পার্থক্য ও প্রভেদ, তা শ্রেণীসঙ্ঘাতের মাধ্যমে প্রকাশ পায়। কেননা সমাজের সমস্ত শ্রেণী মূলত অর্থনৈতিক ব্যবস্থারই বিভিন্ন অঙ্গ।'

এ চিন্তাধারা থেকে কার্লমার্ক্স সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন যে, মানবজাতির শৈশব-যুগটুকু বাদ দিলে তার সুদীর্ঘ ইতিহাস সমাজে শ্রেণীসংগ্রামের ইতিহাস ছাড়া আর কিছুই নয়।

মোটকথা এভাবে ভদ্রলোক অর্থনৈতিক জীবন ছাড়া মানুষের জীবনের অন্যান্য দিকের অস্তিত্বই অস্বীকার করে বসেছেন। ধর্ম ও চরিত্র, হৃদয় ও আত্মা, এমনকি বিবেক-বুদ্ধিকেও তিনি গুরুত্ব দিতে প্রস্তুত ছিলেন না। কখনো তিনি স্বীকার করেননি যে, অর্থনীতির বাইরে এগুলোর কোন একটি কখনো ইতিহাসের কোন অনুঘটকরূপে ভূমিকা পালন করেছে। তার মতে ইতিহাসে যত যুদ্ধ ও বিপ্লব ঘটেছে সেগুলো আর কিছু ছিলো না, ছিলো শুধু প্রতিশোধস্পৃহা; বৃহৎ ও পূর্ণ উদর থেকে ক্ষুদ্র ও শূন্য উদরের প্রতিশোধ গ্রহণের অব্যাহত প্রচেষ্টা এবং অর্থনৈতিক ব্যবস্থা ও পণ্য-উৎপাদনের ব্যবস্থাসমূহের মধ্যে নতুন কোন বিন্যাস প্রতিষ্ঠার নিরন্তর সংগ্রাম। এমনকি ধর্মীয় যুদ্ধগুলোও তার মতে বিভিন্ন অর্থনৈতিক শ্রেণীর পরস্পর সঙ্ঘাত ছাড়া আর কিছু ছিলো না, যেখানে একটি

শ্রেণী সম্পদের উৎস ও উৎপাদন-ব্যবস্থা কুক্ষিগত করে রেখেছিলো, আর অন্য শ্রেণী হয়ে উঠেছিলো তার প্রতিদ্বন্দ্বী এবং কোমর বেঁধে নেমেছিলো 'সম্পদ ও সম্পর্ক' পুনর্বিন্যস্ত করার মাধ্যমে অধিকার প্রতিষ্ঠার প্রচেষ্টায়। ফলে সঙ্ঘাত-সঙ্ঘর্ষ হয়ে উঠেছে অনিবার্য, কিন্তু তার স্বরূপ চাপা পড়ে গিয়েছে ধর্মযুদ্ধের আড়ালে।

তাহলে বলতে হয়, কার্লমার্ক্স-এর দৃষ্টিতে বদর, অহুদ ও কাদিসিয়া, ইয়ার্মুক এবং এজাতীয় আরো যত যুদ্ধের বিবরণ ইতিহাস সংরক্ষণ করেছে সেগুলো অর্থনৈতিক শ্রেণীসংগ্রাম ছাড়া আর কিছুই ছিলো না। (কিন্তু তাতে ভদ্রলোকের মস্তিষ্কের সুস্থতা সম্পর্কে সন্দেহ উপস্থিত হতেই পারে।)

তো এই হচ্ছে আপনার ইউরোপের বস্তুবাদী আধ্যাত্মিকতা এবং 'অর্থনৈতিক সর্বেশ্বরবাদের' দর্শন।

তাসাওউফের পরিভাষায় বিষয়টিকে আমরা এভাবেও উপস্থাপন করতে পারি যে, প্রাচ্যের উপর যেহেতু আধ্যাত্মিক চেতনা ও ঈশ্বরচিন্তার একক প্রভাব ছিলো সেহেতু এক্ষেত্রে যারা 'বিভোর ও বিলুপ্ত' স্তরে চলে গিয়েছিলেন তারা আল্লাহ ছাড়া সকল 'অস্তিত্ব' অস্বীকার করে বসেছিলেন। বিলুপ্ত চেতনা ও আচ্ছন্নতার অবস্থায় তাদের শ্লোগান ছিলো 'লা-মাওজূদা ইল্লাল্লাহ'; পক্ষান্তরে ইউরোপের চিন্তানায়কদের উপর যেহেতু বস্তুবাদের অপ্রতিহত প্রভাব ছিলো এবং এক্ষেত্রে তারা বিভোরস্তরে চলে গিয়েছিলেন সেহেতু তারা অর্থনৈতিক বাস্তবতা ছাড়া জীবনে অন্য সবকিছুর অস্তিত্ব অস্বীকার করেছিলেন। তাদের যেন শ্লোগান ছিলো 'লা-মাওজূদা ইল্লাল মাদ্দাহ'।

প্রাচ্যের সুফীবাদীরা মানুষকে ভাবতেন পৃথিবীতে আল্লাহর ছায়া। তাই আচ্ছন্ন চেতনার সময় কেউ কেউ চিৎকার করে বলে উঠেছেন 'আনাল হক'– আমিই আল্লাহ। পক্ষান্তরে পাশ্চাত্যের বস্তুপূজারীরা মানুষকে নিছক বুদ্ধিমান সামাজিক পশু ছাড়া আর কিছু ভাবতে পারেনি। তাই সেখানে আজ দিকে দিকে একই শ্লোগান, আনাল হক-এর পরিবর্তে 'আনাল হায়ওয়ান'!

ডারউইনের বিবর্তনবাদ ও তার প্রভাব

এভাবে খৃস্টীয় উনিশশতকে ইউরোপে একে একে এমন সব বাদ-মতবাদ ও জ্ঞান-গবেষণা আত্মপ্রকাশ করতে লাগলো যা দ্বারা মানুষ ও তার জীবন সম্পর্কে উপস্থাপিত 'জৈব দৃষ্টিকোণ'টি আরো জোরালো ও সংহত হলো। মড়ার উপর

খাড়ার ঘা-রূপে তখন এলো ডারউইনের বিবর্তনবাদ। ১৮৬৯ খৃস্টাব্দে প্রকাশিত Origin Of Species গ্রন্থে ডারউইন প্রমাণ করতে চাইলেন, প্রকৃতপক্ষে মানুষ হচ্ছে তার চেয়ে নিম্নস্তরের প্রাণী থেকে উন্নতিপ্রাপ্ত একটি প্রাণীমাত্র। বহু লক্ষবছরে সে তার বিবর্তনধারা অতিক্রম করেছে এবং এক প্রাণীর স্তর থেকে অন্য প্রাণীর স্তরে উপনীত হয়েছে। যেমন Amoeba থেকে বানর এবং বানর থেকে ক্রমান্বয়ে মানবরূপ লাভ করেছে। আর এই মানবরূপই হচ্ছে তার শ্রেণীগত উৎকর্ষের সর্বোচ্চ স্তর। ডারউইনের বিবর্তনবাদই তখন সমাজ ও শিক্ষাঙ্গন সর্বত্র আলোচনার কেন্দ্রবিন্দু হয়ে গেলো। সমগ্র ইউরোপে এমন আলোড়ন সৃষ্টি হলো, যার তুলনা বাদ-মতবাদের ইতিহাসে সত্যি বিরল। বস্তুত বিবর্তনবাদ ছিলো মানুষ ও তার জীবন সম্পর্কে চিন্তা করার সম্পূর্ণ নতুন একটি ধারা, যার মাধ্যমে প্রাণীজগতের অভ্যাস ও বৈশিষ্ট্য এবং বিকাশ ও বিবর্তন সম্পর্কে জানার এবং জ্ঞান-পরিধি বৃদ্ধি করার অদম্য কৌতূহল ও স্পৃহা সৃষ্টি হয়েছিলো। বলা যায়, মানুষ যেন মানুষকে বাদ দিয়ে বানরকে নিয়েই বেশী করে গবেষণায় মেতে উঠেছিলো।

বিবর্তনবাদ ইউরোপের চিন্তা-চেতনায় এ বিশ্বাস বদ্ধমূল করে দিয়েছিলো যে, বিশ্বজগত কোন ঐশী ব্যবস্থা এবং অতিপ্রাকৃতিক শক্তির পরিচালনা ও নিয়ন্ত্রণ ছাড়া সম্পূর্ণ নিজস্ব শক্তিতে স্বয়ংক্রিয়ভাবে চলছে। শাশ্বত প্রাকৃতিক সূত্রসমূহ ছাড়া বিশ্বজগতের উদ্ভব ও বিকাশ এবং গতি ও পরিণতি অর্জনের পিছনে অন্য কোন সূত্র নেই, বরং প্রতিটি সৃষ্টি 'উর্ধ্বজাগতিক বুদ্ধি ও প্রজ্ঞার নিয়ন্ত্রণ ছাড়া 'ক্রমস্বভাবপ্রক্রিয়ায়' প্রাণের প্রাথমিক স্তর থেকে পরবর্তী স্তরে উন্নীত হয়ে এসেছে। সুতরাং মানুষ ও অন্যান্য প্রাণী মহাপ্রাজ্ঞ কোন স্রষ্টার সৃষ্টি নয়, বরং প্রকৃতির স্বভাবপ্রক্রিয়ার ফল, যার মূল কথা হচ্ছে শুধু অস্তিত্বের সংগ্রাম, যোগ্যতরের বিজয় এবং প্রকৃতির নির্বাচন, যা সৃষ্টিজগতের সর্বত্র, এমনকি বাক, বুদ্ধি ও বোধের অধিকারী অধিক উন্নত প্রাণী এই যে মানুষ, তার ক্ষেত্রেও সমান কার্যকর।

নৈতিক ও চিন্তানৈতিক ফলাফলের দিক থেকে এবং সূচনা ও পরিণতি-সম্পর্কিত মৌলবিশ্বাসের দিক থেকে, সর্বোপরি বাস্তব প্রভাবের দিক থেকে বিবর্তনবাদ যে ধর্মের সঙ্গে আগাগোড়া সঙ্ঘর্ষপূর্ণ তা তো বলাই বাহুল্য; বরং এ ছিলো এক নতুন ধর্ম, যা অন্যসব ধর্মের মূলে কুঠারাঘাত করে। সুতরাং ধর্মনেতাগণ যদি ইউরোপের বুকে ধর্মের ভবিষ্যত সম্পর্কে শঙ্কিত হয়ে পড়েন এবং বিবর্তনবাদের

বিরোধিতায় কোমর বেঁধে নেমে পড়েন তাতে অবাক হওয়ার কিছুই নেই। প্রফেসর জোড লিখেছেন–

'এখন আমাদের পক্ষে কল্পনা করাও কষ্টকর যে, ডারউইন যখন Origin Of Species গ্রন্থে তার মতবাদ প্রচার করেন তখন আমাদের পূর্বপুরুষগণ কেমন স্তব্ধ-বিমূঢ় হয়ে পড়েছিলেন। ডারউইন তার গবেষণার ফলাফল দ্বারা প্রমাণ করলেন– কিংবা ভাবলেন যে, তিনি প্রমাণ করেছেন– যে, পৃথিবীনামক গ্রহে প্রাণীর বিবর্তনপ্রক্রিয়া Amoeba ও Jelly fish এর প্রাথমিক উদ্ভব থেকে চূড়ান্ত ও সর্বোচ্চ স্তর পর্যন্ত অব্যাহতভাবে চলে এসেছে, আর আমরা হলাম প্রাণের বিবর্তনের সর্বোন্নত ও সর্বোচ্চ স্তর।

এর বিপরীতে ভিক্টোরিয়াযুগের লোকদের বলা হয়েছিলো, মানুষ স্বয়ং স্বতন্ত্র একটি সৃষ্টি এবং প্রকৃতপক্ষে সে ফিরেশতার স্তর থেকে অবনমিত একটি শ্রেণী। অথচ ডারউইনের মতবাদ যদি ঠিক হয় তাহলে মানুষের পরিচয় 'একটি উন্নত বানর' ছাড়া আর কিছুই থাকে না।

বলাবাহুল্য, ভিক্টোরিয়াযুগের মানুষের পক্ষে এটা মেনে নেয়া কঠিন ছিলো যে, মানুষ হবে অবনমিত ফিরেশতার পরিবর্তে উন্নতিপ্রাপ্ত বানর। এই মতবাদ তাদের কাছে ছিলো মৃত্যুর চেয়ে অসহনীয়। তাই তারা মানুষকে বিবর্তনবাদের কলঙ্ক থেকে উদ্ধারের উদ্দেশ্যে বিভিন্ন উপায় ও পন্থা গ্রহণের চেষ্টা করেছিলো।'[১] কিন্তু উপায় ছিলো না।

বৈজ্ঞানিক গবেষণার দিক থেকে বড় ধরনের দুর্বলতা ও শূন্যতা থাকা সত্ত্বেও আমজনতা ও বিজ্ঞানীদের এক বিরাট অংশ বুঝে, কিংবা না বুঝে ডারউইনের বিবর্তনবাদ মেনে নিয়েছিলো। অথচ বিজ্ঞানেরই মূল কথা হলো, চূড়ান্ত গবেষণা ও পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়া ছাড়া কোন ধারণাকে সত্যের মর্যাদা দেয়ার সুযোগ নেই। কিন্তু বিবর্তনবাদের ক্ষেত্রে মানুষ বিজ্ঞানের মূল শিক্ষাই যেন ভুলে গেলো এবং 'প্রমাণ ছাড়াই প্রমাণিত' বলে মেনে নিলো। আসল কথা, ধর্মের প্রতি সৃষ্ট বিদ্বেষের কারণে মানুষের চিন্তা ও মনমস্তিষ্ক এধরনের মতবাদ গ্রহণ করার জন্য সম্পূর্ণ প্রস্তুত ছিলো। কারণ ধর্ম ও ধর্মনেতাদের বিরোধিতার জন্য এর মধ্যে তারা জোরালো ভিত্তি পেয়ে গিয়েছিলো। এভাবে এ সত্য আবারও প্রমাণিত হলো যে, মানুষ যতই বিজ্ঞানমনস্কতা ও মুক্তবুদ্ধির গর্ব করুক আসলেই সে

[১] guid to modern wikedness, p. 235-236

আবেগ-অনুভূতির দাস। সুতরাং জীবন ও জগত সম্পর্কে তার কোন সিদ্ধান্তই আস্থাযোগ্য নয়, যতক্ষণ না অকাট্য কোন প্রমাণ (অহি) তাকে সমর্থন করে।

বিবর্তনবাদের পক্ষে মানুষের চিন্তার গতি এমনই বাঁধভাঙ্গা জোয়ারের মত ছিলো এবং প্রবন্ধ-নিবন্ধ ও প্রকাশনার এমন সর্বপ্লাবী ঢল নেমেছিলো যে, তার মুকাবেলা করা সম্ভবই ছিলো না। ফলে এক অসম যুদ্ধে ধর্ম ও গীর্জাকে আত্ম-সমর্পণ করতেই হলো। এমনকি ১৮৮৩ খৃস্টাব্দে ডারউইনের মৃত্যুতে ব্রিটিশ গীর্জাকে শোক প্রকাশ করতে হলো এবং তাকে সেই সর্বোচ্চ সম্মান দিতে হলো যা গীর্জা কোন মানুষকে দিতে পারে। অর্থাৎ ধর্মনেতাদের সমাধিস্থলে তার সমাধি-ব্যবস্থা অনুমোদন করতে হলো। এ যেন ধর্মের শত্রুকেই সর্বোচ্চ ধর্মীয় মর্যাদায় বরণ করা। বিষয়টি ইউরোপের গীর্জাপতিদের জন্য কতটা অসহনীয় ছিলো!

চিন্তা-চেতনা, নীতি-নৈতিকতা, শিল্প-সাহিত্য, জীবন, সভ্যতা ও রাজনীতি সর্বত্র বিবর্তনবাদের প্রভাব ছিলো অত্যন্ত সুদূরপ্রসারী। 'প্রকৃতির কোলে নগ্ন-স্বাধীন জীবনযাপনের স্বভাবযুগ'-এ ফিরে যাওয়ার যে একটা জোরদার প্রবণতা মাথা-চাড়া দিয়ে উঠেছিলো, মূলত সেটা ছিলো বিবর্তনবাদেরই একটি প্রকাশ। ইউরোপের জীবন ও সভ্যতা এবং কর্ম ও চরিত্রের আরো বহু বিষয় আসলে এ চিন্তা ও বিশ্বাসেরই অনিবার্য ফল ছিলো যে, মানুষ একটি উন্নত প্রাণী। পারিবারিক জীবন বিপর্যস্ত হওয়ারও কারণ ছিলো এটি; ব্রিটিশ চিন্তাবিদ মিস্টার শেপার্ড যেমন বলেছেন, ইংলন্ডে এমন একটি প্রজন্ম আত্মপ্রকাশ করেছে যারা পারিবারিক জীবনের ধারণা সম্পর্কেই অজ্ঞ; পশুপালের অবাধ জীবন ছাড়া অন্য কোন জীবনের সঙ্গে যারা পরিচিতই নয়।

বস্তুবাদের অমার্জনীয় অপরাধ

ইউরোপের এই সর্বগ্রাসী বস্তুবাদ ও ধর্মহীন শিক্ষা, যাতে চরিত্র ও নৈতিকতা এবং আল্লাহভীতি ও পরকালচিন্তার চিহ্নমাত্র ছিলো না, এসবের ফল এই ছিলো যে, রাজনীতি ও রাষ্ট্রপরিচালনার স্নায়ুকেন্দ্রে যারা অবস্থান করতো, কখনো কখনো তারা এমন সব অপরাধে লিপ্ত হতো যা নিকৃষ্টতম অপরাধীদের পক্ষেও কল্পনা করা সম্ভব নয়। নির্দ্বিধায় যে কোন নীচতায় তারা নামতে পারতো শুধু এজন্য যে, তাতে দেশের বা সম্প্রদায়ের রাজনৈতিক স্বার্থ ছিলো, কিংবা ব্যক্তিগত লাভালাভের প্রশ্ন ছিলো।

ইউরোপের সাম্রাজ্যবাদী জাতি ও জনগোষ্ঠীর কালো থাবা যেখানে যেখানে পড়েছে সেখানেই রয়েছে নিষ্ঠুরতা ও বর্বরতার অসংখ্য উদাহরণ; তবে এখানে আমরা শুধু ভারতবর্ষ ও মুসলিম মধ্যপ্রাচ্যের কথাই বলবো। ভারতবর্ষে ব্রিটিশ-জাতির আগমন কীভাবে হয়েছে। শঠতা, ধূর্ততা ও নিষ্ঠুরতার কত শত ঘটনা ঘটেছে, কত রক্তগঙ্গা প্রবাহিত হয়েছে, ইজ্জত-আবরুর কী নৃশংস লুণ্ঠন হয়েছে, সে কাহিনীও থাক। শুধু সেই সময়ের একদু'টি ঘটনা বলি, যখন ব্রিটিশরা চলে যাওয়ার আগে শেষ আক্রোশ মিটিয়েছিলো।

মানবজাতির ইতিহাসে নিষ্ঠুরতা ও নির্মমতার অন্যতম চমকপ্রদ ঘটনা এই যে, ভারতবর্ষের 'বেঙ্গল প্রভিন্স'-এ ব্রিটিশ সরকার একটি কৃত্রিম মহাদুর্ভিক্ষ সৃষ্টি করেছিলো এবং তা এভাবে যে, একদিকে কৃষকদের ধান কেটে আনার জন্য নৌকা ব্যবহারের সুযোগ বন্ধ করে দেয়া হলো, অন্যদিকে সেনাবাহিনীর জন্য বিপুল পরিমাণ চাল মজুদ করা হলো, অথচ প্রদেশটির প্রধান খাদ্যই ছিলো চাল। ক্ষুধা-অনাহারে মানুষ যখন দলে দলে মরছে, গুদামে তখন বিপুল খাদ্যশস্য নষ্ট হচ্ছে! চিন্তাশীল সবাই একমত যে, তখন ঐ ভয়াবহ দুর্ভিক্ষের প্রাকৃতিক কোন কারণ ছিলো না এবং অনাহারে মৃত্যুর কোন আশঙ্কাই ছিলো না, যদি ব্রিটিশ সরকার সামান্য কর্মতৎপরতার পরিচয় দিতো। কারণ খাদ্যের মজুদ ছিলো প্রচুর, রেল ও যোগাযোগ ব্যবস্থা ছিলো সন্তোষজনক। তাছাড়া ভারতবর্ষ ছিলো এমনই উর্বর দেশ যে, অন্যান্য দেশেও খাদ্য সরবরাহ করা তার পক্ষে সম্ভব ছিলো।

কেন এ হৃদয়হীন নিষ্ঠুরতা? শুধু এই ধারণা ও কল্পনার ভিত্তিতে যে, ক্ষুধা-অনাহারে উৎপীড়িত মানুষ ব্রিটিশবাহিনীতে ভর্তি হতে উৎসাহিত হবে। তাছাড়া প্রমাণ করা যাবে যে, দেশপরিচালনার যোগ্যতা ভারতের স্থানীয় প্রশাসনের নেই, এখনো ব্রিটিশ শাসনের প্রয়োজন রয়েছে এবং স্বরাজচিন্তা আগাগোড়া একটি ঝুঁকিপূর্ণ চিন্তা।

১৯৪৭ সালে বিভাগপরবর্তী ভারতের প্রথম গভর্নর জেনারেল ছিলেন লর্ড মাউন্ট বেটেন। তখন দিল্লী ও পূর্বপাঞ্জাবে পর্দার আড়ালে মুসলিমনিধনের যে ভয়াবহ ষড়যন্ত্র দানাবেঁধে উঠছিলো, লর্ড বেটেন সে সম্পর্কে চোখ বন্ধ রেখেছিলেন। তার কাছে লাগাতার খবর আসছিলো এবং প্রশাসন ও গোয়েন্দা বিভাগের অভিজ্ঞ ও মানবতাবাদী লোকেরা তাকে সম্ভাব্য সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার ভয়াবহতা সম্পর্কে সতর্ক করে আসছিলেন, কিন্তু তিনি ছিলেন 'জাগ্রত নিদ্রায়'। কারণ মুসলিম

সম্প্রদায়ের উপর তিনি ক্ষিপ্ত ছিলেন যে, ভারতের মত পাকিস্তান তাকে গভর্নর জেনারেল পদে গ্রহণ করতে রাজী হয়নি, (কারণ তার ভারতপ্রীতি ও নেহরুপত্নির প্রতি দুর্বলতা ছিলো সুবিদিত)। ব্যক্তিগত প্রতিশোধস্পৃহা ছাড়াও লর্ড মাউন্টবেটেন দাঙ্গা ও গৃহযুদ্ধ থেকে প্রমাণ করতে চেয়েছেন যে, ভারতবাসী এখনো স্বাধীনতার উপযুক্ত নয় এবং ভারতবর্ষে ব্রিটিশশাসনের প্রয়োজন রয়েছে এবং ভারতের উভয় অংশ গণনিরাপত্তা ও শান্তিশৃঙ্খলা রক্ষার জন্য এখনো ইংরেজজাতির উপর নির্ভরশীল।

বলাবাহুল্য, এই একটি লোকের ধর্মভয়শূন্য হৃদয়ের কারণে তখন এমন ভয়াবহ মানবনিধনযজ্ঞ সঙ্ঘটিত হতে পেরেছিলো, যার নযির না অতীতে ছিলো, না আগামী বহু শতাব্দী তার নমুনা 'প্রসব' করতে সক্ষম।

রেডক্লিফের নামও এখানে আসতে পারে, যাকে ভারতে হিন্দু-মুসলিম উভয়পক্ষ পাঞ্জাবের কিছু এলাকা সম্পর্কে মধ্যস্থতাকারী মেনেছিলো। তিনি ন্যায়ানুগ সিদ্ধান্ত দেবেন যে, তা ভারতভুক্ত হবে, না পাকিস্তানের অন্তর্ভুক্ত? কিন্তু তিনি বিশ্বাসভঙ্গ করে অন্যায় সিদ্ধান্ত চাপিয়ে দেন। ফল হয়েছিলো ফিরোযপুর ও গুরুদাসপুর থেকে মুসলিম জনগোষ্ঠীর গণবিতাড়ন এবং জানমালের ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি, (আর ইজ্জত-আবরু তো ইংরেজ সভ্যতার কোন বিষয়ই নয়)।

অন্যদিকে মধ্যপ্রাচ্যে ট্রুম্যান-এর ভূমিকা ছিলো আগাগোড়া ন্যাক্কারজনক। ইহুদিবাদকে তিনি সমর্থন করেছেন সম্পূর্ণ অন্ধ সেজে যুক্তি ও বিবেকের টুঁটি চিপে ধরে। ফিলিস্তিনে ইসরাইলী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠায় তার ভূমিকাই ছিলো প্রধান। আরবদের সম্পূর্ণ ন্যায়ানুগ ও যুক্তিনির্ভর দাবী তিনি উপেক্ষা করেছেন। কারণ আর কিছু নয়, ভোটের হিসাব-নিকাশ। নির্বাচনী বৈতরণী পার হওয়ার জন্য তার খুবই প্রয়োজন ছিলো ইহুদীদের রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও মিডিয়া-শক্তির সমর্থনের।

আরব ইসলামী দেশ আলজিরিয়ার স্বাধীনতাযুদ্ধে ফ্রান্স যে মানবতাবিরোধী অপরাধ করেছে, বিশ্বইতিহাসে অবশ্য তার নযির আছে, তবে খুব বেশী নেই। কিন্তু আমেরিকার সমর্থন ছিলো পাশবিক শক্তি ব্যবহারকারী দখলদার দেশ ফ্রান্সের প্রতি। আলজিরিয়ার মাটিতে অসহায় মুসলিম জনগোষ্ঠীর উপর দিয়ে বর্বরতা ও পাশবিকতার যে ভয়াবহ ঝড় বয়ে গিয়েছিলো তাতে আমেরিকা ও ইউরোপ ছিলো সম্পূর্ণ নির্বিকার।

এসব ঘটনা এবং আরো বহু ঘটনা জ্বলন্তভাবে প্রমাণ করে যে, ইউরোপ-আমেরিকার নেতৃবর্গের চরিত্র ও নৈতিকতা বলতে কিছু ছিলো না (এখনো নেই)! বস্তুত তাদের রাজনীতি ও রাষ্ট্রনীতি আবর্তিত হয় স্বার্থকে কেন্দ্র করে, নীতি ও আদর্শকে কেন্দ্র করে নয়; হোক তা ব্যক্তিস্বার্থের ঊর্ধ্বে জাতীয় ও সাম্প্রদায়িক স্বার্থ।

(ফিলিস্তীনে ইহুদিদের হাতে আরবদের যত রক্ত ঝরছে, ইসরাইলী হায়েনাদের হাতে আরব নারী ও শিশুরা যে পাশবিকতার শিকার হচ্ছে, তার কোন প্রতিকার নেই কেন? বিশ্ববিবেক ও জাতিসঙ্ঘ নীরব কেন? শুধু এজন্য যে, আমেরিকার স্বার্থ তাতে ক্ষুণ্ণ হবে বলে মনে করা হচ্ছে।

কয়েক বছর আগে কসোভো, বসনিয়া ও হার্জেগোভীনায় যে নযিরবিহীন গণহত্যা সঙ্ঘটিত হলো, বসনিয়ার প্রধানমন্ত্রীকে জাতিসঙ্ঘ-বাহিনীর হাত থেকে ছিনিয়ে নিয়ে নির্মমভাবে হত্যা করা হলো। কেন করা হলো? ইউরোপের স্বার্থ রক্ষার জন্য।

সম্প্রতি আফগানিস্তান, ইরাক ও লিবিয়ার বুকে যে রক্তের বন্যা বয়ে গেলো, তা কিসের জন্য? শুধু তেলের স্বার্থরক্ষার জন্য।

এমনকি এই মিশরে ইতিহাসের প্রথম স্বচ্ছ নির্বাচনের মাধ্যমে গণতান্ত্রিকভাবে নির্বাচিত একজন প্রেসিডেন্টকে ক্ষমতাচ্যুত ও বন্দী করা হলো, হাজার হাজার বিক্ষোভকারী 'মুসলিম' সেনাবাহিনীর হাতে খুন হলো, জ্বলে পুড়ে ভস্ম হলো; এখনো হচ্ছে, কোথায় এখন গণতন্ত্রের মোড়ল আমেরিকা ও তার তল্পিবাহক জাতিসঙ্ঘ? বিশ্বের যে কোন অঞ্চলে মুসলিমজাতির উপর যুলুম নির্যাতন হচ্ছে, রক্তপাত হচ্ছে, পাশবিকতা ও বর্বরতার যত ঘটনা ঘটছে, একটাই মাত্র কারণ, বৃহৎ শক্তিবর্গের স্বার্থ; কোথাও কোন প্রতিবাদ নেই, তারও কারণ একটাই, এখানে অন্য কোন জাতির স্বার্থ নেই। মোটকথা, নীতি ও আদর্শ এবং মানবতা ও মানবিকতা নয়, তাদের ভাষায় আপন দেশ ও জাতির স্বার্থই হচ্ছে সবকিছুর কেন্দ্রবিন্দু –অনুবাদক)

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

ইউরোপে স্বদেশবাদ ও জাতীয়তাবাদের বিকাশ

রোমান গীর্জার পতন জাতীয়তাবাদের উত্থানের কারণ

পিছনে আমরা বলে এসেছি, উগ্র স্বদেশবাদ, জাতীয়তাবাদ, সাম্প্রদায়িকতা ও ভৌগোলিকতা ছিলো প্রজন্মপরম্পরায় ইউরোপীয় স্বভাবের প্রধান বৈশিষ্ট্য, বরং এটা ইউরোপের প্রাণসত্তায় ও রক্তমাংসে মিশে ছিলো, যা থেকে বিচ্ছিন্ন হওয়ার কথা ইউরোপ কল্পনাও করতে পারে না। তবে ইউরোপে খৃস্টধর্মের আগমনের ফলে ধর্মের হাতে তা কিছুটা অবদমিত ও নিয়ন্ত্রিত হয়েছিলো। কারণ যদিও খৃস্টধর্ম তার আসল রূপ ও প্রকৃতি হারিয়ে ফেলেছিলো এবং তাতে নানা দোষ-দুর্বলতার অনুপ্রবেশ ঘটেছিলো, তবু এটা তো সত্য যে, তাতে হযরত ঈসা (আঃ) ও তাঁর আসমানি ধর্মের শিক্ষা-দীক্ষার কিছু না কিছু ছাপ ও বৈশিষ্ট্য অবশ্যই বিদ্যমান ছিলো। আর, কোন আসমানি ধর্ম, শত বিকার-বিকৃতির পরো মানুষে মানুষে কৃত্রিম কোন ভেদ ও বিভেদ এবং ভাষা, বর্ণ ও জাতীয়তার পার্থক্য স্বীকার করতে পারে না। তাই বিভক্ত ও বিক্ষিপ্ত ইউরোপকে খৃস্টধর্ম রোমান গীর্জার অধীনে ঐক্যবদ্ধ করেছিলো এবং খৃস্টজগতকে অভিন্ন পরিবারে পরিণত করেছিলো। history of morality-এর লেখক বলেন–

'ইউরোপের স্বদেশপ্রেম ও সম্প্রদায়প্রীতি সাধারণ মানবহিতৈষণায় পরিবর্তিত হলো। এই মানসিক পরিবর্তন কতটা সুদূরপ্রসারী ছিলো তা খৃস্টান পণ্ডিতদের বক্তব্য-মন্তব্য থেকেও কিছুটা অনুমান করা যায়। যেমন, ট্রটোলীন বলেন, আমরা একটি প্রজাতন্ত্রের কথাই জানি, 'বিশ্বপ্রজাতন্ত্র'। অরজিন বলেন, 'আমাদের একটিই স্বদেশ, যার ভিত্তি হচ্ছে একটিমাত্র শব্দ, 'ঈশ্বর'।'

কিন্তু মার্টিন লুথার (১৪৮৩– ১৫৪৬ খৃ) যখন বৈপ্লবিক ধর্মীয় সংস্কার-আন্দোলনের ডাক দিলেন এবং রোমান গীর্জার বিরোধিতায় ঝাঁপিয়ে পড়লেন তখনই ধর্ম-

প্রভাবে ইউরোপের অবদমিত স্বভাব আবার জেগে উঠলো। লুথার স্বজাতি জার্মানদের সহযোগিতায় এতটাই সফল হলেন যে, শেষ পর্যন্ত রোমান গীর্জাকে পরাজয় মানতে হলো, আর বিক্ষিপ্ত ইউরোপকে যে ঐক্যসূত্রে গাঁথা হয়েছিলো তা ছিঁড়ে গেলো, কোন বন্ধনই আর থাকলো না। ফলে ইউরোপের বিভিন্ন জাতি ও জনগোষ্ঠী ক্রমে আভ্যন্তরীণভাবে স্বাধীন ও স্বতন্ত্র সত্তায় আত্মপ্রকাশ করতে লাগলো।

বস্তুত ইউরোপে খৃস্টধর্মের পতন এবং সাম্প্রদায়িকতা ও জাতীয়তাবাদের উত্থান শুরু হয়েছিলো সমান্তরালে। অর্থাৎ ধর্ম ও জাতীয়তাবাদ যেন ছিলো দাঁড়িপাল্লার দুই দিক; একটি যত নীচে নামে অন্যটি তত উপরে ওঠে। আর ধর্মের পাল্লাই ভার হারিয়ে উপরে উঠে যাচ্ছিলো এবং জাতীয়তাবাদের পাল্লা ভারী হয়ে নীচে নামছিলো। আমেরিকায় একসময়ের ব্রিটিশরাষ্ট্রদূত সুপ্রসিদ্ধ পণ্ডিত লর্ড লুথিয়ান, ১৯৩৮-এর জানুয়ারিতে আলিগড় বিশ্ববিদ্যালয়ে দেয়া ভাষণে এ ঐতিহাসিক সত্যের প্রতি ইঙ্গিত করেই বলেছিলেন—

'ইউরোপে একসময় ঐরকম সাংস্কৃতিক ও ধর্মীয় ঐক্য বিদ্যমান ছিলো, যেমন ছিলো ভারতে 'খৃস্টীয়তা'র প্রথম সময়ে। কিন্তু পনের শতকে (মার্টিন লুথারের) ধর্মীয় সংস্কার আন্দোলন যখন ইউরোপের সাংস্কৃতিক ও ধর্মীয় ঐক্য বিলুপ্ত করে দিলো তখন সমগ্র মহাদেশ বিভিন্ন জাতীয়তায় বিভক্ত হয়ে গেলো, যাদের পারস্পরিক সঙ্ঘাত শুধু ইউরোপ নয়, বরং সমগ্র বিশ্বের শান্তি ও নিরাপত্তার জন্য স্থায়ী হুমকি হয়ে দেখা দিলো।'

ধর্মের অপসৃতি এবং ধর্মীয় নীতি ও নৈতিকতার বিলুপ্তির কারণে স্বদেশবাদ ও জাতীয়তাবাদের যে প্রবল উত্থান ঘটেছিলো, একই ভাষণে তিনি সেদিকেও দৃষ্টি আকর্ষণ করে বলেন—

'ধর্ম হলো মানুষের অপরিহার্য পথপ্রদর্শক এবং জীবনে নৈতিক ও আত্মিক মর্যাদাবোধ অর্জনের একক মাধ্যম। কিন্তু ধর্মের ক্ষমতা ও প্রতিপত্তি বিলুপ্ত হওয়ার অনিবার্য ফলরূপে পাশ্চাত্য এমন সব রাজনৈতিক মতবাদ ও চিন্তাধারায় আক্রান্ত হয়ে পড়লো যার ভিত্তি ছিলো নিছক জাতিগত ও শ্রেণীগত ভেদ-বিভেদ। বিজ্ঞানের অগ্রযাত্রার প্রভাবে পাশ্চাত্য এ বিশ্বাসে আচ্ছন্ন হলো যে, বস্তুগত উন্নতিই হচ্ছে জীবনের শ্রেষ্ঠ লক্ষ্য। এজন্যই ইউরোপে এখন জীবনের সমস্যা ও জটিলতা বেড়েই চলেছে এবং আধ্যাত্মিক ও জাগতিক সমন্বয় দুরূহ

হয়ে পড়েছে, অথচ এ সমন্বয়ই হলো 'যুগের বড় দুর্যোগ' জাতীয়তাবাদের কবল থেকে মুক্তির উপায়।'[১]

পাশ্চাত্যের অহং ও প্রাচ্যবিদ্বেষ

ধর্মব্যবস্থার পতন ও জাতীয়তাবাদের উত্থানের প্রথম ফল এই হলো যে, আত্ম-বিভেদ সত্ত্বেও ইউরোপ সমগ্র প্রাচ্যের বিপক্ষে এক অভিন্ন প্রতিদ্বন্দ্বী শিবিরে পরিণত হলো এবং পাশ্চাত্য ও প্রাচ্য, কিংবা ইউরোপ ও গর-ইউরোপ, আরো পরিষ্কার ভাষায় আর্য ও অনার্য জাতিবর্গের মধ্যে এমন একটি স্থায়ী পার্থক্যরেখা টেনে দেয়া হলো যে, 'এপারের' সকল সভ্যতা ও সংস্কৃতি 'ওপারের' সকল সভ্যতা ও সংস্কৃতির চেয়ে শ্রেষ্ঠ। বেঁচে থাকার, সমৃদ্ধি অর্জন করার এবং শাসন করার অধিকার এপারের একচ্ছত্র; অন্য কারো, বা অন্য কিছুর বেঁচে থাকার ও বিস্তার লাভ করার অধিকার নেই।

বলাবাহুল্য, এটাই ছিলো স্ব-স্ব উত্থানকালে গ্রীক ও রোমান জাতির স্বভাবচিন্তা। তাদের চোখে শুধু তারাই ছিলো পৃথিবীর সভ্য জাতি, আর বিশেষ করে আটলান্টিকের পূর্বতীরের সবকিছু ছিলো 'বর্বর'।

জাতীয়তাবাদ ও সাম্প্রদায়িকতার এ চরম উগ্র ধ্যান-ধারণা ও চিন্তা-চেতনার ফল এই ছিলো যে, বহিরাগত যে কোন ব্যক্তি, বস্তু, শিক্ষা ও দর্শনের প্রতিই তারা ছিলো চরম বিদ্বেষী। এমনকি ইউরোপের কোন কোন জনগোষ্ঠী স্বয়ং যীশু ও তাঁর ধর্মের প্রতিও বিদ্বেষ পোষন করতো। কারণ তিনি বহিরাগত, সুতরাং তাঁর ধর্ম বহিষ্কারযোগ্য। যেমন জনৈক জার্মান শিক্ষাবিদ বলেন, 'আমাদের সন্তানদের কেন আমরা ভিন্ন জাতির ইতিহাস শেখাবো? কেন তাদের 'ইবরাহীম-ইসহাকের' কাহিনী শোনাবো? আমাদের চাই খাঁটি জার্মান ঈশ্বর।'

সেখানে এমন সম্প্রদায়ও ছিলো যারা যীশুকে শুধু ইসরাঈলী হওয়ার 'অপরাধে' প্রত্যাখ্যান করেছে। পক্ষান্তরে তাঁর প্রতি বিশ্বাসীরা তাঁকে 'আর্যরক্তীয়' প্রমাণ করার জোর প্রয়াস চালিয়েছিলো। এমনকি একসময় জার্মান জাতির উপাস্য প্রাচীন দেব-দেবীর পুনঃঅধিষ্ঠানের আন্দোলন বা প্রবণতাও বেশ দানাবেঁধে উঠেছিলো।

আজকের আন্তর্জাতিকতাবাদের প্রবক্তা রাশিয়াও উগ্র জাতীয়তাবাদে তার প্রাচীন শত্রু জার্মানির চেয়ে কোনভাবেই পিছিয়ে ছিলো না। সেখানে বহু মানুষ বিশ্বাস

---

[১] convocation adress of lord lothian at muslim university aligrah

করে, আধুনিক যুগের যা কিছু মৌলিক আবিষ্কার-উদ্ভাবন, তাতে সিংহভাগ অবদান রুশবিজ্ঞানীদের। তাদের মতে পদার্থের যৌগিকতা-সূত্রের আবিষ্কারক ফরাসী রসায়নবিদ lavoisier নন, বরং এক্ষেত্রে তিনি রুশ বিজ্ঞানী মিশেল লোমুতুসেভ-এর কাছে ঋণী। তদ্রূপ বিদ্যুৎশক্তির উদ্ভাবক টমাস এডিসন নন, বরং রুশ বিজ্ঞানী লিউজীন তার ছয় বছর আগে বিদ্যুৎ উদ্ভাবন করেছেন। প্রাভদা পত্রিকার মতে, রুশ বিজ্ঞানিগণ মার্কিন বিজ্ঞানী স্যামুয়েল মুরিস-এর আগে টেলিগ্রাফ উদ্ভাবন করেছেন এবং জর্জ স্টিফেনসন-এর আগে বাষ্পীয় ইঞ্জিন উদ্ভাবন করেছেন।' ইতিহাসের বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে তাদের আরো বহু দাবী আছে, যার উৎস উগ্র জাতীয়তাবাদ ও যুক্তিহীন রুশবন্দনা ছাড়া আর কিছু নয়।

ছোঁয়াচে জাতীয়তাবাদ মুসলিম জাহানে

পরম পরিতাপের বিষয়, জাতীয়তাবাদের এ ভয়াবহ ব্যাধি মুসলিম দেশেও ছড়িয়ে পড়েছে, অথচ প্রত্যাশা ছিলো, তারা হবে ইসলামের বিশ্বদাওয়াতের অগ্রদূত এবং পৃথিবীর জন্য শান্তি ও নিরাপত্তার বার্তাবাহী। বরং তারাই হবে অভিশপ্ত জাতীয়তাবাদের বিরুদ্ধে প্রতিরোধযুদ্ধের শক্তিশালী কেন্দ্র। বলাবাহুল্য যে, এটা হতে পেরেছে মুসলিমসমাজে দ্বীনের শক্তি দুর্বল হয়ে পড়া এবং পাশ্চাত্যের সভ্যতা, সংস্কৃতি ও শিল্প-সাহিত্যের প্রভাব বৃদ্ধি পাওয়ার কারণে। তাই তুরস্কের উছমানি সালতানাতে দেখা যায় 'তূরানবাদ' নামে মাথাচাড়া দিয়ে ওঠা ফেতনা, যার লক্ষ্য ছিলো প্রাচীন তুর্কী জাহিলিয়াত ও সভ্যতা-সংস্কৃতির পুনর্জাগরণ। ইসলাম, যা আরবদের মাধ্যমে তুর্কীরা পেয়েছে, তার প্রতি তারা ছিলো চরম বৈরী, যেমন ছিলো নতুন জার্মানে অনার্য মাধ্যমে আগত ধর্ম ও সভ্যতা-সংস্কৃতির প্রতি, যাকে তারা উপহাস করে বলতো, 'সেমিটিক ধর্ম ও সভ্যতা'। একই ভাবে নবীন তুরস্কের কোন কোন চিন্তানায়ক ভাবতেন, ইসলাম হচ্ছে তুর্কীজাতির উপর চাপিয়ে দেয়া একটি বহিরাগত ধর্ম, যা কিছুতেই তাদের উপযোগী নয়। সুতরাং তাদের জাতীয় কর্তব্য হলো প্রাচীন প্রতিমাপূজায় ফিরে যাওয়া, যা ছিলো ইসলামপূর্ব যুগে তাদের নিজস্ব ধর্ম। নতুন তুরস্কের শিল্প-সাহিত্য ও সংস্কৃতির অন্যতম প্রধান রূপকার বলে খ্যাত যিয়া কোক আলিব সম্পর্কে খালিদা এদীব খানম বলেন−

'তিনি এমন এক নতুন তুরস্কের স্বপ্ন দেখছিলেন যা উছমানি তুর্কী এবং তাদের পূর্ববর্তী তূরানিদের মধ্যে যোগসূত্র হবে। তিনি ইসলামপূর্ব তুর্কীদের নাগরিক ও

রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান সম্পর্কে বিশদ তথ্য সংগ্রহ করেছিলেন যাতে এগুলোর উপর ভিত্তি করে একটি ব্যাপক নাগরিক সংস্কার-আন্দোলন গড়ে তোলা যায়। তার স্থির বিশ্বাস ছিলো, আরবদের প্রবর্তিত ইসলাম আমাদের অবস্থার উপযোগী নয়। সুতরাং যদি আমরা আমাদের জাহেলি যুগে ফিরে যেতে না চাই, তাহলে অন্তত এমন কোন ধর্মীয় সংস্কার-আন্দোলন গড়ে তুলতে হবে যা আমাদের পূর্ণ স্বভাব-উপযোগী।'[১]

বলাবাহুল্য, এরূপ আত্মঘাতী ঝোঁক-প্রবণতা শেষদিকে যেমন তুর্কীদের মধ্যে দানা বেঁধেছিলো তেমনি বেঁধেছিলো ইরানীদের মধ্যেও।

মরহুম আমীর শাকীব আরসলান আরববিষয়ের মত তুর্কীবিষয়েও ছিলেন আস্থা-যোগ্য বিশেষজ্ঞ পণ্ডিত। কারণ 'মজলিসুল উম্মাহ'-এর সদস্যরূপে দীর্ঘকাল তিনি তুরস্কে বাস করেছেন। তিনি বলেন−

'ইসলামী উছমানি জাতীয়তাবাদের বিপরীতে আরেকটি চিন্তাধারা ছিলো তূরানি জাতীয়তাবাদ। এর অগ্রবর্তী কাতারের প্রবক্তারা হলেন যিয়া কোক আলিব, আহমদ আগায়েফ, ইউসুফ আকশোর (এদু'জন রুশঅঞ্চল থেকে আগত), জালাল সাহির, ইয়াহয়া কামাল, হামদুল্লাহ ছাবহী, জাতীয় কবি মুহম্মদ আমীন বেক এবং আরো বহু সাহিত্যিক চিন্তাবিদ। ছাত্রসমাজ ও নতুন প্রজন্মের অধিকাংশ এ মতবাদে অনুরক্ত ছিলো।

এদের দাবী হলো, সভ্যতার ক্ষেত্রে তুর্কীরা হচ্ছে অগ্রবর্তী প্রাচীনতম জাতি। তুর্কী ও মঙ্গোল হচ্ছে অভিন্ন নৃতাত্ত্বিক সত্তার অধিকারী। সুতরাং তাদেরকে 'তূরানি সত্ত্ব' নামে আবার অভিন্ন সত্তায় ফিরে যেতে হবে। এক্ষেত্রে তাদের দৃষ্টি শুধু সাইবেরিয়া, তুর্কিস্তান, চীন, ককেসাস ও বলকানের তুর্কীদের পর্যন্ত সীমাবদ্ধ ছিলো না, বরং এদিকে চীনের মঙ্গোল এবং ওদিকে ইউরোপের হাঙ্গেরি ও ফিনল্যান্ড পর্যন্ত প্রসারিত ছিলো। কারণ তাদের মতে এরা সবাই তূরানী নৃ-মূল থেকে উৎসারিত। প্রথম চিন্তাধারার বিপরীতে এদের দাবী ছিলো, 'আমরা প্রথমে তুর্কী, তারপর মুসলিম।' বরং এরা ধর্মপরিচয় ও ইসলামী বন্ধন বর্জনের পক্ষে ছিলো, তবে তা 'তূরানবাদ' বিস্তারে কোনভাবে সহায়ক হলে ভিন্ন কথা। অর্থাৎ ইসলামী পরিচয়টি উদ্দেশ্য না হয়ে শুধু মাধ্যম হতে পারে। কোন কোন

---

[১] من محاضرات خالدة أديب خانم التي ألقتها في الجامعة الملية بدلهي

তূরানবাদী এতটা বেড়েছিলো যে, তাদের উদ্ধত ঘোষণা ছিলো, 'আমরা তুর্কী, সুতরাং আমাদের কা'বা হলো তূরান।'
চেঙ্গিজ খান ছিলো তাদের জাতীয় বীর এবং মঙ্গোল বিজয়াভিযান ছিলো তাদের স্তুতি-বন্দনার বিষয়। এসম্পর্কে বহু গান, কবিতা ও সঙ্গীত রচিত হয়েছিলো, যাতে তরুণ প্রজন্ম চেঙ্গিজপূজা ও মঙ্গোলবন্দনার দীক্ষায় গড়ে ওঠে এবং 'যেন তাদের সাহস ও মনোবল উৎকর্ষ লাভ করে'।[১]

তিনি আরো বলেন–

'ইউরোপের অনুকরণে যেহেতু এ যুগটি ছিলো বিভিন্ন জাতীয়তাবাদের যুগ সেহেতু পারসিক জাতীয়তাবাদও পূর্বের যে কোন সময়ের চেয়ে বেশী শক্তি লাভ করেছিলো। বস্তুত এটা ছিলো তূরানবাদেরই পারসীয় সংস্করণ। তাই পারস্যের নতুন প্রজন্মকে দেখতে পাই পারস্যের প্রাচীন ধর্ম সম্পর্কে কৌতূহলী হয়ে উঠতে যেমন তুর্কী নতুন প্রজন্ম তাদের প্রাচীন ধর্ম ও উপাস্য সাদা নেকড়ে সম্পর্কে উৎসাহী হয়ে উঠেছিলো, যার একটি প্রকাশ ঘটেছিলো আধুনিক বইপত্রে সাদা নেকড়ের চিত্র অঙ্কিত করার মাধ্যমে।
এদের উদ্দেশ্যে শায়খুল ইসলাম মূসা কাযিম বলেছিলেন – তিনি নিজে আমাকে শুনিয়েছেন– 'আরবদেরও ছিলো এমন সব পূজা-পদ্ধতি যা ভাবলেও গা কাঁটা দিয়ে ওঠে। কিন্তু তারা ইসলামের মাধ্যমে সেগুলো নির্মূল করেছিলো। তাদের গর্ব ছিলো যে, আল্লাহ দয়া করে এরূপ নীচতা ও মূর্খতা থেকে তাদের উদ্ধার করেছেন। অথচ আজ তোমরা আল্লাহকে ত্যাগ করে নেকড়েপূজায় লিপ্ত হতে চাও! ধিক তোমাদের!
তো তুর্কীদের ঘটনা পারসিকদের বেলায়ও ঘটলো। তাদের নতুন প্রজন্ম পারসীয় প্রাচীন ধর্মগুলোর পুনরুজ্জীবনপ্রয়াসে মেতে উঠলো। যেমন 'আলো ও অন্ধকার তত্ত্ব', যা থেকে অগ্নিপূজার উদ্ভব ঘটেছে। অদ্রূপ যরথোস্ট্রো-চিন্তা, প্রথমে যিনি আল্লাহর একত্বের প্রচারক ছিলেন। তিনি বলতেন, আল্লাহ হচ্ছেন আলো ও অন্ধকারের স্রষ্টা, আর এদু'য়ের সংমিশ্রণেই কল্যাণ ও অকল্যাণের অস্তিত্ব। এ সংমিশ্রণ ছাড়া বিশ্বজগতের অস্তিত্ব সম্ভবই হতো না। এধরনের বিভিন্ন সংস্কার ও ধর্মবিশ্বাস যা প্রাচীন পারস্যে প্রচলিত ছিলো, যেমন দ্বিত্ববাদ ও মানুবাদ। কেউ

[১] من حواشي الأمير شكيب أرسلان على 'حاضر العالم الإسلامي' খ. ১ পৃ. ১৫৮ –১৫৯

কেউ মাযদাক-বাদেরও প্রবক্তা ছিলো যার মূল কথা হলো নাস্তিকতা ও অবাধ স্বেচ্ছাচার।[১]

আরবজাহানে জাতীয়তাবাদ

এর চেয়ে ভয়াবহ বিষয় এই যে, খৃস্টীয় উনিশশতকের শেষ দিকে জাতীয়তাবাদের সর্বনাশা ব্যাধি আরবদের মধ্যেও সংক্রমিত হলো; অথচ আরবরাই সুদীর্ঘ তেরশ বছর বিশ্বকে মানবভ্রাতৃত্ব ও মানবসাম্যের শিক্ষা দিয়ে এসেছে। কারণ তাদের জন্য আল্লাহর মনোনীত দ্বীনুল ইসলামের এটাই ছিলো শিক্ষা।
এই দুষ্ট জাতীয়তাবাদ একসময় তাদের অস্থি-মজ্জায় মিশে স্বভাবের অবিচ্ছেদ্য অংশে পরিণত হয়। অবশ্য এর যথোপযুক্ত কার্যকারণও ছিলো, কিছু অন্তর্গত এবং কিছু বহির্গত।
সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ অন্তর্গত কারণটি হচ্ছে জাতীয় অহঙ্কার, যা তুর্কী শাসক-প্রশাসক ও রাজকর্মচারীদের আচরণে প্রকাশ পেতো। হাঁ, তুর্কীদের অহমিকা ও দম্ভ খুব অবমাননাকরভাবে আরবদের এধারণা দিতো যে, তারা হচ্ছে দ্বিতীয় শ্রেণীর জনগোষ্ঠী। বিশেষ করে যারা অতি সংবেদনশীল তাদের দৃষ্টিতে তুর্কীদের আচরণ-উচ্চারণ ছিলো চরম ঔপনিবেশিক। পরিস্থিতি আরো সঙ্গিন হয়ে গেলো এ কারণে যে, আরবীভাষাকে যথাযোগ্য মর্যাদা ও গুরুত্ব দেয়া হয়নি। পক্ষান্তরে শাসকজাতির ভাষা তুর্কীকে করা হলো সরকারী ভাষা। তুর্কীদের এজাতীয় আরো কিছু রাজনৈতিক নির্বুদ্ধিতা ও হঠকারিতা আরবদের মধ্যে জাতীয় আক্রোশ ও আরবীয় অহমিকা উসকে দিয়েছিলো।
অবশ্য খৃস্টান আরব বুদ্ধিজীবীরাও পিছন থেকে যথেষ্ট ইন্ধন যুগিয়েছে, তুর্কীদের সঙ্গে যাদের না ছিলো দ্বীন ও আকীদার সম্পর্ক, না ছিলো ইসলামী ভ্রাতৃত্বের বন্ধন। এরা সম্পূর্ণরূপে পাশ্চাত্য সংস্কৃতির পরিমণ্ডলে প্রতিপালিত হয়েছিলো, যার সাহিত্যে, সঙ্গীতে, কাব্যে ও দর্শনে ছিলো শুধু জাতি ও জাতীয়তাবাদের স্তুতি-বন্দনা।
এরপর উপস্থিত হলো বহির্গত কার্যরকারণটি। অর্থাৎ পাশ্চাত্যের চিন্তানায়ক ও রাজনৈতিক কর্ণধাররা পরিস্থিতির পূর্ণ সুযোগ নিলো। উছমানি সাম্রাজ্যের পতন তো তাদের বহু কালের স্বপ্ন, যাতে প্রাচ্য থেকে তুর্কীদের জাগতিক ও আধ্যাত্মিক প্রভাব-প্রতিপত্তি বিলুপ্ত হয়ে যায়। তারা যখন দেখলো, কিছু আরব

[১] حواشي حاضر العالم الإسلامي খ. ১ পৃ. ১৬৪ – ১৬৫

যুবকের চিন্তাজগতে জাতীয়তাবাদী চেতনা অঙ্কুরিত হচ্ছে তখন তারা 'শতাব্দীর সুযোগ' ভেবে মুখে, কলমে ও লেখায়, বক্তৃতায় ঐ চিন্তা-চেতনাকে প্রয়োজনীয় খাদ্য ও পুষ্টি যোগাতে লাগলো। এ উদ্দেশ্যে তারা আরব-জাহানের বড় বড় শহর ও রাজধানীতে নিয়মিত যাতায়ত শুরু করলো এবং আরব লেখক, কবি-সাহিত্যিক, বুদ্ধিজীবী এবং গোত্রপ্রধান ও রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দের সঙ্গে খুব ঘনিষ্ঠ হলো। নিঃস্বার্থ আরবপ্রেম ও আরব-অধিকার সংরক্ষণের মুখোশ পরে তারা এ চিন্তা ছড়িয়ে দিলো যে, খেলাফাতের কেন্দ্র হবে, 'আস্তানা' নয়, হারামাইন বা কোন আরব ইসলামী রাজধানী। কারণ হিজরী দশম শতাব্দীতে তুর্কীরা আরবদের হাত থেকে খেলাফাত ছিনিয়ে নিয়েছিলো, সুতরাং আরবরাই হচ্ছে খেলাফতের স্বাভাবিক, বৈধ ও শরীয়তসম্মত হকদার।

এ সর্বনাশা চিন্তা আরবদের মাথায় কীভাবে অনুপ্রবেশ করলো এবং ধীরে ধীরে তার বিষক্রিয়া শুরু হলো, সর্বোপরি পাশ্চাত্যের পণ্ডিতগণ এ চিন্তার জন্মদান ও স্তন্যদানের পিছনে কী খেল খেলেছে তা পরিষ্কার বুঝতে হলে আমাদের মিস্টার ওয়েলফার্ড বেলেন্টির future of islam নামের রহস্যপূর্ণ বইটি অবশ্যই পড়তে হবে। আঠারোশ' বিরাশিতে লেখা বইটি আরব ও মুসলিম বিশ্বে তখন বেশ চমক ও আলোড়ন সৃষ্টি করেছিলো। আরবীসহ এর বিভিন্ন অনুবাদও বিপুল প্রচার পেয়েছিলো। ভূমিকায় লেখক বলেন–

'খেলাফতবিষয়ে মিশরীয় নেতৃবৃন্দ ভারসাম্যপূর্ণ এক মধ্যপন্থা অবলম্বন করেছেন। তাদের পূর্ণ শক্তি ও মনোযোগ এখন নিবদ্ধ 'স্বাধীনতায়', অন্যকিছুতে নয়। কখনো তারা প্রতিদ্বন্দ্বীর ভূমিকায় অবতীর্ণ হননি, বা ইসলামের দুর্গে কোন রকম ফাটল ধরাননি। সে ইচ্ছাও তাদের ছিলো না। কেননা আমীরুল মুমিনীন হিসাবে সুলতান আব্দুল হামীদ খান সবার কাছেই স্বীকৃত ছিলেন এবং তুলনা-মূলক তিনিই ছিলেন এ মহান পদের যোগ্যতম ব্যক্তি। মোটকথা, খেলাফতের নবজাগরণ বা দ্বিতীয় উত্থানের বিষয়টি তুলে রাখা হয়েছিলো ঐ সময়ের জন্য যখন উছমানি খেলাফতের 'নাকে শ্বাস নিয়ে' স্বাভাবিক মৃত্যু হবে। কোন সন্দেহ নেই যে, এটি ছিলো মিশরীয়দের ধীরস্থির ও প্রজ্ঞাপূর্ণ সিদ্ধান্ত এবং এটাই ছিলো তাদের জন্য উপযুক্ত।'

কত ভয়ঙ্কর বিষ কী সুন্দর মোড়কে তুলে দেয়া হচ্ছে সোজা-সরল আরবদের হাতে! একপর্যায়ে তিনি আরো বলেন–

'যদি আমরা আর কয়েকটি বছর ধৈর্য ধারণ করতে পারি তাহলে এ বিজয় যে আরো ব্যাপক ও চমকপ্রদ হবে তাতে খুব বেশী মানুষের সন্দেহ নেই। কারণ সুলতান আব্দুল হামীদ খানের মৃত্যু হোক বা অপসারণ, এর অবশ্যম্ভাবী ফল হবে কায়রোয় খেলাফতকেন্দ্রের স্থানান্তর, আর তা আরবদের সামনে তাদের হারানো ধর্মীয় নেতৃত্ব পুনরুদ্ধারের সুবর্ণ সুযোগ এনে দেবে ।'

উক্ত বইয়ের একটি অধ্যায় হলো, 'মক্কা– প্রকৃত রাজধানী', সত্যি ভদ্রলোকের ধূর্ততার প্রশংসা করতে হয়! তাতে তিনি বলেন–

'মুসলিম জ্ঞানীসমাজের সামনে এটা সুস্পষ্ট যে, যদি আমরা পিছনের দিকে যাত্রা করি (অর্থাৎ যদি খেলাফতকেন্দ্র কনস্টান্টিনোপল থেকে এশিয়ার অন্য কোন স্থানে নেয়া হয়) তাহলে (উদ্দেশ্যে উপনীত হওয়ার জন্য) বাধ্য হয়ে আমাদের এক দীর্ঘ পথ অতিক্রম করতে হবে।
বস্তুত দ্বীনের প্রাণকেন্দ্র ও রাজধানী হচ্ছে জাযীরাতুল আরবে, যা ইসলামের লালনক্ষেত্র এবং অহীর অবতরণক্ষেত্র। সর্বোপরি সেটাই হচ্ছে ধর্মীয় শাসন ও নেতৃত্বের যাবতীয় গুণ ও যোগ্যতার অধিকারী একমাত্র নিরাপদ শহর। ফলে তা এই শাসন ও নেতৃত্ব সর্বোচ্চ সীমা পর্যন্ত বহন করতে পারবে। বাড়তি সুবিধা হলো, সেখানে ইহুদি-খৃস্টানদের উপস্থিতি নেই, তাই বিবাদ-সঙ্ঘাতের পরিস্থিতি সৃষ্টির আশঙ্কাও নেই। আর তা পশ্চিমা দেশগুলোর লালা ঝরবে, এমন উর্বর ও প্রাচুর্যপূর্ণ ভূখণ্ডও নয়। খলিফাকে সেখানে বৃটিশ ও ফরাসী রাষ্ট্রদূত বা অন্য কোন বিদেশী প্রতিনিধির 'তম্বীহ' শুনতে হবে না। ফলে তিনি সত্যিকার 'নাইবে রাসূলের' উপযুক্ত (মর্যাদা ও) স্বাধীনতার সঙ্গে শাসনকার্য পরিচালনা করতে পারবেন। আর ইসলাম ফিরে পাবে তার সর্বপ্রকার আবিলতামুক্ত স্বচ্ছ নির্মল রূপ। এসব কারণে খুবই সম্ভব যে, খেলাফত মক্কায়, কিংবা মদিনায় তার যোগ্য অধিকারীদের কাছে ফিরে আসবে।'

ভদ্রলোক এখানে এসেই থামেননি। আরো বিষ ছিলো তার বোতলে। সেটা উপুড় করে ঢেলে দিয়ে তিনি আরো বলেন–

'মুসলিম জাতির আধ্যাত্মিক রাজধানী কুসতুনতুনিয়া থেকে মক্কায় স্থানান্তরের বিষয়টি খুব সহজ ও স্বাভাবিক একটি পদক্ষেপ, যা মানুষের বর্তমান চিন্তা-বিশ্বাসে তেমন কিছু আলোড়ন বা পরিবর্তন সৃষ্টি করবে না, এমনকি তা আলেমসমাজের চিন্তাধারা ও মতামতের সঙ্গেও পূর্ণ সঙ্গতিপূর্ণ। বস্তুত উম্মাহর

যারা কর্ণধার তাদের জন্য মক্কা-মদিনাই হচ্ছে শরিয়তনির্দেশিত আধ্যাত্মিক নিরাপদ আশ্রয়স্থান এবং অতিসত্বর এদু'টি শহরই হবে আধ্যাত্মিক শক্তির কেন্দ্রভূমি। এ বিষয়ে যার সঙ্গেই আমি কথা বলেছি, তুর্কীদের বন্ধুরা ছাড়া সবাই পূর্ণ একমত প্রকাশ করেছেন এবং আমাকে আশ্বস্ত করেছেন যে, আলেমগণও এ চিন্তার স্বতঃস্ফূর্ত সমর্থক। তবে ব্যক্তিগতভাবে আমি মনে করি, মক্কাই হওয়া উচিত খেলাফতের প্রধান কেন্দ্র। বহুদিন থেকে আমরা একটি জনপ্রিয় বাক্য শুনি, রোমই হচ্ছে রাজধানী। তো 'মক্কাই হচ্ছে রাজধানী' এ বাক্যটিও মানুষের চিন্তায় ব্যাপক প্রভাব বিস্তার করবে। সঙ্গে যদি যোগ করা হয়, 'খেলাফত কোরাইশের' তাহলে নিঃসন্দেহে আরবরা তা সাদরে গ্রহণ করবে, আর আমাদের ভুলে যাওয়া উচিত নয় যে, আরবদের প্রভাববলয় মরোক্ক থেকে বুশেহর পর্যন্ত বিস্তৃত। সুতরাং এ শ্লোগান দ্বারা কমপক্ষে মরোক্ক থেকে বুশেহর পর্যন্ত বিস্তৃত বিশুদ্ধ আরবজনগোষ্ঠীর মধ্যে একটি আলোড়ন ও আন্দোলন অবশ্যই সৃষ্টি হবে। একইভাবে ভারত ও মালয়-এর মুসলিম জনগোষ্ঠীও ঐ প্রভাববলয়ের মধ্যে পড়ে, বরং যে কোন মুসলিম জনগোষ্ঠী, যেখানেই হোক তাদের অধিবাস, অভিন্ন কক্ষপথেই তাদের চিন্তা আবর্তিত হবে, শুধু তুর্কীদের বাদ দিয়ে, যারা সময়ের সঙ্গে সঙ্গে শক্তি ও প্রভাব হারিয়েই চলেছে।'

এ থেকেই বোঝা যায়, আরবদের মগজ ধোলাইয়ের কাজটা কত বুদ্ধিবৃত্তিক কুশলতা ও রাজনৈতিক ধূর্ততার সঙ্গে সম্পন্ন করা হয়েছিলো![1] যাই হোক, ক্ষেত্র প্রস্তুত হয়ে গেলো। এর মধ্যে প্রথম বিশ্বযুদ্ধের আগুন জ্বলে উঠলো আর আরবদের সামনে উছমানি আনুগত্যের 'জোয়াল' ছুঁড়ে ফেলার সুযোগ অবারিত হলো, ওদিকে মিত্রশক্তিও সুযোগটি লুফে নিয়ে আরবদের সামনে জাতীয়তাবাদের বাজনা বাজাতে শুরু করলো। ধুরন্ধর টমাস লরেন্স এ সময় মাঠে নামলেন এবং আরব-জাতীয়তাবাদের আগুন ছড়িয়ে দিলেন। বিশিষ্ট-সাধারণ প্রতিটি আরবকে, যাকে যেভাবে পারা যায়, তুর্কীদের বিরুদ্ধে তিনি ক্ষেপিয়ে তুললেন।

হিজাযে শরীফ হোসায়ন বিদ্রোহ করলেন, শামে শামীরা এবং মিশরে মিশরীয়রা একই পথের পথিক হলো। মুসলিম তুর্কীরা, শত ত্রুটি ও দুর্বলতা সত্ত্বেও তখনো

[1] লেখক পঞ্চম অধ্যায়ের দ্বিতীয় পরিচ্ছেদে 'বোধ ও চেতনার পরিচর্যা' শিরোনামে যা লিখেছেন, এখানে একবার অবশ্যই তা পড়ে নেয়া দরকার। বস্তু কোন জনগোষ্ঠীর মধ্যে যত ভালো গুণ ও যোগ্যতাই থাক, যদি বোধ ও সচেতনতা না থাকে, তাহলে যে কোন কপটের কপটতাই তাকে সহজে বিভ্রান্ত করতে পারে। এমনকি তাহাজ্জুদগুজার মুত্তাকীও হতে পারে যেহনি গোমরাহির শিকার। –অনুবাদক

পর্যন্ত যারা ছিলো ইসলামের শক্তি ও প্রতাপের প্রতীক, এ দুঃসময়ে তাদের পাশে থাকার চেয়ে আরবরা মিত্রশক্তির পক্ষে ভিড়ে যাওয়াকেই লাভজনক মনে করলো। এ বিষয়ে কোরআন ও সুন্নাহর যত স্পষ্ট বাণী ও সতর্কবাণী ছিলো, সব ভুলে গিয়ে মিত্রশক্তির মিষ্টি মিষ্টি প্রতিশ্রুতির উপরই তারা ভরসা করলো, যাদের রাজনীতি ও কূটনীতি সতত পরিবর্তনশীল; সুবিধা ও স্বার্থ ছাড়া আর কিছু যারা জানে না এবং শক্তি ও ক্ষমতা ছাড়া আর কিছুর যারা পূজা করে না; সর্বোপরি ইসলাম ও মুসলিম উম্মাহর প্রতি ঘৃণা-বিদ্বেষই যাদের রাজনীতি ও শাসননীতির মূল চালিকাশক্তি। সিরিয়ায় আরব হাশেমি শাসন প্রতিষ্ঠার পর মিত্রশক্তি কীভাবে সব প্রতিশ্রুতি বেমালুম ভুলে গেলো এবং হাশেমীদের দু'দিনের রাজত্ব তাশের ঘরের মত ভেঙ্গে পড়লো সে ইতিহাস তো সবারই জানা। ইতিহাসে তো অনেক কিছুই আছে, কিন্তু সময়মত মনে পড়ে কোথায়! মনে পড়লেও তা থেকে শিক্ষা নেয়ার ইচ্ছা কোথায়!

তারপর এলো আরবজাতীয়তাদের আদর্শিক চেতনার যুগ। বস্তুত এটা ছিলো আগাগোড়া এক পাশ্চাত্য চিন্তা-চেতনা এবং সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র ও পূর্ণাঙ্গ এক চিন্তা-দর্শন। ধর্মের প্রতি যে পরিমাণ আবেগ-উদ্দীপনা, উচ্ছ্বাস-উত্তেজনা ও প্রশ্নাতীত পবিত্রতার অনুভূতি মানুষের অন্তরে থাকে জাতীয়তাবাদের পক্ষে সেগুলো পূর্ণমাত্রায়ই সক্রিয় ছিলো, বরং বলা চলে, একটি নতুন ধর্মরূপেই যেন তা আত্ম-প্রকাশ করেছিলো। ফলে শিক্ষিত আরবজনগোষ্ঠী, বিশেষত যুবসমাজ, বিভিন্ন কারণে ধর্মের সঙ্গে যাদের যোগসূত্র দুর্বল হয়ে পড়েছিলো, দলে দলে জাতীয়তাবাদের পতাকাতলে সমবেত হলো। সম্ভাব্য কম সময়ে এবং সহজতম উপায়ে গৌরব ও মর্যাদা অর্জনের এবং উন্নতি ও সমৃদ্ধির পথে স্বাধীন ও প্রাগ্রসর জাতিবর্গের সমকক্ষতা অর্জনের এক উদগ্র আকাঙ্ক্ষা তাদের পেয়ে বসেছিলো। আর এজন্য তাদের ধারণামতে আরবজাতীয়তাবাদের কোন বিকল্প ছিলো না। অন্যদিকে পশ্চিমা শক্তিগুলোর প্রতি তাদের মধ্যে বিরাট ক্ষোভ ও হতাশা সৃষ্টি হয়েছিলো, যারা আরবদের বুকে বিষফোড়ার মত ইহুদিরাষ্ট্র ইসরাইলের জন্ম দিয়েছিলো এবং সর্বোতভাবে তাকে লালন-পালন করে যাচ্ছিলো। এ অপমানজনক পরিস্থিতিরই প্রচণ্ড প্রতিক্রিয়া ও চিন্তানৈতিক বিপ্লবরূপে আরবরা আরব-জাতীয়তাবাদের আশ্রয় গ্রহণ করলো। অতিউৎসাহীরা এক্ষেত্রে এতই সীমালঙ্ঘন করলো যে, আরবজাতীয়তাবাদ ছাড়া সবকিছু প্রত্যাখ্যান করার এবং প্রয়োজনে তার বিরুদ্ধে লড়াই করার জন্যও তারা প্রস্তুত হয়ে গেলো, এমনকি ইসলাম ও ইসলামী ভ্রাতৃত্বের বিরুদ্ধেও।

ঝড় ঝড়ের মতই এসেছিলো সাগর উত্তাল করে এবং জোয়ার জোয়ারের মতই এসেছিলো সবকিছু ভাসিয়ে নিতে; তবে জাতীয়তাবাদের জোয়ারে ভাটার টান লাগতেও বেশী দেরী হলো না। কারণ শত্রুর বিরুদ্ধে শ্রেষ্ঠ অস্ত্র এবং হারানো আরবমর্যাদা পুনরুদ্ধারের সর্বোত্তম উপায়রূপে যে আরবজাতীয়তাবাদ তারা আঁকড়ে ধরেছিলো তা ষাতষট্টির আরব-ইসরাইল যুদ্ধে কোন অলৌকিক ফল বয়ে আনতে পারেনি, বরং বয়ে এনেছে নতুন জাতীয় লাঞ্ছনা ও যিল্লতি।

ইউরোপের জাতীয়তাবাদ– উপকরণ ও প্রকৃতি

আগের আলোচনায় ফিরে আসি। ইউরোপে সঙ্কীর্ণ জাতীয়তাবাদী চিন্তা-চেতনার অনিবার্য ফল এই দাঁড়িয়েছিলো যে, ছোট-বড় প্রতিটি জনপদ ও জনগোষ্ঠী নিজেদের ভিন্ন জগতের বাসিন্দা বলে ভাবতে শুরু করলো, যার বাইরে আর কোন জগত নেই। একদিকে ভূগোল ও প্রকৃতি তাদের নদী-পর্বতের সীমারেখা দ্বারা বিচ্ছিন্ন করে রেখেছিলো, অন্য দিকে তারা নিজেরাও রাজনৈতিক ও ঔপনিবেশিক স্বার্থে সঙ্কীর্ণ একটি 'আত্মবেষ্টনী' তৈরী করে নিয়েছিলো। ঐ সীমারেখা ও বেষ্টনীর বাইরে যে আরো জগত আছে এবং সেখানে আছে মানুষের অধিবাস তা তারা ভাবতেই প্রস্তুত ছিলো না। নিজেদের অস্তিত্বের বাইরে অন্য কিছুর প্রতি তাদের না ছিলো আগ্রহ, না ছিলো শ্রদ্ধা। নিজেদের তারা উপাস্যের আসনে বসিয়ে আত্ম-উপাসনায় মেতে উঠেছিলো। উপাস্য ও উপাসিতের মধ্যে উপাসনা ও বন্দনার যত রকম সম্পর্ক হতে পারে সবই তারা গ্রহণ করেছিলো। তাদের যুদ্ধ ছিলো এই উপাস্যের সন্তুষ্টির জন্য; হত্যা ও লুণ্ঠন এবং জনপদের পর জনপদের ধ্বংসসাধন, সবই ছিলো ঐ উপাস্যের ক্ষুধা ও চাহিদা পূরণের জন্য। এককথায় আত্ম-উপাস্যের আত্মবন্দনার জন্যই ছিলো তাদের জীবন ও মরণ এবং যুদ্ধ ও লুণ্ঠন।

জাতীয়তাবাদ নামের এ নতুন ধর্মের প্রথম বিশ্বাসই ছিলো এই যে, জাতি ও জাতীয়তা হচ্ছে সবকিছুর উর্ধ্বে। আমার জাতির চেয়ে উত্তম এবং আমার দেশের চেয়ে সুন্দর কোন দেশ ও জাতি পৃথিবীতে নেই। স্রষ্টা বলে যদি কিছু থেকে থাকে, কিংবা এ শব্দটির ব্যবহার যদি জাতীয় স্বার্থের অনুকূল হয় তাহলে বুদ্ধি, মেধা, গুণ ও প্রজ্ঞায় এবং বিশ্বকে শাসন করার যোগ্যতায় তিনিই আমার জাতিকে অন্য জাতির উপর শ্রেষ্ঠত্ব দান করেছেন। সুতরাং পৃথিবীতে আমরাই স্রষ্টার নির্বাচিত শাসক ও অভিভাবক। শাসন করা আমাদের অধিকার, আর

আনুগত্য ও দাসত্ব হলো সর্বজাতির কর্তব্য। এককথায় জাতীয়তাবাদের এই আগ্রাসী দানব অন্য কোন জাতি ও জনগোষ্ঠীকে পৃথিবীর কোন ভূখণ্ডে বাস করার ও বেঁচে থাকার অধিকারই দিতে রাজি নয়, যতক্ষণ না তারা দাসত্ব ও আনুগত্য স্বীকার করে নেবে।

এই আগ্রাসী চিন্তার ক্ষেত্রে বর্তমান ইউরোপের জাতি ও রাষ্ট্রগুলোর মধ্যে গুণগত কোন পার্থক্য নেই। হিংস্রতায়, রক্তলোলুপতায়, সম্পদলুণ্ঠনের উন্মত্ততায় একই সমান্তরালে সবার অবস্থান। পার্থক্য শুধু কৌশলে ও কর্মপন্থায় এবং আবরণে ও আলখেল্লায়। কেউ যা বলে তাই করে এবং যা করে তাই বলে, আর কেউ যা করে, মুখে তা বলে না, অর্থাৎ পিঠে ছুরি বসায়, তবে মুখের হাসি থাকে অটুট। কৌশল যাই হোক, উদ্দেশ্য অভিন্ন। কারণ জাতীয়তাবাদের বীজ যে মাটিতে এবং যে জলবায়ুতে যেভাবেই বপন করা হোক তার বৃক্ষ হবে কন্টকাকীর্ণ এবং ফল হবে তিক্ত ও বিষাক্ত। এটা সম্ভবই নয় যে, কোন জাতি জাতীয়তাবাদে বিশ্বাসী হবে আর তার মধ্যে লুণ্ঠন ও আগ্রাসনের মনোভাব থাকবে না, কিংবা অন্য জাতির প্রতি ঘৃণা-বিদ্বেষ ও তাচ্ছিল্যের অনুভূতি থাকবে না। যেমন সম্ভব নয়, কেউ মদে চুর হবে, কিন্তু নেশাগ্রস্ত হবে না এবং প্রলাপ বকবে না। কবির ভাষায়–

ألقاه في اليم مكتوفا وقال له   إياك إياك أن تبتل بالماء

'হাত-পা বেঁধে ফেলে দিলো নদীতে, আর বলা হলো, সাবধান, ভিজে না যেন পানিতে।'[১]

বিশেষ করে শিল্প ও সাহিত্য এবং ইতিহাস ও দর্শন, এমনকি জ্ঞান-বিজ্ঞানও যখন জাতীয়তাবাদী চেতনার অনুঘটকরূপে কাজ করে এবং জাতির সর্বস্তরে রক্ত-বংশের অহঙ্কার ও অতীত ঐতিহ্য নিয়ে গর্ব করার মানসিকতায় সুড়সুড়ি দেয়, আর তাতে কোন ধর্মীয় ও নৈতিক বাধা-প্রতিবন্ধকও না থাকে, তদুপরি জাতির নেতৃত্ব ও কর্তৃত্ব যখন তাদের হাতে চলে যায়, জাতীয় অহঙ্কার ও আত্মগৌরবের প্রচার ছাড়া যাদের আর কোন লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য নেই তখন অবস্থা কত ভয়াবহ হতে পারে তা তো বলাই বাহুল্য।

যে দু'টি উপাদান ছাড়া জাতীয়তাবাদ কখনো টিকে থাকতে পারে না, যাকে বলা

---

[১] ديوان الحلاج طبع دار صادر بيروت প্রকাশকাল ১৯৯৮, পৃ.২৬

যায় জাতীয়তাবাদের মূল প্রাণ, তা হলো ভীতি ও ঘৃণা। জাতির সামনে যদি ঘৃণা ও ভয় করার মত কিছু তুলে ধরা না যায় তাহলে জাতীয়তাবাদের চেতনা সৃষ্টি হতে পারে না, হলেও স্থায়ী হতে পারে না। তাই জাতীয় নেতৃত্ব যাদের হাতে, খুব কৌশলে তারা ঘৃণা ও ভয়, এ দুই পথে জাতির আবেগ-অনুভূতি উসকে দেয় এবং 'ব্যথার শিরায়' চাপ দিয়ে এমন তোলপাড় ও উন্মাদনা সৃষ্টি করে, যেন এক প্রলয়ঙ্করী ঝড় ও জলোচ্ছ্বাস!

এজন্য কখনো তারা তিলকে তাল বানায়, তুচ্ছাতিতুচ্ছ বিষয়কে কেন্দ্র করে এবং বাস্তব-অবাস্তব শত্রুকে সামনে এনে জাতির ভিতরে ভয়-ভীতি ও ক্রোধ-ঘৃণার অনুভূতি চাঙ্গা রাখার প্রয়াস চালায়। কারণ এরই মধ্যে রয়েছে তাদের অস্তিত্বের নিশ্চয়তা এবং শাসন ও নেতৃত্বের নিরাপত্তা। ভয়-ভীতি ও ক্রোধ-ঘৃণাই জাতীয়তাবাদের প্রধান খাদ্য। বস্তুত এদু'টি অনুঘটক না থাকলে জাতীয়তাবাদের বেলুন বহু আগেই চুপসে যেতো এবং জাতীয়তাবাদের জোয়ারে কবেই ভাটার টান শুরু হয়ে যেতো। এবিষয়ে প্রফেসর জুড যে দার্শনিক ও মনস্তাত্ত্বিক বিশ্লেষণ পেশ করেছেন তা দেখুন–

'কোন সম্প্রদায়ে যে চেতনাটি সার্বজনীনরূপে বিদ্যমান এবং যা খুব সহজেই জাগিয়ে ও চাগিয়ে তোলা যায় এবং যার মাধ্যমে গোটা সম্প্রদায়কে উদ্দীপ্ত করা যায় তা কিন্তু প্রেম-ভালোবাসার অনুভূতি নয়, বরং ভয়-ভীতি ও ক্রোধ-ঘৃণার অনুভূতি। ভালো-মন্দ যে কোন উদ্দেশ্যে যারা কোন সম্প্রদায়ের উপর শাসন ও কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করতে চায়, তাতে সফল হওয়া সম্ভব নয়, যতক্ষণ না ভয় বা ঘৃণা করার মত কিছু তারা মানুষের সামনে তুলে ধরতে পারবে, হোক তা কোন বস্তু বা ব্যক্তি, কিংবা কোন দল ও জনগোষ্ঠী।

আমার কথাই ধরুন; আমি যদি (পরস্পর যুদ্ধরত) বিভিন্ন জনগোষ্ঠীকে ঐক্যবদ্ধ করতে চাই তাহলে আমার কর্তব্য হবে চাঁদ-মঙ্গল যে কোন গ্রহ-উপগ্রহ থেকে কোন কাল্পনিক শত্রু তাদের সামনে খাড়া করা, যাকে তারা ভয় বা ঘৃণা করবে (তারপর অস্তিত্ব রক্ষার প্রয়োজনে সমস্ত আত্মকলহ ভুলে গিয়ে ঐ শত্রুর বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ হবে)।

এ দৃষ্টিকোণ থেকে চিন্তা করলে আর অবাক হওয়ার কিছু থাকে না যখন আমরা দেখি, সে যুগের জাতীয় সরকারগুলো প্রতিবেশী জাতির সঙ্গে আচরণের ক্ষেত্রে ভীতি ও ঘৃণার আবেগের উপর নির্ভরশীল ছিলো এবং শাসকশ্রেণীর কাছে এটাই

ছিলো শাসন ও নেতৃত্বের রক্ষাকবচ এবং এটাই ছিলো জাতীয় ঐক্য-চেতনার বুনিয়াদ।[১]

জাতিগত হানাহানি ও সঙ্ঘাত নিরসনের ইসলামী সমাধান

আজকের বিশ্বে এই যে জাতিগত হানাহানি ও সঙ্ঘর্ষ এবং অর্থ ও স্বার্থের দ্বন্দ্ব-সঞ্জাত তা থেকে মানবজাতির উদ্ধারের জন্য প্রফেসর জুড যে সমাধান দিয়েছেন তা খুবই যুক্তিপূর্ণ ও বোধগম্য। এটা অবশ্যই স্বতঃসিদ্ধ সত্য যে, বিভিন্ন জাতি ও জনগোষ্ঠীর দ্বন্দ্ব-সঞ্জাত কখনো বন্ধ হবে না যদি না তা অন্যখাতে প্রবাহিত করার ব্যবস্থা হয়। এজন্য কোন বহিঃশত্রুকে তাদের সামনে আনতে হবে যার প্রতি তাদের সবার থাকবে প্রচণ্ড ভয়-ভীতি, ক্রোধ-আক্রোশ ও ঘৃণা-বিদ্বেষ, আর ঐ সাধারণ শত্রুর বিরুদ্ধে লড়তে গিয়ে তারা পরস্পরের প্রতি বাড়িয়ে দেবে সহযোগিতার হাত এবং পোষণ করবে সহানুভূতি ও সহমর্মিতা। তবে এজন্য, মিস্টার জুড যেমন বলেছেন, কল্পনা ও উদ্ভাবনা শক্তির প্রয়োজন নেই এবং চাঁদ-মঙ্গল থেকে শত্রু খুঁজে আনার দরকার নেই। কারণ কোরআনের ভাষায়–

أنى لهم التناوش من مكان بعيد

'কীভাবে সম্ভব হবে তাদের জন্য অত দূর থেকে লড়াই করা।'

তাই আল্লাহর মনোনীত আসমানী ধর্ম ইসলাম সমগ্র মানবজাতিকে সতর্ক করে দিয়ে ঘোষণা করেছে, আদম-সন্তানের এই সাধারণ শত্রু অন্যখানে, অন্য কোন গ্রহে নয়, বরং এই পৃথিবীতেই রয়েছে। সুতরাং আদম-সন্তানের কর্তব্য হলো ভয় ও ঘৃণা এবং জোশ ও জযবা, যাই বলো, এই সাধারণ শত্রুর প্রতি নিবদ্ধ করা এবং তাকেই ঘায়েল করার জন্য ভাষা, বর্ণ ও গোত্র নির্বিশেষে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে লড়াই করা। কোরআনের ভাষায়–

يَٰٓأَيُّهَا ٱلنَّاسُ إِنَّ وَعْدَ ٱللَّهِ حَقٌّۖ فَلَا تَغُرَّنَّكُمُ ٱلْحَيَوٰةُ ٱلدُّنْيَاۖ وَلَا يَغُرَّنَّكُم بِٱللَّهِ ٱلْغَرُورُ ۝٥ إِنَّ ٱلشَّيْطَٰنَ لَكُمْ عَدُوٌّ فَٱتَّخِذُوهُ عَدُوًّاۚ إِنَّمَا يَدْعُوا۟ حِزْبَهُۥ لِيَكُونُوا۟ مِنْ أَصْحَٰبِ ٱلسَّعِيرِ ۝٦

[১] guide to modern wickedness, p. 150

হে লোকসকল, নিঃসন্দেহে আল্লাহর ওয়াদা চিরসত্য, সুতরাং পার্থিব জীবন যেন তোমাদের ধোকায় না ফেলে, আর ঐ প্রতারক যেন আল্লাহর বিষয়ে তোমাদের প্রতারিত না করে। শয়তান তোমাদের জন্য শত্রু, সুতরাং তাকে শত্রুরূপেই গ্রহণ করো। নিঃসন্দেহে শয়তান তার দলকে ডাকে যাতে তারা জাহান্নামী হয়। (ফাতির, ৩৫ : ৬)

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ ٱدْخُلُوا۟ فِى ٱلسِّلْمِ كَآفَّةً وَلَا تَتَّبِعُوا۟ خُطُوَٰتِ ٱلشَّيْطَٰنِ ۚ إِنَّهُۥ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ

হে ঈমানদারগণ, তোমরা শান্তির ধর্মে প্রবেশ করো পরিপূর্ণরূপে, আর তোমরা শয়তানের পথে চলো না। নিঃসন্দেহে সে তোমাদের 'খোলা দুশমন'।'

(বাকারাহ, ২ : ২০৮)

এ কারণেই ইসলাম গোটা মানবজাতিকে শুধু দু'ভাগে ভাগ করেছে; হক ও সত্যের অনুসারী এবং মিথ্যা ও বাতিলের পূজারী; এককথায় আল্লাহর দল ও শয়তানের দল। তারপর আল্লাহর দলের প্রতি ইসলামের উদাত্ত আহ্বান হলো শয়তানি দলের বিরুদ্ধে জিহাদ ও লড়াই করা। কেননা তারা যমিনে শুধু ফিতনা-ফাসাদ, অনাচার-পাপাচার ছড়ায়, আর সত্য ও সুন্দর এবং ন্যায় ও কল্যাণকে পৃথিবী থেকে বিলুপ্ত করতে চায়। তাই তাদের বিরুদ্ধে লড়াই করতে হবে, দেশ ও জাতীয়তা এবং ভাষা ও গোত্রপরিচয় তাদের যাই হোক। ঘৃণা-বিদ্বেষ ও লড়াই-যুদ্ধের বুনিয়াদ ইসলামের দৃষ্টিতে ভূগোলের সীমারেখা যেমন নয় তেমনি নয় ভাষা ও বর্ণের ব্যবধান, বরং একমাত্র বুনিয়াদ হলো আকীদা ও বিশ্বাস, নীতি ও নৈতিকতা, মানবতার কল্যাণ-অকল্যাণ এবং আল্লাহর প্রতি আনুগত্য ও বিদ্রোহ। কোরআনের ঘোষণা—

ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ يُقَٰتِلُونَ فِى سَبِيلِ ٱللَّهِ ۖ وَٱلَّذِينَ كَفَرُوا۟ يُقَٰتِلُونَ فِى سَبِيلِ ٱلطَّٰغُوتِ فَقَٰتِلُوٓا۟ أَوْلِيَآءَ ٱلشَّيْطَٰنِ ۖ إِنَّ كَيْدَ ٱلشَّيْطَٰنِ كَانَ ضَعِيفًا

'যারা ঈমান এনেছে তারা আল্লাহর পথে লড়াই করে, আর যারা কুফুরি করেছে তারা লড়াই করে তাগূতের পথে। সুতরাং তোমরা শয়তানের দোসরদের বিরুদ্ধে লড়াই করো। নিঃসন্দেহে শয়তানের চক্রান্ত অতি দুর্বল।' (নিসা, ৪ : ৭৬)

এই যে শয়তান ও তার দোসরদের বিরুদ্ধে লড়াই, এর ফল ও পরিণাম কী? তাও আগাম জানিয়ে দিয়ে মানুষকে আল্লাহ আশ্বস্ত করেছেন—

أُو۟لَٰٓئِكَ حِزْبُ ٱللَّهِ ۚ أَلَآ إِنَّ حِزْبَ ٱللَّهِ هُمُ ٱلْمُفْلِحُونَ

ওরাই হলো আল্লাহর দল, আর শোনো, আল্লাহর দলই হবে সফলকাম।

(মুজাদালাহ, ৫৮ : ২২)

ٱسْتَحْوَذَ عَلَيْهِمُ ٱلشَّيْطَٰنُ فَأَنسَىٰهُمْ ذِكْرَ ٱللَّهِ ۚ أُو۟لَٰٓئِكَ حِزْبُ ٱلشَّيْطَٰنِ ۚ أَلَآ إِنَّ حِزْبَ ٱلشَّيْطَٰنِ هُمُ ٱلْخَٰسِرُونَ

শয়তান তাদের উপর আধিপত্য বিস্তার করে ফেলেছে, অনন্তর তাদেরকে আল্লাহর স্মরণ ভুলিয়ে দিয়েছে। ওরাই হলো শয়তানের দল, আর শোনো, শয়তানের দলই হবে ক্ষতিগ্রস্ত। (মুজাদালাহ, ৫৮ : ১৯)

হাঁ, আল্লাহর নবী আল্লাহর জন্য জিহাদ ও যুদ্ধ করেছেন, তবে তা আরব বা অনারব কোন জাতি ও জনগোষ্ঠীর স্বার্থের জন্য ছিলো না, বরং ছিলো মানবতার সামগ্রিক কল্যাণের জন্য। এই জিহাদ ও যুদ্ধ একদিকে যেমন শয়তানের বন্ধু ও মানবতার শত্রুদের দমন করেছে তেমনি অন্যদিকে বয়ে এনেছে মানবতার জন্য শান্তি ও সমৃদ্ধি এবং পারলৌকিক মুক্তি ও সৌভাগ্য। অথচ সভ্যতার ইতিহাস এর চেয়ে কম রক্তক্ষয়ী যুদ্ধ আর কখনো দেখেনি। ছোট্ট একটি পরিসংখ্যান শুনুন। দ্বিতীয় থেকে নবম হিজরী পর্যন্ত সমস্ত গাযওয়া ও সারিয়ায় উভয় পক্ষে নিহতের সংখ্যা হচ্ছে একহাজার আঠারো। মুসলমান দু'শ উনষাট, আর কাফির হলো সাতশ উনষাট।[১] পক্ষান্তরে ইতিহাসে এর আগে ও পরে যত যুদ্ধ হয়েছে তার যে কোন একটির রক্তপাতের পরিমাণ দেখুন, আপনি হতবাক হবেন; হিংস্রতা ও নিষ্ঠুরতা, বর্বরতা ও পাশবিকতা এবং অর্থসম্পদের ক্ষয়ক্ষতির কথা নাই বা বলা হলো।

---

[১] এ পরিসংখ্যান নেয়া হয়েছে সুপ্রসিদ্ধ সীরাত-সঙ্কলক কাযী মুহম্মদ সোলায়মান মানছুরপুরী-রচিত 'সীরাতে রাহমাতুল-লিল আলামীন' থেকে, যেখানে ছোট-বড় প্রতিটি যুদ্ধ ও সংঘর্ষ তালিকাভুক্ত হয়েছে। পক্ষান্তরে অন্যান্য সীরাত সঙ্কলকের পরিসংখ্যানে এ সংখ্যা আরো কম এসেছে।

ইসলামের ধর্মযুদ্ধ তো রক্তপাত বন্ধ করেছে এবং শান্তি ও নিরাপত্তা নিশ্চিত করেছে; সর্বোপরি তা মানবতার জন্য কল্যাণ ও সৌভাগ্য বয়ে এনেছে। পক্ষান্তরে অন্যান্য যুদ্ধ মানবজাতিকে কী উপহার দিয়েছে? সঙ্ঘাতের পর সঙ্ঘাত, ধ্বংসের পর ধ্বংস ছাড়া আর কিছু? প্রথম বিশ্বযুদ্ধের বিজয়ী বীর মিস্টার লয়েড জর্জ, যিনি তখন বৃটিশ মন্ত্রিসভার প্রধান ছিলেন এবং ১৯১৯ খৃ-অনুষ্ঠিত ভার্সাই সন্ধিচুক্তিতে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছেন, তার মন্তব্য শুনুন–

'প্রভু যিশু যদি ফিরে আসেন, খুব সামান্য সময়ই বেঁচে থাকতে পারবেন। কারণ তিনি দেখবেন, দু'হাজার বছর পরো মানুষ পাপাচারে ও খুনাখুনিতে লিপ্ত। মানুষই এখন মানুষের হিংস্রতায় বিপর্যস্ত। আমি তো বলতে চাই, ইতিহাসের বৃহত্তম যুদ্ধটি মানবজাতির রক্ত নিঃশেষ করে সেরেছে। ফসল ও গবাদিপশু ধ্বংস হওয়ার পর মানুষ এখন অনাহারে দুর্ভিক্ষে মারা যাচ্ছে।
বলুন তো প্রভু যিশু পৃথিবীতে এসে কী দেখবেন? তিনি কি দেখবেন যে, মানুষ ভাই ও বন্ধুর মত পরস্পর করমর্দন করছে? নাকি দেখবেন, প্রথম যুদ্ধের চেয়েও ভয়াবহ ও ধ্বংসাত্মক যুদ্ধের আয়োজন শুরু হয়েছে, আর মানুষ পাশবিকতা ও নিষ্ঠুরতার নতুন নতুন উপায় উদ্ভাবনের প্রতিযোগিতায় মেতে উঠেছে?'[১]

এই যে বিভিন্ন জাতি আজ হিংসা-হানাহানিতে লিপ্ত; এই যে তারা একের পর এক ভয়ঙ্কর সব যুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়ছে, কেন? এই যে ভৌগোলিকতার শ্লোগান এবং জাতীয়তাবাদের জয়গান, মানুষ তাতে কেন এমন বিভোর? কারণ শুধু এই, দেশ, অঞ্চল, বর্ণ, ভাষা, গোত্র নির্বিশেষে মানুষ আজ তার প্রকৃত শত্রুকে ভুলে গিয়েছে। যা ছিলো মানবজাতির সম্মিলিত যুদ্ধক্ষেত্র তা থেকে সরে গিয়ে মানুষ নিজেই এখন বিভিন্ন দলে বিভক্ত হয়ে আত্মঘাতী যুদ্ধে লিপ্ত হয়ে পড়েছে। এটাই স্বাভাবিক; আগুন যদি গ্রাস করার মত কিছু না পায় তখন নিজেই নিজেকে গ্রাস করে। তাই তো সেই কবে জাহেলি যুগের কবি বলে গিয়েছেন–

---

[১] তার দূরদর্শী ভবিষ্যদ্বাণী কয়েক বছরের ব্যবধানেই দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ আকারে সত্য প্রমাণিত হয়েছে, যাতে মানবজাতিকে প্রথম বিশ্বযুদ্ধের চেয়ে বহুগুণ বেশী বরবাদি ও ধ্বংসযজ্ঞের সম্মুখীন হতে হয়েছে। ১৯৪৫ সালে মৃত্যুবরণকারী লয়েড জর্জ কি কল্পনাও করতে পেরেছিলেন যে, হিরোশিমা ও নাগাসাকির মত দু'টি সমৃদ্ধ জনপদ ধ্বংস করে দেয়া হবে শুধু পারমাণবিক বোমার ধ্বংসযজ্ঞের বাস্তব অভিজ্ঞতা অর্জনের নামে!

وأحيانا على بكر أخينا   إذا ما لم نجد إلا أخانا

'কখনো ঝাঁপিয়ে পড়ি আমাদের গোত্র-ভাই বকরের উপর, যখন ভাই ছাড়া কাউকে খুঁজে না পাই।'

পক্ষান্তরে মানুষ যদি তার আসল শত্রুকে চিনতে পারে এবং অদৃশ্য এই শত্রু, শক্তিতে ও কূটকৌশলে কতটা ভয়ঙ্কর তা বুঝতে পারে তাহলে মুহূর্তের মধ্যে তারা নিজেদের মধ্যে বিদ্যমান সব কৃত্রিম শত্রুতা, হিংসা-বিদ্বেষ ও লড়াই-বিবাদ ভুলে যাবে। এত দিনের সব শত্রু তখন হয়ে যাবে ভাই ও বন্ধু তখন তারা শিসাঢালা প্রাচীরের মত ঐ শত্রুর বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াবে। যেমন আরবের প্রাচীন প্রবাদে বলা হয়েছে–

عند الحفيظة تذهب الأحقاد

'আত্মরক্ষার লড়াই হিংসা-বিদ্বেষ ভুলিয়ে দেয়।'

বিশ্বনবী মুহম্মদ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর নবুবী তারবিয়াতের মাধ্যমে এটাই করেছিলেন। মদীনায় আউস ও খাযরাজ গোত্রের যে দীর্ঘ ভ্রাতৃঘাতী যুদ্ধ এবং জাযীরাতুল আরবে কাহতান ও আদনান গোত্রের যে আত্মবিনাশী সঙ্ঘাত-সঙ্ঘর্ষ, কীভাবে তা বন্ধ হলো? কারণ ছোট-বড় সমস্ত গোত্রকে তিনি কুফুর, জাহিলিয়াত ও শয়তানিয়াতের বিরুদ্ধে এক উম্মাহ ও অভিন্ন শিবিরে পরিণত করেছিলেন। তাদের তিনি এক আল্লাহর প্রতি ঈমানের দাওয়াত দিয়েছিলেন। পরস্পর হিংসা-বিদ্বেষ ও খুন-খারাবি ভুলে গিয়ে তারা হয়েছিলো ভাই ভাই। 'ইন্নামাল মু'মিনূনা ইখওয়াহ' এই বিশ্বাস ও চেতনায় উদ্বুদ্ধ হয়ে তারা যেন এক নবজন্ম লাভ করেছিলেন। কারণ আল্লাহর নবী তাদের জন্য অতি ধুরন্ধর ও শক্তিধর একটি বহিঃশত্রু চিহ্নিত করেছিলেন, যাকে তারা ভয় ও ঘৃণা করবে এবং চিরশত্রুরূপে তার বিরুদ্ধে লড়াই করবে, আর সে শত্রু হলো শয়তান ও তার অনুচর, কোরআনের ভাষায় যারা হলো তাগুত এবং আউলিয়াউশ শয়তান। তিনি তাদের সামনে এ আসমানি ঘোষণা তুলে ধরেছেন–

ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ يُقَـٰتِلُونَ فِى سَبِيلِ ٱللَّهِ ۖ وَٱلَّذِينَ كَفَرُوا۟ يُقَـٰتِلُونَ فِى سَبِيلِ ٱلطَّـٰغُوتِ فَقَـٰتِلُوٓا۟ أَوْلِيَآءَ ٱلشَّيْطَـٰنِ ۖ إِنَّ كَيْدَ ٱلشَّيْطَـٰنِ كَانَ ضَعِيفًا ﴿٧٦﴾

'যারা ঈমান এনেছে তারা আল্লাহর পথে লড়াই করে, আর যারা কুফুরি করেছে তারা লড়াই করে তাগূতের পথে। সুতরাং তোমরা শয়তানের দোসরদের বিরুদ্ধে লড়াই করো। নিঃসন্দেহে শয়তানের চক্রান্ত অতি দুর্বল।' (নিসা, ৪ : ৭৬)

মুসলিম উম্মাহ যতদিন এই সাধারণ শত্রুর কথা মনে রেখেছে ততদিন তারা পরস্পর হিংসা-বিদ্বেষ ও লড়াই-বিবাদ থেকে দূরে ছিলো। কিন্তু যখনই তারা এই সাধারণ শত্রুর কথা ভুলে গেলো এবং তার বিরুদ্ধে লড়াই করা ছেড়ে দিলো তখনই তাদের মধ্যে জাহেলিয়াতের শত্রুতা আবার মাথাচাড়া দিয়ে উঠলো এবং তারা ভয়াবহ অন্তর্কলহ ও গৃহযুদ্ধে লিপ্ত হয়ে পড়লো। এভাবে এক ও অভিন্ন মুসলিম উম্মাহর ভিতরে সর্বগ্রাসী ফেতনার আগুন জ্বলে উঠলো, যা ইতিহাসের পাতায় আমাদের কলঙ্ক হিসাবে এখনো লেখা আছে।

ফেতনার আগুন কি এখন নিভেছে? না নিভেনি। এখনো মুসলিমের তলোয়ার মুসলিমের রক্তে রঞ্জিত হয়; এখনো আমাদের বারুদে আমাদের জনপদ দাউ দাউ জ্বলে, আর শয়তান হাসে হায়েনার হাসি! যে পথে মুক্তি এসেছিলো সেদিন জাহেলিয়াতের অন্ধকার থেকে, সে পথেই আজ মুক্তি আসতে পারে ইউরোপের আধুনিক জাহেলিয়াতের দুর্যোগ থেকে।

لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح أولها

এই উম্মাহর শুরুর সংশোধন যেভাবে হয়েছে, সেভাবেই শুধু হতে তার শেষ-ভাগের সংশোধন।

মানব-ইতিহাসের শুরু থেকে আজ পর্যন্ত জাতীয়তাবাদী চেতনা ও উন্মাদনা যখন যেখানে শিকড় গেড়েছে, পরস্পরের প্রতি ভয়ভীতি ও ঘৃণা-বিদ্বেষের মাধ্যমেই গেড়েছে। অতীত ও বর্তমানের প্রত্যেক জাতীয়তাবাদী সরকার ও সাম্রাজ্য ভয়-ভীতি ও ঘৃণা-বিদ্বেষ, এদু'টি অশুভ শক্তির উপর ভিত্তি করেই গড়ে উঠেছে। প্রাচীন ও আধুনিক যতগুলো ভয়াবহ যুদ্ধ সংঘটিত হয়েছে, যা সমগ্র মানবজাতির অস্তিত্বের প্রতি ছিলো অব্যাহত হুমকি, মূলত তা এদুই জিঘাংসা ও উন্মাদনারই মর্মন্তুদ পরিণতি।

তাওহীদ ও রিসালাতের দাওয়াত এবং মানবতার ঐক্য ও ভ্রাতৃত্বের আহ্বান নিয়ে যখন ইসলামের আবির্ভাব হলো তখন এই অভিশপ্ত সাম্প্রদায়িকতা ও জাতীয়তাবাদকে জাহিলিয়াত বলে ঘোষণা করলো এবং ঐসব যুদ্ধ-বিগ্রহ ও খুন-

খারাবিকে হারাম ঘোষণা করলো যার ভিত্তি হচ্ছে নিছক সম্প্রদায়প্রীতি ও জাত্যাভিমান; যেখানে নীতি ও ন্যায়নীতির চিন্তা নেই, সততা ও সুবিচারের প্রশ্ন নেই; আছে শুধু আপন সম্প্রদায়ের স্তুতি-বন্দনা এবং অন্য সম্প্রদায়ে প্রতি ভীতি ও ঘৃণা। আল্লাহর নবী সুস্পষ্ট ভাষায় ঘোষণা করলেন–

ليس منا من دعا إلى عصبية، وليس منا من قاتل على عصبية، وليس منا من مات على عصبية

যারা সাম্প্রদায়িকতার ডাক দেবে তারা আমাদের দলভুক্ত নয় এবং যারা সাম্প্রদায়িকতার উপর লড়াই করবে তারা আমাদের দলভুক্ত নয় এবং যারা সাম্প্রদায়িকতার উপর মারা যাবে তারা আমাদের দলভুক্ত নয়।[১]

জাতীয়তাবাদ ও সাম্প্রদায়িকতার যুদ্ধে মৃত্যুকে ইসলাম জাহিলিয়াতের মৃত্যু বলে ঘোষণা করেছে, যার পরিণাম হলো চিরস্থায়ী জাহান্নাম। হাদীছ শরীফে ইরশাদ হয়েছে–

من قاتل تحت راية عمية يغضب بعصبية أو يدعو إلى عصبية أو ينصر عصبية فقتل فقتلته جاهلية

অন্ধ ও অন্ধকার পতাকার নীচে, সাম্প্রদায়িকতার উন্মাদনায় একত্র হয়ে, কিংবা সাম্প্রদায়িকতার ডাক দিতে গিয়ে, কিংবা সাম্প্রদায়িকতাকে সমর্থন দিতে গিয়ে যে লড়াই করবে এবং নিহত হবে, তার মৃত্যু হবে জাহিলিয়াতের মৃত্যু (অন্য বর্ণনায় 'সে আমার উম্মতভুক্তই নয়।')[২]

কিন্তু আফসোস, ইসলামি উম্মাহর নবী যে মহাফেতনা সম্পর্কে এত কঠিন সতর্কবাণী উচ্চারণ করলেন তা ভুলে গিয়ে শত্রুর কূটচক্রান্তে উম্মাহ সেই তাতেই লিপ্ত হয়ে পড়লো। তাওহীদ ও রিসালাতের আকীদা-বিশ্বাস এবং উখুওয়াত ও ভ্রাতৃত্বের জাযবা-চেতনার উপর প্রতিষ্ঠিত এক ও অভিন্ন মুসলিম উম্মাহ আজ শতধা বিভক্ত এবং প্রতিটি খণ্ড শত্রুর একেকটি সহজ লোকমায় পরিণত, যেমন আল্লাহর নবী বলেছেন–

[১] আবু দাউদ
[২] মুসলিম, নাসাঈ

يوشك الأمم أن تداعى عليكم كما تداعى الأكلة إلى قصعتها، فقال قائل : ومن قـلة نحن يومئـذ؟ قال : بل أنتم يومئـذ كثير، ولكنكم غثاء كغثاء السيل، ولينزعن الله من صدور عدوكم المهابة منكم، وليقذفن الله في قلوبكم الوهن، فقال قائل : يا رسول الله، وما الوهن؟ قال : حب الدنيا وكراهيـة الموت

খুব দূরে নয় যে, বিভিন্ন জাতি তোমাদের বিরুদ্ধে ডাকাডাকি করবে, যেমন একে অন্যকে ডেকে আনে দস্তরখানে। একজন জিজ্ঞাসা করলেন, (এমন হবে কি) তখন আমাদের সংখ্যাল্পতার কারণে? তিনি বললেন, বরং তোমরা সেদিন (সংখ্যায়) অনেক হবে, কিন্তু তোমরা হবে ঢলে ভেসে আসা খড়কুটোর মত। আর অবশ্যই আল্লাহ তোমাদের শত্রুদের অন্তর থেকে তোমাদের প্রতি ভীতি তুলে নেবেন এবং অবশ্যই আল্লাহ তোমাদের অন্তরে 'ওয়াহন' প্রক্ষেপণ করবেন। একজন জিজ্ঞাসা করলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ, ওয়াহন কী? তিনি বললেন, দুনিয়ার মোহ এবং মৃত্যুর অনিহা।[১]

---

[১] رواه أبو داود في كتاب الملاحم في باب تداعي الأمم على الإسلام

আলোচ্য হাদীছে গভীর তাৎপর্যপূর্ণ একটি শিক্ষা রয়েছে। তা এই যে, যেহেতু বিষয়টি দূর ভবিষ্যতের সেহেতু স্বাভাবিক নিয়মে ছাহাবা কেরামের এভাবে প্রশ্ন করার কথা ছিলো, 'এমন হবে কি তখন তাদের সংখ্যাল্পতার কারণে? কিন্তু দূরভবিষ্যতের উম্মতের প্রতিও ছাহাবা কেরামের অন্তরে এমন মায়া-মমতা ও দরদ-ব্যথা ছিলো যে, তাদের দুর্দশাকে অবচেতনভাবেই যেন নিজেদের দুর্দশা ভেবেছেন এবং এমন একাত্মতা অনুভব করেছেন যে, 'তাদের' না বলে বলেছেন, 'এমন হবে কি তখন আমাদের সংখ্যাল্পতার কারণে?

রহমাতুল-লিল আলামীন ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামও ছাহাবা কেরামের একাত্মতার এ অনুভূতিকে অনুমোদন করে 'তারা' এর পরিবর্তে বলেছেন, 'বরং তোমরা সেদিন হবে অনেক'

তাহলে ছাহাবাদের প্রতি আমাদের জাযবায়ে মুহব্বত কেমন হওয়া দরকার? সর্বোপরি, আজকের উম্মতের প্রতি ছাহাবা কেরামের যদি ছিলো এরূপ মায়া-মমতা তাহলে আজ বিভিন্ন দেশে মজলুম মুসলমানদের প্রতি আমাদের অন্তরে কেমন দরদ-ব্যথা থাকা উচিত, অথচ আমাদের অবস্থা কী? এখন তো আমাদের শত্রুরা এক মুসলিম জনগোষ্ঠীকে ব্যবহার করছে আরেক মুসলিম জনগোষ্ঠীকে ধ্বংস করার কাজে! কারণ ইসলামী ভ্রাতৃত্বের পরিবর্তে সেই অভিশপ্ত ভৌগোলিক, আঞ্চলিক ও ভাষাভিত্তিক জাতীয়তাবাদ, যা বিশাল বিস্তৃত মুসলিম উম্মাহকে আজ খণ্ড খণ্ড করে 'নরম লোকমা' বানিয়ে রেখেছে। তাই এত শতাব্দীর দূরত্বে থেকে ছাহাবা কেরাম বলতে পেরেছেন 'আমরা' এবং নবী রাহমাতুল-লিল আলামীন বলেছেন, 'তোমরা', অথচ একই যুগে, এমনকি একই আরবীভাষার ভাষী হয়েও হিজায বলছে মিশর সম্পর্কে 'ওরা'! আসলে আল্লাহ ছাড়া আমাদের আর কোন পানাহ নেই। 'ওয়াহন' থেকে বের হয়ে আসা ছাড়া আমাদের মুক্তিরও কোন পথ নেই – অনুবাদক

জাতীয়তাবাদের পূজারীদের কর্মকৌশল

জাতীয়তাবাদের পূজারীরা তাদের লক্ষ্য অর্জনে যে কৌশল গ্রহণ করে তা এই যে, প্রথমে তারা ক্ষুদ্র ও দুর্বল জনগোষ্ঠীর সামনে জাতীয়তাবাদের আলোঝলমল রূপ তুলে ধরে এবং তাদের ভাষা, সাহিত্য ও সভ্যতা-সংস্কৃতির গুণগানে এবং অতীত ইতিহাস ও ঐতিহ্যের অতিবন্দনায় তাদের মন্ত্রমুগ্ধ করে তোলে। ফলে প্রতিটি ক্ষুদ্র জনগোষ্ঠী জাতীয়তাবাদের নেশায় এমনই বুঁদ হয়ে থাকে এবং জাতীয় ঐতিহ্যের মিথ্যা অহমিকায় এতই আত্মহারা হয়ে পড়ে যে, তারাই যেন শ্রেষ্ঠ, তারাই যেন একমাত্র। ফলে বাইরের জগত থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে তারা নিজেদের জাতীয় পরিচয়ের সঙ্কীর্ণ গণ্ডিতে আবদ্ধ হয়ে পড়ে। এভাবে বিভিন্ন জনগোষ্ঠীর মধ্যে সঙ্ঘাত-সঙ্ঘর্ষ ও যুদ্ধবিগ্রহ ছড়িয়ে পড়ে এবং অপেক্ষাকৃত দুর্বল জনগোষ্ঠী শক্তিশালী জনগোষ্ঠীর আগ্রাসনের শিকার হয়। শক্তির অহমিকায় বিজয়ী জনগোষ্ঠী তখন এমনই বেশামাল হয়ে পড়ে যে, বড় শক্তির সঙ্গেও সঙ্ঘর্ষে জড়িয়ে পড়ে, কিংবা বড় শক্তি যে কোন অজুহাতে তাদের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে। ফল এই দাঁড়ায় যে, তারা বড় শক্তির নরম লোকমায় পরিণত হয়, আর বিচ্ছিন্নতার কারণে কেউ তাদের সাহায্যে এগিয়ে আসে না, বরং দূর থেকে তামাশা দেখে, খুব বেশী হলে কিছু 'ঠোঁট-সেবা' প্রদান করে। এমনকি যারা জাতীয়তাবাদের ফানুস দেখিয়েছিলো দুঃসময়ে তারাও তাদের পরিত্যাগ করে। কোরআনের ভাষায়–

كَمَثَلِ ٱلشَّيْطَٰنِ إِذْ قَالَ لِلْإِنسَٰنِ ٱكْفُرْ فَلَمَّا كَفَرَ قَالَ إِنِّى بَرِىٓءٌ مِّنكَ إِنِّىٓ أَخَافُ ٱللَّهَ رَبَّ ٱلْعَٰلَمِينَ ﴿١٦﴾

শয়তানের মত, যে মানুষকে বলে কুফুরি করো। যখন মানুষ কুফুরি করে তখন সে বলে ওঠে, তোমার প্রতি দায়বদ্ধতা থেকে আমি মুক্ত। আমি তো রাব্বুল আলামীন আল্লাহকে ভয় করি। (আল-হাশর, ৫৯ : ১৬)

দুর্বল জনগোষ্ঠী জাতীয়তাবাদের প্রাচীর সৃষ্টি করে এবং সারা বিশ্ব থেকে নিজেকে বিচ্ছিন্ন করে ভাবে, তারা আরো শক্তিশালী ও নিরাপদ হয়েছে, কিন্তু প্রকৃত সত্য এই যে, এভাবে তারা বৃহৎ শক্তিবর্গের আগ্রাসন ডেকে আনে। দ্বিতীয় বিশ্ব যুদ্ধে মধ্য ইউরোপের ক্ষুদ্র ও দুর্বল দেশগুলোর ভাগ্যে এটাই ঘটেছিলো। কিন্তু হায়

আফসোস, ইসলামী দেশগুলো, যাদের হাতে রয়েছে বিশ্ব-দাওয়াতের পতাকা এবং এমন অফুরন্ত শক্তি যে, যদি তা কাজে লাগানোর যোগ্যতা থাকে তাহলে গোটা ইউরোপ যাবতীয় বল ও লোকবলসহ তাদের পদানত হতে বাধ্য। কারণ তাদের শক্তি ইউরোপের জাতীয়তাবাদ ও অন্যান্য রাজনৈতিক দর্শনের চেয়ে অনেক বেশী। কিন্তু ইসলামি ভ্রাতৃত্বের পরিবর্তে তাদেরও ঝোঁক এখন সঙ্কীর্ণ জাতীয়তাবাদ। অথচ অর্থনৈতিক ও সামরিক শক্তিতে ইউরোপীয় দেশ-গুলোর চেয়ে তারা যথেষ্ট পিছিয়ে। সুতরাং এ আশা করা একেবারেই বাতুলতা যে, জাতীয়তাবাদের দুর্গে বাস করে মুসলিম দেশগুলো খুব বেশী দিন কোন বিপদের মোকাবেলা করতে পারবে।

পক্ষান্তরে জাতীয়তাবাদের পূজারী বৃহৎ শক্তির দেশগুলো মনে করে, যে কোন মূল্যে-বিভিন্ন মহাদেশে বড় বড় ভূখণ্ডের উপর তাদের আধিপত্য বিস্তার করতে হবে এবং বিশাল-বিস্তৃত উপনিবেশ গড়ে তুলতে হবে, যাতে দুর্বল জাতি ও জনগোষ্ঠীর উপর প্রভুত্ব এবং তাদের সম্পদের উপর দখলস্বত্ব কায়েম করা যায়। প্রতিবেশী দেশ ও প্রতিদ্বন্দ্বী শক্তির উপর নিজেদের শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণের জন্য তারা একদিকে যেমন অর্থনৈতিক ও সামরিক শক্তি অর্জন করে, তেমনি অন্য-দিকে ভাষা, বর্ণ ও ভূগোলভিত্তিক জাতীয় অহমিকা সৃষ্টির চেষ্টা চালায়। জাতিকে তারা এ উন্মাদনায় বিভোর করে রাখে যে, তাদের ভাষা ও সাহিত্য এবং ইতিহাস ও সভ্যতাই হলো শ্রেষ্ঠ গৌরবের অধিকারী; পক্ষান্তরে দূর ও নিকটের অন্যান্য জাতি ও জনগোষ্ঠীর কাছে গর্ব করার মত কোন সাহিত্য-সংস্কৃতি ও ইতিহাস-ঐতিহ্য নেই। নিজেদের জাতীয় শক্তি ও শ্রেষ্ঠত্ব বজায় রাখার জন্য নির্দ্বিধায় হিংস্র থেকে হিংস্র এবং নিষ্ঠুর থেকে নিষ্ঠুর যে কোন কাজ তারা করতে পারে। তুচ্ছাতিতুচ্ছ স্বার্থের জন্য অন্যজাতির অধিকার-মর্যাদা ভূলুণ্ঠিত করতে, এমনকি ব্যাপক গণহত্যা চালাতেও তাদের কোন দ্বিধা নেই। এর পেছনে কোন নৈতিক বা মানবিক উদ্দেশ্য থাকে না, থাকে শুধু তাদের ভাষায় 'জাতীয় গৌরব'। নিকট অতীতে এর জ্বলন্ত উদাহরণ হলো আমেরিকা ও ভিয়েতনাম,[1]

[1] (আর চলমান উদাহরণ ও রক্তকরুণ তো মুসলিম উম্মাহর চোখের সামনেই রয়েছে! এখানেও যথারীতি উচ্চারিত হবে মানবসভ্যতার কলঙ্ক আমেরিকার নাম, বিপরীতে এখন আর কোন অমুসলিম দেশের নাম নেই, আছে ইরাক, আফগানিস্তান, পাকিস্তান, লিবিয়া, মিশর ও সিরিয়ার নাম, আল্লাহ্ করুন, এখানেই দানবীয় শক্তির পতন ঘটে, আর কোন মুসলিম জনপদের উপর যেন নুতন করে দুর্যোগ নেমে না আসে– অনুবাদক)

এধরনের সাম্রাজ্যবাদী শক্তির নৈতিক, চারিত্রিক ও মানবিক মূল্যবোধ যতই নিকৃষ্ট হোক, মানুষ ও মানবতার প্রতি তাদের আচরণ যত জঘন্য ও হিংস্রতাপূর্ণ হোক জাতীয়তাবাদের দৃষ্টিতে সেই দেশ, জাতি ও তাদের কর্ণধাররাই হলো প্রশংসা ও বন্দনার যোগ্য। এই জাতীয় গৌরবের বর্ণনা দিতে গিয়ে প্রফেসর জুড বলেন–

'জাতীয় মর্যাদা ও গৌরবের একমাত্র অর্থ হলো এমন শক্তির অধিকারী হওয়া যাতে প্রয়োজনে নিজের ইচ্ছা ও চাহিদা অন্য জাতির উপর চাপিয়ে দেয়া সম্ভব হয়। তথাকথিত এই জাতীয় গৌরবই হচ্ছে জাতীয়তাবাদের পূজারীদের একমাত্র আরাধ্য।

এর অসারতা প্রমাণের জন্য এতটুকু বলাই যথেষ্ট যে, এটা নৈতিক ও চারিত্রিক মহত্বের সম্পূর্ণ পরিপন্থী। স্বার্থ ত্যাগ করে শুধু ন্যায় ও সত্য অনুসরণ করা, কথা ও প্রতিশ্রুতি রক্ষা করা এবং ক্ষুদ্র ও দুর্বল জাতির সঙ্গে মানবিক আচরণ করা, জাতীয়তাবাদের দৃষ্টিতে মর্যাদা ও গৌরবের কোন বিষয় নয়। মিস্টার বোলডন-এর মতে মর্যাদা মানে এমন শক্তি যা দ্বারা জাতি গর্ব ও গৌরব ছিনিয়ে আনতে পারে এবং অন্যান্য জাতিকে তটস্থ রাখতে পারে। আর বলাবাহুল্য, এমন শক্তি নির্ভর করে গোলা ও বোমার উপর এবং সেই সাহসী ও দেশপ্রেমী সৈনিকের উপর যারা যে কোন জনপদে নির্দ্বিধায় গোলা ও বোমা নিক্ষেপ করতে পারে। মোটকথা, কোন জাতি ও জনগোষ্ঠীর মর্যাদা ঐসব নীতি ও নৈতিকতার সম্পূর্ণ বিপরীত যা কোন ব্যক্তির জন্য মর্যাদার বিষয়। সুতরাং আমার মতে কোন জাতি ও জাতীয় নেতা যত বেশী এ ধরনের মর্যাদার অধিকারী হবে, আসলে সে তত বেশী বর্বর ও অসভ্য হবে। ধোকা, প্রতারণা ও শোষণ-নিপীড়ন দ্বারা অর্জিত মর্যাদা না ব্যক্তির জন্য গৌরবের, না জাতির জন্য।'[1]

অন্যস্থানে তিনি বলেন, 'লালসার চেয়ে দম্ভই বৃটেনের শাসক শ্রেনীতে সেই নীতি ও কর্মপন্থা অনুসরণে বাধ্য করছে যা তাদের তথাকথিত শান্তি, সন্ধি ও সমঝোতা-প্রেমের সঙ্গে খাপ খায় না। কাউকে বলুন, বৃটিশ-সিংহাসনের কাছে আবেদন জানাতে, যে বিশাল সাম্রাজ্যে সূর্য অস্ত যায় না, তা থেকে এক ইঞ্চি ভূমি ছেড়ে দিক, এমন ভূমি যা সবচে' দুর্ভিক্ষপীড়িত; দেখবেন, ইংলেন্ডের রক্ষণশীল বীর পুরুষেরা ক্ষোভে ক্রোধে কেমন জ্বলে ওঠে এবং জগত তোলপাড়

[1] guide to modern wickedness, p. 153

করে ফেলে! দেখবেন, উদারপন্থী বৃটিশ সংবাদপত্র কেমন গযবে ফেটে পড়ে তাহলে বোঝা গেলো, এরা শুধু লোভী নয়, অহঙ্কারী ও হঠকারীও বটে'।[১]

সাম্রাজ্যবাদ ও উপনিবেশবাদের নির্লজ্জ প্রতিযোগিতা

জাতীয়তাবাদের পূজারী বিভিন্ন শক্তি যখন সাম্রাজ্য ও উপনিবেশ বিস্তারের নির্লজ্জ প্রতিযোগিতায় মেতে ওঠে তখন মানবজাতির দুর্ভোগ আরো চরমে পৌঁছে যায়। কারণ কোন শক্তি যখন আগ্রাসন চালিয়ে সমৃদ্ধ কোন জনপদ দখল করে নেয়, প্রতিদ্বন্দ্বী শক্তি তখন চুপচাপ বসে থাকে না, বরং অগ্রবর্তী শক্তিকে হটিয়ে পাল্টা দখল প্রতিষ্ঠায় উঠে পড়ে লেগে যায়। কারণ সম্পদ লুণ্ঠন ও পণ্য-সামগ্রীর বাজার সৃষ্টির জন্য তারও উপনিবেশ চাই। তাকে তো যে কোন মূল্যে একচ্ছত্র সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে সর্বোচ্চ শিখরে জাতীয় গৌরবের পতাকা উড্ডীন করতে হবে।

জাতীয়তাবাদ এক পৃথিবীতে দুই শক্তির অবস্থান মেনে নিতে প্রস্তুত নয়। অন্যদিকে দখলদার শক্তিও দখল ছাড়তে রাজি নয়। এভাবে দেশে দেশে ও জাতিতে জাতিতে উপনিবেশ ও সাম্রাজ্য বিস্তারের লড়াই শুরু হয়ে যায়। তাতে বিপুল সম্পদ ধ্বংস হয় এবং দু'পক্ষেই লোকক্ষয় ঘটে প্রচুর। তবে ধ্বংসযজ্ঞের আসল ঝড় বয়ে যায় সেই জনপদ ও জনগোষ্ঠীর উপর, দুর্ভাগ্যক্রমে যাদের ভূগর্ভে লুকিয়ে আছে বিপুল সম্পদভাণ্ডার, কিন্তু নেই আত্মরক্ষার প্রয়োজনীয় শক্তি ও অস্ত্রসম্ভার। তবে পরিহাসের বিষয়, এ-সবই সঙ্ঘটিত হয় মানবতা, স্বাধীনতা ও গণতন্ত্র রক্ষার নামে এবং দুর্বল জাতিকে সাহায্য করার নামে।[২]

---

[১] ঐ, পৃ. ১৮০

[২] ইরাকে আমেরিকার আগ্রাসন ছিলো তেলের জন্য নয়, নিছক মানববিধ্বংসী অস্ত্রের সন্ধানে এবং সাদ্দামের স্বৈরাচার ও বর্বরতা থেকে ইরাকীদের উদ্ধার করার জন্য, সর্বোপরি তাদেরকে গণতন্ত্র উপহার দেয়ার জন্য, যদিও এখন মিশরের গণতন্ত্র আমেরিকার বিলকুল পছন্দ নয়, যেমন পছন্দ ছিলো না আলজিরিয়ার গণতন্ত্র। কারণ যে গণতন্ত্র ইসলাম ও ইসলামী দলকে ক্ষমতায় নিয়ে আসে, সেটা গণতন্ত্র হতে পারে না, তার চেয়ে 'সেনাতন্ত্র' অনেক ভালো।
এখন সিরিয়ার মাটিতেও একই খেলা চলছে। আমেরিকা স্বাধীন দেশ সিরিয়ার উপর ঝাঁপিয়ে পড়তে উদ্যত। কারণ সিরিয়ার সরকারী বাহিনী তার জনগণের উপর বিষাক্ত গ্যাস ব্যবহার করে মানবতাবিরোধী অপরাধ করেছে। (যদিও বিষয়টি প্রমাণিত নয়।) সুতরাং তাকে শায়েস্তা করা অবশ্য কর্তব্য। আমেরিকার এখানে নিজের কোন স্বার্থ নেই। মার্কিন পররাষ্ট্রমন্ত্রী বলেছেন, 'আমেরিকা যদি (সিরিয়ার প্রেসিডেন্ট) বাশার আল-আসাদকে উপযুক্ত শাস্তি না দেয় তাহলে ইতিহাস আমাদের কখনো ক্ষমা করবে না।' শঠতা আর কাকে বলে! (অপর পৃষ্ঠায়)

উভয় পক্ষেরই দাবী, তাদের যুদ্ধ নিজেদের জন্য নয়, বরং দুর্বল জাতিকে শাসন ও শোষণ থেকে রক্ষা বা উদ্ধার করার জন্য। তবে ভিতরে-বাইরে অনেকেই তাদের সাধুচিন্তা ও সদিচ্ছা সম্পর্কে প্রবলভাবে সন্দিহান। প্রফেসর জুড বলেন–

ইংরেজ ভুলে যায়, বা ভুলে যাওয়ার ভান করে যে, সমস্যা ও সঙ্কটের মূল শিকড় কোথায়? কী কী কারণে সঙ্ঘাত-সঙ্ঘর্ষ এবং শোষণ ও বৈষম্য সৃষ্টি হয়েছে। ভুলে যায়, বা ভুলে যাওয়ার ভান করে যে, জাপান ও অন্যান্য জাতির ঘৃণা, বিদ্বেষ ও ক্রোধের উৎস কী? তাদের বরং দাবী হলো, ইংরেজ খুবই শান্তিপ্রিয় জাতি, জাপানীরাই বরং পররাজ্যলোভী যুদ্ধোন্মাদ। তাদের দাবী হয়ত ঠিক, ইংরেজ নির্লোভ ও শান্তিপ্রিয় জাতি, তবে সে ঐ লুণ্ঠনকারীর মত যে এখন লুণ্ঠন-পেশা ছেড়ে সাধু সেজেছে। কারণ লুণ্ঠিত সম্পদ ইতিমধ্যেই তাকে নিরঙ্কুশ প্রভাব ও প্রতাপ এবং গৌরব ও মর্যাদায় ভূষিত করেছে। সুতরাং শান্তিরক্ষার তাগিদে নব্যলুণ্ঠকদের বিরুদ্ধে সে সংহারমূর্তি ধারণ করতেই পারে। অর্থাৎ সাবেক লুণ্ঠক ও বর্তমানের সাধু ব্যক্তিটি তাদেরকে যুদ্ধবাজ বলছে যারা শোষণে ও লুণ্ঠিত সম্পদে ভাগ বসাতে চায়।[১]

আগ্রাসন ও রাজ্যদখলের প্রতিযোগিতায় এগিয়ে যাওয়া ও পিছিয়ে পড়া, কিন্তু জাতীয়তাবাদের উন্মাদনায় একই রকম উন্মাদ শক্তিগুলোর মধ্যে যত যুদ্ধ-বিগ্রহ হয়েছে ও হচ্ছে তার বীভৎসতা ও ধ্বংসলীলা তো আমাদের চোখের সামনেই রয়েছে, সুতরাং তফসীল করে বলার প্রয়োজন নেই; শুধু বলতে চাই, এগুলোকে ঐসব যুদ্ধের সঙ্গে কিছুতেই তুলনা করা উচিত নয় যার উদ্দেশ্য ছিলো যালিমকে দমন এবং মযলূমকে রক্ষা; যেমন আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করেছেন–

وَإِن طَآئِفَتَانِ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ٱقْتَتَلُوا۟ فَأَصْلِحُوا۟ بَيْنَهُمَا ۖ فَإِنۢ بَغَتْ إِحْدَىٰهُمَا عَلَى ٱلْأُخْرَىٰ
فَقَٰتِلُوا۟ ٱلَّتِى تَبْغِى حَتَّىٰ تَفِىٓءَ إِلَىٰٓ أَمْرِ ٱللَّهِ ۚ فَإِن فَآءَتْ فَأَصْلِحُوا۟ بَيْنَهُمَا بِٱلْعَدْلِ وَأَقْسِطُوٓا۟ ۖ
إِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُّ ٱلْمُقْسِطِينَ ﴿٩﴾

তবে লেখক যে সময়ের কথা এখানে বলেছেন সেটা ছিলো, একাধিক শক্তির উপস্থিতির যুগ। তখন দুর্বল জাতি ও জনগোষ্ঠী একশক্তির আগ্রাসনের মুখে অন্য শক্তির ছত্রচ্ছায়া লাভ করে সাময়িক হলে কিছুটা স্বস্তি ও নিরাপত্তা লাভ করতো, কিন্তু এখন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নেতৃত্বে এককেন্দ্রিক বিশ্বব্যবস্থার যুগ, যেখানে আমেরিকাই অভিযোগকারী, তদন্তকারী, বিচারকারী ও সুবিধাভোগকারী। (অনুবাদক)

[১] guide to modern wickedness, p. 180

যদি মুমিনদের দু'টি দল পরস্পর সজ্ঘর্ষে লিপ্ত হয় তবে তাদের মধ্যে সমঝোতা করে দাও। আর যদি একদল অপর দলের বিরুদ্ধে সীমালঙ্ঘন করে তাহলে যারা সীমালঙ্ঘন করেছে তাদের বিরুদ্ধে লড়াই করো যেন তারা আল্লাহর আদেশের কাছে ফিরে আসে। যদি ফিরে আসে তাহলে উভয়ের মধ্যে ইনসাফের সঙ্গে সমঝোতা করে দাও, আর সুবিচার করো। নিঃসন্দেহে আল্লাহ্ তা'আলা সুবিচারকারীদের ভালোবাসেন। (আলহুজুরাত, ৪৯ : ৯)

কারণ জাতীয়তাবাদের যুদ্ধ হচ্ছে রাজ্যদখল, সম্পদ লুণ্ঠন এবং জাতীয় অহমিকা ও শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণের উদ্দেশ্যে। এগুলো অবশ্যই বিলুপ্ত জাতিপুঞ্জ ও বর্তমান জাতিসঙ্ঘের তত্ত্বাবধানেই ঘটে থাকে, তবে সেটা শুধু আগ্রাসন, লুণ্ঠন, শোষণ ও নিধনযজ্ঞকে আইনগত বৈধতা দেয়ার জন্য। বস্তুত (মরহূম) জাতিপুঞ্জ বলুন, কিংবা (বর্তমান) জাতিসঙ্ঘ, তাদের নিষেধ-নির্দেশ ও প্রস্তাব অবনত মস্তকে মেনে নেয় শুধু দুর্বল পক্ষ। আগ্রাসী শক্তির উপর কোন সিদ্ধান্ত চাপিয়ে দেয়ার ক্ষমতা আগেও ছিলো না, এখনো নেই, আর তা এমনই জ্বলন্ত সত্য যা কোন অন্ধকেও বুঝিয়ে বলার অপেক্ষা রাখে না। প্রাচ্যের দার্শনিক ও মুসলিম উম্মাহর দরদী কবি আল্লামা ইকবালের ভাষায় এগুলো হচ্ছে চোর ও কাফনচোরের আখড়া, যারা চুরির মাল ও কাফনের কাপড় ভাগভাগির জন্য বসেছে। ইংরেজ প্রফেসর জুড সত্যের অনুরোধ রক্ষা করে তাই বলেছেন–

'জাতিপুঞ্জ নামের বিশ্বপুলিশি সংস্থাটির তত্ত্বাবধানে যে যুদ্ধই হয় তা ন্যায়, সাম্য ও শান্তি প্রতিষ্ঠার জন্য, কিংবা অত্যাচারী ও সীমালঙ্ঘনকারীকে প্রতিহত করার জন্য নয়। এগুলো আসলে শক্তির শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিষ্ঠার লড়াই। একদলের লক্ষ্য, যে কোন মূল্যে বিশ্বের সম্পদভাণ্ডারের সর্বোচ্চ পরিমাণের উপর দখল বজায় রাখা; অন্যপক্ষের উদ্দেশ্য হলো যে কোন উপায়ে তাতে ভাগ বসানো। এসব যুদ্ধ অতীতের বিভিন্ন প্রতিদ্বন্দ্বী জাতির মধ্যকার যুদ্ধের চেয়ে, কিংবা জার্মান-প্রোশিয়া যুদ্ধ, সপ্তবর্ষী যুদ্ধ, নেপোলিয়ানের যুদ্ধ এবং বিশ্বযুদ্ধের চেয়ে ভিন্ন কিছু ছিলো না, ছিলো শুধু নামের ভিন্নতা। পক্ষান্তরে এসকল যুদ্ধের পক্ষে সাফাই গেয়ে যা কিছু বলা হয়, যেমন গণতন্ত্র রক্ষা, ফ্যাসিবাদ প্রতিহত করা, বিশ্বশান্তি নিশ্চিত করা, ইত্যাদি, এগুলো প্রকৃতপক্ষে মুখের মুখোশ ছাড়া আর কিছু নয়।'[১]

---

[১] guide to modern wickedness, p. 191

পথ প্রদর্শন, না সম্পদশোষণ?

পৃথিবীর সকল ধর্মহীন সরকার চরিত্রগত দিক থেকে মূলত একটি উন্নত, সুশৃঙ্খল ও সুরক্ষিত বাণিজ্যকেন্দ্র ছাড়া আর কিছু নয়। নীতি ও লক্ষ্যের দিক থেকে এসব সরকার প্রতিষ্ঠিত হয় প্রজা-শাসন ও জনকল্যাণের জন্য নয়, বরং প্রজাশোষণ ও গণলুণ্ঠনের জন্য। শুরু থেকেই তাদের কাছে নীতি ও নৈতিকতার কোন বার্তা থাকে না এবং থাকে না সংস্কার ও সংশোধনের সাধারণ কোন উদ্দেশ্য; দেশ ও জাতির আত্মিক ও আধ্যাত্মিক উন্নতি, মানুষের হিদায়াত ও আত্মশুদ্ধি এবং মানবতার প্রকৃত সেবা ও কল্যাণচিন্তা তো অনেক পরের কথা। উদ্দেশ্যগত কারণে স্বভাবতই তাদের মন ও মনোযোগ সম্পূর্ণরূপে নিবদ্ধ থাকে আয়-আমদানির নতুন নতুন উৎস সন্ধান করা এবং সম্পদ বৃদ্ধি ও রাজকোষের সমৃদ্ধির নতুন নতুন পথ বের করার দিকে। এ উদ্দেশ্যে নির্দ্বিধায় তারা নীতি, নৈতিকতা, চরিত্র ও মূল্যবোধ বিসর্জন দিতে এবং মানবতা ও মানবিকতা পশ্চাতে ছুঁড়ে ফেলতে পারে। যেখানে সুনীতি ও অর্থনীতির সঙ্ঘাত দেখা দেয়, অর্থনীতিকেই তারা অগ্রাধিকার দেয়। জীবনের সর্বক্ষেত্রে তাদের দৃষ্টিভঙ্গি হয় নিছক বৈষয়িক ও অর্থনৈতিক। নগ্নতা ও যৌনতাকেও তারা স্বচ্ছন্দে বৈধতা দান করে 'শিল্প ও পেশা' নাম দিয়ে। অবশ্য প্রয়োজনে কিছু বিধিনিষেধ আরোপিত হয়, যা অপরাধ ও অনৈতিকতাকে রোধ করে না, শুধু নির্দিষ্ট নিয়ম-শৃঙ্খলার মধ্যে আবদ্ধ রাখে। দেহব্যবসা তাদের কাছে শুধু বৈধই নয়, বরং একটি আকর্ষণীয় রাজস্বখাতও বটে।

রাষ্ট্র নিজেই ব্যাপক ও সুসংগঠিত সুদ-বাণিজ্যে জড়িত থাকে এবং বিভিন্ন ভদ্র-পোশাকি নামে জুয়াখেলার অনুমতি দেয়। নামের ভদ্রতা রক্ষার উদ্দেশ্য থাকে শুধু সরকারের স্বার্থ ও মুনাফা নিরাপদ করা। নৈতিকতাবিরোধী ও অসামাজিক কোন কার্যকলাপ রাষ্ট্রের চোখে অপরাধ নয়, যদি তা 'অর্থপূর্ণ' হয়। মদের শুধু অনুমোদনই নয়, বরং এ ব্যবসাটি সরকার নিজের নিয়ন্ত্রণেই রেখে থাকে। এমনকি যারা মদ-জুয়ার বিরোধী, প্রয়োজনে তাদের উপর খড়গহস্ত হতেও পিছপা হয় না।

চলচ্চিত্রশিল্প, যা যাবতীয় সামাজিক অপরাধের উৎস এবং নগ্নতা ও যৌনতার প্রবণতা সৃষ্টির প্রধান কারণ বলে স্বীকৃত, এটা সরকারের এমনই আকর্ষণীয় রাজস্বখাত যে, এর নৈতিক ক্ষতির ভয়াবহতা জেনেও সরকার তা বন্ধ করার কথা কল্পনা করতে পারে না। রেডিও-টিভি চরিত্র সংশোধন ও নৈতিক শিক্ষার

বাহন হওয়ার পরিবর্তে সস্তা বিনোদনের মাধ্যমরূপে কাজ করে এবং সর্বস্তরে সুস্থ বোধ ও রুচিবোধ সৃষ্টির পরিবর্তে রুচিবিকৃতিকেই আরো উস্‌কে দেয় এবং ভোগবাদী মানসিকতা সৃষ্টি করে।

সংবাদপত্র ও প্রকাশনা তদারকের জন্য গঠিত সরকারী সংস্থা রাজনৈতিক ও প্রশাসনিক ক্ষেত্রে তো প্রয়োজনেরও বেশী সংবেদনশীলতার পরিচয় দেয়। ফলে ন্যূনতম সমালোচনাও সহ্য করতে পারে না, অথচ মূল্যবোধ ও নৈতিকতার বিষয়ে হয়ে থাকে অতি-উদার। দায়িত্বহীন লেখক-সাংবাদিক এবং অশ্লীলতার প্রচারক সাহিত্যিকের দল তুচ্ছ বৈষয়িক লাভের জন্য সমাজে নৈতিক অবক্ষয় ও চরিত্রহীনতার মহামারি ছড়িয়ে দেয়, কিন্তু পানি মাথার উপর দিয়ে বয়ে গেলেও সরকার থাকে নির্লিপ্ত, বরং যথেষ্ট প্রশ্রয়ী। এদেরে হাতে চরিত্র ও নৈতিকতার সঙ্গে জাতির স্বাস্থ্যও হয়ে পড়ে অনিরাপদ। বিভিন্ন বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠান চরিত্র-বিধ্বংসী পণ্য উৎপাদনের পাশাপাশি এমন স্বাস্থ্যহানিকর সামগ্রীও বাজারজাত করে যা জাতির যুবসমাজের চরিত্র সমূলে শেষ করে দেয়। সরকার দেখেও দেখে না। কারণ, যারা দেখবে তারাই বাঁধা পড়ে যায় উৎকোচ-উপঢৌকনের জালে। তাছাড়া বিভিন্ন সরকারী খাত, জাতীয় প্রতিষ্ঠান ও ক্রীড়া-অঙ্গনের পৃষ্ঠ-পোষকতার মাধ্যমে আইনের পাকড়াও থেকেই শুধু তারা বেঁচে থাকে না, বরং সামাজিক সম্মান ও প্রতিষ্ঠাও অর্জন করে থাকে। এসব হতে পারে শুধু এজন্য যে, আত্মিক ও নৈতিক কল্যাণের পরিবর্তে আর্থিক মুনাফাই হলো সরকারের মূল চিন্তা।

এমন রাজনীতি ও শাসননীতির অনিবার্য ফল দাঁড়ায় এই যে, চরিত্র ও নৈতিকতা দিন দিন নীচে নামতে থাকে এবং একসময় ভয়াবহ নৈতিক ব্যাধি ও অবক্ষয় দেখা দেয়। জাতির সর্বস্তরে মুনাফাবৃত্তি, সুবিধাবাদিতা ও বাণিজ্য-মানসিকতা ছড়িয়ে পড়ে এবং ব্যবসায়িক লুটতারাজের পরিস্থিতি সৃষ্টি হয়। সবার তখন লক্ষ্যই থাকে বৈধাবৈধ যে কোন উপায়ে অন্যের চেয়ে বেশী মুনাফা অর্জন করা। নীতি ও নৈতিকতা তখন সবার দৃষ্টিপথ থেকেই সরে যায়।

পক্ষান্তরে যে শাসনব্যবস্থা 'মিনহাজে নবুয়ত' বা নববী তরীকার উপর প্রতিষ্ঠিত, তার বুনিয়াদ ও ভিত্তি হয় তিজারাতের পরিবর্তে হিদায়াতের উপর। হযরত উমর বিন আব্দুল আযীয (রহ.)-এর খেলাফত ছিল মাত্র দু'বছরের, কিন্তু তা ছিল খেলাফতে রাশেদার অনুসরণে মিনহাজে নবুয়তের উপর প্রতিষ্ঠিত। একবার তাঁর কাছে অনুযোগ করা হলো, বর্তমান নীতি-ব্যবস্থায় বাইতুল মালের রাজস্ব

আয় ব্যাপকভাবে হ্রাস পেয়েছে এবং রাষ্ট্র বিরাট আর্থিক ক্ষতির সম্মুখীন হয়েছে। তখন তিনি যে ঐতিহাসিক বাক্যটি বলেছিলেন এবং যুগে যুগে বিভিন্ন প্রয়োজনে মুসলিম উম্মাহ যা শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করেছে তা হলো–

ويحك! إن محمدا صلى الله عليه و سلم بعث هاديا و لم يبعث جابيا

চুপ কর, মুহম্মদ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তো পথপ্রদর্শকরূপে প্রেরিত হয়েছেন, রাজস্ব আদায়কারীরূপে নন।

অত্যন্ত অলঙ্কারসমৃদ্ধ ও সুসংক্ষিপ্ত এই একটিমাত্র বাক্যের মধ্যেই মিনহাজে নবুয়তের উপর প্রতিষ্ঠিত শাসনব্যবস্থা ও সরকারপদ্ধতির রূপ ও স্বরূপ সুস্পষ্ট-রূপে এসে গেছে। দ্বীনী হুকুমতের মূল লক্ষ্যই হলো ঈমান ও আখলাক। এখানে আগে দেখা হয়, কিসে মানুষের ঈমান ও বিশ্বাস সুদৃঢ় হবে এবং নৈতিক উন্নতি ও আখেরাতের কল্যাণ সাধিত হবে। রাজস্ববৃদ্ধি ও সম্পদসমৃদ্ধি এখানে মূল লক্ষ্য নয়, বরং আত্মিক ও নৈতিক উন্নতির পথে এবং সরকারপরিচালনার ক্ষেত্রে সহায়কমাত্র। এখানে রাজনীতি, সমাজনীতি, অর্থনীতি, রাজস্বনীতি, সবই হয় শরীয়তের অনুগত। তাই দ্বীনী ও আখলাকী মূলনীতিগুলো সর্বদা বিষয় ও বস্তুর উপর প্রাধান্য পায়।

এই হুকূমত তার শাসন-সীমানায় সুদ, জুয়া, মদ, ব্যভিচার, পাপাচার, নগ্নতা ও বেহায়াপনা এবং এর সর্বপ্রকার 'প্ররোচিকা' সম্পূর্ণরূপে নিষিদ্ধ ঘোষণা করে এবং ঐ সব আর্থিক লেনদেনকেও অপরাধ মনে করে যা ব্যক্তির জন্য উপকারী হলেও সমষ্টির জন্য ক্ষতিকর। তাই তা সে বন্ধ করে দেয়, যদিও তা বিরাট আর্থিক ক্ষতির কারণ হয় এবং সরকারী কোষাগার বিপুল রাজস্ব-আয় থেকে বঞ্চিত হয়।

এই হুকূমত সংস্কার ও সংশোধনমূলক বিভিন্নমুখী কার্যক্রম গ্রহণ করে এবং তা বাস্তবায়নে সর্বপ্রকারে সচেষ্ট হয়। তার দৃষ্টি শুধু মানুষের সাধারণ জীবনযাত্রার উপরই নিবদ্ধ থাকে না, বরং নৈতিকতা ও চিন্তা-চেতনার উপরও নিবদ্ধ থাকে। কারণ এটাই মানুষের জীবন ও কর্মকে নিয়ন্ত্রণ করে। সুতরাং নৈতিকতা ও চিন্তা-চেতনার পরিশুদ্ধি ছাড়া কর্মের সংশোধন এবং অপরাধ ও দুস্কৃতির মূলোৎপাটন কিছুতেই সম্ভব নয়। একারণেই ইসলামী হুকূমত সর্বপ্রথম ঐ সব বিষয়ের উপর বিধি-নিষেধ ও নিয়ন্ত্রণ আরোপ করে যা সমাজকে ভোগ-বিলাস, প্রবৃত্তিপরায়ণতা, আইনলঙ্ঘন ও অপরাধ প্রবণতার দিকে নিয়ে যায়। তার

দৃষ্টিতে তারাও বড় অপরাধী এবং দেশের শত্রু যারা সমাজে প্রতক্ষ্য বা পরোক্ষ-ভাবে নগ্নতা, বেহায়াপনা ও পাপপ্রবণতার পরিবেশ তৈরী করে, হোক তারা লেখক-বুদ্ধিজীবী ও সংস্কৃতিসেবী, কিংবা ব্যবসায়ী, শিল্পপতি ও পেশাজীবী।

এই হুকূমত শান্তি-শৃঙ্খলা, সুবিচার ও নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে যেমন সচেষ্ট তেমনি আত্মিক ও নৈতিক তত্ত্বাবধানের প্রতিও সমান যত্নবান। কেননা ইসলামী হুকূমতের যিনি প্রধান তার ভূমিকা শুধু পুলিশ ও চৌকিদারের নয়, একজন আদর্শ শিক্ষক ও আধ্যাত্মিক দীক্ষকেরও। পৃথিবীর কোন ভূখণ্ডে এই পদ্ধতির হুকূমত প্রতিষ্ঠিত হলে তার অগ্রাধিকারমূলক কাজ কী হবে, তা পরিষ্কারভাবে উঠে এসেছে অগ্রবর্তী মুহাজিরদের সম্পর্কে কোরআনের এ ঘোষণায়–

ٱلَّذِينَ إِن مَّكَّنَّٰهُمْ فِى ٱلْأَرْضِ أَقَامُوا۟ ٱلصَّلَوٰةَ وَءَاتَوُا۟ ٱلزَّكَوٰةَ وَأَمَرُوا۟ بِٱلْمَعْرُوفِ
وَنَهَوْا۟ عَنِ ٱلْمُنكَرِ ۗ وَلِلَّهِ عَٰقِبَةُ ٱلْأُمُورِ

'(এই মযলূম মুসলমান) তারা, যাদেরকে যদি আমি ভূখণ্ডে ক্ষমতা দান করি, তাহলে তারা ছালাত কায়েম করবে এবং যাকাত আদায় করবে এবং অন্যায়কর্ম হতে বিরত রাখবে। আর আল্লাহরই হাতে সকল বিষয়ের পরিণতি।'

নৈতিকতা ও শিল্প-বাণিজ্যের বিরোধ

আজ সম্পদস্ফীতির সঙ্কটকালে, কিংবা লর্ড ম্যাকলের অর্থপূর্ণ ভাষায়, 'সম্ভাব্য দ্রুত সম্ভাব্য অধিক সম্পদ' এই দর্শনে বিশ্বাসী মানুষের ক্ষমতার যুগে সর্বত্র এক উন্মত্ত বাণিজ্যিক প্রতিযোগিতা চলছে; যার ফলে শিল্পকারখানা থেকে বিনোদন, প্রসাধন ও বিলাসসামগ্রী ঢলের মত শহরে, জনপদে এসে আছড়ে পড়ছে। রাজধানীর আলোঝলমল দোকানে শুধু নতুন ফ্যাশান ও নতুন ডিজাইন শোভা পায়। কিন্তু আজকের নতুনই হয়ে যায় কালকের সেকেলে। তার জায়গায় আসে আরো নতুন, কিংবা নামেমাত্র নতুন কিছু। শোভা ও সৌন্দর্যের এবং ফ্যাশান ও আধুনিকতার পরিবর্তন হতেই থাকে। এর পিছনে আসল রহস্য হলো পুঁজিপতি ও শিল্পপতিদের উন্মত্ত প্রতিযোগিতা ও লাগামহীন মুনাফালিপ্সা, যা সমাজের নৈতিকতা ও মূল্যবোধ এবং মানুষের প্রকৃত প্রয়োজন ও ক্রয়ক্ষমতা সম্পর্কে একেবারেই লা-পরোয়া। ফলে, এখন জীবনযাত্রার মান যেমন ক্রমউচ্চমুখী তেমনি তার ব্যয়ও উর্ধ্বমুখী।

জীবনের চাহিদা ও কাল্পনিক প্রয়োজন এমনই মাত্রাছাড়া যে, কোন আয়ই আর যথেষ্ট নয়। ফলে অল্পেতুষ্টি নামে একসময় যে একটি অর্থপূর্ণ শব্দ ছিলো তা এখন অর্থহীন হয়ে পড়েছে এবং হারিয়ে গেছে জীবনের স্বস্তি ও শান্তি। প্রত্যেকের সামনে এখন জীবনযাত্রার উচ্চতর স্তর এবং তা অর্জন করাই জীবনের একমাত্র লক্ষ্য। সমাজ ও পরিবেশও এটাই দাবী করে এবং এ দাবী পূরণে যারা ব্যর্থ তাদের মর্যাদার অযোগ্য মনে করে। আরো মর্মান্তিক বিষয় এই যে, বৈধ-অবৈধ সর্বপ্রকার চেষ্টা-তদ্বির করে যখন সে ঐ কাঙ্ক্ষিত পর্যায়ে উপনীত হয় তখন দেখা যায়, জীবনের চাহিদা ও জীবনযাত্রার মান আরো উপরে উঠে গেছে। তাই জীবন এখন হয়ে পড়েছে এক অন্তহীন দৌড়ঝাঁপ ও অসুস্থ প্রতিযোগিতার নামান্তর যা মানুষের কর্মশক্তিকে শুধু শুষে নেয়, কোন সুফল দেয় না। এর মনস্তাত্ত্বিক ফল এই দাঁড়িয়েছে যে, যে জীবন হতে পারতো স্বস্তি ও শান্তির, তাই হয়ে পড়েছে অস্থিরতা ও অশান্তির এবং যে পরিবার হতে পারতো দুনিয়ার জান্নাত, সেটাই হয়ে গেছে জাহান্নামের নমুনা, যেখানে জ্বলছে শুধু চাহিদার আগুন।

পক্ষান্তরে এর নৈতিক কুফল হয়েছে এই যে, সামাজিক সকল ঐতিহ্য ও নৈতিক মূল্যবোধ বিধ্বস্ত হয়ে পড়েছে। হালাল-হারাম ও বৈধাবৈধের ন্যূনতম সীমারেখাও মুছে গেছে। সীমাবদ্ধ আয় যেহেতু সীমাহীন চাহিদা পূরণে অক্ষম সেহেতু বিভিন্ন নামে ও ছদ্মনামে ঘুষ-উৎকোচ সর্বত্র ছড়িয়ে পড়েছে। এর ফলে ব্যক্তি, পরিবার ও সমাজ-জীবনে কী মহাবিপর্যয় নেমে আসতে পারে তা তো দিবালোকের মতই সুস্পষ্ট।

এটা যেহেতু জীবনের বৈধ ও স্বাভাবিক চাহিদা-প্রয়োজনের ফল নয়, বরং অবাস্তব দাবী ও চাহিদার ফল সেহেতু দুর্নীতিদমনের শুধু আইনগত ব্যবস্থা দ্বারা পরিস্থিতির পরিবর্তন করা কিছুতেই সম্ভব নয়। এর জন্য আসল দায়ী হলো ঐ জীবনব্যবস্থা যা দীর্ঘ দিন থেকে আখলাকি হিদায়াত ও নৈতিক দিকনির্দেশনা থেকে এবং আখেরাতের শাস্তি-পুরস্কারের ধারণা থেকে বঞ্চিত। এর জন্য দায়ী ঐ বস্তুসর্বস্ব শিক্ষাব্যবস্থা যা মানুষের মধ্যে নৈতিক চেতনা ও বিবেকবোধ জাগ্রত করতে সম্পূর্ণ অক্ষম। আর দায়ী ঐ শাসনব্যবস্থা যা আয় ও উৎপাদনের উপর নিয়ন্ত্রণ রাখাকে তো কর্তব্য মনে করে, কিন্তু জীবনের বৈষয়িক চাহিদা ও আত্মিক প্রয়োজনের মধ্যে সমন্বয় সাধন এবং সহযোগিতার সম্পর্ক গড়ে তোলার তাগাদা অনুভব করে না।

কিন্তু প্রাচ্যের দেশ, জাতি ও জনপদ একসময় তো এমন ছিলো না। প্রাচ্য তো ছিলো প্রাচ্যের মত। প্রতিটি জনপদে মায়া ছিলো, মমতা ছিলো, একের প্রতি অন্যের দরদ-ব্যথা ছিলো। প্রাচ্যে ব্যবসা-বাণিজ্য ছিলো, কিন্তু মুনাফা-লিপ্সা ছিলো না। জীবনের প্রতি আকর্ষণ ছিলো, কিন্তু সীমাহীন চাহিদা ছিলো না, বরং ছিলো অল্পে তুষ্টির মহাসম্পদ। এমনকি এই সেদিনও নও মুসলিম মুহম্মদ আসাদ, তার দেখা দামেস্কের বিবরণ দিয়েছেন, দোকানদার তার খরিদ্দারকে বলছে, আমার যথেষ্ট বিক্রি হয়েছে, আপনি পাশের দোকান থেকে নিন, তার আজ প্রয়োজনীয় বিক্রিও হয়নি।

সবকিছু কীভাবে এমন তছনছ হয়ে গেলো! এজন্য একমাত্র দায়ী প্রাচ্যে উপনিবেশবাদী ইউরোপের আগ্রাসন এবং সম্পদ লুণ্ঠনের লোভে উপনিবেশ স্থাপন। এশিয়ায় চীনের সমগ্রজনগোষ্ঠীকে আফিমে আসক্ত করেছিলো এই ইউরোপীয়রা শুধু বাণিজ্যিক মুনাফার লোভে। তাহলে এরা করতে পারে না, এমন কী আছে পৃথিবীতে?! সুতরাং এটা খুবই স্বাভাবিক যে, এই শাসক ও শোষক জাতির শুধু সংস্পর্শের কারণে শাসিত ও শোষিত জাতিও নৈতিক অবক্ষয় ও আত্মিক অধঃপতনের শিকার হবে এবং তাদের মধ্যেও ঐসব রোগ-ব্যাধি দেখা দেবে, যা পাশ্চাত্য সমাজে পাশ্চাত্য সভ্যতা জন্ম দিয়েছে। এ তিক্ত সত্য তো তারা নিজেরাই এখন স্বীকার করছে এবং তা থেকে মুক্তির উপায় খুঁজছে।

মুসলিম জনপদগুলোতে পাশ্চাত্যের ভৌগোলিক, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক আগ্রাসনের পথ ধরে অবধারিতভাবে সভ্যতারও আগ্রাসন ঘটেছে। পাশ্চাত্য সভ্যতার যাবতীয় অনাচার, পাপাচার ও নষ্টাচারও মুসলিম জনপদগুলোতে বন্যার ঢলের মত ছড়িয়ে পড়েছে। সম্পদ পাচার হয়েছে এদিক থেকে ওদিকে, আর নৈতিক ও আত্মিক রোগ-ব্যাধি সংক্রমিত হয়েছে ওদিক থেকে এদিকে। এটাই ছিলো সাভাবিক। যে জাতি, যে সভ্যতা নিজ ভূমিতে নীতি ও নৈতিকতা, আত্মিকত ও আধ্যাত্মিকতার পরিচর্যা করতে পারেনি, তাদের ছত্রচ্ছায়ায় কীভাবে বিজিত জাতি ও জনগোষ্ঠী আত্মিক ও নৈতিক উৎকর্ষ লাভ করতে পারে? চরিত্র ও নৈতিকতা, শুচিতা ও পবিত্রতা, এগুলো তো কখনোই তাদের চিন্তা-ভাবনারই বিষয় ছিলো না, বরং এগুলোর প্রয়োজনীয়তাও তারা বিশ্বাস করেনি এবং করে না। 'পাত্র থেকে তো তাই গড়িয়ে পড়বে, যা পাত্রে রয়েছে। দুধ-মধুর পাত্র থেকে দুধ-মধু, মদ ও শরাবের পাত্র থেকে মদ-শরাব। বিজয়ী শাসক ও

শোষকদের নীতি ও পন্থা তো সর্বযুগে মানবতার হেদায়াত ও সংশোধনের প্রয়াসী আম্বিয়া কেরামের পথ ও পন্থা থেকে সবসময়ই ভিন্ন ছিলো। যে সত্য আল-কোরআন তুলে ধরেছে সাবা'র মালিকা বিলকীসের যবানিতে, তা এমন চিরসত্য যা স্থান ও কালের পরিবর্তনে পরিবর্তিত হয় না, তা তখন সাবার রাজ্যে যেমন সত্য ছিলো, এখন প্রাচ্যের মুসলিম জনপদেও একই রকম সত্য। আল-কোরআনের ভাষায়–

قَالَتْ إِنَّ ٱلْمُلُوكَ إِذَا دَخَلُوا۟ قَرْيَةً أَفْسَدُوهَا وَجَعَلُوٓا۟ أَعِزَّةَ أَهْلِهَآ أَذِلَّةً ۖ وَكَذَٰلِكَ يَفْعَلُونَ ﴿٣٤﴾

রানী বললো, রাজা-বাদশাহ যখন কোন জনপদে ঢুকে পড়ে তাতে ফাসাদ সৃষ্টি করে, আর অভিজাত ও সম্ভ্রান্তদের লাঞ্ছিত ও অপদস্থ করে। এখানেও তারা তাই করবে। (আন-নামল, ২৭ : ৩৪)

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

আত্মহত্যার পথে ইউরোপ

আবিষ্কার ও উদ্ভাবনের যুগ

ইতিহাসের বিভিন্ন যুগকে যদি নিজস্ব বৈশিষ্ট্য ও স্বকীয়তা দ্বারা চিহ্নিত করা যায় তাহলে আমরা অবশ্যই বলতে পারি, বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার ও প্রাযুক্তিক উদ্ভাবনের দিক থেকে আজকের যুগ হচ্ছে মানবজাতির ইতিহাসের বিশিষ্টতম যুগ এবং এ কারণে অতি সঙ্গতভাবেই একে আমরা আবিষ্কার ও উদ্ভাবনের এবং তার ও বেতার যন্ত্রের যুগ বলতে পারি। আর তিক্ত হলেও সত্য, এ ক্ষেত্রে ইউরোপের নেতৃত্ব ও শ্রেষ্ঠত্বও অনস্বীকার্য। ইউরোপের জ্ঞানী-বিজ্ঞানী, আবিষ্কারক ও উদ্ভাবকদের যোগ্যতা ও প্রতিভা যে অন্তত এখনকার জন্য আমাদের ধরা-ছোঁয়ার ঊর্ধ্বে তাও অস্বীকার করার উপায় নেই।

তবে অতিউৎসাহীরা বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিতে আধুনিক ইউরোপের অগ্রগতির যতই স্তুতি-বন্দনা করুন এবং ইউরোপীয় প্রতিভার অবদানে যতই আমরা মুগ্ধ হই, এ সত্য আমাদের ভুলে গেলে চলবে না যে, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির যাবতীয় আবিষ্কার-উদ্ভাবন জীবনের লক্ষ্য বা উদ্দেশ্য নয়, বরং নিছক উপায় ও মাধ্যম। সুতরাং নিজস্ব সত্তায় এগুলো ভালো-মন্দ কিছুই নয়। উপায় ও মাধ্যমের ভালো-মন্দ নির্ধারিত হয় লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যের মানদণ্ডে। সুতরাং বিচারে বসতে হলে আমাদের দেখতে হবে, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি কী উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত হচ্ছে এবং তা সৎ, সুন্দর ও কল্যাণপ্রসূ কি না?

বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি আমাদের জীবনে কী ভূমিকা পালন করে? এককথায় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মানুষের অজ্ঞতা ও দুর্বলতা দূর করে; জগতের অজানা সব রহস্য উদ্ঘাটন করে; প্রকৃতির বিভিন্ন শক্তি ও সম্পদ আয়ত্তে আনে এবং জীবনের গতিকে দ্রুততর ও সহজতর করে।

একসময় মানুষ পায়ে হেঁটে, তারপর ঘোড়ায় চড়ে পথ অতিক্রম করতো। কিন্তু তার চাই আরো গতি, আরো স্বস্তি। এক্ষেত্রে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি এগিয়ে এসেছে তার সেবায়। তাই মানুষের আয়ত্তে এখন এমন বাহন ও যানবাহন এসে গেছে যা মানুষের দূরতম কল্পনায়ও ছিলো না। এখন দূরত্ব অতিক্রমের এই গতি ও স্বস্তিকে যদি মানবজাতির কল্যাণে ব্যবহার করা হয় তাহলে নিঃসন্দেহে তা আল্লাহর বিরাট নিয়ামত। যেমন ইরশাদ হয়েছে–

وَالْأَنْعَامَ خَلَقَهَا ۗ لَكُمْ فِيهَا دِفْءٌ وَمَنَافِعُ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ ﴿٥﴾ وَلَكُمْ فِيهَا جَمَالٌ حِينَ تُرِيحُونَ وَحِينَ تَسْرَحُونَ ﴿٦﴾ وَتَحْمِلُ أَثْقَالَكُمْ إِلَىٰ بَلَدٍ لَّمْ تَكُونُوا بَالِغِيهِ إِلَّا بِشِقِّ الْأَنفُسِ ۚ إِنَّ رَبَّكُمْ لَرَءُوفٌ رَّحِيمٌ ﴿٧﴾ وَالْخَيْلَ وَالْبِغَالَ وَالْحَمِيرَ لِتَرْكَبُوهَا وَزِينَةً ۚ وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ ﴿٨﴾

'আর এসব পশু তিনি সৃষ্টি করেছেন তোমাদের জন্য, তাতে রয়েছে উষ্ণতা এবং বিভিন্ন উপকারিতা, আর কিছু পশুর গোশত তোমরা আহার করো। আর তাতে রয়েছে তোমাদের জন্য সৌন্দর্য, যখন তোমরা সন্ধ্যায় (সেগুলো চারণভূমি থেকে) ফেরত আনো এবং সকালে (চারণভূমির উদ্দেশ্যে) নিয়ে যাও। আর এই পশুগুলো তোমাদের বোঝা বহন করে নিয়ে যায় এমন সব শহরে যেখানে তোমরা পৌঁছতে পারতে না প্রাণান্ত কষ্ট ছাড়া। নিঃসন্দেহে তোমাদের প্রতিপালক অত্যন্ত স্নেহময়, করুণাময়। আর (তিনি সৃষ্টি করেছেন) ঘোড়া, খচ্চর ও গাধা যেন তাতে তোমরা আরোহণ করতে পারো এবং শোভারূপে গ্রহণ করতে পারো। আর তিনি সৃষ্টি করবেন এমন কিছু যা তোমরা জানো না।'

(আন-নাহল, ১৬ : ৫ – ৮)

দেখুন, আল্লাহ তা'আলা এখানে গতি ও স্বস্তির সফরকে মানুষের উপর তাঁর একান্ত দয়া ও অনুগ্রহ বলে উল্লেখ করেছেন। তারপর দেখুন, 'সৃষ্টি করবেন যা তোমরা জানো না' এই ছোট্ট একটি বাক্য যোগ করে কী আশ্চর্য প্রজ্ঞার সঙ্গে কী অপার সম্ভাবনার প্রতি ইঙ্গিত করেছেন! এমন অলৌকিকতা কি মানুষের কালামে কখনো সম্ভব!

আরো ইরশাদ হয়েছে–

وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَىٰ كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا ﴿٧٠﴾

'আর অতি অবশ্যই বনী আদমকে আমি মর্যাদা দান করেছি এবং তাকে স্থলে ও জলে 'বাহন' দান করেছি এবং তাকে রিযিক দান করেছি উত্তম বস্তু হতে এবং যে সকল মাখলূক আমি সৃষ্টি করেছি, তা থেকে অধিকাংশের উপর আমি তাকে অত্যন্ত শ্রেষ্ঠত্ব দান করেছি। (আল-ইসরা, ১৭ :৭০)

অন্যত্র সোলায়মান আলাইহিস্-সালামের প্রতি অনুগ্রহের উল্লেখ-প্রসঙ্গে ইরশাদ হয়েছে–

وَلِسُلَيْمَانَ الرِّيحَ غُدُوُّهَا شَهْرٌ وَرَوَاحُهَا شَهْرٌ

'আর সোলায়মানের জন্য আমি বাতাসকে অনুগত করেছিলাম, তার সকালের যাত্রা ছিলো এক মাসের পথ, আর সন্ধ্যার যাত্রা ছিলো এক মাসের পথ।'

(সাবা, ৩৪ – ১২)

প্রকৃতির সমস্ত শক্তি এবং বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির যাবতীয় আবিষ্কার-উদ্ভাবন, যা দ্বারা মানুষ উপকৃত হচ্ছে সে সম্পর্কেও একই কথা। এ বিষয়ে ইসলামের শিক্ষা খুবই সুস্পষ্ট। কারণ إني جاعل في الأرض خليفة বলে আদম ও বনী আদমকে আল্লাহ তা'আলা 'খলীফাতুল্লাহি ফিল আরদি'-এর মহামর্যাদা দান করেছেন। তারপর ঘোষণা করেছেন, তাঁর আদেশে বিশ্বজগতের সবকিছু মানবের সেবায় নিয়োজিত এবং প্রকৃতির সকল শক্তি ও সম্পদ মানুষের অনুগত। ইরশাদ হয়েছে –

اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزْقًا لَّكُمْ ۖ وَسَخَّرَ لَكُمُ الْفُلْكَ لِتَجْرِيَ فِي الْبَحْرِ بِأَمْرِهِ ۖ وَسَخَّرَ لَكُمُ الْأَنْهَارَ ﴿٣٢﴾ وَسَخَّرَ لَكُمُ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ دَائِبَيْنِ ۖ وَسَخَّرَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ ﴿٣٣﴾ وَآتَاكُم مِّن كُلِّ مَا سَأَلْتُمُوهُ ۚ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا ۗ إِنَّ الْإِنسَانَ لَظَلُومٌ كَفَّارٌ ﴿٣٤﴾

'আল্লাহ ঐ মহান সত্তা যিনি আসমানসকল ও যমীন সৃষ্টি করেছেন এবং আসমান থেকে পানি বর্ষণ করেছেন, অনন্তর তা দ্বারা ফলফলাদি হতে তোমাদের জন্য রিযিক বের করেছেন এবং অনুগত করেছেন তোমাদের জন্য জলযানকে, যেন চলে তা সমুদ্রে তাঁর আদেশে। আর অনুগত করেছেন তিনি তোমাদের জন্য নদ-নদী। আর অনুগত করেছেন তোমাদের জন্য সূর্য ও চাঁদ সদাসক্রিয় অবস্থায়। আর অনুগত করেছেন তোমাদের জন্য রাত ও দিন। আর দান করেছেন তিনি তোমাদের, ঐ সকল বস্তু হতে যা তোমরা তাঁর কাছে চেয়েছো। আর যদি তোমরা গণনা করো আল্লাহর নেয়ামত, তা শুমার করতে পারবে না নিঃসন্দেহে মানুষ বড় অবিচারী, বড় অকৃতজ্ঞ।'

(ইবরাহীম, ১৪ : ৩২ – ৩৪)

জগত-প্রকৃতির সকল শক্তি-সম্পদ মানুষ ব্যবহার করবে এটাই তো স্বাভাবিক। কারণ সবকিছু আল্লাহ মানুষেরই জন্য সৃষ্টি করেছেন। তবে একজন মুমিন, যে আল্লাহকে বিশ্বাস করে এবং আল্লাহর আনুগত্য স্বীকার করে, তার মধ্যে এবং অবিশ্বাসী ও অবাধ্য মানুষের মধ্যে চেতনাগত ও আচরণগত বিরাট পার্থক্য রয়েছে।

আপন অনুসারীর প্রতি ইসলামের হিদায়াত হলো, জগত-প্রকৃতির সকল শক্তি-সম্পদ এবং বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির যাবতীয় উপায়-উপকরণ ব্যবহার করার সময় তার অন্তরে এ চেতনা যেন জাগ্রত থাকে যে, এগুলো আল্লাহর দান ও অনুগ্রহ। সে ঘোড়ার পিঠে সওয়ার হোক বা গাড়ীতে; জাহাজে আরোহণ করুক, বা উড়োজাহাজে, সে আল্লাহর নেয়ামত স্মরণ করবে এবং তাঁর পবিত্রতা ঘোষণা করবে, যিনি এগুলোকে তার অনুগত করে দিয়েছেন। বস্তুত তিনি যদি তাকে জ্ঞান, বুদ্ধি, যোগ্যতা ও প্রজ্ঞা দান না করতেন, এগুলোর অর্জন, নিয়ন্ত্রণ ও পরিচালন তার পক্ষে কিছুতেই সম্ভব হতো না। দেখুন আল-কোরআনের কত মমতাপূর্ণ ও প্রজ্ঞাপূর্ণ উপদেশ! ইরশাদ হয়েছে–

وَالَّذِي خَلَقَ الْأَزْوَاجَ كُلَّهَا وَجَعَلَ لَكُم مِّنَ الْفُلْكِ وَالْأَنْعَامِ مَا تَرْكَبُونَ ﴿١٢﴾ لِتَسْتَوُوا عَلَىٰ ظُهُورِهِ ثُمَّ تَذْكُرُوا نِعْمَةَ رَبِّكُمْ إِذَا اسْتَوَيْتُمْ عَلَيْهِ وَتَقُولُوا سُبْحَانَ الَّذِي سَخَّرَ لَنَا هَٰذَا وَمَا كُنَّا لَهُ مُقْرِنِينَ ﴿١٣﴾ وَإِنَّا إِلَىٰ رَبِّنَا لَمُنقَلِبُونَ ﴿١٤﴾

আর যিনি সব জিনিসের জোড়া সৃষ্টি করেছেন, আর তোমাদের জন্য বানিয়েছেন জলযান ও চতুষ্পদজন্তু, যাতে তোমরা আরোহণ করো। যেন তোমরা সেগুলোর পিঠে চড়ে বসো। তারপর যখন সেগুলোর উপর সমাসীন হবে তখন তোমাদের প্রতিপালকের নেয়ামত স্মরণ করবে আর বলবে, চিরপবিত্রতা ঐ সত্তার যিনি আমাদের অনুগত করে দিয়েছেন এটিকে, অথচ আমরা তা নিয়ন্ত্রণে আনতে সক্ষম ছিলাম না। আর অতি অবশ্যই ফিরে যাবো আমরা আমাদের প্রতিপালকের দিকে। (যুখরুফ, ৪৩ : ১২ –১৪)

একটি স্বাধীন প্রাণীকে, যার শক্তি মানুষের চেয়ে অনেক বেশী, কী সাধ্য ছিলো মানুষের তাকে বশ করার, তার পিঠে চড়ে বসার! কিংবা খণ্ড খণ্ড লোহা, ইস্পাত ও খনিজ দ্রব্য, যা নিশ্চল, নিষ্প্রাণ, কী সাধ্য ছিলো মানুষের তাতে এমন গতি ও 'প্রাণ' সৃষ্টি করার! দয়াময়, প্রজ্ঞাবান আল্লাহই এগুলো মানুষের অনুগত করে দিয়েছেন এবং মানুষকে যোগ্যতা দান করেছেন। তারই আদেশে এগুলো চলমান হয়, যেন অনুকূল বায়ু প্রবাহিত হয় ঐ দিকে যেদিকে মানুষ ইচ্ছা করে। সুতরাং কৃতজ্ঞ মানুষের কি কর্তব্য নয়, ঘোড়া বা হাতির পিঠে বসে; গাড়ী ও জাহাজ-উড়োজাহাজে আসন গ্রহণ করে, কিংবা সাগরের তলদেশে ও মহাশূন্যের উদ্দেশ্যে যাত্রাকালে উচ্চারণ করবে–

سُبْحَانَ الَّذِي سَخَّرَ لَنَا هَٰذَا وَمَا كُنَّا لَهُ مُقْرِنِينَ

চিরপবিত্রতা ঐ সত্তার যিনি আমাদের অনুগত করে দিয়েছেন এটিকে, অথচ আমরা তা নিয়ন্ত্রণে আনতে সক্ষম ছিলাম না।

সেই সঙ্গে মনে রাখতে হবে, যত উন্নত বাহনেই সে আরোহণ করুক, জলে, স্থলে ও অন্তরীক্ষে যেখানেই বিচরণ করুক তার পরিণতি হলো–

وَإِنَّا إِلَىٰ رَبِّنَا لَمُنقَلِبُونَ

আর অতি অবশ্যই ফিরে যাবো আমরা আমাদের প্রতিপালকের দিকে।

তাকে মনে রাখতে হবে, সে আল্লাহর অনুগত ও নিয়ন্ত্রিত দাস। জীবন, মৃত্যু ও পুনরুত্থান কোন কিছুর উপর তার নিয়ন্ত্রণ নেই। নির্ধারিত সময়ে তাকে ফিরে যেতে হবে আপন প্রতিপালকের সমীপে। তখন তাকে প্রতিটি নেয়ামত, প্রতিটি

শক্তি ও সক্ষমতা এবং প্রতিটি সচ্ছলতা ও প্রাচুর্যের হিসাব দিতে হবে যে, কোথায় কীভাবে সে এগুলো ব্যবহার করেছে? যদি এমন কাজে এমনভাবে ব্যবহার করে থাকে যা আল্লাহর পছন্দ নয় তাহলে তাকে কঠিন শাস্তি পেতে হবে।

জীবনের সর্বক্ষেত্রে মুমিনের আচরণ একথা প্রমাণ করে যে, শক্তি, সম্পদ ও উপায়-উপকরণ হচ্ছে আল্লাহর দান ও অনুগ্রহ এবং আল্লাহর পক্ষ হতে পরীক্ষার বিষয়। তার প্রতিটি আচরণ যেন ঘোষণা করে−

هَٰذَا مِن فَضْلِ رَبِّي لِيَبْلُوَنِي أَأَشْكُرُ أَمْ أَكْفُرُ ۖ وَمَن شَكَرَ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ ۖ وَمَن كَفَرَ فَإِنَّ رَبِّي غَنِيٌّ كَرِيمٌ

'এটা তো আমার রবের পক্ষ হতে অনুগ্রহ, যাতে তিনি আমাকে পরীক্ষা করেন, আমি কি শোকর করি, না অ-শোকর! আর যে শোকর করে সে নিজেরই জন্য শোকর করে, আর যে না-শোকরি করে, (সে জেনে রাখুক) আমার রব তো নির্মোখাপেক্ষী, মহান।' (আন-নামল, ২৭ : ৪০)

এভাবেই শোকর আদায় করেছিলেন আল্লাহর নবী হযরত সোলায়মান আ. চোখের পলক পড়ার আগে রানী বিলকিসের সিংহাসন নিজের দরবারে উপস্থিত দেখতে পেয়ে! এভাবেই কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেছে যুগে যুগে আল্লাহর কৃতজ্ঞ বান্দারা।

শক্তি, সম্পদ ও উপায়-উপকরণকে মুমিন সঠিক ক্ষেত্রে, সঠিক লক্ষ্যে ব্যবহার করে। আর তার একমাত্র উদ্দেশ্য হয় আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জন করা এবং মানবতার কল্যাণ সাধন করা। কারণ এটাই হচ্ছে জগত-প্রকৃতির সকল শক্তি-সম্পদ এবং যাবতীয় উপায়-উপকরণ সৃষ্টির উদ্দেশ্য। ইরশাদ হয়েছে−

لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ ۖ وَأَنزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ مَن يَنصُرُهُ وَرُسُلَهُ بِالْغَيْبِ ۚ إِنَّ اللَّهَ قَوِيٌّ عَزِيزٌ

'অতিঅবশ্যই প্রেরণ করেছি আমি আমার রাসূলদের, প্রমাণাদিসহ, আর অবতারণ করেছি তাদের সঙ্গে কিতাব ও মীযান'[১] যাতে মানুষ সুবিচার পালন করতে পারে। আর আমি লৌহ 'অবতারণ' করেছি; তাতে রয়েছে প্রচণ্ড পরাক্রম এবং রয়েছে মানুষের জন্য বিভিন্ন উপকার। আর (এগুলো মানুষের অনুগত করে দেয়ার উদ্দেশ্য এই যে,) যেন আল্লাহ জেনে নেন, কে তাঁকে এবং তাঁর রাসূলদের সাহায্য করে, না দেখে। (প্রকৃত বিষয় তো এই যে,) নিঃসন্দেহে আল্লাহ সর্বশক্তির অধিকারী, মহাপ্রতাপশালী।' (আল-হাদীদ, ৫৭ : ২৫)

শুরুতে রাসূল প্রেরণ ও কিতাব অবতারণের উল্লেখ করেছেন, আবার শেষে বলেছেন, আল্লাহ ও তাঁর রাসূলকে সাহায্য করার বিষয়। মাঝখানে এনেছেন লৌহ অবতারণের বিষয়। আবার কিতাব ও হাদীদ উভয়ের জন্য ব্যবহার করেছেন 'ইনযাল' বা অবতারণ শব্দটি। এসব বিষয়ের আলোকে আয়াতের অন্তর্নিহিত মর্ম সম্ভবত এই যে, লোহার সবচে' বড় উপকারিতার একটি এই যে, এর শক্তি ও পরাক্রম যেন ব্যবহৃত হয় আল্লাহ ও তাঁর রাসূলকে সাহায্য করার কাজে। এটা কীভাবে সম্ভব হবে যদি লৌহের সকল শক্তি ও পরাক্রম আমি আয়ত্ত না করি?! সুতরাং সেই জ্ঞান অর্জনের আহ্বানও রয়েছে এ আয়াতে। আর লৌহের উল্লেখ হচ্ছে প্রতীকী। মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে, এই জগত প্রকৃতিতে আল্লাহ যত শক্তি গচ্ছিত রেখেছেন, মুসলিম তা অর্জন করবে এবং আল্লাহর রাস্তায় জিহাদে, আল্লাহর দ্বীন প্রচারে এবং আল্লাহর কালিমাকে বুলন্দ করার কাজে ব্যবহার করবে এবং ব্যবহার করবে ঐ সকল বৈধ কাজে যার প্রতি শরীআত উদ্বুদ্ধ করেছে; যেমন হালাল ব্যবসা ও উপার্জন, সৎ উদ্দেশ্যে সফর ও ভ্রমণ এবং অন্যান্য কল্যাণপূর্ণ কাজ।

আল্লাহর কোন নেয়ামতকে মুমিন কখনো অন্যায় কাজে, অন্যায়কারীর সাহায্যে ব্যবহার করতে পারে না। যেমন বলেছেন আল্লাহর নবী মূসা আ.−

رَبِّ بِمَا أَنْعَمْتَ عَلَيَّ فَلَنْ أَكُونَ ظَهِيرًا لِّلْمُجْرِمِينَ

'হে রব, যেহেতু আপনি আমার প্রতি অনুগ্রহ করেছেন সেহেতু কিছুতেই আমি অপরাধীদের সাহায্যকারী হবো না।' (আল-কাছাছ, ২৮ : ১৭)

---

[১] মীযান অর্থ দাড়িপাল্লা, যা ইনছাফের প্রতীক, সুতরাং এখানে উদ্দেশ্য হলো, ন্যায়বিচারের সহায়ক নীতি বা বিধান।

মোটকথা নবী ও নবুয়ত এবং দ্বীন ও শরী'আতই একমাত্র পথ যা মানুষের অন্তরে আল্লাহর পরিচয় এবং আল্লাহর প্রতি ভয় সৃষ্টি করে, আর সকল সৃষ্টির স্রষ্টা ও জগতের প্রকৃত নিয়ন্তার সঙ্গে সম্পর্ক তৈরী করে এবং তাকে এ শিক্ষা দান করে যে, মানুষ কোনকিছুর মালিক নয়, রক্ষকমাত্র। একদিন তাকে তার মালিকের সামনে দাঁড়াতে হবে এবং জওয়াব দিতে হবে, এসকল শক্তি, সম্পদ ও উপায়-উপকরণ সে কোথায়, কী কাজে ব্যবহার করেছে?

দ্বীন ও শরী'আতই শুধু পারে মানুষকে শক্তির দম্ভ ও ক্ষমতার অপপ্রয়োগ থেকে বিরত রাখতে এবং সম্পদ ও উপায়-উপকরণের সঠিক ব্যবহারক্ষেত্র নির্ধারণ করতে, যাতে তা মানবজাতির জন্য কল্যাণপ্রসূ হয়।

বস্তুত বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির বিস্ময়কর উন্নতি মানবজাতিকে আজ যে মহাধ্বংস ও বিপর্যয়ের দিকে নিয়ে চলেছে তাতে পদার্থ ও যন্ত্রের কোন অপরাধ নেই। কারণ এগুলো সম্পূর্ণরূপে মানুষের ইচ্ছা ও চাহিদা এবং নীতি ও নৈতিকার অনুগত। স্বকীয় সত্তায় এগুলো না ভালো, না মন্দ। মানুষই ব্যবহার ও প্রয়োগের মাধ্যমে এগুলোকে ভালো বা মন্দে পরিণত করে।

এই যে আজ বিশ্বযুদ্ধের ধ্বংসলীলা চলছে; এই যে শহরে, জনপদে বিমান থেকে বোমা বর্ষিত হচ্ছে আর সবকিছু ধ্বংসস্তূপে পরিণত হচ্ছে; এই যে ডুবোজাহাজ শান্তিপ্রিয় বেসামরিক যাত্রীদের জাহাজ ও বাণিজ্যিক জাহাজ ডুবিয়ে দিচ্ছে, আর এই যে বেতার যন্ত্র (এবং বর্তমানে মোবাইল ও ইন্টারনেট ব্যবস্থা) মিথ্যাচার, পাপাচার, নগ্নতা ও বেহায়াপনার প্রসার ঘটাচ্ছে, তো পশ্চিমা সমাজ এবং তাদের অনুসারীদের কোরআনের ভাষায় বলা যায়–

طَائِرُكُم مَّعَكُمْ

তোমাদের কুফল তো তোমাদের সঙ্গে।

কারণ বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি তো শুধু পদার্থ ও প্রকৃতির বিভিন্ন শক্তি মানুষের আয়ত্তে এনে দেয় এবং বিভিন্ন যন্ত্র তার হাতে তুলে দেয়। এতটুকুই তার কাজ। এখন কোথায়, কীভাবে ও কী উদ্দেশ্যে এর ব্যবহার হবে, এটা শিক্ষা দেয়া বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির কাজ নয়। দেয়াশলাই মানুষের হাতে আগুনের দাহ্যক্ষমতা তুলে দেয়। মানুষ এখন চুলার আগুন জ্বেলে খাবার প্রস্তুত করতে, বা ঘর গরম করতে পারে, আবার পারে সমগ্রজনপদ জ্বালিয়ে দিতে। মানুষ তার আয়ত্তের শক্তি-সম্পদ

কোথায় কীভাবে ব্যবহার করবে, কোন উপায়ে তা থেকে যথার্থ উপকৃত হবে সেটা শিক্ষা দিতে পারে একমাত্র দ্বীন ও শরী'আত।

যারা দ্বীন ও শরীআতের অনুগত তাদের হাতে 'শক্তি' হয় কল্যাণের মাধ্যম, আর যারা নফস ও শয়তানের অনুগত, একই শক্তি তাদের হাতে হয়ে যায় ফাসাদ ও বরবাদির কারণ।

দ্বীন ও শরী'আতই পারে মানুষের বুদ্ধিবৃত্তি ও নৈতিকতার মধ্যে এবং ব্যক্তিস্বার্থ ও সামষ্টিক কল্যাণের মধ্যে ভারসাম্য রক্ষা করতে এবং ক্ষমতা ও প্রতিপত্তির ঔদ্ধত্যের পরিবর্তে বিনয় ও আবদিয়াতের শান পয়দা করতে।

আলকোরআন তার ই'জাযপূর্ণ ও অলৌকিক ভাষায় উভয় তরফের নমুনা পেশ করেছে। হযরত ইউসুফ (আ.) তাঁর বাদশাহাতের পূর্ণ শান ও জালালের সময় বলেছেন–

رَبِّ قَدْ آتَيْتَنِي مِنَ الْمُلْكِ وَعَلَّمْتَنِي مِن تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ ۚ فَاطِرَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ أَنتَ وَلِيِّي فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ ۖ تَوَفَّنِي مُسْلِمًا وَأَلْحِقْنِي بِالصَّالِحِينَ ﴿١٠١﴾

'হে রব! আপনি আমাকে রাজত্ব দান করেছেন এবং আমাকে বক্তব্যের মর্ম অনুধাবন শিক্ষা দান করেছেন। হে আসমান-যমীনের সৃষ্টিকারী, আপনি দুনিয়া ও আখেরাতে আমার অভিভাবক। আপনি আমাকে মুসলিমরূপে ওয়াফাত দান করুন এবং আমাকে আপনার নেক বান্দাদের সঙ্গে যুক্ত করুন।'

(সূরা ইউসুফ, ১২ : ১০১)

হযরত সোলায়মান (আ.) যখন শাহানশাহির শান-শৌকত ও দবদবা দেখলেন তখন 'বে-সাখতা' তাঁর যবানে এসে গেলো–

فَتَبَسَّمَ ضَاحِكًا مِّن قَوْلِهَا وَقَالَ رَبِّ أَوْزِعْنِي أَنْ أَشْكُرَ نِعْمَتَكَ الَّتِي أَنْعَمْتَ عَلَيَّ وَعَلَىٰ وَالِدَيَّ وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضَاهُ وَأَدْخِلْنِي بِرَحْمَتِكَ فِي عِبَادِكَ الصَّالِحِينَ ﴿١٩﴾

'তখন পিঁপড়ের কথা শুনে তিনি মৃদু হাসলেন, আর বললেন, হে রব, আমাকে তাওফীক দান করুন, যেন আপনার নেয়ামতের শোকর আদায় করতে পারি, যা

আপনি দান করেছেন আমাকে এবং আমার পিতা-মাতাকে; আর যেন এমন আমল করতে পারি যাতে আপনি সন্তুষ্ট হন। আর আপনি আমাকে আপনার করুণাবশে নেক বান্দাদের মধ্যে দাখিল করুন।' (আন-নামল, ২৭ : ১৯)

পক্ষান্তরে দ্বীন ও শরী'আতের আলো থেকে যারা বঞ্চিত, যাদের অন্তরে নেই আল্লাহর ভয় ও পরিচয়; স্রষ্টাকে ভুলে গিয়ে যারা হয়ে পড়েছিলো নিজের সৃষ্টি-উদ্দেশ্য সম্পর্কেও বে-খবর তারা ছিলো ক্ষমতা ও প্রতিপত্তির গর্বে গর্বিত। কারণ তারা ভাবতো না, তাদের উপরে আছে কোন শক্তি যার কাছে তাদের জবাবদেহি করতে হবে। ইরশাদ হয়েছে–

فَأَمَّا عَادٌ فَٱسْتَكْبَرُوا۟ فِى ٱلْأَرْضِ بِغَيْرِ ٱلْحَقِّ وَقَالُوا۟ مَنْ أَشَدُّ مِنَّا قُوَّةً ۖ أَوَلَمْ يَرَوْا۟ أَنَّ ٱللَّهَ ٱلَّذِى خَلَقَهُمْ هُوَ أَشَدُّ مِنْهُمْ قُوَّةً ۖ وَكَانُوا۟ بِـَٔايَٰتِنَا يَجْحَدُونَ ﴿١٥﴾

'আর কাউমে আদ, তারা যমীনে বড়াই করেছিলো অন্যায়ভাবে, আর বলেছিলো, শক্তিতে কে আমাদের চেয়ে প্রচণ্ড! তারা কি দেখতে পায়নি যে, আল্লাহ, যিনি তাদের সৃষ্টি করেছেন তিনিই শক্তিতে তাদের চেয়ে প্রচণ্ড! আসলে তারা আমার নিদর্শনসমূহ অস্বীকার করতো।' (হা-মীম সিজদাহ, ৪১ : ১৫)

সত্যকে অনুধাবন করার পক্ষে কত সুন্দর যুক্তি! কিন্তু অনুধাবনের যোগ্যতা তো চাই! তো এই যে শক্তির এত বড় দম্ভ, কী হয়েছিলো শেষপর্যন্ত তাদের পরিণতি, তাও আল-কোরআন পরিষ্কার জানিয়ে দিয়েছে তার অনুসারীদের–

فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحًا صَرْصَرًا فِىٓ أَيَّامٍ نَّحِسَاتٍ لِّنُذِيقَهُمْ عَذَابَ ٱلْخِزْىِ فِى ٱلْحَيَوٰةِ ٱلدُّنْيَا ۖ وَلَعَذَابُ ٱلْـَٔاخِرَةِ أَخْزَىٰ ۖ وَهُمْ لَا يُنصَرُونَ ﴿١٦﴾

তখন আমি কতিপয় অশুভ দিনে তাদের উপর পাঠালাম এক ঝঞ্ঝা বায়ু, যাতে আস্বাদন করাই তাদেরকে দুনিয়ার জীবনে লাঞ্ছনাকর আযাব, আর আখেরে আযাব অবশ্যই অধিক লাঞ্ছনাকর, আর তখন তাদের সাহায্য করা হবে না।
(হা-মীম সিজদাহ, ৪১ : ১৬)

সম্পদগর্বে গর্বিত কারূনের ঘটনা এভাবে বলা হয়েছে–

إِنَّ قَٰرُونَ كَانَ مِن قَوْمِ مُوسَىٰ فَبَغَىٰ عَلَيْهِمْ ۖ وَءَاتَيْنَٰهُ مِنَ ٱلْكُنُوزِ مَآ إِنَّ مَفَاتِحَهُۥ لَتَنُوٓأُ بِٱلْعُصْبَةِ أُو۟لِى ٱلْقُوَّةِ إِذْ قَالَ لَهُۥ قَوْمُهُۥ لَا تَفْرَحْ ۖ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُحِبُّ ٱلْفَرِحِينَ ﴿٧٦﴾ وَٱبْتَغِ فِيمَآ ءَاتَىٰكَ ٱللَّهُ ٱلدَّارَ ٱلْـَٔاخِرَةَ ۖ وَلَا تَنسَ نَصِيبَكَ مِنَ ٱلدُّنْيَا ۖ وَأَحْسِن كَمَآ أَحْسَنَ ٱللَّهُ إِلَيْكَ ۖ وَلَا تَبْغِ ٱلْفَسَادَ فِى ٱلْأَرْضِ ۖ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُحِبُّ ٱلْمُفْسِدِينَ ﴿٧٧﴾

'কারূন ছিলো মূসার সম্প্রদায়ভুক্ত, অনন্তর সে তাদের উপর স্বেচ্ছাচার শুরু করলো। আর তাকে আমি দান করেছি এত ধনভাণ্ডার যে, তার চাবিগুলো ভারী ছিলো বলশালী দলের জন্য। ঐসময় তার কাউম তাকে বললো, বড়াই করো না; আল্লাহ বড়াইকারীদের পসন্দ করেন না। আর আল্লাহ তোমাকে যা দান করেছেন তা দিয়ে পরকালের ঘর তালাশ করো, অবশ্য দুনিয়া থেকে তোমার প্রাপ্য অংশও ভুলো না। আর সদাচার করো, যেমন আল্লাহ তোমার প্রতি সদাচার করেছেন। আর যমীনে ফাসাদের অপচেষ্টা করো না। নিঃসন্দেহে আল্লাহ ফাসাদ-কারীদের পসন্দ করেন না।' (কাছাছ, ২৮ : ৭৬ –৭৭)

সম্পদের আধিক্যের পরিমাণ বর্ণনা করার কী আশ্চর্য সুন্দর অলৌকিক শৈলী! সম্পদের রক্ষণাবেক্ষণের সঙ্গে প্রথম সম্পর্ক সিন্দুকের, দ্বিতীয় সম্পর্ক তালার, তৃতীয় সম্পর্ক চাবির, এর মধ্যে সবচে হালকা ও ক্ষুদ্র বস্তু হলো চাবি। সুতরাং চাবির উল্লেখ দ্বারাই সম্পদের আধিক্যের বিষয়টি অন্তরে অধিক রেখাপাত করবে।

কারূন দম্ভভরে জবাব দিলো, আমার প্রতি কারো কোন দান ও দয়া নেই। যা কিছু দেখো, তা আমার জ্ঞান-বুদ্ধি ও হুনর-হেকমতের ফল–

قَالَ إِنَّمَآ أُوتِيتُهُۥ عَلَىٰ عِلْمٍ عِندِىٓ

সে বললো, এগুলো তো আমি প্রাপ্ত হয়েছি আমার বিশেষ জ্ঞান দ্বারা।
(কাছাছ, ২৮ :৭৮)

শক্তির অনুভূতি ও ক্ষমতার দম্ভ এবং উর্ধ্বশক্তির অস্তিত্ব অস্বীকার করার ফলে মানুষের মধ্যে এমন এক নেশা ও উন্মাদনা সৃষ্টি হয় যে, সে হিতাহিত জ্ঞান

হারিয়ে ফেলে। কোন উপদেশ ও নীতিকথা, কোন মানবিক আবেদন ও সাধুবাদ তখন তাকে নিয়ন্ত্রণে রাখতে পারে না। তার ক্ষমতার দাপটে মানুষ অসহায় হয়ে পড়ে; দুর্বল জনগোষ্ঠী তার পদতলে পিষ্ট হতে থাকে। যেমন কাউমে আদকে তাদের পায়গম্বর বলেছিলেন–

وَإِذَا بَطَشْتُم بَطَشْتُمْ جَبَّارِينَ ﴿١٣٠﴾

'যখন তোমরা কাউকে ধরো শক্তিমত্ত অবস্থায় ধরো।' (শুআরা, ২৬ : ১৩০)

কোন কল্যাণকর্ম ও ন্যায়-আচারণই তার কাছ থেকে আর আশা করা যায় না। ফেতনা-ফাসাদ, অনাচার-স্বেচ্ছাচার ও মনাবনিপীড়নই হয়ে থাকে তার একমাত্র কাজ। যেমন ফেরআউন সম্পর্কে বলা হয়েছে–

إِنَّ فِرْعَوْنَ عَلَا فِي الْأَرْضِ وَجَعَلَ أَهْلَهَا شِيَعًا يَسْتَضْعِفُ طَائِفَةً مِّنْهُمْ يُذَبِّحُ أَبْنَاءَهُمْ وَيَسْتَحْيِي نِسَاءَهُمْ ۚ إِنَّهُ كَانَ مِنَ الْمُفْسِدِينَ ﴿٤﴾

'নিঃসন্দেহে ফির'আউন (তার) রাজ্যে মাথা তুলেছিলো এবং রাজ্যের অধিবাসীদের বিভিন্ন দলে বিভক্ত করে রেখেছিলো। তাদের একটি দলকে সে দুর্বল করে রাখছিলো, (অর্থাৎ) তাদের পুত্রদের যবাই করছিলো, আর তাদের নারিদের জীবিত রাখছিলো। নিঃসন্দেহে সে ছিলো ফাসাদীদের অন্তর্ভুক্ত।'
(সূরাতুল কাছাছ, ২৮ :৪)

তো ক়ারূনের শক্তির দম্ভ ও অহঙ্কারের কী পরিণতি হয়েছিলো? শুনুন আল-কোরআনে আল্লাহ বলছেন–

فَخَسَفْنَا بِهِ وَبِدَارِهِ الْأَرْضَ فَمَا كَانَ لَهُ مِن فِئَةٍ يَنصُرُونَهُ مِن دُونِ اللَّهِ وَمَا كَانَ مِنَ الْمُنتَصِرِينَ ﴿٨١﴾

অনন্তর আমি তাকে ও তার বাড়ী-ঘর ভূমিতে ধ্বসিয়ে দিলাম। ফলে তার পক্ষে এমন কোন দল ছিলো না, যারা তাকে সাহায্য করবে আল্লাহর মোকাবেলায়। সে নিজেও নিজেকে সাহায্য করার অবস্থায় ছিলো না। (সূরাতুল কাছাছ, ২৮ : ৮১)

নবী ও নবুয়তের নূর, দ্বীন ও শরী'আতের হিদায়াত এবং আখলাকি তারবিয়াত ছাড়া যখন জ্ঞান-বুদ্ধি ও শিল্প-প্রযুক্তির উন্নতি হতে থাকে তখন তার স্বাভাবিক পরিণতি সেটাই হয় যা উপরে বর্ণনা করা হলো। যিনি বলেছেন বড় সুন্দর বলেছেন, 'শক্তি ও ভক্তির যখন শুভমিলন হয় তখনই মনবতার কল্যাণ সাধিত হয়।'

ইউরোপের দুর্ভাগ্য এবং দুর্ভাগ্য মানবজাতির, ইউরোপ আজ দ্বীন ও শরী'আত থেকে এবং 'আকাশ ও পৃথিবীর সেতু বন্ধন' থেকে বঞ্চিত। তাদের সামনে তাই নীতি ও নৈতিকতার কোন বাধা নেই এবং নেই দ্বীন ও ধর্মের কোন বিধিনিষেধ, এমনকি নেই আসমানী জ্ঞানের অধিকারী কোন ব্যক্তি যিনি তাদের সঠিক পথ দেখাবেন। ফলে তারা তাদের সৃষ্টির উদ্দেশ্য এবং জীবনের পরিণতি সম্পূর্ণ ভুলে গিয়েছে। তারা ভাবছে (কোরআনের ভাষায়)–

إِنْ هِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا نَمُوتُ وَنَحْيَا وَمَا نَحْنُ بِمَبْعُوثِينَ ﴿٣٧﴾

'আমাদের পার্থিব জীবন ছাড়া আর কোন জীবন নেই। আমরা মৃত্যুবরণ করি, আর জীবনযাপন করি, আর আমরা পুনরুত্থিত হবো না।' (আল-মুমিনূন, ২৩ : ৩৭)

এই বিশ্বাসের অনিবার্যতায় তারা ধরে নিয়েছে যে, ভোগ-উপভোগ, আয়েশ-বিলাস, বস্তুগত উপকৃতি এবং ক্ষমতা ও আধিপত্য বিস্তার– এছাড়া মানবজীবনে আর কোন উদ্দেশ্য নেই। বিশ্বজগত যেন রাজাহীন এক রাজ্য, বা মালিকানাহীন কোন পতিত ভূমি। সুতরাং দখল করো, আর ভোগ করো।

ফলে ইউরোপ তার যাবতীয় জ্ঞান ও শক্তি ব্যয় করেছে ভোগ-বিলাসের উপায়-উপকরণ তৈরী, কিংবা আধিপত্য প্রতিষ্ঠার জন্য মারণাস্ত্র উৎপাদনের পিছনে। এ ক্ষেত্রে তাদের নিজেদের মধ্যেও রয়েছে অস্ত্র ও যন্ত্রের উদ্ভাবন ও উৎপাদনের উন্মত্ত প্রতিযোগিতা, যার শুরু আছে, শেষ নেই। এভাবে চলতে চলতে একসময় লক্ষ্য ও উপলক্ষ এবং উদ্দেশ্য ও মাধ্যমের পার্থক্যই মুছে গেছে তাদের মন-মস্তিষ্ক থেকে, আর তারা বিশ্বাস করে নিয়েছে যে, আবিষ্কার-উদ্ভাবন, উপায়-উপকরণ এবং বস্তু ও যন্ত্র, এগুলো কোন উদ্দেশ্যের মাধ্যম নয়, বরং সত্তাগত-ভাবে নিজেই উদ্দেশ্য। ফলে এ নিয়েই তারা এমন মেতে উঠেছে যেমন খেলনা নিয়ে মেতে থাকে শিশু। তারা ধরেই নিয়েছে, 'ভোগই হলো সভ্যতা', তারপর আরো এগিয়ে ভাবতে শুরু করেছে 'গতিই হলো সভ্যতা'। প্রফেসর জুড বলেন,

'ডিযরেইলীর মতে তার যুগের সমাজ ভাবতো, সভ্যতার মূল কথা হচ্ছে ভোগ, কিন্তু আমরা মনে করি, সভ্যতা মানে গতি। গতিই হচ্ছে আধুনিক যুবকের উপাস্য এবং গতির যূপকাষ্ঠে নির্দয়ভাবে তারা বলি দিতে পারে সর্বপ্রকার সুখ, স্বস্তি ও শান্তি, এমনকি অন্যের প্রতি দয়া-মায়াও।[১]

ইউরোপে নীতি ও শক্তির ভারসাম্যহীনতা

দুর্ভাগ্যক্রমে ইউরোপে বহু শতাব্দী থেকে নীতি ও চরিত্র এবং শক্তি ও সম্পদের মধ্যে, অদ্রূপ জাগতিক জ্ঞান ও যুক্তি এবং ধর্ম ও পরকাল-চিন্তার মধ্যে ভারসাম্য গুরুতরভাবে নষ্ট হয়ে আছে। নবজাগরণের পর থেকে চরিত্র ও ধর্মচিন্তার বিপরীতে জড়শক্তি ও জাগতিক জ্ঞান দ্রুত বিস্তার লাভ করেছে, আর তারা অধঃপতনের দিকে এগিয়ে গেছে। যদি দাঁড়িপাল্লার দু'দিকের কথা ভাবি তাহলে বলতে হয়, শক্তি ও জ্ঞানের পাল্লা ভারি হয়ে শুধু নীচে নেমে এসেছে, আর ধর্ম ও চরিত্রের পাল্লা হালকা হয়ে উপরের দিকে উঠে গেছে। এভাবে জীবনের মঞ্চে একসময় এমন এক প্রজন্ম আত্মপ্রকাশ করেছে যারা জ্ঞান ও শক্তির চর্চায় যেন আকাশের উচ্চতাকে ছুঁয়ে ফেলে, পক্ষান্তরে ধর্ম ও চরিত্রের বিষয়ে রয়ে গেছে ভূমিলগ্ন। এ প্রজন্ম জ্ঞান ও প্রযুক্তির অভিযাত্রায় এবং পদার্থ ও প্রাকৃতিক শক্তি আয়ত্ত করার সফলতায় যেন অতিমানবীয় কোন প্রাণী; অন্যদিকে কর্ম ও চরিত্রে, লোভ-লালসা ও ভোগ-বিলাসিতায় এবং নিষ্ঠুরতা ও নির্দয়তায় যেন চতুষ্পদ ও হিংস্র পশুর চেয়ে নীচে।

জীবনযাপনের সব উপায়-উপকরণ তাদের হাতে, কিন্তু তারা জানে না, জীবন কীভাবে যাপন করতে হয়। জড়জীবনের ভোগ-বিনোদন ও নান্দনিকতার চূড়ান্ত -সীমারও জ্ঞান আছে তাদের, অথচ মানবিক জীবন এবং সভ্যতা ও চরিত্রের প্রাথমিক নীতি ও মূলনীতি সম্পর্কেও অজ্ঞ। মোটকথা, তাদের জ্ঞানের উন্নতি ও চরিত্রের অবনতি দু'টোই অবিশ্বাস্য রকমের। প্রযুক্তি ও শিল্পের অগ্রযাত্রায় তারা যেন তারকালোকে পৌঁছে যেতে চায়, অথচ জানে না, পায়ের নীচের মাটি কী করে হবে বাস-উপযোগী? বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি তাদের দিয়েছে অন্তহীন শক্তি, কিন্তু তার সুন্দর ব্যবহার ও সুপ্রয়োগের যোগ্যতা দান করেনি। প্রফেসর জুড বড় সুন্দর বলেছেন, 'প্রাকৃতিক জ্ঞান-বিজ্ঞান আমাদের এমন শক্তি দান করেছে যা

---

[১] guide to modern wickedness, p. 241

দেবতার উপযোগী, কিন্তু আমরা তা ব্যবহার করছি শিশু ও হিংস্র পশুর বুদ্ধি দ্বারা।'[১]

সুতরাং এর বেশী আর কী হতে পারে যে, সম্পদ নষ্ট হবে, আর লাশ ছিন্নভিন্ন হবে! অন্যত্র তিনি আরো বিশদ করে লিখেছেন–

'একদিকে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির জগতে বিস্ময়কর অগ্রযাত্রা, অন্যদিকে লজ্জাজনক সামাজিক 'শিশুতা'; উভয়ের মধ্যে এই যে এত বিরাট ব্যবধান, জীবনের মোড়ে মোড়ে আমাদেরকে এর মন্দ পরিণতির সম্মুখীন হতে হচ্ছে। একদিকে আমরা ঘরে বসে মহাদেশ থেকে মহাদেশে কথা বলি; ছবি আদান-প্রদান করি; সিলনে বসে রেডিওতে লন্ডনের বড় ঘড়ির ঘণ্টাধ্বনি শুনতে পাই; ভূমি ও সমুদ্রের উপরে -নীচে বিচরণ করি; নিঃশব্দ টেলিপ্রিন্টার ব্যবহার করি; বিদ্যুতের সাহায্যে ফসল ফলাই; এক্স-রের সাহায্যে দেহের অভ্যন্তরে উঁকি দেই; ছবি এখন কথা বলে, গান গায়[২]; বেতার যন্ত্রের সাহায্যে অপরাধী সনাক্ত হয়; উড়ো জাহাজ ও ডুবো-জাহাজ দক্ষিণমেরু ও উত্তরমেরুতে যায়। এত কিছু হয়, হয় না শুধু এইটুকু যে, বড় বড় শহরে কিছু মুক্ত মাঠ তৈরী করি যেখানে গরীব শিশুরা মনের আনন্দে নিরাপদে খেলাধূলা করবে। ফল এই যে, প্রতি বছর আমরা দু'হাজার শিশুকে হত্যা করি এবং নব্বই হাজার শিশুকে আহত করি।

একবার এক ভারতীয় দার্শনিকের সঙ্গে আলাপকালে আমি আমাদের সভ্যতার প্রশংসা করছিলাম। তখনকার ঘটনা, একজন গাড়ীচালক বালুসড়কে ঘণ্টায় চারশ মাইল অতিক্রম করার রেকর্ড গড়েছেন এবং একজন বিমানচালক মস্কো থেকে নিউইয়র্কে সম্ভবত বিশঘণ্টায় উড়ে এসেছেন। সব শুনে তিনি বললেন, হাঁ, তোমরা বাতাসে পাখীর মত উড়তে পারো এবং পানিতে মাছের মত সাঁতরাতে পারো, শুধু জানো না, কীভাবে মাটির উপরে হাঁটতে হয়!'[৩]

---

[১] guide to modern wickedness, p. 261

[২] প্রফেসর জুড যে সময়ের কথা বলছেন, 'ছবি কথা বলে', এটাই ছিলো তখন বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি সর্বশেষ উন্নতি। কিন্তু আমাদের কাছে এখন খুবই সাদামাটা কথা। আজকের বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি তো দূর মহাকাশে বিচরণ করছে, এমনকি মঙ্গল গ্রহ ছাড়িয়ে আরো দূরের অভিযাত্রার জন্য প্রস্তুতি নিচ্ছে, পক্ষান্তরে নীতি ও নৈতিকতা এবং আত্মা ও আত্মিকতার ক্ষেত্রে এই মহাশূন্যচারী মানুষে দৈন্য দারিদ্র্য আরো বহুগুণ বৃদ্ধি পেয়েছে। প্রফেসর জুড যদি বেঁচে থাকতেন, হয়ত দু'টো বিস্ময়ই তাকে আরো বেদনাহত করতো।
–অনুবাদক

[৩] guide to modern wickedness, p. 293

যা ক্ষতিকর তাই শেখে

বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির এসব আবিষ্কার-উদ্ভাবন যদি এমন মানুষের হাতে ব্যবহৃত হতো যারা কল্যাণ-অকল্যাণে পার্থক্য করতে পারে এবং কল্যাণের পথে নিবেদিত হওয়ার যোগ্যতা রাখে, তাহলে নিঃসন্দেহে এগুলো মনাবজাতির জন্য হতো 'আশীর্বাদ', কিন্তু মানুষেরই ব্যবহারদোষে কল্যাণের পরিবর্তে মানবজাতির জন্য তা চরম বিপর্যয় ডেকে আনছে। বাবেলের জাদু সম্পর্কে যেমন কোরআন বলেছে–

وَيَتَعَلَّمُونَ مَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ

'আর তারা ঐসব বিষয় শিক্ষা করতো যা তাদের উপকার না করে ক্ষতি করে।'
(সূরা বাকারাহ, ২ : ১০২)

দেখুন, প্রফেসর জুড কীভাবে প্রযুক্তি-সম্পদের স্বরূপ উদ্ঘাটন করে এর বস্তুনিষ্ঠ সমালোচনা করছেন–

'আমরা এখন অভাবনীয় গতিতে দূরত্ব অতিক্রম করতে পারি, কিন্তু খুব কমই আমাদের গন্তব্য হয়ে থাকে আদর্শ গন্তব্য। পর্যটক ও পরিভ্রমণকারীর জন্য পৃথিবী ছোট হয়ে এসেছে ঠিক এবং সমস্ত জাতি ও জনগোষ্ঠী এখন এত কাছে যে, সবার অঙ্গন যেন অভিন্ন। কিন্তু ফল? শুধু এই যে, পারস্পরিক সম্পর্কের আরো বেশী অবনতি ঘটেছে। আর যেসব উপায় ও সুবিধার সাহায্যে আমরা পরস্পর পরিচিত হতে পেরেছি সেগুলোই আসলে বিশ্বকে যুদ্ধের আগুনে নিক্ষেপ করেছে। আমরা রেডিও বেতার উদ্ভাবন করেছি এবং প্রতিবেশী দেশের সঙ্গে যোগাযোগ প্রতিষ্ঠা করেছি, কিন্তু প্রতিবেশী দেশের আকাশ ও বাতাস ব্যবহার করা হচ্ছে তারই বিরুদ্ধে 'প্রচারযুদ্ধে' এবং নিজেদের রাজনৈতিক ব্যবস্থার শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণ করার উদ্দেশ্যে।'[১]

'এই বিমানটি দেখুন আকাশে ঘোরপাক খাচ্ছে, প্রথমে যারা তাতে উড্ডয়ন করেছিলো, কোন সন্দেহ নেই যে, তাদের সাহস ও মেধা ছিলো অতুলনীয়। কিন্তু এখন কী উদ্দেশ্যে তা ব্যবহৃত হয় এবং ভবিষ্যতে হবে? বোমা ফেলে শহর জনপদ ধ্বংস করা এবং জ্বালিয়ে পুড়িয়ে সবকিছু ভস্মস্তূপ করার জন্য, অসংখ্য

[১] guide to modern wickedness, p. 247

মৃতদেহ ছিন্নভিন্ন করার জন্য। এটা তো (কোন জ্ঞানী ও ভদ্র মানুষের কাজ নয়;) হয় নির্বোধ (ও ইতর) লোকের কাজ, কিংবা শয়তানের।'[১]

'আগামী দিনের ঐতিহাসিক আমাদের সম্পর্কে কী লিখবেন? লিখবেন, কীভাবে বেতারতরঙ্গের সাহায্যে সোনার খনি আবিষ্কার করতাম, সোনা আহরণ করতাম এবং কী অপূর্ব দক্ষতার সঙ্গে সোনা ওজন করতাম, আর কীভাবে মাধ্যাকর্ষণ শক্তিকে পরাস্ত করে বিভিন্ন রাজধানীতে সোনা হস্তান্তর করতাম। তিনি আরো লিখবেন, মানুষরূপী এই হিংস্র পশুরা, যারা শিল্প ও প্রযুক্তির উন্নতি সাধনে যেমন ছিলো কুশলী তেমনি ছিলো দুঃসাহসী, কিন্তু তারা আন্তর্জাতিক সহযোগিতা প্রতিষ্ঠায় ছিলো অক্ষম, যা সঠিক স্বর্ণবন্টন ও স্বর্ণসংরক্ষণের দাবী ছিলো। তারা বরং একটা জিনিসই বুঝতো, যথাসম্ভব দ্রুত খনিগুলো দাফন করা; অর্থাৎ দক্ষিণ আফ্রিকার খনি থেকে সোনা তুলে আনা, আর লন্ডন, নিউইয়র্ক ও প্যারিসের ব্যাঙ্কে দাফন করা।'[২]

জ্ঞান, শিল্প ও প্রযুক্তি এবং ধর্ম, চরিত্র ও মানবতার মধ্যে বর্তমান পশ্চিমা সভ্যতা যে বিরাট ব্যবধান সৃষ্টি করে রেখেছে এবং মানবতার কল্যাণসাধনে যে অমার্জনীয় ব্যর্থতার পরিচয় দিয়েছে সে সম্পর্কে মন্তব্য করতে গিয়ে অন্য এক পশ্চিমা পণ্ডিৎ, যিনি দর্শনশাস্ত্র ও প্রাকৃতিক বিজ্ঞান উভয় বিষয়ে বৈদগ্ধ্য অর্জন করেছেন, তিনি আরো সূক্ষ্ম-গভীর শৈলী ও দৃষ্টিকোণ থেকে বিষয়টি বিশ্লেষণ করেছেন। তিনি ডক্টর আলেক্সিস কেরল, তার মন্তব্য–

'বর্তমান জীবনব্যবস্থা মানুষকে শুধু সম্ভাব্য সকল উপায়ে সম্পদ অর্জনে প্রলুব্ধ করে, কিন্তু মানুষকে সম্পদের উদ্দেশ্য পর্যন্ত পৌঁছায় না, বরং তার মধ্যে একটা স্থায়ী উত্তেজনা ও জৈবিক চাহিদা সৃষ্টি করে এবং সেটাকে প্রশমিত ও পরিতৃপ্ত করার একটা অপরিপক্ব তাড়না সৃষ্টি করে। ফলে মানুষ ধৈর্য ও স্থৈর্য থেকে বঞ্চিত হয় এবং এমন যে কোন কাজ থেকে সে দূরে সরে থাকে যা কিছুটা কষ্টকর ও ধৈর্যসাপেক্ষ। আধুনিক সভ্যতা যেন এমন মানুষ সৃষ্টিই করতে পারে না যার মধ্যে সৃজনশীলতা, সাহস ও মেধা রয়েছে। প্রত্যেক দেশে দেখা যায়, যে শ্রেণীটি দেশ পরিচালনা করে এবং যাদের হাতে দেশের নিয়ন্ত্রণক্ষমতা,

[১] ঐ. পৃ. ২৯২
[২] ঐ. পৃ. ২৯২

তাদের মধ্যে নৈতিক ও চিন্তানৈতিক সক্ষমতার যথেষ্ট ঘাটতি রয়েছে। আমরা পরিষ্কার দেখতে পাচ্ছি, আধুনিক সভ্যতা ঐসব বৃহৎ আশা-আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ করতে সক্ষম হয়নি যা তার কাছে মানবজাতির কাম্য ছিলো। আধুনিক সভ্যতা এমন মানুষ সৃষ্টি করতে পারেনি যাদের মধ্যে সাহস আছে এবং মেধা ও যোগ্যতা আছে; যারা এই সভ্যতাকে ঐ দুর্গম চড়াই-উৎরাইপূর্ণ পথে নিরাপদে নিয়ে যেতে পারবে যেখানে এখন সভ্যতা শুধু ঠোকর খাচ্ছে এবং একের পর এক স্খলনের শিকার হচ্ছে। প্রকৃত ঘটনা এই যে, মানবসম্প্রদায় ঐরকম দ্রুত উন্নতি করতে পারেনি যেমন মানবমস্তিষ্ক থেকে জন্মলাভ করা প্রতিষ্ঠানগুলো করেছে। এটা মূলত রাজনৈতিক নেতৃবর্গের নৈতিক ও চিন্তানৈতিক ত্রুটি-বিচ্যুতিরই ফল এবং ঐ মূর্খতার ফল যা আজকের সমস্ত জাতি ও সম্প্রদায়কে বিপদ-ঝুঁকির মধ্যে ফেলে দিয়েছে।[1]

বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি আজ যে পরিবেশ ও পরিপার্শ্ব তৈরী করেছে তা মানুষের উপযোগী নয়। কেননা তা গড়ে উঠেছে শুধু তাৎক্ষণিকতার উপর, কোন পূর্ব-পরিকল্পনা ও চিন্তা-ভাবনার উপর নয়। মানুষের ব্যক্তিসত্তা ও চরিত্রের সঙ্গে সঙ্গতির বিষয়টি সেখানে চিন্তা করা হয়নি।
এই পরিবেশ ও পরিপার্শ্ব, যা শুধু মেধা ও বুদ্ধি এবং প্রযুক্তি ও উদ্ভাবনার ফসল, তা আমাদের আকার-আকৃতি ও দেহাবয়বের সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ নয়। এ অবস্থায় আমরা খুশী ও সুখী নই। আমরা এক নিরন্তর নৈতিক ও বুদ্ধিবৃত্তিক অধঃপতনের শিকার। যে সব জাতি ও জনগোষ্ঠীর মধ্যে শিল্পসভ্যতার বিকাশ ঘটেছে এবং যারা উৎকর্ষ ও সমৃদ্ধির চূড়ায় উপনীত হয়েছে তারা কিন্তু আগের চেয়ে দুর্বল হয়ে পড়েছে এবং দ্রুত বন্যতার দিকে ধাবিত হচ্ছে, কিন্তু তাদের সে অনুভূতি নেই। ঐ ক্ষিপ্ত ও উন্মত্ত পরিবেশ-পরিপার্শ্ব থেকে কোন শক্তি এখন তাদের বাঁচাতে পারবে না, যা বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি তাদের চারপাশে বেষ্টনীর মত তৈরী করে রেখেছে।[2]

সত্য এই যে, পূর্ববর্তী সভ্যতাগুলোর মত আমাদের বর্তমান সভ্যতাও জীবনের জন্য এমন কিছু শর্ত আরোপ করে রেখেছে, যা বিভিন্ন অজ্ঞাত কারণে জীবনকে অসম্ভব করে তোলবে। আমরা জড়বস্তু সম্পর্কে যতটা জ্ঞান অর্জন করেছি তার

[1] man the unknown, p. 33
[2] man the unknown, p. 33

তুলনায় জীবন সম্পর্কে আমাদের জ্ঞান খুবই অল্প। আমরা আসলে জানিই না, মানুষের কীভাবে জীবনযাপন করা উচিত। এ বিষয়ে আমাদের জ্ঞান এখনো অনেক পিছনে এবং এ জ্ঞানদৈন্যই আমাদের সর্বনাশ করেছে। এর মাশুল আমাদের দিয়েই যেতে হবে।[1]

উদ্ভাবিত যন্ত্রের যত দ্রুত সংখ্যাবৃদ্ধি ঘটছে, তা থেকে সেভাবে উপকার গ্রহণ করা সম্ভব হচ্ছে না। প্রাকৃতিক বিজ্ঞান, মহাকাশ বিজ্ঞান ও রসায়নশাস্ত্রের আবিষ্কারগুলোকে বেশী গুরুত্ব দিয়েও কোন লাভ নেই। কারণ সভ্যতার ভোগ-সামগ্রী, বিলাসপ্রাচুর্য এবং সৌন্দর্য ও নান্দনিকতাকে গুরুত্ব দিলেই বা কী হবে যদি নিজেদেরই দুর্বলতার কারণে তা থেকে আমরা উপকৃত না হতে পারি এবং মানব-কল্যাণে নিয়োজিত করতে না পারি! আমাদের জীবন থেকে যদি চরিত্র ও নৈতিকতার দিকটি এবং সর্বোত্তম মানবীয় গুণগুলো সম্পূর্ণ বের করে দেয়া হয় তাহলে সেই জীবনব্যবস্থাকে সুসংহত করে কী লাভ? আমাদের জন্য তো বেশী ভালো ছিলো দ্রুতগামী বিমান, আরামদায়ক গাড়ী, সস্তা রেডিও এবং দূর মহাকাশের অনুসন্ধানী টেলিস্কোব তৈরী করার চেয়ে নিজের প্রতি অধিক মনোযোগী হওয়া। কোন বিমান যদি সল্পতম সময়ে দূরতম কোন স্থানে পৌঁছে দেয় তাতে আমাদের প্রকৃত কী উন্নতিটা অর্জিত হবে? আমাদের জন্য কি খুব জরুরি যে, আমরা উৎপাদন বাড়িয়েই যাবো, যাতে মানুষ অধিক হারে অপ্রয়োজনীয় সামগ্রী ব্যবহার করতে থাকে? এতে কি সামান্যতম সন্দেহ আছে যে, যন্ত্রবিজ্ঞান, প্রাকৃতিক বিজ্ঞান ও রসায়নশাস্ত্র আমাদেরকে মেধা ও প্রজ্ঞা দান করতে পারে না এবং পারে না নৈতিক ব্যবস্থা, স্বাস্থ্যবিধান, স্নায়ুবিক ভারসাম্য ও শান্তি-নিরাপত্তা দান করতে?

যন্ত্র ও প্রযুক্তির ধ্বংসযজ্ঞতা

বিভিন্ন পরিবেশ-পরিস্থিতির কারণে, যার কিছু বিবরণ পিছনে তুলে ধরা হয়েছে, পাশ্চাত্যের জনপদে শুভ ও শুভ্রতা এবং কল্যাণ ও উত্তমতার প্রতি আগ্রহ-অনুরাগ প্রায় লোপ পেয়ে গেছে। সভ্যতা ও নৈতিকতার সুস্থ-সুন্দর নীতি ও মূলনীতিগুলো বহু আগেই তাদের হাতছাড়া হয়ে গেছে। দায়িত্বহীন ও ভ্রান্ত সাহিত্য তাদের হৃদয় ও হৃদয়বৃত্তিকে ভুল পথে নিয়ে গেছে। অন্তঃসারশূন্য ও

[1] ঐ. পৃ. ৩৮

নাস্তিকতামুখী দর্শন তাদের চিন্তা-চেতনাকে ভ্রষ্টতার পথে পরিচালিত করেছে। ফলে তাদের মন ও মনন, সংস্কার ও সংস্কৃতি এবং রুচি-রোচ্যতায় এমন ধ্বস নেমেছে যে, কল্যাণ ও সুকৃতির কোন যোগ্যতাই আর অবশিষ্ট থাকেনি। ফলে অসুস্থ পাকস্থলীর জন্য যেমন সুখাদ্যও ক্ষতিকর তেমনি বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির চর্চা এবং জ্ঞান ও বুদ্ধিবৃত্তির উদ্ভাস ও বিকাশ স্বয়ং ইউরোপের জন্য এবং সাধারণ-ভাবে মানবজাতি ও মানবসভ্যতার জন্য চরম ক্ষতির কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। বৃটেনের সাবেক প্রধানমন্ত্রী মিস্টান এডেন ১৯৩৮ সনে তার এক ভাষণে বড় সুন্দরভাবে বিষয়টি তুলে ধরেছেন। তিনি বলেন–

'কিছু বুঝে ওঠা এবং কিছু সংশোধন করার আগেই হয়ত মানুষ এ শতাব্দীর শেষভাগে সেই অসভ্যতা ও বর্বরতার যুগে ফিরে যাবে, যা পৃথিবীতে একসময় বিরাজমান ছিলো। হয়ত আজকের আধুনিক মানুষ প্রাচীন পৃথিবীর জঙ্গলী গুহাবাসিদের জীবনই গ্রহণ করবে। কী আশ্চর্য! সমস্ত জাতি ও রাষ্ট্র মারণাস্ত্র থেকে বাঁচার জন্য পানির মত অর্থ ব্যয় করছে। এসব অস্ত্রের ধ্বংসযজ্ঞতার বিষয়ে ভীত-সন্ত্রস্ত তো সবাই, কিন্তু সেগুলো নিয়ন্ত্রণে রাখার কথা কেউ ভাবছে না। কখনো কখনো অবাক হয়ে ভাবি, যদি ভিন্নগ্রহের কোন বুদ্ধিমান প্রাণী এখন পৃথিবীতে নেমে আসে, তাহলে সে কী দেখবে এবং কী ভাববে? সে দেখবে, আমরা নিজের হাতে নিজের ধ্বংসের সরঞ্জাম তৈরী করছি! আবার তথ্যবিনিময় করছি যে, এসব নারকীয় অস্ত্রের, আরো উন্নয়ন ঘটিয়ে, কীভাবে আরো কার্যকর ব্যবহার নিশ্চিত করা যায়।'

মিস্টার এডিন যখন কথা বলছিলেন তখন হয়ত তার কল্পনায়ও ছিলো না যে, উন্নত বিশ্ব ও তার অভিভাবক আমেরিকা, মুখে যারা শান্তির দাবিদার, ঐ যুদ্ধেই এমন অস্ত্র ব্যবহার করবে, যার ধ্বংসযজ্ঞতা সব মারণাস্ত্রকে ছাড়িয়ে যাবে, যার বীভৎসতা স্বয়ং বিজ্ঞানীদেরও ধারণাকে হার মানাবে। স্রষ্টার সঙ্গে যাদের সম্পর্ক নেই, নিজেদেরই যারা মনে করে বিজ্ঞান-প্রযুক্তির স্রষ্টা তাদের সেই 'ভয়ঙ্কর সুন্দর' সৃষ্টির নাম হলো পারমাণবিক বোমা।

কয়েক বছরের সুপরিকল্পিত গবেষণা ও চেষ্টা-সাধনা এবং বিপুল অর্থব্যয়ের মাধ্যমে শেষ পর্যন্ত আমেরিকা পারমাণবিক বোমার 'জনক' হলো। এবার আধুনিক প্রযুক্তির এই নতুন দৈত্যটির ধ্বংসযজ্ঞতার পরীক্ষার পালা। প্রথম পরীক্ষাটি সম্পন্ন হলো ১৯৪৫-এর ১৬ই জুলাই ভোর পাঁচটায় নিউ মেক্সিকোর জনমানবহীন মরুভূমিতে। তারপর চূড়ান্ত পরীক্ষার জন্য অত্যন্ত ঠাণ্ডামাথায় বেছে নেয়া হলো জাপানে কয়েক লাখ মানুষের শান্তিপূর্ণ দু'টি জনপদকে। কারণ এর পিছনে পাশ্চাত্য তার সর্বোচ্চ মেধা ও প্রযুক্তি ব্যয় করেছিলোই তো এ জন্য যে, শত্রুজাতি যেন সন্ত্রস্ত হয়ে পরাজয় মেনে নেয়, হোক না তাতে লাখ লাখ নিরপরাধ মানুষের দেহ ভস্ম!

১৯৪৫-এর ৬ই আগস্ট জাপানের দুর্ভাগা শহর হিরোশিমা হলো বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির নারকীয় ধ্বংসযজ্ঞের প্রথম শিকার, দ্বিতীয় শিকার হলো নাগাসাকি, ঠিক তিন দিন পর! যে সভ্যতা মানুষকে শিক্ষা দেয় শুধু বর্বরতা, ধিক তাকে ধিক! যে বিজ্ঞান, যে প্রযুক্তি মানুষের জন্য বয়ে আনে এমন ধ্বংস, এমন মৃত্যু, ধিক তাকে শত ধিক!

বোমাবিস্ফোরণের মুহূর্তের মধ্যে লক্ষ মানুষের বিশাল সমৃদ্ধ জনপদ ধ্বংসস্তূপে পরিণত হয়ে গেলো। না প্রাণ অবশিষ্ট ছিলো, না কোন প্রাণী; না মাকান অক্ষত ছিলো, না কোন 'মাকীন'। চোখের পলকে মানুষ, পশু, জড়পদার্থ সব নিশ্চিহ্ন হয়ে গেলো। বিস্ফোরণের বিকট 'ধামাকা', আলোর তীব্র ঝলকানি, বাতাসের চাপ ও ধোঁয়া সব মিলিয়ে বলা যায়, জাহান্নামের বিভীষিকা ছিলো। ধুলোবালি ও ধোঁয়ার কয়েক মাইলব্যাপী যেন সুউচ্চ এক পাহাড়, যার নীচে জ্বলছে জাহান্নামের আগুন, যা সবকিছুকে, শাব্দিক অর্থেই সবকিছুকে, ছাইভস্মে পরিণত করে ফেলেছে।

নিক্ষিপ্ত বোমার ধ্বংসলীলা উপভোগ করার লোভ ছিলো বিমানচালকের, কিন্তু বোমা ফেলেই তাকে সরে যেতে হয়েছে নিরাপদ দূরত্বে। নইলে বিমান ও চালক 'গলিত পদার্থ' হয়ে নীচে পড়ে যেতো। বোমার ধামাকা এত বিকট ছিলো যে, বোমাবর্ষণকারীদেরও অন্তরাত্মা কেঁপে উঠেছিলো। ভয়-ভীতি ও হতভম্বতার অবস্থার মুখ থেকে 'হায় খোদা'- এই একটিমাত্র শব্দই বের হতে পেরেছিলো। কিন্তু মিশনের সফলতার খবর শোনামাত্র মিত্রশক্তির শিবিরে শুরু হয়ে গিয়েছিলো নৃত্য ও আনন্দ-উল্লাস। ধ্বংস ও উল্লাসের এ বীভৎস দৃশ্য শয়তানের জন্য ছিলো কত না আনন্দের!

১৯৪৯ সালের ২০শে আগস্ট হিরোশিমার নগরপ্রধান এক বিবৃতিতে বলেছেন, ৬ই আগস্টে তাৎক্ষণিকভাবে যারা এ বোমার নির্মম বলি হয়েছে তাদের সংখ্যা দু'লাখ দশ হাজার থেকে চল্লিশ হাজার।

মিস্টার স্টুয়ার্ট গিল্ডার ভারতের স্টেটম্যান পত্রিকার ১৬ই সেপ্টেম্বর (১৯৪৫) সংখ্যায় প্রকাশিত এক নিবন্ধে এটম বোমার ধ্বংসযজ্ঞ সম্পর্কে মন্তব্য করতে গিয়ে লিখেছেন–

'যদিও বিশদ বৃত্তান্ত জানা ছিলো না, তবু বিজ্ঞানীরা এতটুকু অবশ্যই জানতেন, যে বোমা তারা ফেলতে যাচ্ছেন তার পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া এই হবে যে, মানবতার ধ্বংস রোধ করা আর সম্ভব হবে না। বিশদ বিবরণ জানতে হলে হিরোশিমার ধ্বংসপরবর্তী যেসব রিপোর্ট সংবাদদাতাদের হাতে এসেছে তা দেখুন। বোমা বিস্ফোরণের এটমিক প্লেগ সম্পর্কে তারা লিখেছেন–

'বহু মানুষ, যারা বোমার বিস্ফোরণ ও তাপবিকিরণের প্রতিক্রিয়ায় তৎক্ষণাৎ মৃত্যুবরণ করেনি, তারা এখন নিয়মিত মারা যাচ্ছে এবং মৃত্যুর কারণ এই যে, তাদের রক্ত 'বিশ্লিষ্ট' হয়ে যায়। প্রথমে শ্বেত কণিকা, পরে লোহিত কণিকা ধীরে ধীরে ধ্বংস হয়ে যায়। তাদের চুল পড়ে যায়, আর যত দিনই বেঁচে থাকে, অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ শুকিয়ে যেতে থাকে। এভাবে ক্রমে মৃত্যুর থাবা এগিয়ে আসে এবং তারা মৃত্যুর শিকার হয়। এর কারণ, সম্ভবত বিস্ফোরণের পর বাতাসে কিছু তেজস্ক্রিয় পদার্থ রয়ে গেছে এবং দেহের ত্বকে শোষিত হয়ে বা শ্বাস-প্রশ্বাসের মাধ্যমে ফুসফুসে অনুপ্রবেশ করছে।'

'এ খবর সারা বিশ্বকে কাঁপিয়ে দেয়ার জন্য যথেষ্ট। এর আগ পর্যন্ত পৃথিবী এ বোমার ভয়াবহতা সম্পর্কে যেমন কিছু জানতো না তেমনি তেজস্ক্রিয়তার ক্ষতি সম্পর্কেও অবগত ছিলো না, কিন্তু বিজ্ঞানীরা তো ত্রিশবছর আগেই জানতেন, এটা হবে এমন এক মারণাস্ত্র যার কোন প্রতিরোধ ও পাল্টা ব্যবস্থা নেই, যা পক্ষ-প্রতিপক্ষ সমগ্র মানবজাতির জন্য ধ্বংসকর প্রমাণিত হতে পারে।'

'জাপানীরা নাকি তেজস্ক্রিয়তার প্রভাব থেকে বাঁচার জন্য গৃহে প্রস্তুত মুখোশ ব্যবহার করেছে। সম্ভবত এগুলো হচ্ছে প্রচণ্ড শীত থেকে রক্ষার মুখাবরণ, যা তারা এত দিন ব্যবহার করে এসেছে, কিন্তু তা কোন কাজেই আসেনি; যেমন কাজে আসেনি ইথিওপীয় বাহিনীর নাক-পেঁচানো রুমাল, যা তারা হানাদার মুসোলিনীয় বাহিনীর বিমান থেকে ছোঁড়া বিষাক্ত গ্যাস থেকে আত্মরক্ষার জন্য ব্যবহার করেছিলো।'

'বোমা নিক্ষেপকারী বৈমানিকের মতে বিস্ফোরণের পর ধূলো ও ধোঁয়ার কুণ্ডলী শূন্যে নয় মাইল পর্যন্ত ছড়িয়ে পড়েছিলো। প্রফেসর প্লেসেস বলেন, বিস্ফোরণ-

ক্ষেত্র থেকে একশ মাইল দূরের লোকেরাও এর মরণছোবল থেকে নিরাপদ নয়। সুতরাং তাদেরও মেডিকেল পরীক্ষা হওয়া দরকার এবং নিবিড় বৈজ্ঞানিক পর্যবেক্ষণে রেখে দেখা দরকার, কোনভাবে তারা তেজস্ক্রিয়তার শিকার হয়েছে কি না। এটা মোটেও অসম্ভব নয় যে, পৃথিবীর মানুষ এক ভোরে ঘুম থেকে জেগে খবরের কাগজে পড়বে, জাপান থেকে হাজার মাইল দূরের বসতিতেও এটমিক প্লেগের লক্ষণ প্রকাশ পেতে শুরু করেছে।

একটি ছোট্ট এটম বোমার ধোঁয়া ও ধূলা যদি নয় মাইল পর্যন্ত পরিবেশকে বিষাক্ত করতে পারে তাহলে এটা ভাবা খুবই যৌক্তিক যে, আরো বড় বোমা আরো বিস্তৃত অঞ্চলজুড়ে প্রভাব ফেলবে।'

বার্মিংহাম বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক এম, ভি ওলে ফিনেট, এটমবোমা শিল্প-সংস্থার সদস্য, বলেন–

'কেউ যদি এটা ভাবে তাহলে খুবই হাস্যকর হবে যে, ব্রিটেন বা অন্য কেউ এটমবোমার কৌশল ও রহস্য গোপন রাখতে পারবে। যে সব সূত্রের উপর ভিত্তি করে এ বোমা তৈরী হয়েছে তা এখন প্রতিটি দেশের জন্য 'খোলা পাতা'। ব্রিটেন ও আমেরিকা পূর্ববর্তীদের জ্ঞান-অভিজ্ঞতা কাজে লাগিয়ে পারমাণবিক শক্তি অর্জন করেছে। তো নির্দ্বিধায় বলা যায়, একটা নির্দিষ্ট সময়ের পর তা সামরিক গোপনীয় বিষয় কিছুতেই থাকবে না, বরং প্রতিটি শিল্পোন্নত দেশ সর্বোচ্চ পাঁচ বছরের মধ্যে এ বোমা বানাতে পারবে। আর যদি সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার দিয়ে সর্বশক্তি এ প্রকল্পেই নিয়োজিত করা হয় তাহলে দু'বছরই যথেষ্ট।'

তিনি আরো বলেন, 'আমি নিশ্চিত যে, অচিরেই বিশ্ব এমন বোমা দেখতে পাবে যা প্রথমটির চেয়ে দশ হাজার টন বেশী বিস্ফোরকশক্তির অধিকারী হবে। এর পর আসবে এমন বোমা যার বিস্ফোরণ শক্তি হবে দশলক্ষ টন। কোন সতর্কতা ও প্রতিকারমূলক ব্যবস্থাই তখন কাজে আসবে না। আর এধরনের মাত্র ছয়টি বোমা পুরো ইংল্যান্ডকে ধ্বংসস্তূপে পরিণত করার জন্য যথেষ্ট। রুশবোমাও এখন আর খুব দূরে নয়।'

সম্প্রতি আমেরিকা আরেকটি বোমা উদ্ভাবনে সফল হয়েছে, হাইড্রোজেন বোমা, যার শক্তি ও ধ্বংসকরতা এটম বোমা থেকে অনেক বেশী। ১৯৫৪ সালের ২৬শে মার্চ প্রশান্ত মহাসাগরে দ্বিতীয়বারের মত এর পরীক্ষামূলক বিস্ফোরণ ঘটানো

হয়েছে। প্রতিরক্ষা সচীব মিস্টার চার্লস ই উইলসন বলেছেন, পরীক্ষার ফল ছিলো অবিশ্বাস্য পর্যায়ের।

আমেরিকার পারমাণবিক শক্তি কমিশনের প্রধান মিস্টার লুয়াইস স্ট্রাস বলেন, একটি হাইড্রোজেন বোমা নিউইয়র্কের মত বিশাল শহর মাটির সঙ্গে মিশিয়ে দিতে পারে।

প্রখ্যাত প্রকৃতি-বিজ্ঞানী এবং নিরাপত্তা পরিষদের প্রধান, সাহেব সিং নতুন দিল্লীতে বলেছেন, চারটি হাইড্রোজেন বোমা, যার প্রতিটির ওজন একশ টন, ভূপৃষ্ঠের প্রতিটি মানবসন্তানকে হত্যা করার জন্য যথেষ্ট। আর সর্বশেষ খবরে প্রকাশ, রাশিয়া নাইট্রোজেন বোমা উদ্ভাবন করতে সক্ষম হয়েছে যার ধ্বংস-বীভৎসতা হাইড্রোজেন বোমা থেকে অনেক বেশী।

যা খবীছ তা খবীছ ছাড়া আর কী দেবে?

পিছনের বিশদ আলোচনা থেকে এটা খোলা হয়ে গেছে যে, ইউরোপীয় সভ্যতার বুনিয়াদ এখন নড়বড়ে হয়ে পড়েছে। দিন দিন তার উচ্চতা যতই বৃদ্ধি পাচ্ছে দুর্বলতা, ভঙ্গুরতা ও পতনঝুঁকি ততই বেড়ে চলেছে। আর এটাই স্বাভাবিক। কারণ এ সভ্যতার বীজ নষ্ট বীজ; সুতরাং তার বৃক্ষ যেমন ভালো হতে পারে না তেমনি তার ফলও উত্তম হতে পারে না।

وَالْبَلَدُ الطَّيِّبُ يَخْرُجُ نَبَاتُهُ بِإِذْنِ رَبِّهِ ۖ وَالَّذِي خَبُثَ لَا يَخْرُجُ إِلَّا نَكِدًا

'আর উত্তম শহর, তার উদ্ভিদ (উত্তমরূপে) অঙ্কুরিত হয়, কিন্তু যা নিকৃষ্ট তা তো নিকৃষ্ট ছাড়া আর কোনরূপে অঙ্কুরিত হতে পারে না।' (আল-আ'রাফ, ৭ : ৫৮)

উপমহাদেশের প্রখ্যাত এক মুসলিম স্কলার সংক্ষেপে বিষয়টি এভাবে তুলে ধরেছেন–

'যে ভূখণ্ড ও জনগোষ্ঠীতে পাশ্চাত্য সভ্যতার আত্মপ্রকাশ, সেখানে আসমানি হিকমত ও ঐশী প্রজ্ঞার কোন স্বচ্ছ ও সুমিষ্ট ঝর্ণাধারা ছিলো না (যা হৃদয় ও আত্মার পিপাসা নিবারণ করতে পারে, যার সম্পর্কে বলা যায়, 'একবার পান করে আর পিপাসা ধরে না')। সেখানে ধর্মনেতা কম ছিলেন না, কিন্তু তাদের কাছে জ্ঞান, প্রজ্ঞা ও আসমানি শরী'আত ছিলো না; ছিলো ধর্মের কিছু আবছা ছায়া, যা চিন্তা ও কর্মের সরল পথে মানবজাতিকে পরিচালিত করতে যদি ইচ্ছাও করতো,

পারতো না। তবে ধর্ম নামের ঐ বস্তুটির উচিত ছিলো না জ্ঞান-বিজ্ঞানের অগ্রগতির পথে প্রতিবন্ধক ও 'হোঁচটখাওয়া পাথর' হওয়া, কিন্তু তাই হয়েছিলো। ফলে, যারা বিজ্ঞানের অভিযাত্রায় বদ্ধপরিকর ছিলো তারা ধর্মের জোয়াল ছুঁড়ে ফেলে দিলো এবং একটি পথ ও পন্থা গ্রহণ করলো যেখানে অবলোকন ও পরীক্ষা এবং গবেষণ ও নীরিক্ষা ছাড়া তাদের আর কোন প্রমাণ ও প্রদর্শক ছিলো না। এই প্রমাণ ও প্রদর্শক-এর উপরই তারা নিঃশর্ত আস্থা স্থাপন করেছিলো, অথচ এগুলো নিজেই ছিলো প্রমাণসাপেক্ষ এবং হিদায়াত ও নূরের মুহতাজ। অবলোকন, নিরীক্ষণ ও পরীক্ষণ– এসব প্রমাণের ভিত্তিতেই তারা চিন্তা-গবেষণা, সন্ধান-অনুসন্ধান ও নির্মাণ-বিনির্মাণের পথে অগ্রসর হলো এবং চেষ্টা-সাধনায় আত্মনিয়োগ করলো। কিন্তু প্রতিটি দিকে, প্রতিটি ক্ষেত্রে তাদের প্রথম পদক্ষেপই ছিলো ভ্রান্ত। ফলে জ্ঞানসাধনার সর্বঅঙ্গনে তাদের অভূতপূর্ব সফলতা এবং চিন্তা-গবেষণার পথে তাদের সব প্রয়াস-প্রচেষ্টা তাদেরকে সঠিক লক্ষ্যে উপনীত করতে সম্পূর্ণ ব্যর্থ হলো।

তারা যাত্রা শুরু করলো জড়বাদ ও নাস্তিকতা, এই বিন্দু থেকে। বিশ্বজগতকে তারা দেখলো এই বিশ্বাস থেকে যে, এর কোন স্রষ্টা নেই এবং অবলোকন ও অনুভবের বাইরে কোন কিছুর উপস্থিতি নেই। এই যে দৃশ্য পর্দা, এর আড়ালে অদৃশ্য কোন কিছুর অস্তিত্ব নেই। পরীক্ষা-নিরীক্ষার মাধ্যমে তারা প্রকৃতির নীতি ও সূত্র অনুধাবন করতে তো সক্ষম হলো, কিন্তু প্রকৃতির নিয়ন্তা-শক্তির পরিচয় অর্জনে ব্যর্থ হলো। বিদ্যমান বস্তু, পদার্থ ও ব্যবস্থাকে তারা 'নিয়ন্ত্রিত' দেখতে পেলো এবং বিভিন্ন কাজেও লাগালো, কিন্তু ভুলে গেলো যে, তারা এগুলোর মালিক নয়, প্রকৃত মালিকের প্রতিনিধিমাত্র। তাই তাদের মনেই হলো না যে, এ বিষয়ে তাদের কোন দায়িত্ব ও দায়বদ্ধতা আছে এবং কোন উর্ধ্বশক্তির কাছে তাদের জবাবদেহি করতে হবে। ফলে তাদের সভ্যতার ভিত্তিতেই গলদ রয়ে গেলো। স্রষ্টার উপাসনা ছেড়ে তারা মেতে উঠলো আত্মপূজায়। প্রবৃত্তিই হলো তাদের উপাস্য, যা তাদের নিক্ষেপ করলো এক মহাফিতনার আবর্তে, যা থেকে উদ্ধারের কোন উপায় থাকলো না। বরং মন-মনন ও চিন্তা-চেতনার সব ক্ষেত্রেই আপাত সুন্দর, কিন্তু বড় ভয়ঙ্কর পথে তারা এগিয়ে গেলো, যার পরিণতি ধ্বংস ছাড়া আর কিছু নয়।

এটাই জ্ঞান-বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিকে বিকৃত ও বিনষ্ট করেছে। ফলে মানব-কল্যাণের মাধ্যম না হয়ে তা হয়ে পড়েছে মানবতার ধ্বংসের বাহন। এবং আখলাক ও

চরিত্র হয়ে পড়েছে খাহেশাত ও প্রবৃত্তির অনুগামী এবং নগ্নতা ও স্বেচ্ছাচারের অপর নাম। সর্বোপরি জীবন ও জীবিকা এবং সমাজ ও সামাজিকতা, সবকিছুর উপর চেপে বসেছে কৃপণতা, স্বার্থপরতা, নিষ্ঠুরতা ও বর্বরতার শয়তান। শিরায় শিরায় প্রবাহিত হচ্ছে আত্মপূজা, আত্মকেন্দ্রিকতা, আত্মঅহমিকা ও ভোগ-লালসা। একারণেই রাজনীতি ও রাষ্ট্রনীতিতে চলছে বর্ণবাদ ও জাতীয়তাবাদের জিঘাংসা ও উন্মাদনা, চলছে শক্তিদেবতার পূজা ও বন্দনা, যা মানবতার জন্য আজ সবচে' বড় অভিশাপ।

মোটকথা, নবজাগরণের পর ইউরোপের মাটিতে যে দুষ্ট বীজ বপন করা হয়েছিলো, কয়েক শতাব্দীর মধ্যেই তা এক বিরাট বিষবৃক্ষের রূপ ধারণ করে ফেলেছে এবং স্বাভাবিক ফল দিতে শুরু করেছে, যা বাইরে সুন্দর, কিন্তু ভিতরে তিতা ও বিষে ভরা, যার শাখা-প্রশাখা সবুজ পাতায় ছাওয়া, কিন্তু তা অক্সিজেন নির্গত করে না, বিষাক্ত গ্যাস ছড়ায় এবং শ্বাস-প্রশ্বাসের মাধ্যমে মানবদেহের রক্তে গিয়ে মিশে যায়।

পাশ্চাত্য জাতি, যারা নিজেরাই এ দুষ্ট বৃক্ষ রোপণ করেছে, এর বিষাক্ততায় আজ অতিষ্ঠ ও দিশেহারা হয়ে পড়েছে। কেননা জীবনের সর্বক্ষেত্রে তা অসংখ্য সমস্যা ও সঙ্কট সৃষ্টি করেছে এবং করে চলেছে। হয়ত তারা একটি সমস্যার সমাধান করে, কিন্তু সেখান থেকে নতুন নতুন সমস্যা মাথাচাড়া দিয়ে ওঠে। একটি ডাল যদি বা কাটে, সেখান থেকে আরো অসংখ্য ডাল-কাঁটা গজিয়ে ওঠে। তাদের অবস্থা হয়েছে সেই হতভাগ্য চিকিৎসকের মত যে রোগ দিয়ে রোগের চিকিৎসা করে এবং কাঁটা দিয়ে কাঁটার আঘাত সারাতে চায়।

তারা যখন পুঁজিবাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করলো তখন কমিউনিজম জন্ম নিলো। যখন গণতন্ত্রের মূলোৎপাটন করতে চাইল তখন একনায়কত্ব আজদাহার মত মুখ হা করলো। যখন সামাজিক সঙ্কটের সমাধান করার চেষ্টা করলো, তখন সমাধান তো হলোই না, বরং দানা বেঁধে উঠলো নারীর পুরুষায়ণ ও জন্মনিরোধ আন্দোলন। নৈতিক অনাচার দূর করার জন্য যখন আইন ও বিধান তৈরী করলো তখন অপরাধ ও আইন অমান্যের প্রবণতা হলো সর্বগ্রাসী। ফলে একটি মন্দ আরেকটি মন্দকে এবং একটি ফাসাদ আরো বড় ফাসাদকেই শুধু ডেকে আনতে লাগলো। এভাবে এ বিষবৃক্ষ তাদের জীবনে বিষ ও বিষাক্ত কাঁটাই শুধু ছড়িয়ে চলেছে এবং নিত্য নতুন বিপদ ও বিপর্যয় ডেকে আনছে। ফলে পাশ্চাত্যের

সমাজদেহ আজ তাদের চিন্তানায়ক ও বিদগ্ধ পণ্ডিতদের মতেও দগদগে ঘা ও পুঁজপূর্ণ ক্ষতে এমনভাবে ভরে গেছে যে, ক্ষত ধোয়া ও মলম লাগানোরও উপায় নেই–

'তান হামা দাগ দাগ শুদ, পুম্বা কুজা কুজা নিহাম'–
সারা দেহে ক্ষত, তুলো ও মলম লাগাব কোথায়?

রোগ-ব্যাধি এখন চিকিৎসককেই যেন দিশেহারা করে ফেলেছে এবং ছেঁড়া-ফাড়া রিফুকারীকে হতভম্ব করে ফেলেছে। পাশ্চাত্য আজ রোগে, শোকে, ব্যথায়, যন্ত্রণায় কাতর। অস্থিরতায় শুধু ছটফট করছে, কিন্তু উপশমের উপায় খুঁজে পাচ্ছে না। তার হৃদয় শান্তির জন্য ব্যাকুল এবং তার আত্মা অমৃতজলের জন্য পিপাসার্ত, কিন্তু জানা নেই কোথায় জল ও জলাশয়?! কোথায় অমৃত, কোথায় আবেহায়াত?!

পাশ্চাত্যের বিদগ্ধ সমাজের সাধারণ ধারণা, সমস্যার উৎস হচ্ছে গাছের ডাল-পালায়। তাই তারা ডাল-পালা কাটতেই ব্যস্ত এবং এতেই তাদের সময়, শ্রম ও মেধার অপচয় ঘটছে। তারা জানে না, কিংবা জানতে চায় না যে, ফাসাদ ও নষ্টতা ডাল-পালায় নয়, গাছের গোড়ায়। আর এটা কোন বিচক্ষণতা ও বুদ্ধি-মত্তার পরিচয় নয় যে, নষ্ট বীজ থেকে উত্তম বৃক্ষ এবং মন্দ মূল থেকে উত্তম শাখা আশা করা হবে।

কতিপয় জ্ঞানী ও বুদ্ধিমান ব্যক্তি অবশ্য সত্য অনুধাবন করতে পেরেছে, কিন্তু যেহেতু তারা বহু শতাব্দী ধরে এই বিষবৃক্ষের বিষাক্ত ছায়ায় প্রতিপালিত হয়েছে এবং এর ফল দ্বারা তাদের অস্থি-মাংস তৈরী হয়েছে তাই তারা চাইলেও বিষবৃক্ষের বৃত্ত থেকে বেরিয়ে আসতে পারছে না। দুর্বল চিন্তা ও অসুস্থ বুদ্ধি তাদের একথা ভাবারই সুযোগ দিচ্ছে না যে, জীবন ও সভ্যতার নতুন নির্মাণের জন্য নতুন কোন ভিত্তি ও বুনিয়াদ থাকতে পারে, কিংবা থাকতে পারে অন্য কোন সুস্থ বীজ যা থেকে জন্ম লাভ করবে একটি উত্তম বৃক্ষ, যার প্রতিটি শাখা-প্রশাখা হবে উত্তম, প্রতিটি ফল-পাতা হবে উত্তম। এজন্য উভয় পক্ষের পরিণামই হচ্ছে অভিন্ন। উভয় পক্ষই সন্ধান করছে রোগ নিরাময়ের সঠিক উপায়, কিন্তু কেউ জানে না, প্রকৃত আরোগ্য কোথায়?[১]

[১] তানকীহাত, প্রবন্ধ 'যুগের ব্যাধিগ্রস্ত জাতিসমূহ', মাওলানা মওদূদী, পৃ. ২৪, ২৫, ২৬

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

ইউরোপীয় সাম্রাজ্যবাদের যুগে মানবতার আত্মিক বিপর্যয়

বিপর্যয়ের বিভিন্ন দিক

পাশ্চাত্য সভ্যতা ও ইউরোপীয় সাম্রাজ্যবাদের আগ্রাসনের কারণে প্রাচ্যের এশীয় জাতি ও জনগোষ্ঠীগুলোর জাগতিক ও বস্তুগত দুর্গতি ও ক্ষয়ক্ষতি কম ছিলো না, বরং এমন ভয়াবহ পর্যায়ের ছিলো যা কাটিয়ে ওঠা বহু যুগেও হয়ত সম্ভব হবে না।

এটা অবশ্যই অত্যন্ত মর্মন্তুদ বিষয়, তবে এ সম্পর্কে এখানে আলোচনা করা আমাদের উদ্দেশ্য নয়। প্রাচ্যের রাজনীতি, অর্থনীতি, শিল্প ও ব্যবসা-বাণিজ্য কীভাবে বিপর্যস্ত হয়েছে; কীভাবে তাদের সুবিপুল সম্পদ-সম্ভার লুণ্ঠিত হয়েছে এবং কীভাবে দেশের পর দেশ ও জনগোষ্ঠীর পর জনগোষ্ঠী পাশ্চাত্যের জাগতিক শক্তি ও রাজনৈতিক ধূর্ততার কাছে পরাজিত হয়েছে, সে বড় দীর্ঘ ও মর্মন্তুদ ইতিহাস, যা এই ক্ষুদ্র পরিসরে তুলে ধরা সম্ভব নয়। তাছাড়া প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের বহু লেখক-ঐতিহাসিক এ বিষয়ে কলম ধরেছেন এবং বিভিন্ন মান ও কলেবরের বহু গ্রন্থ রচনা করেছেন। এখানে যেহেতু আমাদের মূল আলোচ্যবিষয় হচ্ছে মুসলিমবিশ্বের পতন ও তার অনিবার্য ফলরূপে ইউরোপীয়দের আধিপত্য বিস্তারের কারণে বিশ্বের কী ক্ষতি হয়েছে তা তুলে ধরা, সেহেতু এখানে আমরা অতি সংক্ষেপে ও সঙ্কেতে তুলে ধরতে চাই যে, ইউরোপের এই সর্বগ্রাসী আগ্রাসনের ফলে, যার ভয়াবহ প্রভাব থেকে পর্বতের চূড়া ও গভীর উপত্যকা, ভৌগোলিক পরিবেশ ও জলবায়ু, এমনকি স্বাধীন জনগোষ্ঠীগুলোর বিবেক-বুদ্ধিও নিরাপদ থাকেনি, এরূপ ভয়াবহ আগ্রাসনের ফলে মানবজাতি হৃদয় ও আত্মা, নীতি ও চরিত্র এবং চিন্তা ও বিশ্বাসের ক্ষেত্রে কী পরিমাণ ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে? বলাবাহুল্য যে, বস্তুসম্পদের ক্ষতির চেয়ে আত্মিক সম্পদের ক্ষতি অনেক বেশী

বিপর্যয়কর। এ শোকের, এ বিপর্যয়ের সত্যি কোন তুলনা নেই। এমনকি খুব অল্প মানুষই এর ব্যাপকতা ও গভীরতা বুঝতে পেরেছেন। আর ঐ অল্পেরও খুব অল্পসংখ্যক এ বিষয়ে কলম ধরেছেন।

বিজিত জনপদ ও জনগোষ্ঠীর মধ্যে যেহেতু একমাত্র মুসলিম উম্মাহই ছিলো স্বতন্ত্র বোধ, বিশ্বাস, সংস্কৃতি, নীতি ও চরিত্রের অধিকারী এবং ইসলামী জীবন-ব্যবস্থাই ছিলো জাহেলিয়াতের আসল প্রতিদ্বন্দ্বী সেহেতু খুব স্বাভাবিক কারণেই ইউরোপীয় সাম্রাজ্যবাদের শাসন-শোষণে মুসলিম উম্মাহর ক্ষতি ও বিপর্যয়ই ছিলো সবচে' বেশী এবং তাদেরই উপর দিয়ে বয়ে গেছে ঝড়-তুফানের আসল প্রলয়তাণ্ডব।

বস্তুত স্বভাব ও প্রকৃতিতেই ইসলাম ও জাহেলিয়াত হচ্ছে 'তারাজুর' দুই পাল্লা। সুতরাং একটি পাল্লা নীচে নামলে অন্যটি অনিবার্যভাবেই উপরে উঠে যাবে। মধ্যযুগে তাতারী হামলার ক্ষেত্রে যেমন এটা হয়েছে, আধুনিক যুগে ইউরোপীয় আগ্রাসনের ক্ষেত্রেও এটাই হয়েছে। তো ইউরোপীয় জাহেলিয়াতের আগ্রাসনের মুখে মুসলিম উম্মাহ কোন্ কোন্ দিক থেকে আত্মিক বিপর্যয়ের সম্মুখীন হয়েছে, এখানে একে একে সেগুলো আমরা আলোচনা করছি। বিপর্যয়ের প্রধান শিরোনামগুলো হচ্ছে এই–

(ক) ধর্মীয় অনুভূতির বিলুপ্তি (খ) ধর্মীয় আবেগ-উদ্দীপনার বিলুপ্তি (গ) উদর ও বস্তুর উদগ্রতা (ঘ) নীতি ও নৈতিকতার ধ্বস (ঙ) উদ্যমহীনতা ও আরামপ্রিয়তা

ধর্মীয় অনুভূতির বিলুপ্তি

এই যে, জগত-সংসার, এই যে, জীবন ও তার দৌড়ঝাঁপ, এর শেষ পরিণতি কী? মানুষ কোত্থেকে এসেছে, কোথায় যাবে? মৃত্যুর পর অন্যকোন জীবন কি আছে? যদি থাকে, কেমন সে জীবন? কী তার রূপ ও প্রকৃতি? দুনিয়ার দু'দিনের জীবনে কি আখেরাতের অনন্ত জীবনের জন্য কোন হিদায়াত ও বিধান-ব্যবস্থা রয়েছে? যদি থাকে, কোন্ উৎস থেকে মানুষ তা পাবে এবং কার তারবিয়াত ও তত্ত্বাবধানে নির্ভুলভাবে মানুষ তা পালন করতে পারে? আখেরাতের চিরসৌভাগ্য অর্জনের পথ ও পন্থা কী এবং তা কে বলে দেবে?

প্রাচ্যের জীবন ও চিন্তায় এগুলো ছিলো এমন জ্বলন্ত প্রশ্ন যা মানুষকে যুগযুগ ধরে অস্থির ও ব্যাকুল করে রেখেছে; এমনকি চরম ভোগবাদিতা ও আত্মবিস্মৃতির যুগেও হৃদয় ও আত্মার এসব অস্থির জিজ্ঞাসা সম্পর্কে সে উদাসীন থাকতে

পারেনি। তার অন্তরাত্মা বারবার তাকে জিজ্ঞাসা করেছে এবং জবাব চেয়েছে। প্রাচ্যের মানুষ তার সুদীর্ঘ জীবন-ইতিহাসের কোন অধ্যায়ে হৃদয় ও আত্মার স্বতঃস্ফূর্ত এসব জিজ্ঞাসাকে উপেক্ষা করতে পারেনি; পারেনি সংসারের জটিলতার অজুহাতে ভিতরের আওয়ায শুনেও না শোনার ভান করতে, বরং সে কান পেতে শুনেছে, নিবিষ্ট চিত্তে গ্রহণ করেছে এবং জাগ্রত মস্তিষ্কে চিন্তা করেছে–

কে আমি? কোত্থেকে এসেছি? কোথায় যাবো? কীভাবে এ জীবনে ঐ জীবনের প্রস্তুতি গ্রহণ করবো?

জীবনের অব্যাহত ব্যস্ততা ও ত্রস্ততা এবং বুদ্ধিবৃত্তির নিরন্তর প্রয়াস-সাধনার মধ্যে এ প্রশ্নগুলোকেই সে অগ্রাধিকার দিয়েছে। জ্ঞান ও সভ্যতার বহু সহস্র-বৎসরব্যাপী ইতিহাসে এসব জিজ্ঞাসার উত্তরসন্ধানেই সে ব্যাপৃত ছিলো। কখনো যুক্তিতে, কখনো ভক্তিতে; কখনো বিতর্কে, কখনো বিশ্বাসে কিছু সে গ্রহণ করেছে, কিছু বর্জন করেছে। কখনো সত্য থেকে সরে গেছে, কখনো সত্যের কাছে এসেছে। কখনো তার সামনে আলো ছিলো, কখনো ছিলো আঁধার। কিন্তু তার সত্যসন্ধানের অভিযাত্রা কখনো থেমে থাকেনি। প্রাচ্যের গর্বের সম্পদরূপে স্বীকৃত এই যে বিভিন্ন দর্শন ও আত্মদর্শন, দেহতত্ত্ব ও ঈশ্বরতত্ত্ব; এই যে, আধ্যাত্মিক সাধনা ও নির্বাণপ্রয়াস এবং বিভিন্ন ঊর্ধ্বজাগতিক চর্চা-অনুশীলন ও পরীক্ষণ-নিরীক্ষণ, এগুলো আর কিছু নয়, মানুষের স্বভাবজাত ঐসব প্রশ্নের উত্তরসন্ধানের বিভিন্ন প্রয়াসমাত্র।

এ সুদীর্ঘ প্রয়াস-প্রচেষ্টায় মানুষ সফল হয়েছে, না ব্যর্থ, তা মূল কথা নয়; মূল কথা হলো, প্রাচ্যের জীবনে এসব প্রশ্ন সর্বদা জাগরূক ছিলো এবং উত্তর-সন্ধানের প্রাণান্ত প্রয়াস অব্যাহত ছিলো। পথ দীর্ঘ, দুর্গম ও অন্ধকার ছিলো; গন্তব্য ছিলো অজানা ও রহস্যঘেরা, কিন্তু তার পথচলা ও অভিযাত্রা ছিলো অব্যাহত; যা প্রমাণ করে যে, প্রাচ্যের জীবনে এটি ছিলো অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এক অধ্যায় এবং তার কৌতূহল, ব্যাকুলতা ও অস্থিরতা ছিলো সীমাহীন। এক্ষেত্রে দার্শনিক পরিভাষা ব্যবহার করে বলা যায়, প্রাচ্যের মানুষ 'পঞ্চ-ইন্দ্রিয়'র পাশাপাশি ষষ্ঠ একটি ইন্দ্রিয়'র অধিকারী ছিলো, যাকে আমরা 'ধর্মেন্দ্রিয়' বলতে পারি। তো প্রতিটি ইন্দ্রিয় যেমন নিজস্ব ক্ষেত্রে কাজ করে এবং সংশ্লিষ্ট তথ্য আহরণ করে, তেমনি এই 'ধর্মেন্দ্রিয়'রও রয়েছে নিজস্ব কিছু অনুভবযোগ্য বিষয়, যা প্রাচ্যের চিন্তা-জীবনের অপরিহার্য অংশ।

এটা অবশ্য ঠিক যে, নবজাগরণের প্রথম দিকে ইউরোপেও এসব প্রশ্ন জাগরূক ছিলো এবং চিন্তাশীল ও বিদ্বানসমাজ এ বিষয়ে চিন্তা-গবেষণায় নিয়োজিত ছিলো। কিন্তু সময়ের সঙ্গে সঙ্গে পাশ্চাত্য সভ্যতা ও জীবন-দর্শনের অন্তর্গত গুণ-বৈশিষ্ট্যগুলো যতই সামনে এসেছে এবং ভোগবাদ ও বস্তুবাদের কঠিন মোহজালে তারা যতই জড়িয়ে পড়েছে, হৃদয় ও আত্মার জিজ্ঞাসার গুরুত্ব ততই কমে এসেছে এবং বাস্তব জীবনে ততই তা ভোগ ও চাহিদার নীচে চাপা পড়ে গেছে।

বস্তুত এ আত্মজিজ্ঞাসা, যা মানুষের জাগ্রত বিবেক এবং জীবন্ত হৃদয়ের গভীর থেকে উৎসারিত হয়, জীবনের হৈচৈ ও শোরগোলে যারা ডুবে থাকে, তারা কখনো তা শুনতে পায় না। এর জন্য প্রয়োজন অখণ্ড নীরবতা, নির্জনতা ও অপরিসীম নৈশব্দ, যা পাশ্চাত্যের জীবনে একেবারেই অনুপস্থিত। তাদের জীবন তো একটানা দৌড়ঝাঁপ, ভোগের উল্লাস, আনন্দের হৈচৈ এবং যন্ত্রের শোরগোল ছাড়া আর কিছু নয়।

অতিপ্রাকৃতিক দর্শনের পরিমণ্ডলে, বিশ্ববিদ্যালয়ে এবং বুদ্ধিজীবীদের সমাবেশে হয়ত এখনো এসব প্রশ্নের তাত্ত্বিক আলোচনা হয়। বিশেষজ্ঞ পণ্ডিতগণ হয়ত এখনো এ বিষয়ে গবেষণা করেন, মতামত ব্যক্ত করেন এবং মাঝেমধ্যে গ্রন্থ-রচনাও করেন, কিন্তু এটা নির্মম সত্য যে, হৃদয় ও আত্মার জগত থেকে তা এমনভাবে নির্বাসিত হয়েছে যে, প্রশ্নবোধক চিহ্নটিপর্যন্ত মুছে গেছে। আত্ম-জিজ্ঞাসার যে উৎকণ্ঠা ও ব্যাকুলতা এবং যে অন্বেষা ও অনুসন্ধিৎসা প্রাচ্যকে শত সহস্র বৎসর থেকে অস্থির করে রেখেছে, পাশ্চাত্যের জীবনে আজ তা সম্পূর্ণ অনুপস্থিত। আর অবশ্যই তা এজন্য নয় যে, এক্ষেত্রে তারা বিশ্বাস ও প্রত্যয় এবং স্বস্তি ও আশ্বস্তি লাভ করেছে, বরং এজন্য যে, জীবনে এর গুরুত্বই শেষ হয়ে গেছে এবং অন্যবহু ব্যস্ততা, সমস্যা ও জটিলতা এর স্থান দখল করে নিয়েছে। আজকের সদাব্যস্ত ও ভোগসর্বস্ব মানুষ হৃদয় ও আত্মার জিজ্ঞাসার প্রতি সম্পূর্ণ উদাসীন ও নিস্পৃহ। এ সম্পর্কে চিন্তা-ভাবনা ও উত্তর-অন্বেষণের কোন অবকাশই তাদের জীবনে আর নেই। কারণ তাদের কাছে জীবন মানেই হলো যা দেখা যায় এবং নগদ ভোগ করা যায়। এখন তাদের একমাত্র কাম্য হলো, ভোগের চাহিদা বৃদ্ধি করার এবং আরো আনন্দঘনরূপে তা চরিতার্থ করার বিশদ দিকনির্দেশনা।

পাশ্চাত্যের জীবন এখন দিনভর ব্যস্ত থাকে কল-কারখানায়, অফিস-আদালতে। দিনশেষে সন্ধ্যায় প্রয়োজন আনন্দ-বিনোদন এবং মদের গ্লাসে সন্তরণ। শেষ-রাতে প্রয়োজন একটু শান্তির ঘুম ও সুখনিদ্রা। সপ্তাহ বা মাসশেষে প্রয়োজন প্রাপ্য বেতন-মজুরি। বছরের শেষে প্রয়োজন লাভ ও মুনাফার হিসাব, আর জীবনের শেষে প্রয়োজন হারানো যৌবন ও নষ্ট স্বাস্থ্য ফিরে পাওয়া। আর জীবনের ওপারে?! সেটা অজানা, বরং তার কাছে সেটা হলো আজগুবি চিন্তা। কোরআনের ভাষায়–

بَلِ ادّٰرَكَ عِلْمُهُمْ فِي الْاٰخِرَةِ ۚ بَلْ هُمْ فِيْ شَكٍّ مِّنْهَا ۚ بَلْ هُمْ مِّنْهَا عَمُوْنَ ﴿٦٦﴾

বরং আখেরাত সম্পর্কে তাদের সব জ্ঞান নিঃশেষ হয়ে গেছে, বরং এ বিষয়ে তারা সন্দেহে পড়ে আছে, বরং এ বিষয়ে তারা অন্ধ। (আন-নামল, ২৭ : ৬৬)

প্রাচীন প্রাচ্য এবং আধুনিক পাশ্চাত্যের মধ্যে এ এক বিরাট মনস্তাত্ত্বিক পার্থক্য যে, প্রাচ্য 'ধর্মেন্দ্রিয়' নামে একটি অন্তর্শক্তির অধিকারী ছিলো, পক্ষান্তরে সভ্যতা ও যন্ত্রসভ্যতার অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে পাশ্চাত্য তা থেকে বঞ্চিত হয়ে পড়েছে। আর কোন ইন্দ্রিয় শক্তি যখন নষ্ট হয়ে যায় তখন সংশ্লিষ্ট অনুভবও বিলুপ্ত হয়ে যায়। অন্ধের কাছে তাই দৃশ্যজগত ও তার বর্ণবৈচিত্র্য অর্থহীন, আর বধির জানে না শব্দজগতের কোলাহল। তদ্রূপ ধর্মেন্দ্রিয় থেকে বঞ্চিত যে, তার কাছে এর দ্বারা অনুভবযোগ্য সকল বিষয় অস্তিত্বহীন। গায়বের সকল সত্য তার কাছে অলীক কল্পনামাত্র। আখেরাত, জান্নাত-জাহান্নাম, আযাব ও ছাওয়াব, আল্লাহর সন্তুষ্টি-অসন্তুষ্টি, তাকওয়া ও পবিত্রতা, এগুলো তার কাছে অর্থহীন শব্দ ছাড়া আর কিছু নয়। এমন কোন দাওয়াত ও আহ্বানের প্রতি তার কোন অনুরাগ-আকর্ষণ নেই যার সম্পর্ক পঞ্চেন্দ্রিয়ের সঙ্গে নয়, যা নগদ ভোগ-আনন্দের কথা বলে না। অন্তরকে ঝাঁকুনি দেয়, হৃদয়কে বিগলিত করে এবং চোখকে অশ্রুসিক্ত করে, এমন কোন ঘটনা, বাণী ও উপদেশ তার মধ্যে কোন রেখাপাতই করে না।

ধর্মেন্দ্রিয়-বঞ্চিত এসমস্ত লোকদের পক্ষ হতেই যুগে যুগে আম্বিয়া ও ওয়ারিছীনে আম্বিয়া সবচে' কঠিন প্রতিবন্ধকতার সম্মুখীন হয়েছেন। কোন উপদেশ ও ধর্মকথা এবং কোন দরদ-ব্যথা ও অশ্রুপাত তাদের মধ্যে সামান্য প্রতিক্রিয়াও সৃষ্টি করতে পারেনি। তাদের হৃদয়ের তাপ ও উত্তাপ এমন শীতল হয়ে

গিয়েছিলো যে, তাতে সামান্য উষ্ণতা সৃষ্টিরও আর অবকাশ ছিলো না। তাদের চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত ছিলো, ধর্মের কথায় তারা কান দেবে না এবং ধর্মের কোন আবেদনে আর সাড়া দেবে না। পাথর গলে মোম হয়ে যায়, এমন দাওয়াত শুনেও যুগে যুগে এরাই বলে উঠতো–

إِنْ هِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا نَمُوتُ وَنَحْيَا وَمَا نَحْنُ بِمَبْعُوثِينَ

আমাদের পার্থিব জীবন ছাড়া আর কোন জীবন নেই। আমরা মৃত্যুবরণ করি, আর জীবনযাপন করি, আর আমরা পুনরুত্থিত হবো না। (আল-মুমিনূন, ২৩ : ৩৭)

নবী ও পয়গম্বরগণ যখন তাদেরকে তাদেরই ভাষায় সহজ-সরল কথায় উপদেশ দিতেন এবং দ্বীনের পথে দাওয়াত দিতেন, যা একটি শিশুরও বুঝতে পারার কথা, তখন তারা 'আপসে আপ' বলে বসতো–

قَالُوا يَا شُعَيْبُ مَا نَفْقَهُ كَثِيرًا مِمَّا تَقُولُ وَإِنَّا لَنَرَاكَ فِينَا ضَعِيفًا وَلَوْلَا رَهْطُكَ لَرَجَمْنَاكَ وَمَا أَنْتَ عَلَيْنَا بِعَزِيزٍ

তারা বলতো, হে শো'আইব, তুমি যা বলো তার অনেক কিছুই আমরা বুঝি না, আর তোমাকে তো দেখতে পাচ্ছি আমাদের মধ্যে দুর্বল। তোমার গোষ্ঠী যদি না হতো তাহলে তো তোমাকে পাথর ছুঁড়ে মেরে ফেলতাম। আমাদের কাছে তুমি মূল্যবান কিছু নও। (হূদ, ১১ : ৯১)

وَقَالُوا قُلُوبُنَا فِي أَكِنَّةٍ مِمَّا تَدْعُونَا إِلَيْهِ وَفِي آذَانِنَا وَقْرٌ وَمِنْ بَيْنِنَا وَبَيْنِكَ حِجَابٌ فَاعْمَلْ إِنَّنَا عَامِلُونَ

তারা বলতো, তুমি আমাদের যে দিকে ডাকছো, সে বিষয়ে আমাদের অন্তর আবরণের মধ্যে রয়েছে, আর আমাদের কানে রয়েছে বধিরতা, আর আমাদের মধ্যে এবং তোমাদের মধ্যে রয়েছে আড়াল। সুতরাং তুমি কাজ করে যাও, আমরাও কাজ করে যাচ্ছি। (হা-মীম সিজদাহ, ৪১ : ৫)

পাশ্চাত্য সভ্যতার এই চরমোৎকর্ষের যুগে সকল জনপদেই বিরাট একটা শ্রেণী এমন রয়েছে যাদের অতিব্যস্ত ও ভোগসর্বস্ব জীবনে ধর্মের নামে কোন স্থানই

বরাদ্দ নেই। দুনিয়ার লোভ-লালসা ও মোহগ্রস্ততা তাদের এমন সীমাহীন যে, বহু সাধ্য-সাধনার পরো একজন দা'ঈ ও আহ্বানকারী এমন কোন ছিদ্রপথও খুঁজে পান না যা দিয়ে তাদের হৃদয়ে ও মস্তিষ্কে দ্বীন, ঈমান ও আখলাকের দাওয়াত প্রবেশ করতে পারে। কেউ যদি সুরের 'সারগম' না জানে, কিংবা স্বভাব ও প্রকৃতির কাছ থেকে কাব্যরুচি ও ছন্দবোধ না পেয়ে থাকে, তার জন্য যেমন সেরা সঙ্গীত ও শ্রেষ্ঠ কবিতাও অর্থহীন, তদ্রূপ যে ব্যক্তি ধর্মেন্দ্রিয় থেকে বঞ্চিত তার ক্ষেত্রে নবীর দাওয়াত ও উপদেশ, আসমানি কিতাবের হিদায়াত ও পথনির্দেশ এবং আলিমের প্রজ্ঞাপূর্ণ বাণী ও বক্তব্য, এসবই নিছক অরণ্যে রোদন এবং নিভে যাওয়া ছাইভস্মে ফুঁক দেয়া বলে প্রমাণিত হয়। আরব জাহেলিয়াতের কবি সেই কবে বলে গেছেন, যিনি তার সম্প্রদায়কে সাহায্যের জন্য ডেকে ডেকে কোন সাড়া না পেয়ে হতাশ হয়ে পড়েছিলেন–

لقد أسمعت لو ناديت حيا ولكن لاحياة لمن تنادي

জীবজন্তুকে আওয়াজ দিলে শুনতো, কিন্তু তুমি যাকে ডাকছো, তার দেহে তো প্রাণ নেই![১]

এই শ্রেণীর লোকদের কখনো সম্বোধন করার, উপদেশ দেয়ার এবং দ্বীন ও আখলাকের দাওয়াত পেশ করার তিক্ত অভিজ্ঞতা যাদের হয়েছে তারা নীচের কোরআনি আয়াতগুলোর মর্ম ও রহস্য ঐ লোকদের তুলনায় অনেক ভালো বুঝবেন যাদের দাওয়াতি ময়দানের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা নেই, যারা শুধু তত্ত্বগত-ভাবে এর অর্থ বোঝার চেষ্টা করেছেন–

خَتَمَ اللَّهُ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ وَعَلَىٰ سَمْعِهِمْ ۖ وَعَلَىٰ أَبْصَارِهِمْ غِشَاوَةٌ ۖ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ

মোহর মেরে দিয়েছেন আল্লাহ তাদের কলবে এবং তাদের কানে, আর তাদের চোখে রয়েছে পর্দা; আর তাদের জন্য রয়েছে বিরাট আযাব (বাকারাহ, ২ : ৭)

---

১১ قاله فضالة بن شريك الصداي، كان شاعرا فتاكا صعلوكا مخضرما، أدرك الجاهلية والإسلام، وتوفي سنة أربع وستين هـ، والبيت في "الأمثال والحكم" لعلي بن محمد بن حبيب الماوردي .

أَمْ تَحْسَبُ أَنَّ أَكْثَرَهُمْ يَسْمَعُونَ أَوْ يَعْقِلُونَ ۚ إِنْ هُمْ إِلَّا كَالْأَنْعَامِ ۖ بَلْ هُمْ أَضَلُّ سَبِيلًا ﴿٤٤﴾

নাকি আপনি মনে করেন যে, তাদের অধিকাংশ শোনে বা বোঝে! (না, বরং) তারা তো পশুর মত, বরং পশুর চেয়েও ভ্রষ্ট। (আল-ফোরকান, ২৫ : ৪৪)

وَمَثَلُ الَّذِينَ كَفَرُوا كَمَثَلِ الَّذِي يَنْعِقُ بِمَا لَا يَسْمَعُ إِلَّا دُعَاءً وَنِدَاءً ۚ صُمٌّ بُكْمٌ عُمْيٌ فَهُمْ لَا يَعْقِلُونَ ﴿١٧١﴾

আর যারা কুফুরি করে তাদের উদাহরণ হলো ঐ লোকের মত যে, চিৎকার করছে এমন কিছুর পিছনে যা হাঁক-ডাক ছাড়া কিছু শুনতে পায় না। এরা বধির, বোবা ও অন্ধ; সুতরাং এরা কোন বোধ রাখে না। (বাকারাহ, ২ : ১৭১)

বস্তুত দাওয়াতের বাস্তব অভিজ্ঞতা এ জাতীয় আয়াত সম্পর্কে ঐসব প্রশ্ন ও দ্বিধা-সংশয় অন্তর থেকে স্বয়ংক্রিয়ভাবে মুছে দেয়, যা নিছক তাত্ত্বিক তাফসীরের ক্ষেত্রে দেখা দেয়।

বর্তমান যুগের আসল ব্যাধি, যা কোন ঔষধে ধরে না এবং চিকিৎসায় সারে না, তা হচ্ছে দ্বীন, ঈমান, কলব ও রূহের বিষয়ে চরম উদাসীনতা ও নির্লিপ্ততা। বস্তুত, অনাচার ও পাপাচারের ঘোর অন্ধকার যুগেও এবং চরম বিরোধিতার কঠিন গোলযোগের সময়ও দ্বীনী দাওয়াত ও ইছলাহি মেহনত অতটা প্রতিকূলতার সম্মুখীন হয়নি যতটা হচ্ছে দ্বীন ও আখলাক এবং রূহ ও রূহানিয়াতের প্রতি চরম নির্লিপ্ততার এ 'শান্তিপূর্ণ' যুগে। বে-তলব ও নির্লিপ্ত মানুষের তো কিছুতেই কিছু যায় আসে না! পানির পিপাসাই যার নেই তাকে কূপের সন্ধান বলে কী লাভ! কোরআনের ভাষায়–

إِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَىٰ وَلَا تُسْمِعُ الصُّمَّ الدُّعَاءَ إِذَا وَلَّوْا مُدْبِرِينَ ﴿٨٠﴾ وَمَا أَنْتَ بِهَادِي الْعُمْيِ عَنْ ضَلَالَتِهِمْ ۖ إِنْ تُسْمِعُ إِلَّا مَنْ يُؤْمِنُ بِآيَاتِنَا فَهُمْ مُسْلِمُونَ ﴿٨١﴾

আপনি তো ডাক শোনাতে পারবেন না মৃতদের এবং শোনাতে পারবেন না বধিরদের, যখন তারা পিঠ দেখিয়ে চলে যায়। আর আপনি তো অন্ধদের বিরত

রাখতে পারবেন না তাদের ভ্রষ্টতা হতে। আপনি তো শোনাতে পারবেন না, তবে শুধু তাদের যারা আমার আয়াতসমূহের প্রতি ঈমান আনে, অনন্তর তারা আত্মসমর্পণকারী। (আন-নাম্‌ল, ২৭ : ৮০-৮১)

পাশ্চাত্যের বড় এক বিশ্ববিদ্যালয়ের দর্শন ও মনস্তত্ত্ব বিভাগের স্বনামধন্য অধ্যাপক প্রাচীন ও আধুনিক মনমানসের এই মৌলিক ও বুনিয়াদি পার্থক্য ঠিক ঠিক বুঝতে পেরেছেন এবং সুসংক্ষিপ্ত ভাষায় তা তুলে ধরেছেন। বলতে গেলে একটিমাত্র বাক্যে তিনি পুরো একটি কিতাবের বক্তব্য ধারণ করেছেন। তিনি বলেন–

'আগে ধর্মবিষয়ে প্রশ্ন-সংশয় দেখা দিতো এবং হয়ত সন্তোষজনক উত্তর দিয়েও কাউকে কাউকে সন্তুষ্ট করা যেতো না, কিন্তু বর্তমান প্রজন্মের ধাত এই যে, কোন প্রশ্ন তাদের নাড়াই দেয় না এবং আপত্তির আকারে হলেও অন্তরে কোন কৌতূহল জাগে না।'

দ্বীনী আবেগ–অনুভূতির বিলুপ্তি

পূর্বে আমরা আলোচনা করে এসেছি যে, ইসলামী শাসন ও সভ্যতার সোনালী যুগে পৃথিবীর অবস্থা কী ছিলো এবং মুসলিম উম্মাহ তখন কী কী গুণ-বৈশিষ্ট্যের অধিকারী ছিলো?

এককথায় ব্যক্তি, পরিবার, সমাজ ও রাষ্ট্র, সর্বক্ষেত্রে মুসলিম উম্মাহর জীবন ছিলো দ্বীনমুখী ও আল্লাহ-অভিমুখী। মানুষের মধ্যে দ্বীনের তলব-তালাশ ও ধর্মীয় প্রেরণা-উদ্দীপনা ছিলো ব্যাপক। কিন্তু ইতিহাসের অমোঘ সত্য এই যে, যে কোন উত্থানের জন্যই রয়েছে পতন, আর জীবনের সর্বক্ষেত্রে পতনের উপকরণগুলো সবার অলক্ষ্যেই যেন দানা বাঁধতে শুরু করে এবং একসময় শিকড় এত গভীরে চলে যায় যে, তা নির্মূল করা এবং জীবনের গতিকে সঠিক খাতে ফিরিয়ে আনা আর সম্ভব হয় না।

ইতিহাসের এ অমোঘ বিধান থেকে মুসলিম উম্মাহও মুক্ত ছিলো না। পতনের ধারা সেখানেও শুরু হয়ে গিয়েছিলো এবং অধঃপতনের সমস্ত উপকরণ ধীরে ধীরে ছড়িয়ে পড়েছিলো। কিন্তু ওলামায়ে উম্মত, যাদের দায়িত্বই হলো উম্মাহর দ্বীনী তত্ত্বাবধান, আল্লাহ তাঁদের দান করেছেন পর্বতের অবিচলতা এবং সিংহের সাহস, উম্মাহর পতন ও অধঃপতনের যুগেও তাঁরা তাঁদের দায়িত্ব পালন করে গিয়েছেন। শেষ যুগে যখন ভোগবাদ ও বস্তুবাদের সাগর-জোয়ারে মুসলিমবিশ্ব

ভেসে গিয়েছিলো তখন ওলামায়ে উম্মত সেই ঝড়বিক্ষুব্ধ সমুদ্রে ছোট ছোট দ্বীপ-উপদ্বীপ তৈরী করেছিলেন, যেন দ্বীনের অনুসারীরা যেখানে আশ্রয় নিতে এবং ঈমান ও বিশ্বাসের শেষ সম্বলটুকু রক্ষা করতে পারে।

দ্বীনের ধারক, বাহক ও রক্ষক এই মহান ব্যক্তিগণ যেন অন্ধকার সমুদ্রে আলোর মিনার ছিলেন। মানুষকে তারা জড়বাদ ও বস্তুবাদের ঘূর্ণাবর্ত থেকে উদ্ধার করে আনতেন এবং দ্বীনী তারবিয়াত ও আধ্যাত্মিক সংশোধন দ্বারা তাদের ঝড়-তুফানের মুকাবেলা করে জীবনের লক্ষ্যে এগিয়ে চলার যোগ্যরূপে গড়ে তুলতেন। পরবর্তী যুগে তাঁরাই ছুফিয়া ও মাশায়েখ নামে অভিহিত হয়েছেন।

বলা যায়, শেষ শতাব্দীগুলোতে এই মহান আধ্যাত্মিক ব্যক্তিগণই ছিলেন মুসলিম সমাজের ধার্মিকতা ও ধর্মানুরাগ পরিমাপের মোটামুটি মানদণ্ড। অর্থাৎ তাঁদের প্রতি সাধারণ মুসলিমের ভক্তি-মুহব্বতের গভীরতা থেকেই আমরা ধারণা করতে পারি, তখন মানুষ বস্তুবাদিতা ও দুনিয়ামুখিতা হতে কতটা দূরে ছিলো এবং তাদের অন্তরে দ্বীনের তলব ও তড়প কেমন ছিলো।

মুসলিমবিশ্বের সমস্ত কেন্দ্রীয় শহর ও জনপদে এমন কিছু নূরানী ব্যক্তিত্বের উপস্থিতি ছিলো যারা ভোগবাদিতা ও বস্তুবাদিতার 'অন্ধকার সমুদ্রে' সত্যি সত্যি ছিলে আলোর মিনার। সেই আধ্যাত্মিক আলোর আকর্ষণে চারদিক থেকে মানুষ পতঙ্গের মত এসে ঝাঁপিয়ে পড়তো। দুনিয়ার দূরদারায এলাকা থেকে বিভিন্ন ভাষা বর্ণ ও গোত্রের মনুষ তাঁদের খানকায় জড়ো হতো।[1] বলা যায়, সেগুলো

[1] দুনিয়ার প্রবল প্রতাপশালী বাদশাহ ও তার বাদশাহির সমান্তরালে এই খানকাহগুলো ছিলো এমন রূহানি বাদশাহির নমুনা যার প্রতাপ ছিলো দুনিয়ার বাদশাহির চেয়ে অনেক উর্ধ্বে। দুনিয়ার সাম্রাজ্যের ব্যবস্থাপনার মত তাঁদেরও ছিলো স্বতন্ত্র ব্যবস্থাপনা। সেখানেও হতো নিয়মিত নিয়োগ-বদলি ও স্থলবর্তিতা। প্রতিটি পার্থিব রাজত্বে তাঁদেরও থাকতো 'দূত ও রাষ্ট্রদূত'। যেন সমগ্র মুসলিম জাহানের মানচিত্র তাঁদের সামনে থাকতো। যখনই ইসলামী জাহানের কোন অঞ্চল 'খালি' হতো, সেখানে আরেকজন দ্বীনী প্রশাসক নিয়োগ লাভ করতেন যিনি ঐ অঞ্চলকে গাফলাত ও নাফরমানির বিস্তার থেকে এবং মূর্খতা ও অধর্মের কবল থেকে রক্ষা করতেন। এখানে শুধু একটি নমুনা উল্লেখ করা হচ্ছে। মহান শায়খ সাইয়েদ আবুল হাসান আলী আল হোজায়রী রহ, যিনি লাহোরে সমাধিস্থ হয়েছেন, বলেন, আমার শায়খ আমাকে লাহোরে গমন করে সেখানে বসবাস করার আদেশ করেন। আমি ওযর পেশ করে বললাম, সেখানে তো আমার 'সাথী' হোসায়ন যানজানী রয়েছেন। শায়খ বললেন, তোমাকে যেতেই হবে। তখন শায়খের আদেশ পালনার্থে আমি রওয়ানা হলাম এবং গভীর রাতে লাহোরে উপনীত হলাম। শহরের দরজা তখন বন্ধ হয়ে গিয়েছে। তাই নগরপ্রাচীরের বাইরেই রাত অতিবাহিত করলাম। ভোরে যখন শহরের দরজা খোলা হলো তখন দেখি, মানুষ হোসায়ন যানজানির জানাযা নিয়ে বের হচ্ছে। তখন শায়খের আদেশের রহস্য বুঝতে পারলাম। তারপর আমি তার স্থলবর্তী হয়ে দাওয়াত ইলাল্লাহর কাজ অব্যাহত রাখলাম। (কাশফুল মাহজুব)

ছিলো মুসলিম উম্মাহর আন্তর্জাতিক বসতি, যেখানে পূর্ব-পশ্চিম ও উত্তর-দক্ষিণ সব এলাকার সবগোত্রের মুসলমানদের উপস্থিতি ছিলো। আজকের পরিভাষায় বলা যায়, সুবিস্তৃত মুসলিম জাহান যেন নিজেকে গুটিয়ে এখানে মেলে ধরেছিলো; এটা ছিলো 'মিনি মুসলিম জাহান'।

আমাদের উপমহাদেশ মুসলিম জাহানের এক প্রান্তে অবস্থিত। কিন্তু এ ভূখণ্ড সবসময় ছিলো দ্বীনী তলব ও ধর্মীয় চেতনা এবং রূহানিয়াত ও আধ্যাত্মিকতার গুরুত্বপূর্ণ কেন্দ্র। এখানে প্রত্যেক যুগে মুসলিম শাসকদের রাজত্বের পাশাপাশি রূহানিয়াতেরও বহু স্বাধীন কেন্দ্র প্রতিষ্ঠিত ছিলো, যেখানে হাজার হাজার মানুষ সমকালের বস্তুগত লোভ-লালসা ও প্ররোচনা উপেক্ষা করে এবং রাজা ও রাজনীতির উত্থান-পতন থেকে নির্লিপ্ত হয়ে আধ্যাত্মিক উন্নতি ও রূহানি তরক্কির সাধনা ও মুজাহাদায় নিমগ্ন থাকতেন।

হযরত নিযামুদ্দীন আউলিয়া (রহ.)-এর আধ্যাত্মিক কেন্দ্র ও রূহানি মারকায গিয়াছপুর হচ্ছে এর উত্তম উদাহরণ, যা মুসলিম ভারতের শাসনকেন্দ্র স্বয়ং দিল্লীতে অবস্থিত ছিলো। এই স্বাধীন আধ্যাত্মিক কেন্দ্র (গিয়াছুদ্দীন বলবন থেকে গিয়াছুদ্দীন তুগলক পর্যন্ত) একে একে আটজন প্রতাপশালী মুসলিম শাসকের শাসনকাল প্রত্যক্ষ করেছে এবং প্রায় সুদীর্ঘ অর্ধশতাব্দীকাল নিজের স্বাধীনতা, স্বকীয়তা ও নির্মুখাপেক্ষিতা পূর্ণমাত্রায় বজায় রেখেছিলো।[1] ইরানের 'সনজর' থেকে পূর্বভারতের 'ঔধ' পর্যন্ত সমস্ত অঞ্চলের আধ্যাত্মিকতা ও রূহানিয়াতের পিপাসু মানুষ দলে দলে এখানে এসে পড়ে থাকতো।

যদি তরীকতের সমস্ত সিলসিলার ছুফিয়া-মাশায়েখের খানকাহগুলোর আবাদি এবং জনসমাগমের বিশদ বিবরণ লেখা হয় (যা দ্বারা সে যুগের মানুষের ধর্মপ্রেম, আল্লাহমুখিতা ও দ্বীনী তলবের পরিমাণ পরিমাপ করা যায়) তাহলে এ সংক্ষিপ্ত কলেবরে তার সঙ্কুলান হবে না। তাই নমুনাস্বরূপ শুধু একটি সিলসিলার কয়েক-জন বুযুর্গানের সঙ্গে সমকালের সাধারণ মানুষের ভক্তি-মুহব্বতের সম্পর্কের চিত্র তুলে ধরছি। তাতে কিছুটা হলেও অনুমান করা যাবে যে, তাঁদের যুগে, যা ছিলো

[1] হযরত নিযামুদ্দীন রহ, গিয়াছুদ্দীন বলবন-এর রাজত্বকালে ৬৬৯ হিজরীতে দিল্লী আগমন করেছিলেন। কিছুদিন বিভিন্ন মহল্লায় অবস্থান করে অবশেষে বস্তি গিয়াছপুর (বর্তমানে বস্তি নিযামুদ্দীন) এ স্থায়ীভাবে বসবাস শুরু করেন। ৭২৫ হিজরী পর্যন্ত বিভিন্ন সুলতান তাঁর সঙ্গে শুধু সাক্ষাতের চেষ্টা করেছেন, কিন্তু কেউ সফল হননি। প্রায় ষাট বছর পর্যন্ত তিনি এবং তাঁর খানকার অধিবাসীরা সম্পূর্ণ একা ও একান্ত জীবন যাপন করেছেন।

ভোগবাদিতা ও দুনিয়ামুখিতার চরম যুগ, তখনো মানুষের ধর্মপ্রেম ও আল্লাহ-মুখিতার কী বিস্ময়কর অবস্থা ছিলো এবং রূহানিয়াত ও আধ্যাত্মিকতার অনন্ত পিপাসা মানুষকে কাঁহা কাঁহা মুলুক থেকে চুম্বক-আকর্ষণের মত এখানে টেনে আনতো।

এসকল রূহানি মারকায ও আধ্যাত্মিক কেন্দ্রে যারা বাস করতেন, তাঁরা ছিলেন দুনিয়ার ফকীর। তাঁদের যিন্দেগি ছিলো আগাগোড়া ফকিরি যিন্দেগি। কিন্তু সমাজের বুকে এবং মানুষের অন্তরে এমনই ছিলো তাঁদের প্রতি ভক্তি-শ্রদ্ধা ও সম্মান-সমীহ যে, দুনিয়ার সবচে' বড় বাদশাহ পর্যন্ত ঈর্ষা অনুভব করতেন এবং অনেক সময় এটা হয়ে যেতো দুনিয়ার ফকীর ও দুনিয়ার বাদশাহ-এর মধ্যে দূরত্ববোধের কারণ।

শায়খ আহমদ সারহিন্দী, মুজাদ্দিদে আলফেছানি (রহ. মৃ. ১০৩৪ হি.)-এর 'সম্পর্কী' যারা তাদের তালিকা দেখুন, তাহলেই বুঝতে পারবেন, হিন্দুস্তান ও আফগানিস্তানের কত শহর-জনপদের কত বিপুল সংখ্যক মানুষ এবং জাহাঙ্গীর-যুগের কত বড় বড় আমীর-ওমরা ও রাজপুরুষ তাঁর বাই'আতের সিলসিলায় দাখিল ছিলো এবং কত দূর-সুদূর এলাকা থেকে মানুষ তাঁর রূহানি ফায়য ও ফায়যান হাছিল করার জন্য ছুটে আসতো।

তাঁর বিশিষ্ট খলিফা হযরত সাইয়েদ আদম বিন্নূরী (রহ. মৃ. ১০৫৩ হি.)-এর খানকাহ'র দস্তরখানে দৈনিক মেহমান ছিলো একহাজার। শত সহস্র ভক্ত-অনুরাগী আলিম-ওলামা তাঁর সওয়ারির অনুগামী হতেন। *'তাযকিরায়ে আদামিয়া'* কিতাবে আছে, ১০৫২ হিজরীতে, মৃত্যুর একবছর আগে তিনি লাহোরে তাশরীফ আনেন। তখন 'সাদাত'[১] ওলামা-মাশায়েখ ও অন্যান্য শ্রেণীর দশহাজার মানুষ তাঁর সফরসঙ্গী ছিলো। তালিবীন ও শিষ্যদের এত বিরাট মজমা তাঁকে ঘিরে থাকতো যে, শাহজাহানের মত সম্রাটও শঙ্কিত হয়ে পড়েন এবং তাঁর খিদমতে এই পায়গামসহ কিছু আশরাফী হাদিয়া পাঠান যে, এখন তো আপনার উপর হজ্ব ফরয হয়ে গেছে। সুতরাং আপনি হারামাইনের 'ইচ্ছে' করুন।

শায়খ সম্রাটের 'ইশারা' বুঝলেন। দুনিয়ার হুকুমত ও শাহানশাহির লোভ তো তাঁর ছিলোই না। তিনি তখনি হারামাইনে হিজরত করলেন। মদীনা শরীফে তাঁর

[১] বড় বড় সৈয়দ খান্দান আজমের অঞ্চলে, বিশেষ করে ভারত, ইরান ও আফগানিস্তানে সাদাত নামে পরিচিত। —অনুবাদক

ইনতিকাল হলো এবং জান্নাতুল বাকীতে দাফন হলো।

হযরত মুজাদ্দিদে আলফে ছানি রহ.-এর সুযোগ্য পুত্র ও খলীফা হযরত খাজা মা'ছুম বিল্লাহ (মৃ. ১০৭৯ হি.)-এর হাতে ৯০০০০০ মানুষ তাওবা করে বাই'আত হয়েছেন। সংখ্যাটি আপনি ঠিকই পড়েছেন, নয় লাখ! আর যারা মানুষের নৈতিক ও আত্মিক সংশোধন এবং দ্বীনী তারবিয়াত-বিষয়ে তাঁর পক্ষ হতে খিলাফাতের সনদ-সৌভাগ্য লাভ করেছেন তাঁদের সংখ্যা ছিলো সাত হাজার।

তাঁর ছাহেবযাদা শায়খ সাইফুদ্দীন সারহিন্দি (রহ. মৃ. ১০৯৬ হি.)-এর দিল্লীর খানকায় 'তালিবীনসমাগম' কেমন ছিলো, তা কিছুটা অনুমান করা যায় 'যায়লুর-রাশাহাত' কিতাবের এই তথ্য থেকে যে, একহাজার চারশ মানুষ দু'বেলা তাঁর দস্তরখানে শরীক হতো, আর খাবার তৈরী হতো মেহমানের পছন্দ ও ফরমায়েশ অনুযায়ী।

আওলিয়া-মাশায়েখদের সঙ্গে সমাজের বিত্তশালী ও অভিজাত শ্রেণী এবং আমীর-ওমরাদের যে গভীর সম্পর্ক ছিলো এবং যার ভিত্তি ছিলো শুধু দ্বীনী মুহব্বত ও ভক্তি-শ্রদ্ধা, তার একটি নমুনা দেখুন। হযরত খাজা মুহম্মদ সারহিন্দী যখন বাসস্থান থেকে মসজিদে গমন করতেন, তারা রাস্তায় দাঁড়িয়ে শাল-রুমাল বিছিয়ে দিতেন, যেন কদম মাটিতে না পড়ে। রোগীর তত্ত্ব নিতে, বা অন্যকোন প্রয়োজনে কোথাও গেলে তাঁর সওয়ারি বের হতো শাহী শান ও জালালের সঙ্গে। আমীর-ওমরাদের পাল্কী ও সওয়ারি হতো তাঁর অনুগামী।[১]

ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির বাণিজ্য-যুগে ধীরে ধীরে যখন মুসলিম হুকুমতের তখত উল্টে গেলো, তার কিছুকাল আগ পর্যন্তও মুসলিম সমাজের সর্বস্তরে এই দ্বীনী তলব, যওক-শওক এবং ধর্মানুরাগ ও আল্লাহমুখিতা পূর্ণমাত্রায় বিদ্যমান ছিলো। হযরত মিরযা মাযহার জানেজানাঁ রহ.-এর খলীফা হযরত শাহ গোলাম আলী রহ. (মৃত. ১২৪০ হি.)-এর যুগে দিল্লীর মুজাদ্দিদী খানকাহ ছিলো তালিবীনের বিরাট সমাগমকেন্দ্র। 'আছারুছ-ছানাদীদ' কিতাবে আলীগড়ের স্যার সৈয়দ আহমদ খান লিখেছেন—

'হযরতের খানকাহে আমি নিজের চোখে দেখেছি, রোম, শাম, বাগদাদ, মিশর, চীন ও হাবাশা থেকে আগত লোকেরা বাই'আত হচ্ছেন এবং পরম সৌভাগ্য

[১] দারুল মা'আরিফ (ফারসি ভাষায় লিখিত)।

মনে করে খানকাহ'র খিদমত করছেন। আর নিকটবর্তী জনপদ, হিন্দুস্তান, পান্জাব ও আফগানিস্তানের কথা তো বলাই বাহুল্য। যেন পতঙ্গদল ছেয়ে থাকতো। খানকাহের নিয়মিত বাসিন্দা, যারা দুনিয়া ত্যাগ করে আসতেন তাদের সংখ্যা পাঁচশ'র কম কখনো হতো না। তাদের সবার রুটি-কাপড় ছিলো হযরতের যিম্মায়।'

২৮শে জুমাদাল উলা ১২৩১ হি. শুধু এই একটি তারিখে তাঁর ফায়য হাছিল করার জন্য যত শহর-জনপদ থেকে তালিবীনের সমাগম হয়েছিলো তার তালিকা দেখুন–

'সমরকন্দ, বোখারা, গযনি, তাশকন্দ, হিছার, কান্দাহার, কাবুল, পেশোয়ার, কাশ্মীর, মুলতান, লাহোর, সিন্ধু, আমরোহ, সম্ভল, রামপুর, বেরেলী, লৌখনো, ঝাঁসি, বাহরাইচ, গোরখাপুর, আযীমাবাদ, ঢাকা, হায়দরাবাদ, পুনা, ইত্যাদি।'

এটা তখনকার কথা যখন আধুনিক যোগাযোগব্যবস্থা বলতে কিছুই ছিলো না। পদব্রজই ছিলো প্রায় একমাত্র উপায়।

ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির যুগে ইংরেজ রাজত্ব পাকা-পোক্ত হওয়ার কিছু আগে হযরত সাইয়েদ আহমদ শহীদ ও তাঁর 'জাঁনেছার'[১] মুবাল্লিগগণ দিকভ্রান্ত মুসলিম মিল্লাতকে 'ডাক' দিয়েছিলেন এবং 'ধাবিত হও আল্লাহর দিকে'-এর আওয়ায বুলন্দ করেছিলেন।

বস্তুত সেটা ছিলো মুসলিম সমাজে শিকড় গেড়ে বসা গাফলাত, নাফরমানি ও শরীয়ত-বিমুখ জীবনাচারের বিরুদ্ধে আপোসহীন জিহাদ ও মুজাহাদার সূচনা। মুসলিমগণ তখন যে আবেগ-উদ্দীপনা ও জোশ-জাযবার সঙ্গে লাব্বাইক বলে সাড়া দিয়েছিলো, যেমন পতঙ্গের মত তাঁর কাফেলায় ছুটে এসেছিলো, প্রতিটি জনপদ তাঁর প্রেরিতদের যে ত্যাগ ও বদান্যতা, যে ভক্তি ও বিনয়নম্রতার সঙ্গে গ্রহণ করেছিলে, 'গুলিস্তানে হিন্দ'-এর সেরা ফুলগুলো যেভাবে তাঁর গলার হার হয়েছিলো, তারপর বালাকোটের ময়দানে ধূলিলুণ্ঠিত হয়েছিলো, তা থেকে সহজেই বোঝা যায়, অধঃপতনের ঐযুগেও মুসলিমসমাজে কী সাহস ও মনোবল ছিলো, কী বিপুল উদ্যম ও কর্মশক্তি ছিলো, কী জোশে জিহাদ ও শাওকে শাহাদাত ছিলো এবং আত্মসংশোধন ও মুজাহাদার কী তলব ও তড়প ছিলো।

[১] প্রাণ উৎসর্গকারী

তখনকার মুসলিমদের দ্বীনী হালাত সম্পর্কে আরো কিছু ধারণা পেতে হলে আপনি ঐসমস্ত দাওয়াতি সফরের বিবরণ পড়ুন, যা সৈয়দ ছাহিব প্রথমে গঙ্গা-যমুনার মধ্যবর্তী অঞ্চলের শহর-জনপদে এবং পরে অযোধ্যায় করেছেন। আরো স্পষ্ট ও জীবন্ত ধারণা আপনি পাবেন সৈয়দ ছাহিবের ১২৩৬ হিজরীর হজ্জ-সফরের রোয়েদাদ থেকে। এই দীর্ঘ সফরে তিনি পূর্বভারতের ঐ বিশাল এলাকা অতিক্রম করেছেন যা এখন যুক্ত প্রদেশ, বিহার ও বাংলা, এই তিনটি প্রদেশে বিভক্ত। সাড়ে সাতশ' মানুষের বিরাট কাফেলা সৈয়দ ছাহিবের প্রিয় জন্মভূমি রায়বেরেলী থেকে রওয়ানা হয়ে সুদূর কলকাতায় গিয়ে পানির জাহাযে উঠেছিলো।

কাফেলার পুরো যাত্রাপথে ছিলো অভূতপূর্ব সাজসাজ ও আলোড়ন। সর্বত্র একই 'মানযার', একই দৃশ্য; দ্বীনের তলবে বে-কারার মানুষ পতঙ্গের মত ছুটে আসছে। গাফলতে ও নাফরমানির যিন্দেগি থেকে তওবা করছে; দ্বীনের উপর অবিচলতা এবং শরী'আতের প্রতি আনুগত্যের বিষয়ে আল্লাহর নামে নতুন প্রতিজ্ঞা করছে। গ্রাম-জনপদ থেকেও দলে দলে মানুষ হাযির হয়ে বাই'আত গ্রহণ করছে। উপচে পড়া ভক্তি-মুহব্বতের সঙ্গে তারা তাঁকে নিজ নিজ এলাকায় নিয়ে যাচ্ছে। মধ্যবিত্ত, কিন্তু উদারচিত্ত মুসলিমগণ মনভরে কয়েক দিন পর্যন্ত পুরো কাফেলার, এমনকি নিকটবর্তী এলাকা থেকে আসা বিপুলসংখ্যক মানুষেরও মেহমানদারি করছে। অবস্থা এমন ছিলো যে, মেযবানির জন্য লটারী করতে হয়েছে। যারা বিত্তশালী তারা রাজোচিত বদান্যতার সঙ্গে দ্বীনের পথে সম্পদ লুটিয়েছেন। এলাহাবাদের শেখ গোলাম আলী পনের দিনে সে যুগের বিশহাজার টাকা ব্যয় করেছেন।[১]

সাধারণ থেকে সাধারণ মানুষের মধ্যেও ইছলাহ ও সংশোধনের এমন স্বতঃস্ফূর্ত চেতনা ছিলো যে, কোন জনপদে এমন লোক কমই ছিলো যে সৈয়দ ছাহিবের হাতে তওবা করে বাই'আত হয়নি। এলাহাবাদ, মির্যাপুর, বেনারশ, গাযীপুর, আযীমাবাদ, পাটনা ও কলকাতায় কয়েক লাখ মুসলমান তাঁর হাতে বাই'আত ও তওবা গ্রহণ করেছে। সবচে' চমকপ্রদ ঘটনা হলো, বেনারশ হাসপাতাল থেকে রোগীদের বার্তা এসেছিলো যে, আমাদের তো নড়াচড়ার শক্তি নেই। আপনি যদি একটিবার অনুগ্রহ করতেন, আমরা আপনার হাতে তওবা ও বাই'আত নিয়ে

[১] মাখযানে আহমাদী, ফারসি ভাষায় লিখিত, মওলভী মুহম্মদ আলী রহ. (মৃত ১২৬৬ হি.)-রচিত।

ধন্য হতাম। সৈয়দ ছাহিব খুশিমনে তাদের আবদার কবুল করেছিলেন, আর রোগীরা কৃতজ্ঞচিত্তে তাঁর হাতে বাই'আত হয়েছিলো।[১]

কলকাতায় তিনি দু'মাস অবস্থান করেছেন। তখন দৈনিক একহাজারের বেশী নারী-পুরুষ বাই'আত হতো। সমাগমবৃদ্ধির অবস্থা এমন ছিলো যে, ভোর থেকে মধ্যরাত পর্যন্ত বাই'আতের সিলসিলা জারি থাকতো। সৈয়দ ছাহিবের সামান্য বিশ্রাম গ্রহণেরও অবকাশ ছিলো না। জনে জনে বাই'আত তো সম্ভবই ছিলো না। মানুষ উন্মুক্ত স্থানে একত্র হতো। আট-দশটি পাগড়ি খুলে দেয়া হতো। মানুষ পাগড়ি ধরে রাখতো। তিনি উচ্চ স্বরে বাই'আতের শব্দ উচ্চারণ করতেন, আর লোকেরা তা অনুসরণ করতো। এভাবে প্রতিদিন সতেরো আঠারো বার বাই'আতের মজলিস হতো[২]

সৈয়দ ছাহিব পনের বিশদিন বাদফজর ওয়ায করেছেন। সাধারণ মানুষ তো ছিলো বেশুমার; ওলামা-মাশায়েখও নেতৃস্থানীয় লোকদেরই উপস্থিতি হতো দু'হাজারের উপরে। তাঁর সফরসঙ্গী মাওলানা আব্দুল হাই ছাহেবের ওয়ায হতো প্রতি জুমু'আ ও মঙ্গলবার দুপুর থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত। মজমায় তিলধারণেরও স্থান থাকতো না। প্রতিদিন দশপনেরজন অমুসলিম তাঁর হাতে ইসলাম গ্রহণ করতো। ইছলাহ ও সংশোধন, তওবা ও আত্মশুদ্ধি এবং ব্যাপক আখেরাতমুখিতার এমনই সুফল দেখা দিলো যে, ইংরেজশাসনের কেন্দ্রস্থান কলকাতায় মদের ব্যবসায় ধ্বস নামলো। শরাবখানার জলসা-জৌলুস শেষ হয়ে গেলো, আর কারবারীরা বাজারমন্দা বলে সরকারকে রাজস্ব দিতে অক্ষমতা প্রকাশ করলো।[৩]

হজ্ব-ফেরত কাফেলা যখন রায়বেরেলীর উদ্দেশ্যে কলকাতা থেকে রওয়ানা হলো তখন পথে পথে আরো অভূতপূর্ব দৃশ্যের অবতারণা হলো। মুরশিদাবাদে দেওয়ান গোলাম মুরতযা এমন শানদার মেহমানদারি করলেন যা এখন কল্পনা করাও সম্ভব নয়। তিনি বাজারে ঘোষণা দিলেন, 'কাফেলার যিনি যে দোকান থেকে যা কিছু খরিদ করবেন তার মূল্য আমি পরিশোধ করবো।'

সৈয়দ ছাহিব আপত্তি করলেন যে, নিজের উপর কেন এত অতিরিক্ত ভার বহন করছেন! গোলাম মুরতযা তখন অশ্রুরুদ্ধ কণ্ঠে বললেন, হযরত, কোন মুসলিম-

---

[১] ঐ

[২] ওয়াকাইয়ে আহমাদী (কলমি নোসখা)

[৩] ঐ

ঘরে একজন হাজীর আগমনকে সৌভাগ্যের মনে করা হয়। অথচ আমার গরীব-খানায় আপনার মত হাজী তশরীফ এনেছেন এবং সঙ্গে আছে এত হাজিয়ান! আমি আমার কিসমতের উপর যত নায-ফখর করি, হাজীদের জন্য যত খরচ করি, কমই হবে তা।[১]

সৈয়দ ছাহিব যখন জিহাদের ডাক দিলেন তখন সর্বস্তরের মুসলিমগণ বিপুল উদ্দীপনায় তাতে সাড়া দিলো। কৃষক লাঙ্গল ছুঁড়ে, দোকানী দোকান ছেড়ে, চাকুরিজীবী চাকুরি ত্যাগ করে, ওলামা-মাশায়েখ মাদরাসা-খানকাহ থেকে বের হয়ে জিহাদি কাফেলায় শামিল হলেন এবং এমনভাবে স্বজন-স্বদেশ ত্যাগ করলেন যে, আর পিছনে ফিরে তাকাননি। অবশেষে এই জানবায মুজাহিদীনের আখেরি জামাত দুই পাহাড়ের মধ্যবর্তী বালাকোটের দুর্গম পাথুরে উপত্যকায় দশগুণ শক্তির দুশমনের মোকাবেলায় লড়াই করে শহীদ হলেন। এমনকি শাহাদাতের সময়ও তাদের মনে পড়েনি বাড়ীঘর ও আপনজনের কথা; মনে পড়েছে শুধু জান্নাতে পাখী হয়ে উড়ে বেড়ানোর খোশখবরির কথা। আহলে দিল যারা, আজো বালাকোটের প্রান্তরে তারা শোহাদায়ে মিল্লাতের শহীদী খুনের ঘ্রাণ পান।

এসব ঘটনা এমন সময় ঘটেছিলো যখন হিন্দুস্তানে ইসলামী সভ্যতা ও মুসলিম-শাসন ছিলো মুমূর্ষু অবস্থায়। বিশাল মুসলিম সাম্রাজ্যের দিকে দিকে একে একে বাতিগুলো যখন নিভছে, আর হতাশার ঘোর আঁধার এমনভাবে ঘিরে ধরছে যে, মুক্তির কোন উপায় দেখা যায় না। বলাবাহুল্য যে, এটা সম্ভব হয়েছে শুধু সেই দ্বীনী গায়রাত ও জাযবা, জোশে জিহাদ ও শাওকে শাহাদাত, দুনিয়ার প্রতি নিরাসক্তি, আল্লাহর রাস্তায় কোরবান করার আকুতি এবং সেই আখেরাত-মুখিতা ও আল্লাহ-অভিমুখিতার গুণে যার ছিটেফোঁটা তখনও মুসলিম-সমাজে বাকি ছিলো।

ইংরেজ রাজত্বের প্রথম দিকেও অবস্থা এই ছিলো যে, পাশ্চাত্যের শিক্ষা-সভ্যতা, নীতি-নৈতিকতা ও শাসন-শোষণের দুষ্ট প্রভাব হিন্দুস্তানের সাধারণ জীবনে তখনো তেমন করে দেখা দেয়নি, বরং পূর্ববর্তী যুগের ছাপ ও প্রভাব তখনো বিদ্যমান ছিলো, যদিও তার ঊর্ধ্বশ্বাস শুরু হয়ে গিয়েছিলো। তাই হযরত

---

[১] منظورة السعداء للسيد جعفر علي النقوي

মাওলানা ফযলুর-রহমান গাঞ্জেমুরাদাবাদীর মত বুযুর্গ (রহ. ১২১৩-১৩০৮ হি.) যিনি উভয় যুগের অবস্থা দেখেছেন, তখনকার দ্বীনী বরবাদির উপর 'অশ্রুপাত' করে বলতেন–

'যাদের হাতে ছিলো হৃদয়-ব্যাধির আরোগ্য, তারা হায়, আজ সাজিয়ে বসেছে পণ্যের পসরা।'

তবে যদিও হেমন্তের বাতাস বইতে শুরু করেছিলো, তবু সবুজ পাতা সব তখনো ঝরে পড়েনি এবং বৃক্ষ একেবারে শুকিয়ে যায়নি। ডালে কিছু রস এবং পাতায় সবুজের কিছুটা আভাস তখনো ছিলো, কিংবা বলুন, বসন্ত বিদায় হলেও তার রেশ তখনো ছিলো এবং বাগানে ছিলো একটা দু'টো ফুল। আল্লাহকে পাওয়ার ব্যাকুলতা তখনো ছিলো। ইছলাহ ও সংশোধন এবং আধ্যাত্মিক সাধনা ও রূহানিয়াতের মেহনত-মুজাহাদা তখনো যিন্দেগির জরুরি বিষয় ছিলো। আহলে ইলম ও আহলে দ্বীন তো বটেই, দুনিয়ার কারবারী লোকেরাও এ চিন্তা-ব্যাকুলতা থেকে বঞ্চিত ছিলো না। তদ্রূপ বড় বড় শহর-জনপদ তো বটেই, ছোট ছোট গ্রাম-বস্তিও আল্লাহ-প্রেমিকদের দ্বারা আবাদ ছিলো। আল্লাহর মা'রিফাত ও পরিচয় শিক্ষা দেয়ার এবং আল্লাহর পথে আহ্বান করার মত সাধকপুরুষ সর্বত্র এত প্রচুর ছিলেন যে, সম্ভবত কোন স্থান ও কালই তাদের নূরানিয়াত থেকে মাহরূম ছিলো না।

আজ থেকে অর্ধশতক আগেও বিশাল ভারতের এ প্রান্ত থেকে ও প্রান্ত পর্যন্ত ছিলো প্রদীপ, আর প্রদীপ; শুধু আলোর প্রদীপ! কিন্তু সারা রাত জ্বলতে জ্বলতে শেষরাতে এই প্রদীপগুলো একে একে নিভতে শুরু করেছিলো। প্রদীপ থেকে প্রদীপের আলোগ্রহণ তো আগেই বন্ধ হয়ে গিয়েছিলো। কিছু প্রদীপ যে নিভু নিভু জ্বলছিলো তাও নিভে গেলো। অন্ধকারের সামনে সামান্য আলোর যে দুর্বল প্রতিরোধ ছিলো তাও শেষ হয়ে গেলো। চারদিকে এখন শুধু অন্ধকার, ঘোর অন্ধকার।

শীতের মরা গাছে ঝাঁকুনির কী প্রয়োজন! শুকনো পাতা তো এমনিতেই ঝরে যায়! তাই বৃটিশরাজের পক্ষ হতে এমন ঘোষণা কখনো আসেনি যে, মাদরাসা-খানকাহ বন্ধ করো। ইলমের শিক্ষা ও আধ্যাত্মিক দীক্ষার যে ধারা চলে আসছে তার পাতা উল্টে দাও। না, বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদ তা করেনি। যা যেমন ছিলো

তেমনি রেখে দিয়েছিলো। দ্বীনী কেন্দ্রগুলোর জন্য অবস্থা বরং আগের তুলনায় অনুকূল ছিলো। কারণ আধুনিক যোগাযোগব্যবস্থা গড়ে উঠেছিলো এবং দূর-দূরান্তের সফর অনেক সহজ হয়ে গিয়েছিলো। কিন্তু হৃদয়ের উত্তাপ ও দিলের তড়প যদি শেষ হয়ে যায়! সেই শাওক ও জাযবাই যদি না থাকে যা তালিবীনকে বুখারা-সমরকন্দ থেকে পথের কষ্ট ও ক্ষুধা-অনাহার সহ্য করে চলে আসতে উদ্বুদ্ধ করতো!

বৃটিশরাজ এত নির্বোধ ছিলো না যে, গাছের গোড়ায় কুড়াল চালাবে এবং বাগানে আগুন লাগাবে। তারা শুধু এটা নিশ্চিত করেছে যে, গাছের গোড়ায় যেন পানি না থাকে। বুড়ো মালী বাগানের যত্ন ও পরিচর্যা যেন করতে না পারে। অর্থাৎ অন্ধকার ছড়িয়ে দেয়ার জন্য তারা শুধু নতুন শিক্ষার 'আলো' জ্বেলে দিয়েছিলো। বস্তুত ধর্মহীন শিক্ষাব্যবস্থাই ছিলো হিন্দুস্তানে মুসলিম-সমাজের বিরুদ্ধে বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদের সেই অদৃশ্য হানাদার বাহিনী যা 'কতল-কিতাল' ও খুনখারাবি ছাড়াই ময়দান জিতে নিয়েছিলো এবং তাদেরকে কাঙ্ক্ষিত ফল এনে দিয়েছিলো।

এই বৃটিশশিক্ষা ভারতবর্ষের মুসলিম-সমাজে, বলতে গেলে প্রায় অজ্ঞাতসারেই জীবনব্যবস্থা ও চিন্তাধারা আমূল পাল্টে দিয়েছিলো। দ্বীনী চেতনা ও ধর্মীয় প্রেরণা ধীরে ধীরে দুর্বল হয়ে পড়েছিলো। দিলের 'অঙ্গার' ও হৃদয়ের অগ্নিস্ফুলিঙ্গ ছাইভস্মের নীচে চাপা পড়ে গিয়েছিলো। রূহানিয়াতের শামা' ও আধ্যাত্মিকতার দীপশিখা নিভে গিয়েছিলো। উদ্যম-উদ্দীপনা ও প্রতিযোগিতার স্বভাবপ্রবণতা, যা জীবনের যে কোন অঙ্গনের গতি ও অগ্রগতির মূল শক্তি, তা দ্বীন ও রূহানিয়াত এবং ধর্ম ও আধ্যাত্মিকতার দিক থেকে জীবিকা এবং ভোগ ও বস্তুর দিক থেকে ঘুরে গিয়েছিলো। ইলমের মেহনত এবং কলবানিয়াত ও রূহানিয়াতের মুজাহাদার প্রতি উদ্বুদ্ধকারী উপাদানগুলো নির্জীব হয়ে পড়েছিলো, আর বিপরীত উপাদানগুলো চাঙ্গা হয়ে উঠেছিলো। মেধা, প্রতিভা ও সৃজনশক্তি, যা এত দিন ধর্মচর্চা ও আধ্যাত্ম-সাধনায় নিয়োজিত ছিলো, তা জাগতিক জীবনের বিভিন্ন অঙ্গনে চলে গিয়েছিলো। তখন কী হলো? গাছে ফুল আসা, ফল ধরা বন্ধ হলো; ডালপালা শুকিয়ে গেলো, পাতাসব এমনিতেই ঝরে গেলো। এভাবে চোখের সামনে গোটা বাগান উজাড় হয়ে গেলো।

দ্বীনের তলব, ইছলাহে নফস ও আত্মসংশোধনের স্পৃহা, আখেরাতমুখিতা ও

আল্লাহ-অভিমুখিতা, এগুলোর জন্য মানুষের জীবনে আর কোন অবকাশই ছিলো না। হৃদয় ও আত্মা এবং কলব ও রূহের স্থানও দখল করে নিয়েছিলো উদর-সর্বস্ব চিন্তা ও ভোগের উদগ্র চাহিদা। যিন্দেগির বুলন্দ মাকছাদ এবং জীবনের সুউচ্চ চিন্তা-চেতনা জাগতিক দৌড়ঝাঁপের নীচে চাপা পড়ে গিয়েছিলো। 'মাহাওল'[১] ও পরিপার্শ্ব যেন কবির ভাষায় আর্তনাদ করছিলো–

না চোড আহলে দিল কো আব, কে জোশে কুলযুম ফানা
মাতা'য়ে দরদ জিন মেঁ থী ওয়ো কিশতিয়াঁ ডুবো চুকা

'যারা ছিলো আহলে দিল তালাশ করো না তাদের। মরে গেছে নদী, হারিয়ে গেছে স্রোত। দরদের পণ্য ছিলো যে কিশতিতে, ডুবে গেছে সেই কবে।'

এটা অবশ্য ঠিক যে, বিগত যুগের দ্বীনী গায়রত এবং রূহানিয়াত ও আধ্যাত্মিক চেতনার মৃত্যু তখনো চূড়ান্ত হয়নি, কিছুটা প্রাণস্পন্দন বাকি ছিলো এবং বেঁচে থাকার শেষ চেষ্টা অব্যাহত ছিলো। কতিপয় কঠিনপ্রাণ দ্বীনী ব্যক্তিত্ব মৃত্যুশয্যায় নিশ্চল অবস্থায়ও দ্বীনী দাওয়াত ও রূহানি তারবিয়াতের চেষ্টা মেহনত ধরে রেখেছিলেন এবং আত্মশোধন ও চরিত্রসংশোধনের প্রচেষ্টা ক্ষীণধারায় হলেও প্রবহমান রেখেছিলেন। দুনিয়ার প্রতি নিরাসক্তি, আখেরাতের প্রতি অনুরাগ এবং সুন্নাহ অনুসরণের ক্ষেত্রে শাব্দিক অর্থেই তাঁরা ছিলেন সালাফের শেষ স্মৃতিচিহ্ন। মানুষ তখনো তাঁদের দাওয়াতে কিছু না কিছু সাড়া দিতো এবং মনে করতো যে, এই পাকীযা মানুষগুলোর সঙ্গে জুড়ে থাকা, অন্তত ভক্তি-শ্রদ্ধার সম্পর্ক রক্ষা করা হচ্ছে তাদের উপর দ্বীনের আদনা হক এবং জীবনের ন্যূনতম দাবী। তারা সেটা রক্ষা করার চেষ্টা করতো। এমনকি দুনিয়াদারি ও বিত্তসম্পদের দৌড়ঝাঁপে ব্যতিব্যস্ত অভিজাত শ্রেণীর লোকেরাও আখেরাত-চিন্তায় মশগুল ছিলো এবং নফসের ইছলাহ, হৃদয় ও আত্মার সংশোধন এবং আখেরাতের সুপরিণতি ও সুন্দর মৃত্যু লাভের বিষয়কে যথেষ্ট গুরুত্ব দিতো। কিন্তু এসবই ছিলো নিভু নিভু প্রদীপের শেষ জ্বলে ওঠা। কারণ তেল ফুরিয়ে গিয়েছিলো। কিংবা বলুন, বৃক্ষের শেকড় মাটি থেকে প্রাণরস সংগ্রহ করার শক্তি হারিয়ে ফেলেছিলো এবং লুহাওয়া বাগান সারখার করে ফেলেছিলো।

সাধারণভাবে পুরা ইলমী ও দ্বীনী মহল এবং বিশেষভাবে ইতিহাস ও ঐতিহ্যের

[১] পরিবেশ, পরিপার্শ্ব।

অধিকারী খান্দানগুলোও পরিবেশের চাপে এবং ইংরেজি শিক্ষার প্রভাবে ধর্ম ও পরকাল সম্পর্কে দ্বিধা-সংশয়ে আক্রান্ত হয়ে পড়েছিলো। আল্লাহর যাত ও সত্তা ও গুণ-ছিফাতের প্রতি এবং আখেরাতের ওয়াদা ও প্রতিশ্রুতির প্রতি আস্থা-বিশ্বাসে ফাটল ধরে গিয়েছিলো। তাই তারাও দ্বীনী তালিম ও তারবিয়াতের বিষয়ে কুণ্ঠিত ছিলো। কোরআন-সুন্নাহর ইলম হাছিল করে আলিমে দ্বীন হওয়ার সৌভাগ্য অর্জনের নামে সন্তানের উজ্জ্বল ভবিষ্যত ঝুঁকির মুখে ফেলতে তারা আর প্রস্তুত ছিলো না। তাই সন্তানকে তারা জীবিকামুখী জাগতিক জ্ঞান, তথা ইংরেজি শিক্ষা প্রদানের পথেই অগ্রসর হলো।

তাদের এ উদ্যোগ কিন্তু কল্যাণকর জ্ঞান অর্জনের প্রেরণা, বা ইসলাম-রক্ষার চেতনার কারণে ছিলো না, বরং ছিলো দ্বীনের প্রতি উদাসীনতা, ভবিষ্যত সম্পর্কে দুশ্চিন্তা এবং পরিবর্তিত সময়ের কাছে আত্মসমর্পণের পরাজিত মানসিকতার কারণে। তাদের আশঙ্কা ছিলো, এখনো যদি কলিজার টুকরো সন্তানকে দ্বীনী শিক্ষার ছেঁড়া চাটাইয়ে বসিয়ে রাখা হয়, এখনো যদি 'আধুনিক শিক্ষার আলো' না দেয়া হয় তাহলে তো তাদের ভবিষ্যত শেষ। বস্তুত দারিদ্র্যের ভয় এবং সামাজিক অমর্যাদার আশঙ্কায় তারা এমনই বেহাল ছিলো যে, 'মৃত্যুর আগেই মৃত্যুর শিকার' হয়ে পড়েছিলো।

এভাবেই এ প্রজন্মের বিলুপ্তি ঘটলো এবং এ পাতা উল্টে গেলো। এভাবেই নূরানিয়াতপূর্ণ সুদীর্ঘ এই রূহানি ও আধ্যাত্মিক যুগের অবসান ঘটলো এবং জড়বাদ, বস্তুবাদ ও ভোগবাদের সর্বগ্রাসী যুগ শুরু হয়ে গেলো, আর পৃথিবী হয়ে গেলো এমন এক বাজার যেখানে বেচা-কেনা ও কেনা-বেচা ছাড়া আর কিছু ছিলো না।

উদর ও বস্তুর উদগ্রতা

আজকের যুগ হৃদয় ও আত্মার যুগ নয়, উদর ও বস্তুর যুগ। জীবন এখন কোন-ভাবেই আখেরাতমুখী নয়, বরং দুনিয়ামুখী। আধুনিক মানুষের জীবনযাত্রায় এখন দিন-রাতের একমাত্র চিন্তা, যে কোন উপায়ে, যে কোন মূল্যে পকেট ভর্তি ও উদরপূর্তি করা। জাহেলি যুগের নারীকবি কাবশা বিনতে মা'দীকারাব তার ভাই আমর বিন মা'দীকারাবকে এজন্য লজ্জা দিয়েছিলেন যে, তিনি নিহত ভাইয়ের রক্তপণ গ্রহণে রাজী ছিলেন। কবিতার একটি পঙ্ক্তি দেখুন–

دع عنك عمرا إن عمرا مسالم   وهل بطن عمرو غير شبر لمطعم

বাদ দাও আমরের কথা, সে তো (অর্থের লোভে) আপোসের পথ ধরেছে।
আচ্ছা, আহারের জন্য আমরের উদর কি একমুষ্টির চেয়ে বড়?![১]

জাহেলিয়াতের সহজ-সরল নারীকবি কল্পনাও করতে পারেননি যে, মানব-উদর এক মুষ্টির চেয়ে বড় হতে পারে। কিন্তু তিনি যদি আজকের আধুনিক মানুষের স্ফীত উদর ও থলথলে ভুঁড়ি দেখতেন, যা কখনো ভরে না এবং কিছুতেই ভরাট হয় না! কবরের মাটি ছাড়া আর কিছুতে যার মুখ বন্ধ হয় না!

হাঁ, পশ্চিমা সভ্যতার গর্ভ থেকে জন্ম নেয়া মানুষের লোভ-লালসার উদর এতই বড় যে, কোন পরিমাণ সম্পদই তার ক্ষুধা মেটাতে পারে না এবং নদীর সব পানিও তার পিপাসা দূর করতে পারে না। তার ভেতরের জাহান্নাম থেকে শুধু শোনা যায় একই গর্জন, 'হাল মিম্মাযীদ– আরো চাই, আরো চাই! ব্যক্তি ও জাতি, উভয়ের কাঁধে লোভ-লালসার শয়তান আজ এমন চেপে বসেছে যে, উম্মাদের মত সে শুধু ছুটে চলেছে মালের পিছনে; পুরো দুনিয়াটাই যেন গিলে খাবে! হালাল-হারাম যে কোন উপায়ে সে সম্পদের পাহাড় গড়ে তুলতে চায়। তবু মনে হয় না, চাহিদা তার পুরা হয়েছে এবং অভাব দূর হয়েছে। এমন তো ছিলো না আমাদের ব্যক্তি! আমাদের জাতি!! কেন এমন হলো? কিসে এমন হলো?

আসলে এটাই হচ্ছে ইউরোপীয় সভ্যতার স্বভাব এবং আধুনিক জীবনের প্রকৃতি ও প্রবণতা। এ সভ্যতা, এ জীবনব্যবস্থা এমনই বস্তুসর্বস্ব যে, জড়জীবনের ভোগ ছাড়া আর কিছু সে বোঝে না; আখেরাত ও অনন্ত জীবনে সে বিশ্বাস করে না। তো দুনিয়ার দু'দিনের জীবন ছাড়া আর কিছু যার সামনে নেই; এ জগতের বাইরে কল্পনা-ঊর্ধ্ব আরেকটি জগত, সময় ও সীমানাহীন আরেকটি জীবন আছে বলে যার জানা নেই সে কী আর করতে পারে, বরং কী না করতে পারে! ষাট সত্তর বছরই তো তার পুঁজি! তার আশা-আকাঙ্ক্ষার শেষ সীমা! তার জ্ঞান ও চিন্তার শেষ সীমানা! কিসের আশায়, কিসের ভরসায় বর্তমানের ভোগ-উপভোগ, স্বাদ-আহ্লাদ ও আনন্দ-ফুর্তির কোন সুযোগ হাতছাড়া করবে সে? কোন্ জীবনের

[১] شرح حماسة أبي تمام للأعلم الشنتمري طبع دار الفكر، دمشق খ. ১ পৃ. ৩৩৬

জন্য, কোন্ আনন্দের জন্য, কোন প্রাপ্তি ও তৃপ্তির জন্য ত্যাগ ও আত্মত্যাগ, ক্ষুধা ও তৃষ্ণা এবং সাধনা ও সংযমের জীবন অবলম্বন করবে সে?

আধুনিক জীবন ও সভ্যতার এই যে ভোগবাদী ও বস্তুমুখী চিন্তাধারা, কোনমতেই এটা আধুনিক কিছু নয়; এটা ইসলামপূর্ব জাহেলিয়াতেরই উচ্ছিষ্টমাত্র। দেখুন, জাহেলি যুগের যুবক কবি তুরফা ইবনুল আব্‌দের কী সহজ-সরল ও অকপট স্বীকারোক্তি!–

فإن كنت لاتستطيع دفع منيتي   فدعني أبادرها بما ملكت يدي

كريم يروي نفسه في حياته   ستعلم إن متنا غدا أينا الصدي

আমার আয়ু যদি বাড়াতে না পারো, মৃত্যুহীন জীবনের আশ্বাস যদি দিতে না পারো, তাহলে কেন আর কৃপণতা, কেন ত্যাগের কষ্ট, ভোগের সংযম? মৃত্যুর আগে দু'হাত ভরে লুটতে দাও, লুটাতে দাও। আগামীকাল যখন মৃত্যু আসবে, বোঝবে কে তৃষ্ণার্ত? তুমি, না সেই উদার যুবক, জীবনকে যে সিক্ত রেখেছিলো মদ ও মদিরায়?

আধুনিক মানুষের মত জাহেলিয়াতের মানুষ অজুহাত ও যুক্তির আবরণে উদ্দেশ্য লুকিয়ে রাখা জানতো না এবং ছল ও ছলনা বুঝতো না। যা বিশ্বাস করতো সরল ভাষায় তা প্রকাশ করতো। তাই কবি তুরফা কোন রাখঢাক না করে, এত সরল-ভাবে মনের কথা বলতে পেরেছে।

বস্তুত এটাই হচ্ছে জীবন সম্পর্কে আজকের সভ্য মানুষের দৃষ্টিভঙ্গি। কারো তা স্পষ্ট করে বলার সাহস আছে; আর কারো মনের কথা খুলে বলার হয় সাহস নেই, কিংবা নেই ভাষার অলঙ্কার। জীবনের প্রতি এই বস্তুসর্বস্ব মানসিকতার ক্ষেত্রে বিশিষ্ট-সাধারণ, ধনী-নির্ধন ও অজ্ঞ-বিজ্ঞ সবাই সমান, তবে আল্লাহ যাকে ঈমানের আলো ও হিদায়াতের সুরক্ষা দান করেন।

দ্বিতীয় কারণ হচ্ছে ব্যাপক অর্থে আধুনিক সাহিত্য ও সংবাদমাধ্যম (এবং সর্বশেষ আকাশসংস্কৃতি), যা আকারে প্রকারে বিভিন্নভাবে শুধু ভোগবাদী জীবনেরই সৌন্দর্য ও মনোহর রূপ তুলে ধরে এবং এ জীবনের সফল ও বিজয়ী ব্যক্তিদের বন্দনা গায়। কলমের চাতুর্যে, ছবি ও চিত্রের কারুকার্যে এবং প্রচার-প্রচারণার মাধুর্যে বড় ঈর্ষণীয়রূপে তাদের উপস্থাপন করা হয়। গল্পের প্রতিটি চরিত্রে, নাটকের প্রতিটি অঙ্কে, গান ও কবিতার প্রতিটি স্তবকে এবং শিল্পকর্মের

প্রতিটি প্রদর্শনে থাকে শুধু একই বার্তা, 'ভোগের জন্য জীবন, জীবনের জন্য ভোগ।'

বলাবাহুল্য, এমন বস্তুবাদী সাহিত্যের ছায়ায় যারা বেড়ে ওঠে, গড়ে ওঠে, পুষ্ট ও পরিপুষ্ট হয়, ভোগের উন্মাদনা ও বস্তুর বন্দনা ছাড়া তাদের জীবনে মহৎ ও সুন্দর কোন লক্ষ্য থাকে না। মেধাবী ও জড়বাদী পশু ছাড়া আর কোন পরিচয়-সত্তাই তাদের অবশিষ্ট থাকে না।

বস্তুবাদী ও ভোগবাদী সমাজও একই ভূমিকা পালন করে। এ সমাজে মর্যাদা শুধু চৌকশ বিত্তশালীর জন্য, স্বভাব-চরিত্র ও নীতি-নৈতিকতা তার যত নিকৃষ্টই হোক। পক্ষান্তরে যার অর্থবিত্ত নেই তার কোন মান-মর্যাদা নেই; জ্ঞান, প্রজ্ঞা, মেধা ও প্রতিভা এবং স্বভাব ও চরিত্রের বিশুদ্ধতায় যত উর্ধ্বেই হোক তার অবস্থান। এ সমাজ আকারে ইঙ্গিতে, অভিব্যক্তিতে, কখনো বা স্পষ্ট ভাষায় বলে দেয়, 'জীবনের উপর চিত্তহীন মানুষের অধিকার থাকতে পারে, বিত্তহীন মানুষের কিছুতেই নয়।'

এমন মানুষকে এ নিষ্ঠুর সমাজ মনে করে কুকুর-বেড়ালেরও অধম। এ অবস্থার মধ্যেও সমাজের বিরুদ্ধে যারা বুক চিতিয়ে দাঁড়াতে পারে তাদের কথা আলাদা, কিন্তু তাদের সংখ্যা কত? সময়ের চাহিদা ও প্রকৃতি মেনে নিয়ে অধিকাংশকেই তো সাজতে হয় সমাজের সাজে এবং চলতে হয় সমাজের পথে। তদুপরি মর্যাদা ও আভিজাত্যের মাপকাঠি পরিবর্তিত হতে থাকে এবং তার দাবী ও চাহিদা শুধু বাড়তে থাকে। ফলে জীবনসংগ্রামে ধ্বস্ত-বিধ্বস্ত মানুষ আরো বেশী অর্থের জন্য আরো ভুল পথে যেতে বাধ্য হয়। আর তাতে নেমে আসে বিভিন্ন দুর্ভোগ-দুর্গতি, দুর্দশা ও বিপর্যয়, যার শুরু আছে, শেষ নেই। এর মধ্যে 'শনির খাড়া' হয়ে নেমে আসে চটকদার বিজ্ঞাপনের আগ্রাসন, পণ্যসামগ্রীর উৎপাদন-জোয়ার এবং পুঁজিপতি ও শিল্পগোষ্ঠীর উন্মত্ত বাণিজ্যিক প্রতিযোগিতা ও মুনাফা-লিপ্সা। আজ যা নতুন মডেলের গাড়ী, নতুন ফ্যাশনের পোশাক এবং নতুন ডিজাইনের আসবাব, দু'দিন পরেই তা হয়ে যায় সেকেলে। এভাবে যেসব জিনিস ছিলো জীবনের বাড়তি 'ফুযূল' তাই হয়ে পড়ে সামাজিক ও নাগরিক মর্যাদার প্রতীক। যারা তা রক্ষা করে না, বা করতে পারে না তারা হয়ে পড়ে সমাজে অপাঙ্‌ক্তেয়। এগুলোর মূলে কিন্তু প্রয়োজনের দাবী নয়, শুধু বাজার, বাণিজ্য ও মুনাফার স্বার্থ।

এসব কারণে এবং অন্য আরো অনেক কারণে অর্থবিত্তের মূল্য ও গুরুত্ব আজ এত বেড়ে গিয়েছে যে, পিছনে মানুষের লিখিত ইতিহাসে আর কখনো হয়নি। অর্থসম্পদই এখন সমাজদেহের প্রাণ এবং যাবতীয় নাগরিক কর্মকাণ্ডের চালিকা-শক্তি, বরং এটাই একমাত্র অক্ষদণ্ড যার উপর আবর্তিত হচ্ছে আধুনিক জীবনের চাকা। লণ্ডনবিশ্ববিদ্যালয়ের দর্শন ও মনস্তত্ত্বের অধ্যাপক জুড যা বলেছেন তা শুধু ইউরোপের ক্ষেত্রেই নয়, পশ্চিমা সভ্যতার আগ্রাসনের শিকার প্রতিটি সমাজ সম্পর্কেই সমান প্রযোজ্য। তিনি বলেন–

'যে জীবনদর্শন বর্তমান যুগের উপর অপ্রতিহত প্রভাব বিস্তার করে রেখেছে তা হলো অর্থনৈতিক দর্শন। 'পেট ও পকেট'ই এখন যে কোন কিছুর প্রতি মানুষের আগ্রহ-অনাগ্রহের মাপকাঠি।'

আপনি যদি যুগ ও সমাজের রুচি, স্বভাব ও গতি-প্রকৃতি বিচার করেন বাস্তব জীবন থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে এবং ঐসব গবেষণাপত্রের সাহায্যে, যা গৃহের নির্ঝঞ্ঝাট পরিবেশে বাস্তবতার পরিবর্তে তাত্ত্বিকতার ভিত্তিতে লেখা হয়েছে তাহলে অবশ্যই আপনি ভ্রান্তি ও বিভ্রান্তির শিকার হবেন। কেননা লেখক, সাহিত্যিক ও দার্শনিকগণ কখনো কখনো ব্যক্তির রুচি-প্রবণতা এবং ক্ষুদ্র গোষ্ঠীর চিন্তা-চেতনার প্রতিনিধিত্ব করে থাকেন। কখনো বা বাস্তবতার চিত্র অঙ্কনের পরিবর্তে নিজস্ব আশা ও প্রত্যাশার চিত্র তুলে ধরেন। অর্থাৎ যা ঘটেছে বা ঘটছে তার পরিবর্তে যা ঘটা কাম্য তাই লিখে থাকেন। যদিও লেখার আয়নায় সমাজের বিদ্যমান রুচি ও প্রবণতার কিছু না কিছু ছাপ পড়েই থাকে, তবু সাধারণ অবস্থা এটাই যে, এতে ভুল সিদ্ধান্তের যথেষ্ট ঝুঁকি থাকে। তাই যুগ ও সমাজের রুচি, অভিরুচি এবং ঝোঁক ও প্রবণতার সম্পর্কে সঠিক ধারণা পেতে হলে বইয়ের পাতা থেকে নয়, জীবনের পাতা থেকেই পেতে হবে। মানুষের সঙ্গে মিশে আপনাকে তাদের ঘরোয়া কথা-বার্তা ও মজলিসি আলাপ শুনতে হবে। সেখান থেকেই বেরিয়ে আসবে যুগ ও সমাজের প্রকৃত চিত্র। আকবর যেমন বলেছেন তাঁর কবিতায়–

নকশোঁ কো তুম না জাঁচো লোগোঁ সে মিল কে দেখো

কেয়া চীজ জী রাহী হ্যয়, কেয়া চীজ মার রাহী হ্যয়

চিত্র ও মানচিত্র দেখে বিচার করো না, মানুষের ভিতরে গিয়ে দেখো, কী জীবন্ত আছে, আর কী হয়েছে বিলুপ্ত

এ মাপকাঠির ভিত্তিতে আপনি গাড়ী ও রেলগাড়ীর সফরে, সকাল-সন্ধ্যার ভ্রমণে, চায়ের মজলিসে, পার্কে উদ্যানে এবং বন্ধুমহলে কান পেতে শুনুন, কী নিয়ে কথা হচ্ছে? কী নিয়ে মাতামাতি হচ্ছে? যে কোন আলোচনার শুরু কোত্থেকে এবং শেষ কোথায়? আপনার কানে আসবে শুধু এপার জীবনের আলাপ; ওপার জীবনের কোন আলোচনাই সেখানে নেই, একদু'টি ব্যতিক্রম ছাড়া। আরব-কবি ভিক্ষুককে অভিসম্পাত দিচ্ছেন এজন্য যে, তার নযর কখনো রুটি-কাপড় থেকে উপরে ওঠে না। দেখুন–

لحا الله صعلوكا مناه وهمه من العيش أن يلقى لبوسا ومطعما

ঐ ভিক্ষুকের আল্লাহ সর্বনাশ করুন, যার চিন্তা ও দুশ্চিন্তা হলো একটুকরো রুটি, আর একখণ্ড কাপড়।

এই জাহেলী কবি যদি আজকের 'সভ্য জীবন' দেখতে পেতেন, যেখানে দার্শনিক ও রাজনীতিক এবং বিচারপতি ও পুঁজিপতি কারো চিন্তাই রুটি-কাপড় অতিক্রম করতে পারে না তাহলে তিনি কী বলতেন?!

আকারে প্রকারে, আবরণে ও অলঙ্কারে যতই ভিন্নতা থাকুক, বিষয় কিন্তু একই, সোনা-চাঁদি ও রুটি-কাপড়। পশ্চিমা বিশ্বকে বলা যায় এ নতুন জীবনদর্শনের স্রষ্টা, আর অন্যান্য জাতি হলো তাদের 'উপাসক' ও অনুগামী, কিন্তু আফসোস, মুসলিমজাতিও আজ তাদেরই পদ-রেখার অনুসারী!

নীতি ও নৈতিকতার ধ্বংস

ইসলামী প্রাচ্যে পশ্চিমারা যখন প্রথমে বণিকবেশে, তারপর শাসক ও শোষকরূপে তাদের পূর্ণ দখলদারি কায়েম করে, তার আগে থেকেই সেখানে নৈতিক অধঃপতন ও সামাজিক অবক্ষয় শুরু হয়ে গিয়েছিলো এবং প্রাচ্য ও ইসলামী সভ্যতার গুণ-বৈশিষ্ট্যগুলো বিনষ্ট হতে শুরু করেছিলো, যা ছিলো মুসলিমরাষ্ট্রসমূহের পতন এবং প্রাচ্যের জনগোষ্ঠীগুলোর পরাজয়ের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ কারণ।

এত কিছুর পরো নির্দ্বিধায় বলা যায়, তখনো তাদের মধ্যে এমন কিছু নৈতিক ও চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য বিদ্যমান ছিলো এবং তা এতটাই উচ্চস্তরের ছিলো, যার নমুনা অন্যান্য জাতির নৈতিক ইতিহাসে নেই। প্রাচ্যের অধিবাসিগণ কিছু গুণ ও

বৈশিষ্ট্যের উৎকর্ষ সাধন করে করে সেটাকে রীতিমত একটি কলা সংস্কৃতির রূপ দান করেছিলেন এবং তাতে এমন এমন সূক্ষ্মতা, কমনীয়তা ও লালিত্য আনয়ন করেছিলেন যা পশ্চিমে শুধু কবিতা ও সাহিত্যে এবং শিল্পকলায় ভাবা যায়, জীবনের আচরণে নয়।

ইসলামী প্রাচ্যে মানুষের মধ্যে পারিবারিক ও সামাজিক বন্ধন এমনই সুগভীর, সুসংহত ও সুদূরপ্রসারী ছিলো যা এযুগে কারো কল্পনারও বাইরে। সর্বোপরি এসব সম্পর্ক ছিলো সর্বপ্রকার জাগতিক স্বার্থ ও বস্তুগত লাভের ঊর্ধ্বে, যেখানে পাশ্চাত্যে প্রতিটি সম্পর্ক নির্ধারিত হয় সুযোগ-সুবিধার উপস্থিতি-অনুপস্থিতির ভিত্তিতে। মা-বাবার সঙ্গে সন্তানের এবং সন্তানের সঙ্গে মা-বাবার ভালোবাসা ও মায়া-মমতার যে বন্ধন, ছোট ও বড়র মধ্যে স্নেহ-সম্মানের যে সম্পর্ক, নারীর সতিত্ব, দাম্পত্য-বিশ্বস্ততা, চাকর-নওকরদের আমানতদারি ও নিমকহালালি, যুবকদের চারিত্রিক দৃঢ়তা, শরীফ ও অভিজাত শ্রেণীর পারস্পরিক আচরণে সমতা ও শিষ্টাচার এবং বন্ধুর জন্য বন্ধুর ত্যাগ ও আত্মত্যাগ, এসব ক্ষেত্রে এমন এমন ঘটনা রয়েছে যা এখন মনে হয় কাহিনী, আর কিছু দিন পর মনে হবে 'কাহানী'![1]

বস্তুত প্রাচ্যের ইসলামী পরিবারে বৃদ্ধ পিতা-মাতাই ছিলেন সবচে' শ্রদ্ধার পাত্র। তাদের পরিপূর্ণ সেবা-যত্ন ও সন্তুষ্টি অর্জনই ছিলো গোটা পরিবারের স্বতঃস্ফূর্ত কর্তব্য। বড় বড় পারিবারিক বিষয়ে পিতা-মাতার সিদ্ধান্তই ছিলো চূড়ান্ত এবং সেটাকে মনে করা হতো কল্যাণ ও সৌভাগ্যের কারণ। পশ্চিমা সমাজ ও সভ্যতা এটা কীভাবে কল্পনা করতে পারবে, যেখানে বুড়ো মা-বাবার নিঃসঙ্গ জীবন কাটে বৃদ্ধনিবাসে![2]

প্রাচ্যে মুসলিম সমাজে পিতা-মাতার প্রতি সন্তানের আত্মনিবেদনমূলক এই যে, মন-মানস, আচরণ ও সংস্কৃতি, এর উৎস হলো কোরআন ও সুন্নাহর এই আদেশ, উপদেশ ও সতর্কবাণী যা থেকে কয়েকটি নীচে পেশ করা হচ্ছে। আল-কোরআনের ইরশাদ–

---

[1] প্রথমে ছিলো এরূপ, 'এখন মনে হয় কাহিনী, আর কিছু দিন পর মনে হবে অলীক কাহিনী।

[2] মুসলিম সমাজের দুর্ভাগ্য, এখানেও এখন 'সুন্দর সুন্দর বৃদ্ধ-আশ্রম গড়ে উঠছে। আমারও পরিকল্পনা আছে, একটি 'আদর্শ ইসলামী' বৃদ্ধ ও বৃদ্ধা নিবাস প্রতিষ্ঠা করার, ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিঊন। – অনুবাদক

وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوٓا۟ إِلَّآ إِيَّاهُ وَبِٱلْوَٰلِدَيْنِ إِحْسَـٰنًا ۚ إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ ٱلْكِبَرَ أَحَدُهُمَآ أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَآ أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا ﴿٢٣﴾ وَٱخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ ٱلذُّلِّ مِنَ ٱلرَّحْمَةِ وَقُل رَّبِّ ٱرْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِى صَغِيرًا ﴿٢٤﴾

আর আপনার প্রতিপালক সিদ্ধান্ত দিয়েছেন যে, তোমরা তাঁকে ছাড়া আর কারো ইবাদত করবে না, আর পিতা-মাতার সঙ্গে সদাচার করবে। যদি তোমার কাছে তাদের একজন, বা উভয়ে বার্ধক্যে উপনীত হয় তাহলে তাদের উদ্দেশ্যে 'উফ' পর্যন্ত বলো না, আর তাদেরকে ধমকিও না, বরং তাদের সঙ্গে সম্মানজনক কথা বলো। আর দয়াবশত তাদের জন্য বিনয়ের ডানা নামিয়ে দাও (বিনয়ের আচরণ করো।) আর বলো, হে রব্ব, আপনি তাদের প্রতি দয়া করুন, যেরূপ তারা আমাকে প্রতিপালন করেছে শৈশবে। (বনী ইসরাঈল, ১৭ : ২৩- ২৪)

আল্লাহর পক্ষ হতে কত বড় মর্যাদা মা-বাবাকে! বান্দাকে যেখানে আপন বান্দেগির আদেশ করেছেন সেখানে একই সঙ্গে মা-বাবার প্রতি সাদাচারের আদেশ করেছেন এবং কত বিশদভাবে! ঘটনা যাই হোক, পরিস্থিতি যেমনই হোক, সন্তানের অধিকার নেই কষ্টের প্রকাশরূপে তাদের সামনে উফ শব্দটি পর্যন্ত উচ্চারণ করার! তারপর কত সুন্দর উপমা, পাখী যেমন মমতার কারণে ছানাকে ডানা জড়ো করে জড়িয়ে রাখে, তোমার বুড়ো মা-বাবা তো এখন ছোট্ট শিশুরই মত, সুতরাং ছানার প্রতি পাখীর যেমন মমতা, তুমিও ঐরূপ মমতা প্রদর্শন করো! তারপর শিক্ষা দিলেন এমন এক দু'আ যাতে যেমন রয়েছে মা-বাবার প্রতি সন্তানের কল্যাণ-আকুতি, তেমনি রয়েছে শৈশবের প্রতিপালন স্মরণ করে কৃতজ্ঞতার প্রকাশ। সন্তান যেন প্রকারান্তরে নিজের অক্ষমতা স্বীকার করে নিলো যে, শৈশবে মা-বাবার প্রতিপালনের প্রতিদান দেয়ার সামর্থ্য আমার নেই, সুতরাং হে রব্ব, তুমিই তাদের প্রতি দয়া করো।

এমন আসমানী হুকুমের পর মুসলিম সন্তান তার মা-বাবার প্রতি কোমল, সদয় ও বিনয়ী হবে এটাই তো স্বাভাবিক! আরো ইরশাদ হয়েছে-

وَوَصَّيْنَا ٱلْإِنسَـٰنَ بِوَٰلِدَيْهِ إِحْسَـٰنًا ۖ حَمَلَتْهُ أُمُّهُۥ كُرْهًا وَوَضَعَتْهُ كُرْهًا ۖ وَحَمْلُهُۥ وَفِصَـٰلُهُۥ ثَلَـٰثُونَ شَهْرًا

আর আমি কঠোর আদেশ করেছি মানুষকে তার মা-বাবার সঙ্গে সদাচার করার। (কারণ) তার মা তাকে ধারণ করেছে অতি কষ্টে এবং তাকে প্রসব করেছে অতি কষ্টে। তাকে ধারণ করা এবং দুগ্ধদান করা দীর্ঘ ত্রিশটি মাসের বিষয়!
(আহকাফ, ১৫ : ৪৬)

এমনকি ক্ষেত্রবিশেষে মা-বাবার খেদমতকে আল্লাহর রাস্তায় জিহাদের উপরও অগ্রাধিকার দেয়া হয়েছে। ছাহাবী জিহাদে যাওয়ার অনুমতি প্রার্থনা করলেন, নবী ছাল্লাল্লাহু যখন জানলেন, তার মা-বাবা রয়েছেন, তখন বললেন-

ففيهما فجاهد ،

তাহলে তাদের ক্ষেত্রেই জিহাদ করো।

তোমার জিহাদ এটাই যে, তুমি তোমার মা-বাবার খেদমত করো। তাতেই তুমি জিহাদের ছাওয়াব পাবে।

সন্তানের কাছে মা-বাবার এই যে সদাচারের প্রাপ্যতা, এটা শুধু মা-বাবা হওয়ার কারণেই। সুতরাং মা-বাবা যদি কাফির মুশরিকও হন, তবু সন্তানের কাছে তারা সদাচারের হকদার। ইরশাদ হয়েছে-

وَإِن جَـٰهَدَاكَ عَلَىٰٓ أَن تُشْرِكَ بِى مَا لَيْسَ لَكَ بِهِۦ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا ۖ وَصَاحِبْهُمَا فِى ٱلدُّنْيَا مَعْرُوفًا

আর যদি তারা তোমাকে মজবুর করে আমার সঙ্গে এমন কিছুকে শরীক করতে যে বিষয়ে তোমার কোন জ্ঞান নেই, তবে তুমি তাদের আনুগত্য করো না, তবে দুনিয়াতে তাদেরকে সঙ্গ দাও সদাচারের সঙ্গে। (লোকমান, ৩১ : ১৫)

মা-বাবা শুধু যে নিজেরাই মুশরিক তা নয়, বরং সন্তানকেও মজবুর করছে শিরকের উপর। এ অবস্থায় তো শানে জালাল ও শানে কহর প্রকাশ পাওয়ার কথা, কিন্তু না। তোমার মা-বাবা আল্লাহর হক চূড়ান্তভাবে লঙ্ঘন করেছেন।

তারপরো তুমি তোমার উপর তাদের যে হক, তা ভুলে যেয়ো না। শিরকের পথে তাদের আনুগত্য তো কিছুতেই করবে না। তবে যত দিন তারা দুনিয়াতে বেঁচে আছেন তাদের প্রতি তোমার আচরণ হবে আদবের, দয়া ও সদাচারের। (কে জানে, হয়ত তোমার সদাচারই তাদের হেদায়াতের ওছিলা হয়ে যাবে!)

কোন এক প্রসঙ্গে নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জনৈক ছাহাবীকে বলেছেন–

أنت ومالك لوالدك

তুমি নিজে এবং তোমার সম্পদ তোমার বাবার[১]

অন্যদিকে মা-বাবার সঙ্গে অসদাচরণ সম্পর্কে বিভিন্ন হাদীছে কঠিন সতর্কবাণী উচ্চারিত হয়েছে। হযরত আবু হোরায়রা রা. হতে বর্ণিত, নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন–

رغم أنفه، ثم رغم أنفه ثم رغم أنفه . قيل : من يا رسول الله؟ قال : من أدرك والديه عند الكبر أو أحدهما ثم لم يدخل الجنة (رواه مسلم)

তার নাক ধূলিমিশ্রিত হোক, আবার তার নাক ধূলিমিশ্রিত হোক, আবার তার নাক ধূলিমিশ্রিত হোক। জিজ্ঞাসা করা হলো, কে ইয়া রাসূলাল্লাহ? তিনি বললেন, যে তার মা-বাবাকে বার্ধক্যের অবস্থায় পেয়েছে, কিংবা তাদের একজনকে, আর তিনি তাকে জান্নাতে দাখেল করাননি।

হযরত জাবির বিন সামুরাহ রা. হতে বর্ণিত হাদীছে রয়েছে, হযরত জিবরীল আ. যে তিন ব্যক্তির জন্য বদদু'আ করেছেন, আর নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমীন বলেছেন, ঐ তিন ব্যক্তির একজন হলো যে তার মা-বাবার সন্তুষ্টি অর্জন করেনি। (তাবারানী, ইবনে হিব্বান)

পিতা-মাতার প্রতি সন্তানের ভালোবাসা ও ভক্তি-মুহব্বত এবং সেবা ও সদাচার, এগুলো তাদের জীবদ্দশা পর্যন্ত সীমাবদ্ধ ছিলো না, বরং মৃত্যুর পরও তা

---

[১] رواه أبوداود عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مرفوعا، في كتاب البيوع، وابن ماجه في كتاب التجارات وأحمد في مسنده (مسند المكثرين من الصحابة

অব্যাহত থাকতো। কারণ মা-বাবার বন্ধু-স্বজনদের সঙ্গে সর্বপ্রকার সদাচার রক্ষা করাকেও কৃতার্থ সন্তান নৈতিক কর্তব্য বলে মনে করতো। আর এটাও মূলত নববী শিক্ষারই প্রতিবিম্ব ছিলো। কারণ তিনি ইরশাদ করেছেন–

إن من أبر البر صلة الرجل بأهله وود أبيه بعد أن يولي

মানুষের সর্বোত্তম নেক আমলের একটি হলো নিজের পরিবারের সঙ্গে সদাচার করা এবং (মা ও) বাবার মৃত্যুর পর তার বন্ধু-স্বজনদের সঙ্গে সদাচার করা।[১]

সন্তানের শিক্ষা-দীক্ষা ও লালন-প্রতিপালনে প্রাচ্যের ইসলামী পরিবারে মা-বাবার ত্যাগ ও আত্মত্যাগ ছিলো তুলনাহীন। সন্তানের সুখ-শান্তির জন্য জীবনের সব সাধ-আহ্লাদ, আরাম-আয়েশ হাসিমুখে তারা বিসর্জন দিতেন। সন্তানের উজ্জ্বল ভবিষ্যতের জন্য তিলে তিলে নিজেদের ক্ষয় করে দেয়া, এতেই ছিলো তাদের আত্মার শান্তি। সন্তানের তালিম-তারবিয়াত ও শিক্ষা-দীক্ষাই ছিলো তাদের জীবনের একমাত্র স্বপ্ন, একমাত্র লক্ষ্য। এমনকি সন্তানের ভবিষ্যতের স্বার্থে প্রয়োজনে শক্ত হতেও তারা দ্বিধা করতেন না। সন্তানকে দূরের শহরে পাঠিয়ে দিয়ে বাবা বুকের কান্না বুকে চেপে রাখতেন, আর মা আঁচলে চোখের পানি মুছতেন। সন্তান 'কী না কী খায়' ভেবে তাদের মুখে আর ভালো খাবার উঠতো না। এমন কাহিনী প্রাচ্যের ঘরে ঘরে এত অসংখ্য যে, অন্য সমাজে, অন্য সভ্যতায় তা কল্পনা করাও ভার।

উস্তাদের শাসন ও শাস্তি সবসময় প্রাচ্যের শিক্ষাব্যবস্থার অন্যতম অনুষঙ্গ ছিলো এবং স্বীকার করতে বাধা নেই, এর উপকারিতা ও প্রয়োজনীয়তা যেমন ছিলো তেমনি কখনো কখনো ব্যক্তিবিশেষের স্বভাবগত কারণে তা সীমা অতিক্রমও করতো। তবে সেক্ষেত্রে মা-বাবা হাতের জ্বলন্ত অঙ্গারের মত তা বরদাশত করে নিতেন। সন্তানকে প্রশ্রয় দেয়া বা অভিযোগ করা তো দূরের কথা, উস্তাদের শানে অশোভন কোন শব্দ পর্যন্ত উচ্চারণ করাকে ভাবা হতো শরাফত ও ভদ্রতার মানদণ্ড থেকে নীচের বিষয়। এসব ক্ষেত্রে তারা বরং সন্তানকে প্রবোধ দিতেন যে, উস্তাদের হক মা-বাবার উপরে। কখনো বলতেন, উস্তাদের শাসন ছাড়া কে কবে বড় হতে পেরেছে!

---

[১] رواه مسلم عن ابن عمر رضي الله عنهما في كتاب البر والصلة والأداب، وأبوداود في كتاب الأدب، وأحمد في مسنده (مسند المكثرين من الصحابة

এক্ষেত্রে সাধারণ ও অভিজাত পরিবারে কোন পার্থক্য ছিলো না। উভয়ের আচরণ ও দৃষ্টিভঙ্গি ছিলো অভিন্ন, বরং অভিজাত পিতা-মাতার আচরণ হতো আরো অভিজাত। উস্তাদ কাসাঈ'র খিদমত সম্পর্কে আমীন-মামূনের প্রতি খলীফা হারূন রশীদের যে উপদেশ তার তুলনা কোথায়?

এ প্রসঙ্গে ইতিহাসে বহু বিস্ময়কর ঘটনা বর্ণিত হয়েছে, যা প্রাচ্যের সংস্কৃতি ও মনমানসের প্রতিনিধিত্ব করে। এখানে একটিমাত্র ঘটনা শুনুন। তাজুদ্দীন আলদায, যিনি সুলতান শিহাবুদ্দীন ঘোরীর পর আফগানিস্তানের শাসক ছিলেন, তাঁর সম্পর্কে বর্ণিত আছে, তিনি পুত্রের শিক্ষা-দীক্ষার দায়িত্ব জনৈক শিক্ষকের হাতে ন্যস্ত করলেন। সে যুগে শিক্ষকও বাদশাহযাদাকে শাসন করতে দ্বিধা করতেন না। কিন্তু দুর্ভাগ্য, শিক্ষক একবার এমন 'সীমাছাড়া' হলেন যে, তার শাসন-প্রহারে বাদশাহযাদা মারাই গেলো। কী নাযুক পরিস্থিতি! কিন্তু বাদশাহ চরম ধৈর্য-সংযমের পরিচয় দিয়ে বললেন, আপনি দূরে কোথাও চলে যান। কারণ সন্তানের মা সম্পর্কে আমি আশ্বস্ত নই। তার পক্ষ হতে যদি অনাকাঙ্ক্ষিত কিছু হয়ে যায়![১]

ইসলামী সমাজে বড়-ছোটর পরস্পর সম্পর্কের ভিত্তি ছিলো শরী'আতের এই শাশ্বত শিক্ষা–

من لم يرحم صغيرنا ويعرف حق كبيرنافليس منا

যে আমাদের ছোটকে স্নেহ করে না এবং আমাদের বড়দের হক বোঝে না সে আমাদের মধ্য হতে নয়[২]

প্রাচ্যের সভ্যতা ও তাহযীব-তামাদ্দুনের আরেকটি বৈশিষ্ট্য ছিলো আভিজাত্য রক্ষা করে জীবনকে একধাঁচে একভাবে যাপন করা। আজকের অবনতিশীল সমাজেও এক্ষেত্রে বিস্ময়কর বহু দৃষ্টান্ত পাওয়া যায়। যে ব্যক্তি যে কাজ, আচরণ, রীতি বা নীতি নিজের জন্য নির্ধারণ করতো তা শেষ পর্যন্ত রক্ষা করতো; এমনকি লেবাস-পোশাকের স্বকীয়তাও বজায় রাখার চেষ্টা করতো। পরিবেশ,

---

[১] الإعلام بمن في تاريخ الهند من الأعلام খ. ১ পৃ. ৮৮

[২] رواه أبو داود عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه، في كتاب الأدب، وأحمد في مسنده (مسند المكثرين من الصحابة)

পরিস্থিতি, মৌসুম ও স্বাস্থ্যের পরিবর্তনে তাতে কোন পরিবর্তন আসতো না। যার সঙ্গে যে আচরণ ও সম্পর্ক শুরু হতো, জীবনের শেষ পর্যন্ত তা রক্ষা করা হতো; সেজন্য যত বড় মূল্য দিকে হোক তা থেকে পিছিয়ে আসার কথা চিন্তাও করা হতো না।

সে যুগে পারিবারিক ও গোত্রীয় জীবনে মর্যাদা ও সম্পর্কের ভিত্তি অর্থের প্রাচুর্য ছিলো না। খান্দানে বিভিন্ন জনে অর্থনৈতিক তারতম্য হতে পারে। কেউ সচ্ছল, বিত্তবান; কেউ অসচ্ছল, বিত্তহীন। কিন্তু খান্দানি মজলিসে এটা অকল্পনীয় ছিলো যে, অর্থনৈতিক পার্থক্যের কারণে কারো প্রতি কারো আচরণ ভিন্ন হবে। এমন ভুল ভুলেও যদি হতো, পুরা খান্দান তার প্রতিবাদ করতো, এমনকি তাকে 'ভিন্ন' করে দেয়া হতো, যতক্ষণ না সে মাফ চায়।

একজন অসচ্ছল শরীফ ব্যক্তি তার সচ্ছল ভাই বা আত্মীয়ের সঙ্গে নিঃসঙ্কোচে কথা বলতো এবং বলতে পারতো। কেননা আভিজাত্য, বংশমর্যাদা, নিজস্ব গুণ ও যোগ্যতা, বা আত্মীয় সম্পর্কের ভিত্তিতে তার সঙ্গে সমতার আচরণই করা হতো। হতে পারে, কারো জীবনে দারিদ্র্যের ছায়া পড়েছে, কিন্তু সেটা তার বংশীয় আভিজাত্য, ধর্মীয় মর্যাদা ও জ্ঞান-প্রজ্ঞাকে আড়াল করতে পারতো না।

আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় ছিলো এই, অসচ্ছল ও দরিদ্র ব্যক্তি তার অসচ্ছলতা ও দারিদ্র্য সংযম ও যত্নের সঙ্গে গোপন রাখার চেষ্টা করতো। কেউ তার ঘরের অভাব-অনাহারের কথা জানবে, এটা গরীব থেকে গরীব মানুষের জন্যও ছিলো কষ্টের বিষয়। অতি নিকটজন ছাড়া কারো সামনেই তা প্রকাশ করা হতো না।

ইসলামী সমাজের শেষ সময় পর্যন্ত বিবেকবান মানুষের কাছে বিবেক ছিলো তার দ্বীন-ধর্ম ও ইয্যত-আবরুর মতই এমন মূল্যবান ছিলো যে, কোন মূল্যেই তা খরিদ করা সম্ভব ছিলো না। ভয়-ভীতি এবং লোভ ও প্রলোভনন, কোন কিছুই তাকে বিবেকের অবস্থান থেকে সরাতে পারতো না।

আঠারোশ' সাতান্নের মহাবিদ্রোহের আগে-পরে বহু অভিজাত মুসলিম ব্যক্তির ক্ষেত্রে এমন ঘটনা ঘটেছে। হাসিমুখে তারা মৃত্যুবরণ করেছেন, কিন্তু বিবেকের অপমৃত্যু হতে দেননি। বুক পেতে গুলি খেয়েছেন, গলায় ফাঁসির রজ্জু পরেছেন; বাঁচার জন্য এইটুকু বলে দেয়াই যথেষ্ট ছিলো, 'এ বিদ্রোহে আমার কোন ভূমিকা ছিলো না', কিন্তু মিথ্যা বলা পছন্দ করেননি।

বহু উদাহরণের শুধু একটি শুনুন। শায়খ রাযিউল্লাহ বাদায়ূনী রহ. ৫৭-এর বিদ্রোহের অভিযোগে ধৃত হলেন। যে ইংরেজ বিচারকের আদালতে তাঁর বিচার হলো তিনি ছিলেন শায়খ বাদায়ূনীর ছাত্র। বিচারক কোন বন্ধুর মাধ্যমে ইঙ্গিত দিলেন যে, তিনি যেন অভিযোগ অস্বীকার করেন, যাতে তাকে অব্যাহতি দিতে পারি।

শায়খ তা প্রত্যাখ্যান করে বললেন, যা করেছি তা কীভাবে অস্বীকার করবো? ফলে ইংরেজ বিচারক সহানুভূতিশীল হয়েও ফাঁসির রায় দিতে বাধ্য হলেন। এমনকি ফাঁসির আদেশ কার্যকর করার সময়ও ইংরেজ বিচারক শেষ অনুরোধ জানিয়ে বললেন, এখনো সময় আছে, একবার যদি বলেন, অভিযোগ মিথ্যা, তাহলে রায় পরিবর্তনের চেষ্টা করতে পারি।

শায়খ নারায হয়ে বললেন, তুমি কি চাও, একটি মিথ্যা দ্বারা সারা জীবনের অর্জন নষ্ট করে ফেলি! তাহলে তো নিজেই নিজের সর্বনাশ করলাম। না, আমি বিদ্রোহে ছিলাম; এটাই সত্য, যা করার করো।

ফাঁসির রজ্জুতে তিনি তো মরলেন, কিন্তু তাঁর ধর্মের সত্য অমর হলো এবং গর্ব করার মত সম্পদ আমাদের হাতে এলো।

সত্যের প্রতি এ নিষ্ঠা এবং বিশ্বাসের প্রতি এই অবিচলতা ব্যক্তিজীবনেই সীমাবদ্ধ ছিলো না, বরং সাম্প্রদায়িক ক্ষেত্রেও তা অক্ষুণ্ণ ছিলো। স্বজাতি ও স্বদেশ-অন্ধত্ব বলতে কোন কিছু তাঁদের জীবনে ছিলো না, যা বর্তমান যুগে অপরিহার্য গুণ বলে মনে করা হয়। নিজের ক্ষেত্রে যেমন, তেমনি সাম্প্রদায়িক স্বার্থে মিথ্যার আশ্রয় গ্রহণ করাকেও তাঁরা পাপ ও নীচতা বলে বিশ্বাস করতেন। কারণ ইসলামের দৃষ্টিতে ব্যক্তি, পরিবার, জাতি ও সমাজ সর্বক্ষেত্রে বিধান অভিন্ন। আলকোরআন ঘোষণা করছে–

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ كُونُوا۟ قَوَّٰمِينَ بِٱلْقِسْطِ شُهَدَآءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَىٰٓ أَنفُسِكُمْ أَوِ
ٱلْوَٰلِدَيْنِ وَٱلْأَقْرَبِينَ ۚ إِن يَكُنْ غَنِيًّا أَوْ فَقِيرًا فَٱللَّهُ أَوْلَىٰ بِهِمَا ۖ فَلَا تَتَّبِعُوا۟
ٱلْهَوَىٰٓ أَن تَعْدِلُوا۟ ۚ وَإِن تَلْوُۥٓا۟ أَوْ تُعْرِضُوا۟ فَإِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا ﴿١٣٥﴾

হে মুমিনগণ! তোমরা ন্যায়ের প্রতি একনিষ্ঠ হও এবং আল্লাহর জন্য সাক্ষ্যদান-কারী হও, যদিও তা তোমাদের, পিতা-মাতা ও স্বজনদের বিপক্ষে হয়। যদি সে (অভিযুক্ত) ধনী হয় বা গরীব, সর্বাবস্থায় আল্লাহ তাদের প্রতি (তোমাদের চেয়ে অধিক দয়াবান। সুতরাং ন্যায়বিচারের ক্ষেত্রে তোমরা প্রবৃত্তির অনুসরণ করো না। আর যদি তোমরা (সাক্ষ) বিকৃত করো বা এড়িয়ে যাও, তাহলে মনে রেখো, তোমাদের কৃতকর্ম সম্পর্কে আল্লাহ সম্যক অবগত। (আন-নিসা, ৪ : ১৩৫)

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ كُونُوا۟ قَوَّٰمِينَ لِلَّهِ شُهَدَآءَ بِٱلْقِسْطِ ۖ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَـَٔانُ
قَوْمٍ عَلَىٰٓ أَلَّا تَعْدِلُوا۟ ۚ ٱعْدِلُوا۟ هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ ۖ وَٱتَّقُوا۟ ٱللَّهَ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ خَبِيرٌۢ بِمَا
تَعْمَلُونَ ﴿٨﴾

হে মুমিনগণ! তোমরা আল্লাহর পক্ষে অবিচল থাকো এবং ন্যায়ের পক্ষে সাক্ষ্য-দানকারী হও। কোন সম্প্রদায়ের প্রতি শত্রুতা যেন অন্যায়ের প্রতি তোমাদের প্ররোচিত না করে। সুবিচার করো; (কারণ) সেটাই হলো তাকওয়ার অধিকতর নিকটবর্তী। আর তোমরা আল্লাহকে ভয় করো। নিঃসন্দেহে আল্লাহ তোমাদের কৃতকর্ম সম্পর্কে সম্যক অবগত। (আল-মাইদাহ, ৫ : ৮)

إِنَّ ٱللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تُؤَدُّوا۟ ٱلْأَمَٰنَٰتِ إِلَىٰٓ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُم بَيْنَ ٱلنَّاسِ أَن تَحْكُمُوا۟
بِٱلْعَدْلِ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُم بِهِۦٓ ۗ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ سَمِيعًۢا بَصِيرًا ﴿٥٨﴾

অবশ্যই আল্লাহ তোমাদের আদেশ দিচ্ছেন যে, আমানতগুলো তার অধিকারীর কাছে অর্পণ করবে। আর যখন মানুষের মধ্যে বিচার করবে তখন ইনছাফের সঙ্গে বিচার করবে। আল্লাহ কতই না উত্তম উপদেশ তোমাদের দিচ্ছেন! আল্লাহ তো সর্বশ্রোতা, সর্বদ্রষ্টা। (আন-নিসা, ৪ : ৫৮)

وَلَا تَقْرَبُوا۟ مَالَ ٱلْيَتِيمِ إِلَّا بِٱلَّتِى هِىَ أَحْسَنُ حَتَّىٰ يَبْلُغَ أَشُدَّهُۥ ۖ وَأَوْفُوا۟ ٱلْكَيْلَ
وَٱلْمِيزَانَ بِٱلْقِسْطِ ۖ لَا نُكَلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا ۖ وَإِذَا قُلْتُمْ فَٱعْدِلُوا۟ وَلَوْ كَانَ ذَا
قُرْبَىٰ ۖ وَبِعَهْدِ ٱللَّهِ أَوْفُوا۟ ۚ ذَٰلِكُمْ وَصَّىٰكُم بِهِۦ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴿١٥٢﴾

আর কখনো তোমরা এতীমের মালের কাছেও যেয়ো না, তবে উত্তম পন্থায়, যতক্ষণ না সে প্রাপ্তবয়স্ক হয়। আর মাপ ও পরিমাপ ন্যায়ভাবে পূর্ণ করো। কোন মানুষকে আমি তার সাধ্যের অধিক কষ্ট দেই না। আর যখন তোমরা কোন কথা বলবে তখন ইনছাফ রক্ষা করো, যদিও তা আত্মীয়ের বিপক্ষে যায়। আর তোমরা আল্লাহর সঙ্গে কৃত ওয়াদা পূর্ণ করো। এই সব বিষয়ে তিনি তোমাদের উপদেশ দিচ্ছেন, যাতে তোমরা সতর্কতা অবলম্বন করো। (আল-আন'আম, ৬ : ১৫২)

প্রাচ্যের মুসলিম জাতি তাদের এই ধর্ম-বিধানের প্রতি কতটা অনুগত ছিলো তার প্রমাণ ইতিহাসের পাতায় ভরপুর। এখানে আমরা শুধু ভারতবর্ষের ইতিহাস থেকে একটিমাত্র ঘটনা উল্লেখ করছি। ইংরেজ-রাজত্বের শুরুর দিকে মুজাফফর-নগর জেলার কসবা কান্ধলায় একটি ভূমি নিয়ে হিন্দু-মুসলিম বিরোধ দেখা দেয়। হিন্দুদের কথা, এটি দেবসম্পত্তি, মুসলমানদের দাবী, এটি মসজিদের জমি। ইংরেজ ম্যাজিস্ট্রেট উভয়পক্ষের যুক্তি-প্রমাণ শুনে দ্বিধায় পড়ে গেলেন। তখন তিনি মুসলিমপক্ষকে একান্তে জিজ্ঞাসা করলেন, এমন কোন হিন্দু সাধু কি আছেন যার সততা ও সত্যবাদিতার উপর আপনাদের আস্থা আছে, যার সাক্ষ্যের ভিত্তিতে ফায়ছালা হতে পারে? তারা বললেন, এমন কেউ নেই।

একই প্রশ্নের উত্তরে হিন্দুরা বললো, রাজবাহাদুর, এ তো বড় কঠিন পরীক্ষা! বিষয়টিও ব্যক্তিগত নয়, জাতিগত। তবে একজন আছেন যিনি কখনো মিথ্যা বলেন না। হয়ত এক্ষেত্রেও তিনি সত্যই বলবেন।

হিন্দুরা যার কথা বলছিলো, তিনি (সাইয়েদ আহমদ শহীদ রহ.-এর খলীফা হযরত শাহ আব্দুল আযীয দেহলবী রহ.-এর ছাত্র) মুফতি এলাহী বখশ রহ.-এর খান্দানের কোন বুযুর্গ। ইংরেজ ম্যাজিস্ট্রেট তাঁকে আদালতে ডেকে পাঠালেন, আর তিনি বললেন, আমি কসম করেছি, বেঁচে থাকতে কোন ফিরিঙ্গির চেহারা দেখবো না।

এমন ইংরেজও ছিলো যারা এমন কথাও হাসিমুখে গ্রহণ করতো। তিনি বলে পাঠালেন, ঠিক আছে, ন্যায়বিচারের স্বার্থে তবু আপনি আসুন।

তিনি আদালতে হাযির হলেন এবং 'ফিরিঙ্গি'র দিকে পিঠ দিয়ে দাঁড়ালেন। হিন্দু-মুসলিম উভয়পক্ষ তাঁর দিকে তাকিয়ে, আর বিচারক তাঁর বক্তব্য শোনার জন্য উৎকর্ণ। কারণ তাঁরই কথায় একটি গুরুতর সাম্প্রদায়িক বিবাদের ফায়ছালা হবে।

তিনি বললেন, 'সত্য কথা বলতেই হবে। জমি মন্দিরের, মসজিদের নয়।'

আদালতের ফায়ছালায় মুসলমানদের পরাজয় হলো, কিন্তু নৈতিক বিজয় হলো ইসলামের। ইসলামী শিক্ষার একটিমাত্র অভিপ্রকাশে ছোট্ট একখণ্ড ভূমি যদিও হাতছাড়া হলো, কিন্তু বহু হৃদয় বিজিত হলো এবং সেদিনই অনেকে ইসলাম গ্রহণ করলো।

বিবেকের মত জ্ঞান ও প্রজ্ঞাও ছিলো তাদের কাছে আল্লাহর আমানত, যা কোন মূল্যেই বাজারে পণ্যের মত বিক্রি হতে পারে না। এক্ষেত্রে যারা উচ্চস্তরের তারা তো এটাও বরদাশত করতেন না যে, অন্যায়ের পক্ষে প্রত্যক্ষ-পরোক্ষ কোনভাবে তাদের জ্ঞান ও মেধা ব্যবহৃত হবে, কিংবা কোন যালিম শাসক ও ইসলাম-দুশমন হুকুমতের কাজে লাগবে। তাদের কাছে এটা ছিলো আসমানি আমানতের সঙ্গিন খেয়ানত।

এক্ষেত্রেও ইতিহাস থেকে আমরা শুধু একটি ঘটনা বলবো। শায়খ আব্দুর-রহীম রামপুরী রহ. দেশীয় মুসলিম রাজ্যের পক্ষ হতে মাত্র দশটাকা মাসোহারায় শিক্ষক ছিলেন। এসময় রোহিলাখণ্ডের ইংরেজ শাসক মিস্টার হকিন্স তাঁকে বেরেলী কলেজে আড়াইশ টাকা বেতনে শিক্ষকতার প্রস্তাব দিলেন এবং দ্রুত পদোন্নতি ও বেতনবৃদ্ধির প্রতিশ্রুতি দিলেন। সাতান্নপূর্ব ভারতের আড়াইশ টাকা বর্তমানে কত হয় ভাবুন!

শায়খ বললেন, তাহলে যে আমার দশটাকা ভাতা বন্ধ হয়ে যাবে! মিস্টার হকিন্স হতচকিত হয়ে বললেন, আজিব মানুষ! আড়াই শ টাকার বদলে দশটাকার আফসোস!

শায়খ তখন বললেন, তাছাড়া আমার বাড়ীতে একটি বরই গাছ আছে, যার বরই আমার খুব প্রিয়। বেরেলীতে তা পাবো কোথায়?

বেচারা ইংরেজ যে কোন উপায়ে শায়খের সেবা পেতে আগ্রহী ছিলেন। তিনি বললেন, আচ্ছা, সে ব্যবস্থা আমি করবো।

শায়খ তখন বললেন, আরেকটা সমস্যা আরেকটু গম্ভীর। রামপুরে যারা আমার কাছে পড়ে, আমি চলে গেলে তাদের পড়া বন্ধ হয়ে যাবে। মিস্টার হকিন্স তখনো হাল ছাড়তে রাজী নন, তিনি বললেন, তাদের জন্য বৃত্তি মঞ্জুর করা হবে, যাতে তারা আপনার কাছে পড়া অব্যাহত রাখতে পারে।

শায়খ তখন তাঁর তূণীরের শেষ তীরটি ছুঁড়লেন যার কোন জবাব ইংরেজ-পুত্রের কাছে ছিলো না। তিনি বললেন, সব ঠিক আছে। কিন্তু আগামীকাল আল্লাহ যখন

জিজ্ঞাসা করবেন, বেশী মূল্যে ইলম বিক্রি করেছো, তখন কী জবাব দেবো?!

বিজয়ী জাতির শাসক অবশেষে মুসলিম আলিমের অনুভূতি বুঝতে পেরে অভিভূত ও শ্রদ্ধাবনত হলেন। এদিকে শায়খ সেই দশটাকা মাসোহারায় সারা জীবন কাটিয়ে দিলেন। আল্লাহ তাঁকে করুণা করুন, আর আমাদের চলার পথ আলোকিত করুন, আমীন।

এই সমুচ্চ নীতি ও নৈতিকতার তুলনা করুন বর্তমান যুগের জ্ঞান-বাণিজ্যের সঙ্গে। জ্ঞানজীবী ও বুদ্ধিজীবীরা তাদের জ্ঞান-বুদ্ধিকে এখন রীতিমত নিলামে তুলে দিয়েছেন। সর্বোচ্চ দরে বিক্রি হয় তাদের জ্ঞান ও বুদ্ধির পণ্য, ক্রেতা যেই হোক এবং তার পরিচয় যাই হোক। আকীদা, বিশ্বাস, উদ্দেশ্য ও ফল, এমনকি রুচি ও মানসিকতার বিষয়টিও এখন গৌণ: মূল্যই হচ্ছে মূল বিষয়। এক্ষেত্রে নিত্যনতুন এমন সব ঘটনার জন্ম হচ্ছে যা একদিকে হাসির খোরাক যোগায়, অন্যদিকে চোখে পানি আনে। কোন ইসলামী শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান যদি একশ দেয়, আর কোন মিশনারি প্রতিষ্ঠান দেয় দেড়শ, নির্দ্বিধায় একজন শিক্ষক প্রথমটি ছেড়ে দ্বিতীয়টিতে চলে যাবেন। এমন ঘটনাও আছে যে, শিক্ষাবিভাগে গুরুত্বপূর্ণ পদে কর্মরত শিক্ষিত যুবক, যার ঐ বিভাগে সৃজনশীল কাজ করার যথেষ্ট সুযোগ-সম্ভাবনা ছিলো, হঠাৎ তিনি পুলিশে বা কাস্টমসে বদলি হয়ে গেছেন। জিজ্ঞাসা করলাম, কেন জীবনের এই হঠাৎ মোড় পরিবর্তন? তার সরল স্বীকারোক্তি, 'এখানে পয়সা বেশী।'

আরেকজন স্কলার ইসলামী তাছাওউফের উপর গবেষণাপত্র লিখে সুখ্যাতি অর্জন করেছেন। হঠাৎ শুনি, তিনি পররাষ্ট্রমন্ত্রণালয়ে যোগ দিয়েছেন; সেখান থেকে আবার চলে গেছেন দোভাষীর কাজে কোন ইউরোপীয় দেশে। উদ্দেশ্য, অধিকতর সুবিধা অর্জন। সুবিধাই যেন জীবন; অর্থই যেন পূজ্য। হৃদয় ও আত্মার উপর এবং জ্ঞান-গবেষণা ও বুদ্ধিবৃত্তির উপর মুদ্রা ও স্বর্ণমুদ্রারই এখন একচ্ছত্র প্রভাব।

ইতিহাসে আমরা পড়েছি, প্রসিদ্ধ আব্বাসী খলীফা আলমানছূর একবার কিছু লেখার জন্য মজলিসে উপস্থিত ইবনে তাউসকে কালির দোয়াত এগিয়ে দিতে অনুরোধ করলেন, কিন্তু ইবনে তাউস বিরত থাকলেন। ক্ষুব্ধ খলীফা 'আমীরুল মুমিনীন'-এর হুকুম না মানার কারণ জানতে চাইলেন। ইবনে তাউস বললেন, আমার আশঙ্কা, এ কালি দিয়ে কোন না-হক ফরমান লেখা হবে, আর আমিও তাতে শামিল হয়ে যাবো।

এমনই চূড়ান্ত স্তরে ছিলো এই কোরআনি আদেশের উপর তাঁদের আমল–

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۖ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

'আর তোমরা পুণ্যকর্ম ও ধার্মিকতায় পরস্পর সহযোগিতা করো, পাপ ও সীমালঙ্ঘনে পরস্পর সহযোগিতা করো না। আর আল্লাহকে ভয় করো, অবশ্যই আল্লাহ কঠিন শাস্তিদানকারী।' (আল-মাইদাহ, ৫ : ২)

আর ইসলামের সোনালী যুগে তো এমন ঘটনা ছিলো প্রচুর ও নিশ্চিত সনদে বর্ণিত যে, ওলামায়ে উম্মত শত প্রলোভন ও ভীতিপ্রদর্শনের মুখেও ঐ শাসকের অধীনে বিচারক হতেও রাজী হননি যার নীতি ও কর্মনীতির প্রতি তিনি আশ্বস্ত নন।

অন্যায়কর্মে কোন প্রকার সহযোগিতা করা, অস্বচ্ছ প্রশাসনের অধীনে কোন পদ গ্রহণ করা এবং মুসলিম উম্মাহর স্বার্থবিরোধী কোন কাজে কোনভাবে সংশ্লিষ্ট হওয়া দূরের কথা, এসবের স্পর্শ থেকেও বেঁচে থাকার এই যে সর্বাত্মক সতর্ক প্রচেষ্টা, এর সঙ্গে এখনকার মুসলিমদের তুলনা করুন, যারা ইউরোপের বিভিন্ন সরকারের পক্ষে কাজ করছে; সামান্য পয়সায় যাদের মেধা, প্রজ্ঞা, বুদ্ধিবৃত্তি ও লেখনী অমুসলিমদেশের স্বার্থ ও উদ্দেশ্যের অনুকূলে, এমনকি ক্ষেত্রবিশেষে মুসলিম স্বার্থের প্রতিকূলে ব্যবহৃত হচ্ছে। তুলনা করুন এবং বিচার করুন, কোথায় ছিলাম, কোথায় নেমে এসেছি!

মুসলিমবিশ্বের বহু যুবক ও প্রতিষ্ঠিত লেখক বিভিন্ন দেশের ও দূতাবাসের পক্ষ হতে স্থানীয় ভাষায় প্রকাশিত পত্র-পত্রিকায় কাজ করে, যার উদ্দেশ্যই হচ্ছে মুসলিমদেশে নিজেদের স্বার্থ রক্ষা করা এবং মুসলিম চিন্তা-চেতনা ও মন-মানসে প্রভাব বিস্তার করা। ভাড়াটে মুসলিম লেখক-বুদ্ধিজীবীদের দিয়েই তারা মুসলিম-বিশ্বে তথ্যবিকৃতি ও মিথ্যাপ্রচারণার কাজটা করে থাকে। বুদ্ধিজীবী মহোদয় কি বুঝতে পারেন যে, এখানেও আসলে তিনি নিজের মুসলিম-পরিচয়টিরই সুবিধা ভোগ করছেন!

আরববিশ্বে এমন বহু বিদগ্ধ পণ্ডিত আছেন যারা অভিজাত ও ঐতিহ্যবাহী আরব পরিবারে জন্মগ্রহণ করেছেন; ইসলাম ও মুসলিম উম্মাহর জন্য ঐসব পরিবারের বিরাট ত্যাগ ও কোরবানি রয়েছে। তাদের পদবীও ঐ রক্তের উত্তরাধিকার প্রমাণ

করছে, কিন্তু তারা আজ ইউরোপের বিভিন্ন সরকারের অধীনে তাদেরই স্বার্থের প্রতিনিধি হয়ে কাজ করছেন। কালামুল্লাহ-এর আরবীভাষা আজ ব্যবহৃত হচ্ছে অমুসলিমদের স্বার্থ-সেবায়, যে ভাষায় মুসলিম উম্মাহর প্রতিনিধিগণ একসময় রোম ও পারস্যের রাজদরবারে নির্ভীকচিত্তে কথা বলেছেন এবং ভীতি ও সমীহ আদায় করেছেন। যে ভাষায় ইতিহাসে অমর মুসলিম সেনাপতিগণ জিহাদের অনলবর্ষী ভাষণ দিয়েছেন; যে মহান ভাষা শুধু ইসলামী শৌর্য-বীর্য প্রকাশেরই উপযোগী এবং যে অলঙ্কারসমৃদ্ধ বাগ্মিতা শুধু জিহাদের ঘোষণা ও সত্যের বার্তা প্রচারের জন্যই 'শোভনীয়', তা আজ ব্যবহৃত হচ্ছে অমুসলিম সরকারগুলোর প্রচার-প্রচারণার কাজে, যারা মুসলিম উম্মাহকে নিয়ে এমনই খেলছে, যেমন খেলে খেলোয়াড় পায়ের বল নিয়ে; যারা মুসলিম বিশ্বের ঈমান ও বিশ্বাস, চিন্তা-চেতনা ও বুদ্ধিবৃত্তি, স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্ব এবং সম্পদ ও অর্থনীতির সর্বনাশ সাধনে সদাতৎপর।

আরো লজ্জাকর বিষয়, এ জ্ঞানপাপীরা এই বলে আত্মপক্ষ সমর্থন করে থাকেন, 'অমুসলিম হলেও ওরা আরব ও মুসলিম উম্মাহর প্রতি আন্তরিক। আমাদের কল্যাণে ওরা নিঃস্বার্থভাবে কাজ করে যাচ্ছে।'

আরো বলতে শোনা যায়, 'বিবিসি'র বিশাল সম্প্রচার কার্যক্রমের উদ্দেশ্য হচ্ছে আরব-জাগরণ, আরবসংহতি এবং আরববিশ্বের চিন্তানৈতিক ও সাংস্কৃতিক উন্নয়ন। আরো উদ্দেশ্য হচ্ছে মুসলিম উম্মাহকে তাদের গৌরবময় ইতিহাস ও সমৃদ্ধ সভ্যতার সঙ্গে পরিচিত করা এবং সততা, সত্যতা ও পরিচ্ছন্নতার সঙ্গে বর্তমান বিশ্ব-পরিস্থিতির বাস্তবতা তাদের সামনে তুলে ধরা।'[১]

দীর্ঘদিন থেকেই তাদের এ বক্তব্য আমরা শুনে আসছি যে, ওরা বিশুদ্ধ গণতন্ত্রে বিশ্বাসী এবং বিশ্বের শান্তি ও নিরাপত্তাবিধানে তৎপর, সর্বোপরি দুর্বল জাতি ও রাষ্ট্রবর্গের স্বাধীনতা ও অর্থনৈতিক স্বনির্ভরতা নিশ্চিত করার বিষয়ে আন্তরিক-

---

[১] বিবিসিসহ ইহুদিনিয়ন্ত্রিত বিশ্বপ্রচারমাধ্যমের মুখ ও মুখোশ এতদিনেও যদি কেউ বুঝতে না পেরে থাকে, অন্তত সাম্প্রতিক কালে 'আরববসন্ত' নামে যে খেলা তারা খেলছে তাতে তো নির্বোধ শিশুও সব বুঝতে পারার কথা! সজ্ঞানে সচেতনভাবে তারা মিথ্যা প্রচার করে, যখন উদ্দেশ্য সাধিত হয়ে যায়, সততা ও বস্তুনিষ্ঠতার মুখোশ পরার জন্য, খবরটি ভুল ছিলো বলে দুঃখ প্রকাশ করে। তাদের খবরের কারিশমায় এই তো সেদিন শাপলাচত্বরে হাজার মানুষের উপস্থিতি হয়ে গেলো লক্ষজনতার মহাসমাবেশ! পরে যথারীতি ক্ষমাপ্রার্থনা। মিশরে মুসলিম ভ্রাতৃসঙ্ঘের দশলক্ষ জনতার বিক্ষোভ তাদের চোখে পড়ে না, চোখে পড়ে সামরিক জান্তার পক্ষে হাজার মানুষের বিক্ষোভ, তারপরো বিশ্বপ্রচার মাধ্যম গণতন্ত্রের বন্ধু!
–অনুবাদক

ভাবে সচেষ্ট। ন্যায় ও সাম্যের পতাকা সমুন্নত রাখা এবং যালিমের বিরুদ্ধে মযলুমের পক্ষাবলম্বন করাই হচ্ছে তাদের লক্ষ্য ...'

এখন কথা হলো, তারা যা বলছেন, তাতে যদি তাদের বিবেকের সায় না থাকে বরং তাদের যদি জানা থাকে যে, এসব শব্দ যথাপাত্রে প্রযুক্ত নয়, বরং শুধু অর্থ ও স্বার্থের কালিমা আড়াল করার হীন উদ্দেশ্যে উচ্চারিত তাহলে তো বলতে হয়, মহৎ প্রাণের একি অধঃপতন! মহামূল্য পণ্যের একি দরপতন! আরবের হাতে আরবী ভাষার একি লাঞ্ছনা!

আর যদি পূর্ণ বিশ্বাস ও উপলব্ধি হতে বলে থাকেন তাহলে বলতে হয়, সত্য ও বাস্তবতা সম্পর্কে একি অজ্ঞতা! বোধ ও বুদ্ধির একি ভ্রষ্টতা! হৃদয় ও আত্মার একি অপমৃত্যু!

আধুনিক বুদ্ধিবৃত্তির যুগ যেন আগাগোড়া স্ববিরোধিতার যুগ। তাই দেখা যায়, কোন লেখক-সাংবাদিক হয়ত আজ মুসলিম উম্মাহর কোন বীর মুজাহিদ ও বরণীয় ব্যক্তি সম্পর্কে উদ্দীপনাপূর্ণ লেখা লিখছেন, কিন্তু লেখার কালি না শুকোতেই নিছক স্বার্থের খাতিরে মুসলিম উম্মাহর কোন দুশমন ও গাদ্দারের পক্ষে কলম ধরছেন!

পক্ষান্তরে প্রাচীন যুগের দৃশ্য দেখুন, এক আরব বাদশাহ জনৈক আরবকবির কাছে তার ঘোড়াটি চাইলেন, আর তিনি কোন মূল্যেই তা দিতে অস্বীকার করে কবিতা লিখলেন–

أبيت اللعن إن إسكاب علق　　　　نفيس لا تعار ولا تباع

'আপনি শাপমুক্ত থাকুন, আমার ঘোড়া 'সিকাব' তো এমন মূল্যবান সম্পদ যা না ধারে দেয়া যায়, না বিক্রিতে।'

কিন্তু এ যুগে যারা নিজেদের জ্ঞান, প্রজ্ঞা, মেধা, বুদ্ধি অমুসলিম দেশের বা তাদেদার মুসলিম সরকারের সেবায় নিয়োজিত রেখেছেন তাদের বিবেক যেন জাহেলী কবির ঘোড়ার চেয়েও সস্তা, যা ভাড়ায়ও খাটে, বিক্রিও হয়।

প্রাচ্যে সম্পর্ক ও বন্ধনের নিজস্ব গুণ ও **বৈশিষ্ট্য ছিলো**। এর ভিত্তি-বুনিয়াদ কখনো বস্তুগত লাভলোকসানের উপর হতো না, বরং ইখলাছ, আন্তরিকতা, আত্মিকতা ও আধ্যাত্মিকতার উপর হতো। প্রবৃত্তি ও আত্মস্বার্থের কালিমা তাতে খুব কমই থাকতো। এর ফলে সম্পর্ক ও বন্ধন এমন নিবিড় হতো এবং তার

শেকড় হৃদয় ও আত্মার এত গভীরে প্রোথিত হতো যার কোন বস্তুগত ব্যাখ্যা দেয়া সম্ভব নয়।

ছাত্র-শিক্ষক সম্পর্ক তো এমন ছিলো যার তুলনা এ যুগের পিতা-পুত্রেও পাওয়া যায় না, বললে অসঙ্গত হবে না। একটি ঘটনাই শুধু বলি, হিন্দুস্তানের সুপ্রসিদ্ধ আলিম দরসে নিযামীর প্রবর্তক মোল্লা নিযামুদ্দীনের মৃত্যু-সংবাদ শুনে তার ছাত্র সৈয়দ কামালুদ্দীন আযীমাবাদী শোকাঘাতে মৃত্যুবরণ করলেন, আর অন্য ছাত্র সৈয়দ যরীফ আযীমাবাদী কাঁদতে কাঁদতে অন্ধ হয়ে গেলেন। পরে জানা গেলো, উস্তাদের মৃত্যুসংবাদ ছিলো ভুল। হয়ত এ যুগের মনমানস এমন ঘটনার সত্যতা হযম করতে চাইবে না, কিন্তু যিনি প্রাচ্যের স্বভাব ও মানসিকতা সম্পর্কে জ্ঞাত এবং উস্তাদ-ছাত্রের মুহব্বত সম্পর্কে অবগত তার জন্য এখানে অবাক হওয়ার কিছু নেই।

নৈতিকতার ইতিহাস ও দর্শন সম্পর্কে ওয়াকিফহালমাত্রই জানেন, খৃস্টপূর্ব চতুর্থ শতকে ইউরোপে একটি চিন্তাধারা আত্মপ্রকাশ করেছিলো এবং খৃস্টীয় উনিশ-শতক পর্যন্ত নেতৃস্থানীয় বহু দার্শনিক ও নীতিশাস্ত্রবিদ এ চিন্তাধারার সমর্থক ছিলেন। 'দেহ-সুখ'ই ছিলো তাদের বিশ্বাসের মূল কথা। তারা মনে করতেন, দেহের আনন্দ ও জৈবিক সুখই হচ্ছে সকল কর্ম ও চরিত্রের মানদণ্ড। তারা বলতেন, 'ইহ জীবনকে ভোগ করার সব সুবিধা লুফে নাও; সময়ের ছিটকে পড়া মুহূর্তগুলো হাতছাড়া করো না।'

এ চিন্তাধারা আবার দু'টি উপধারায় ভাগ হয়ে যায়। প্রথমটিকে বলা হতো আত্মস্বার্থবাদী, তাদের বক্তব্য ছিলো, 'মানুষ ও তার প্রবৃত্তির মধ্যে কোন আড়াল ও প্রতিবন্ধক যেন না থাকে, যাতে প্রবৃত্তির যে কোন চাহিদা 'চাহিবামাত্র' সে পূরণ করতে পারে এবং সুখ ও আনন্দের সর্বোচ্চ মাত্রা ভোগ করতে পারে।' তাদের শেষ কথা ছিলো, 'সুখ মানে প্রবৃত্তির যে কোন চাহিদা চরিতার্থ করা এবং জীবনের স্বাদ ও সাধ দু'হাতে কুড়িয়ে নেয়া।'

দ্বিতীয়টিকে বলা হতো, স্বার্থবাদী। তাদের বক্তব্য ছিলো, 'এমন সুযোগ-সুবিধা সৃষ্টি করা যাতে সর্বোচ্চসংখ্যক ব্যক্তি সর্বোচ্চ পরিমাণ স্বাদ ও আনন্দ ভোগ করতে পারে।' তাদের মতে নৈতিক কর্মকাণ্ডের কোনই মূল্য নেই, যদি না তা স্বজাতির গরিষ্ঠসংখ্যক মানুষের জন্য আনন্দবিধানে সক্ষম হয়। তারা বলেন, 'সুখ মানে কর্মযোগে মানুষের জন্য যাবতীয় স্বাদ ও আনন্দ নিশ্চিত করা এবং যাবতীয় দুঃখ-ব্যথা দূর করা।'

বলাবাহুল্য, নীতিশাস্ত্রীয় এই দর্শন ও চিন্তাধারার মূল চেতনাই হলো বস্তুবাদিতা, যা প্রাচ্যের স্বভাব, প্রকৃতি ও ঐশী বিধান থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন। পক্ষান্তরে পাশ্চাত্যের দর্শন, চরিত্র, সাহিত্য, সভ্যতা– সর্বত্র তা গভীর প্রভাব বিস্তার করে আছে।

পাশ্চাত্যের নীতিশাস্ত্রবিদগণ বলে আসছেন, 'লাভ ও আনন্দলাভই নৈতিকতার মূল', কিন্তু তা নির্ধারণের ক্ষেত্রে সর্বদা তারা বস্তুবাদিতার দিকে ঝুঁকে পড়েন। কারণ নিজেদের বুদ্ধি ও যুক্তিকেই তারা মাপকাঠিরূপে গ্রহণ করেছেন, আর দুঃখজনকভাবে শুরু থেকেই তা বস্তুবাদের খাতে প্রবাহিত হচ্ছে। ফলে কোন প্রকার বস্তু-উর্ধ্ব লাভ বা উপকার কল্পনা করতেও তাদের বুদ্ধি ও চিন্তাশক্তি সক্ষম ছিলো না। এভাবে এমন এক নীতিশাস্ত্র ও নৈতিক দর্শন অস্তিত্ব লাভ করেছে যা ঐসব কোন বিষয় আলোচনায় আনতে প্রস্তুত ছিলো না, যেগুলোর স্থূল ও ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য লাভ বা উপকার নেই।

এই বস্তুতান্ত্রিক চেতনা ধীরে ধীরে জীবনের সর্ব-অঙ্গনে বিস্তার লাভ করেছিলো। ফলে, পাশ্চাত্যের চিন্তা-বুদ্ধি বস্তুবাদ ও ভোগবাদের সবচে' বড় উকীলরূপে আত্মপ্রকাশ করেছিলো। তাই চরিত্র ও নৈতিকতা যে পরিমাণ বস্তুগত উপকার বয়ে আনতো, সমাজ ও ব্যক্তিবর্গ তা দ্বারা যে পরিমাণ সুখ, স্বাদ, আনন্দ ও সচ্ছলতা লাভ করতো চিন্তা ও বুদ্ধির কাছে তা সেই পরিমাণে উত্তমতার সনদ লাভ করতো। এককথায় বস্তুগত লাভই হয়ে দাঁড়িয়েছিলো চরিত্র ও নৈতিকতার মানদণ্ড এবং ভালো-মন্দের মধ্যে পার্থক্য নির্ধারণকারী। বস্তুর মানদণ্ডে যে চরিত্র ও নৈতিকতার কোন মূল্য নেই, প্রাচীন পরিভাষায় তার ধর্মীয় মূল্যই শুধু অবশিষ্ট ছিলো, পক্ষান্তরে হৃদয় ও মস্তিষ্কের উপর তার প্রভাব ও নিয়ন্ত্রণ দিন দিন কমেই আসছিলো এবং নীতিবাদী ও চরিত্রবাদী মানুষ বিলুপ্তপ্রায় হয়ে অতীতের স্মৃতিরূপেই শুধু অস্তিত্ব বজায় রাখছিলো। যেমন সন্তানের প্রতি পিতা-মাতার স্নেহ-মমতা, স্বামী-স্ত্রীর পারস্পরিক বিশ্বাস। এসকল নৈতিকতা ও মূল্যবোধের স্থান দখল করে নিয়েছিলো শিল্পশক্তি, উদ্ভাবন ও উৎপাদন এবং স্বদেশবাদ ও জাতীয়তাবাদ। এগুলোর মূল্য ও গুরুত্ব এবং ধার ও ভার উত্তরোত্তর বেড়েই চলেছিলো।

পরিস্থিতি এ পর্যায়ে এসে দাঁড়িয়েছে যে, আধুনিক সমাজ পারিবারিক বন্ধন, রক্তসম্পর্ক ও নৈতিক বিধিবিধানের কোন প্রয়োজনীয়তাই আর অনুভব করছে না। কারণ রাজনৈতিক, শিল্পনৈতিক ও অর্থনৈতিক রূপরেখার ভিত্তিতে বিকল্প

কিছু সামাজিক বিন্যাস ও গণব্যবস্থা সে উদ্ভাবন করে নিয়েছে। সুতরাং সমাজের এ নিয়ে কোন মাথাব্যথা নেই যে, সন্তান পিতা-মাতার সঙ্গে বা স্বামী-স্ত্রী পরস্পরের প্রতি কী আচরণ করছে, যদি তারা সেই নাগরিক সীমারেখা মেনে চলে যা সমাজ তার সদস্যদের জন্য নির্ধারণ করে দিয়েছে। তদ্রূপ যদি কারো কোন আচরণ সমাজে গোলযোগ সৃষ্টি না করে এবং নির্ধারিত বিধিব্যবস্থার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ না করে এবং নাগরিকতার গতি ব্যাহত না হয় তাহলে সন্তান পিতার অবাধ্য হওয়া, স্বামী-স্ত্রীর পারস্পরিক বিশ্বাস রক্ষা না করা, বা পাপাচারে লিপ্ত হওয়া, এগুলো সমাজের কোন সমস্যা নয়।

পাশ্চাত্যের সভ্যতা ও সাহিত্যে বিগত শতাব্দীগুলোতে যে ক'টি শব্দের ব্যবহার সবচে' বেশী হয়েছে এবং যেগুলোর মধ্যে ইউরোপ এখনো সবচে' আকর্ষণ অনুভব করে সেগুলোর মধ্যে একটি হলো স্বভাব ও ফিতরত। তবে যেসব ক্ষেত্রে তা ব্যবহৃত হয় তাতে পরিষ্কার বোঝা যায় যে, ফিতরত ও স্বভাব দ্বারা উদ্দেশ্য হলো পশুগত স্বভাব, যা সর্বপ্রকার সূক্ষ্ম-কোমল অনুভূতি, বিবেক ও নৈতিকতা এবং বিশুদ্ধ হৃদয় ও বিশুদ্ধ মস্তিষ্ক থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত এবং যা যে কোন বন্ধন ও সীমারেখাকে ভয় করে। এই পশুগত স্বভাবের একটাই শুধু দাবী, পানাহার করো, ভোগ করো এবং মুক্ত থাকো। অধিকার ও মানবিক দায়দায়িত্ব বলতে কোন কিছুর অস্তিত্ব তার কাছে নেই। উনিশশতকে মানুষের উৎপত্তি সম্পর্কে যে গবেষণা হয়েছে এবং যার অভ্রান্ততা সাধারণভাবে মেনে নেয়া হয়েছে, (অর্থাৎ ডারউইনের ভ্রান্ত বিবর্তনবাদ) তা জীবনের সর্বক্ষেত্রে প্রভাব বিস্তার করেছে এবং চরিত্র ও নৈতিকতার উপর ব্যাপকভাবে তার অনুভূত ও অননুভূত চাপ ও ছাপ পড়েছে।

পরবর্তীকালে ইউরোপে শুরু হয় যন্ত্রযুগ। তখন মানুষ সম্পর্কে মানুষের চিন্তা-ধারণা হয়ে গেলো সম্পূর্ণ বস্তুগত ও পদার্থগত। পশুগত ধারণায় মানুষের পরিচয়সত্তায় যে সামান্য প্রাণ ও সজীবতা ছিলো বস্তুগত ধারণায় তাও বিলুপ্ত হয়ে গেলো। ইউরোপিয়ান নও মুসলিম মুহম্মদ আসাদ ইউরোপের এই নৈতিক ও চারিত্রিক পরিবর্তন সম্পর্কে অত্যন্ত গভীর ও তাৎপর্যপূর্ণ মন্তব্য করেছেন। যদি প্রাচ্যের উপর পাশ্চাত্যের রাজনৈতিক ও মনস্তাত্ত্বিক আধিপত্য এভাবেই বহাল থাকে, আর স্বয়ং ইউরোপে বড় কোন বিপ্লব না আসে তাহলে আজ পাশ্চাত্য সম্পর্কে যা কিছু বলা হচ্ছে আগামীকাল প্রাচ্য সম্পর্কেও তা সঠিক বলে মনে হবে, যার আভাস এখনই দেখা যাচ্ছে। জীবনের সব অঙ্গনের মত প্রাচ্যের

নীতি ও নৈতিকতাও এখন পাশ্চাত্যের ছাঁচে গড়ে উঠছে। সমাজের যে সব শ্রেণী পাশ্চাত্যশিক্ষা ও সভ্যতা দ্বারা পুরোপুরি প্রভাবিত তাদের চরিত্র ও নৈতিকতা পাশ্চাত্যের চরিত্র-দর্শনের সর্বোত্তম প্রতিবিম্বরূপে এখনই পরিগণিত হতে পারে। মুহম্মদ আসাদ বলেন–

'(ইউরোপে) মানুষের এমন একটি শ্রেণী তৈরী হয়ে গেছে যাদের চরিত্র ও নৈতিকতা কার্যকর উপযোগবাদের প্রশ্নের ভিতরে ঘোরপাক খাচ্ছে। ফলে তাদের কাছে ভালো-মন্দের সর্বোচ্চ মাপকাঠি হয়ে পড়েছে বস্তুগত ও বৈষয়িক সফলতা।

পাশ্চাত্যের সামাজিক জীবন বর্তমানে যে গভীর পরিবর্তনের ভিতর দিয়ে যাচ্ছে তাতে নতুন চারিত্রিক উপযোগবাদ স্পষ্ট থেকে স্পষ্টতর হচ্ছে। সমাজের বস্তুগত উপকারের উপর সরাসরি প্রভাবক গুণসমূহ, যেমন শিল্পযোগ্যতা, স্বদেশপূজা ও জাতীয়তাবাদী আবেগ, এগুলোর মূল্য ও গুরুত্ব বৃদ্ধি পেয়ে চলেছে এবং তা অস্বাভাবিক অতিশয়তার সঙ্গে।

পক্ষান্তরে যে সমস্ত গুণের এখনো পর্যন্ত শুধু নৈতিক মূল্য ছিলো, যেমন পিতৃস্নেহ, দাম্পত্য বিশ্বস্ততা, তা খুব দ্রুত গুরুত্ব হারাতে চলেছে। কেননা সমাজে এগুলোর তেমন কোন বস্তুগত উপকার নেই। পারিবারিক বন্ধনের দৃঢ়তাকে পাশ্চাত্যে একসময় গোত্র ও পরিবারের কল্যাণের জন্য অপরিহার্য মনে করা হতো, কিন্তু এখন আধুনিক পাশ্চাত্যসমাজে তার স্থান গ্রহণ করে নিয়েছে নতুন সামাজিক বিন্যাস, মৌলিকভাবে যা শুধু শিল্পনির্ভর। এ বিন্যাস খুব দ্রুত নির্ভেজাল যান্ত্রিক রূপরেখার উপর প্রতিষ্ঠিত হচ্ছে। সেখানে পিতার সঙ্গে সন্তানের আচরণ কোন সামাজিক গুরুত্ব বহন করে না, যতক্ষণ না তা সমাজনির্ধারিত সভ্যতা-ভদ্রতার সাধারণ সীমারেখার ভিতরে থাকে। ফল এই দাঁড়িয়েছে যে, সন্তানের উপর পিতার ক্ষমতা এবং পিতার প্রতি সন্তানের শ্রদ্ধা ক্রমেই হ্রাস পাচ্ছে। অর্থাৎ পারস্পরিক সম্পর্ক দ্রুত নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে যাচ্ছে এবং কার্যত এমন একটি যান্ত্রিক সমাজ দ্বারা সেগুলো ধ্বংস করে দেয়া হচ্ছে যেখানে পারস্পরিক অধিকার রহিত করার প্রবণতা দেখা যায়, যার স্বাভাবিক ফল এই যে, পারিবারিক আত্মীয়তার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট অধিকারসমূহও শেষ হয়ে যাচ্ছে।[১]

---

[১] islam at the cross-road; the tragedy of europe

উদ্যমহীনতা ও আরামপ্রিয়তা

সে যুগে প্রাচ্যের মুসলিম সমাজে (বিশেষ করে শাসক ও অভিজাত সমাজে) উৎকর্ষ ও পূর্ণতা পরিমাপ করার মাপদণ্ড ছিলো অনেক উঁচুতে। কারণ তাদের জীবন ও চরিত্রে দ্বীন ও দুনিয়া, ইলম ও আমল এবং আধ্যাত্মিকতা ও কর্মোদ্যম এমনভাবে একত্র হয়েছিলো এবং (পার্থিব-অপার্থিব) 'উভমুখি' গুণ ও যোগ্যতার এমন আশ্চর্য সমাবেশ ঘটেছিলো যা এযুগের দুর্বলমনা ও স্থূলদৃষ্টির মানুষ কল্পনা করতেও অক্ষম। এখন তো বরং এগুলোকে এত বিপরীতমুখী ভাবা হয় যে, কারো জীবনে এগুলোর একত্রসমাবেশ যেন অসম্ভব; অথচ সেটাই ছিলো তখনকার মুসলিমসমাজের সাধারণ ও স্বাভাবিক চিত্র। ইচ্ছে করলে আমাদের আলোচনার ক্ষেত্র খুব সহজেই পুরো মুসলিম জাহান পর্যন্ত বিস্তৃত করা যায়। কিন্তু তার প্রয়োজন নেই। আসুন, আমরা শুধু হিন্দুস্তানের মুসলিম সুলতান, আমীর-উমরা, উযির ও শাসক-প্রশাসকদের জীবন ও কর্মের উপর একবার দৃষ্টিপাত করি। সেখানেও দ্বীন-দুনিয়া উভয় ক্ষেত্রে সুউচ্চ মনোবল, শাসন-প্রশাসনের সর্বব্যাপী কর্মব্যস্ততার মধ্যেও ইলমের সাধনা এবং আমল-ইবাদতের নিমগ্নতা, এককথায় শাহী লেবাসে দরবেশি যিন্দেগির এমন সব নমুনা দেখা যাবে যার নযীর মানবজাতির সাধারণ ইতিহাসে পাওয়া খুব সহজ নয়। মানব-চরিত্রের উন্নতি-উৎকর্ষ সম্পর্কে বর্তমান যুগের যে সঙ্কীর্ণ চিন্তা ও সীমাবদ্ধ ধারণা তাতে তো সেগুলো এখন বিশ্বাস করতেই কষ্ট হবে।

***

সুলতান শামসুদ্দীন ইলতুমিশ-এর সুবিশাল সাম্রাজ্য এবং তাঁর দিনরাতের ব্যস্ততা সম্পর্কে ইতিহাসের প্রত্যেক ছাত্রই কম বেশী জানেন। কিন্তু ভেবে দেখার বিষয় হলো, রাজ্যশাসনের সর্বমুখী চাহিদা ও প্রয়োজন এবং অসংখ্য যুদ্ধাভিযান তাঁর ধর্মকর্ম ও নিয়মিত আমল-ইবাদতে বিন্দুমাত্র বিঘ্ন ঘটাতে পারতো না। তাঁর সময়ের সর্বমান্য বুযুর্গ হযরত খাজা কুতবুদ্দীন বখতিয়ার কাকী রহ. অছিয়ত করেছিলেন, আমার জানাযা তিনি পড়াবেন, কখনো যার আছরের সুন্নত ও তাকবীরে উলা ফউত হয়নি। মউতের পর অছিয়তের ঘোষণা হলো, কিন্তু এমন কাউকে খুঁজে পাওয়া গেলো না, তখন বাধ্য হয়ে সুলতান ইলতুমিশ আগে বেড়ে জানাযা পড়ালেন।

সুলতান গিয়াসুদ্দীন বলবন, নাছেরুদ্দীন মাহমূদ, ফিরোয শাহ তুঘলক প্রমুখের ধর্মনিষ্ঠা ও আখেরাতমুখী জীবনের কথা কারোই অজানা নয়। গুজরাতের

শাসকবর্গ বিশেষভাবে দ্বীনদারি ও দুনিয়াদারি, তথা 'তাজ ও তাসবীহ' একত্রে ধারণের ক্ষেত্রে ছিলেন সর্বোত্তম উদাহরণ। মাহমূদ শাহ (প্রথম) এবং তাঁর সুযোগ্য পুত্র মুযাফ্ফর শাহ হালীম-এর জীবনচরিত হচ্ছে এ বক্তব্যের স্বপক্ষে অকাট্য প্রমাণ। ভারতবর্ষের শীর্ষস্থানীয় ঐতিহাসিক মাওলানা হাকীম সৈয়দ আব্দুল হাই রহ. মুযাফ্ফর শাহ হালীম-এর জীবনীপ্রসঙ্গে 'ইয়াদে আইয়াম' গ্রন্থে লিখেছেন–

'মাহমূদ শাহ-এর মৃত্যুর পর তাঁর সুযোগ্য পুত্র মুযাফ্ফর শাহ হালীম সিংহাসনে আরোহণ করেন। সত্যিকার অর্থেই তিনি ছিলেন 'আদর্শ পূর্বসূরীর আদর্শ উত্তরসূরী'। বিভিন্ন জ্ঞান ও শাস্ত্রে তিনি ছিলেন আল্লামা মুহম্মদ ইবনে মুহম্মদ এলায়েজির ছাত্র, পক্ষান্তরে হাদীছশাস্ত্র অধ্যয়ন করেছেন আল্লামা জামালুদ্দীন মুহম্মদ বিন ওমর বাহরক-এর নিকট। হিফযুল কোরআনের সৌভাগ্য অর্জন করেছেন যুববয়সে, যে সম্পর্কে শেখ সা'দী রহ. যথার্থই বলেছেন, 'তুমি তো জানো জোয়ানি কী অসাধ্য সাধন করে!'

এই অতুলনীয় জ্ঞানবৈদগ্ধের সঙ্গে তাকওয়া ও আযীমত-এর আল্লাহপ্রদত্ত মহাসম্পদও তিনি লাভ করেছিলেন। তাঁর সারাজীবনের আমল ছিলো (কোরআন ও) সুন্নাহর উপর। অযু-অবস্থায় থাকা এবং বা-জামাত নামায আদায় করা, এটা ছিলো তাঁর সারা জীবনের আমল। প্রাপ্তবয়স্কতার কাছাকাছি আসার পর থেকে কখনো রোযা তরক করেননি। রাজা-বাদশাহর জীবনে নিত্যসঙ্গী হলো সুর ও সুরা, এটা নাকি দোষের কিছু নয়। কিন্তু তিনি না এর কাছে গিয়েছেন, না কাছে আসতে দিয়েছেন।

কখনো কারো প্রতি অযথা কঠোর আচরণ করেননি। অশোভন শব্দ দ্বারা কখনো জিহ্বা কলুষিত করেননি। আরো আশ্চর্যের বিষয়, যিনি ছিলেন ধার্মিকতা ও পবিত্রতার এমন প্রতিমূর্তি, একই সঙ্গে তিনি আদর্শ সৈনিক ও আদর্শ শাসকও ছিলেন। 'মালব'-এর বিজয়াভিযানের ঘটনা পড়ুন এবং তা থেকে তাঁর চারিত্রিক মহত্ত্ব ও সমরকুশলতা অনুধাবন করুন।

মালব-এর শাসক মাহমূদ শাহ-এর উদাসীনতা ও অব্যবস্থার সুযোগ নিয়ে মন্ত্রী মনসেলি রায় যখন তাকে উৎখাত করে ক্ষমতা দখল করে নিলেন এবং ইসলামের যাবতীয় নিশান ও বিধান মুছে ফেলে শিরক-কুফুরির প্রসার ঘটাতে লাগলেন তখন মুযাফ্ফর শাহ হালীম রহ. এর ঈমানি গায়রত উদ্দীপ্ত হলো।

তিনি এক অজেয় বাহিনী নিয়ে অভিযানে বের হলেন এবং দীর্ঘ পথ অতিক্রম করে মান্ডো অবরোধ করলেন।

একা প্রতিরোধ করা সম্ভব নয়, বুঝতে পেরে মন্‌দেলি রায় মহামূল্যবান রাজ-উপঢৌকনের প্রলোভন দিয়ে রানাসঙ্গকে সাহায্যের আবেদন জানালেন। কিন্তু রানাসঙ্গ সারেঙ্গপুর পর্যন্ত না পৌঁছতেই বিচক্ষণ সুলতান তার বিহিত ব্যবস্থা করার জন্য বাহিনীর একটি বড় অংশ অগ্রে প্রেরণ করলেন। ফলে রানাসঙ্গের সামনে বাড়ার সাহস হলো না। এদিকে মন্‌দেলি রায়-এর নিকট চারপাশ থেকে সাহায্য এসে পৌঁছার আগেই সুলতান চূড়ান্ত আঘাত হেনে দুর্গ জয় করে নিলেন।

ঘটনার মূল আকর্ষণ এই যে, দুর্গদখলের পর মুযাফ্‌ফর শাহ হালীম ভিতরে প্রবেশ করলেন। সঙ্গের আমীর-উমরাগণ বিপুল বিলাসসামগ্রী, স্ফীত রাজভাণ্ডার ও গুপ্ত ধনসম্পদ দেখে এবং রাজ্যের সমৃদ্ধি ও প্রাচুর্যের খবর পেয়ে প্রলুব্ধ হলেন এবং সাহস করে সুলতানের খেদমতে আরয করলেন, এ যুদ্ধে সুলতানের দু'হাজার যোদ্ধা শহীদ হয়েছে। এত বিরাট ক্ষতি স্বীকার করার পর এটা যুক্তিযুক্ত মনে হয় না যে, বিজিত রাজ্য তারই হাতে তুলে দেয়া হবে যার অযোগ্যতার সুযোগে মন্‌দেলি রায় বিদ্রোহ করেছিলো। একথা শোনামাত্র পরিদর্শন স্থগিত করে সুলতান দুর্গ থেকে বেরিয়ে এলেন এবং মাহমূদ শাহকে বললেন, আমার পরিচয়ে কাউকে যেন দুর্গে ঢুকতে না দেয়া হয়। মাহমূদ শাহ অনেক অনুরোধ উপরোধ করলেন যেন সুলতান কিছুদিন দুর্গে বিশ্রাম গ্রহণ করেন। কিন্তু সুলতান অপারগতা প্রকাশ করলেন। পরে একসময় নিজ থেকে বললেন, এই জিহাদ তো আমি শুধু আল্লাহ তা'আলার সন্তুষ্টির জন্য করেছি। আমার আশঙ্কা হলো যে, লোকদের কথায় আমার দিলে না লোভ ঢুকে যায় এবং নিয়তের ইখলাছ বরবাদ হয়ে যায়! তাছাড়া আসলে আমি মাহমূদ শাহ-এর উপর কোন ইহসান করিনি, এটা বরং আমার প্রতি তার অনুগ্রহ যে, তারই মাধ্যমে আমি জিহাদের এ সৌভাগ্য লাভ করেছি।

মৃত্যুশয্যায় ওলামা ও আমীর-উমরাদের সামনে তিনি নেয়ামতের কৃতজ্ঞতাস্বরূপ বলেছেন, আল্লাহ তা'আলার অনুগ্রহে হিফযে কোরআনের সঙ্গে প্রতিটি আয়াতের প্রাসঙ্গিক আহকাম ও বিধান, শানে নুযূল এবং উছূলে তাজবীদের জ্ঞানও আমার রয়েছে। আমার উস্তাদ আল্লামা জামালুদ্দীন ওমর বাহরক থেকে যেসব হাদীছের সনদ হাছিল করেছি সেগুলো মতন, সনদ এবং বর্ণনাকারীদের বৃত্তান্তসহ আমার মুখস্থ রয়েছে। হাদীছে যে এসেছে–

من يرد الله بــه خيرا يفقــهه في الدين

আল্লাহ যার প্রতি কল্যাণের ইচ্ছা করেন তাকে দ্বীনের ফিক্‌হ ও প্রজ্ঞা দান করেন।

আশা করি, আমিও এই সুসংবাদে শামিল হবো। আর এখন কয়েক মাস যাবৎ ছূফিয়া ও মাশায়েখের তরীকামতে তাযকিয়া ও আত্মসংশোধনের সাধনায় নিমগ্ন রয়েছি। সুতরাং হাদীছের ফরমান–

من تشبــه بقوم فهو منهم

যে ব্যক্তি যে সম্প্রদায়ের সাদৃশ্য গ্রহণ করে সে তাদেরই অন্তর্ভুক্ত।

এই সুবাদে আমিও তাঁদের ফুয়ূয ও বারাকাত লাভের আশা করি। তাফসীরে মা'আলিমুত্-তানযীল[1] শুরু থেকে শেষ, একবার অধ্যয়ন করেছি। আবার শুরু করে অর্ধেকে পৌঁছেছি। ইনশাআল্লাহ বাকিটুকু জান্নাতে গিয়ে সমাপ্ত করবো।

জুমার কিছু পূর্বে যখন মউতের হালাত শুরু হয়ে গেলো তখন সবাইকে জুমার জামাতে যাওয়ার তাকীদ করলেন, আর নিজে যোহর পড়লেন; তারপর বললেন, যোহর তো তোমাদের এখানে পড়লাম, আছর ইনশাআল্লাহ জান্নাতে পড়বো।

ইন্‌তিকালের সময় হযরত ইউসুফ আ.-এর এই দু'আ তাঁর মুখে ছিলো–

رَبِّ قَدْ ءَاتَيْتَنِي مِنَ ٱلْمُلْكِ وَعَلَّمْتَنِي مِن تَأْوِيلِ ٱلْأَحَادِيثِ ۚ فَاطِرَ ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَٱلْأَرْضِ أَنتَ وَلِىِّۦ فِى ٱلدُّنْيَا وَٱلْءَاخِرَةِ ۖ تَوَفَّنِى مُسْلِمًا وَأَلْحِقْنِى بِٱلصَّٰلِحِينَ ﴿١٠١﴾

'হে পরওয়ারদিগার, আপনি আমাকে রাজত্ব দান করেছেন এবং কথা ও বক্তব্যের তাবীল-ব্যাখ্যার ইলম দান করেছেন, হে আসমান ও যামীনের খালিক, আপনিই আমার মাওলা, দুনিয়াতেও, আখিরাতেও। আপনি আমাকে মুসলিম-রূপে ওয়াফাত দান করুন এবং আমাকে নেককারদের সঙ্গে যুক্ত করুন।

(সূরা ইউসুফ, ১২ আয়াত ১০১)

***

শেরশাহ সূরী রহ.-এর দৈনন্দিন কাজকর্মের যে তালিকা ইতিহাসে সংরক্ষিত রয়েছে তা একবার দেখুন; তারপর বলুন, এ যুগে মধ্যম পর্যায়ের কর্মব্যস্ত কোন

[1] আল্লামা বগবী রহ.কৃত কয়েক হাজার পৃষ্ঠার বিশাল তাফসীর।

মানুষের পক্ষেও তা নিয়মিত পালন করা সম্ভব কি না, অথচ তিনি ছিলেন বিশাল হিন্দুস্তানের সেই বাদশাহ যিনি মাত্র পাঁচ বছরের সময়সীমার মধ্যে 'শতাব্দীর কাজ' সম্পন্ন করার প্রতিজ্ঞা করেছিলেন। সুতরাং রাজ্যপরিচালনা ও প্রশাসনিক দায়-দায়িত্বের বাইরে কিছু করার জন্য তাঁর কি লমহারও ফুরসত ছিলো? সমকালীন ঐতিহাসিকের বর্ণনামতে –

'রাতের একতৃতীয়াংশ থাকতেই জাগ্রত হতেন। তাহাজ্জুদ ও নফলে মশগুল হতেন এবং ফজরের আগেই ওযীফা ও তাসবীহ আদায় করে নিতেন। তারপর প্রশাসনের বিভিন্ন বিভাগের হিসাব দেখতেন এবং দিনের গুরুত্বপূর্ণ কাজকর্ম সম্পর্কে পারিষদবর্গকে প্রয়োজনীয় দিকনির্দেশনা দান করতেন, যাতে পরে কেউ প্রশ্ন করে কাজের ব্যাঘাত না ঘটায়। এরপর বা-জামাত ফজর আদায় করতেন এবং যিকির-আযকারে মশগুল হতেন। ইতিমধ্যে প্রশাসনের বিভিন্ন কর্মকর্তা সালাম আরয করার জন্য হাযির হতেন, আর তিনি ইশরাক থেকে ফারিগ হয়ে লোকদের প্রয়োজনাদি সম্পর্কে খোঁজখবর নিতেন এবং মঞ্জুরি প্রদান করতেন। তারপর বিচারপ্রার্থীদের প্রতি মনোযোগী হতেন এবং উপযুক্ত প্রতিকার করতেন। এরপর শাহী ফৌজ ও অস্ত্রাগার পরিদর্শন করতেন এবং ফউজে ভর্তি হতে ইচ্ছুকদের যোগ্যতা যাচাই করে নিয়োগের আদেশ দিতেন। তারপর অর্থ বিভাগের আয় ও রাজস্ব সম্পর্কে খোঁজখবর নিতেন। এর মধ্যে সাম্রাজ্যের আমত্যবর্গ, আমীর-ওমারা এবং বিভিন্ন রাজ্যের দূত ও প্রতিনিধিবর্গ উপস্থিত হতেন। তাদের সঙ্গে প্রয়োজনীয় আলোচনা সেরে তিনি প্রশাসনিক কর্মকর্তাদের পেশকৃত 'প্রতিবেদন' দেখতেন এবং প্রয়োজনীয় আদেশ লেখাতেন। এরপর দুপুরের খাবার গ্রহণ করতেন। দস্তরখানে ওলামা-মাশায়েখ শরীক হতেন। কিছুক্ষণ কায়লূলা করে যোহর পর্যন্ত দু'ঘণ্টা সময় ব্যক্তিগত কাজকর্মে ব্যস্ত থাকতেন। যোহরের পর কিছুক্ষণ কোরআন তিলাওয়াত করে আবার সরকারী কাজে ব্যস্ত হয়ে পড়তেন। ঘরে সফরে এই কর্মসূচীর কোন ব্যত্যয় হতো না। তিনি বলতেন–

'বড় মানুষ তিনি যিনি পুরো সময় প্রয়োজনীয় কাজে ব্যয় করেন'।

***

সুলতান আওরঙ্গযেব আলমগীর রহ-এর বিশদ জীবনবৃত্তান্ত পড়ে দেখুন, এই 'দুনিয়াদার' বাদশাহ যিনি কাবুল ও কান্দাহার থেকে সুদূর দক্ষিণাত্য পর্যন্ত

শাসন করেছেন এবং এই বিশাল বিস্তৃত সাম্রাজ্যের সবকিছু একা পরিচালনা ও নিয়ন্ত্রণ করেছেন; (হাঁ, অনিবার্য কারণে সবকিছু তাঁকে একাই করতে হয়েছে, কিন্তু) এমনই ছিল তাঁর দ্বীনী হিম্মত ও মনোবল যে, সবকিছুর মধ্যেও যথাসময়ে বা-জামাত নামায আদায় করতেন। জুমার নামায জামে মসজিদে আদায় করতেন, এমনকি সুন্নত-নফলেরও পাবন্দি করতেন। আগুনঝরা গরমের দিনেও রমযানে রোযা রাখতেন এবং দীর্ঘ তারাবীহ পড়তেন। শেষ দশকে ই'তিকাফ করতেন। সোম, বৃহস্পতি ও শুক্র, সপ্তাহের এই তিনদিন নফল রোযা রাখতেন। সবসময় অযু অবস্থায় থাকতেন। যিকির-আযকার ও দু'আ মাছুরা-এর অযিফা পাবন্দির সঙ্গে আদায় করতেন। প্রতিদিন সকালে কোরআন তেলাওয়াত করতেন।

রাজ্যপরিচালনার মনবিক্ষিপ্তকারী পরিস্থিতি সত্ত্বেও পূর্ণ একাগ্রতার সঙ্গে মুজাদ্দিদ-ই-আলফেছানী (রহ)-এর পৌত্র হযরত খাজা সাইফুদ্দীন (রহ)-এর তারবিয়াতি তত্ত্বাবধানে কঠোর আধ্যাত্মিক সাধনায় আত্মনিয়োগ করতেন। আধ্যাত্মিকতার এত উচ্চ মার্গে তিনি উপনীত হয়েছিলেন যে, হযরত খাজা ছাহেব পিতা হযরত খাজা মুহম্মদ মাসূম (রহ)-কে বাদশাহ-এর অন্তরে 'যিকিরের উল্লাস' সম্পর্কে অবহিত করেছেন।

রাজ্যপরিচালনার অন্তহীন ব্যস্ততার মধ্যেও পর্যাপ্ত সময় বের করে ফতোয়া সঙ্কলনের মত বিশাল কর্মকাণ্ড তদারক করতেন, যা তাঁর নির্দেশে এবং প্রত্যক্ষ নির্দেশনায় সে যুগের শ্রেষ্ঠ ফকীহগণ সঙ্কলন করছিলেন। প্রতিদিন যে পরিমাণ লেখা হতো, তিনি আগাগোড়া শুনতেন এবং প্রয়োজনীয় সংশোধনী ও পরামর্শ দান করতেন। তাঁরই অমর কীর্তিরূপে আলমগীরি নামে কালজয়ী ফতোয়া সঙ্কলন আজ মুসলিম উম্মাহ লাভ করেছে।

বাদশাহ আওরঙ্গযেব (রহ)-কে কী কঠিন ও ঝঞ্ঝাবিক্ষুব্ধ পরিস্থিতিতে সাম্রাজ্যের দায়িত্বভার গ্রহণ করতে হয়েছে তা ইতিহাসের পাঠকমাত্রই অবগত আছেন। পিতা শাহজাহান মমতাজের জন্য তাজমহল বানাতে গিয়ে সব উজাড় করে ফেলেছিলেন। তাই সাম্রাজ্যের সমগ্র প্রশাসনব্যবস্থা তাঁকে আগাগোড়া ঢেলে সাজাতে হয়েছে। সেই সঙ্গে চারদিকে মাথাচাড়া দিয়ে ওঠা ফিতনা, গোলযোগ ও বিদ্রোহ দমন করতে হয়েছে। কিন্তু বাদশাহ আওরঙ্গযেব (রহ)-এর অবিচল মনোবলের পক্ষেই সম্ভব ছিলো যে, যখন মাথা তুলে কোনদিকে তাকানোর পর্যন্ত

অবকাশ ছিলো না তখন তিনি কোরআন হিফয করেছেন এবং 'আরবাঈন' নামে ব্যাখ্যা ও ভাষ্যসহ চল্লিশ হাদীছের সঙ্কলন প্রস্তুত করেছেন।

বাদশাহ আলমগীরেরই রচিত কবিতার একটি শ্লোক (-এর তরজমা) হলো–

একদিকে আমার দুর্বল একহৃদয়, অন্যদিকে সারা জগতের চিন্তা ও দুশ্চিন্তা,
'বালুঘড়ির' ছোট্ট আধারে যেন ধারণ করছি মরুভূমির বালুরাশি।

এটা যে তাঁর নিছক কাব্যাড়ম্বর ছিলো না, ছিলো তাঁর জীবনেরই বাস্তব চিত্র, তা তো উপরের আলোচনা থেকেই প্রমাণিত।

***

শাসকদের কথা থাক, এবার আসুন প্রশাসক পর্যায়ে আমীর-ওমারা ও গুণীদের আলোচনায়। সেখানে আপনি পাবেন আব্দুর রহীম বৈরাম খানেখানাঁ, জুমলাতুল মালিক সা'আদুল্লাহ খান, আল্লামা মজদুদ্দীন মুহম্মদ বিন মুহম্মদ এলায়েজী, ইখতিয়ার খান, আফযল খান এবং মসনদে আলা আব্দুল আযীয আছিফ খান-এর মত বহুমুখী গুণ ও প্রতিভার অধিকারী এবং ধার্মিকতা ও আধ্যাত্মিকতার সুউচ্চ সোপানে অধিষ্ঠিত ব্যক্তিবর্গের নাম।

এখানে আমরা শুধু আব্দুর রহীম খানেখানাঁ ও আছিফ খান, এ দুজনের সংক্ষিপ্ত আলোচনা করছি।

আব্দুর রহীম খান তখনকার প্রচলিত দরসি কিতাব (ও পাঠ্যপুস্তক) পড়েছেন মাওলানা মুহম্মদ আমীন 'অনব্জানী' ও কাযী নিযামুদ্দীন বাদখশানী-এর নিকট। এবং উচ্চতর শাস্ত্রীয় জ্ঞান অর্জন করেছেন হাকীম আলী গীলানী ও আল্লামা ফাতহুল্লাহ শিরাজীর নিকট। পরে গুজরাতে অবস্থানকালে আল্লামা অজীহুদ্দীন বিন নাছরুল্লাহ গুজরাতীর সান্নিধ্যে থেকে আরো অধিক জ্ঞান অর্জন করেছেন। সময়ের স্বীকৃত এসকল শিক্ষক ছাড়াও তাঁর দরবার ছিলো বিভিন্ন বিষয়ের জ্ঞানী-গুনী, বিজ্ঞ-প্রাজ্ঞ ও শাস্ত্রবিশারদদের মিলনকেন্দ্র। তাঁদের সঙ্গে তাঁর জ্ঞানচর্চা ও আহরণধারা অব্যাহত ছিলো। ফলে একসময় তিনি সর্বজ্ঞান ও শাস্ত্রে পূর্ণ বৈদগ্ধ্য অর্জন করেন। জ্ঞানের বিভিন্ন শাখায় তিনি নিজস্ব চিন্তা ও সিদ্ধান্ত প্রয়োগের অধিকার তথা 'অথরেটি' এর মর্যাদা অর্জন করেছিলেন। এছাড়া তাঁকে বলা যায় 'হাফতে যবান' (বহুভাষাবিদ)। 'মাআছিরুল ওমারা' কিতাবে আব্দুর রাজ্জাক খাওয়াফী লিখেছেন, 'আরবী, ফারসী, তুর্কী ও হিন্দী ভাষায় তাঁর পূর্ণ দখল

ছিলো। এসব ভাষায় তিনি অনর্গল কথা বলতেন এবং তা ছিলো বিশুদ্ধ, বাগ্মিতা-পূর্ণ ও অলঙ্কারমণ্ডিত; এমনকি এসব ভাষায় উচ্চাঙ্গ কবিতা রচনারও সহজাত অধিকার ছিলো।

ধার্মিকতা ও জ্ঞানযোগ্যতার পাশাপাশি সৈনিকতা, সমরকুশলতা এবং সাহস ও শৌর্যবীর্যে তিনি ছিলেন যুগশ্রেষ্ঠ, যার জীবন্ত স্বাক্ষর হলো গুজরাত, সিন্ধু ও দাক্ষিণাত্যের বিভিন্ন বিজয়াভিযান।

চরিত্র ও মহত্ত্বের দিক থেকে দেখুন, ঐতিহাসিকগণ তাঁর উত্তম চরিত্র, কোমলতা, সহনশীলতা, বিনয় ও নম্রতার অকুণ্ঠ প্রশংসা করেছেন। তাঁর দান ও বদান্যতা সম্পর্কে সৈয়দ গোলাম আলী বেলগ্রামী এভাবে সাক্ষ্য দিয়েছেন–

'যদি আব্দুর রহীম খানে খানান-এর দান-অনুদান এক পাল্লায় রাখা হয়, আর অন্য পাল্লায় রাখা হয় 'শাহানে ছাফাবিয়া' সকলের দান-অনুদান তাহলে কোন সন্দেহ নেই, তাঁর পাল্লাই হবে ভারী।'

জ্ঞানমনস্কতা ও অধ্যয়ননিমগ্নতার অবস্থা ছিলো এমন যে, যুদ্ধের ময়দানেও সঙ্গে কিতাব থাকতো। এমনকি স্নানের সময়ও সেবক কিতাব খুলে ধরে রাখতো, আর তিনি চোখ বুলিয়ে যেতেন।

তাঁর ধর্মমুখিতা ও স্বভাবশুভ্রতা সম্পর্কে ধারণা করা যায় এ থেকে যে, তিনি হযরত মুজাদ্দিদে আলফে ছানী (রহ)-এর কৃপাদৃষ্টি লাভে ধন্য হয়েছেন। তিনি সেই খোশকিসমত লোকদের একজন যারা ছিলেন হযরত মুজাদ্দিদ ছাহেবের আস্থাভাজন, যাদের নামে তিনি পত্র লিখতেন। 'মাকতুবাত' থেকে তাঁর কলবী তা'আল্লুক ও আত্মিক সম্পর্কের গভীরতা সম্যক অনুধাবন করা যায়।

***

গুজরাতের উযীর আছিফ খানের 'হালাত' পড়ুন, বহুমুখী গুণ ও যোগ্যতার অন্য একটি আশ্চর্য সুন্দর চিত্র আপনার সামনে উদ্ভাসিত হবে। তিনি ছিলেন পিতা 'হামীদুলমুলক'-এর বড় সন্তান। আসল নাম আব্দুল আযীয। কিছু পাঠ্যপুস্তক তিনি পিতার কাছেই অধ্যয়ন করেছেন। হাদীছ ও ফিকহ অধ্যয়ন করেছেন কাযী বোরহানুদ্দীন নহরওয়ালে-এর নিকট। নীতি ও দর্শনশাস্ত্রে তাঁর শিক্ষক ছিলেন আবুল ফযল আস্তরাবাদী।

জ্ঞান ও শাস্ত্রের প্রথাগত অধ্যয়ন পূর্ণ করার পর তিনি শাহী দরবারে শামিল হন। বাহাদুর শাহের আমলে 'ওযির পদ' লাভ করেন। আর মাহমূদ শাহের আমলে

প্রধান সচীবের পদে বরিত হন। এমন গুরুত্বপূর্ণ পদে অধিষ্ঠিত হওয়া সত্ত্বেও তাঁর অধ্যয়ন-অধ্যাপন ও জ্ঞানসাধনা শেষ পর্যন্ত অব্যাহত ছিলো।

বিভিন্ন রাজনৈতিক বিপ্লবের কারণে একটা দীর্ঘ সময় আছিফ খান মক্কায় অবস্থান করেছেন। তখন হারামাইনের ওলামা এবং বিভিন্ন দেশ ও অঞ্চল থেকে আগত বিজ্ঞ-প্রাজ্ঞ ব্যক্তিগণ তাঁর ইলমী ও আমলী যোগ্যতা, দ্বীনী ইস্তিকামাত ও অটলতা এবং ইবাদত-নিমগ্নতা দেখে অভিভূত হয়েছেন। ইবনে হাজার মক্কী, যাকে বলা হতো যুগের আল্লামা– তিনি তো আছিফ খানের জ্ঞান ও গুণ বর্ণনা করে আলাদা কিতাবই লিখেছেন। তাতে তিনি তাঁর মহত্ত্ব, মহিমা, তাকওয়া ও ধার্মিকতা এবং পবিত্রতা ও আধ্যাত্মিকতার উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করেছেন। সম্ভবত কোন হিন্দুস্তানী আলিমের স্তুতি-প্রশংসায় সর্বজনমান্য কোন আরব আলিমের এটাই ছিলো প্রথম রচিত গ্রন্থ।

হারামাইনের আলিমসমাজ সাক্ষ্য দিয়েছেন, অতি উচ্চ মর্যাদা ও প্রভাব-প্রতাপের অধিকারী এবং অর্থবিত্ত ও চাকর-নকর থাকা সত্ত্বেও মক্কা শরীফে তাঁর জীবন-যাত্রা ছিলো বিলকুল সাদাসিধা ও 'যাহিদানা'। তাহাজ্জুদে নিয়মিত দশপারা তেলাওয়াত করতেন। ইবনে হাজার মক্কী বলেন, মক্কায় দীর্ঘ দশবছর অবস্থান-কালে মসজিদুল হারামে তাঁর কোন জামাত ফউত হয়নি। তাঁর বাসগৃহ ছিলো মাতাফ বরাবর। নফল নামায, যিকির, তাসবীহ, তিলাওয়াত, মুরাকাবা ও কিতাব মুতালাআ ছাড়া অন্য কোন অবস্থায় তাঁকে কখনো দেখা যায়নি।

উচ্চ স্তরের বিভিন্ন কিতাবি দরস এবং বিভিন্ন জটিল বিষয়ে ইলমি পর্যালোচনার ধারা অব্যাহত থাকতো। হারামের আলিমগণ অত্যন্ত আগ্রহের সঙ্গে তাঁর ইলমী মজলিসে শরীক হতেন। বিভিন্ন দ্বীনী বিষয়ে সর্বোচ্চ স্তরের কিতাবসমূহের জটিল থেকে জটিল বিষয়ে জ্ঞানগর্ভ ও গবেষণাসমৃদ্ধ আলোচনা হতো।

ইলম ও আহলে ইলমের পৃষ্ঠপোষকতা ও কদর-সমাদরের ক্ষেত্রেও তিনিই ছিলেন তাঁর তুলনা। ইবনে হাজার মক্কী লিখেছেন, আছিফ খানের বসবাসকালে মক্কায় আশ্চর্য রকম ইলমী রওনক ও জৌলুস সৃষ্টি হয়েছিলো। আহলে মক্কা বিরাট জোশ ও জযবার সঙ্গে ইলম হাছিলের মেহনতে নিয়োজিত হয়েছিলো। ইলম-পিপাসুরা চারদিক থেকে ছুটে ছুটে এসে ইলমের প্রতি ব্যাপক মনোনিবেশ করেছিলো। ইলমের সূক্ষ্ম-জটিল সববিষয়ে গবেষণা-অনুসন্ধান করা এবং তাতে গভীর প্রজ্ঞা অর্জন করা, এই ছিলো তাদের লক্ষ্য-উদ্দেশ্য, যাতে আছিফ খানের

নৈকট্য অর্জন করা যায়। কারণ, আহলে ইলমের প্রতি তিনি এত বিপুল দান-অনুগ্রহ বর্ষণ করতেন, যার তুলনা তাঁর সমকালে তো নয়ই, বরং পরেও দীর্ঘকাল ছিলো না। মক্কার ঘরে ঘরে এবং পথে পথে এমনভাবে তার জন্য দু'আ হতো, যা আর কারো জন্য কখনো হয়নি।

আছিফ খানের জ্ঞান ও প্রজ্ঞা এবং গুণ ও যোগ্যতার খ্যাতি এত দূর ছড়িয়ে পড়েছিলো যে, তুর্কী সুলতান তাঁর সাক্ষাৎ লাভের আগ্রহ প্রকাশ করেন এবং 'শরীফে মক্কা'-এর মাধ্যমে শাহী মর্যাদায় তাঁকে কুসতুনতুনিয়ায় আনার ব্যবস্থা করেন এবং যথাযোগ্য মর্যাদা ও অন্তরঙ্গতার সঙ্গে বহু গুণের আধার এই মহান ব্যক্তিকে গ্রহণ করেন এবং বিভিন্ন বিষয়ে মতবিনিময় করেন।

মক্কা থেকে কুসতুনতুনিয়া, তাঁর সফরসঙ্গী ছিলেন এমন একব্যক্তি বলেন, এ দীর্ঘ সফরে আছিফ খান কখনো কোন 'রোখসত'-এর উপর আমল করেননি; বরং মুকিম অবস্থার মত এখানেও সর্বদা 'আযীমত'[1]-এর উপরই আমল করেছেন। তিনি আরো বলেন, মিশরের শাসনকর্তা খসরু পাশা তাঁর জন্য অতিমূল্যবান 'খেলাত'[2] প্রেরণ করেছিলেন। কিন্তু তিনি তা গ্রহণ করতে অপারগতা প্রকাশ করেন। তখন খেলাত বহনকারী দূত বারবার অনুরোধ করেন যে, বাদশাহর সন্তুষ্টির জন্য অন্তত একবার পরিধান করুন, যাতে কিছু বলার মত হয়। কিন্তু আছিফ খান এই বলে অবিচল থাকলেন যে, এটা রেশমী বস্ত্র, যা আমি কিছুতেই পরিধান করতে পারি না।

এতে কোন সন্দেহ নেই যে, সে যুগের প্রত্যেক বাদাশাহ মুযাফ্ফর শাহ হালীম বা আওরঙ্গযেব ছিলেন না, এবং প্রত্যেক উযীর আব্দুর রহীম ও আছিফ খান ছিলেন না, তবে সাধারণভাবে মানুষের আত্মা ও আত্মিকতার মান ও মানদণ্ড অনেক উন্নত ছিলো। মানুষের বড়ত্ব ও মহত্ত্বের জন্য এমন বহু গুণ ও যোগ্যতা

---

[1] শরী'আতের মূল হুকুমকে বলা হয় عزيمت আর বিভিন্ন ওযর, আপারগতা ও কমজোরির কারণে অপেক্ষাকৃত যে সহজ হুকুম এসেছে সেটাকে رخصت বলা হয়। যেমন সফরে রামাযানের রোযা রাখা, এটা হলো মূল হুকুম, তবে তখন রোযা না রেখে পরে কাযা করার অবকাশ রাখা হয়েছে, এটা হলো রোখছত বা অপেক্ষাকৃত সহজ হুকুম। –অনুবাদক

[2] রাজা-বাদশাহদের পক্ষ হতে প্রদত্ত উপহার, বিশেষ করে পোশাকজাতীয়। বিগত যুগে মূল্যবান পোশাক ও বস্ত্র উপহার দেয়ার শাহী রেওয়াজ ছিলো। মূল আরবী শব্দটি হচ্ছে خلعت (বিকাসরিল খা ও সুকুনিল-লাম) –অনুবাদক

তখন অপরিহার্য বলে স্বীকৃত ছিলো, যা পরবর্তীকালে, বিশেষত পাশ্চাত্যের চরম বস্তুবাদিতার যুগে গুরুত্ব হারিয়ে ফেলেছে এবং মর্যাদা ও মহত্ত্বের শর্তরূপে মূল্যহীন হয়ে পড়েছে।

উপরে যে সুউচ্চ মাপকাঠির কথা বলা হয়েছে তা শাসকদের বিবেচনায় যেমন থাকতো তেমনি সাধারণ মানুষও তাদের কাছ থেকে তা প্রত্যাশা করতো। সুউচ্চ মনোবলের অধিকারী ব্যক্তিরাও আধ্যাত্মিক মর্যাদার সর্বোচ্চ মানদণ্ডে উত্তীর্ণ হওয়ার চেষ্টা-সাধনা ও মেহনত-মোজাহাদায় নিয়োজিত থাকতেন। জাগতিক উন্নতির সর্বোচ্চ স্তরের অবস্থানও তাদের মধ্যে দ্বীনের বিষয়ে কোন দ্বিধা-শৈথিল্য সৃষ্টি করতে পারতো না। জীবনের জটিলসব দায়দায়িত্ব, বিপুল কর্মব্যস্ততা, রাজ্যশাসনের ভীষণ প্রতিকূল পরিস্থিতি, এসব কিছুই তাদেরকে দ্বীনের ফরয আমল তো বটেই, এমনকি সুন্নত-নফল থেকেও কখনো বিচ্যুত করতে পারতো না। আরাম-আয়েশ ও ভোগবিলাসের সমস্ত আয়োজন ছিলো, কিন্তু জীবনের চারপাশে নির্মোহতার যে প্রাচীর তাঁরা তৈরী করেছিলেন তাতে তা সামান্য ফাটলও ধরাতে পারেনি। শাসক ও অভিজাত শ্রেণীর এই সর্বব্যাপী ধার্মিকতা ও আধ্যাত্মিকতা স্বাভাবিকভাবেই সাধারণ মানুষের জীবনেও প্রভাব বিস্তার করেছিলো। সমাজের প্রতিটি স্তরেই দুনিয়ার উপর দ্বীনকে অগ্রাধিকার প্রদানের মানসিকতা বিদ্যমান ছিলো।

কিন্তু .. কিন্তু ধীরে ধীরে অবক্ষয় শুরু হলো। জীবনের অন্যান্য ক্ষেত্রে যেমন তেমনি জাগতিকতা ও আধ্যাত্মিকতার এই যে 'একত্রতা ও সার্বিকতা' তাতেও দুর্বলতা ও শিথিলতা অনুপ্রবেশ করলো। যে সকল আদর্শ-উদাহরণ অতীতে বহুসংখ্যায় দেখা যেতো, কমতে কমতে তা একেবারে বিরল হয়ে গেলো। তারপরো জীবন ও সমাজে কোন না কোন স্তরে ঐ মানদণ্ডটি বিদ্যমান ছিলো এবং মানুষের চিন্তা-চেতনায় তার কিছু না কিছু প্রভাব ছিলো। তাই যুগের উচ্চমনা ব্যক্তিগণ ঐ মানদণ্ডে পূর্ণ উত্তীর্ণ হওয়ার চেষ্টা-সাধনায় নিয়োজিত হতেন এবং সেজন্য সর্বপ্রকার আরাম-আয়েশ ও চাহাত-চাহিদা হাসিমুখে বিসর্জন দিতেন।

১৮শ সাতান্নের মহাবিপ্লবের আগে ও পরে ভারতবর্ষের অভিজাত ও বিদ্বান সমাজের দিকে দৃষ্টিপাত করুন; আপনি মুফতি ছদরুদ্দীন খান, নওয়াব কুতবুদ্দীন খান, নওয়াব ওয়াযীরুদ্দাওলাহ মরহুম (ওয়ালিয়ে টোঙ্ক), নওয়াব কালবে আলি খান (ওয়ালিয়ে রামপুর), (মাদারুল মাহাম) মুনশি জামালুদ্দীন খান (উযিরে ভুপাল) ও নওয়াব সৈয়দ সিদ্দীক হাসান খান-এর মত বহুমুখী গুণ এবং জাগতিক ও আধ্যাত্মিক যোগ্যতার অধিকারী মহান ব্যক্তিদের দেখা পাবেন, যাদের জ্যোতির্ময় ব্যক্তিত্বে রাজ্যশাসন ও জ্ঞান-অন্বেষণ এবং যুহদ-ইবাদত ও সিপাহিসুলভ উদ্যম-উদ্দীপনার একত্রসমাবেশ ঘটেছিলো। এটা কীভাবে সম্ভব হয়েছিলো? কারণ জীবনের আইডিয়েল বা আদর্শ ছিলো অতি উচ্চ স্তরের। আর মনমানস ও চিন্তাচেতনার উপর আইডিয়েল বা আদর্শেরই প্রভাব বিদ্যমান থাকে সর্বযুগে।

কিন্তু ধীরে ধীরে নিভু নিভু প্রদীপও যেন নিভে গেলো। পাশ্চাত্যের বস্তুবাদী ও জীবিকামুখী সভ্যতার প্রভাব-প্রতিপত্তির যুগে অনুসরণীয় আদর্শের ধারণা অনেক নীচে নেমে গেলো।

সবকিছু এখন অন্যরকম হয়ে গেছে। আগে যা ছিলো সুপরিচিত, এখন তা বিলকুল অচেনা 'আজনবী'। এখন হৃদয়ের যুগ নয়, হৃদপিণ্ডের যুগ। এখন শুধু জীবনের স্বাচ্ছন্দ্য, প্রাচুর্য, সামাজিক মর্যাদা ও প্রতিষ্ঠা এবং আপন পরিমণ্ডলে প্রতিপত্তি অর্জন- এই হয়ে উঠেছে জীবনের উদ্দেশ্য। নবুওয়াতের প্রদর্শিত জীবনবোধ এবং চরিত্র ও নৈতিকতা মানুষের দৃষ্টিপথ থেকে অদৃশ্য হয়ে গিয়েছে। যারা ছিলেন দ্বীন ও দুনিয়া এবং জাগতিকতা ও আধ্যাত্মিকতার মিলনকেন্দ্র; যাদের মধ্যে একদিকে ছিলো ইলমী ও রূহানী উচ্চতা, অন্যদিকে ছিলো পরিপূর্ণ জাগতিক যোগ্যতা এবং ভোগবিলাসের স্থলে হালাল জীবিকায় তুষ্টি- এসকল ব্যক্তি ও ব্যক্তিত্বের প্রভাব মনমানস থেকে হারিয়ে গেছে। সর্বস্তরের সমাজ-মানস এখন ঐসব লোকের প্রভাবে আচ্ছন্ন হয়ে পড়েছে, এবং মানুষের চিন্তাচেতনায় জীবনের সফলতার চূড়ান্ত নমুনা ও আদর্শরূপে তাদেরই ব্যক্তিত্ব 'পূজার মূর্তি'রূপে বিরাজ করছে, নৈতিক ও চিন্তানৈতিক দিক থেকে যাদের অবস্থান খুবই নীচে; কর্ম ও কীর্তির বিচারে যারা একেবারে দেউলিয়া এবং জ্ঞান, প্রজ্ঞা ও মহৎ গুণাবলী থেকে সম্পূর্ণ বঞ্চিত। এককথায় তারা হলো অতি নিম্নস্তরের আর্থসামাজিক জীব, কিংবা অনুভূতিহীন, নিস্প্রাণ অর্থ-উৎপাদক যন্ত্র। স্থূল আরাম আয়েশ ও বিলাসপ্রিয়তা এতই প্রবল হয়ে পড়েছে এবং ক্রীড়া ও বিনোদনমূলক কর্মকাণ্ড জীবনের এত বিস্তৃত পরিসর অধিকার করে রেখেছে যে, ইবাদত ও ধর্মচর্চা, আত্মসংশোধন ও আত্মার প্রয়োজনের প্রতি মনোনিবেশ

করার কোন অবকাশই আর অবশিষ্ট থাকেনি। আপনি যদি বর্তমান যুগের তথাকথিত প্রাগ্রসর ও অভিজাত লোকদের দিনরাতের কর্মসূচীর প্রতি তাকান তাহলে আপনাকে হতবাক হতে হবে। কারণ প্রাচীন ইসলামী সভ্যতার যারা প্রতিনিধিত্বকারী, তাদের কর্মসূচী এবং বিশশতকের এই লোকদের কর্মসূচীর মধ্যে এত বিরাট ফারাক ও পার্থক্য দেখা যাবে যে, উভয়কে একই দেশের, একই জাতির মানুষ মনে হবে না; মনে হবে উভয়ের মধ্যে যেন বহুবছরের নয়, বরং রয়েছে বহু শতাব্দীর ব্যবধান।

পঞ্চম অধ্যায়

বিশ্বনেতৃত্বের আসনে ইসলামের প্রত্যাবর্তন

প্রথম পরিচ্ছেদ

মুসলিম বিশ্বের নব উত্থান

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

আরবজাতির নেতৃত্ব

প্রথম পরিচ্ছেদ

মুসলিমবিশ্বের নব-উত্থান

সমগ্র বিশ্বের জাহেলিয়াতমুখিতা

বিভিন্ন ঐতিহাসিক, বুদ্ধিবৃত্তিক ও প্রাকৃতিক কারণে, যার বিশদ আলোচনা পিছনে বিভিন্ন অধ্যায়ে আমরা করে এসেছি, খৃস্টান ইউরোপ আগাগোড়া জড়বাদী ও বস্তুবাদী জাহেলিয়াতের আঁধারে ডুবে গিয়েছিলো। আসমানি নবুয়ত যা কিছু নৈতিক ও আধ্যাত্মিক শিক্ষা এনেছিলো এবং মানুষের সামনে মহৎ মানবিক মূল্যবোধ তুলে ধরেছিলো, তার সবকিছুই ইউরোপীয় জাতিবর্গ জীবন থেকে ছুঁড়ে ফেলেছিলো। অবস্থা এমন হয়ে পড়েছিলো যে, ব্যক্তিজীবনে স্থূল ভোগ-উপভোগ ছাড়া, রাজনৈতিক জীবনে শক্তি ও ক্ষমতা ছাড়া এবং জাতীয় জীবনে সর্বগ্রাসী জাতীয়তাবাদ ছাড়া আর কিছুতে তাদের বিশ্বাস ছিলো না। যাবতীয় নৈতিক মূল্যবোধ ও সুস্থ মানবপ্রকৃতির বিরুদ্ধে তারা রীতিমত বিদ্রোহ করে বসেছিলো। জীবনের মহৎ উদ্দেশ্য বিস্মৃত হয়ে তারা যন্ত্র ও যান্ত্রিকতায় মেতে উঠেছিলো। একদিকে আত্মিক উন্নয়ন, নৈতিক সংশোধন এবং ঐশী শিক্ষার অনুসরণের প্রতি অব্যাহত উপেক্ষা-অবজ্ঞা, অন্যদিকে জড়জাগতিক জীবনের পথে দুর্গম অভিযাত্রা, নিরবচ্ছিন্ন বিজ্ঞানসাধনা ও নিত্যনতুন আবিষ্কার-উদ্ভাবনের মাধ্যমে প্রকৃতির 'অপার' শক্তির সন্ধান লাভ, এই ছিলো তখনকার ইউরোপ ও তার জাতিবর্গের পরিচয়বৈশিষ্ট্য।

প্রকৃতির বিপুল বিধ্বংসী বিভিন্ন শক্তি হয়ে পড়েছিলো তাদের হস্তগত। পক্ষান্তরে আত্মিক ও নৈতিক শক্তি হয়ে গিয়েছিলো হাতছাড়া। ফলে স্বাভাবিক কারণেই

তাদের অবস্থা ছিলো সেই উন্মত্ত হাতির মত, যা সম্পদ ও জনপদ সবকিছু তছনছ করে এবং মানুষ ও পশুপ্রাণী যা কিছু সামনে পড়ে, পদপিষ্ট করে শুধু ছুটতে থাকে।

এভাবে খৃস্টীয় সপ্তম শতাব্দী পর্যন্ত পৃথিবী এক সামগ্রিক ধ্বংসের পথে ধাবমান ছিলো। আর ভূপৃষ্ঠে এমন কোন কল্যাণশক্তির অস্তিত্ব ছিলো না, যা পতনোন্মুখ মানবতাকে হাত ধরে রক্ষা করতে পারে।

তখন মানবতার অস্তিত্ব-সঙ্কটের সেই কঠিন সময়ে মুহাম্মাদুর রসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আবির্ভাব হলো। দীর্ঘ তেইশ বছরের নববী সাধনায় তিনি গড়ে তুললেন সেই নূরানী মানব-জামাত যাদের বলা হয় 'ছাহাবা'। পৃথিবী থেকে বিদায় গ্রহণের সময় মানব-জাতির নেতৃত্বভার তিনি তাঁদের হাতে তুলে দিয়ে গেলেন।

কেমন ছিলেন তাঁরা? দেহসত্তায় ছিলেন মাটির মানুষ, আর স্বভাবসত্তায় ছিলেন নূরের ফিরেশতা! কী ছিলো তাঁদের কাছে? ছিলো আসমানী কিতাব ও ঐশী জীবনবিধান এবং ছিলো নবীর রেখে যাওয়া পথ ও পন্থা, যাকে বলা হয় সুন্নাহ! যিন্দেগীর চলার পথে তাঁদের প্রতিটি কদম উঠতো আলোর মধ্যে এবং প্রতিটি কদম পড়তো উজালায়। তাঁরা ছিলেন হক ও ইনছাফের 'আলমবরদার'; বিশ্বের নেতৃত্বের আসনে তাঁরা সমাসীন হয়েছিলেন নবুয়তের সুসংহত নৈতিক ও আধ্যাত্মিক সংশোধন লাভের পর। তাই তাঁরা বিশেষ কোন দেশ, অঞ্চল; বিশেষ কোন বর্ণ ও সম্প্রদায়ের সেবক বা স্বার্থ রক্ষাকারী ছিলেন না, ছিলেন সমগ্র মানবতার কল্যাণকামী ও মুক্তি-প্রয়াসী। মুহাম্মাদী নবুয়তের মাধ্যমে আসমান থেকে তাঁদের দান করা হয়েছিলো সর্বাধিক ভারসাম্যপূর্ণ ও সুসমন্বিত স্বভাব-প্রকৃতি। তাঁদের জীবন ছিলো শুধু আলো আর আলো। দিনে সূর্যের আলো, রাতে পূর্ণিমার আলো।

আসমানি তত্ত্বাবধানে এবং নববী তারবিয়াতে গড়ে ওঠা এই মুবারক জামা'আত-এর পরিচয়বৈশিষ্ট্য আসমানি কিতাবের চেয়ে পূর্ণাঙ্গরূপে আর কোথায় পাওয়া যেতে পারে? আলকোরআন বলছে—

كُنتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ
وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ

তোমরা হলে সর্বোত্তম জাতি, যাদের উত্থান ঘটানো হয়েছে মানবের (কল্যাণের) জন্য। তোমরা সৎ কর্মের আদেশ করবে এবং মন্দ কর্ম হতে নিষেধ করবে; আর আল্লাহর প্রতি ঈমান রাখবে। (আলে ইমরান, ৩ : ১১০)

এই মুবারক জামা'আতের অস্তিত্ব মানবসম্প্রদায়ের সামগ্রিক ধ্বংসের পথে তাৎক্ষণিক প্রতিরোধকের কাজ করেছে এবং ক্রমান্বয়ে মানবতাকে কয়েক শতাব্দীর জন্য ঐসব বিপদ-দুর্যোগ ও ফিতনা-ফাসাদ থেকে সুরক্ষা দান করেছে, যা মানবতাকে অক্টোপাশের মত ঘিরে ধরেছিলো। নেতৃত্বের অবস্থান থেকে মানবজাতিকে তাঁরা সেই সঠিক মানযিলের দিকে পরিচালিত করলেন, যা তাদের স্রষ্টা স্বয়ং আল্লাহ তাদের জন্য নির্ধারণ করেছিলেন; ঈমান ও ইয়াকীন, বিশ্বাস ও প্রত্যয়, তাকওয়া ও ধার্মিকতা, তাহারাত ও পবিত্রতা এবং ফালাহ ও কামিয়াবির মানযিল।

তাঁদের শাসনে তত্ত্বাবধানে, নির্দেশে নির্দেশনায় মানবসভ্যতার ভারসাম্যপূর্ণ উন্নতি ও অগ্রগতি সাধিত হলো এবং মানুষের লৌকিক ও আত্মিক সকল শক্তি ও যোগ্যতা অত্যন্ত সুসঙ্গতরূপে পুষ্টি ও সমৃদ্ধি লাভ করলো। ফলে এমন একটি অনুকূল ও কল্যাণকর পরিবেশ সৃষ্টি হলো যেখানে সাধারণ থেকে সাধারণ মানুষের জন্যও খুব সহজে 'মানবপূর্ণতা'র ঐ স্তরে উপনীত হওয়া সম্ভব, যা নিজস্ব যোগ্যতা অনুযায়ী সৃষ্টির সময় তার জন্য নির্ধারিত ছিলো।

ধীরে ধীরে জীবনের ধারা ও পৃথিবীর গতিধারা বদলে গেলো। পৃথিবীব্যাপী মানুষ যেখানে ছিলো আল্লাহ-বিস্মৃতি ও আত্মবিস্মৃতির শিকার সেখান থেকে তারা আল্লাহর পরিচয় ও আত্মপরিচয় লাভের অভিযাত্রায় অগ্রসর হলো। স্বভাব, চিত্ত ও চিন্তা আমূল বদলে গেলো। বিচ্যুত নৈতিক মূল্যবোধ ও ভালো-মন্দের ভ্রান্ত মানদণ্ড বিলুপ্ত হলো এবং মহত্তোম চরিত্র তার স্থান গ্রহণ করলো। জীবন ও জীবনব্যবস্থা এবং শাসন ও শাসনব্যবস্থার ক্ষেত্রে দ্বীন ও শরীয়তই একমাত্র মানদণ্ডের মর্যাদা লাভ করলো। তাদের সভ্যতা-সংস্কৃতির ব্যাপ্তি ও বিস্তৃতির যুগে ব্যবসা-বাণিজ্য এবং শিল্প ও শিল্পকলার উন্নতির সমান্তরালে চরিত্র ও নৈতিকতা, হৃদয় ও হৃদয়বৃত্তি এবং আত্মা ও আত্মিকতারও উৎকর্ষ ঘটলো। বিজয়াভিযানের প্রবল গতি এবং সভ্যতার অগ্রগতির সঙ্গে আত্মিকতা ও আধ্যাত্মিকতাও একই-ভাবে উচ্চ থেকে উচ্চতর এবং উচ্চতম স্তরে উপনীত হলো। আত্মিক বন্ধন, উদ্দেশ্যের ঐক্য, ধর্মীয় ভ্রাতৃত্ব এবং আল্লাহমুখী প্রীতি ও সম্প্রীতি পৃথিবীকে

যেন জান্নাতের নমুনা বানিয়ে দিলো। বাজারে তারা দর করে, দরকষাকষি করে না। জীবনের বিভিন্ন অঙ্গনে প্রতিযোগিতা করে, রেষারেষি করে না। নিজেরা পথ চলে, আবার অন্যকে পথ করে দেয়। সফলতা অর্জনের চেষ্টা করে, আবার অন্যকে সফলতার পথে হাত ধরে এগিয়ে নেয়।

বিশুদ্ধতা, পবিত্রতা ও ধার্মিকতার যে সহজ সরল পথ জাহেলিয়াতের যুগে ছিলো কন্টকাকীর্ণ এবং বহুকাল পড়েছিলো সুনসান, ঐ পথ আবার তার সহজ সরলতা ফিরে পেলো। কাফেলার পর কাফেলা সে পথে এখন স্বস্তিতে নিরাপদে পথ চলে এবং মানযিলে পৌঁছে যায়। আল্লাহর প্রতি আনুগত্য, যা প্রথমে কঠিন ছিলো এখন সহজ হয়ে গেলো; আর আল্লাহর নাফরমানি, যা আগে সহজ ছিলো এখন কঠিন হয়ে গেলো। দ্বীনের দাওয়াত এবং আল্লাহর পথে আহ্বানের মধ্যে এমন চুম্বকাকর্ষণ সৃষ্টি হলো যে, মৃত হৃদয়গুলো সজীব হয়ে এদিকে ছুটে ছুটে আসে। আখলাকের তারবিয়াত ও নৈতিক দীক্ষা এবং রূহের তাযকিয়া ও আত্মিক সংশোধনের মধ্যে এমন জোরালো শক্তি সৃষ্টি হলো, যা অসংখ্য মানুষকে পাশবিকতা ও নৈতিক অধ:পতন থেকে উদ্ধার করে মানবিকতা, নৈতিকতা ও আত্মোন্নতির শীর্ষ সোপানে উপনীত করলো। মানবীয় মেধা, প্রতিভা ও যোগ্যতা এবং মানবপ্রকৃতির উদ্দামতা, এতদিন যার অপচয় হচ্ছিলো, কিংবা ভুল পথে প্রবাহিত হচ্ছিলো তা সঠিক ব্যবহারক্ষেত্র ও প্রবাহপথ লাভ করে পৃথিবীকে যথার্থ উন্নতি, অগ্রগতি ও উৎকর্ষ দান করলো। মোটকথা মানবজাতি সামগ্রিক আত্মহননের পথ ছেড়ে আত্মরক্ষার পথ গ্রহণ করলো এবং মানবতার কাফেলা মানযিলে মকছুদের নিকটবর্তী হলো, এমনকি তার অগ্রভাগ মানযিলে পৌঁছেও গেলো।

জাতির ইতিহাসে পরিবর্তনের এবং অবক্ষয় ও অধ:পতনের উপাদানগুলো এত ধীর পর্যায়ক্রমে দানা বাঁধে যে চট করে তা ধরা যায় না। মুসলিম উম্মাহর ক্ষেত্রেও এর ব্যতিক্রম হলো না। কেউ বুঝতে পারলো না, কাফেলার গতি ধীরে ধীরে কমে আসছে এবং কাফেলা থেমে যাচ্ছে। হতে হতে একসময় দেখা গেলো, কাফেলার নেতৃত্বই বদলে গেছে। যারা ছিলো কাফেলার সালার ও রাহবার, তাদেরকে রাহবারি ও নেতৃত্বের অবস্থান থেকে সরে যেতে হয়েছে, এজন্য যে, তারা কাফেলার হেফাজত ও সুরক্ষার যথাযথ ব্যবস্থা করেনি। এক আজনবী মুসাফির, যাকে কাফেলার কেউ জানে না, চেনে না; কাফেলার মানযিল

ও গন্তব্য সম্পর্কে যার কিছুই জানা নেই, জানার আগ্রহও নেই, বরং তার রয়েছে নিজস্ব স্বার্থচিন্তা ও লুণ্ঠনমানসিকতা– এমন এক আজনবী মুসাফির শুধু অস্ত্রের বলে এবং শক্তির যুক্তিতে কাফেলার রাহবারি ও নেতৃত্ব ছিনিয়ে নিলো। কারণ যারা ছিলো কাফেলার সালারি ও রাহবারির আসল হকদার তারা ভুল করেছিলো এবং ভুলে গিয়েছিলো। ফলে কাফেলার মধ্যে মুসাফিরবেশে ঢুকে পড়েছে আজনবী, যার উদ্দেশ্য ছিলো কাফেলার রাহবারি নয়; রাহযানি। এভাবে রাহযান হয়ে গেলো রাহবার। ফলে কাফেলার আঞ্জাম ও পরিণতি যা হওয়ার তাই হলো।

গতির যুগের দাবী রক্ষা করে এর উপমা দিতে গিয়ে একজন অন্তর্দর্শী বলেছেন, 'কিংবা যেন এক রেলগাড়ী পূর্ণগতিতে ছুটে চলেছে গন্তব্য-অভিমুখে। চালকের আসনে যিনি, পূর্ণ দক্ষতা ও যোগ্যতার সঙ্গেই চালনা করছিলেন। কিন্তু একসময় কী হলো? চলন্ত রেলগাড়ীর হাজার হাজার যাত্রীর জীবন ও সম্পদ রক্ষার এবং গন্তব্যে পৌঁছে দেয়ার দায়িত্ব যার কাঁধে তাকে পেয়ে বসলো তন্দ্রার ঘোর। পথ যেহেতু ছিলো সরল সোজা সেহেতু চালকের তন্দ্রা সত্ত্বেও গাড়ী কিছুদূর চলতে থাকলো। কিন্তু তারপর ধীরে ধীরে গাড়ীর গতি কমতে শুরু করলো। এই সুযোগে ডাকাতদল গাড়িতে উঠে পড়লো। আর তন্দ্রাচ্ছন্ন চালককে সরিয়ে চালকের আসনে বসে গেলো এবং গাড়ির দখল নিয়ে নিলো।

কিংবা যেন এযুগের বিমান ছিনতায়ের ঘটনা। যাত্রীবেশে ছিনতাইকারী আগেই বিমানে উঠে বসেছিলো। বিমানচালনার দায়িত্বে যারা ছিলেন তারা পূর্ণ সতর্ক ছিলেন না। বিমান চালাচ্ছেন আর নিজেদের মধ্যে খোশগল্প করছেন। যাত্রীবেশী ছিনতাইকারী ধীরে ধীরে অগ্রসর হলো এবং ককপিটে ঢুকে পড়লো। তারপর অস্ত্রের জোরে পাইলটকে সরিয়ে দিয়ে নিজেই চালকের আসনে বসে গেলো এবং গতিপথ পরিবর্তন করে নিজের পছন্দের গন্তব্যে বিমান উড়িয়ে নিয়ে যেতে লাগলো। যাত্রীরা হয়ত জানলো বা জানলো না, বিমান ছিনতাই হয়ে গেছে এবং বিমানের গতি পরিবর্তন হয়ে গেছে।

যাই হোক আগের উদাহরণে ফিরে আসি। কাফেলার নতুন সালার ও রাহবার কাফেলাকে এমন এক পথে নিয়ে গেলো যাতে রয়েছে কঠিন চড়াই উৎরাই, খানাখন্দক এবং ঝুঁকিপূর্ণ বিভিন্ন বাঁক। যেখানে দিনের আলোতেও রয়েছে রাতের অন্ধকার। কাফেলার অসহায় যাত্রীরা বারবার হোঁচট খায়, উপুড় হয়ে

পড়ে যায়, আর্তনাদ করে, ফরিয়াদ করে। কিন্তু নতুন সালারের তো কাফেলার যাত্রীদের প্রতি দয়ামায়া নেই। তাকে তখন পেয়ে বসেছে শক্তির নেশা এবং দ্রুততম গতিতে গন্তব্যে পৌঁছার উন্মাদনা। কোন্ গন্তব্যে? কাফেলার সালার ও রাহবার নিজেও হয়ত জানে না তা। সে শুধু কাফেলার ইচ্ছুক, অনিচ্ছুক, নিশ্চুপ ও প্রতিবাদী সব যাত্রীকে টেনে হেঁচড়ে নিয়েই চলেছে সামনের দিকে। একসময় দেখা গেলো, সামনে এক বিশাল উপত্যকা, যেখানে আছে শুধু আগুন ও ধ্বংস, যেখান থেকে বের হয়ে আসার কোন পথই আর খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না। কাফেলার যাত্রীরা তো বটেই, এমনকি সালার ও রাহবারও এখন সেই ধ্বংসের আগুনে জ্বলে পুড়ে সারখার হচ্ছে।

এটা কোন কল্পকথা বা কাল্পনিক উপমা নয়; বরং কঠিন বাস্তব ও নির্মম সত্য। এটা অস্বীকার করার উপায় নেই যে, মুসলিম উম্মাহ একসময় ভুলে গিয়েছিলো, কী উদ্দেশ্যে ছিলো পৃথিবীতে তাদের উত্থান, এবং দ্বীন ও দুনিয়া উভয় ক্ষেত্রে তাদের কী দায়িত্ব ও কর্তব্য। এটা ছিলো তাদের নিজেদের প্রতি এবং গোটা মানবজাতির প্রতি এক অমার্জনীয় অপরাধ। ফলে যখন তারা জীবনের মঞ্চ ও যিন্দেগির ময়দান থেকে সরে গেলো এবং বিশ্বের কর্তৃত্ব ও জাতিবর্গের নেতৃত্ব থেকে বিচ্যুত হলো তখন পৃথিবীর নেতৃত্ব ও নিয়ন্ত্রণভার ইউরোপের ঐসব জাতি গ্রহণ করলো যাদের কাছে শুরু থেকেই আসমানী ইলম ও ঐশী জ্ঞান বলতে কিছুই ছিলো না; ছিলো না ঈমান ও বিশ্বাস এবং হিকমত ও প্রজ্ঞার স্বচ্ছ কোন ঝর্ণাধারা। নবুওতের আলো আসলে সেখানে পৌঁছতেই পারেনি। হযরত ঈসা মাসীহ-এর তালীম ও শিক্ষার সামান্য আলো যাও বা পৌঁছেছিলো তাও ভুল ব্যাখ্যা ও বিকৃতির আঁধারে হারিয়ে গিয়েছিলো। সেই আসমানি নূর ও ঐশী আলোর অভাব তারা পূরণ করতে চেয়েছিলো গ্রীক ও রোমান 'পুঁথি-পুস্তকের কালো কালি' দ্বারা। কেননা তদানীন্তন জাহেলিয়াতের প্রতিনিধি গ্রীস ও রোমের যাবতীয় জ্ঞান-দর্শন উত্তরাধিকাররূপে তাদের হাতে এসেছিলো এবং বংশগতভাবে তাদের যাবতীয় স্বভাব ও প্রকৃতি এবং নৈতিক ও চিন্তানৈতিক গুণাগুণ তাদের সত্তায় পূর্ণরূপে স্থানান্তরিত হয়েছিলো। গ্রীকধারা থেকে তারা পেয়েছিলো ইন্দ্রিয়পরায়ণতা, ভোগবাদিতা, অবাধ ব্যক্তিস্বাধীনতা, অতি উগ্র স্বদেশবাদ ও আধ্যাত্মিকতার প্রতি বিমুখতা। পক্ষান্তরে রোমানধারা থেকে পেয়েছিলো ঈমান ও বিশ্বাসের দুর্বলতা, আগ্রাসী জাতীয়তাবাদ, ক্ষমতা ও শক্তির পূজা এবং সাম্রাজ্যবাদের মানসিকতা। ঈসা মাসীহ-এর ধর্মশিক্ষা ও ধর্মীয় নীতিমালার

ছিটেফোঁটা যা কিছু ছিলো (যা সম্ভবত মূলের এক দশমাংশও নয়), রোমান প্রতিমাবাদ এবং সেন্টপল ও সম্রাট কনস্টান্টাইনের কপটতার নীচের চাপা পড়ে গিয়েছিলো। এরপরো যদি কিছু অবশিষ্ট থেকে থাকে তবে তা পোপ-পাদ্রী ও ধর্মপতিদের মনগড়া ব্যাখ্যার আবর্তে হারিয়ে গিয়েছিলো।

অন্যদিকে বৈরাগ্যবাদের স্বভাববিরুদ্ধ উন্মাদনার প্রতিক্রিয়ারূপে দেখা দেয় ভোগবাদ ও বস্তুবাদ। তারপরে 'গীর্জাপতিদের' ভোগলালসা ও দুনিয়ামুখিতার কারণে দেখা দেয় ধর্ম ও ধর্মপন্থীদের প্রতি সমাজের সর্বত্র ভয়ানক অনাস্থা ও ঘৃণা। তদুপরি রাজা ও গীর্জার মধ্যকার দ্বন্দ্বের কারণে জাতীয় স্বভাবের মধ্যে সৃষ্টি হয় দ্রোহ ও ভারসাম্যহীনতা, যার ফলে শেষ পর্যন্ত ধর্ম ও রাজনীতির স্থায়ী বিচ্ছেদ সূচিত হয়। সর্বোপরি ধর্মনেতা ও গীর্জাপতিদের স্থবিরতা, নির্বুদ্ধিতা ও হিংস্রতার ফলে ধর্ম ও বিজ্ঞানের মধ্যে যে রক্তক্ষয়ী সংঘাত ইউরোপজুড়ে দেখা দেয় তাতে নামেমাত্র টিকে থাকা ধর্মের বিরুদ্ধেও স্থায়ী শত্রুতার বীজ বপিত হয়। তার উপর অপরিপক্ব প্রগতিবাদিদের অসহিষ্ণুতা, তাড়াহুড়া ও (বুদ্ধিবৃত্তির নামে) গোঁড়ামি, ধর্মের সঙ্গে সমাজের শেষ বন্ধনটুকুও ছিন্ন করে ফেলে। তাতে ধর্মের ছিটেফোঁটা উপকার ও কল্যাণ থেকেও মানুষ বঞ্চিত হয়ে পড়ে। শেষ পর্যন্ত ইউরোপ ও তার সমগ্র জনগোষ্ঠী জড়বাদ ও বস্তুবাদের জোয়ারে একেবারে ভেসে যায়। পাশ্চাত্যের মানুষ আল্লাহকে ভুলে যায় এবং আল্লাহ-বিস্মৃতির স্বাভাবিক পরিণতিরূপে আত্মবিস্মৃতির শিকার হয়ে পড়ে। সে তখন জানে না- 'কে তার স্রষ্টা এবং কেন তার সৃষ্টি?'

কার্যকারণ যাই হোক, ফল এই দাঁড়ালো যে, ভোগ-উপভোগই হয়ে গেলো জীবনের লক্ষ্য এবং বিত্তপূজাই হয়ে গেলো জীবনের ধর্ম। বলা যায় বস্তুবাদের উপর ভর করে এমন এক নির্ভেজাল অর্থনৈতিক 'সর্বেশ্বরবাদ' জন্ম নিলো, যার শ্লোগান হলো-

لا إلـه إلا الخبز، ولا موجود إلا البطن

রুটিই একমাত্র উপাস্য এবং উদরই একমাত্র সত্য।

অন্যদিকে তাদের সামনে জীবনের সঠিক উদ্দেশ্য ও আদর্শ এবং বিশ্বের জন্য কোন কল্যাণবার্তা ও কর্মপন্থা না থাকার কারণে আগ্রাসী জাতীয়তাবাদই সামনে এসে গেলো জাতীয় জীবনের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যরূপে। সুতরাং নিজস্ব জাতীয়

অস্তিত্ব রক্ষার প্রয়োজনে জন্ম নিলো অন্যান্য জাতি ও জনগোষ্ঠীর প্রতি ভীতি ও ঘৃণার আবেগ-উত্তাপ। একদিকে গোটা প্রাচ্যকে ধরে নেয়া হলো ইউরোপের প্রতিদ্বন্দ্বী শিবির ও শক্তিরূপে; অন্যদিকে আভ্যন্তরীণ বিভিন্ন 'উপ-জাতীয়বাদের' সীমারেখা দ্বারা সমগ্র ইউরোপকে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ভূখণ্ডে বিভক্ত করা হলো। প্রত্যেক ভূখণ্ডের জনগোষ্ঠী মনে করছে, এই সীমানার ভিতরেই শুধু মানুষের বসবাস। এর বাইরে কোন মানুষের অস্তিত্ব নেই, থাকতে পারে না।

হতে হতে এই হলো যে, পাশ্চাত্যের সাম্রাজ্যবাদ আজ সমগ্র পৃথিবীকে দাস ব্যবসায়ের বিশাল বাজারে পরিণত করেছে, যেখানে বিভিন্ন জাতি ও জনগোষ্ঠীর কেনাবেচা হয় এবং বাঁচামরার ফায়ছালা হয়। বড় বড় শক্তির দ্বন্দ্ব-সংঘাতের ফলে দুনিয়া যেন এখন কামারের দোকান, যেখানে দাউ দাউ আগুনে লোহা গরম করা হয় এবং দুশমনকে ঘায়েল করার হাতিয়ার তৈরী হয়।

বহু শতাব্দী ধরে ধর্ম ও নৈতিকতার শিক্ষা-বঞ্চিত জ্ঞান-গবেষণা ও আবিষ্কার-উদ্ভাবনের অগ্রগতির কারণে ইউরোপীয় জাতিবর্গের জীবনে এখন জাগতিক শক্তি ও আধ্যাত্মিক শক্তির মধ্যে কোন প্রকার ভারসাম্যই আর বাকি নেই। মানুষ পাখীর মত আকাশে উড়তে শিখেছে এবং মাছের মত পানিতে ডুব-সাঁতার দিতে শিখেছে, কিন্তু মাটির উপর মানুষের মত বিচরণ করা ভুলে গেছে। অনুভব-অনুভূতিহীন এবং লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যহীন বিজ্ঞান-গবেষণা ও প্রযুক্তিচর্চা এযুগের উন্মাদ মানুষের হাতে যেন ধারালো অস্ত্র তুলে দিয়েছে, যা দ্বারা কখনো সে নিজেকে জখম করে, কখনো আপন ভাইকে ক্ষতবিক্ষত করে; বরং বলা যায় অন্ধ-বধির বিজ্ঞান পারমাণবিক ও হাইড্রোজেন বোমার আকারে মানুষের হাতে আজ গণহত্যার অস্ত্র তুলে দিয়েছে।

এসকল ধর্মহীন; বরং ধর্মবিদ্বেষী জাতি ও জনগোষ্ঠীর শাসন-শোষনের যুগে মানুষ আজ ধর্মীয় অনুভূতি থেকে প্রায় বঞ্চিত হয়ে পড়েছে, যা অন্যান্য মানবীয় অনুভূতির সঙ্গে প্রাচ্যের হাজার বছরের জীবনে অবিচ্ছেদ্য উপাদানরূপে বিদ্যমান ছিলো। ফলে একসময় যেখানে ছিলো ত্যাগ ও আত্মত্যাগ এবং আল্লাহমুখিতার সর্বব্যাপী প্রবাহ সেখানে এখন চলছে লোভলালসা ও দুনিয়ামুখিতার সর্বনাশা দুর্যোগ। চরিত্র ও নৈতিকতায় এখন ধ্বস নেমেছে। আত্মিক গুণাবলী ও পরম মানবীয় বৈশিষ্ট্যসমূহ লোপ পেয়ে গেছে। ফলে ইস্পাত ও লোহা তো প্রভূত উন্নতি করেছে, কিন্তু সর্বদিক থেকেই মনুষ্যত্বের ঘটেছে অবক্ষয় ও বিপর্যয়।

আজ পৃথিবীর বুকে এমন কোন জাতি বা সম্প্রদায় নেই যারা পাশ্চাত্যের জাতিবর্গের চিন্তা ও চিন্তাধারার প্রতি ভিন্নমত পোষণ করে এবং তাদের জাহেলি দর্শন ও বস্তুবাদী জীবনব্যবস্থার বিরোধিতা করে; না ইউরোপ-আমেরিকায়, না এশিয়া-আফ্রিকায়। সবমহাদেশের ছোট বড় সমস্ত জাতি ও জনগোষ্ঠী এই জাহেলি দর্শন ও বস্তুবাদী জীবনব্যবস্থার সামনে মাথা নত করেছে বা করতে বাধ্য হয়েছে। ইচ্ছায় বা অনিচ্ছায় সবাই এখন পাশ্চাত্য জীবনদর্শনের অনুসারী। কারো কারো ক্ষেত্রে বরং 'পূজারী' শব্দটি অধিক উপযোগী। তাহলে জাতিতে জাতিতে এই যে দ্বন্দ্ব-বিরোধ এবং বিভিন্ন চিন্তা-দর্শনের এই যে কখনো উষ্ণ, কখনো শীতল সঙ্ঘাত, এর কারণ কী? কারণ আর কিছু না, নিছক নেতৃত্বের দ্বন্দ্ব। অর্থাৎ জীবনের গাড়ী যে গন্তব্যের দিকে চলছে তাতে কোন প্রশ্ন নেই। প্রশ্ন শুধু এই, চালকের আসনে কে বসবে? আমি না তুমি? বিরোধ আদর্শ ও উদ্দেশ্যের নয়, নেতৃত্বের, নিয়ন্ত্রণের, স্বার্থ উদ্ধারের, এগিয়ে যাওয়ার এবং ছাড়িয়ে যাওয়ার।

কোন শক্তিমান জাতির জাত্যাভিমান এটা মেনে নিতে রাজী নয় যে, অন্য কোন শক্তি দীর্ঘদিন বিশ্বনেতৃত্বের আসনে পাকাপোক্ত হয়ে বসে থাকবে। বাজার ও উপনিবেশগুলোর উপর একচেটিয়া দখল কায়েম করে রাখবে। মাল, কাঁচামাল ও প্রাকৃতিক সম্পদ একা ভোগ করে যাবে, অথচ মেধায়, প্রতিভায়, দক্ষতা ও যোগ্যতায় এবং জনবল ও অস্ত্রবলে সে কারো চেয়ে পিছিয়ে নেই; বরং হয়ত এগিয়েই আছে। বাকি রইল অন্য পথ, অন্য মত গ্রহণ করা; পৃথিবীকে কল্যাণের পথে পরিচালিত করা; জাতিতে জাতিতে ন্যায় ও সুবিচার প্রতিষ্ঠা করা; জীবনের গতিধারা ধর্মহীনতা ও বস্তুবাদ থেকে ধার্মিকতা ও আধ্যাত্মিকতার দিকে পরিচালিত করা; চরিত্রহীনতা থেকে পবিত্রতার দিকে, নফস ও প্রবৃত্তির দাসত্ব থেকে আল্লাহর আনুগত্যের দিকে আহ্বান জানানো; তো এই 'গরীব বেচারা' না কখনো এগুলোর দাবী করেছে, না ইচ্ছা পোষণ করেছে।

একসময় অবশ্য সমাজতান্ত্রিক রাশিয়ার কথা বেশ আলোচনায় আসতো। কেননা মনে করা হতো, এর জীবনব্যবস্থা পাশ্চাত্যের পুঁজিবাদী ব্যবস্থা থেকে ভিন্ন; কিন্তু বাস্তব সত্য এই যে, এটাও পাশ্চাত্য সভ্যতারই পাকা ফল ছাড়া আর কিছু নয়, যা গাছ থেকে পেড়ে নেয়ার সময় হয়ে গেছে। পার্থক্য শুধু – যদি কিছু থেকে থাকে – এই যে, পাশ্চাত্যের কবি, সাহিত্যিক, লেখক, চিন্তাবিদ ও

দার্শনিক বুদ্ধিজীবীগণ যে সামাজিক দর্শন এবং নৈতিক ও অর্থনৈতিক ব্যবস্থার কথা যুগ যুগ ধরে লিখে এসেছেন এবং বিশ্বাস করে এসেছেন, নিজেদের সমাজে তা কখনো বাস্তবায়ন করেননি। তত্ত্ব আউড়েছেন, কিন্তু প্রতিফলন ঘটানোর কাজটি করেননি। পক্ষান্তরে রাশিয়া শুরুতেই কপটতার ঘোমটা ছুঁড়ে ফেলেছে এবং বস্তুবাদী দর্শন ও জীবনব্যবস্থা কঠোরভাবে বাস্তবায়ন করে দেখিয়েছে, বরং বলা যায়, পাশ্চাত্য জাতিবর্গ যে গতিতে ধর্মহীনতা, নাস্তিকতা, নৈতিক স্বেচ্ছাচার ও পাশবিক ভোগবাদের দিকে অগ্রসর হচ্ছিলো, রাশিয়ার সমাজতান্ত্রিক নেতৃবৃন্দ সেটাকে ভেবেছেন 'শম্বুকগতি'। তাই রাশিয়া ধাবমান গতিতে পথ অতিক্রম করেছে এবং গন্তব্যে উপনীত হয়েছে। তারপর পৃথিবীর নেতৃত্বের অধিকার দাবী করেছে, যাতে বিশ্বের সব জাতিকে একই গতিতে ঐ গন্তব্যের দিকে পরিচালিত করতে পারে, যেখানে সে উপনীত হয়েছে।[১]

এশীয় দেশ ও জনগোষ্ঠীসমূহ

এশিয়ার বিভিন্ন দেশ ও জনগোষ্ঠী এবং প্রাচ্যের বিভিন্ন জাতি সম্পর্কে নতুন কিছু বলার নেই। সভ্যতা-সংস্কৃতি এবং অর্থনীতি ও রাজনীতির যে গন্তব্যস্থলে ইউরোপীয় জাতিবর্গ অনেক আগেই উপনীত হয়েছে, প্রাচ্যের জাতিসমূহ বিভিন্ন গতিতে সেই গন্তব্যের উদ্দেশ্যেই পথ চলছে। নীতি ও নৈতিকতা, চরিত্র ও

১। তবে আল্লাহর শোকর, নিরঙ্কুশ কুদরতের কারিশমা এই যে, শেষ পর্যন্ত সোভিয়েত নেতার হাতেই সোভিয়েত রাশিয়ার পতন ঘটেছে, যা অন্তত এত তাড়াতাড়ি কেউ ধারণা করতে পারেনি; এমনকি কল্পনাও করতে পারেনি। এখন মধ্য এশিয়ার সাবেক সোভিয়েতভুক্ত দেশগুলোর মুসলিম জনগোষ্ঠী যথেষ্ট পরিমাণে ধর্মীয় স্বাধীনতা ভোগ করছে, এবং নতুন প্রজন্ম দ্বীনী তালিম ও তারবিয়াত গ্রহণ করছে। আল্লাহ তা'আলা যেন অব্যাহত রাখেন এবং উত্তরোত্তর উন্নতি দান করেন, আমীন। (লেখক)
এটা অবশ্য সত্য যে, এককেন্দ্রিক বিশ্বব্যবস্থার সুযোগে সাম্রাজ্যবাদী আমেরিকা আজ মুসলিমবিশ্বের সঙ্গে চরম স্বেচ্ছাচারী ও আগ্রাসী আচরণ করে চলেছে, যা ঠান্ডা লড়াইয়ের যুগে সম্ভব ছিলো না। কিন্তু মুসলিম উম্মাহর জন্য বর্তমান অবস্থাকে পরিণতির বিচারে আমরা কল্যাণকরই মনে করি। অনেক রক্ত যেমন ঝরছে তেমনি উম্মাহর মধ্যে গণজাগরণও সৃষ্টি হচ্ছে, ইনশাআল্লাহ সেদিন খুব দূরে নয় যখন এ গণজাগরণ গণজোয়ারে, তারপর গণবিস্ফোরণে রূপান্তরিত হবে। মুসলিম উম্মাহর এখন শুধু কর্তব্য হলো সময়ের আঘাত থেকে সঠিক শিক্ষা গ্রহণ করা
সমস্ত আলামত বলছে ছোট হাতির মত বড় হাতিটারও পতনের সময় ঘনিয়ে এসেছে। আরব ও মুসলিম যুবশক্তি রক্ত যখন দিতে শিখেছে, জিহাদ ও শাহাদাতের প্রেরণায় যখন উজ্জীবিত হয়েছে কোন তাগুতি শক্তি ওদের আর রুখতে পারবে না। আসমান থেকে সাহায্যের ফিরেশতা নেমে আসার সময় হয়ে এসেছে। ইনশাআল্লাহ– অনুবাদক

সমাজ এবং জীবন ও জগত সম্পর্কে পাশ্চাত্য যে দর্শন ও চিন্তাধারায় বিশ্বাসী এবং যা পশ্চাত্যের জীবন-বৈশিষ্ট্য, প্রাচ্য সেটাকেই নিজের চিন্তা-বিশ্বাস ও দর্শনরূপে গ্রহণ করে চলেছে; এমনকি প্রাচ্যের ব্যক্তিজীবন ও সামাজিক আচরণও এখন পাশ্চাত্য থেকে খুব বেশী ভিন্ন নয়। পাশ্চাত্যের সঙ্গে প্রাচ্যের যা কিছু দ্বন্দ্ব-সজ্ঞাত তা শুধু একারণে যে, রাজনৈতিক সচেতনতা ও জাতীয়তা-বাদের ব্যাপক জাগরণের কারণে বিদেশী শক্তির শাসন-শোষণ ও আধিপত্য এখন আর তারা মানতে রাজি নয়। ইউরোপ এখানে বড় বড় সাম্রাজ্য ও উপনিবেশ প্রতিষ্ঠা করবে এবং তার ছত্রচ্ছায়ায় সাদা চামড়ার লোকেরা জাঁকজমপূর্ণ আয়েসী ও বিলাসী জীবন ভোগ করবে, আর নিজ দেশেই এরা বরণ করবে দাসত্বের জীবন এবং বঞ্চিত হবে নিজেদের সম্পদ ভোগের অধিকার থেকে, এটা তারা সহ্য করতে পারছে না।

মূল দ্বন্দ্ব-সজ্ঞাত এখানে। বাকি পাশ্চাত্যের জড়বাদ ও বস্তুবাদকে অস্বীকার করা, তাদের জীবন-চরিত্র ও চিন্তা-দর্শনকে ঘৃণাভরে প্রত্যাখ্যান করা, কিংবা হৃদয় ও আত্মার জগতে তাদের দারিদ্র্য ও দেউলিয়াত্বের প্রতি করুণা প্রকাশ করা, এগুলো ক্ষণিকের জন্যও হয়ত কারো অন্তরে উদিত হয়নি। প্রাচ্যের বিভিন্ন দেশের জাতীয়তাবাদী সমগ্র সাহিত্যভাণ্ডারে জীবনবোধ ও আদর্শগত বিরোধের চিহ্নমাত্র আপনি খুঁজে পাবেন না। পাশ্চাত্যের বাহ্যিক জীবন-জৌলুসে প্রাচ্যের জাতিবর্গ এমনই মোহমুগ্ধ যে, তাদের সবকিছু এদের চোখে সুন্দর; এমনকি তাদের জীবনের যত অন্ধকার এদের দৃষ্টিতে তা আলোর চেয়ে উজ্জ্বল। ঝুটঝামেলা শুধু এইটুকু, আমাদের দেশ আমরা চালাবো; আমাদের সম্পদ আমরা ভোগ করবো। তোমাদের মত করেই ভোগ করবো; তবে আমরা ভোগ করবো। অর্থাৎ দাবার ছক পাল্টানো উদ্দেশ্য নয়, খেলা চলবে একই ছকে, একই চালে। শুধু খেলোয়াড় পরিবর্তন করা উদ্দেশ্য। তদুপরি প্রাচ্যের বহু জাতির রয়েছে নিজস্ব অতীত এবং নিজস্ব জাহেলিয়াত, যার সাথে এখন যুক্ত হয়েছে ফিরিঙ্গি জাহেলিয়াত। সুতরাং শ্বেতাঙ্গ শাসককে সরিয়ে যখন এই 'কালোরা' ক্ষমতায় আসবে, মানুষকে তখন তারা উভয় জাহেলিয়াতের মিশ্র রস আস্বাদন করাবে, যা হবে আরো তিক্ত। তাই দেখা যায়, শোষিত, বঞ্চিত, মযলুম ও পরাধীন এসব জাতি যখন যেখানে স্বাধীতার সুযোগ এবং শাসনক্ষমতা হাতে পেয়েছে তখনই তাদের জাহেলি স্বভাব-চরিত্র স্বরূপে আত্মপ্রকাশ করেছে, যা ফিরিঙ্গি জাহেলিয়াত থেকেও কদর্য ও বীভৎস। তাদের হাতে তখন এমন

নিষ্ঠুরতা ও হিংস্রতা প্রকাশ পেয়েছে; নিরাপরাধ রক্তের এমন হোলিখেলায় তারা মেতেছে, মানুষের জানমাল, ইজ্জত-আবরু এমন নির্দয়ভাবে লুণ্ঠিত হয়েছে, জনপদের পর জনপদে এক সময়ের মজলুম জাতির হাতে এমন পাশবিকতা ও ধ্বংসযজ্ঞ ঘটেছে, যার নযীর এমনকি ফিরিঙ্গি বর্বরতার ইতিহাসেও খুঁজে পাওয়া যায় না।

এশিয়ার কোন কোন জনগোষ্ঠী বিদেশী শাসন থেকে মুক্ত হওয়ার অব্যবহিত পর তাদেরই স্বদেশবাসী দুর্বল নিরস্ত্র সংখ্যালঘু জনগোষ্ঠীর উপর এমন জঘন্য পাশবিকতার পরিচয় দিয়েছে, বনের বন্য পশুরাও যাতে লজ্জা পায়। ধর্মীয় ও রাজনৈতিক সাম্প্রদায়িকতার এমন ভয়ঙ্কর উন্মাদনায় তারা মেতেছে, যাতে খোদ ইবলিসেরও বুক কেঁপে উঠতে পারে। দুধের শিশুকে ত্রিশূলে গাঁথা হয়েছে। আবরুলুণ্ঠিতা নারীকে জীবন্ত জ্বালানো হয়েছে। না ছিলো লাজ-লজ্জা, না ছিলো দয়ামায়া। কুয়ায় বিষ ঢালা হয়েছে যাতে পানি খেয়ে এবং পানি না পেয়ে ছটফটিয়ে মানুষ মরে। ঘরবাড়ি গুঁড়িয়ে দেয়া হয়েছে। গোটা জনপদ আগুন জ্বেলে সারখার করা হয়েছে। নেকড়ে তার শিকারকে যেমন ছিন্নভিন্ন করে, পথে ঘাটে দেখা গেছে এমন বহু নারীদেহ। হত্যার আগে তাদের উপর চালানো হয়েছে এমন পাশবিকতা যা কোন মানুষের পক্ষে কল্পনা করাও সম্ভব নয়। এই বর্বরতা, এই নারকীয়তা, হিন্দুদের হাতে যেমন ঘটেছে, তেমনি ঘটেছে ইহুদীদের হাতে; ঘটেছে 'সর্বজীবে দয়া' যাদের ধর্ম সেই বৌদ্ধদের হাতে। লজ্জায় মাথা নত হয়ে আসে, এমন কি এসব ঘটেছে কোন কোন মুসলিম দেশে মুসলিমের হাতে মুসলিমের ভাগ্যে।

এছাড়াও রয়েছে সংখ্যাগুরু সম্প্রদায়ের পক্ষ হতে নিজ ভূমিতে সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের উপর ধর্মীয় নিপীড়ন ও সামাজিক অবরোধ। জীবনযাত্রা দুর্বিষহ করার এমন কোন উপায় ও কৌশল নেই যা প্রয়োগ করা হচ্ছে না। তাদের ধর্ম, কৃষ্টি, ঐতিহ্য ও সমাজবৈশিষ্ট্য এখন হুমকির মুখে। অন্য ভাষা চাপিয়ে দিয়ে তাদের ভাষা-স্বাধীনতা হরণ করা হচ্ছে। সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা বাঁধিয়ে তাদেরই উপর আরোপ করা হচ্ছে কল্পিত অপরাধের দায়। মিথ্যার পর মিথ্যা সাজিয়ে তাদের গৌরবময় ইতিহাসকে করা হচ্ছে ধিকৃত-কলঙ্কিত। প্রতিদিন কোন না কোনভাবে অভিনীত হচ্ছে নেকড়ে ও মেষশাবকের কাহিনী। সম্পদ লুণ্ঠিত হচ্ছে, ব্যবসা-বাণিজ্য ও রুটি-রুজির পথ রুদ্ধ হচ্ছে। হাস্যকর ছলছুতায় তাদের চাকুরিচ্যুত করা হচ্ছে। মেধা ও প্রতিভার অবমূল্যায়ন করা হচ্ছে, বরং অপমৃত্যু

ঘটানো হচ্ছে। আন্তধর্ম বিবাহের নামে তাদের বংশধারা বিলুপ্তির ষড়যন্ত্র হচ্ছে। আরো মর্মান্তিক বিষয়, যা কিছু করা হচ্ছে তা ধর্মের নামে, দেবতা ও ভগবানের দোহাই দিয়ে। অথচ প্রকৃত সত্য এই যে, ধর্ম ও চরিত্র এবং নীতি ও নৈতিকতা সর্বক্ষেত্রে এসব জাতি আজ শাব্দিক অর্থেই দেউলিয়া হয়ে পড়েছে। বস্তুবাদিতা ও অর্থলিপ্সা তাদের অস্থিমজ্জায় মিশে গেছে। আত্মস্বার্থচিন্তা ও অন্তহীন ভোগ-লিপ্সা তাদের এমনভাবে পেয়ে বসেছে যে, সরকার ও শাসকদল নিজেরাই দিশেহারা হয়ে পড়েছে। দুর্মূল্য ও অগ্নিমূল্যের কারণে জীবনযাত্রা বিপর্যস্ত হয়ে পড়েছে। পরিস্থিতি সামাল দেয়ার চেষ্টায় সরকার যখন মূল্যনিয়ন্ত্রণ করতে চায় তখন বাজার থেকে দ্রব্য উধাও হয়ে যায়। ফলে সাধারণ মানুষ মুনাফালোভী ব্যবসায়ীদের আরোপিত মূল্যে খাদ্য ও জীবন ধারণের প্রয়োজনীয় দ্রব্য আর সংগ্রহ করতে পারে না। এভাবে কালোবাজারি, চোরাচালানি, ঘুষ-উৎকোচসহ যাবতীয় অবৈধ উপায়ের হার এবং সমাজের সর্বস্তরে অপরাধপ্রবণতা ভয়ানক-ভাবে বেড়ে যায়। সরকার ও ব্যবসায়ী সম্প্রদায় নিজ নিজ স্বার্থরক্ষায় হয়ে ওঠে মরিয়া, যেন ঘোড়দৌড়ের দুই ঘোড়া, কাকে ছাড়িয়ে কে হবে প্রথম। আর হতদরিদ্র, সর্বস্বান্ত আমজনতা! তাদের অবস্থা হয়ে পড়ে যাঁতার দুই পাটের মধ্যে গমের দানা, চূর্ণ ও পিষ্ট হওয়াই যার নিয়তি।

ধর্মনেতা ও সংস্কারকগণ বারবার চেষ্টা করেছেন এসব জাতির পচনধরা দেহে নতুন প্রাণ সঞ্চার করতে এবং সততা, ধার্মিকতা, পুণ্যমনস্কতা, ভোগ-সংযম ও মিতব্যয়িতা এবং নীতি ও নৈতিকতার প্রতি অনুপ্রাণিত করতে। কিন্তু তারা চরম -ভাবে ব্যর্থ হয়েছেন এবং বুঝতে পেরে হাল ছেড়ে দিয়েছেন যে, একটি নতুন জাতি সৃষ্টি করা এসব জাতির সংস্কার ও সংশোধনের চেয়ে অনেক বেশী সহজ কাজ। কেননা তাদের জাতিসত্তায় কল্যাণ-উপাদানই নষ্ট হয়ে গেছে এবং তাদের স্বাভাবিক 'আয়ু' ফুরিয়ে গেছে।

মোট কথা, পূর্ব-পশ্চিম সমগ্র বিশ্ব আজ এক ভয়াবহ নৈতিক, আত্মিক, সামাজিক ও অর্থনৈতিক সঙ্কট ও দুর্যোগে নিপতিত। অনিবার্য ধ্বংসের হাত থেকে মানব-জাতিকে রক্ষ করতে হলে এখনই এবং এখনই খুঁজে বের করতে হবে নির্ভুল ও কার্যকর কোন সমাধানের পথ।

উপরে বিশ্বমানবতার সামগ্রিক বিপর্যয়ের যে উদ্বেগজনক চিত্র তুলে ধরা হলো তার একমাত্র এবং একমাত্র সমাধান হলো অযোগ্য, আদর্শচ্যুত ও ধর্মবিচ্যুত

জাতির হাত থেকে বিশ্বের নেতৃত্বভার এমন জাতির হাতে অর্পণ করা যাদের যোগ্যতা, দক্ষতা, ধার্মিকতা এবং মানবতার প্রতি আন্তরিকতা ও কল্যাণ-মনস্কতা প্রশ্নাতীত।

ব্রিটিশ জাতির হাত থেকে মার্কিন জাতির হাতে বা উভয়ের হাত থেকে রুশ জাতির হাতে ক্ষমতা ও নেতৃত্বের হস্তান্তরে মানবজাতির কোন উপকার হবে না এবং পরিস্থিতির কোন পরিবর্তন হবে না। কেননা এর অর্থ হলো শুধু একটি হাত পরিশ্রান্ত হয়েছে বলে অন্য হাতে বৈঠা ধরা। নৌকার বৈঠা ও মাঝী যেখানে অভিন্ন সেখানে ডান হাত আর বাঁ হাতে কোন পার্থক্য নেই। ব্রিটেন, আমেরিকা বা রাশিয়া কিংবা এশিয়ার চীন-জাপান আসলে একই ব্যক্তির ভিন্ন ভিন্ন হাত ছাড়া আর কিছু নয়, যা পালাক্রমে বৈঠা চালাচ্ছে, আর নৌকা চলছে একই রেখায় একই অভিমুখে।

নেতৃত্বের যে পরিবর্তন এবং ক্ষমতার যে হস্তান্তর বিশ্ব ও মানবজাতির জন্য সত্যিকার অর্থে কল্যাণকর হতো তা হলো ব্যাপক অর্থে জড়বাদী সভ্যতা ও বস্তুবাদী জীবন-দর্শনের ধারক বাহক পশ্চিমা জাতিবর্গ থেকে ইসলামী বিশ্বের কাছে নেতৃত্বের হস্তান্তর এবং মানবজাতিকে শান্তি, কল্যাণ ও মুক্তির পথে চালিত করার দায়িত্ব মুসলিম উম্মাহর হাতে অর্পণ; যাকে স্বয়ং মুহম্মদুর রসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর চিরস্থায়ী রিসালাত ও শরীয়ত দ্বারা পরিচালনা করেছেন। এটাই শুধু পারে আবার ইতিহাসের গতিধারা পরিবর্তন করতে এবং পারে বিশ্ব ও মানবজাতিকে সম্ভাব্য বিপর্যয়ের হাত থেকে রক্ষা করতে।

ইসলামী বিশ্বের এখন অবশ্যকর্তব্য হলো বিশ্বনেতৃত্বের মহামর্যাদাপূর্ণ ও মহাদায়িত্বপূর্ণ আসনটি গ্রহণ করার জন্য উদ্যোগী হওয়া। প্রতিটি মুসলিম দেশ ও মুসলিম জনগোষ্ঠীর কর্তব্য হলো বিশ্বনেতৃত্বের মঞ্চে উম্মাহর প্রতিনিধিত্ব করার এক মহাকর্মযজ্ঞে ঝাঁপিয়ে পড়া এবং যোগ্যতার স্বাক্ষর রাখা। উম্মাহর প্রতিটি সদস্যের, প্রত্যেক নর-নারীর কর্তব্য হলো জান-মাল কোরবান করে এই সুমহান লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য অর্জনের জিহাদে শামিল হওয়া এবং সাধ্য ও সামর্থ্যের শেষ বিন্দুটুকু এতে উৎসর্গ করা।

এটাই হলো সেই মহান দায়িত্ব যা ইসলামী উম্মাহর ভাগ্যের সঙ্গে জুড়ে দেয়া হয়েছে, ঠিক সেই দিন যেদিন অস্তিত্বের জগতে তার আত্মপ্রকাশ ঘটেছে, যেদিন 'আরব জাযিরা'র পবিত্র মাটিতে তার অঙ্কুরোদ্গম হয়েছে।

কিন্তু আমাদের সামনে নির্মম বাস্তবতা কী? বাস্তবতা এই যে, মুসলিম জাতি, যারা ছিলো প্রজন্ম পরম্পরায় জাহেলিয়াতের আদী শত্রু, তারা আজ পৃথিবীর বিভিন্ন ভূখণ্ডে ইউরোপীয় জাহেলিয়াতের বন্ধু ও মিত্র, বরং লাঠিয়াল ও বরকন্দাযের ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়েছে এবং নিজেদের বিশ্বস্ততার বিষয়ে আশ্বস্ত করার জন্য বিভিন্নভাবে স্বতঃস্ফূর্ত সেবা দিয়ে চলেছে। এমনকি ইসলামের কেন্দ্ররূপে বিবেচিত ও পরিচিত ভূখণ্ডগুলোও এর ব্যতিক্রম নয়। বিপদের উপর বিপদ এই যে, ইউরোপীয় জাতিবর্গ, যারা বহু শতাব্দী ধরে জাহেলিয়াতের নেতৃত্ব দিয়ে আসছে; প্রয়োজনে জাহেলিয়াতের মৃতদেহে নতুন প্রাণ সঞ্চার করে আসছে; যুগে যুগে পূবে-পশ্চিমে পৃথিবীর সর্বভূখণ্ডে যারা জাহেলিয়াতের বিজয়পতাকা উড়িয়েছে, কোন কোন মুসলিম জনগোষ্ঠী ও তাদের সরকার তাদেরকেই ভাবছে ইসলাম ও মুসলিম উম্মাহর দরদী বন্ধু, কিংবা অন্তত তাদের সম্পদ ও স্বার্থের রক্ষক, তাদের ভূখণ্ড ও সীমান্তের বিশ্বস্ত প্রহরী। কারো কারো চোখে তো ইউরোপ-আমেরিকাই হলো আজকের বিশ্বে ন্যায়, ইনসাফ ও সুবিচারের পৃষ্ঠপোষক! বোকা মেষশাবক এখন ধূর্ত নেকড়েকেই ভাবছে দরদী অভিভাবক! ইউরোপের আধুনিক জাহেলিয়াতের এর চেয়ে বড় সফলতা আর কী হতে পারে!

মুসলিম উম্মাহর আমজনতার অবস্থা আরো শোচনীয়। বিশ্বের নেতৃত্বের ধারণা তো তারা কবেই ছেড়ে দিয়েছে। জিহাদের ইসলামী ফৌজের জানবায সিপাহী হওয়ার পরিবর্তে জাহেলিয়াতের 'ভারবাহী' হতে পেরেই তারা সন্তুষ্ট ও কৃতার্থ। পাশ্চাত্যের বস্তুবাদী জাহেলিয়াত ও জীবনদর্শন তাদের মনমস্তিষ্কে, চিন্তাচেতনায় ও জীবনযাপনে এমনভাবে বিস্তার লাভ করেছে যেমন শিকড় বেয়ে পানি এবং তার বেয়ে বিদ্যুৎ। মুসলিমবিশ্বের যে কোন শহর-নগর ও জনপদে যান, পশ্চাত্যের জড়বাদী সভ্যতা ও বস্তুবাদী জীবনদর্শনের বিভিন্ন প্রকাশ ও অতি-প্রকাশ পূর্ণ জৌলুশ ও প্রতাপের সঙ্গেই দেখতে পাবেন এবং দেখে আপনাকে হতবাক হতে হবে। তখন নিজেকেই হয়ত প্রশ্ন করতে ইচ্ছে হবে, ভুল করে আমি কি কোন ইউরোপীয় ভূখণ্ডে এসে পড়েছি?! প্রবৃত্তির এমন উগ্র চাহিদা, ভোগসর্বস্ব জীবনের প্রতি এমন উদগ্র লালসা, যেন আখেরাত বলে কিছু নেই এবং এ জীবনের পর সেই জীবন নেই, যার শুরু আছে শেষ নেই। যেখানে নায-নেয়ামতের অন্ত নেই।

সর্বত্র একই ছোটাছুটি, একই দৌড়ঝাঁপ, একই কামড়াকামড়ি; অন্যকে বঞ্চিত করো, নিজের ঝুড়ি পূর্ণ করো। যেভাবে পারো কামাই করো আরো ভোগ করার জন্য, এবং যেভাবে পারো ভোগ করো আরো কামাই করার জন্য। এ যেন এমন ক্ষুধা যা কবরের মাটি ছাড়া দূর হবে না, এবং এমন পিপাসা যা সাগরের পানিতেও মিটবে না।

হায় আফসোস! এই সেদিন পর্যন্ত যে সকল ভূখণ্ড ও জনপদে সংযম, সততা ও ধার্মিকতাই ছিলো মানুষের জীবনের প্রধান বৈশিষ্ট্য, যাদের কাছে আখেরাতের যিন্দেগিই ছিলো আসল যিন্দেগি, পাশ্চাত্যের শিক্ষা, সভ্যতা ও সংস্কৃতির প্রভাবে তাদের মধ্যেও আখেরাতের চিন্তা দুর্বল এবং দুনিয়ার চিন্তা প্রবল হয়ে চলেছে। নীতি, নৈতিকতা, আদর্শ ও মূল্যবোধের কোন পরোয়া নেই। ব্যক্তিস্বার্থ ও ব্যক্তিক লাভক্ষতি ছাড়া অন্য কিছুর গুরুত্ব নেই। যেন কোন নবুয়ত ও কিতাবের সঙ্গে পরিচয় নেই, এবং মৃত্যুর পর হিসাব ও বিচারের ভয় নেই। জীবনের প্রতি এমন আশক্তি, যেন দু'দিনের এ জীবনই একমাত্র সম্বল এবং আশা-ভরসার স্থল। মৃত্যুকে তাদের এত ভয় যেন...!

শিক্ষিত, অভিজাত ও উচ্চাভিলাষী মুসলমানরা ইউরোপের উন্নত ও প্রাগ্রসর লোকদের পদাঙ্ক অনুসরণে ব্যস্ত। বাহ্যিক চাকচিক্য ও অন্তসারশূন্য জৌলুশের প্রতি তারা এমনই মোহমুগ্ধ যে, জীবনের স্থূল সব স্বপ্ন ও উচ্চাভিলাষ পূর্ণ করার জন্য ক্ষমতা ও সম্পদের সামনে মাথা নোয়াতে এবং ক্ষমতাধর ও বিত্তশালী মানুষের সামনে জোড় হাতে দাঁড়াতে কোন আপত্তি নেই। বিত্তের জন্য চিত্তের ঐশ্বর্য জলাঞ্জলি দিতে কোন দ্বিধা নেই। শক্তি ও ক্ষমতা, পদ ও সম্পদ এবং রাজা ও রাজসরকার, এগুলো যেন মূর্তি ও দেবদেবী, আর তারা এর কৃতার্থ পূজারী।

তবু আশার আলোক শিখা

যা কিছু বলা হলো সবই সত্য, তবে সবচে' বড় সত্য এই যে, যত দোষ-দুর্বলতা, ও ক্ষয়-অবক্ষয় মুসলিম উম্মাহকে নিস্তেজ করে রাখুক; এই ঘোর অন্ধকারে তাদেরই কাছে আছে আশার আলো। কারণ পৃথিবীর বুকে মুসলমানই একমাত্র উম্মাহ যারা বিশ্বনেতৃত্বের দাবী নিয়ে পশ্চিমা জাতিবর্গের বিরুদ্ধে দাঁড়াতে পারে এবং বস্তুবাদী সভ্যতার সব অনাচারের বিরুদ্ধে কার্যকর প্রতিরোধ গড়ে তুলতে পারে। আর তা এজন্য যে, তাদের দ্বীন ও শরীয়াত তাদের উপর এই আসমানী দায়িত্ব আরোপ করেছে যে, সবসময় তারা চলমান বিশ্বের

গতিধারা পর্যবেক্ষণ করবে এবং মানবজাতির বিভিন্ন সম্প্রদায় ও জনগোষ্ঠীর নীতি ও নৈতিকতা, আচরণ ও কর্মকাণ্ড এবং ঝোঁক ও প্রবণতার খোঁজখবর ও কৈফিয়ত নেবে। তারপর সৎকর্ম ও ধার্মিকতার দিকে এবং দুনিয়া-আখেরাতের সফলতা ও সৌভাগ্যের দিকে তাদের পথ দেখাবে, বরং হাত ধরে টেনে নিয়ে যাবে। যুক্তি দ্বারা এবং প্রয়োজনে ও সম্ভব হলে শক্তি দ্বারা জাহান্নামের পথ থেকে ফিরিয়ে রাখবে। মুসলমানদের ধর্ম, তাদের অবস্থান এবং তাদের স্বভাব ও প্রকৃতি মোটেই সহ্য করে না যে, জীবনের কোন পর্যায়ে তারা জাহেলিয়াতের সঙ্গে সমঝোতা করবে, কিংবা হয়ে যাবে জাহেলিয়াতের অনুসারী। সুতরাং নিদ্রার ঘোরে আজ তারা যতই আচ্ছন্ন হোক, তাদেরই পক্ষে সম্ভব আবার জেগে ওঠা, আবার ফিরে আসা এবং সমস্ত যমীনে ছড়িয়ে পড়া জাহেলিয়াতকে যমীনের নীচে চিরকালের জন্য দাফন করে দেয়া।

মুসলিম উম্মাহ ছাড়া আর কোন জাতির পক্ষেই সম্ভব নয় এই অগ্নিঝড়ের মোকাবেলা করা। কারণ অন্যান্য জাতি আসমানের হিদায়াত এবং নবুয়তের তা'লীম ও হিকমত হারিয়ে ফেলেছে; যেমন হারিয়ে ফেলে মরুভূমির মুসাফির পথ, পাথেয় ও বাহন। হাঁ, তাদেরও কাছে প্রদীপ ছিলো আলো দেয়ার, কিন্তু বহু আগেই তাদের 'সীনা ও সাফীনায়' নিভে গেছে সেই আলোর প্রদীপ। অতীত ও বর্তমানের বন্ধনকে অটুট রাখার জন্য প্রয়োজন যে যোগসূত্রের, যুগের নির্দয় হাত তা ছিঁড়ে ফেলেছে। সুতরাং তারা হয়ে পড়েছে অতীতহীন বর্তমান, কিংবা বর্তমানহীন অতীত। আর অতীত ও বর্তমানের ভিত্তিমূল ছাড়া কীভাবে তৈরী হতে পারে শুভ্র সুন্দর ভবিষ্যতের প্রাসাদ!

এসব জাতির ধর্মীয় সংস্কারের ইতিহাস বলে, ধর্মীয় রেনেসা ও পুনর্জাগরণের কোন আহ্বান তাদের জাতিসত্তায় বড় কোন পরিবর্তন বা ব্যাপক বিপ্লব সাধন করতে পারেনি। ভোগলালসা, শক্তির পূজা ও সম্পদলিপ্সা তাদের স্বভাবসত্তায় এমনভাবে মিশে গেছে যে, 'গোশাবকে'র মৃতদেহে ধার্মিকতা ও নৈতিকতার প্রাণ সঞ্চার করা যুগের কোন 'সামেরি'-এর পক্ষেই আর সম্ভব হয়নি। জাহেলিয়াতের দর্জিখানায় তৈরী যে কোন পোশাক তাদের দেহে সহজেই খাপ খেতে পারে, কিন্তু দ্বীনের কোন লেবাস চাপাতে চাইলেও তাদের দেহকাঠামো এখন আর তা গ্রহণ করে না। অর্থাৎ জাহেলিয়াতের সম্পূর্ণ প্রতিদ্বন্দ্বী ও বিপরীত মেরুর ধর্ম, দর্শন, রীতি-নীতি, চরিত্র ও বিধিবিধান; বহু শতাব্দীর অভ্যাস-অনুশীলনে গড়ে

ওঠা তাদের মনমস্তিষ্ক ও চিন্তাকাঠামো এখন আর গ্রহণ করতে পারে না। পক্ষান্তরে মুসলিম উম্মাহর দ্বীন ও শরীয়ত এবং আসমানি হেদায়াত ও হিকমত পূর্ণ অক্ষত ও নিরাপদ রয়েছে–

إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ ۝

নিঃসন্দেহে আমিই নাযিল করেছি কোরআন এবং আমিই তা হেফাযত করবো।

(সূরাতুল হাজর, ১৫ : ৯)

তদুপরি তাদের কাছে রয়েছে নবীর সীরাত ও হায়াতে ছাহাবা, যার মধ্যে রয়েছে পুরো উম্মতের যিন্দেগি গড়ে তোলার শক্তি। সর্বোপরি উম্মাহর সুদীর্ঘ ইতিহাসে রয়েছে মুজাদ্দিদীন ও মহান সংস্কারকদের ধারাবাহিক তাজদীদী 'কারনামা' ও সংস্কার-সাধনা, যার ফলে ঝড়ঝাপটা ও ফিতনা-দুর্যোগ যতই এসেছে, উম্মাহ কখনো জাহেলিয়াতের আঁধারে পথ হারিয়ে ফেলেনি। যে আকার-আকৃতি এবং রূপ ও প্রকৃতি ধারণ করেই আসুক, জাহেলিয়াতের 'নির্ভেজাল' বস্তুবাদী জীবন-দর্শন ও সমাজব্যবস্থা এই উম্মাহর জাতিসত্তাকে কখনোই গিলে খেতে পারে না; হজম ও পরিপাক করা তো দূরের কথা। লোহা-লক্কড়ের যন্ত্রে যন্ত্রাংশ যেভাবে খাপে খাপে বসে যায়, জাহেলিয়াতের যন্ত্রে মুসলিম চিন্তাচেতনা ও মনমানস ঠিক সেভাবে খাপে খাপে বসে যাবে- এটা কিছুতেই হতে পারে না, যতক্ষণ না তা ভেঙ্গে নতুনভাবে গড়া সম্ভব হয়। আর কোরআন-সুন্নাহর মানদণ্ড যতক্ষণ এই উম্মাতে মারহুমার কাছে রয়েছে ততক্ষণ সেখানে ভাঙ্গাগড়ার কোন কারসাজিই চলতে পারে না–

تركت فيكم أمرين لن تضلوا ما إن تمسكتم بهما، كتاب الله وسنتي.

তোমাদের মধ্যে আমি দু'টি বিষয় রেখে যাচ্ছি, যত দিন তোমরা তা আকড়ে ধরে রাখবে, কিছুতেই গোমরাহ হবে না, আল্লাহর কিতাব এবং আমার সুন্নাহ।

দ্বীনের রক্ষক ও দুনিয়ার হিসাব রক্ষক

ময়দানে বদরে উম্মাহর অস্তিত্বের সঙ্কটকালে আল্লাহর কাছে আল্লাহর নবীর মিনতি ও ফরিয়াদ ছিলো এই–

اللهم إن تهلك هذه العصابة لن تعبد

হে আল্লাহ, এই উম্মাহকে যদি তুমি হালাক করো, দুনিয়াতে আর তোমার বন্দেগি হবে না।

নবীর যুগে ছাহাবা কেরামের মোবারক জামা'আত সম্পর্কে এই নববী ফরিয়াদ যেমন সত্য ছিলো, উম্মাহর যাবতীয় দোষ-দুর্বলতা সত্ত্বেও আজও একই রকম সত্য। বস্তুত জাহেলিয়াতের কাছে মানবজাতির জন্য জীবন ও জীবন-পথের যে ভুল নকশা রয়েছে, যা দ্বারা মানুষকে সে ধ্বংস ও বরবাদির পথে নিয়ে চলেছে, তার মোকাবেলায় ন্যায়, সত্য, শান্তি ও মুক্তির চিরসবুজ উপত্যকায় নিয়ে যাওয়ার জন্য কোন 'পথনকশা' যদি থাকে তবে তা আছে শুধু মুসলিম উম্মাহর কাছে। এটা অবশ্য ভিন্ন বিষয় যে, মুসলিম জাতি নিজেই সে নকশার কথা ভুলে আছে, তবে তা হারিয়ে যায়নি এবং হারিয়ে যেতে পারে না। কারণ তার জন্য রয়েছে 'লাহাফিযূন'-এর রক্ষাকবচ। কোরআন ও সুন্নাহর সুস্পষ্ট নির্দেশ মতে মুসলিম উম্মাহ 'সৃষ্টিগত'ভাবেই আল্লাহর পক্ষ হতে মনোনীত, মনব কাফেলার অতন্দ্র প্রহরী। যদিও প্রহরী এখন তন্দ্রায় আচ্ছন্ন। কিন্তু একদিন সে গা-ঝাড়া দিয়ে জেগে ওঠবে এবং তার সৃষ্টিগত দায়িত্ব পালনে তৎপর হবে। সেদিন মাশরিক-মাগরিবের সমস্ত জাতির জন্যই হবে 'মহাহিসাবের' দিন। স্ফুলিঙ্গ আছে, যদিও ছাইচাপা, একদিন না একদিন তা জ্বলে ওঠবে, ওঠবেই এবং জাহেলিয়াতের সব আস্তানা জ্বালিয়ে সারখার করবে, করবেই। গায়েবের আড়াল থেকে হয়ত সে আয়োজনই এখন চলছে পৃথিবীর দিকে দিকে। 'আধমরাদের' ঘা মেরে জাগিয়ে তোলার আয়োজন; এটাকে এখন 'সভ্যতার দ্বন্দ্ব' বলে ডাকুন, কিংবা ডাকুন অন্য কোন নামে।

প্রাচ্যের দার্শনিক কবি আল্লামা ইকবালের কল্পনা-শক্তিকে আমাদের অভিনন্দন। ইসলামী জীবনবিধানের অধিকারী মুসলিম উম্মাহই যে জাহেলিয়াতের একমাত্র প্রতিদ্বন্দ্বী এবং জাহেলিয়াতের মৃত্যুপরোয়ানা বহনকারী সেটা জাহেলিয়াতের জন্মদাতা 'শয়তানে রাজীম'-এর চেয়ে ভালো আর কে জানবে? আল্লামা ইকবাল 'ইবলিসের সংসদ' নামে তাঁর অনবদ্য এক কবিতায় শয়তানের কল্পিত (তবে বাস্তব) বক্তব্য এভাবে তুলে ধরেছেন–

ইবলিসের পরামর্শসভা নাকি বসেছিলো ১৯৩৬ এর কোন এক সময়, কোন এক জায়গায়। সময় ও স্থান অবশ্য এখানে গুরুত্বপূর্ণ নয়, গুরুত্বপূর্ণ হলো পরামর্শ-সভার আলোচ্যবিষয়, আলোচনা এবং ইবলিসের 'বয়ান'। ইবলিসের নামী দামী

অনুচর ঐ পরার্মশসভায় যোগ দিয়েছিলো। আলোচ্যবিষয় ছিলো আগামী দিনের সম্ভাব্য বিপদ, যা ইবলিসের রাজত্বকে ধ্বংস করে দিতে পারে। একেক অনুচর একেক বিষয়কে আসল বিপদ বলে চিহ্নিত করলো এবং প্রতিকারের সুপারিশ করলো।

একজন বললো, হুযূর, অনেক দেখে শুনে মনে হয় গণতন্ত্রই হলো আসল বিপদ। কারণ তা রাজতন্ত্র উচ্ছেদ করে জনগণের শাসন প্রতিষ্ঠা করতে চায়।

দ্বিতীয়জন বললো, না জনাব! গণতন্ত্রে ভয়ের কিছু নেই। আসলে রাজতন্ত্রের চেহারাকে আড়াল করার জন্য আমিই গণতন্ত্রের মুখোশ তৈরী করেছি। প্রয়োজন ছিলো। কারণ মানুষ ধীরে ধীরে নিজের মর্যাদা ও অধিকার সম্পর্কে সচেতন হয়ে উঠছে। তো তাদের শান্ত করার জন্যই হচ্ছে আমার তৈরী গণতন্ত্রের দাওয়াই, যাতে রাজতন্ত্রের সব খন্নাছি বহাল তবিয়তে রয়েছে। রাজতন্ত্রীয় চরিত্র ব্যক্তির মধ্যে যেমন থাকে তেমনি থাকতে পারে দল, গোষ্ঠী, সম্প্রদায় ও জাতির মধ্যেও। রাজতন্ত্রের মূল কথা হলো শোষণ, সেটা রাজার পক্ষ হতে প্রজাসাধারণকে হোক, আর সরকারের পক্ষ হতে জনসাধারণকে হোক। তাছাড়া আগে যুদ্ধ হতো দুই দেশের দুই রাজায়, এখন হয় এক দেশের দুই দলে। মন্দ কী? 'চেঙ্গিস খান ও চার্চিল খান' পার্থক্য কোথায়?

আরেকজন বললো, বুঝলাম, কিন্তু কার্লমার্কস নামের ঐ হতচ্ছাড়া ইহুদি সম্পর্কে আপনার কী মত যে, সমাজতন্ত্রের নামে ইতিমধ্যেই বিরাট ফেতনা খাড়া করে ফেলেছে? খবর রাখেন? শ্রেণী-সংগ্রামের নামে দুনিয়ার সমস্ত শোষিতকে শোসকের বিরুদ্ধে ক্ষেপিয়ে তুলেছে। লোকটা নবী তো নয়, তবে সঙ্গে কেতাব আছে একখান।

আরেকজন সরাসরি 'ছদরে মজলিস' ইবলিসকে সম্বোধন কর বললো, হুযূর! ফেরআউনের যাদুগরদের মত যদিও ইউরোপের যাদুগরেরা আপনার খুব অনুগত মুরিদ, কিন্তু তাদের বুদ্ধি-চালাকির প্রতি আমার আস্থা নেই। নইলে দেখুন, এই ইহুদির বাচ্চা সামেরি, যে কিনা (পারস্যের শাসক) মাযদাকেরই 'কার্বন কপি' সমাজতন্ত্রের নামে দুনিয়া কাঁপিয়ে দিয়েছে। আমার তো আশঙ্কা, হুযূরের রাজত্ব এর হাতেই না শেষ হয়!

সব অনুচরের বক্তব্য শেষ হলে ছদরে মজলিস এভাবে তার বয়ান শুরু করলো– 'তোমরা যা বলছো এগুলো কোন সমস্যাই নয়, দুনিয়ার যেখানে যা কিছু হয়

কলকাঠি তো আমিই নাড়ি। ইউরোপে এ্যায়সা 'গুড়' লাগাবো যে, শেষ পর্যন্ত শুরু হয়ে যাবে কুকুর ও নেকড়ের মধ্যে কামড়াকামড়ি। তাছাড়া রাজনীতির মোড়ল আর 'গীর্জার গুরুদের' কানে কানে ফুঁকে দেবো এক মন্ত্র, দেখবে হিতাহিত জ্ঞান হারিয়ে সবাই কেয়সা লড়াই শুরু করে। আর সমাজতন্ত্রের কথা বলছো, না, প্রকৃতি মানুষে মানুষে যে পার্থক্য সৃষ্টি করেছে, মাযদাকি দর্শনে তা দূর হবে না। সমাজতন্ত্র নিজেই বরং মুখথুবড়ে পড়বে।'

এরপর ইবলিস আসল খাতরা সম্পর্কে আশঙ্কা প্রকাশ করলো এভাবে–

'ভয় যদি কাউকে আমি করি তাহলে শুধু এই উম্মতকে করি, যাদের ছাইতলে এখনো ধিক ধিক জ্বলে আগুনের স্ফুলিঙ্গ, যাদের মধ্যে এখনো আছে এমন 'যালিম' আখেরি রাতের অশ্রু দিয়ে যারা 'অযু' করে। যার কাছে আছে ভিতরের খবর সেই জানে আগামী দিনের বিপদ ইসলাম; শুধু ইসলাম।

জানি, এই উম্মত কোরআন ছেড়ে দিয়েছে; মালের বন্দেগি শুরু করেছে, আরো জানি মাশরিকে এখন রাতের আঁধার, অথচ হারামের মোল্লাদের কাছে নেই মূসার 'ইয়াদে বায়যা', যা দূর করতে পারে সব আঁধার এবং সারা বিশ্বকে করতে পারে আলোকিত। কিন্তু আমার ভয়, যুগের দুর্যোগের ঝাঁপটায় ভেঙ্গে না যায় তাদের ঘুম। আবার না আকড়ে ধরে মুহম্মদের শরী'আত। সাবধান, দ্বীনে মুহম্মদী থেকে সাবধান। ভাগ্য ভালো এখন এরা ঘুমিয়ে আছে। যতদিন পারো, যেভাবে পারো, ঘুম পাড়িয়ে রাখো।'

ইসলামী উম্মাহর বার্তা

বিশ্বের সব জাতির জন্য এখনো ইসলামী উম্মাহর কাছে রয়েছে মুক্তির নতুন বার্তা ও পায়গাম এবং জীবনের নতুন আহ্বান ও দাওয়াত। এটা সেই পায়গাম ও দাওয়াত যা মুহম্মদুর রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম চৌদ্দশ বছর আগে বিদায় হজ্জে আরাফার ময়দানে ألا هل بلغت বলে উম্মাহর দায়িত্বে অর্পণ করেছেন। এ এমন এক শক্তিশালী, সুস্পষ্ট ও সমুজ্জ্বল বার্তা যে, এর চেয়ে ন্যায়ানুগ, সর্বসুন্দর এবং মানবতার জন্য কল্যাণবাহী বার্তা পৃথিবী এর আগে (ও পরে) কারো কাছে শুনতে পায়নি। ইসলামী বিশ্বের কাঙ্ক্ষিত নব-উত্থান তখনই সম্ভব হবে যখন উম্মাহ বিশ্ববাসীর উদ্দেশ্যে জীবনের এই নতুন বার্তা ও আহ্বান এবং পায়গাম ও দাওয়াত নিয়ে আগে বাড়বে।

এটা সেই বার্তা যা ছাহাবা কেরাম তাঁদের নবীর কাছ থেকে ধারণ করেছেন এবং বিশ্বের বিভিন্ন জাতির কাছে বহন করে নিয়ে গিয়েছেন। এ পায়গাম ও দাওয়াত-কে কেন্দ্র করেই তাঁরা মদীনা থেকে বের হয়েছে এবং সারা দুনিয়ায় ছড়িয়ে পড়েছেন। এই দাওয়াত ও পায়গামকে উদ্দেশ্য করেই শুরু হয়েছিলো কল্যাণ-যুগের ধারাবাহিক বিজয়াভিযান, যাতে ভূমি ও রাজ্য জয়ের আগে হতো হৃদয়-রাজ্য জয়। এ সেই পায়গাম ও দাওয়াত যা মুসলিম দূত পারস্যসম্রাটের দরবারে তুলে ধরেছিলেন এই ছোট্ট, অথচ সারগর্ভ বাণীর মাধ্যমে–

الله ابتعثنا لنخرج من شاء من عبادة العباد إلى عباد الله وحده، ومن ضيق الدنيا إلى سعتها، ومن جور الأديان إلى عدل الإسلام

আল্লাহ আমাদের পাঠিয়েছেন, যাতে তাঁর ইচ্ছায় মানুষকে আমরা বের করে আনি মানুষের উপাসনা থেকে লা-শরীক আল্লাহর ইবাদতের দিকে এবং পৃথিবীর সঙ্কীর্ণতা থেকে প্রশস্ততার দিকে এবং বিভিন্ন ধর্মের অবিচার থেকে ইসলামের সুবিচারের দিকে।

বিশ্বের বিভিন্ন দেশে, এমনকি চীনের মহাপ্রাচিরের পাশে ছাহাবা কেরামের এই যে অসংখ্য কবর, আমাদের কাছে এর আবেদন কী? আবেদন এই, 'আমরা বের হয়েছিলাম মানবজাতির মুক্তির জন্য; তোমরাও ওঠো, জাগো এবং ছড়িয়ে পড়ো মানবতার উদ্ধারের জন্য। তোমাদেরও কবর হোক এখানে সেখানে, পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে, বিভিন্ন জনপদে।'

পারস্যের রাজদরবারে ছাহাবী হযরত রাবঈ বিন আমির (রা.) যা বলেছিলেন, সেটাই হবে আমাদেরও দাওয়াত ও পায়গাম। এখনো তাতে একটি হরফেরও কমবেশী করার প্রয়োজন নেই। আজকের বিশশতকের আধুনিক পৃথিবীর জন্যও তা তেমনই নতুন সজীব, সময়োপযোগী ও কল্যাণকর যেমন ছিলো খৃস্টীয় ষষ্ঠ শতকের প্রাচীন পৃথিবীর জন্য। যেন সময়ের চাকা উল্টো ঘুরে আবার ঠিক সেদিনের জায়গায় এসে দাঁড়িয়েছে যেদিন মুসলিম উম্মাহ জীবনের মুক্তির বার্তা নিয়ে তাদের জাযিরা থেকে বের হয়েছিলো বিশ্বকে প্রতিমাপূজা ও জাহেলিয়াতের থাবা থেকে উদ্ধার করার জন্য। হাঁ, সময়ের পরিবর্তন হয়েছে, প্রাচীন পৃথিবী আধুনিক পৃথিবীর জৌলুস লাভ করেছে। এমনকি জাহেলিয়াতেরও হয়ত বাইরের রূপ বদলেছে, কিন্তু স্বভাব-প্রকৃতি ও জীবনদর্শন একই রয়ে গেছে; তাতে কোন পরিবর্তন ঘটেনি।

من عبادة العباد إلى عبادة الله وحده আজো মানুষ দৃশ্য-অদৃশ্য এবং হাতে গড়া ও মনে গড়া বিভিন্ন মূর্তির সামনে মাথা নত করছে। একইভাবে বস্তুবাদের পূজায় এবং শক্তিবাদের বন্দনায় নিয়োজিত রয়েছে। তাওহীদ ও এক আল্লাহর ইবাদত এখনো পৃথিবীতে অপরিচিত, উপেক্ষিত। চিন্তায়, বিশ্বাসে, আচরণে ও জীবন-যাপনে, নীতি ও চরিত্রে সেই সব 'ফিতনা' এখনো জোয়ান এবং আগুয়ান। এখনো একইভাবে চলছে বিভিন্ন গায়রুল্লাহর ইবাদত, চলছে নফসের খাহেশাত ও প্রবৃত্তির 'নগ্ন' পূজা। ধর্মপতি ও সাধুসন্ন্যাসী, দেশের শাসক ও রাষ্টনায়ক, যুদ্ধজয়ী সেনাপতি, শিল্পপতি, পুঁজিপতি, ক্ষমতাধর নেতা ও রাজনৈতিক দল أرباب من دون الله সেজে বসে আছে এবং 'যে দেবতা যে ফুলে তুষ্ট সে দেবতা সেই ফুলের পূজা-নৈবেদ্য' পেয়ে আসছে। আজো বিভিন্ন বেদীতে সত্যের বলি হয়। আজো বিভিন্ন 'দেবমন্দিরে' আভূমি প্রণাম হয়, যেমন সেযুগে দেবমূর্তির মন্দিরে হত।

ومن ضيق الدنيا إلى سعتها আজকের পৃথিবীর এই যে বিস্তৃতি ও প্রশস্ততা, ভ্রমণ-পরিভ্রমণের আয়োজন-উপকরণের প্রাচুর্য, বিভিন্ন জাতি ও জনগোষ্ঠীর নিকট যোগাযোগ; তাসত্ত্বেও পৃথিবী অতীতের যেকোন সময়ের চেয়ে এখন অনেক বেশী সঙ্কীর্ণ। কারণ বস্তুর পূজারী এখনকার মানুষ নিজের ছাড়া আর কারো অস্তিত্বই স্বীকার করে না এবং আত্মস্বার্থ ও খাহেশাত ছাড়া আর কিছুতে বিশ্বাস করে না। তার দৃষ্টি শুধু নিজের পায়ের তলার মাটিটুকুর প্রতি। সে মজে আছে শুধু আরাম আয়েশ ও ভোগ-বিলাসে। তার ত্যাগ শুধু নিজের প্রতিষ্ঠার জন্য; কারো কল্যাণের জন্য নেই তার কোন আত্মত্যাগ। স্বার্থপরতা ও আত্মপূজা এমন মারমুখী ও আগ্রাসী করে তুলেছে যে, একটি বিশাল ভূখণ্ডে দু'জনমাত্র মানুষেরও স্বচ্ছন্দ বসবাসের সুযোগ নেই। সঙ্কীর্ণ স্বদেশবাদ মনুষ্যত্বের এমনই অপমৃত্যু ঘটিয়েছে যে, মানুষ এখন মানুষকে ঘৃণা ও তাচ্ছিল্যের চোখে দেখে; তার মেধা ও প্রতিভার অবমূল্যায়ন করে; এমনকি প্রাপ্য ন্যূনতম মানবিক অধিকার থেকেও তাকে বঞ্চিত করে। অপরাধ শুধু এই যে, সে তার দেশের মানুষ নয়। তার জন্ম হয়েছে দেশের সীমানার বাইরে, অন্য ভূখণ্ডে।

তারপরো জীবনের যা কিছু প্রশস্ততা ও সজীবতা অবশিষ্ট ছিলো, রাজনীতির খেলোয়াড় ও ক্ষমতার কুশলীরা তার বেষ্টনী আরো সঙ্কীর্ণ করে এনেছে। জীবন ধারণের যাবতীয় উপকরণ তারা এমনভাবে কুক্ষিগত করেছে যে, যার প্রতি তুষ্ট

তাকে প্রাচুর্য দান করে, আর যার প্রতি হয় রুষ্ট জীবনকে তার জন্য করে তোলে সঙ্কীর্ণ ও দুর্বিষহ। বড় বড় সমৃদ্ধ শহর এবং উর্বর ও সবুজশ্যামল ভূখণ্ড তাদের অভিশাপে হয়ে পড়েছে জীবনধারণের এবং শান্তিতে বাস করার অযোগ্য। চারদিকে প্রাচুর্য, সমৃদ্ধি, উদ্বৃত্তি ও ছড়াছড়ি, তারই পাশাপাশি অনাহার ও হাহাকার, এমনকি কোলের শিশুটিও কঙ্কালসার। মানুষ যেন ক্ষমতা ও রাজনীতির কিছু দানবের হাতে বন্দী, যিম্মী। কখনো প্রাকৃতিক দুর্ভিক্ষ, কখনো কৃত্রিম খাদ্যাভাব; এই হরতাল, এই ধর্মঘট, এই দাঙ্গা-গোলযোগ; কখনো যুদ্ধ, কখনো গৃহযুদ্ধ। এভাবে উদ্বেগ-উৎকণ্ঠা, ভয়ভীতি, আতঙ্ক ও সন্ত্রস্ততার মধ্যেই কাটে মানুষের দিন-রাত। এ যেন আল-কোরআনের অলৌকিক অলঙ্কারপূর্ণ ভাষায় وضاقت عليهم الأرض بما رحبت[১]এর বাস্তব নমুনা। কারো প্রতি কারো আস্থা ও বিশ্বাস নেই। শুধু সন্দেহ অবিশ্বাস, সবাই সবার প্রতিপক্ষ ও প্রতিদ্বন্দ্বী। জীবন যেন জাহান্নামের আগুনে জ্বলেপুড়ে সারখার। সেই জাহান্নামের আগুনে বসেও হায়েনা হাসে উল্লাসের হাসি। কারণ তারা এত চতুর যে, আগুন জ্বালে, কিন্তু সেই আগুনে নিজেরা পোড়ে না।

ومن جور الأديان إلى عدل الإسلام সম্পর্কেও একই কথা। কোন সন্দেহ নেই প্রগতি, প্রাগ্রসরতা, মুক্তচিন্তা ও মুক্তবুদ্ধির এ 'আলোকিত' যুগেও রয়েছে ধর্মের অনাচার-অবিচার, যা থেকে উদ্ধার করে মানুষকে ইসলামের সাম্য ও সুবিচারের ছায়াতলে আনার প্রয়োজন। এখনো এমনসব ধর্মীয় আচার-বিশ্বাস ও কুসংস্কার দেখা যায়, যা রীতিমত হাস্যকর, যা মানুষের চিন্তা-বুদ্ধিকে যেন পরিহাস করে। মানুষও যেন গরুছাগলের মতই এসব কুসংস্কার ও অন্ধবিশ্বাসের ঘাস খেয়ে চরে বেড়ায়। কোথাও ঈদের দিনে গরু কোরবানী হলো, আর গো-হত্যার উন্মাদনা সৃষ্টি করে শত শত মানুষ জবাই করা হলো স্রেফ ধর্মের পবিত্রতা ও গো-মাতার মর্যাদা রক্ষার নামে!

বলুন, এটা কি ধর্ম না বর্বরতা? বিশ্বাস ও সংস্কার না পশুর হিংস্রতা?!

তাছাড়াও আছে এমন বহু দর্শন, মতবাদ ও চিন্তাধারা, যা ধর্মের নাম-পরিচয় তো ধারণ করে না, তবে সীমাহীন প্রভাব ও প্রতাপের ক্ষেত্রে এবং অনুসারীদের অন্ধবিশ্বাস ও আবেগ-উচ্ছ্বাসের বিচারে, সর্বোপরি সামাজিক শোষণ-নিপীড়ন ও

---

[১] ভূমি তার প্রশস্ততা সত্ত্বেও তাদের জন্য সঙ্কুচিত হয়ে পড়েছে।

অনাচার সৃষ্টির দিক থেকে প্রাচীন ধর্মগুলোর চেয়ে কোন অংশেই কম নয়। এখানে আমি ঐসব রাজনৈতিক ব্যবস্থা ও অর্থনৈতিক মতবাদের কথা বলছি যা কখনো কখনো ব্যাপক রক্তপাত ও গণহত্যার মাঝে কোন ভূখণ্ডে প্রতিষ্ঠা লাভ করেছে এবং মানব-রক্তের 'প্রসাদ' গ্রহণ করেই টিকে আছে; যার প্রতি বিশ্বাস তেমনই অন্ধ ও অপ্রতিরোধ্য যেমন ছিলো অতীতে বিভিন্ন ধর্মের ইতিহাসে। তখন খুনের দরিয়া বইতো বিভিন্ন ধর্মের নামে, এখন রক্তের নদী প্রবাহিত হয় নানা মতবাদের নামে। যেমন ভৌগোলিক ও ভাষাভিত্তিক জাতীয়তাবাদ, গণতন্ত্র, সমাজতন্ত্র, একনায়কতন্ত্র ও কমিউনিজম। অনুদারতা, অসহিষ্ণুতা, নির্দয়তা ও নিষ্ঠুরতার ক্ষেত্রে এসব 'আধুনিক ধর্ম' প্রাচীন জাহেলী ধর্মগুলোর চেয়ে কিছু বেশী ছাড়া কম নয়। এখন কোন দর্শন বা মতবাদের প্রতি এমনকি যুক্তিনির্ভর ভিন্নমত প্রকাশেরও শাস্তি ও পরিণতি অতীতের কোন ধর্মবিশ্বাসের প্রতি ভিন্নমতের চেয়ে অনেক বেশী নির্মম হয়ে থাকে।

বর্তমান যুগে বিভিন্ন দেশে যে রাজনৈতিক সহিংসতা ও দমন-নিপীড়ন আমরা দেখতে পাই তা অন্ধকার যুগের ধর্মীয় সহিংসতা ও দমন-নিপীড়নের চেয়ে অনেক বেশী ভয়াবহ। যখন কোন দর্শন বা বাদ-মতবাদ কোন ভূখণ্ডে প্রাধান্য বিস্তারে সক্ষম হয়, এমনকি যখন নির্বাচনে কোন রাজনৈতিক দল জয়ী হয়ে ক্ষমতায় বসে তখন পারলে যেন প্রতিপক্ষ দলের বেঁচে থাকার অধিকারই কেড়ে নেয়। এমন 'আযাব-গযবের' অবস্থা নাযিল করা হয় যে, আল-আমান! আল-আমান!![1]

আধুনিক ইউরোপে দু'দুটি বিশ্বযুদ্ধের ব্যাপক হত্যা ও ধ্বংসযজ্ঞের পিছনে দুই ধর্মের বিরোধ বা কোন ধর্মীয় দল-উপদলের দ্বন্দ্ব-সঞ্জাত ছিলো না, ছিলো নিছক রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও জাতীয় অহমিকার সঞ্জাত। স্পেন ও চীনের দীর্ঘ রক্তক্ষয়ী গৃহযুদ্ধ, তদ্রূপ দুই কোরিয়ার যুদ্ধ, উত্তর ও দক্ষিণ ভিয়েতনামের গৃহযুদ্ধ এবং দক্ষিণ ভিয়েতনামের পক্ষে আমেরিকার হানাদারি- এগুলোর কারণ রাজনৈতিক মতাদর্শ, অর্থনৈতিক মতবাদ ও জাতীয় স্বার্থের সঞ্জাত ছাড়া আর কিছু ছিলো না। অথচ নিষ্ঠুরতায় ও ধ্বংসযজ্ঞের ব্যাপকতায় ষষ্ঠ শতাব্দীর খৃস্টজগতের ধর্মীয় গৃহযুদ্ধ এবং মধ্যযুগে গীর্জা ও বিজ্ঞানের দ্বন্দ্ব-সংঘাত এগুলোর তুলনায় ছিলো খুবই মামুলি।

[1] আল্লাহ পানাহ! আল্লাহ পানাহ!

তো চৌদ্দশ বছর আগের মত আজো বিশ্বমানবতার উদ্দেশ্যে ইসলামী উম্মাহর একই দাওয়াত, একই পায়গাম, অর্থাৎ–

'হে মানুষ, এক আল্লাহকে বিশ্বাস করো। আল্লাহর রাসূলকে বিশ্বাস করো, এক আল্লাহর ইবাদত করো। আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের আনুগত্য করো। আখেরাত ও বিচারদিবসে বিশ্বাস করো।'

এ দাওয়াত ও পায়গাম কবুল করার আসমানী পুরস্কার কী? পুরস্কার এই যে, জাহেলিয়াতের যে পরত পরত অন্ধকারে শতাব্দীর পর শতাব্দী মানুষ ডুবে আছে তা থেকে বের হয়ে ঈমান ও বিশ্বাসের আলোর বলয়ে প্রবেশ করবে। মানুষের গোলামি ও দাসত্ব থেকে মুক্ত হয়ে এক আল্লাহর দাসত্ব ও বন্দেগির গৌরব অর্জন করবে। জীবনের সঙ্কীর্ণ কারাগার ও যিন্দেগীর যিন্দানখানা থেকে বের হয়ে জীবনের মুক্ত অঙ্গনে এবং পৃথিবীর প্রশস্ত পরিবেশে শান্তি ও স্বস্তির শ্বাস গ্রহণ করবে। বিভিন্ন ধর্মের অনাচার ও বাদ-মতবাদের স্বেচ্ছাচার থেকে বের হয়ে স্বভাবধর্ম ইসলামের ন্যায় ও সুবিচারের ছায়াতলে আশ্রয় লাভ করবে।

অতীতের যে কোন যুগের তুলনায় এ দাওয়াত ও পায়গামের সত্যতা ও শ্রেষ্ঠত্ব এবং গুরুত্ব ও প্রয়োজন অনুধাবন করা এখন অনেক সহজ হয়ে গেছে। কেননা জাহেলিয়াত আজ ভরা বাজারে নাঙ্গা হয়ে গেছে। তার সব পঙ্কিলতা ও কলঙ্ক-কালিমা উৎকটভাবে ধরা পড়ে গেছে। জড়বাদী ও ভোগবাদী জীবনের অনাচার-স্বেচ্ছাচারে মানুষ অতিষ্ঠ হয়ে পড়েছে। সর্ব-অন্তরে জাহেলিয়াতের প্রতি ঘৃণা ও ধিক্কার উপচে পড়ছে। বিশ্ব এখন জাহেলিয়াতের নেতৃত্ব ত্যাগ করে ইসলামের নেতৃত্ব গ্রহণের জন্য সম্পূর্ণ প্রস্তুত। ইসলামী উম্মাহরও তার ছিনতাই হওয়া নেতৃত্ব পুনরুদ্ধার করার এখনই সর্বোত্তম সুযোগ। যদি আজ ইসলামী উম্মাহ উঠে দাঁড়ায় এবং ইখলাছ, আত্মনিবেদন, পূর্ণ উদ্যম ও সঙ্কল্পের সঙ্গে এই দাওয়াত ও পায়গাম বুকে ধারণ করে আবার মানবজাতিকে ডাক দেয়; আস্থার সঙ্গে, দরদের সঙ্গে, মমতার সঙ্গে, কল্যাণকামিতার সঙ্গে; যুক্তি দিয়ে, ভক্তি দিয়ে, আচরণ দিয়ে এবং জীবনের পাতায় অঙ্কন করে বিশ্বকে যদি সে বোঝাতে পারে যে, এটাই একমাত্র দাওয়াত ও পায়গাম, যা মানবতা ও মানবসভ্যতাকে পতন ও অধ:পতনের চরম পরিণতি থেকে রক্ষা করতে পারে, তাহলে কবির ভাষায় 'এ ভূমি এখন বড় সিক্ত উর্বর এবং খুবই উপযোগী; চাই শুধু উন্নত বীজ, আর বিচক্ষণ ও দরদী কৃষক।'

সবকিছুর আগে এবং সবকিছুর পরে ইচ্ছা আল্লাহর, এবং ফায়ছালা আল্লাহর।

নতুন ঈমান ও আত্মিক প্রস্তুতি

আবারো বলছি, এ দুর্যোগপূর্ণ যুগে এ মহান দায়িত্ব পালন করার জন্য পরিপূর্ণ-রূপে আত্মপ্রস্তুতি গ্রহণ করতে হবে। প্রথম প্রস্তুতি এই যে, ঈমানের দুর্বলতা ঝেরে ফেলতে হবে, ঈমানকে নতুনভাবে মজবুত ও তরুতাজা করতে হবে। যেমন ছাহাবা কেরাম ক্ষণে ক্ষণে ঈমান তাজা করার মুজাহাদা করতেন আর বলতেন, اجلس بنا نؤمن ساعة (এসো একসঙ্গে বসি, কিছুক্ষণ ঈমান তাজা করি)। তো নবুয়তের নিকটতম যুগে ছাহাবা কেরামের পাক-পাকীযা অন্তরে যদি জাগরূক থাকে ঈমান তাজা করার এমন ব্যাকুলতা তাহলে কেমন হওয়া উচিত আমাদের মত দুর্বল ঈমানওয়ালাদের ব্যাকুলতা ও অস্থিরতা!?

ইসলামী উম্মাহর নতুন দ্বীন ও শরীয়তের এবং নতুন নবী ও নবুয়তের কোন প্রয়োজন নেই, অবকাশও নেই। ইসলাম হলো মহাকালের সূর্যের মত; না কখনো পুরোনো ছিলো, না এখন পুরোনো হয়েছে। বিশ্বনবীর নবুয়ত হলো আখেরী ও চিরস্থায়ী নবুয়ত। তিনি যে দ্বীন ও শরীয়ত এনেছেন তা সুরক্ষিত ও সংরক্ষিত। তিনি যে শিক্ষা ও আদর্শ রেখে গেছেন তা শাশ্বত ও চিরন্তন। কিন্তু ইসলামী উম্মাহর, কোন সন্দেহ নেই যে, নতুন ঈমানের, তরুতাজা ঈমানের এবং آمنوا كما آمن الناس ওয়ালা ঈমানের প্রয়োজন রয়েছে। নতুন যুগের নতুন নতুন ফিতনা ও দুর্যোগের, নতুন শক্তি ও ক্ষমতার, নতুন প্রলোভন ও প্ররোচনার এবং নতুন দাওয়াত ও মতবাদের মোকাবেলা করা নিছক অভ্যাস ও রীতিসর্বস্ব দুর্বল ঈমান দ্বারা কিছুতেই সম্ভব নয়। কোন জরাজীর্ণ ইমারত কোন নতুন ঝড়ের প্রবল ঝাপটা এবং কোন নতুন ঢল ও জলোচ্ছ্বাসের ধাক্কা বরদাশত করতে পারে না। আর ঈমানের দুর্বলতা তো ইমারতের দুর্বলতার চেয়েও ভয়ঙ্কর।

দাওয়াতের দা'ঈ যিনি হবেন তার জন্য অপরিহার্য হলো, নিজের দাওয়াতের উপর অবিচল আস্থা ও স্থির প্রত্যয়ের অধিকারী হওয়া। এই আস্থা ও প্রত্যয়ের গভীরতা থেকে উৎসারিত হবে অদম্য স্পৃহা, উদ্দীপনা, জোশ ও মস্তি, যেন তিনি কোন গুপ্তধনের সন্ধান পেয়েছেন, কিংবা নতুন কোন দেশ আবিষ্কার করেছেন। ইসলামী উম্মাহ যদি মানবজাতির মধ্যে নতুন জীবন ও নতুন প্রাণ সঞ্চার করতে চায় এবং আজকের বস্তুবাদী জাহেলিয়াতের উপর চূড়ান্ত বিজয় অর্জন করতে

চায় তাহলে অবশ্যই তাকে নিজের মধ্যে নতুন ঈমানী চেতনা, স্থির প্রত্যয় এবং অদম্য জোশ-উদ্দীপনা সৃষ্টি করতে হবে।

মুসলিমবিশ্ব যদি মনে করে ইউরোপের অবদানরূপে পাওয়া নগর-সভ্যতার বাহ্যিক জৌলুস দ্বারা এবং বস্তুবাদী জীবনের রীতিনীতি রপ্ত করা দ্বারা আধুনিক জাহেলিয়াতের অস্ত্রে সজ্জিত ইউরোপের মোকাবেলা করতে পারবে এবং দাওয়াতের অর্পিত দায়িত্ব পালনে সফল হবে তাহলে সেটা হবে চিন্তার চরম ভ্রান্তি। কেননা কোন জাতির নব-উত্থান ও নতুন শক্তির উদ্বোধনের ক্ষেত্রে এসব বাহ্যিকতার কোন ভূমিকা নেই। বিশ্বের কাছে সে তার দাওয়াত ও পায়গাম পৌঁছাতে পারে শুধু ভিতরের রূহানিয়াত ও আধ্যাত্মিক শক্তি দ্বারা, যে ক্ষেত্রে বস্তুবাদী ও ভোগবাদী ইউরোপ দিনদিন দেউলিয়া হয়ে চলেছে। অতীতের মত বর্তমানেও মুসলিম উম্মাহ তার প্রতিপক্ষের উপর তখনই শুধু বিজয় অর্জন করতে পারে যখন সে ঈমানি শক্তিতে তার উপর শ্রেষ্ঠত্ব অর্জন করবে; যখন জীবনের প্রতি মোহ এবং ভোগ ও খাহেশাতের আসক্তি তার অন্তর থেকে বের হয়ে যাবে; যখন শাহাদাতের প্রেম ও জান্নাতের ব্যাকুলতায় হৃদয় উদ্বেলিত হবে; যখন সব বিপদ কষ্ট আল্লাহর জন্য হাসিমুখে ধৈর্যের সঙ্গে বরণ করতে তার হৃদয়, আত্মা ও সর্বসত্তা প্রস্তুত হবে। বস্তুত আল্লাহর পরিচয় ও আখেরাতের বিশ্বাস থেকে বঞ্চিত কোন জাতি ও জনগোষ্ঠীর মোকাবেলায় এটাই হলো মুমিনদের বৈশিষ্ট্য। এজন্যই প্রত্যাশা করা হয়েছে যে, কাফিরদের মোকাবেলায় তাদের ছবর ও সহ্যশক্তি বেশী হবে–

وَلَا تَهِنُوا فِي ابْتِغَاءِ الْقَوْمِ ۖ إِن تَكُونُوا تَأْلَمُونَ فَإِنَّهُمْ يَأْلَمُونَ كَمَا
تَأْلَمُونَ ۖ وَتَرْجُونَ مِنَ اللَّهِ مَا لَا يَرْجُونَ ۗ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا

শত্রুপক্ষকে ধাওয়া করার ক্ষেত্রে তোমরা হিম্মতহারা হয়ো না। যদি তোমরা কষ্টপ্রাপ্ত হয়ে থাকো তবে তারাও তো কষ্টপ্রাপ্ত হয়। অথচ (ঐ কষ্টের বিনিময়ে) তোমরা আল্লাহর কাছে এমন কিছু আশা করতে পারো, যা তারা আশা করতে পারে না। আর অবশ্যই আল্লাহ সর্বজ্ঞানী ও মহাপ্রজ্ঞাবান। (আন-নিসা, ৪ : ১০৪)

ব্যস, মুমিনের শক্তির উৎস ও বিজয় লাভের রহস্য এই যে, সে আখেরাতে বিশ্বাসী এবং আল্লাহর কাছে আজর ও ছাওয়াবের প্রত্যাশী। দুনিয়াতেই তার কাছে এ সুসংবাদ এসে গেছে–

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : قال الله : أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولاخطر على قلب بشر . فاقرؤوا إن شئتم : فلاتعلم نفس ما أخفي (لهم) من قرة أعين .

হযরত আবু হোরায়রা রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, আল্লাহ বলেন, আমি আমার নেক বান্দাদের জন্য এমন কিছু প্রস্তুত করে রেখেছি যা কোন চোখ দেখেনি, কোন কান শুনেনি এবং কোন মানবের হৃদয়ে উদিত হয়নি। (নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন) সুতরাং তোমরা ইচ্ছে করলে পাঠ করতে পারো, 'কোন নফস জানে না, যে চক্ষুশীতলকারী বস্তু (তাদের জন্য) লুকিয়ে রাখা হয়েছে।' (বুখারী)

কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে মুসলিম উম্মাহ যদি বিপরীত কিছু চিন্তা করে; ভোগে বিশ্বাসী ও বস্তুর পূজারী ইউরোপের মত মুসলিম উম্মাহর সামনেও যদি থাকে দুনিয়ার ঐ সব স্থূল উদ্দেশ্য ও মুনাফা; সেও যদি বস্তুবাদিতার মোহজালে আটকা পড়ে যায় তাহলে কিন্তু সর্বনাশ। কারণ বহু শতাব্দীর চেষ্টা-সাধনায় বস্তুশক্তিতে এবং সাজ-সরঞ্জামের আয়োজনে ইউরোপ এতটাই এগিয়ে গেছে, আর মুসলিম জাতি এতই পিছিয়ে পড়েছে যে, কচ্ছপ ও খরগোশের গল্পই শুধু হতে পারে উভয়ের তুলনা। তবে এখানে কচ্ছপ তার ধীর গতি সত্ত্বেও অলস উদাসীন, আর খরগোশ তার দ্রুত গতি সত্ত্বেও উদ্যমী ও ধাবমান। সুতরাং মুসলিম বিশ্বের মোকাবেলায় ইউরোপই হবে বিজয় ও নেতৃত্বের অধিক হকদার। হাঁ, মুসলিমবিশ্বের বিজয় লাভের একমাত্র উপায় হলো ইউরোপীয় জাতিসত্তার দুর্বলতম স্থানটিতে আঘাত করা, অর্থাৎ রূহানিয়াত ও আত্মিক শক্তিতে শ্রেষ্ঠত্ব অর্জন করা।

ইসলামী বিশ্বের উপর দীর্ঘ একটা যুগ এমন পার হয়েছে, যখন সে তার ভিতরের আত্মিক শক্তিকে অবহেলা করেছে। কারণ জীবন ও জগতের যাবতীয় জটিলতা ও প্রতিকূলতার সফল মোকাবেলা করার জন্য আত্মিক শক্তির ভূমিকা কী, এর মূল্য কত, এ সম্পর্কে তার সেই পূর্বচেতনা আর জাগ্রত ছিলো না। তাই এ অমূল্য শক্তিটির সংরক্ষণ ও পরিচর্যা এবং এর পুষ্টি যোগানো ও বৃদ্ধি ঘটানোর প্রতি তার কোন চিন্তা-মনোযোগই ছিলো না।

ফল এই হয়েছে যে, তার অন্তর ও আত্মার বিপুল শক্তির স্রোতধারাটি ধীরে ধীরে শুকিয়ে গেছে এবং উম্মাহ খুব দ্রুত এক্ষেত্রে চরম অবক্ষয় ও দেউলিয়াত্বের

শিকার হয়ে পড়েছে। এরপর যখন বিভিন্ন সময়, বিভিন্ন ভূখণ্ডে এমন সব প্রতিকূল ঝড় ও সংগ্রাম-দুর্যোগ দেখা দিলো যার মোকাবেলা করার জন্য ঈমান ও বিশ্বাস, ধৈর্য ও সহনশীলতা, অবিচলতা ও স্থিরতা, ত্যাগ ও আত্মত্যাগ এবং অব্যাহত জোশ-উদ্দীপনার প্রয়োজন, যা ব্যতীত এসব ঝড়-তুফান ও সংগ্রাম-দুর্যোগের পথ পাড়ি দেয়া সম্ভব নয় তখন দেখা গেলো, এ মহাসম্পদ বহুদিন হলো, হৃদয় ও আত্মার জগত থেকে হারিয়ে গেছে এবং কোরআনের অঙ্কিত চিত্র, কোরআনি কাউমের জীবনেই সত্য হয়ে দেখা দিয়েছে– "দূর থেকে দেখে মনে হয় পানি, কাছে গিয়ে দেখে মরিচীকা"। তখন বহু বিপর্যয়ের মাশুল দিয়ে আলমে ইসলাম অনুভব করতে পারলো, এই রূহানিয়াত ও আত্মিক শক্তির প্রতি অবহেলা করে নিজেরই উপর সে অনেক বড় অবিচার করেছে। তখন অনেক খোঁজ-তালাশ ও চেষ্টা তদবীর করা হলো, কিন্তু তার 'শূন্য' অস্ত্রাগারে এমন কিছু পাওয়া গেলো না যা এই শূন্যতা পূর্ণ করতে পারে এবং এই বিরাট লোকছানের কিছুটা হলেও 'তালাফি' হতে পারে।

এর মধ্যে আলমে ইসলামকে এমন কিছু ভাগ্যনির্ধারণী সজ্ঞাতের সম্মুখীন হতে হয়েছে যার সঙ্গে ইসলাম ও মুসলিম উম্মাহর ইমামত, সম্মান ও ভাবমর্যাদারও প্রশ্ন জাড়িত ছিলো। এ সব ঘটনার প্রতিক্রিয়ায়, ধারণা করা হয়েছিলো, সারা বিশ্বের মুসলমানদের মধ্যে কেয়ামতের 'ধামাকা' শুরু হয়ে যাবে; দিলের জাহানে দাউ দাউ আগুন জ্বলে উঠবে; ইসলাম ও পবিত্রভূমির মর্যাদা রক্ষার জন্য তারা জানমালের বাজি লাগিয়ে দেবে; এককথায় আল্লাহ, রাসূল ও দ্বীনের হুরমতের জন্য তারা এমন গযব-ক্রোধের বহিঃপ্রকাশ ঘটাবে যে, দুশমন শেষপর্যন্ত মেনে নিতে বাধ্য হবে, উম্মাহর গায়রতকে 'লালকার' দিয়ে তারা ভুল করেছে।

কিন্তু দেখা গেলো, তেমন কিছুই হলো না। অস্তিত্বে ঝাঁকুনি দেয়া একেকটি ঘটনা ঘটলো এবং অল্প দিনেই 'অতীত' হয়ে গেলো। মুসলিম জনপদে মানুষের জীবনে তেমন কোন প্রভাব বিস্তার করলো না। কিছুদিন ক্ষোভ-বিক্ষোভ হলো, প্রতিবাদের মিছিলে শ্লোগানের গর্জন হলো, তারপর ধীরে ধীরে সবকিছু স্বাভাবিক হয়ে এলো। মানুষ তাদের সকাল-সন্ধ্যার নিস্তরঙ্গ জীবনে ফিরে গেলো। ভোগ-বিলাস, আনন্দ-বিনোদন, বিয়েশাদী সবকিছু আগের নিয়মে চলতে লাগলো। যেন এই কিছুদিন আগে বিরাট কিছু ঘটেনি। তখন আলমে ইসলামের মুফাক্কিরীন ও চিন্তাশীল সমাজ এবং আহলে নযর ও অন্তর্দৃষ্টিসম্পন্ন

ব্যক্তিগণ উপলব্ধি করলেন, মুসলিম উম্মাহর দ্বীনী গায়রত ও ধর্মোদ্দীপনা এবং ইসলামী জোশ ও জযবাই আসলে দুর্বল-কমযোর হয়ে গেছে। ভিতরের স্রোত ও তরঙ্গ থেমে গেছে। জিহাদ ও শাহাদাতের সেই অহুদি প্রেরণা ও ইয়ারমুকি চেতনা নিস্তেজ হয়ে গেছে। এককথায় ঈমানের সেই স্ফুলিঙ্গ একেবারে নিভে না গেলেও ভস্মস্তূপের নীচে চাপা পড়ে গেছে। এমনকি অন্যদেরও আর জানতে বাকি থাকলো না, আলমে ইসলামের এই ভিতরের কমযোরি ও আত্মিক অবক্ষয় অধ:পতনের কথা। ফলে উম্মাহর বিজয়াভিযান ও জিহাদের গৌরবময় ইতিহাস পড়ে শুনে তাদের মনমস্তিষ্কে যে ভীতি ও সম্ভ্রম তৈরী হয়েছিলো তা দূর হয়ে গেলো। মানুষের চোখে হঠাৎ তারা হয়ে গেলো তুচ্ছ মানুষ।

সুতরাং আজ মুসলিমবিশ্বের সরকার ও রাষ্ট্রনায়ক, দার্শনিক ও চিন্তাশীল সমাজ এবং আলেম-ওলামা ও তৃণমূল দাওয়াতি কর্মী, সবার সম্মিলিত কর্তব্য হলো মুসলমানদের অন্তরে নতুন করে আবার ঈমানের বীজ বপণ করা; দ্বীনী জাযবা ও গায়রত এবং ধর্মীয় আবেগ ও উদ্দীপনা নতুন করে জাগ্রত করা; নবুয়তের মিনহাজ ও তরীকায় দাওয়াত ইলাল্লাহ-এর কাজ আঞ্জাম দেয়া এবং দ্বীনের জন্য ত্যাগ ও কোরবানি এবং জিহাদ ও শাহাদাতের পথে উদ্বুদ্ধ করা। এ কাজে ঐ সমস্ত পথ ও পন্থা অনুসরণ করতে হবে, যা ইসলামের কল্যাণযুগের দা'ঈগণ করেছেন। সেই সঙ্গে ঐ সকল উপায়-উপকরণ ও কর্মকৌশলও (শরীয়তের সীমারেখায়) ব্যবহার করতে হবে যা আধুনিক প্রযুক্তি আজ আমাদের সামনে এনেছে।

কোরআন ও সুন্নাহ এবং নবীর সীরাত ও হায়াতে ছাহাবা এখনো এমন বিপুল শক্তির আধার যে, এর সাহায্যে মুসলিম উম্মাহর শুষ্কপ্রায় শিরা-উপশিরায় জীবনের উষ্ণ ও সজীব রক্ত প্রবাহিত করা যায়। এখনো হৃদয় ও আত্মার জগতে ঈমান ও বিশ্বাস এবং জিহাদি উদ্দীপনার মহাবিপ্লব এবং জাহেলিয়াত ও বস্তুবাদের বিরুদ্ধে মহাবিদ্রোহ সৃষ্টি করা সম্ভব। হাঁ, এখনো খুব সহজেই সম্ভব এই হতোদ্যম, নিস্তেজ ও তন্দ্রাচ্ছন্ন জাতিকে তারুণ্যের উদ্যমে উচ্ছল, সাহসী ও কর্মচঞ্চল এবং জাহেলিয়াতের বিরুদ্ধে আপোষহীন জাতিতে পরিণত করা, বিশ্বাসে ও আচরণে যারা হবে কল্যাণযুগের মুসলিম উম্মাহরই ছবি ও প্রতিচ্ছবি।

বর্তমান মুসলিম উম্মাহর মূল রোগ হচ্ছে দুনিয়ার যিন্দেগী নিয়েই খুশী থাকা এবং পচনধরা এই নষ্ট সমাজেই সন্তুষ্ট ও নিরুদ্বিগ্ন চিত্তে জীবন কাটিয়ে দেয়া।

এত ফিতনা-ফাসাদ, এত স্খলতি-ভ্রষ্টতা, তাতে কারো কোন উৎকণ্ঠা-অস্থিরতা নেই। এত অন্যায়-অনাচার, নাফরমানি-পাপাচার, কিন্তু কোন চিন্তা-ফিকির নেই। উম্মাহর সংশোধন ও সংস্কার-প্রচেষ্টায় যারা নিয়োজিত, এ অদ্ভুত অবস্থায় তারা যদি নিরুৎসাহিত হয়, হিম্মত হারিয়ে ফেলে তাহলে অবাক হওয়ার কিছু নেই। কিন্তু যাদের অন্তর্দৃষ্টি আছে, কোরআন-সুন্নাহর গভীর জ্ঞান আছে এবং উম্মাহর ইতিহাসের সঙ্গে পরিচয় আছে, তারা অবশ্যই জানেন যে, উম্মাহর এ বেদনাদায়ক অবস্থা সামগ্রিক নয়, সাময়িক। উম্মাহ ঘুমিয়েছে, আবার জেগেছে। যখনই 'জাগানেওয়ালা' জাগিয়েছে, অবিলম্বে, কিংবা বিলম্বে জেগে উঠেছে। ইনশাআল্লাহ, এ উম্মাহ আবার জাগবে, জেগে ওঠবে; তবে একমাত্র কোরআন-সুন্নাহ ও সীরাতে নববীর প্রভাবে; যদি হৃদয়ের বন্ধ দুয়ার খোলা যায় এবং পথ করে দেয়া যায়। আবার শুরু হবে চূড়ান্ত সজ্ঘাত ঈমান ও নেফাকের মধ্যে, বিশ্বাস ও সংশয়ের মধ্যে, ক্ষণস্থায়ী দুনিয়ার লাভ ও লোভ এবং চিরস্থায়ী আখেরাতের সুখ-শান্তির মধ্যে, দেহের ভোগ-উপভোগ এবং হৃদয় ও আত্মার প্রশান্তির মধ্যে এবং উদ্দেশ্যহীন জীবন ও শাহাদাতের মৃত্যুর মধ্যে। এমন দ্বন্দ্ব-সজ্ঘাত যা প্রত্যেক নবী সৃষ্টি করেছেন নিজ নিজ সময়ে তাঁর সম্প্রদায়ের মধ্যে; যা ছাড়া কোন জাতীর জীবন সংশোধনের পথে আসে না; আসতে পারে না। এটা যখন হবে তখনই মুসলিম দেশের প্রতিটি পরিবারে জাগ্রত হবে আছহাবে কাহাফের তরুণদের সার্থক প্রতিনিধি, যাদের সম্পর্কে আলকোরআন বলছে–

نَّحْنُ نَقُصُّ عَلَيْكَ نَبَأَهُم بِالْحَقِّ ۚ إِنَّهُمْ فِتْيَةٌ آمَنُوا بِرَبِّهِمْ وَزِدْنَاهُمْ هُدًى ﴿١٣﴾ وَرَبَطْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ إِذْ قَامُوا فَقَالُوا رَبُّنَا رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ لَن نَّدْعُوَ مِن دُونِهِ إِلَٰهًا ۖ لَّقَدْ قُلْنَا إِذًا شَطَطًا ﴿١٤﴾

আমি তাদের ঘটনা তোমাকে শোনাবো সত্যভাবে। নিঃসন্দেহে তারা কতিপয় তরুণ যারা ঈমান এনেছে তাদের প্রতিপালকের প্রতি। আর আমি তাদের হিদায়াত আরো বাড়িয়ে দিয়েছিলাম। আর আমি তাদের অন্তর আরো সুসংহত করেছিলাম, যখন তারা অবিচল হয়ে বললো, আমাদের রব তো সমস্ত আসমান ও যমীনের রব। আমরা তো তাকে ছেড়ে অন্য ইলাহকে ডাকবো না। (যদি ডাকি) তাহলে তো আমরা বড় গর্হিত কথা বললাম। (আল-কাহফ, ১৫ : ১৩-১৪)

তখন দুনিয়াতে আবার বিলাল, আম্মার, খাব্বাব, খোবায়ব, মুছ'আব, ছোহায়ব, আনাস বিন নাযার ও উসমান বিন মায'উন-এর ঈমানী জোশ-উদ্দীপনা এবং ত্যাগ ও কোরবানির ইতিহাস জীবন্ত হবে; তখন আবার পাহাড়ের পিছন থেকে জান্নাতের সুবাস পাওয়া যাবে; প্রথম শতাব্দীর কল্যাণ-সৌরভে জীবন আবার স্নিগ্ধ হবে এবং এমন এক নতুন ইসলামী বিশ্বের আবির্ভাব হবে যার সঙ্গে বর্তমান মুসলিম বিশ্বের কোন মিল খুঁজে পাওয়া যাবে না।

আজ দেশে দেশে এই যে এত সামাজিক, অর্থনৈতিক অস্থিরতা, জীবন ও সম্পদ এবং ইজ্জত-আবরুর নিরাপত্তার অভাব-উৎকণ্ঠা, এটা মুসলিম বিশ্বের আসল সমস্যা নয়, আসল সমস্যা এই যে, (উম্মাহর বর্তমান ও ভবিষ্যত সম্পর্কে) আজকের মুসলমান বড় বেশী শান্ত, নিরুদ্বিগ্ন, দুনিয়ার দু'দিনের ভোগ-বিলাসের জীবন নিয়েই তারা তুষ্ট, পরিতৃপ্ত। এ জন্য অবস্থা ও পরিস্থিতির সঙ্গে সমোঝতা করতে তাদের আপত্তি নেই। বিশ্বের এই যে আত্মিক ও নৈতিক দুর্গতি, বিশ্ব-মানবতার এই যে অবক্ষয়, এজন্য তাদের মধ্যে কোন অস্থিরতা নেই। মানব-জাতির জীবন, চরিত্র, চিন্তা ও ধ্যানধারণা যে পথে চলেছে এবং যেভাবে চলেছে তাতে সে কোন ভুল, বিচ্যুতি ও স্খলন দেখতে পায় না; বরং সে নিজেও তো ঐ পথের পথিক। তার লাভ-ক্ষতির দৃষ্টি কখনো ব্যক্তি-পরিমণ্ডলের বাইরে যেতেই পারে না। তার চিন্তা-চেতনার এই যে অবসাদগ্রস্ততা, হৃদয়ের এই যে নির্জীবতা ও মুরদাদিলি এর কারণ; ভিতরে তাপ ও উত্তাপ নেই। বুকে কাঁটার 'বিঁধন' নেই এবং হৃদয়ে ব্যথার দহন নেই।

কবি বলেন (তরজমা)–

> হৃদয়ের চিকিৎসক আমার বুকের স্পন্দন পরীক্ষা করে বলেন, তোমার ব্যাধি আর কিছু না, শুধু ব্যাকুলতার অভাব।

সুতরাং এখন প্রয়োজন বুকে আবার ব্যথার দহন সৃষ্টি করা, হৃদয়ের সেই তাপ-উত্তাপ ও ব্যাকুলতা ফিরিয়ে আনা; উম্মাহর এই তৃপ্তি ও পরিতৃপ্তির জীবনে একটা 'হালচাল' মাচিয়ে দেয়া, যাতে তার মধ্যে ব্যক্তি ও ব্যক্তিস্বার্থের পরিবর্তে মানবতার দরদ ব্যথা, মানবতার হেদায়াত ও নাজাতের চিন্তা, এবং মানবতার প্রতি করুণা ও কল্যাণ-ব্যাকুলতা জাগ্রত হয়; যেন এই লজ্জা তাকে অস্থির করে তোলে যে, আল্লাহর সামনে কী মুখ নিয়ে দাঁড়াবো? এই উম্মাহর কল্যাণ-কামনা এ নয় যে, তার জন্য তুমি নিরুদ্বিগ্ন ও নির্ঝঞ্ঝাট জীবনের প্রার্থনা জানাবে; বরং

প্রকৃত কল্যাণ এই যে, তার জন্য তুমি দরদ-ব্যথা, দহন-যন্ত্রণা ও অস্থিরতার প্রার্থনা করবে। তাই তো কবি বলেছেন–

> খোদা তুঝে কিসী তুফান সে আশনা ক্যর দে
> কে তেরেরে ব্যহর কী মওজ্ ম্যঁ ইযতিরাব ন্যহীঁ

> "আল্লাহ করুন, তোমার জীবনে কোন ঝড়তুফানের সঙ্গে যেন পরিচয় ঘটে। কারণ তোমার জীবন-সাগরে তরঙ্গ হয়ত আছে, তরঙ্গাঘাত নেই।

বোধ ও চেতনার পরিচর্যা

কোন জাতি ও সম্প্রদায়ের জন্য সবচে' বিপজ্জনক ও ঝুঁকিপূর্ণ বিষয় হলো সঠিক বোধ ও চেতনা থেকে বঞ্চিত হওয়া। যে জাতি সর্বপ্রকার যোগ্যতা ও প্রতিভার অধিকারী, ধর্ম ও কর্ম উভয় ক্ষেত্রে অগ্রসর। 'বদন' আছে, বদান্যতা আছে, শক্তি আছে, সাহস আছে, কৌশল আছে, কুশলতা আছে, আবার আমল আছে, আখলাক আছে, রোযা-নামায সবই আছে, কিন্তু ভালো-মন্দ, পাপ-পুণ্য ও ভুল-নির্ভুল বোঝার, শত্রু-মিত্র চেনার এবং অতীত অভিজ্ঞতা কাজে লাগিয়ে ভবিষ্যতে পদক্ষেপ গ্রহণ করার যোগ্যতা নেই; নেতা ও ধর্মনেতাদের কাছে কৈফিয়ত চাওয়ার এবং জাতির কাছে যারা অপরাধী তাদের পাকড়াও করার সৎ সাহস নেই; যে জাতি নেতা ও নায়কদের মিষ্টি মোলায়েম কথায় ভুলে যায়, বাগ্মিতা ও বাক-যাদুতে মুগ্ধ হয়ে যায়, বারবার প্রতারিত হয়, তারপরো নতুন প্রতারণার শিকার হয়, এমন জাতি তার ধর্মীয় ও জাগতিক সাফল্য, উচ্চতা ও যোগ্যতা সত্ত্বেও কিছুতেই আস্থাযোগ্য নয়। এমন জাতি যে কোন সময় যে কোন পেশাদার রাজনীতিক ও ভাগ্যান্বেষী নেতাদের খেলার পাত্র হতে পারে। জাতির সরলতা ও বোধহীনতার কারণে এসব নেতা ও শাসক স্বেচ্ছাচার করার সুযোগ পায় এবং নিশ্চিন্ত থাকে যে, তার কাছে হিসাব চাওয়ার বা কৈফিয়ত নেয়ার কেউ নেই।

মুসলিম দেশগুলো সম্পর্কে সতর্কতার অনুরোধে যদি আমরা একথা বলতে না চাই যে, 'সচেতনতা' তাদের মধ্যে সম্পূর্ণ বিলুপ্ত, তাহলে অন্তত এতটুকু বলতে হবে যে, তাদের সচেতনতা খুবই দুর্বল এবং প্রাথমিক পর্যায়ের। আফসোসের সঙ্গেই বলতে হয়, দোস্ত-দুশমন ও শত্রু-মিত্রের পার্থক্য তারা বুঝতে পারে না। হিতাকাঙ্ক্ষী ও অহিতাকাঙ্ক্ষী উভয়ের প্রতি তাদের আচরণ প্রায় অভিন্ন।

ক্ষেত্রবিশেষে বরং সুচতুর ও 'ক্ষতিকর' ব্যক্তিরাই বিপুল আস্থা ও সর্বপ্রিয়তা অর্জন করে থাকে।

রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সতর্ক করে বলেছেন, মুমিন একই গর্ত থেকে দুবার দংশিত হয় না, কিন্তু মুসলিম দেশগুলোর বাসিন্দারা দু'বার নয়, বহুবার দংশিত হয়েও যেন দংশনের ঘোর থেকে বেরিয়ে আসতে পারে না। আবারও সহজ দংশনের শিকার হয়। তাদের স্মৃতি ও স্মৃতিশক্তি এত দুর্বল যে, নেতা ও শাসকদের অতীত, এমনকি নিকট অতীতও ভুলে যায়। তাদের ধর্মীয়, সামাজিক ও নাগরিক সচেতনতা মর্মান্তিকভাবে দুর্বল, আর রাজনৈতিক সচেতনতা তো বলতে গেলে একেবারেই শূন্য। এই সচেতনতার অভাবেই তারা বাইরের শক্তিগুলোর এবং নিজেদের স্বার্থবাদী নেতাদের হাতে 'খেলার পুতুল' হয়ে আছে। খুব সহজেই তাদের দৃষ্টি ও মনোযোগ যে কোন দিকে ঘুরিয়ে দেয়া যায় এবং এক লাঠিতে সবাইকে ইচ্ছেমত হাঁকিয়ে নেয়া যায়।

অন্যদিকে পাশ্চাত্যের অবস্থা দেখুন, নৈতিক ও আত্মিক দেউলিয়াত্ব এবং যাবতীয় অবক্ষয় অধ:পতন সত্ত্বেও –যা এ পর্যন্ত আমাদের আলোচনায় এসেছে– নাগরিক ও সামাজিক বিষয়ে তারা পূর্ণ সচেতন। আর রাজনৈতিক সচেতনতার ক্ষেত্রে তো রীতিমত পরিপক্বতার স্তরে উপনীত। বস্তুগত লাভক্ষতি তারা যথেষ্ট বোঝে। যোগ্য-অযোগ্য এবং আন্তরিক ও মতলবীর মধ্যে পার্থক্য করতে পারে। কে বন্ধু কে শত্রু তা সঠিকভাবে চিহ্নিত করতে পারে। দুর্বল, ভীরু, ভঙ্গুর, অযোগ্য ও অবিশ্বস্ত ব্যক্তির হাতে কখনো তারা নেতৃত্ব ও কর্তৃত্ব অর্পণ করে না। এ বিষয়ে তারা এতই সতর্ক-সচেতন যে, ক্ষমতা ও দায়িত্ব অর্পণের পরও তাদের তীক্ষ্ণ পর্যবেক্ষণ অব্যাহত থাকে। সামান্য বিচ্যুতি বা স্খলন দেখা দিলেই তাকে ক্ষমতা থেকে অপসারণ করে এবং দায়িত্ব থেকে অব্যাহতি দিয়ে দেয়। এমন কি জনগণ যখন দেখে, অমুক তার দায়িত্ব সম্পন্ন করেছে এবং তার কাজ শেষ, তখন তাকে অবসরে পাঠিয়ে দেয় এবং তার স্থলে আরো যোগ্য, আরো উপযোগী কাউকে নির্বাচন করে। কোন নেতার গৌরবোজ্জ্বল অতীত, অবিস্মরণীয় অবদান, যুদ্ধক্ষেত্রে কোন সেনাপতির অসাধারণ শৌর্যবীর্য ও সমর কৃতিত্ব, কোন কিছুই তাদের কঠোর ও সময়োপযোগী সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রে বাধা হয়ে দাঁড়ায় না। এ কারণেই পাশ্চাত্যের জাতিবর্গ রাজনীতির অযোগ্য, অবিশ্বস্ত খেলোয়াড়দের স্বেচ্ছাচার থেকে নিরাপদ। অবশ্য তাদের রাজনৈতিক

নেতৃবর্গ ও জনপ্রতিনিধিরাও সতর্কতা ও বিশ্বস্ততা রক্ষা করতে বাধ্য থাকে। প্রতিটি পদক্ষেপ তারা যথেষ্ট ভেবে চিন্তে গ্রহণ করে। জনগণের অসন্তোষ এবং জনমতের ক্রোধ সম্পর্কে সবসময় তারা ভীত সন্ত্রস্ত থাকে।

এখন সময়ের অনেক বড় প্রয়োজন এবং মুসলিম বিশ্বের অনেক বড় সেবা হলো উম্মাহর বিভিন্ন স্তরে এবং সাধারণ মানুষের মধ্যে সঠিক বোধ ও সচেতনতা সৃষ্টি করা। সবার জন্য সামাজিক, নাগরিক ও রাজনৈতিক প্রশিক্ষণের পর্যাপ্ত ব্যবস্থা করা। মনে রাখতে হবে যে, শিক্ষার প্রসার, শিক্ষার হার বৃদ্ধি এবং মানুষের সংখ্যাধিক্য ঘটলে জাতির মধ্যে সচেতনতাও থাকবে, এটা অনিবার্য নয়। যদিও এতে সন্দেহ নেই যে, শিক্ষার প্রসার ও জ্ঞানের বিস্তার সচেতনতা বৃদ্ধিতে যথেষ্ট সহায়ক। তবে সচেতনতা সৃষ্টি করার জন্য মোটকথা স্বতন্ত্র প্রচেষ্টা গ্রহণ ও ব্যাপক আন্দোলনের প্রয়োজন রয়েছে। মুসলিম নেতৃবৃন্দকে এবং সংস্কার-প্রচেষ্টায় নিয়োজিত ব্যক্তিবর্গকে এটা খুব ভালো করে বুঝতে হবে যে, যে জাতি ও জনগোষ্ঠীর মধ্যে চিন্তা ও চিন্তার গভীরতা কম সে জাতি আস্থা ও ভরসার যোগ্য নয়; যতই নেতৃত্বের প্রতি আস্থা, ভালোবাসা ও উচ্ছ্বাস প্রকাশ করুক, যতই নিঃশর্ত আনুগত্য প্রদর্শন করুক এবং নেতৃত্বের ডাকে, দাওয়াতের লক্ষ্য-উদ্দেশ্য অর্জনের পথে যতই আত্মত্যাগ ও কোরবানি পেশ করুক, যতক্ষণ ব্যক্তি ও জাতীয় পর্যায়ে সচেতনতা সৃষ্টি না হবে এবং দূরদর্শী ও পরিপক্ব চিন্তার অধিকারী না হবে, এ আশঙ্কা সবসময় বিরাজ করবে যে, এরা অন্যকোন দাওয়াত বা আন্দোলনের ক্রীড়নকে পরিণত হতে পারে। ফলে দেখতে দেখতে বহু বছরের চেষ্টা মেহনত ও সাধনা ব্যর্থ হয়ে যেতে পারে। যে জাতির বোধ অনুভূতি জাগ্রত নয়, নিজস্বভাবে চিন্তা করার এবং ভালোমন্দের পার্থক্য বোঝার যোগ্যতা নেই, তার উদাহরণ হলো ঝরে পড়া শুকনো পাতা, বিভিন্ন দিকের বাতাস যাকে বিভিন্ন দিকে উড়িয়ে নিয়ে যায়।

ইসলাম যদিও একটি আসমানী ধর্ম এবং তার বুনিয়াদ হলো অহী ও নবুয়তের উপর, তবু সে তার অনুসারীদের মধ্যে এমন একটি বোধ ও চেতনা সৃষ্টি করতে চেয়েছে, যা সর্বপ্রকার বোধ ও চেতনার মধ্যে অধিক পূর্ণাঙ্গ, অধিক গভীর ও বিস্তৃত। ইসলাম তার অনুসারীদের এমন এক চিন্তাপদ্ধতি দান করেছে, যা জাহেলি চিন্তাপদ্ধতি থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন, এমন জাগ্রত ও মর্যাদাপূর্ণ চিন্তাপদ্ধতি যা যথেষ্ট উদার ও সম্প্রসারণযোগ্য হওয়া সত্ত্বেও ঐসব চিন্তা ও ধ্যানধারণা গ্রহণ

করতে পারে না যা তার স্বীকৃত ও চিরস্থির বিষয়গুলোর সঙ্গে সঙ্গতি রক্ষা করে না এবং এমন কোন উপায়-উপাদান বা অণু-অংশ আত্মস্থ করার জন্য প্রস্তুত নয় যা তার মূল প্রাণ ও মূলনীতিমালার বিরোধী।

এই ইসলামী বোধ ও সচেতনতার একটি উদাহরণ দেখুন; ইসলামের দাওয়াত এবং নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ছোহবত ও তারবিয়াত-এর মাধ্যমে ছাহাবা কেরামের চিন্তাচেতনায় ও মনমস্তিষ্কে এ বিশ্বাস বদ্ধমূল হয়ে গিয়েছিলো যে, যুলুম অতি জঘন্য পাপ এবং দ্বীনী ও আখলাকী অপরাধ, যা কারো জন্যই এবং কোন অবস্থাতেই বৈধ নয়। দ্বীন ও শরীয়ত এবং নববী ছোহবত থেকে তারা এ শিক্ষাই পেয়েছিলেন যে, জীবনের সর্ব-অঙ্গনে ন্যায় ও সত্যের পক্ষে থাকতে হবে; আপন-পর, দূর-নিকট ও শত্রু-মিত্র সবার সঙ্গে ইনছাফের আচরণ করতে হবে। জাহেলি জাত্যাভিমান এবং গোত্রীয় ও বংশীয় সাম্প্রদায়িকতা থেকে তাঁরা চিরতাওবা করেছিলেন এবং এ উপলব্ধি অর্জন করেছিলেন যে, ইসলামে অন্ধ সম্প্রদায়-প্রীতির কোন স্থান নেই। এটা তাঁদের আকীদা-বিশ্বাসের অবিচ্ছেদ্য অংশ হয়ে গিয়েছিলো এবং তাঁদের সত্তা ও অস্থিমজ্জায় মিশে গিয়েছিলো। একদিন হঠাৎ তাঁরা তাঁদের প্রাণপ্রিয় নবীর পবিত্র মুখে এ উপদেশ-বাণী শুনতে পেলেন–

انصر أخاك ظالما أو مظلوما

তোমার ভাইকে সাহায্য করো, হোক সে যালিম বা মযলূম।

যদি তাঁদের তারবিয়াত ও দীক্ষায় সামান্য ত্রুটিও থাকতো এবং মনমানস ও চিন্তাচেতনায় বিন্দুমাত্র ইনতিশার ও বিক্ষেপ থাকতো তাহলে তারা নীরবে এ উপদেশ শুনতেন এবং জাহেলি ধ্যান-ধারণায় এর যা অর্থ সেভাবেই তা গ্রহণ করে নিতেন। ইসলামপূর্ব জীবনে এ ধ্যান-ধারণার উপরই তাঁদের প্রতিপালন হয়েছিলো এবং সারা জীবন এ নীতির উপরই তাঁরা চলে এসেছেন। তদুপরি তাঁদের অটল বিশ্বাস, আল্লাহর নবী কোন কথা নিজের খাহেশ ও ইচ্ছা অনুযায়ী বলেন না; যা বলেন আসমানি অহীর নির্দেশেই বলেন। নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আদব ও আযমত রক্ষা করা এবং তাঁর সকল আদেশ-উপদেশ বিনাবাক্য ব্যয়ে মেনে নেয়ার ক্ষেত্রে, তাঁদের চেয়ে তৎপর ও অগ্রসর তো আর কেউ ছিলো না। কিন্তু না, নববী ছোহবত ও সাহচর্যের কারণেই তাঁদের পক্ষে

নীরব থাকা সম্ভব হলো না। এ উপদেশ তাঁদের কাছে ঐ আকীদা-বিশ্বাস, চিন্তা-চেতনা এবং বোধ ও উপলব্ধির সঙ্গে সজ্ঘর্ষপূর্ণ মনে হলো যা নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামেরই তালীম-তারবিয়াত এবং শিক্ষা ও সাহচর্য থেকে তাঁরা অর্জন করেছেন। এ উপদেশ যেন তাঁদের অর্জিত বোধ, উপলব্ধি ও চেতনাকেই আঘাত করলো। তাই আচমকা তাঁরা প্রচণ্ড এক ঝাঁকুনি খেলেন। এই চিন্তা-যাতনা তাঁরা লুকোতেও চেষ্টা করলেন না, বরং অবাক হয়ে জানতে চাইলেন–

মযলূমের বিষয় তো ঠিক, কিন্তু যালিমের বিষয়টি কী?

নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের তারবিয়াত ও শিক্ষাদানের পদ্ধতি ছিলো এমনই হাকীমানা ও প্রজ্ঞাপূর্ণ। তিনি সচেতনভাবেই এরূপ বলেছিলেন, যাতে তাঁদের চিন্তায় একটা তোলপাড় হয় এবং প্রশ্নের মাধ্যমে প্রকৃত বিষয়টি তাঁরা জানেন এবং আত্মস্থ করেন। ছাহাবা কেরামের জিজ্ঞাসার জবাবে তিনি ব্যাখ্যা করে বললেন–

যুলুম থেকে বিরত রাখা, এটাই হলো তাকে সাহায্য করা।

যখানে নবুয়তের এ ব্যাখ্যা শোনামাত্র তাঁদের চিন্তার জট যেন খুলে গেলো। তাঁদের ইসলামী মানস ও চিন্তা-চেতনা এ উপদেশবাণীকে তখন এমনভাবেই গ্রহণ করে নিলো যেন তা এতদিনের জানাশোনা ও পরিচিত সত্য। ছোট্ট একটি ঘটনা, কিন্তু তা ইসলামী বোধ ও চেতনার নাযুকতা ও সংবেদনশীলতার সুস্পষ্ট উদাহরণ, যা হাদীছ ও সীরাতগ্রন্থে চিরকাল সংরক্ষিত থাকবে।

আরেকটি উদাহরণ; জনৈক ছাহাবীর 'ইমারত' ও নেতৃত্বে রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ছাহাবাদের একটি ফৌজ পাঠালেন এবং তাঁদেরকে আমীরের আনুগত্য করার তাকীদ করলেন।

সফরের কোন একপর্যায়ে কোন কারণে আমীর তাঁর বাহিনীর প্রতি এমনই নারায ও ক্রুদ্ধ হলেন যে, অগ্নিকুণ্ড প্রজ্জ্বলিত করলেন, আর (তাঁর ধারণায় যারা অপরাধী) তাদেরকে আগুনে ঝাঁপ দেয়ার হুকুম করলেন। কিন্তু তাঁরা অস্বীকৃতি জানিয়ে বললেন, আমরা তো নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের অনুসরণ করেইছি আগুন থেকে নাজাত পাওয়ার জন্য, এখন সেই আগুনে ঝাঁপ দেবো?!

পরে নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁদের চিন্তা ও কাজ সমর্থন করে বললেন, তারা যদি আগুনে ঝাঁপ দিতো, আর কখনো বের হতে পারতো না।

ছাহাবা কেরামের অস্বীকৃতির ভিত্তি কী ছিলো? অথচ নবীর আদেশ ছিলো আমীরের আনুগত্য করা। আর এ ভরসার উপরই আমীর এমন কঠিন হুকুম জারি করেছিলেন। ভিত্তি ছিলো এই যে, তারা শরীয়তের এই উছূল ও মূলনীতির উপর বিশ্বাস স্থাপন করেছিলেন–

لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق

খালিকের নাফরমানি করে মাখলূকের ফরমাবরদারি করা ছহী নয়।

ইতা'আত ও আনুগত্য তখনই বৈধ হবে যখন শরীয়তসম্মত কোন আদেশ দেয়া হবে। বলাবাহুল্য যে, ইসলামের সঠিক বোধ, চেতনা ও উপলব্ধি ছাড়া এ ধরণের জটিল পরিস্থিতিতে দ্বীন ও শরীয়াতের চাহাত ও ইচ্ছার উপর অবিচল থাকা কিছুতেই সম্ভব হয় না; বরং মানুষ প্রান্তিকতার শিকার হয়ে পড়ে। কেউ চলে যায় তথাকথিত মান্যতার একেবারে বহি:সীমায়, কেউ চলে যায় অবাধ্যতার চূড়ান্ত সীমায়। অথচ ঘটনাসংশ্লিষ্ট ছাহাবাগণ আমীরের প্রতি বিদ্রোহ প্রকাশ করেননি; শুধু শরীয়ত-অসঙ্গত ঐ আদেশটি মান্য করা হতে বিরত থেকেছেন। আর সেটাই ছিলো ঐ ক্ষেত্রে শরীয়াতের সঠিক আদেশ।

নবুয়তের ছোহবত ও তারবিয়াত থেকে অর্জিত ইসলামী বোধ ও চেতনারই কারণে ছাহাবা কেরাম কোন ভুল কথা বা কাজ এবং কোন না-ইনছাফি বরদাশত করতে পারতেন না। এমনকি তা স্বয়ং খলীফার পক্ষ হতেও যদি প্রকাশ পায়। খোতবা দেয়ার জন্য মিম্বরে দাঁড়ানো খলীফার কাছে কৈফিয়ত চাইতেও তাঁরা দ্বিধা করতেন না। এটা ছিলো হযরত ওমর (রা.)-এর ঘটনা। তাঁর দেহে ছিলো দু'টি বস্ত্রের পূর্ণপ্রস্থ নতুন পোশাক। খোতবায় তিনি বললেন, লোকসকল, তোমরা শোনো, জনৈক ছাহাবী দাঁড়িয়ে গেলেন, 'আমরা শোনবো না যতক্ষণ না জানতে পাই, বন্টনে আমরা সবাই পেয়েছি একটি কাপড়। আপনার এক জোড়া হলো কীভাবে?'

তিনি পুত্র আব্দুল্লাহ বিন উমরকে আওয়ায দিয়ে জিজ্ঞাসা করলেন, যে কাপড় দ্বারা তহবন্দ তৈরী করা হয়েছে তা কি তোমার নয়? তিনি বললেন হাঁ, তখন লোকেরা বললো, হাঁ আমীরুল মু'মিনীন, এখন বলুন, আমরা শোনবো।

এই ছিলো নববী ছোহবত ও তারবিয়াত থেকে প্রাপ্ত ইসলামী বোধ ও চেতনা, শাসক ও শাসিত উভয়ের!

খেলাফতে রাশেদার পরবর্তী সময়ে আসুন। সমাজের সর্বস্তরে বিদ্যমান এই ইসলামী বোধ ও চেতনারই ফল ছিলো এই যে, উমাইয়া পরিবারকে তাদের রাজক্ষমতা প্রতিষ্ঠা করতে এবং বহাল রাখতে কঠিন থেকে কঠিন প্রতিকূলতা ও প্রতিরোধের সম্মুখীন হতে হয়েছে। এই ইসলামী চেতনা বারবার উমাইয়া শাসনের বিরুদ্ধে জিহাদের ঝাণ্ডা বুলন্দ করেছে। উমাইয়া শাসকরা ততদিন পর্যন্ত স্বস্তির শ্বাস নিতে পারেনি যতদিন ইসলামী বোধ ও চেতনার উপর প্রতিপালিত ও দীক্ষাপ্রাপ্ত প্রজন্মের ব্যক্তিগণ বিদ্যমান ছিলেন। যারা ইসলামী খেলাফত, ইসলামের নেযামে হুকুমত এবং ইসলামের শাসন-পদ্ধতি সম্পর্কে পূর্ণ সচেতন ছিলেন এবং পরিপূর্ণ বোধ ও উপলব্ধির অধিকারী ছিলেন, আর এক্ষেত্রে কোন প্রকার বিচ্যুতিকে পরিষ্কার বিদ'আত মনে করতেন।

ইউরোপের জাতিবর্গ এখন যে সমস্ত আত্মিক ও নৈতিক দুর্বলতা, অবক্ষয় ও অধঃপতনের শিকার তাতে কোন জাতির অস্তিত্বই টিকে থাকার কথা নয়, অথচ ইউরোপ শুধু যে বেঁচে বর্তে আছে তা নয়, বরং ভালোমন্দ যেভাবেই হোক এবং মানবতার পরিণতি যাই হোক দুর্দণ্ড প্রতাপে বিশ্বকে শাসনও করছে। কীভাবে তা সম্ভব হচ্ছে? সম্ভব হচ্ছে, কারণ, অবক্ষয় ও অধঃপতনের এমন সরগরম অবস্থার মধ্যেও ইউরোপ ব্যক্তি, সমাজ ও জাতীয় পর্যায়ে একটি বিষয়কে খুব দৃঢ়ভাবে আঁকড়ে ধরে আছে, আর তা হলো নাগরিক জীবনের দায়দায়িত্বের অনুভূতি এবং ব্যাপক রাজনৈতিক সচেতনতা। এখনো ইউরোপ-আমেরিকায় এমন মানুষের অস্তিত্ব বিরল যারা ব্যক্তিস্বার্থ চরিতার্থ করার জন্য, জাতীয় 'খেয়ানত'-এর স্তরে নেমে আসতে পারে; দেশকে সস্তা দামে (বা উচ্চ মূল্যে) বেচে দিতে পারে; জাতীয় গুরুত্বপূর্ণ কোন তথ্য পাচার করতে পারে, কিংবা উচ্চ কমিশনের লোভে রাষ্ট্রীয় সম্পদ ব্যয় করে অচল, অনুপযোগী অস্ত্রশস্ত্র ও সমরোপকরণ খরিদ করতে পারে।

মোটকথা 'জাতীয় গাদ্দারি'র এ ধরণের উদাহরণ প্রাচ্যে প্রচুর, মুসলিম দেশে ভুরি ভুরি, কিন্তু ইউরোপ-আমেরিকায় বিরল। বলতে গেলে একেবারেই নেই। ইউরোপের যা কিছু আখলাকি ফাসাদ ও নৈতিক অবক্ষয় তা ব্যক্তিজীবনে এবং পারিবারিক পর্যায়ে সীমাবদ্ধ। খুব বেশী হলে সামাজিক পরিমণ্ডল পর্যন্ত বলতে পারেন। তাদের কোন নেতা, রাষ্ট্রনেতা বা পদস্থ কর্মকর্তা অবশ্যই সফেদ সফেদ মিথ্যা বলতে পারে, ধূর্ততার আশ্রয় নিতে পারে, অন্য জাতিকে ধোকা দিতে

পারে, ভিন্ন দেশের সম্পদ লুন্ঠন করতে পারে, দুর্বল জাতির উপর নেকড়ের হিংস্রতা নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়তে পারে; অনেক কিছুই করতে পারে, তবে নিজের ব্যক্তিস্বার্থে নয়, স্বদেশ ও স্বজাতির স্বার্থে। কোন সন্দেহ নেই যে, এগুলো সব মানবতার বিরুদ্ধে জঘন্য অপরাধ, ইসলামে যার কোন প্রকার বৈধতা নেই। অন্যায় অনাচার, অনৈতিকতা ও বদ আখলাকি ব্যক্তির সঙ্গে হোক বা দল ও সম্প্রদায়ের সঙ্গে, পিছনে ব্যক্তিগত 'চালিকা' থাক, বা সামাজিক ও জাতীয় চালিকা, মিথ্যা সর্বাবস্থায় মিথ্যা এবং অপরাধ যে কোন পরিচয়েই অপরাধ। কিন্তু পার্থক্য এই যে, পাশ্চাত্য যা কিছু করে, একটা নির্দিষ্ট বোধ ও চেতনা এবং নৈতিক দর্শনের প্রেরণায় করে। পক্ষান্তরে প্রাচ্য ও 'মুসলিম' যা করে, বোধহীন ও চেতনাহীন অবস্থায় করে; ব্যক্তিগত চালিকায় চালিত হয়ে ব্যক্তিস্বার্থ উদ্ধারের জন্য করে, এমনকি সে জন্য সামষ্টিক ও জাতীয় স্বার্থ জলাঞ্জলি দিতেও কুণ্ঠিত হয় না।

মুসলিম দেশগুলোর নেতা, শাসক ও ক্ষমতাসীন লোকেরা, কিছুমাত্র অসম্ভব নয় যে, নিজেদের তুচ্ছ কোন ফায়দা বা স্বার্থের কারণে এবং আরো তুচ্ছ কোন ভোগের প্রলোভনে দেশ বন্ধক রেখে দেবে, কিংবা বিক্রির বায়না করে ফেলবে। এমন কতবার হলো, রক্ষক নিজে ভক্ষক হয়ে জাতীয় সম্পদ, এমনকি তেলের ভাণ্ডার বিদেশী প্রভুর হাতে তুলে দিয়েছে, আর তারা এক গ্যালন তেলও নিজের গাড়িতে খরচ না করে জাতীয় ভাণ্ডারে জমা করেছে। কতবার এমন ঘটেছে যে, শুধু নিজের গদি রক্ষা ও ক্ষমতা নিশ্চিত করার জন্য বহিঃশক্তিকে ডেকে আনা হয়েছে বা জাতির উপর রক্তক্ষয়ী যুদ্ধ চাপিয়ে দেয়া হয়েছে। আরো মর্মান্তিক বিষয় এই যে, বোধহীন, চেতনাহীন জাতি নির্বিবাদে সব কিছু মেনে নেয়, বরং 'জাতীয় বেঈমান'কেই জাতীয় বীরের মর্যাদায় বরণ করে নেয় এবং তার শ্লোগান-বন্দনায় মেতে ওঠে! এসব মর্মান্তিক চিত্র এছাড়া আর কী প্রমাণ করে যে, জাতির বিবেক মরে গেছে। চেতনা ও চিন্তাশক্তি লোপ পেয়ে গেছে। যাকে কোরআনের ভাষায় বলা যায়– 'ওরা চতুষ্পদ জন্তু, বরং তার চেয়ে অধম'!

এমন মুসলিম দেশের কি অভাব আছে, মানুষের সঙ্গে যেখানে ভারবাহী পশুর মত আচরণ করা হয়! আমজনতা শুধু হাড়ভাঙ্গা পরিশ্রম করে, রক্তের ঘাম ঝরায়, আর উপর তলার কিছু মানুষ ভোগবিলাস ও মৌজ-ফূর্তি করে বেড়ায়। খোল্লামখোল্লা আল্লাহর নাফরমানি হতে থাকে, শরীয়াতের আহকাম ও বিধান

পদদলিত হতে থাকে, অথচ মুসলিম জনতা নির্বিকার। না কোন প্রতিবাদ প্রতিরোধ আছে, না কারো অন্তরে ঘৃণা ও ক্রোধের তরঙ্গপ্রবাহ আছে, আর না আছে সামান্য যন্ত্রণার দহন।

কখনো কখনো বিক্ষোভ বিদ্রোহের আগুন যে জ্বলে ওঠে না তা অবশ্য নয়, কিন্তু কোন বিপ্লব, বিদ্রোহের বিন্দুমাত্র মূল্যও নেই (দৃশ্যত দেশ ও জাতির জন্য তা যতই ফলদায়ক মনে হোক) যতক্ষণ না তার ভিত্তি হবে নির্ভুল ও বিশুদ্ধ চিন্তা-বিশ্বাস এবং গভীর প্রজ্ঞাপূর্ণ বোধ ও চেতনা। এটা হলো বুদ্বুদের মত ক্ষণস্থায়ী বা আতশবাজির মত সাময়িক। যতক্ষণ পর্যন্ত জনমত পূর্ণ প্রাজ্ঞ না হবে এবং মানুষের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য সুস্পষ্ট ও সুস্থির না হবে এবং উত্তেজনা ও উন্মাদনার পরিবর্তে উদ্যম ও উদ্দীপনা সৃষ্টি না হবে ততক্ষণ শাসকের নির্বাসন, সরকারের পতন এবং মন্ত্রী, প্রধানমন্ত্রীর অপসারণ, এসবের আসলেই কোন গুরুত্ব নেই। এগুলো মোটেই বিবেচনাযোগ্য কোন পরিবর্তন নয়। নীতি ও ব্যবস্থা, পন্থা ও পদ্ধতি এবং পাপ ও অপরাধের প্রতি যদি ঘৃণা সৃষ্টি না হয়; বিশুদ্ধ ধর্মবিশ্বাস এবং ন্যায় ও সামাজিক সুবিচার প্রতিষ্ঠা যদি উদ্দেশ্য না হয় তাহলে বিপ্লব ও বিদ্রোহের ফসলরূপে ভুল কোন ব্যক্তি বা ভ্রান্ত কোন দলের স্থানে আরেকজন ভুল ব্যক্তি বা ভ্রান্ত দল ক্ষমতায় আসতে পারে, এর বেশী কিছু নয়। সুতরাং আসল বিবেচনার বিষয় হলো, জাতি যেন সচেতন হয়, জাতির বোধ, বিবেক ও চেতনা যেন জাগ্রত হয়, যাতে কোন অবস্থায় এবং কোন ব্যক্তি বা দলের ক্ষেত্রেই কোন ভুলবিচ্যুতি, ভ্রষ্টতা ও নষ্টাচার জাতির বিবেক ও চেতনায় বরদাশতযোগ্য না হয়।

ঘুরিয়ে ফিরিয়ে বারবার একই কথা এজন্য বলতে হচ্ছে যে, আলমে ইসলামের জন্য এখন সবচে' বড় খেদমত হলো, এমন বোধ ও প্রজ্ঞা এবং চেতনা ও প্রেরণা জাগ্রত করা যাতে ব্যক্তি, সমাজ ও জাতি, ভালোমন্দ, ন্যায়-অন্যায়, কপটতা ও আন্তরিকতা, সংশোধন ও বিনাশ এবং হকের দাওয়াত ও বাতিলের শোরগোলের মধ্যে সহজেই পার্থক্য করতে পারে এবং গ্রহণ-বর্জনের সঠিক ও নির্দ্বিধ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে পারে। বন্ধু যেন অবহেলিত না হয়, শত্রু যেন সমাদৃত না হয়; অপরাধী যেন নিস্তার না পায়; সৎ ও নিষ্ঠাবান যেন উপেক্ষিত না হয়। নাগরিক, সামাজিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও ধর্মীয় জটিল থেকে জটিল বিষয়ে মানুষ যেন পূর্ণ প্রজ্ঞার সঙ্গে চিন্তা করার ও সিদ্ধান্ত গ্রহণ করার পরিপূর্ণ যোগ্যতার অধিকারী হয়। এমন জাতি ও জনগোষ্ঠী যতক্ষণ আমরা না পাবো

ততক্ষণ কোন কর্মোদ্দীপনা ও কর্মযোগ্যতা এবং জাগতিক ও ধর্মীয় জীবনের জৌলুসপূর্ণ যাবতীয় প্রকাশ ও অভিপ্রকাশ জাতির ভাগ্য ও সময়ের গতিধারা পরিবর্তনের ক্ষেত্রে বিশেষ কোন ভূমিকাই রাখতে পারে না।

আত্মস্বার্থ ও আত্মপূজার অবকাশ নেই

আলফে লায়লা নামের আরব্য উপন্যাস হচ্ছে মুসলিম বিশ্বের ঐ যুগ ও সমাজের প্রতিনিধি যেখানে জীবন শুধু এক ব্যক্তিকে কেন্দ্র করে আবর্তিত হয়, যার পরিচয়, 'মহামান্য বাদশাহ বা খলীফা হযরত'। যেখানে যাবতীয় আরাম-আয়েশ ও ভোগবিলাস ছিলো অভিজাত শ্রেণীর অল্পকিছু মানুষের নাগালে, যাদের পরিচয় আমীর ওমারা ও শাহজাদা। পুরো সালতানাত যেন ছিলো ঐ সৌভাগ্যবান ব্যক্তি ও তার অনুগতদের মালিকানাধীন, আর কাউমের সমস্ত নর-নারী যেন তাদের দাসদাসী। বাদশাহ সালামত ছিলেন প্রজাবর্গের ধনসম্পদ, জানমাল ও ইজ্জত আবরুর মালিক মুখতার। পুরো জাতি যেন ঐ একজন মাত্র ব্যক্তির ছায়া। তিনি আছেন তো ছায়া আছে। তিনি নেই তো কিছুই নেই। তাই জীবনের সবকিছু, শিল্প, সাহিত্য, সংস্কৃতি, কবি ও কবিতা এবং গানবাজনা, নুপুর-ঝঙ্কার, আনন্দ-বিনোদন সবকিছু তাকে কেন্দ্র করেই আবর্তিত হতো। আজ যখন আমরা সে যুগের জীবনযাত্রা ও সাহিত্যসম্ভার পর্যালোচনা করি, পরিষ্কার দেখতে পাই, তখনকার জীবন, সমাজ ও নগর-সভ্যতার উপর একটি মাত্র ব্যক্তিরই অপ্রতিহত প্রভাব ও একক আধিপত্য। যেন দৈত্যাকৃতির এক বিশাল বৃক্ষ, চারপাশের সমস্ত লতাগুল্ম ও উদ্ভিদের উপর ছায়া বিস্তার করে আছে এবং জীবনধারণের রোদ-বাতাস সব সে একাই শুষে নিচ্ছে। ঠিক এভাবেই পুরো জাতি যেন ঐ একজনের ব্যক্তিসত্তায় বিলীন হয়ে যেতো। তারপর না কারো আলাদা কোন ব্যক্তিত্ব ও স্বকীয়তা থাকতো, না আত্মসম্মানবোধ। এক কথায় তিনি ছিলেন 'জাহাঁপনা', আর পুরো কাউম ছিলো 'জ্বি, জাহাঁপনা'!

ইনি সেই 'মহান' ব্যক্তি যার সেবায় ধন্য হওয়ার জন্য জীবনের চাকা ঘূর্ণন করে। কৃষক হাল চালায়, তার তুষ্টি সাধনের জন্য। সওদাগর বাণিজ্য করে, কারিগর কিছু তৈরী করে তার সন্তুষ্টি বিধানের জন্য। লেখক গদ্য লেখেন, কবি ছন্দ নির্মাণ করেন তাঁর আশীর্বাদ লাভের জন্য। গায়ক সুরের জাল বিস্তার করে, নর্তকী-নুপুরের ঝঙ্কার তোলে তার মনোরঞ্জনের জন্য। সিপাহী তীর-তলোয়ারের আঘাতে জান দেয় রাজমুকুট রক্ষা করার জন্য। তিনি দৃষ্টি দান করেন, প্রজারা ধন্য হয়। তিনি কৃপা করেন, প্রজারা কৃতার্থ হয়। তিনি রুষ্ট হন, 'অপরাধী' তার পদতলে লুটিয়ে পড়ে, তারপর তিনি হয় প্রাণ হরণ করেন, নয় প্রাণ ভিক্ষা দেন। তিনিই যেন জীবন-মৃত্যুর ভাগ্যবিধাতা। বাদশাহ ও তার লোকলস্কর ভুরিভোজন করে ঢেকুর তোলেন, ওদিকে মানুষ থাকে অনাহারে, অর্ধাহারে; তবু রাজার বিরুদ্ধে কারো কোন যোগ-অভিযোগ নেই। মানুষের মনুষ্যত্বের অপমান হয়, মানবসত্তার অপমৃত্যু ঘটে, তবু তাদের কোন চিত্তবিকার ঘটে না। নিয়তি বলে অম্লান বদনে সবকিছু তারা 'বরণ' করে নেয়।

এ ছিলো মানবতার জন্য লজ্জাজনক এমন এক যুগ যা প্রাচ্যের ভূমিতে বেশ শিকড় গেড়ে বসেছিলো এবং বিপুল শাখাবিস্তার করেছিলো। জীবন, সমাজ, নগর, সভ্যতা, সংস্কৃতি, কবিতা ও সাহিত্য সর্বত্র এর গভীর প্রভাব পড়েছিলো। আরবী সাহিত্যের গ্রন্থাগারও তা থেকে মুক্ত ছিলো না। বস্তুত জীবনের উপর সেই রাজপ্রভাবেরই জীবন্ত ছবি হলো আলফে লায়লা নামের আরব্য উপন্যাস। (যদিও তা কল্পনা ও বাস্তবের মিশ্রতুলিতে আঁকা, অনুবাদক)

এই যে যুগ, যার চিত্র আঁকা হয়েছে আলফে লায়লার কাহিনী ও রূপকথায় এবং 'আগানী'র ইতিহাস ও সাহিত্যে এটা না ছিলো ইসলামী যুগ, না ছিলো যুক্তি ও বুদ্ধির বিচারে উত্তীর্ণ যুগ। ইসলাম যেমন তা অস্বীকার করে, তেমনি আকল-বুদ্ধিও তা প্রত্যাখ্যান করে। ইসলাম তো বরং স্বভাব ও ফিতরতবিরোধী এরূপ জঘন্য যুগের বিলুপ্তির বার্তা নিয়ে এসেছে, কোরআন ও সুন্নাহ যার নাম দিয়েছে 'জাহেলিয়াত'। ইসলাম তো এই জাহেলিয়াতের উপর অভিশাপ বর্ষণ করেছে এবং সমকালীন জাহেলিয়াতের দুই প্রতিভূ কায়ছার ও কিসরার পতনের ঘোষণা দিয়েছে।

এমন অভিশপ্ত যুগ কোন কালে কোন দেশে জীবনের যোগ্যতা এবং বেঁচে থাকার অধিকার রাখে না। তারপরো বেঁচে থাকে, যখন মানুষ অবস্থা ও পরিস্থিতির কাছে অসহায় আত্মসমর্পণ করে এবং চেতনা ও সচেতনতার সম্পদ থেকে বঞ্চিত হয়ে পড়ে; বেঁচে থাকার মধ্যেও মানুষ যখন 'মুরদা' হয়ে যায়।

আকল, বুদ্ধি ও বিবেকও এ অবস্থা বরদাশত করতে পারে না। এটা কীভাবে মেনে নেয়া যায় যে, কিছু মানুষ খাদ্য ও সম্পদপ্রাচুর্যে ডুবে থাকবে, অন্যদিকে লাখে লাখে বনী আদম ক্ষুধায় অনাহারে মারা যাবে। একদিকে বাদশাহি মহলে এবং আমীর-ওমারাদের বালাখানায় রেশমি বস্ত্রের পর্দা ঝুলবে, অন্যদিকে

সাধারণ মানুষ লজ্জা ঢাকার জন্য এক টুকরো কাপড়ও পাবে না!

এটা কীভাবে সহ্য করা যায় যে, সংখ্যায় গরিষ্ঠ শ্রেণীটির কাজ হবে উদয়াস্ত পরিশ্রম করা, ফসল ফলানো এবং উৎপাদন বৃদ্ধি করা, আর হাতের আঙুলে গোনা যায়, শ্রেণীটির কাজ হবে শুধু ভোগ করা, তাও অনুভব অনুভূতিহীন অবস্থায় এবং কৃতজ্ঞতার একটি শব্দও উচ্চারণ না করে?!

এটা সম্পূর্ণ অস্বাভাবিক ও অপ্রাকৃতিক অবস্থা যা বছরের পর বছর এবং যুগের পর যুগ তো দূরের কথা, একদিনের জন্যও টিকে থাকতে পারে না; টিকে থাকার অধিকার রাখে না। ইতিহাসের কোন সময়পর্বে যদি এরূপ কালো যুগ এসে থাকে এবং দীর্ঘকাল টিকে থাকে তাহলে তা জাতির গাফলত ও উদাসীনতা এবং সচেতনতার অভাবে এবং ঈমান ও বিশ্বাসের দুর্বলতা এবং জাহেলিয়াতের শক্তির কারণেই হতে পারে। কিন্তু যখন ইসলাম পূর্ণ শক্তিতে ফিরে এসেছে, জাতির মধ্যে পূর্ণ বোধ ও চেতনা সৃষ্টি হয়েছে, হিসাব ও কৈফিয়ত নেয়ার এবং পাকড়াও করার যোগ্যতা সৃষ্টি হয়েছে, তখন কিন্তু জাহেলিয়াতের সব তেলেসমাতি মুহূর্তের মধ্যে তাসের ঘরের মত ভেঙ্গে পড়েছে।

গাফলতের ঘোরে বেহুশ মানুষ এখনো আলফে লায়লার দুনিয়ায় বাস করছে এবং রঙ্গিন স্বপ্নের জগতে বিচরণ করছে। এমন ঘরে তারা আস্তানা তৈরী করেছে যা মাকড়সার জালের চেয়েও দুর্বল; প্রতিমুহূর্তে যেখানে বিপদ-দুর্যোগের আশঙ্কা। কেউ জানে না কখন মাথার উপর ছাদ ধ্বসে পড়বে। উদ্বুদ্ধ করার জন্য আমার বলা উচিত, 'এখনো সময় আছে গাফলত ছেড়ে স্বপ্নের ঘোর থেকে জেগে ওঠার', কিন্তু বাস্তবতা এই যে, সময় অনেক আগেই পার হয়ে গেছে। জাহেলিয়াত এখন এতই মোটাতাজা ও দৈত্যাকার ধারণ করেছে এবং আমাদের দুর্বলতা ও কমজোরি এতই বেড়ে গিয়েছে যে, এখন আর মোকাবেলায় টিকে থাকা সম্ভব নয়। তবে আল্লাহর কুদরতের কাছে অসম্ভব বলে কিছু নেই। আর আল্লাহ কঠোরভাবে নিষেধ করেছেন (অপরাধী, কিন্তু অনুতপ্ত) মুমিনকে তাঁর রহমত থেকে নিরাশ হতে। সুতরাং আল্লাহর অসীম কুদরত ও সীমাহীন রহমতের উপর ভরসা করে বলছি– এখনো সময় আছে, গাফলত থেকে জেগে ওঠার, নতুন বোধ, উপলব্ধি ও চেতনায় উজ্জীবিত হওয়ার এবং দ্বীন ও শরীয়াতকে পরিপূর্ণভাবে এবং প্রবলভাবে আঁকড়ে ধরার।

আলফে লায়লার সময় এখন শেষ। তার পাশা এখন উলটে গেছে। মুসলিম বিশ্বের এখন উচিত নয় নিজেকে ধোকা দেয়া এবং আত্মপ্রতারণায় ডুবে থাকা।

অন্ধ সাজলেই প্রলয় বন্ধ হবে না। এই গাড়ীর চাকা ভেঙ্গে গেছে। যে কোন মুহূর্তে বিপর্যয়-দুর্ঘটনা ঘটবে। লাফিয়ে লাফিয়ে এখনই গাড়ি থেকে নেমে পড়া উচিত। আত্মপূজা ও আত্মস্বার্থ-চিন্তা এখন শেষ রাতের টিমটিমে বাতি, যার তেল শেষ হয়ে গেছে; সলতে পুড়ে গেছে। এ বাতি যখন তখন নিভে যাবে। বাতাসের ঝাপটা আসুক বা না আসুক।

ইসলামে এ রকম 'আনানিয়াত' ও আত্মম্ভরিতা এবং আত্মচিন্তা ও 'খোদগরযি'র কোন সুযোগ নেই। ব্যক্তিগরিমা বা পারিবারিক অহমিকা প্রতিষ্ঠারও কোন অবকাশ নেই, যা আজ প্রাচ্যের বিভিন্ন জাতি এবং বহু মুসলিম দেশে দেখা যায়। ইসলামে ঐ রূপ সম্প্রসারিত ও সুসংগঠিত 'আত্মগরিমা' প্রতিষ্ঠারও কোন বৈধতা নেই যা আজ ইউরোপ, আমেরিকা ও রাশিয়ায় দেখা যায়। ইউরোপে তা দলীয় শাসন ও ক্ষমতার রূপ ধারণ করেছে। আমেরিকায় পুঁজিবাদীদের সঙ্ঘবদ্ধতার আকারে জেঁকে বসেছে, আর রাশিয়ায় ঐ ক্ষুদ্র দলটির ঘাড়ে সাওয়ার হয়ে আছে, যারা কমিউনিজমের প্রচারণায় মাতোয়ারা, যারা দেশের আমজনতার উপর সিন্দাবাদের দৈত্যের মত চেপে বসেছে; মজদুর ও শ্রমিকদের রাজ কায়েমের নাম করে যারা তাদেরই রক্ত শোষণ করে চলেছে। সেখানে শ্রমিকদের প্রতি শ্রমিকদরদীদের আচরণ এমনই অমানবিক, নিষ্ঠুর ও পাশবিক যার নমুনা ইতিহাসে খুঁজে পাওয়া মুশকিল। এই আনানিয়াত, আত্মম্ভরিতা, আত্মস্বার্থচিন্তা ও খোদগরযি তার সকল আকৃতি ও প্রকৃতিসহ অবশ্যই খতম হবে। আহত মানবতা ও যখমখাওয়া ইনসানিয়াত খুব দ্রুত নির্মমভাবে প্রতিশোধ গ্রহণ করবে। পৃথিবীর ভবিষ্যত এখন শুধু এবং শুধু ইসলামের সঙ্গে সম্পৃক্ত। এই আনানিয়াত ও আত্মম্ভরিতা আরো কিছুটা মুহলত ও অবকাশ যদিও বা পায়, লাগাম যদিও বা আরো কিছুটা ঢিল দেয়া হয়, তার দম্ভ, দুর্বিনয়, ভ্রষ্টাচার, নৈরাজ্য যদিও বা আরো কিছু দিন চলে, কিন্তু সময় তার শেষ হয়ে এসেছে। পৃথিবী এখন ইসলামের জন্য, যার সমগ্র জীবনব্যবস্থা ইনছাফপূর্ণ, দয়াপূর্ণ, ভারসাম্যপূর্ণ এবং সর্বকালের সর্বদেশের উপযোগী।

আনানিয়াত ও আত্মম্ভরিতা ব্যক্তিক হোক কিংবা পারিবারিক, গোত্রীয় ও বংশীয়, দলীয় ও শ্রেণীগত; রূপ-প্রকৃতি তার যাই হোক জাতীয় জীবনে তা অস্বাভাবিক ও অপ্রাকৃতিক, যার নাগপাশ প্রথম সুযোগেই ছিন্ন করা উচিত। না ইসলামে এর অবকাশ আছে, না এই জাগ্রত সচেতন সমাজে, যা অনেক আগেই পরিপক্বতা ও প্রাপ্তবয়স্কতার স্তরে উপনীত হয়েছে। সুতরাং মুসলিম ও আরব-বিশ্বের জন্য এবং

মুসলিম ও আরব শাসকবর্গের জন্য ভালো এটাই যে, এই আত্মম্ভরি চিন্তা ও খোদগরয ব্যবস্থার সঙ্গে সম্পর্কচ্ছেদ করা এবং যথাসম্ভব দ্রুত তা থেকে বের হয়ে যাওয়া। সাবধান, এ কিশতি যখন ডোববে যাত্রীদের নিয়েই ডোববে।

প্রাচ্যেও এখন এর শেষ সময় চলছে। এর উত্থান-তারকা অস্ত যেতে শুরু করেছে। এটা যায়দ, আমর, বকরের বিষয় নয়; এটা একটা যুগের বিষয়, একটা সমাজব্যবস্থা এবং একটা চিন্তাশিবিরের বিষয়, যার জাঁকান্দানি ও মৃত্যুলক্ষণ শুরু হয়ে গেছে। এর মৃত্যু এখন শুধু সময়ের ব্যাপার। এখনো যারা এই নষ্টাচার ও ভ্রষ্টাচারের ছত্রচ্ছায়ায় নিজেকে নিরাপদ ভাবছে তারা সাবধান! ঝড় উঠছে!! নৌকা দুলছে!! নৌকা ডুবছে!!

শিল্প, প্রযুক্তি ও সমরযোগ্যতা

তবে আলমে ইসলামীর দায়িত্ব কর্তব্য এখানে এসেই শেষ হয়ে যায় না। যদি সে ইসলামের দাওয়াত ও পায়গাম প্রচার করতে চায় এবং বিশ্বের নেতৃত্বভার গ্রহণ করতে চায় তাহলে যে কোন উপায়ে এবং যে কোন মূল্যে তাকে বৈশিষ্ট্য-পূর্ণ শক্তি ও সক্ষমতা অর্জন করতে হবে। জ্ঞান, বিজ্ঞান, শিল্প, প্রযুক্তি, অস্ত্রশস্ত্র ও সমরবিদ্যায় তাকে পূর্ণ যোগ্যতা অর্জন করতে হবে। জীবন ও প্রয়োজনের প্রতিটি ক্ষেত্রে পাশ্চাত্যের উপর নির্ভরতা থেকে সরে আসতে হবে এবং স্বনির্ভরতা অর্জন করতে হবে। মুসলিম বিশ্বকে অতি অবশ্যই এমন একটি স্তরে পৌঁছতে হবে যেখানে নিজেই সে নিজের খাদ্যবস্ত্র ও চিকিৎসার ব্যবস্থা করতে পারে। হাঁ, চিকিৎসা-ব্যবস্থার কথাও বলতে হচ্ছে। এটা কত বড় লজ্জার বিষয় যে, মুসলিম বিশ্বের রাজা-বাদশা ও সাধারণ মানুষ সবাইকে চিকিৎসার ক্ষেত্রেও ইউরোপ-আমেরিকার শরণাপন্ন হতে হয়! এমন কি মুসলিমবিশ্বের 'ভাগ্য-ভবিষ্যত' যার হাতে এমন 'মহামানব'কেও অমুসলিম অস্ত্র-চিকিৎসকের 'ছুরির নীচে' যেতে হয়!

আমাদের কারখানার যন্ত্রপাতি, অস্ত্রশস্ত্র ও যুদ্ধসরঞ্জাম আমাদেরই তৈয়ার করতে হবে। আমাদের সম্পদ আমরাই যেন আহরণ, সংরক্ষণ ও ব্যবহার করতে পারি। অর্থব্যবস্থা, যোগাযোগব্যবস্থা ও তথ্যব্যবস্থা থেকে শুরু করে জীবনের সর্বব্যবস্থার নিয়ন্ত্রণ যেন নিজেদের হাতে নিতে পারি। সমুদ্রের বিস্তীর্ণ জলভাগে আমাদের নৌবহর, জাহায ও ডুবোজাহায যেন প্রাধান্য অর্জন করে। নিজেদের সীমান্ত ও জলসীমা নিজেরাই যেন পাহারা দিতে পারি। আমাদের 'আকাশঈগল' যেন আকাশের সীমানায় ডানা ঝাপটাতে পারে। আমাদের রাডার যন্ত্রের চোখ যেন শত্রুবিমান ফাঁকি দিতে না পারে। আমাদের অর্থনীতি যেন নিজের পায়ে দাঁড়াতে পারে। আমাদের রপ্তানী যেন আমদানির উপরে থাকে। পশ্চিমের সুদী ঋণের বেড়াজাল থেকে পুরো মুসলিম বিশ্ব যেন বেরিয়ে আসতে পারে। মুসলিম বিশ্বকে আর কখনো যেন কোন শিবিরের লেজুড়বৃত্তির কলঙ্ক বহন করতে না হয়।

মুসলিমবিশ্ব যতদিন জ্ঞান-প্রযুক্তি, শিল্প-বাণিজ্য ও রাজনৈতিক ব্যবস্থার ক্ষেত্রে পাশ্চাত্যের মুখাপেক্ষী থাকবে, পাশ্চাত্য তার 'অর্থ ও রক্ত' শোষণ করতেই থাকবে। আমাদের সরকারগুলো যতদিন গুরুত্বপূর্ণ ও স্পর্শকাতর পদে এবং বিভিন্ন নিয়ন্ত্রণকেন্দ্রে পশ্চিমা বিশেষজ্ঞদের বসাতে থাকবে, সামরিক প্রশিক্ষণ গ্রহণের জন্য আমাদের সেনা ও সেনাপতিরা যতদিন ইউরোপ-আমেরিকার সমর বিশেষজ্ঞদের হাতে 'মগজধোলাই' গ্রহণ করতে থাকবে ততদিন পাশ্চাত্যের মোকাবেলা করা তো দূরের কথা, তার চোখে চোখ রেখে কথা বলাও সম্ভব হবে না।

জ্ঞান, শিল্প ও প্রযুক্তি হচ্ছে জীবনের এমন গুরুত্বপূর্ণ ও স্পর্শকাতর ক্ষেত্র যেখানে একসময় মুসলিম উম্মাহর ছিলো একচ্ছত্র অধিকার। পক্ষান্তরে ইউরোপ ছিলো অন্ধকারে। তারপর অবহেলায় অলসতায় তারা পিছিয়ে যায়, আর তাদেরই দেখানো পথ ধরে পাশ্চাত্য যায় এগিয়ে। এটা ছিলো এমনই এক অমার্জনীয় অপরাধ যার শাস্তি মুসলিমবিশ্বের স্বাধীন, অর্ধস্বাধীন ও পরাধীন দেশগুলো এখনো ভোগ করছে এবং যিল্লতি ও লাঞ্ছনার আবর্তে ঘোরপাক খাচ্ছে। এদিকে শক্তি ও ক্ষমতার ভরকেন্দ্র চলে গেছে ইউরোপে। প্রকৃতিতে শূন্যতার সুযোগ নেই। তাই বিশ্বনেতৃত্বের শূন্য আসনে পশ্চিমা জাতিবর্গ বেশ মজবুতভাবেই শিকড় গেড়ে বসেছে, আর সারা পৃথিবীতে এমন ধ্বংস ও বরবাদি, এমন রক্তপাত ও লুটতরাজ এবং পাশবিকতা ও বর্বরতা ঘটে চলেছে যা এর আগে হয়ত মানুষের কল্পনায়ও ছিলো না।

মুসলিমবিশ্বের সামনে আবার সুযোগ এসেছে নিজেদের মেধা ও প্রতিভা (অন্যের সেবায় ব্যবহার না করে) এবং আল্লাহর দেওয়া বিপুল সম্পদ (অন্যের হাতে তুলে না দিয়ে) নিজেদের কল্যাণে নিযুক্ত করার এবং জ্ঞান, শিল্প ও প্রযুক্তির ক্ষেত্রে দ্রুত এগিয়ে যাওয়ার। কিন্তু এবারও যদি একই ভুল করা হয়, এখনো যদি

আমাদের গাফলতের ঘোর না কাটে তাহলে বলতেই হবে, মানবজাতির ভাগ্যে আরো গর্দিশ, আরো দুর্যোগ লেখা আছে। মানবতার বিপর্যয় তাহলে হবে আরো দীর্ঘ, আরো ভয়ঙ্কর।

এটা ঠিক যে, এ বিশাল কর্মযজ্ঞ শুরু করা এবং এগিয়ে যাওয়া এখন আর অত সহজ নেই। যারা এগিয়ে গেছে, পিছিয়ে পড়াদের তারা পিছনেই ফেলে রাখতে চাইবে। কিছুতেই অগ্রসর হতে দেবে না। পথে পথে পদে পদে বাধা দেবে, প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করবে। প্রয়োজনে চুরি ও লুকোচুরির আশ্রয় নেবে, ছলে বলে কৌশলে আমাদের মেধা পাচার করে নিয়ে যাবে। অনেক কিছুই করবে, তবে যদি আল্লাহর উপর পূর্ণ ভরসা থাকে এবং আল্লাহর গায়বি মদদ সঙ্গে থাকে তাহলে সফলতা অনিবার্য। যারা সাহসী পুরুষ ও 'মরদানে ময়দান', পথের দুর্গমতায় হিম্মতহারা হয়ে তারা তো পিছিয়ে আসে না। বাধা-বিপদ যত প্রবল হয় তাদের পৌরুষ তত জাগ্রত হয়; তাদের 'মরদাঙ্গী' তত তেজিয়ান হয়।

ঝড়-তুফানে ভয় পেয়ো না হে মাঝি সিন্দাবাদ,
আসমানের বিজলী তোমায় দেখাবে পথের ইশারা।

জ্ঞান ও গবেষণায় নেতৃত্ব পুনরুদ্ধার

আরববিশ্ব ও পুরো ইসলামী বিশ্ব বহু যুগ ধরে একাডেমিক ও বুদ্ধিবৃত্তিক নেতৃত্ব এবং দিকনির্দেশনা দানের অবস্থান থেকে পিছিয়ে পড়েছে। এখন তার চিন্তানৈতিক স্বাধীনতা ও স্বকীয়তা বলতে কিছু নেই। জ্ঞানের সকল শাখায় মুসলিমবিশ্ব এখন পাশ্চাত্যের 'সুবোধ' ছাত্র এবং পশ্চিমের দস্তরখানে উচ্ছিষ্ট-ভোজী। একটু ছাড় দিয়ে বলা যায়, 'অনাহূত ও অনাদৃত মেহমান'। এমনকি আরবী ভাষা ও সাহিত্য, আরবীয় শাস্ত্রপুঞ্জ, মুসলিম সভ্যতা ও তার ইতিহাস; এমনকি হাদীছ, তাফসীর ও ফিকহের মত নির্ভেজাল দ্বীনী ইলম ও ধর্মীয় শাস্ত্রের ক্ষেত্রেও উচ্চতর শিক্ষা ও সনদের জন্য মুসলিম শিক্ষার্থীরা ইউরোপ আমেরিকার মুখাপেক্ষী। 'ওরিয়েন্টালিস্ট'গণই হচ্ছে অধ্যয়ন, গবেষণা, গ্রন্থ ও অভিসন্দর্ভ (থিসিস) রচনার ক্ষেত্রে অভিভাবক ও তত্ত্বাবধায়ক। ইসলামী জ্ঞান ও ইতিহাস-বিষয়ে এবং বিভিন্ন দর্শন ও চিন্তাধারা এবং দ্বীনী আহকাম ও বিধানের ক্ষেত্রেও তারাই হচ্ছে প্রামাণ্যতা ও অথরেটির মর্যাদার অধিকারী; তাদের মত ও সিদ্ধান্তই হচ্ছে চূড়ান্ত; তারাই হচ্ছে একমাত্র অনুসরণীয় আদর্শ। অথচ ছদ্মবেশী এই 'জ্ঞানপুরুষ'দের অনেকেই হচ্ছেন পাদ্রী, মিশনারী এবং চরম সাম্প্রদায়িক ইহুদী,

খৃস্টান। ইসলাম ও তার নবীর প্রতি জাতবিদ্বেষী, যাদের প্রধান লক্ষ্যই হলো ইসলামের ইতিহাস ও সভ্যতার প্রতি চাতুর্যপূর্ণ ভাষায় উপহাস-বিদ্রূপ করা এবং সুকৌশলে ভুল ব্যাখ্যা প্রদান ও বিকৃতভাবে উপস্থাপন করা; এমনকি অনেক সময় উদ্ধৃতির ক্ষেত্রেও এরা আশ্চর্যরকম শঠতার আশ্রয় নিয়ে থাকে। অনেকের আবার আরবী ভাষায় যথার্থ ব্যুৎপত্তিও নেই। ফলে 'নছ' বোঝার বা তরজমা করার ক্ষেত্রে অনিচ্ছায় হলেও গুরুতর ভুল-বিচ্যুতির শিকার হয়, আর তাদের মুসলিম ছাত্ররা সেগুলোকেই পরম সত্য ও অমৃত বিবেচনা করে গ্রহণ করে থাকে।

পাশ্চাত্যের ইসলামবিষয়ক পণ্ডিতদের 'বুদ্ধিবৃত্তিক' প্রচার-প্রচারণা, দর্শন ও চিন্তা -ধারা দ্বারা মুসলিমবিশ্বের 'পাশ্চাত্যগ্রস্ত' বুদ্ধিজীবীমহল মারাত্মকভাবে প্রভাবিত হয়েছে। বিশেষ করে দ্বীন ও শরীয়তের বুনিয়াদি উছূল ও মূলনীতি এবং মৌলিক চিন্তাদর্শনের বেশ কিছু ক্ষেত্রে এই পাশ্চাত্যপ্রভাব অতি প্রকটভাবে ধরা পড়েছে। মূলত: ইউরোপের বস্তুবাদী সভ্যতা-সংস্কৃতি ও ভোগবাদী জীবনদর্শন থেকে তাদের মাধ্যমে মুসলিমবিশ্বের বুদ্ধিজীবীমহলে এই ভ্রান্ত চিন্তা অনুপ্রবেশ করেছে যে, ধর্ম রাজনীতি থেকে আলাদা সম্পূর্ণ ব্যক্তিগত বিষয়; সমাজ ও রাষ্ট্রের সঙ্গে এর কোন সম্পর্ক নেই। ব্যক্তিজীবনে পোষিত কিছু বিশ্বাস, পালিত কিছু আচরণ এবং অনুসৃত কিছু নীতি ও চরিত্র, এ-ই হচ্ছে ধর্মের 'সম্পদসমগ্র'। রাজনীতি, অর্থনীতি, সমাজনীতি ও শাসননীতি, এসব বিষয়ে সিদ্ধান্ত দেয়ার মত কিছু ধর্মের কাছে নেই। বড়জোর ধর্মের কতিপয় উপদেশ শোনা যেতে পারে। পাশ্চাত্যের পণ্ডিতসমাজের কল্যাণেই আমাদের আধুনিক বুদ্ধিজীবীমহলে ইসলামী শরীয়ত ও বিধান সম্পর্কে খণ্ডিত, পরিবর্তিত ও বিকৃত নানা ব্যাখ্যা ও ধারণার অনুপ্রবেশ ঘটেছে। এছাড়াও বিভিন্ন ভ্রান্ত চিন্তাধারা ও মতবাদ তদের অনুগত ছাত্রদের মাধ্যমেই প্রচার লাভ করেছে।

আফসোসের বিষয়, প্রাচ্যের মুসলিম লেখক, গবেষক ও চিন্তাবিদগণ পাশ্চাত্য সভ্যতার সরাসরি মোকাবেলা করতে এবং এর বুনিয়াদ, দর্শন ও মূল্যবোধের স্বাধীন ও সাহসী সমালোচনা করতে চরমভাবে ব্যর্থ হয়েছেন। তাদের সব স্বকীয়তা ও সৃজনশীলতা এখানে এসে একেবারেই হারিয়ে যায়। কিছু বলতে যেন মুখে বাধে; কিছু লিখতে যেন হাত কাঁপে; এমনকি কিছু ভাবতেও যেন চিন্তা গুলিয়ে যায়। কারো কারো চিন্তার দৈন্য এবং অন্ধ আনুগত্যের নগ্ন প্রকাশ তো এতদূর যে, তারা ভাবে এবং ভাবতে ভালোবাসে, পাশ্চাত্যসভ্যতা ও জীবন-

দর্শনই মানবচিন্তার সর্বোচ্চ অবদান। এরপর চিন্তা করার আর কোন স্তর নেই। কারো কারো মতে তো দোষ-দুর্বলতা ও সীমাবদ্ধতা যাই থাক, প্রাচ্যের জীবনে পাশ্চাত্যসভ্যতার সামগ্রিক বাস্তবায়নই আমাদের সর্বরোগের একমাত্র চিকিৎসা। কোন কোন আরব ইসলামী দেশ তো এমনকি নিজেকে ইউরোপীয় মহাদেশের অবিচ্ছেদ্য অংশ বলেও দাবী করছে। সেখানকার কোন কোন বুদ্ধিজীবী মুসলিম সমাজকে ইউরোপের জীবনধারায় আত্মলীন হওয়ার এবং ইউরোপীয় সংস্কৃতি-সমূহের সূতিকাগার গ্রীক সংস্কৃতি গ্রহণ করার রীতিমত আন্দোলন শুরু করেছেন।
(ডঃ তোয়াহা হোসায়নের مستقبل الثقافة في مصر দ্রঃ)

মুসলিমবিশ্বের বুদ্ধিজীবীসমাজে সাহসী ব্যক্তিত্ব ও বড় প্রতিভার খুবই অভাব যিনি পাশ্চাত্যসভ্যতা, তার জীবনদর্শন ও মূল্যবোধ সম্পর্কে ব্যতিক্রমী ও প্রথাবিরোধী কিছু চিন্তা করবেন এবং যেসব ভিত্তিমূলের উপর পাশ্চাত্যসভ্যতা দাঁড়িয়ে আছে, পূর্ণ আস্থা, প্রজ্ঞা ও জ্ঞান-প্রত্যয়ের সঙ্গে তার সমালোচনা-পর্যালোচনা করবেন। (সম্মানজনক কিছু ব্যতিক্রমকে অবশ্য আমরা শ্রদ্ধার সঙ্গে স্বীকার করি।)

মুসলিমবিশ্ব যদি সত্যি সত্যি আজ নিজের পায়ে দাঁড়াতে চায় এবং নিজের বুদ্ধিতে চিন্তা করতে চায় তাহলে এই বুদ্ধিবৃত্তিক আত্মসমর্পণ ও চিন্তা-দাসত্ব থেকে তাকে অবশ্যই বের হয়ে আসতে হবে। আমাদের আজ এমন বিশাল ব্যক্তিত্বের আলিম, চিন্তাবিদ ও লেখক-গবেষকের প্রয়োজন যারা আত্মরক্ষার অবস্থান থেকে নয়, আক্রমণের অবস্থান থেকে পাশ্চাত্যসভ্যতার সমালোচনা ও 'ময়নাতদন্ত' সম্পন্ন করতে পারবেন। ইসলামী জ্ঞান ও শাস্ত্রের সকল শাখায় বিস্তৃত ও গভীর অধ্যয়নের মাধ্যমে তারা এমন বৈদগ্ধ্য ও 'সাগরতা' অর্জন করবেন যাতে ইউরোপ-আমেরিকার ইসলামবিষয়ক পণ্ডিতদের 'প্রয়োজনীয় জ্ঞান' দান করতে পারেন এবং তাদের ভুলবিচ্যুতি ও 'জ্ঞানপাপ'গুলো ধরিয়ে দিতে পারেন, যাতে তাদের 'বুদ্ধিবৃত্তিক জাদুময়তা'র জাল ছিন্ন হয়ে যায় এবং গবেষক ও বিদ্যাপিপাসুগণ মুসলিমবিশ্বের আরব-আজমের শিক্ষাকেন্দ্রগুলোর দিকে 'শিক্ষা অভিযাত্রা'য় উদ্বুদ্ধ হয়; এখন যেমন তারা ইউরোপ-আমেরিকার শিক্ষাঙ্গনে উপচেপড়া ভিড় জমায় এবং যেমন একসময় তারা আমাদের আন্দালুসে ভিড় জমাতো। অন্তত ইসলামী সংস্কৃতি, আরবীভাষা ও সাহিত্য এবং ধর্মীয় জ্ঞান ও শাস্ত্রচর্চার কেন্দ্ররূপে ইউরোপীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের মোকাবেলায় ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়গুলো অধিক যোগ্য হবে এটাই তো স্বাভাবিক। এর চেয়ে

দীনতা ও হীনতার বিষয় আর কী হতে পারে যে, মুসলিমবিশ্বের ঐতিহ্যবাহী মহান বিদ্যাপীঠগুলো বুদ্ধিবৃত্তিক নেতৃত্বের আসন থেকে সরে এসে অন্যদের জন্য জায়গা ছেড়ে দেবে!

শিক্ষাব্যবস্থার নতুন বিন্যাস

মুসলিমবিশ্বের জন্য আজ সময়ের অন্যতম প্রয়োজন হলো, শিক্ষাব্যবস্থার এমন নতুন বিন্যাস সম্পন্ন করা যা তার প্রাণ-প্রেরণা এবং দাওয়াত ও পায়গামের সঙ্গে পূর্ণ সঙ্গতিপূর্ণ। ইসলামের ইতিহাস বলে, মুসলিমবিশ্ব দীর্ঘ কয়েক শতাব্দী পর্যন্ত পৃথিবীর উপর প্রাধান্য বজায় রেখেছে এবং মানবজাতির বুদ্ধিবৃত্তি, সংস্কৃতি, দর্শন ও সাহিত্যে গভীর প্রভাব বিস্তার করেছে। সভ্য পৃথিবী তখন আমাদের বুদ্ধি দ্বারা চিন্তা করেছে; আমাদের কলম দ্বারা লিখেছে এবং 'আমাদের ভাষায়' গ্রন্থ রচনা করেছে। ইরান, তুর্কিস্তান, আফগানিস্তান, স্পেন ও হিন্দুস্তানে গুরুত্বপূর্ণ কোন কিতাব আরবী ভাষায়ই লেখা হতো; এমনকি অমুসলিমদের ক্ষেত্রেও এটাই ছিলো বাস্তবতা।

অবশ্য এটা সত্য যে, শিক্ষাব্যবস্থার এই ধারা যা আব্বাসী যুগের সূচনাপূর্বে শুরু হয়েছিলো, গ্রীক ও পারসিক ভাবধারা দ্বারা প্রভাবিত ছিলো; পরিপূর্ণ ইসলামী প্রাণপ্রেরণা ও চিন্তা-চেতনার ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত ছিলো না; বরং জ্ঞানগত ও ধর্মগত দিক থেকে তাতে বিভিন্ন দুর্বলতা ও অসম্পূর্ণতা ছিলো। তারপরো তা নিজস্ব শক্তি ও সজীবতার কারণে সমগ্র পৃথিবীর উপর প্রাধান্য বিস্তার করেছিলো এবং প্রাচীন সকল শিক্ষাব্যবস্থা তার সামনে গুটিয়ে গিয়েছিলো।

এরপর এলো ইউরোপের উত্থানযুগ। তখন তারা বুদ্ধিবৃত্তিক পরীক্ষা-নিরীক্ষা ও গবেষণার মাধ্যমে প্রাচীন ব্যবস্থাকে অকার্যকর প্রমাণ করে দেয় এবং তদস্থলে নতুন এক শিক্ষানীতি ও শিক্ষাব্যবস্থা প্রস্তুত করে যা ছিলো ইউরোপীয় প্রাণ-প্রেরণা ও চিন্তা-চেতনার আদর্শ উদাহরণ। সুতরাং প্রত্যেক শিক্ষার্থী ঐ পরিবেশ থেকে ঐ শিক্ষার প্রাণপ্রেরণায় সুসিক্ত হয়েই বের হতো। ফলে এই শিক্ষাব্যবস্থার সামনে বিশ্বকে নতজানু হতে হলো এবং স্বাভাবিক কারণেই মুসলিমবিশ্বকেও। বস্তুত বহুদিন থেকেই মুসলিমবিশ্ব বুদ্ধিবৃত্তিক অবক্ষয় ও চিন্তার স্থবিরতার শিকার ছিলো এবং হীনমন্যতার কারণে ইউরোপের অন্ধ অনুকরণের মধ্যেই শুধু উন্নতি ও মুক্তি নিহিত বলে ভেবেছে। তাই সমস্ত অসম্পূর্ণতা ও দুর্বলতাসহই এ নতুন

শিক্ষাব্যবস্থা সে গ্রহণ করে নিয়েছে, যা এখনো ইসলামী বিশ্বের সর্বত্র বহাল রয়েছে।

এর স্বাভাবিক ফল এই দাঁড়ালো যে, পরিবেশের প্রতিকূলতার মধ্যেও যুবমানসে তখনো যা কিছু ইসলামী চিন্তা-চেতনা অবশিষ্ট ছিলো, তার মধ্যে এবং আধুনিক মনমানসের মধ্যে, তদ্রূপ ইসলামী নীতিদর্শন ও ইউরোপীয় নীতিদর্শনের মধ্যে এবং বস্তুর মূল্য নিরূপণের আধুনিক ও প্রাচীন মানদণ্ডের মধ্যে দ্বন্দ্ব-সঙ্ঘাত শুরু হলো। দ্বিতীয় ফল এই দাঁড়ালো যে, আধুনিক শিক্ষার 'আলোপ্রাপ্ত'দের অন্তরে সংশয়-সন্দেহ প্রবলভাবে দানা বাঁধলো। ধৈর্য ও সংযমের অত্যন্ত অভাব দেখা দিলো। জীবনের প্রতি মোহ, পরকালের চেয়ে ইহকালকে অগ্রাধিকার প্রদানের মানসিকতা শুরু হয়ে গেলো। এ ধরণের আরো বহু দোষত্রুটি দেখ দিলো যা ছিলো ইউরোপীয় সভ্যতার অনিবার্য ফল।

সুতরাং মুসলিমবিশ্ব যদি নতুন করে জীবন শুরু করতে চায় এবং অন্য জাতির দাসত্বশৃঙ্খল থেকে মুক্ত হতে চায়, সর্বোপরি আবার বিশ্বের নেতৃত্ব ও শাসনকর্তৃত্ব লাভ করতে চায় তাহলে শিক্ষাব্যবস্থার ক্ষেত্রে শুধু স্বকীয়তা ও স্বনির্ভরতাই নয়, বরং তাকে আজ 'শিক্ষা-নেতৃত্ব' অর্জন করতে হবে। অবশ্যই তা খুব সহজ কাজ নয়, বরং এজন্য প্রয়োজন গভীর চিন্তাভাবনা এবং ব্যাপক পরীক্ষা-নিরীক্ষা ও গবেষণা; প্রয়োজন আধুনিক যুগের যাবতীয় জ্ঞান ও শাস্ত্র সম্পর্কে এতটা ব্যাপক জানাশোনা ও গভীর অধ্যয়ন যার মাধ্যমে মত ও সিদ্ধান্ত প্রদানের যোগ্যতা এসে যায়। সেই সঙ্গে ইসলামের মূলপ্রাণ সম্পর্কে পূর্ণ জ্ঞান এবং ইসলামের শিক্ষা, দর্শন ও মূলনীতির প্রতি সুসংহত বিশ্বাস ও প্রত্যয় অর্জন করতে হবে। এ এমনই গুরুভার দায়িত্ব যা কোন ব্যক্তি বা দলের পক্ষে বহন করা প্রায় অসম্ভব। বস্তুত এটা হচ্ছে মুসলিমবিশ্বের সরকার ও নীতিনির্ধারকদের কাজ। তাদেরই আজ এগিয়ে আসতে হবে সুদৃঢ় প্রতিজ্ঞা ও প্রত্যয়ের সঙ্গে। সমস্ত শক্তি ও সম্পদ কাজে লাগিয়ে গড়ে তুলতে হবে পর্যাপ্ত সংখ্যক সুসংগঠিত গবেষণাসংস্থা এবং একত্র করতে হবে প্রত্যেক বিষয়ের বিজ্ঞ, প্রাজ্ঞ, বিশেষজ্ঞ ও নিবেদিতপ্রাণ ব্যক্তিদের। তাঁরা তাঁদের সারা জীবনের জ্ঞান, প্রজ্ঞা, অভিজ্ঞতা ও গবেষণার আলোকে এমন একটি শিক্ষাব্যবস্থা ও নিছাবে তা'লীম তৈরী করবেন যেখানে কোরআন-সুন্নাহর মুহকামাত ও অপরিবর্তনীয় মূল সত্য এবং আধুনিক জ্ঞান-বিজ্ঞানের মধ্যে সুসমন্বয় সাধিত হবে। তাঁরা ইসলামের প্রাণ-প্রেরণার

ভিত্তির উপর আধুনিক জ্ঞান-বিজ্ঞানের পুনর্বিন্যাস সম্পন্ন করবেন, যেখানে নতুন প্রজন্মের জীবন বিনির্মাণের প্রয়োজনীয় সকল উপাদান বিদ্যমান থাকবে, যাতে তারা আপন অস্তিত্ব ও নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে পারে এবং পাশ্চাত্যনির্ভরতা থেকে মুক্ত হয়ে তার বিরুদ্ধে বস্তুগত ও বুদ্ধিগত উভয় যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হতে পারে; যাতে নিজেদের ভূগর্ভস্থ সম্পদ নিজেরাই আহরণ করতে পারে এবং দেশের সমস্ত সম্পদ কাজে লাগাতে পারে। এই যুবশক্তি যেন ইসলামী দেশগুলোর অর্থব্যবস্থাকে ইসলামের নীতি ও শিক্ষার আলোকে সুসংহত রূপে গড়ে তুলতে পারে, যাতে সরকারব্যবস্থা ও অর্থব্যবস্থার ক্ষেত্রে ইউরোপের মোকাবেলায় ইসলামের শ্রেষ্ঠত্ব সুপ্রমাণিত হয়ে যায় এবং ঐ সকল অর্থনৈতিক সমস্যারও সমাধান হয়ে যায় যার সমাধানে ইউরোপ সম্পূর্ণ ব্যর্থ হয়েছে এবং ব্যর্থতা স্বীকার করে নিয়েছে।

মোটকথা, এভাবে আত্মিক প্রস্তুতি, শিল্প-প্রস্তুতি, সামরিক প্রস্তুতি এবং স্বাধীন শিক্ষাব্যবস্থা গ্রহণের মাধ্যমেই কেবল মুসলিমবিশ্বের উত্থান ঘটতে পারে এবং তার উপর অর্পিত দাওয়াত ও পায়গাম সে বিশ্বের দুয়ারে পৌঁছাতে পারে, আর বিশ্বকে বাঁচাতে পারে প্রায় অবধারিত ধ্বংসের হাত থেকে। নেতৃত্ব এবং বিশ্বের জাতিবর্গের নেতৃত্ব হাসিতামাশার বিষয় নয়, এটা খুবই নাযুক, জটিল ও ঝুঁকিপূর্ণ বিষয়। সুতরাং এক্ষেত্রে প্রয়োজন অনবরত ঐকান্তিক প্রচেষ্টা এবং কঠিন সংগ্রাম সাধনা। আরবের কবি অনেক আগেই বলেছেন–

كل امرئ يجري إلى يوم الهياج بما استعدا

যে যেমন প্রস্তুতি নিয়েছে সে তো সেভাবেই যুদ্ধের মাঠে ধাবিত হবে।

আলকোরআনের এ মহান বাণী দ্বারাই আলোচ্য পরিচ্ছেদের বক্তব্যের সমাপ্তি টানা সর্বোত্তম হবে বলে মনে করি–

وَأَن لَّيْسَ لِلْإِنسَٰنِ إِلَّا مَا سَعَىٰ ﴿٣٩﴾ وَأَنَّ سَعْيَهُۥ سَوْفَ يُرَىٰ ﴿٤٠﴾ ثُمَّ يُجْزَىٰهُ ٱلْجَزَآءَ ٱلْأَوْفَىٰ ﴿٤١﴾

আর নয় মানুষের জন্য কোন কিছু, তবে যা সে চেষ্টা করে, আর অচিরেই তার চেষ্টার ফল দেখা যাবে। তারপর তাকে প্রতিদান দেয়া হবে, পূর্ণতম প্রতিদান।

(সূরাতুন-নাজম, ৫৩ :৩৯ -৪০)

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

আরবজাতির নেতৃত্ব

বিশ্বের চোখে আরববিশ্বের গুরুত্ব

বিশ্বের রাজনৈতিক মানচিত্রে আরবভূখণ্ডের গুরুত্ব অপরিসীম। শুরু থেকেই তা ঐসব জাতি ও জনগোষ্ঠীর আবাসস্থল যারা মানবজাতির ইতিহাসে সবচে' গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে। তাছাড়া তার বুকে রয়েছে সম্পদ ও শক্তির সুবিশাল ভাণ্ডার জ্বালানী তেল, লোভাতুর পশ্চিমা বিশ্ব যার নাম দিয়েছে 'তরল স্বর্ণ'। শিল্প ও যুদ্ধকে যদি একটি শরীর কল্পনা করি তাহলে তেল হচ্ছে সেই শরীরের জন্য প্রবহমান রক্ত, (যার জন্য বিভিন্ন নামে পশ্চিমাদের হাতে লাগাতার ঝরছে আরবদের এত রক্ত)। তদুপরি আমাদের আরবভূখণ্ড হচ্ছে ইউরোপ-আমেরিকা ও দূরপ্রাচ্যের মাঝে সংযোগস্থল। সর্বোপরি আরব হচ্ছে ইসলামী বিশ্বের স্পন্দিত হৃদপিণ্ড। ধর্মীয় ও আধ্যাত্মিক কারণে পুরো মুসলিমবিশ্বের অভিমুখ আরবের দিকে। প্রতিটি মুসলিম হৃদয় আরবের প্রতি ভালোবাসা ও বিশ্বস্ততার বন্ধনে আবদ্ধ।

সম্প্রতি বিশ্বরাজনীতির প্রেক্ষাপটে আরবভূখণ্ডের গুরুত্ব আরো বেড়ে যাচ্ছে একারণে যে, আল্লাহ না করুন হয়ত এটাই হবে তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধের ক্ষেত্র। তাই পশ্চিমা সমরবিশেষজ্ঞরা নতুন করে আরববিশ্বের মানচিত্র নিয়ে গবেষণা শুরু করেছেন। সেখানে রয়েছে জ্ঞান, প্রজ্ঞা, মেধা ও প্রতিভা; রয়েছে চিন্তার উপযোগী সক্রিয় বুদ্ধি এবং যুদ্ধের উপযোগী মযবুত শরীর; রয়েছে দক্ষ জনবল ও কর্মীর হাত; রয়েছে বড় বড় বাজার ও বাণিজ্যকেন্দ্র এবং রয়েছে কৃষি-উপযোগী প্রচুর ভূমি।

সেখানে রয়েছে 'সৌভাগ্যের প্রতীক' নীলনদ এবং নীলনদের দেশ মিশর, যা উর্বরতায়, সম্পদে, শস্যপ্রাচুর্যে, সর্বোপরি বুদ্ধিবৃত্তিক অগ্রগতি ও নাগরিক সভ্যতার সমৃদ্ধিতে বৈশিষ্ট্যপূর্ণ মর্যাদার অধিকারী।

আরো রয়েছে সিরিয়া, ফিলিস্তীন ও প্রতিবেশী বিস্তীর্ণ অঞ্চল, যার আবহাওয়া ও জলবায়ু অতি মনোরম ও স্বাস্থ্যপ্রদ। প্রকৃতি সেখানে তার অপার সৌন্দর্য যেন অকৃপণভাবে ঢেলে দিয়েছে। সর্বোপরি এ অঞ্চল আলাদা সামরিক কৌশলগত গুরুত্বেরও অধিকারী।

সেখানে রয়েছে সভ্যতার লালনভূমি ইরাক, দজলা-ফোরাতের সুবাদে আদিকাল থেকেই যাকে বলা হয় দুই নদীর দেশ, بلاد الرافدين যা শৌর্য-সাহস, অদম্য মনোবল ও কষ্টসহিষ্ণুতার কারণে, সেই সঙ্গে বর্তমানে বস্তুসভ্যতার প্রাণ তেল-সম্পদের কারণে প্রসিদ্ধ।

সর্বোপরি আরবভূখণ্ডেই রয়েছে মক্কা, মদীনা, হিজায ও জাযীরাতুল আরব; মুসলিম উম্মাহর আধ্যাত্মিক কেন্দ্র হিসাবে যা অপরিসীম দ্বীনী মর্যাদা ও ধর্মীয় প্রভাব প্রতিপত্তির অধিকারী। সেখানে পবিত্র ভূমিতে প্রতিবছর অনুষ্ঠিত হয় ইসলামের অন্যতম প্রধান ইবাদত হজ্জ। তাতে ঘটে সারা পৃথিবী থেকে আগত লাখ লাখ মানুষের ভাবগম্ভীর আধ্যাত্মিক সমাবেশ, সারা বিশ্বে যার কোন তুলনা নেই। তেল সম্পদের বিপুল মজুদের কথা এখানে না হয় নাই বলা হলো।

এসকল বহুমুখী গুণ, বৈশিষ্ট্য ও গুরুত্বের কারণে বহুকাল ধরে আরববিশ্ব হয়ে আছে পশ্চিমাদের আগ্রহ ও মনোযোগের কেন্দ্রবিন্দু, লোভ-লালসার ক্ষেত্র এবং রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠার দ্বন্দ্বসংঘাতের উত্তপ্ত ভূমি। এর প্রতিক্রিয়ারূপে আরবজাতির মধ্যে যেখানে জেগে ওঠার কথা ছিলো ঈমানি গায়রত ও ইসলামী চেতনার জোয়ার; আফসোস, তার পরিবর্তে আজ সমগ্র আরববিশ্বে জেগে উঠেছে আরবজাতীয়তাবাদ ও স্বদেশপূজার সুতীব্র অনুভূতি ও আন্দোলন।

আল্লাহর রাসূল মুহম্মদ আরবজাতির প্রাণ

কিন্তু একজন মুসলিম আরববিশ্ব ও আরবজাতির প্রতি সেই দৃষ্টিতে তাকায় না যে দৃষ্টিতে তাকায় ইউরোপ, আমেরিকা ও পাশ্চাত্যের জাতিবর্গ। এমনকি আরবের প্রতি কোন জাতীয়তাবাদী আরবের যে দৃষ্টি, একজন মুসলিমের দৃষ্টি তা থেকেও সম্পূর্ণ ভিন্ন। একজন মুসলিমের দৃষ্টিতে আরবের পবিত্র ভূমি হচ্ছে ইসলামের দোলনা ও প্রতিপালনভূমি, ইসলামের নূর-মিনার এবং মানবতার রক্ষাদুর্গ। জাযীরাতুল আরব হচ্ছে বিশ্বনেতৃত্বের কেন্দ্রভূমি। মুসলিম বিশ্বাস করে

মুহম্মদ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামই হচ্ছেন আরবজাতির প্রাণ, অস্তিত্বের ভিত্তি এবং তার গৌরব ও মর্যাদার শিরোনাম। আরববিশ্ব আজ যত সম্পদ, তেলক্ষেত্র, সোনার খনি এবং যত গুণ-বৈশিষ্ট্য ও কল্যাণের অধিকারী, তার সঙ্গে যদি আরো কয়েকগুণ যুক্ত হয়, আর আল্লাহ না করুন সাইয়েদিনা মুহম্মদুর রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সঙ্গে তার পরিচয়সূত্র ছিন্ন হয়ে যায়, তাঁর দ্বীন ও শরীআত, তাঁর শিক্ষা ও আদর্শ থেকে যদি তারা বিচ্যুত হয়ে পড়ে তাহলে আরবজাতি হবে প্রাণহীন এক দেহ এবং মরুভূমির বালুতে আঁকা অস্পষ্ট রেখা। এককথায় বিশ্বের মানব-মঞ্চ থেকে আরবজাতির অস্তিত্ব বিলুপ্ত হতে তখন খুব বেশী সময় লাগবে না।

আল্লাহর নবী এই মুহম্মদে আরাবীই তো তাদের জাতীয় সত্তার অস্তিত্ব দান করেছেন। তাঁর পূর্বে তো এই ভূখণ্ড ছিলো শতখণ্ডে খণ্ডিত অখ্যাত, অজ্ঞাত, উপেক্ষিত ও অবহেলিত দেশ। সেখানে ছিলো পরস্পর দ্বন্দ্ব-বিবাদ; খুনাখুনি ও রক্তপাতে লিপ্ত বিভিন্ন গোত্র-উপগোত্র। মেধা, যোগ্যতা ও প্রতিভা যা কিছু ছিলো, অপচয় হচ্ছিলো, কিংবা অক্ষেত্রে ব্যয় হচ্ছিলো। অজ্ঞতা, মূর্খতা, ভ্রষ্টতা ও গোমরাহির অন্ধকারে সারা দেশ ডুবে ছিলো।

অহমিকা, আত্মম্ভরিতা ও জাত্যাভিমান ছিলো তাদের প্রচণ্ড, কিন্তু রোম ও পারস্যের সঙ্গে পাল্লা দেয়ার কথা স্বপ্নেও তারা ভাবতে পারতো না। এমন কথা কেউ যদি তাদের কানে দিতো তাহলেও কোন অবস্থাতেই তারা তা বিশ্বাস করতে পারতো না। আরববিশ্বের অতি গুরুত্বপূর্ণ অংশ শাম ও সিরিয়া ছিলো রোম সাম্রাজ্যের ‘উপনিবেশ’, যা রাজতন্ত্রের স্বেচ্ছাচারী শাসনের যাঁতাকলে পিষ্ট হচ্ছিলো। ন্যায়, সাম্য, সুবিচার ও স্বাধীনতার কোন অর্থই তাদের জানা ছিলো না।

অন্যদিকে ইরাক ছিলো কায়ানি শাসনের ভোগ-চাহিদা ও লোভলালসার শিকার-ভূমি। বিভিন্ন নামে আরোপিত নিত্যনতুন শুল্ক ও করের বোঝায় তারা ছিলো বিপর্যস্ত। মিশর ছিলো রোমান সাম্রাজ্যের বাহন-উট ও দুধের উটনী। পিঠে চড়তো, দুধ খেতো, কিন্তু পর্যাপ্ত ঘাস দিতো না। তদুপরি ছিলো রাজনৈতিক যুলুম-অবিচার এবং ধর্মীয় নিপীড়ন-নির্যাতন।

ছিন্নভিন্ন, বিপর্যস্ত ও বিভিন্ন নিপীড়ন-নির্যাতনের এই ভূখণ্ডে হঠাৎ ইসলামের সুশীতল বায়ু প্রবাহিত হলো। মুহম্মদুর রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম

দেখতে পেলেন, গোটা আরব বিনাশ ও ধ্বংস এবং হালাকত ও বরবাদির দোরগোড়ায় চলে গিয়েছে। তিনি হাত ধরে সেখান থেকে তাদের উদ্ধার করলেন এবং আল্লাহর ইচ্ছায় তাদের নতুন জীবন দান করলেন। নূর দান করলেন, যার উজ্জ্বলতায় তারা মানবসমাজে স্বচ্ছন্দে বিচরণ করতে পারে। তাদের কিতাব ও হিকমত শিক্ষা দিলেন এবং তাযকিয়া ও আত্মসংশোধনের দীক্ষা দিলেন। এভাবে মুহম্মদি নবুয়তের পর আরবজাতির প্রকৃতি বদলে গেলো। এখন তারা বিশ্বের জন্য ইসলামের সফীর ও প্রতিনিধি এবং শান্তি ও নিরাপত্তার বার্তাবাহী। তাহযীব ও তামাদ্দুন এবং নতুন সভ্যতা ও সংস্কৃতির পতাকাবাহী। সারা বিশ্বের জন্য এখন তারা সাম্য, শান্তি, কল্যাণ ও করুণার অগ্রদূত। এভাবে শাম, ইরাক ও মিশর নতুন পরিচয় লাভ করলো এবং আরবজাতি নতুন জাতীয় সত্তায় আত্মপ্রকাশ করলো।

আল্লাহর রাসূল যদি না হতেন, তাঁর দাওয়াত, রিসালাত ও মিল্লাত যদি না হতো, কোথায় থাকতো আজ শাম, ইরাক ও মিশর? কোথায় থাকতো আজকের এ অনন্য মর্যাদা ও গৌরবের অধিকারী আরব জাহান ও আরবজাতি? কোন কিছুর অস্তিত্বই খুঁজে পাওয়া যেতো না। শুধু তাই নয়, পৃথিবীও কখনো সভ্যতা, সংস্কৃতি, জ্ঞান, বুদ্ধিবৃত্তি, ধর্ম ও নৈতিকতা এবং উন্নতি ও অগ্রগতির বর্তমান পর্যায়ে পৌঁছতে পারতো না।

উপরে যা বলা হলো, কসম করে বলো হে আরব, তা কি সত্য নয়? যদি সত্য হয় তাহলে বলবো, আরবের কোন সরকার, বা জনগোষ্ঠী যদি দ্বীনুল ইসলামকে পরিত্যাগ করে পাশ্চাত্যের সঙ্গে, কিংবা ইসলামপূর্ব আরব জাহেলিয়াতের সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপন করতে চায়, যদি তারা জীবন ও জীবনব্যবস্থা থেকে শরীয়তে মুহম্মদীর আহকাম ও বিধান সরিয়ে পাশ্চাত্যের জীবনব্যবস্থা ও জীবনদর্শন গ্রহণ করতে চায়, কিংবা আরবজাতীয়তাবাদের বুনিয়াদের উপর নিজেদের ভবিষ্যত তৈরী করতে চায়, যদি কেউ মুহম্মদুর রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে ইমাম ও উসওয়াতুন হাসানাহ্ এবং নেতা ও আদর্শরূপে গ্রহণ করতে না চায় তাহলে এই মুহূর্তে তারা মুহম্মদ বিন আব্দুল্লাহর সমস্ত দান, অবদান, দয়া ও অনুগ্রহ যেন ফিরিয়ে দেয় এবং প্রাচীন জাহেলিয়াতের অবস্থায় ফিরে যায়, যেখানে আছে শুধু গোত্রীয় যুদ্ধ ও গৃহবিবাদ, রোম ও পারস্যের জুলুম-অবিচার, দাসত্ব-লাঞ্ছনা এবং ক্ষুধা-অনাহারের অভিশাপ; যেখানে আছে

শুধু পৃথিবী থেকে বিচ্ছিন্ন, শিক্ষা ও সভ্যতার ছায়া থেকে বঞ্চিত অখ্যাত অজ্ঞাত ও অন্ধকার এক জীবন।

এই যে তোমাদের গৌরবময় ইতিহাস, আলোকোজ্জ্বল সভ্যতা, এই সুসমৃদ্ধ ভাষা ও সাহিত্য, এই আরব সালতানাত, এত রাজ্য ও রাজত্ব, এসব তো মুহম্মদী নবুয়তেরই দয়া ও দান, ফয়য ও ফয়যান, এ তো তাঁরই শুভাগমনের কল্যাণ-অবদান!

আরবজাতির শক্তির উৎস ঈমান

ইসলামই হচ্ছে আরব জাহানের পরিচয় ও জাতীয়তা, মুহম্মদুর রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হচ্ছেন আরবজাতির ঈমাম, নবী ও পথপ্রদর্শক। আর ঈমানই হচ্ছে আরবজাতির শক্তির উৎস। এ শক্তিবলেই জাগতিক শক্তিতে দুর্বল হয়েও তারা সমগ্র বিশ্বের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছে এবং নিরঙ্কুশ বিজয় অর্জন করেছে। অতীতে যেমন ছিলো, আজো তেমনি ঈমানই আরবজাতির অস্ত্র ও শক্তি। এ শক্তিবলেই সে পারে শত্রুকে পরাস্ত করতে এবং নিজের অস্তিত্বকে সুরক্ষা দিতে এবং পারে তার উপর অর্পিত দায়িত্ব: রিসালাতের দাওয়াত ও পায়গাম নিয়ে বিশ্বের সামনে দাঁড়াতে। আরবজাতি ইহুদীবাদ বা অন্য শক্তির বিরুদ্ধে, ইউরোপ-আমেরিকা ও রাশিয়ার দেয়া অস্ত্র দিয়ে– যার মাধ্যমে তারা আরবদের অর্থ শোষণ ও তেল লুন্ঠন করছে– এসব অস্ত্র দিয়ে তারা কারো বিরুদ্ধে দাঁড়াতেই পারবে না; যুদ্ধ জয় করা তো দূরের কথা। তারা জয়ী হতে পারবে শুধু ঈমান ও আত্মিক শক্তি দ্বারা এবং প্রাণপ্রেরণা ও উদ্যম-উদ্দীপনা দ্বারা, যার বলে বলীয়ান হয়ে একদিন তারা রোম ও পারস্য সাম্রাজ্যের বিরুদ্ধে একই সঙ্গে যুদ্ধে নেমেছিলো এবং জয়ী হয়েছিলো।

আজ আমরা আরবজাতির অবস্থা কী দেখতে পাই! জীবনের আকাঙ্ক্ষা ও মৃত্যুর ভয়, ভোগ ও আরাম-আয়েশের লোভ, অবিশ্বাস ও দ্বিধা-সংশয় এবং চিন্তার দ্বন্দ্ব; এ অবস্থায় আর যাই হোক শত্রুর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা যায় না। সুতরাং আরববিশ্বের সরকার ও নেতৃবৃন্দ এবং আরবলীগের নীতিনির্ধারকদের প্রথম ও প্রধান কর্তব্য হলো শ্রেণী ও স্তরনির্বিশেষে গোটা জাতির অন্তরে এবং আরব ফৌজের, সিপাহী ও সিপাহসালার সবার দিলে ঈমানের বীজ বপণ করা, জিহাদের প্রেরণা, শাহাদাত ও জান্নাতের আকাঙ্ক্ষা জাগ্রত করা। আরবজাতির বিশিষ্ট-সাধারণ সর্বস্তরের মানুষকে আজ এমন শিক্ষা ও দীক্ষা দান করতে হবে,

যেন দুনিয়ার অন্তসারশূন্য চাকচিক্য ও জাঁকজমকের প্রতি তুচ্ছতা ও নির্মোহতা সৃষ্টি হয়; নাফসের খাহেশাত ও প্রবৃত্তির চাহিদা-লালসা এবং জীবনের মোহ-মায়ার উপর সংযম ও নিয়ন্ত্রণ অর্জন করা সম্ভব হয়। শুধু কথা ও বাগ্মিতা দ্বারা নয়, বরং কর্ম ও আচরণ দ্বারা তাদের দেখাতে হবে, কীভাবে আল্লাহর রাস্তায় বিপদ-কষ্ট বরণ করতে হয় এবং কীভাবে আলো ও পতঙ্গের মত মৃত্যুতে ঝাঁপ দিতে হয় এবং মৃত্যুকে হাসিমুখে আলিঙ্গন করতে হয়। তাদের দেহ-শিরায় যদি আল্লাহর তলোয়ার খালিদ বিন ওয়ালীদের রক্ত থাকে তাহলে তাঁর মত তাদেরও আজ বলতে হবে শত্রুর উদ্দেশ্যে, 'আগামীকাল এমন কাউমের সঙ্গে হবে তোমাদের মোকাবেলা, মৃত্যু যাদের কাছে তেমনই প্রিয় যেমন প্রিয় তোমাদের কাছে মদের পেয়ালা।'

আরবযুবশক্তির আত্মত্যাগ ও মানবতার মুক্তি

নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আবির্ভাব হয় ঠিক ঐ সময় যখন মানবতার দুর্গতি ও দুর্ভাগ্য এমন চূড়ান্ত সীমায় পৌঁছে গিয়েছিলো, যারপর আর কোন সীমা নেই। সেখান থেকে মানবজাতিকে উদ্ধার করা এবং মুক্তি ও সৌভাগ্যের পথে পরিচালিত করা তাদের সাধ ও সাধ্যের বাইরে ছিলো যারা প্রাচুর্যের কোলে প্রতিপালিত হয়েছে এবং যাদের জীবন ও যৌবন ছিলো খাহেশাত ও ভোগ-বিলাসে নিমজ্জিত, যাদের বর্তমান ছিলো আনন্দ-বিনোদনের আয়োজনে ভরপুর এবং ভবিষ্যত ছিলো নিশ্চিন্ত নিরাপদ। ছায়াঘেরা জীবন থেকে বের হয়ে দুঃখ-কষ্ট ও বিপদ-দুর্যোগের সম্মুখীন হওয়া এবং জানমালের কোরবানি দেয়ার যোগ্যতা তাদের ছিলো না। এজন্য প্রয়োজন ছিলো এমন জাতি ও জনগোষ্ঠীর, মুমূর্ষু মানবতার মুক্তির মহান দায়িত্ব পালনের জন্য যারা জীবন, যৌবন ও ভবিষ্যত বিসর্জন দিতে পারে; পারে যে কোন বিপদ-দুর্যোগের মধ্যে হাসিমুখে ঝাঁপিয়ে পড়তে। না জানমালের পরোয়া আছে, না পেশা, ব্যবসা ও জীবিকার দুয়ার বন্ধ হওয়ার দুশ্চিন্তা আছে, না মা-বাবা পরিবার ও বন্ধু-স্বজনের আশাহত হওয়ার অনুতাপ আছে। যেমন কাউমে ছালেহ বলেছিলো–

يَٰصَٰلِحُ قَدْ كُنتَ فِينَا مَرْجُوًّا قَبْلَ هَٰذَآ

হে ছালেহ, এর আগে তো আমাদের মধ্যে তুমি সম্ভাবনাময় ছিলে (কোত্থেকে কী হলো, এমন উন্মাদনা পেয়ে বসলো যে, আমাদের সব আশা, সব সম্ভাবনা মাটি হয়ে গেলো।)
(হুদ, ১১ : ৬২)

কিন্তু যারা আগে বাড়ে, তাদের অন্তরে এসব চিন্তা ও দুশ্চিন্তা কিছুই থাকে না। থাকে শুধু মানবতার প্রতি দরদ-ব্যথা এবং মানবতার মুক্তির ব্যাকুলতা।

'জীবন-মৃত্যুকে পায়ের ভৃত্য'করা এমন মুজাহিদীনের জামাত ছাড়া মানবতার উদ্ধার ও অস্তিত্ব রক্ষার আশা কিছুতেই করা যায় না এবং কোন মহান দাওয়াত ও আন্দোলনের সফলতার কথা চিন্তাও করা যায় না। হাতে গোনা এমন কিছু মানুষের– সময় ও সমাজের চোখে যারা বোকা ও দুর্ভাগা– হাঁ, তাদেরই 'দুর্গতি ও দুর্ভাগ্যের' মূল্যেই মানবতা লাভ করে নবজীবন, মানবজাতির ঘটে নব-উত্থান; জীবন ও সভ্যতার গতি পরিবর্তিত হয় অন্ধকার থেকে আলো এবং অকল্যাণ থেকে কল্যাণের দিকে। যদি কিছু মানুষের ত্যাগ ও আত্মত্যাগ, বঞ্চনা ও দুর্ভোগ এবং বৈষয়িক ও ব্যবসায়িক ক্ষতি পুরো উম্মাহর জন্য সফলতা ও সৌভাগ্য বয়ে আনে এবং লাখো মানুষ, যাদের সংখ্যা-শুমার আল্লাহ ছাড়া কেউ জানে না, যদি তারা আল্লাহর আযাব ও জাহান্নামের আগুন থেকে নাজাত পেয়ে যায় তাহলে বলতেই হবে, ঐ 'বঞ্চিত ও দুর্ভাগারাই' সার্থক, তাদেরই জীবন ধন্য। পেয়ারা নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তো একজন মাত্র মানুষের হিদায়াত সম্পর্কে বলেছেন–

لأن يهدي الله بك رجلا خير من حمر النعم

আল্লাহ তোমার মাধ্যমে একজন মানুষকে হিদায়াত দান করবেন, এটা (আরবের শ্রেষ্ঠ সম্পদ) লাল বর্ণের উটদলের চেয়ে উত্তম।

আর এখানে তো প্রশ্ন হলো মানুষ, মানবতা ও গোটা মানবজাতির!

নবুয়তে মুহম্মদীর 'তাশরীফায়নে'র সময় আল্লাহ তা'আলা অবশ্যই জানতেন, রোম ও পারস্য এবং পৃথিবীর অন্যান্য সভ্য জাতি, যাদের হাতে তখন বিশ্বের নিয়ন্ত্রণক্ষমতা ছিলো, ভোগসর্বস্ব জীবন ও বস্তুবাদী স্বভাবের কারণে দাওয়াত ও জিহাদ এবং বিপন্ন মানবতার উদ্ধার-প্রচেষ্টায় কঠিন প্রতিকূলতা ও বিপদ-দুর্যোগের ঝুঁকি কিছুতেই গ্রহণ করতে পারবে না। এমনকি জীবনের সামান্য আরাম-আয়েশ, সাধারণ সাজসজ্জা ও সাধ-আহলাদও কিছুমাত্র ত্যাগ করার যোগ্যতা তাদের নেই। সেখানে অল্পসংখ্যায়ও এমন মানুষ ছিলো না যারা খাহেশাত ও লোভ-লালসা দমন করতে এবং নাগরিক জীবনের অপ্রয়োজনীয় 'কেতদুরস্তি' ছেড়ে 'কাফাফ'-এর জীবনে খুশী হতে পারে।

তাই ইসলামের পায়গাম ও নবীর ছোহবতের জন্য আল্লাহ তা'আলা এমন জাতিকেই মনোনীত করেছেন যারা দাওয়াত ও জিহাদের গুরুভার বহন করতে পারে এবং ত্যাগ ও কোরবানির পথে চলতে পারে। তারা ছিলো আরবজাতি, সুস্থ-সবল, শক্ত-সুঠাম, সভ্যতার যাবতীয় দোষ-উপসর্গ থেকে মুক্ত। কারণ সে যুগের 'পচনধরা' নগরসভ্যতার ছোঁয়া-ছায়া থেকে তারা ছিলো নিরাপদ দূরত্বে। তাদের মধ্য হতেও আল্লাহ তা'আলার নির্বাচিত ব্যক্তিগণ হলেন নবীর ছাহাবা, হৃদয়ের পুণ্যতায়, জ্ঞানের গভীরতায় এবং জীবনের অনাড়ম্বরতায় মানুষের সমাজে তাঁরা ছিলেন সবার উপরে।

রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দাওয়াত নিয়ে সেই যে ছাফা পাহাড়ে দাঁড়ালেন এবং নেমে এলেন, তারপর দীর্ঘ পথ পাড়ি দিলেন। এসময় তিনি চেষ্টা সাধনা ও মেহনত-মুজাহাদার পুরা হক আদায় করেছেন। দাওয়াতের কাজকে তিনি এমন সব কিছুর উপর প্রাধান্য দিয়েছেন যা দাওয়াতের পথে বাধা হতে পারে। দুনিয়ার যাবতীয় লোভ ও চাহিদা থেকে তিনি সম্পূর্ণ বেঁচে ছিলেন এবং এ বিষয়ে সমগ্র বিশ্বের জন্য ইমাম ও উসওয়া এবং আদর্শ মানদণ্ড ছিলেন। সীরাতের প্রসিদ্ধ ঘটনা, দাওয়াত থেকে বিরত থাকার প্ররোচনারূপে কোরায়শ একবার এমন কিছু প্রস্তাব দিলো, যার হাতছানি এড়িয়ে যাওয়া 'খাহেশাতের আভাসমাত্র রয়েছে এমন কারো পক্ষেই সম্ভব হতো না; তিনি তা ঘৃণাভরে প্রত্যাখ্যান করলেন। আর প্রিয় চাচা যখন আগের মত 'ছায়া' দিতে একটু দ্বিধা প্রকাশ করলেন তখন তিনি যা বললেন, তা ছিলো দাওয়াতের প্রতি আত্মনিবেদনের ইতিহাসে তুলনাহীন। তিনি বললেন–

يا عم! والله لو وضعوا الشمس في يميني والقمر في يساري على أن أترك هذا الأمر حتى يظهره الله أو أهلك فيه، ما تركته

হে চাচা! আল্লাহর কসম, এরা যদি আমার ডান হাতে সূর্য এবং বাম হাতে চাঁদ এনে রাখে তবু একাজ থেকে আমি পিছু হটবো না, যতক্ষণ না আল্লাহ এটাকে বিজয়ী করেন, কিংবা এ পথে আমি শেষ হয়ে যাই।

দাওয়াতের জন্য ত্যাগ ও আত্মত্যাগ এবং সর্বস্ব বিসর্জনের এ ঘটনা শুধু ঘটনা ছিলো না, বরং নবী-যুগ ও পরবর্তী যুগের সমস্ত 'আহলে দাওয়াত'-এর জন্য ছিলো চিরস্থায়ী আদর্শ। এক্ষেত্রে জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত নিজের জন্য তিনি

আরাম-আয়েশের সমস্ত পথ বন্ধ করে রেখেছিলেন। শুধু নিজের জন্য কেন? পরিবার পরিজন ও সমস্ত নিকটজনকেও তিনি 'দুনিয়া' থেকে দূরে রেখেছেন। তাই আত্মীয়তায় যিনি যত নিকটের ছিলেন, জীবনের সুবিধাভোগের ক্ষেত্রে তিনি তত পিছনে ছিলেন, কিন্তু ত্যাগ ও কোরবানির ক্ষেত্রে ছিলেন তত অগ্রভাগে। যখন কোন কিছু হারাম ও নিষিদ্ধ করার পদক্ষেপ নিতেন, আল্লাহর রাসূল আপন গোত্র, পরিবার ও ঘর থেকে তা শুরু করতেন, আর যখন কোন হক ও সুবিধা ঘোষণা করতেন তখন অন্যদের এগিয়ে রাখতেন; এমনকি কখনো নিকটতম আত্মীয়দের উপর তা হারামও করে দিতেন।

যখন 'সুদ' হারাম করার ইচ্ছা করলেন তখন চাচা আব্বাস বিন আব্দুল মুত্তালিব -কে দিয়ে শুরু করলেন এবং সর্বপ্রথম তার পাওনা সুদ রহিত করলেন। যখন জাহেলিয়াতের 'প্রতিশোধপ্রথা' বাতিল করার ইচ্ছা করলেন তখন রাবী'আ ইবনুল হারিছ ইবনে আব্দুল মুত্তালিবের 'রক্ত' দিয়ে শুরু করলেন এবং সর্বপ্রথম তার রক্তের প্রতিশোধ-অধিকার বাতিল ঘোষণা করলেন।

পক্ষান্তরে যখন যাকাতের বিধান প্রবর্তন করলেন, যা ছিলো 'চিরঅব্যাহত' একটি বিরাট অর্থনৈতিক সুবিধা, কিন্তু তিনি তা চিরকালের জন্য তার নিকটতম স্বজন বনুহাশিমের উপর হারাম করে দিলেন। তাদের ধনীরা যাকাত দেবে, কিন্তু তাদের গরীবরা যাকাত পাবে না।

মক্কাবিজয়ের দিন আলী বিন আবু তালিব (রা.) আবদার জানালেন, যেন বনু-হাশিমের অনুকূলে 'সিকায়া' এবং 'হিজাবাহ'-এর দায়িত্বও যুক্ত করা হয়, কিন্তু তিনি তা না-মঞ্জুর করে (তখন পর্যন্ত অমুসলিম) উছমান বিন তালহাকে ডাকালেন এবং কা'বার চাবি তার হাতে তুলে দিয়ে বললেন–

هاك مفتاحك يا عثمان! اليوم يوم بر ووفاء، وقال : خذوها خالدة تالدة فيكم، لاينزعها منكم إلا ظالم

হে উছমান, তোমার চাবি নাও। আজ অনুগ্রহের ও বিশ্বস্ততা রক্ষার দিন। নাও, চিরকাল, লাগাতার এটা তোমাদের মধ্যে থাকবে, যালিম ছাড়া কেউ তোমাদের থেকে তা ছিনিয়ে নেবে না।

স্ত্রীগণকে তিনি যুহদ ও নির্মোহতা, কানা'আত ও অল্পেতুষ্টি এবং 'শুকনো রুক্ষ' জীবন যাপনের প্রতি উদ্বুদ্ধ করলেন। তিনি পরিষ্কার ভাষায় জানিয়ে দিলেন, যদি

তোমরা অভাব অনটনের জীবনে সন্তুষ্ট থাকো তাহলে আমার সঙ্গে থাকো; আর যদি আরাম আয়েশের জীবন পছন্দ করো তাহলে ভিন্ন পথ গ্রহণ করো। তিনি তাঁদেরকে আল্লাহ তা'আলার ফায়সালা শুনিয়ে দিলেন–

يَٰٓأَيُّهَا ٱلنَّبِىُّ قُل لِّأَزْوَٰجِكَ إِن كُنتُنَّ تُرِدْنَ ٱلْحَيَوٰةَ ٱلدُّنْيَا وَزِينَتَهَا فَتَعَالَيْنَ أُمَتِّعْكُنَّ وَأُسَرِّحْكُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا ﴿٢٨﴾ وَإِن كُنتُنَّ تُرِدْنَ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُۥ وَٱلدَّارَ ٱلْءَاخِرَةَ فَإِنَّ ٱللَّهَ أَعَدَّ لِلْمُحْسِنَٰتِ مِنكُنَّ أَجْرًا عَظِيمًا ﴿٢٩﴾

হে নবী, বলুন আপনার স্ত্রীগণকে, যদি তোমরা চাও দুনিয়ার জীবন এবং তার সৌন্দর্যশোভা, তাহলে এসো, তোমাদের আমি ভোগ করাবো এবং সুন্দরভাবে বন্ধনমুক্ত করে দেবো। আর যদি চাও তোমরা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলকে এবং আখেরাতের বাসস্থানকে, তাহলে আল্লাহ প্রস্তুত করে রেখেছেন তোমাদের মধ্য হতে যারা পুণ্যবতী তাদের জন্য বিরাট প্রতিদান।

তবে তাঁর 'পুণ্যবতী' স্ত্রীগণ আল্লাহ ও তাঁর রাসূলকেই গ্রহণ করেছিলেন।

নবীকন্যা হযরত ফাতেমা (রা.) অবগত হলেন, তাঁর কাছে কিছু গোলাম ও খাদেম এসেছে। এদিকে আটা পেষার যাঁতাকল চালাতে চালাতে তাঁর হাতে 'যখম' পড়ে গিয়েছিলো। তিনি প্রিয় পিতার নিকট গেলেন এবং একজন খাদেমের আবদার জানালেন, কিন্তু তিনি বললেন, তুমি যা চেয়েছো আমি কি তোমাকে এর চেয়ে উত্তম জিনিস বাতাবো না? শয্যাগ্রহণের সময় চৌত্রিশবার 'আল্লাহু আকবার' বলো, তেত্রিশবার 'আলহামদুলিল্লাহ' বলো এবং তেত্রিশবার 'সুবহানাল্লাহ' বলো। এটা তোমাদের জন্য তোমাদের চাওয়া জিনিস থেকে উত্তম।

মোটকথা, এটাই ছিলো আহলে বাইত ও নিকটজনদের ক্ষেত্রে তাঁর আচরণ ও অনুসৃত নীতি। যিনি যত নিকটজন তার সুবিধা তত সঙ্কুচিত, আর দায়দায়িত্ব তত সম্প্রসারিত। পৃথিবীর কোন সভ্যজাতির কোন কর্ণধার এর ন্যূনতম নমুনাও যদি দেখাতে পারতো! হাঁ, পেরেছিলেন তাঁর প্রিয়তম পাত্র, উম্মতের শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি খলিফা হযরত আবু বকর রা.; পেরেছিলেন তাঁকে অনুসরণ করতে। তাঁর স্ত্রী যখন কিছু দিনের খরচ বাঁচিয়ে একটু মিষ্টান্ন তৈরী করলেন, তখন ছিদ্দীকে

আকবর বাইতুল মালের যিম্মাদারকে জানালেন, এখন থেকে আবু বকরের ভাতা যেন এই পরিমাণ কমিয়ে দেয়া হয়। কারণ পরীক্ষা করে দেখা গেছে, আবু বকরের পরিবার আরো কম খরচে চলতে পারে!

পেরেছিলেন হযরত ওমর, উছমান, আলী, হাসান, হোসায়ন এবং ছাহাবায়ে কেরাম, রিযওয়ানুল্লাহি তা'আলা আলাইহিম আজমা'ঈন।

মক্কার কিছু মানুষ যখন ঈমান আনলেন তখন তাদের অর্থনৈতিক জীবন তছনছ হয়ে গেলো। বাজারের অসহযোগিতার কারণে এবং দাওয়াতি কাজের ব্যস্ততার কারণে তাঁদের ব্যবসা বসে গেলো। কারো কারো সারা জীবনের সঞ্চিত পুঁজি হাতছাড়া হয়ে গেলো। তাঁদের মধ্যে এমনো ছিলেন যাদের বিলাস-ব্যসন, পোশাক-জৌলুস ও প্রাচুর্যপূর্ণ জীবন ছিলো প্রবাদতুল্য, কিন্তু সবকিছু এমনভাবে শেষ হলো যে তাঁদের জীর্ণ-মলিন বাস দেখে সকলে হয়রান। অনেকে শুধু ঈমান আনার অপরাধে পৈতৃক সম্পত্তির অংশ থেকে বঞ্চিত হলেন (কিন্তু পরবর্তীতে এজন্য তারা বিশেষ কোন সুবিধা লাভ করেননি)।

তারপর আল্লাহর রাসূল যখন মদীনায় হিজরত করলেন এবং আনছার তাঁর সঙ্গ গ্রহণ করলেন, তখন (ঈমানী, আমলী, দাওয়াতি ও জিহাদি ব্যস্ততার কারণে) তাদের কৃষিকাজ ও বাগান পরিচর্যা বেশ ক্ষতিগ্রস্ত হলো এবং তাঁদের আর্থিক অবস্থার উপর বিরূপ প্রভাব পড়লো। শেষে তাঁরা খামার ও বাগান পরিচর্যার জন্য কিছু সময় প্রার্থনা করলেন, কিন্তু তিনি তা নাকচ করে দিলেন, আর আল্লাহ তা'আলা তাঁদের সতর্ক করে আয়াত নাযিল করলেন–

وَأَنفِقُوا۟ فِى سَبِيلِ ٱللَّهِ وَلَا تُلْقُوا۟ بِأَيْدِيكُمْ إِلَى ٱلتَّهْلُكَةِ ۛ وَأَحْسِنُوٓا۟ ۛ إِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُّ ٱلْمُحْسِنِينَ ﴿١٩٥﴾

আর তোমরা খরচ করো আল্লাহর রাস্তায়, আর নিজেকে নিক্ষেপ করো না বরবাদির দিকে। আর সদাচার করো, নিশ্চয় আল্লাহ সদাচারকারীদের ভালোবাসেন। (বাকারাহ, ২ :১৯৫)

একই রকম ছিলো (সাধারণ) আরবদের অবস্থা, যারা দাওয়াত গ্রহণ করেছেন এবং দাওয়াতি আমলে ও জিহাদ-মুজাহাদায় শামিল হয়েছেন। বস্তুত জানমালের কোরবানিতে এবং বিপদ-কষ্টের জীবনে পৃথিবীর অন্য যে কোন জাতির চেয়ে

তারা অনেক বেশী অগ্রসর ছিলেন। আর তাদেরই সম্বোধন করে আল্লাহ তাআলা বলেছেন–

قُلْ إِن كَانَ ءَابَآؤُكُمْ وَأَبْنَآؤُكُمْ وَإِخْوَٰنُكُمْ وَأَزْوَٰجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمْوَٰلٌ ٱقْتَرَفْتُمُوهَا وَتِجَٰرَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسَٰكِنُ تَرْضَوْنَهَآ أَحَبَّ إِلَيْكُم مِّنَ ٱللَّهِ وَرَسُولِهِۦ وَجِهَادٍ فِى سَبِيلِهِۦ فَتَرَبَّصُوا۟ حَتَّىٰ يَأْتِىَ ٱللَّهُ بِأَمْرِهِۦ ۗ وَٱللَّهُ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمَ ٱلْفَٰسِقِينَ ﴿٢٤﴾

আপনি বলে দিন, যদি তোমাদের পিতা এবং তোমাদের পুত্র এবং তোমাদের ভাই এবং তোমাদের স্ত্রী এবং তোমাদের পরিবার-স্বজন এবং সম্পদ, যা তোমরা সঞ্চয় করেছো এবং ব্যবসা, যা মন্দাগ্রস্ত হওয়ার আশঙ্কা করো এবং আবাসস্থল যেগুলো তোমাদের খুব পছন্দের, যদি এগুলো তোমাদের কাছে অধিক প্রিয় হয় আল্লাহ ও তাঁর রাসূল থেকে এবং তাঁর রাস্তায় জিহাদ করা থেকে তাহলে অপেক্ষা করো আল্লাহ তাঁর (আযাবের) ফায়ছালা পাঠানো পর্যন্ত। আর আল্লাহ ফাসিক কাউমকে পথ দেখান না। (তাওবা, ৯ : ২৪)

আরো ইরশাদ হয়েছে–

مَا كَانَ لِأَهْلِ ٱلْمَدِينَةِ وَمَنْ حَوْلَهُم مِّنَ ٱلْأَعْرَابِ أَن يَتَخَلَّفُوا۟ عَن رَّسُولِ ٱللَّهِ وَلَا يَرْغَبُوا۟ بِأَنفُسِهِمْ عَن نَّفْسِهِۦ ۚ

মদীনার বাসিন্দাদের এবং তাদের প্রতিবেশে বাসকারী বেদুঈনদের জন্য শোভন ছিলো না আল্লাহর রাসূলের সঙ্গ থেকে পিছিয়ে থাকা এবং তাঁর প্রাণের কথা ভুলে নিজেদের প্রাণ নিয়ে ব্যতিব্যস্ত হয়ে পড়া। (তাওবাহ, ৯ : ১২০)

কারণ এই যে, মানবজাতির সৌভাগ্যের ইমারত তাঁদেরই কোরবানির বুনিয়াদের উপর কায়েম হওয়ার কথা ছিলো এবং অবস্থার পরিবর্তন ও নতুন বিপ্লবের আত্মপ্রকাশ শুধু এ অপেক্ষায় ছিলো যে, 'মুহাজির-আনছার'-এর এই জামাত যেন ত্যাগ ও আত্মত্যাগ এবং মানবতার স্বার্থে যে কোন বিপদ-দুর্যোগ বরণের

সাহসী সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। তাই তাঁদের উদ্বুদ্ধ করে আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন–

وَلَنَبْلُوَنَّكُم بِشَىْءٍ مِّنَ ٱلْخَوْفِ وَٱلْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ ٱلْأَمْوَٰلِ وَٱلْأَنفُسِ وَٱلثَّمَرَٰتِ ۗ وَبَشِّرِ ٱلصَّٰبِرِينَ ﴿١٥٥﴾

আর অতিঅবশ্যই পরীক্ষা করবো আমি তোমাদেরকে কিছুটা ভয় ও ক্ষুধা দ্বারা এবং মালের ও জানের ও ফলের ক্ষতি দ্বারা। আর ছবরকারীদের আপনি সুসংবাদ দান করুন। (বাকারাহ, ২ : ১৫৫)

অন্যত্র ইরশাদ হয়েছে প্রশ্নের শৈলীতে বক্তব্যকে আরো জোরালো, আরো আবেদনপূর্ণ করে –

أَحَسِبَ ٱلنَّاسُ أَن يُتْرَكُوٓا۟ أَن يَقُولُوٓا۟ ءَامَنَّا وَهُمْ لَا يُفْتَنُونَ ﴿٢﴾ وَلَقَدْ فَتَنَّا ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ ۖ فَلَيَعْلَمَنَّ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ صَدَقُوا۟ وَلَيَعْلَمَنَّ ٱلْكَٰذِبِينَ ﴿٣﴾

মানুষ কি ধরে নিয়েছে যে, তারা 'ঈমান এনেছি' বলবে, আর তাদের ছেড়ে দেয়া হবে; তাদের কোন পরীক্ষা নেয়া হবে না!? অথচ অবশ্যই আমি পরীক্ষা করেছি তাদের, যারা এদের পূর্বে বিগত হয়েছে। অবশ্যই আল্লাহ জেনে নেবেন ঐ লোকদের যারা সত্য বলেছে, আর অবশ্যই জেনে নেবেন ঐ লোকদের যারা মিথ্যা বলেছে। (আনকাবূত, ২৯ : ২ - ৩)

আরবজাতি যদি ত্যাগ ও আত্মত্যাগের এ সৌভাগ্য গ্রহণ করতে কিছুমাত্র দ্বিধা করতো বা পিছপা হতো, মানবতার দুর্ভোগ ও দুর্ভাগ্য আরো দীর্ঘায়িত হতো এবং জাহেলিয়াতের অন্ধকার পৃথিবীর উপর আরো বহুকাল ছেয়ে থাকতো। যেমন ইরশাদ হয়েছে–

إِلَّا تَفْعَلُوهُ تَكُن فِتْنَةٌ فِى ٱلْأَرْضِ وَفَسَادٌ كَبِيرٌ ﴿٧٣﴾

যদি তোমরা তা না করো তাহলে যমীনে বড় ফেতনা দেখা দেবে এবং বড় ফাসাদ (সৃষ্টি হবে)। (আনফাল, ৮ : ৭৩)

খৃস্টীয় ষষ্ঠ শতকে পৃথিবী এক দো-মাথায় এসে দাঁড়িয়েছিলো, তখন আরব-জাতির সামনে এবং তার ফলশ্রুতিতে মানবজাতির সামনে দু'টো পথই খোলা ছিলো। প্রথম পথ এই যে, আরবরা কোরবানির রাস্তায় এগিয়ে যাবে, জানমাল, সন্তান-সন্ততির কোরবানি, এবং জীবনের প্রিয় সবকিছুর কোরবানি। দুনিয়ার তুচ্ছ লোভলালসা সংযত রাখবে এবং বৃহত্তর স্বার্থ ও কল্যাণের পথে ব্যক্তিস্বার্থ এবং ব্যক্তিগত সর্বস্ব বিসর্জন দেবে, তাহলে তা হবে মানবতার সৌভাগ্য এবং ইনসানিয়াতের খোশকিসমত। তখন দুনিয়াতেই বসবে জান্নাতের বাজার, এবং যারা সৌভাগ্যবান, প্রাণের মূল্যে তারা ক্রয় করবে ঈমানের সম্ভার।

দ্বিতীয় পথ এই যে, বিশ্বের সংশোধন ও মানবজাতির কল্যাণের চিন্তা ছেড়ে তারা নিজেদের খাহেশাত ও চাহিদা, ব্যক্তিস্বার্থ ও ব্যক্তিগত ভোগবিলাসের চিন্তায় ডুবে থাকবে; তখন মানবজাতি পথহারা অবস্থায় দুর্ভাগ্যের চোরাবালিতেই আটকা পড়ে থাকবে এবং ধীরে ধীরে আরো তলিয়ে যেতে থাকবে। আর সেটা কতকাল, তা শুধু আল্লাহ জানেন।

কিন্তু আল্লাহ তা'আলা মানবজাতির কল্যাণ, সৌভাগ্য ও মুক্তি চাইলেন, আর আরবজাতি, অর্থাৎ ছাহাবা কেরাম পূর্ণ সাহস, উদ্দীপনা, ত্যাগ ও আত্মত্যাগের প্রেরণা এবং কোরবানির জোশ ও জযবা নিয়ে অগ্রসর হলেন। কেননা মুহম্মদুর রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁদের মধ্যে ঈমানের প্রেরণা এবং কোরবানির জোশ-উদ্দীপনা সঞ্চারিত করেছিলেন এবং দুনিয়ার 'ফানি যিন্দেগি'র মোকাবেলায় আখেরাতের আবাদী যিন্দেগানির হাকীকত তাঁদের বুঝিয়েছিলেন এবং জান্নাত ও তার অফুরন্ত নায নেয়ামতকে তাঁদের সামনে অনেক প্রিয় ও কাঙ্ক্ষিতরূপে তুলে ধরেছিলেন। তাই তাঁরা নিজেদের জানমাল ও জীব যৌবনকে সমগ্র মানবতার জন্য মুক্তিপণরূপে পেশ করেছিলেন এবং মানবজাতির কল্যাণ ও সৌভাগ্যের জন্য দুনিয়ার লোভলালসা ও ভোগবিলাস বিসর্জন দিয়েছিলেন। এই জীবনে মানুষ যা কিছুর আকাঙ্ক্ষা করে, যা কিছুর স্বপ্ন দেখে এবং যা কিছু আপন করে পেতে চায় সব তাঁরা বিসর্জন দিয়েছিলেন এবং একমাত্র আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য জিহাদ ও মুজাহাদা এবং মেহনত ও সাধনায় আত্মনিয়োগ করেছিলেন। আল্লাহর পক্ষ হতে তাঁদের জন্য কী ছিলো এর পুরস্কার? আলকোরআনের ভাষায়–

فَـَٔاتَىٰهُمُ ٱللَّهُ ثَوَابَ ٱلدُّنْيَا وَحُسْنَ ثَوَابِ ٱلْـَٔاخِرَةِ ۗ وَٱللَّهُ يُحِبُّ ٱلْمُحْسِنِينَ ﴿١٤٨﴾

আর আল্লাহ তাদের দুনিয়ার বিনিময় এবং আখেরাতের উত্তম বিনিময় দু'টোই দান করলেন। পুণ্যকর্মকারী ও নেককারদের তো আল্লাহ ভালোবাসেন।

(আল-মাইদাহ, ৩ : ১৪৮)

পৃথিবী এখন পিছনে সরতে সরতে ঠিক সেই বিন্দুতে ফিরে গেছে যেখানে খৃস্টীয় ষষ্ঠ শতকে ছিলো। মানবজাতি আরেকবার সেই দো-মাথায় এসে দাঁড়িয়েছে যেখানে মুহম্মদি নবুয়তের আবির্ভাবের সময় দাঁড়িয়ে ছিলো। আরবজাতিকেই আজ আবার সিদ্ধান্ত নিতে হবে, কী তারা করবে এবং কোন্ পথে চলবে। হয় তারা নবীর উম্মত হিসাবে এবং নবুয়তের সঙ্গে রক্ত-বন্ধনের দাবিতে ঈমান ও আমলের ময়দানে আবার আগে বাড়বে এবং পৃথিবীর ভাগ্য পরিবর্তনের জন্য, মানবজাতিকে অন্ধকার থেকে আলোর দিকে আনার জন্য আবার বিপদ-দুর্যোগের মধ্যে ঝাঁপিয়ে পড়বে; যিন্দেগীর আরাম-আয়েশ, জীবনের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য এবং ভবিষ্যত উন্নতির সব সম্ভাবনা বিসর্জন দেবে, যাতে হোঁচটখাওয়া ও মুখ থুবড়ে-পড়া মানবতা আবার উঠে দাঁড়াতে পারে এবং পৃথিবীর আমূল চিত্রপরিবর্তন ঘটে।

কিংবা তারা এতদিন যেমন ছিলো, বদস্তুর তেমনই থেকে যাবে। সেই লোভ লালসা ও ব্যক্তিগত উচ্চাভিলাষ, সেই পদ ও সম্পদের প্রতিযোগিতা, উন্নতি-পদোন্নতি, আয়-আমদানি ও লাভ-মুনাফার চিন্তা; সেই ভোগবিলাস ও আনন্দ বিনোদনে ডুবে থাকা। এককথায়, মানবতার দুর্গতির কথা না ভেবে মানব-জাতির মুক্তি ও কল্যাণের চিন্তা না করে, ভোগবাদী জীবনের অভ্যস্ত পথেই চলতে থাকা। তখন মানবতা এই গান্দাগলিয নর্দমায়ই পড়ে থাকবে যেখানে পড়ে আছে বহু শতাব্দী ধরে। কারণ মানবতার কল্যাণের আশা করাই বৃথা যদি আরবের অভিজাত যুবশক্তি বড় বড় শহরে, ইউরোপ-আমেরিকার বিনোদন-কেন্দ্রে খাহেশাত ও ভোগবিলাসে মজে থাকে; যদি তাদের জীবন-যৌবন বস্তুপূজা ও উদরপূজার মধ্যে আবর্তিত হতে থাকে; যদি ব্যক্তিজীবনের উন্নতি ও প্রাচুর্যের চিন্তা ছাড়া আর কোন চিন্তাই তাদের না থাকে। আমাদের তো মনে হয়, জাহেলি যুগের কোন কোন যুবক আজকের আরব ও মুসলিম যুবকদের চেয়ে অনেক বেশী উচ্চ মনোবলের অধিকারী ছিলো; চিন্তায় চেতনায় অনেক বেশী প্রসারিত ছিলো। কারণ যে বিশ্বাস ও জীবনদর্শন তারা সত্য বলে গ্রহণ করেছিলো তার জন্য তারা নিজেদের ভবিষ্যত বিসর্জন দিয়েছিলো। এমনকি

জাহেলিয়াতের কবি ইমরুউল কায়েসও হয়ত তাদের চেয়ে অনেক অভিজাত ছিলেন, যিনি নিজের সম্পর্কে বলেছেন–

ولو أنما أسعى لأدنى معيشـــة كفاني و لم أطلب قليلا من المال

ولكنما أسعى لمجد مؤثل وقد يدرك المجد المؤثل أمثالي

যদি জীবনের সাধারণ জীবিকা-স্তরের জন্য সচেষ্ট হতাম, সামান্য অর্থই আমার জন্য যথেষ্ট হতো, কিন্তু আমি তা চাইনি। আমি তো চাই এমন মর্যাদা যার শিকড় অনেক গভীরে, আর আমার মত যুবকই পায় সুসংহত মর্যাদার নাগাল।

মানবতা ও মানবজাতিকে যদি শান্তি-সৌভাগ্যের সেই সবুজ দ্বীপে পৌঁছাতে হয় তাহলে নিজেদের কোরবানি ও আত্মত্যাগ দ্বারা মুসলিম যুবশক্তিকেই তৈরী করতে হবে 'মানবতার মুক্তির সেতু'। সেই সেতু পার হয়েই নিরাপদে পৌঁছা সম্ভব কল্যাণ ও মুক্তির সবুজ দ্বীপে।

উত্তম ফসলের জন্য ভূমির প্রয়োজন উত্তম সার। মানবতার ভূমিতে ইসলামের সবুজ ফসল ফলাতে হলেও প্রয়োজন উপযুক্ত সারের, আর তা হলো মুসলিম যুবকদের ব্যক্তিগত সমস্ত ইচ্ছা-চাহিদা, সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য, জৌলুস-প্রাচুর্য এবং ভবিষ্যতের সমস্ত স্বপ্ন ও সম্ভাবনার বিসর্জন, যা তারা ইসলামের বিজয়, বিশ্বের শান্তি ও নিরাপত্তা এবং মানুষকে জাহান্নাম থেকে জান্নাতের পথে ফিরিয়ে আনার জন্য যুগে যুগে দিয়ে এসেছে। আরবযুবশক্তির এইটুকু ত্যাগ ও কোরবানির বিনিময়ে সত্যি যদি বিভ্রান্ত মানবতা মুক্তির পথ পেয়ে যায় এবং কল্যাণ ও শান্তির ঠিকানায় পৌঁছে যায়, বলতেই হবে, 'বড় সস্তায় পাওয়া সওদা'।

আল্লাহ-প্রেমের পাকা সওদাগর এক কবি বড় সুন্দর বলেছেন–

আয় দিল, তামাম নফা' হ্যয় সওদায়ে ইশক মেঁ
ইক জান কা যিয়াঁ, সো এ্যয়সা যিয়াঁ ন্যহী
হে দিল, সমস্ত লাভ হলো ইশকের সওদায়,
তাতে যায় শুধু জান, তা এমন কি আর যাওয়া!

এ প্রসঙ্গে কোন অন্তর্দর্শী বলেছেন–

إنه لثمن قليل جدا لسلعة غالية جدا!

বড় মূল্যবান পণ্যের জন্য বড় স্বল্প মূল্য!

ঘোড়সাওয়ারি ও ফৌজি যিন্দেগী

বড় তিক্ত ও মর্মান্তিক বাস্তবতা যে, আরবজাতি আজ অতীতের সৈনিকসুলভ বহু বৈশিষ্ট্য হারিয়ে ফেলেছে। বিশেষ করে অশ্বচালনা, একসময় যা ছিলো তাদের জাতীয় পরিচয়, তা এখন একদম শেষ হয়ে গেছে। আরবজীবনে এটা আসলেই বিরাট ক্ষতি ও বিপর্যয় এবং জিহাদের ময়দানে দুর্বলতা ও পরাজয়ের অন্যতম কারণ। তাদের ফৌজি জযবা ও সামরিক প্রেরণা নিস্তেজ হয়ে পড়েছে। আয়েশি জীবনের কারণে স্বাস্থ্য ও দৈহিক শক্তিতে ভাটা পড়েছে। আরামদায়ক গাড়ী এখন আরবদের একমাত্র বাহন। ফলে বিশ্বসেরা তেজিয়ান আরবী ঘোড়া এখন আরব জাযিরাতেই বিলুপ্তপ্রায়। সামরিক প্রশিক্ষণ, শরীরচর্চামূলক খেলাধূলা, ঘোড়দৌড়, বর্শাচালনা, কুস্তিলড়াই, সাধারণ মানুষ এগুলো ভুলে এখন মজে আছে ক্ষতিকর যন্ত্রনির্ভর খেলাধূলায়। সুতরাং আরব-বিশ্বের নীতিনির্ধারক ও শিক্ষা-দীক্ষার নিয়ন্ত্রক ব্যক্তিবর্গের অপরিহার্য কর্তব্য হলো আরব যুবশক্তিকে সৈনিকসুলভ বৈশিষ্ট্যের উপর প্রতিপালন করা, যাতে প্রতিটি যুবক শারীরিক শক্তি, দৃঢ়চিত্ততা, কষ্টসহিষ্ণুতা ও বিপদ-দুর্যোগের মোকাবেলা করার মানসিকতা নিয়ে গড়ে ওঠে এবং সহজ সরল, অনাড়ম্বর ও শুষ্ক-রুক্ষ জীবনে অভ্যস্ত হতে পারে। মুসলিম উম্মাহর মহান মুরুব্বী ও দীক্ষাদাতা আমীরুল মুমিনীন ওমর ইবনুল খাত্তাব (রা.)-এর অন্তর্দৃষ্টিতে এ বিষয়টির গুরুত্ব ধরা পড়েছিলো। তাই তিনি আজমের বিভিন্ন অঞ্চলে নিযুক্ত আরব প্রশাসকদের উদ্দেশ্যে প্রেরিত এক দিক-নির্দেশনামূলক পত্রে লিখেছিলেন–

إياكم والتنعم وزي العجم، وعليكم بالشمس، فإنها حمام العرب، وتمعددوا، واخشوشنوا،
واخشوشبوا، واخلولقوا، وأعطوا الركب أسنتها، وانزوا نزوا، وارموا الأغراض

আরাম-আয়েশ ও আজমি পোশাক থেকে দূরেই থেকো। (শুধু ছায়ায় ছায়ায় থেকো না) রোদের অভ্যাস বজায় রেখো, কারণ রোদই হচ্ছে আরবদের 'স্নান'। আহার-বিহার ও পোশাক-পরিচ্ছেদে রুক্ষ, কঠোর ও সহিষ্ণু হও। (ধোপদুরস্তির পরিবর্তে) মোটা খসখসে ও পুরোনো জীর্ণ কাপড়ে অভ্যস্ত হও। ঘোড়ার পিঠে লাফিয়ে চড়ার ও লক্ষ্যভেদের অভ্যাস করো।[১]

---

[১] رواه البغوي عن أبي عثمان النهدي

নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন–

ارموا بني اسماعيل، فإن أباكم كان راميا

হে ইসমাঈলের পুত্রগণ, তীরন্দাযি করো। কারণ তোমাদের পিতা ইসমাঈল তীরন্দায ছিলেন।[১]

অন্য এক হাদীছে সাবধান-অব্যয় ألا ব্যবহার করে বলেছেন–

ألا إن القوة الرمي، ألا إن القوة الرمي

শোনো, তীরন্দাযিই হলো শক্তি, তীরন্দাযিই হলো শক্তি।[২]

(আমার মনে হয়, মহাগুরুত্বপূর্ণ এ হাদীছটির চিরায়ত অনুবাদ হবে এই– 'শোনো, ক্ষেপণেই শক্তি, ক্ষেপণেই শক্তি', অনুবাদক)

যারা আগামী প্রজন্মের শিক্ষাদীক্ষার দায়িত্বে নিয়োজিত এবং যারা কর্ণধার ও নীতিনির্ধারক তাদের অপরিহার্য কর্তব্য হলো শিক্ষাঙ্গন এবং যুবশক্তির জীবন থেকে সর্বশক্তি দিয়ে ঐ সব উপাদান-উপকরণ দূর করা যা যুবচরিত্রে শৌর্য-সাহস, ঋজুতা ও পৌরুষ-এর বিলুপ্তি ঘটিয়ে দুর্বলতা, অক্ষমতা ও 'রমণীয়তা' সৃষ্টি করে। তাই নগ্ন-অশ্লীল, ধর্মদ্রোহী ও চরিত্রবিধ্বংসী সাহিত্য-সাংবাদিকতার মূলোৎপাটন করতে হবে, যা তরুণ ও যুবসমাজে কপটতা, লজ্জাহীনতা, পাপাচার, যৌনতা ও প্রবৃত্তিপরায়ণতার বিষ ছড়ায়। অর্থ ও বাণিজ্যের লোভে যারা মুসলিমসমাজে অশ্লীলতা ও পাপাচার ছড়াতে ভালোবাসে, সর্বশক্তি প্রয়োগ করে তাদের প্রতিহত করতে হবে। কোনভাবেই যেন তারা মহোত্তম চরিত্রের ধারক মুহম্মদ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের শিবিরে অনুপ্রবেশ করতে না পারে। সামান্য কিছু পয়সার জন্য পাপাচার, অনাচার, নগ্নতা ও যৌনতার মোহজাল বিস্তার করে যারা মুসলিম প্রজন্মের হৃদয় ও চরিত্র ধ্বংস করছে সমাজ থেকে তাদের নিশ্চিহ্ন করতে হবে।

---

[১] رواه البخاري عن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه في كتاب الجهاد والسير، وفي كتاب أحاديث الأنبياء، وفي كتاب المناقب، وأحمد في مسنده (في مسند المدنيين)

[২] رواه مسلم عن عقبة بن عامر رضي الله عنه في كتاب الإمارة، وأبوداود في كتاب الجهاد، وابن ماجه في كتاب الجهاد، وأحمد في مسند (مسند الشاميين، والدارمي في كتاب الجهاد

ইতিহাস সাক্ষী, যখনই কোন জাতির পুরুষ পৌরুষ ও মর্যাদাবোধ হারিয়ে ফেলে, আর নারীসমাজ নারিত্ব ও মাতৃত্ব পরিত্যাগ করে পর্দাহীনতা ও নগ্নতার পথে চলে যায়, ঘর ছেড়ে বাইরে পুরুষের প্রতিদ্বন্দ্বী হতে চায় এবং সৌন্দর্য রক্ষার নামে বন্ধ্যাত্বমুখী হয়ে পড়ে, তখনই তাদের ভাগ্যতারকা ডুবতে শুরু করে এবং নামনিশানা মুছে গিয়ে তারা 'ছিলো' থেকে 'নাই' হয়ে যায়।

এটাই ছিলো গ্রীক, রোমান ও পারসিক জাতির পরিণতি, আজকের ইউরোপও সেই পরিণতির পথে ধাবমান। সুতরাং সাবধান, হে আমার প্রিয় আরবজাতি! এ ভয়ঙ্কর পরিণতি থেকে সাবধান!!

শ্রেণীবৈষম্য ও অপচয় রোধ

আরেকটি দুঃখজনক বাস্তবতা এই যে, বস্তুবাদী পশ্চিমা সভ্যতার প্রভাবে এবং আরো বিভিন্ন কারণে আরবজাতি আজ আরাম-আয়েশ ও ভোগবিলাসে ভীষণ-ভাবে অভ্যস্ত হয়ে পড়েছে। জীবনের অযথা প্রয়োজন, সাজসজ্জা ও প্রসাধন, এবং সৌন্দর্য-বিলাসের পিছনে যেমন তেমনি পারিবারিক ও সামাজিক মর্যাদা রক্ষার নামে ঘটছে আল্লাহর দেয়া বিপুল সম্পদের নির্দয় অপচয়। অথচ চোখ-ধাঁধানো এ বিত্তজৌলুসের পাশাপাশি রয়েছে এমন মুখহাকরা অভাব, দারিদ্র্য, ক্ষুধা ও দৈন্য যে, ভাবতেও গা শিউরে ওঠে, চোখে পানি আসে, বুকে ব্যথা জাগে, লজ্জায় মাথা ঝুঁকে যায়। একদিকে রয়েছে এমন মানুষ, যার অনেক খানাপিনা, সোনাদানা; রয়েছে বিশাল গাড়ীবহর ও বহু অট্টালিকা; বিস্তর অপচয় করেও বুঝে উঠতে পারে না কোথায় কীভাবে রাখবে সম্পদ। অন্যদিকে অসহায় আরববেদুঈন জোগাড় করতে পারে না নিজের ও পরিবারের ক্ষুধার অন্ন ও লজ্জা নিবারণের বস্ত্র। একদিকে ধনকুবের আরব শায়খ ধুলি উড়িয়ে ঝকঝকে গাড়ী হাঁকিয়ে ছুটে যান, অন্যদিকে ছিন্ন জীর্ণ কাপড়ে শীর্ণ মলিন চেহারায় কোন বেদুঈন পরিবার ক্লান্তপথে হেঁটে যায় এবং অবাক চোখে সেদিকে তাকায়। মাথায় রুমাল পেঁচানো আরব শায়খ ও তার সুখী পরিবার কিছু দেখলেন কি দেখলেন না, বোঝা যায় না।

তো আরবের শহর-নগর ও জনপদে যতদিন উঁচু উঁচু প্রাসাদ ও দামী দামী গাড়ী এবং গরীবের অপ্রশস্ত, অপরিচ্ছন্ন আলোবাতাসহীন ঘরবাড়ী একসঙ্গে দেখা যাবে এবং একই জনপদে দেখা যাবে সম্পদের সর্বপ্লাবী ঢল এবং ক্ষুধা ও দারিদ্র্যের অসহনীয় ধকল, ততদিন বিভিন্ন নামে বিভিন্ন শ্লোগানে চলতেই থাকবে

সর্বনাশা দাঙ্গা-ফাসাদ ও বিপ্লব-গোলযোগ। শক্তির জোরে বা প্রচারণার ছলে কৌশলে তার গতি রোধ করা কিছুতেই সম্ভব হবে না। ইসলামের ভারসাম্যপূর্ণ সর্বসুন্দর অর্থব্যবস্থা ও জীবনব্যবস্থাকে যদি প্রত্যাশিত ভূমিকা ও অবদান রাখার সুযোগ না দেয়া হয় তাহলে প্রবল প্রতিক্রিয়ারূপে এবং আল্লাহর আযাব হিসাবে কোন না কোন অপশাসন ও অভিশপ্ত ব্যবস্থা দেশ ও জাতির উপর চেপে বসবে এবং যুলুম, শোষণ, অনাচার ও স্বেচ্ছাচারের নতুন ঝড় বয়ে যাবে।

বিশ্ব নেতৃত্বের শীর্ষ চূড়ায়

কী বিরাট ও কল্যাণপ্রসূ বিপ্লবই না সৃষ্টি হয়েছিলো আরবজাতির ইতিহাসে মুহম্মদী নবুয়তের আবির্ভাবের পর, যার কথা বলা হয়েছে আল কোরআনে সূরাতুল ইসরায়, অলঙ্কারসমৃদ্ধ ও সুস্পষ্ট, সমুজ্জ্বল ভাষায়! কী বিরাট নেয়ামতই না আল্লাহ দান করেছিলেন তাঁর নবীর মাধ্যমে আরবজাতিকে! একটা ক্ষুদ্র সঙ্কীর্ণ উপদ্বীপে তারা হানাহানি ও খুনাখুনিতে লিপ্ত ছিলো। এভাবেই হয়ত শেষ হয়ে যেতো এবং মুছে যেতো ইতিহাসের পাতা থেকে। কিন্তু তিনি তাদের বের করে আনলেন বিশাল বিস্তৃত বিশ্বের বুকে, তাকে শাসন করার জন্য এবং নেতৃত্ব দেয়ার জন্য। গোত্রীয় জীবনের সঙ্কীর্ণ ও শ্বাসরুদ্ধকর পরিবেশে তারা আবদ্ধ ছিলো। তিনি তাদের বিশ্বমানবতার সুপ্রশস্ত প্রাঙ্গণে নিয়ে এলেন, বিভ্রান্ত মানবতাকে পথপ্রদর্শন করার জন্য।

এ বিরাট বিপ্লব ও পরিবর্তনের কল্যাণে তারা এমন মর্যাদার অবস্থানে চলে এলেন যে, সারা বিশ্বকে চমকে দিয়ে পারস্যসম্রাটের দরবারে সাহসী ও দ্ব্যর্থহীন ভাষায় ঘোষণা করলেন–

الله ابتعثنا ليخرج بنا من شاء من عبادة العباد إلى عبادة الله وحده، ومن
ضيق الدنيا إلى سعتها، ومن جور الأديان إلى عدل الإسلام.

হাঁ, সত্য কথা! প্রথমে তাঁরা নিজেরা বেরিয়ে এসেছেন পৃথিবীর সঙ্কীর্ণতা থেকে পৃথিবীর প্রশস্ততার দিকে, তারপর বের করে এনেছেন মানবজাতিকে। গোত্র, সম্প্রদায় ও জাতীয়তাভিত্তিক জীবনের চেয়ে সঙ্কীর্ণ জীবন আর কী হতে পারে? এবং ন্যায়, সাম্য ও মানবতাভিত্তিক জীবনের চেয়ে প্রশস্ত ও উদার জীবন কী হতে পারে? তদ্রূপ ক্ষণস্থায়ী পৃথিবীর ক্ষণস্থায়ী ভোগবিলাসের জন্য দৌড়ঝাঁপ

ছাড়া আর কোন লক্ষ্য নেই যে জীবনের, তার চেয়ে সঙ্কীর্ণ জীবন আর কী হতে পারে? এবং ঈমান, রূহানিয়াত, আখেরাত ও জান্নাতের অনন্ত সৌভাগ্যের উপর যে জীবনের ভিত্তি তার চেয়ে প্রশস্ত জীবন আর কী হতে পারে?

মুহম্মদী নবুয়তের মহান বিপ্লবের কল্যাণে তাঁরা বের হয়ে এলেন জাযীরাতুল আরবের সঙ্কীর্ণ সীমানা থেকে, যেখানে ছিলো শুধু জীবনের দুর্ভোগ ও লাঞ্ছনা, ছিলো জীবনের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র স্বার্থ ও সমস্যার চিন্তা, ছিলো সামান্য সম্পদ, সামান্য নেতৃত্ব ও তুচ্ছ অহমিকার জন্য হানাহানি ও রক্তপাত; সেখান থেকে তাঁরা বের হয়ে এলেন এক নতুন পৃথিবীর মুক্ত প্রাঙ্গণে, যেখানে তাঁদের প্রতীক্ষায় ছিলো নৈতিক, আত্মিক, বুদ্ধিবৃত্তিক ও রাজনৈতিক নেতৃত্বের মহাগৌরব।

দানিউব, নীল, দজলা-ফুরাত ও সিন্ধুনদ তাঁদের কাছে সামান্য খাল-নালা ছাড়া আর কিছু নয়। আলপ্স ও পিরেনিজ পর্বতমালা, সিরিয়া ও লেবাননের পাহাড়শ্রেণী এবং হিমালয়ের সুউচ্চ চূড়া ও শিখর তাদের কাছে টিলা-টিবির চেয়ে বেশি কিছু নয়। ভারত, চীন ও তুর্কিস্তানের বিশাল বিস্তৃত দেশ তাদের কাছে ক্ষুদ্র পল্লী ও সামান্য জনপদ ছাড়া কিছু নয়। আরো সুন্দর করে বলা যায়, 'পৃথিবীর সমগ্র ভূখণ্ডকে যদি বিশ্বনেতৃত্বের শীর্ষস্থান থেকে অবলোকন করা হয় তাহলে টেবিলের উপর মেলে ধরা একটি রঙ্গীন সাধারণ মানচিত্রই শুধু মনে হবে। আর এই সব বিরাট জাতি ও জনগোষ্ঠীকে তাদের সভ্যতা, সংস্কৃতি, সাহিত্য, দর্শন ও বিপুল জ্ঞানসম্পদসহ মনে হবে বড় কোন ঘরানার ছোট ছোট পরিবার।

এই বিরাট 'পৃথিবী' অস্তিত্ব লাভ করেছিলো এক অভিন্ন ঈমান-আকীদা এবং এক সুদৃঢ় আত্মিক সম্পর্কের উপর, যা ছিলো ইতিহাসের দেখা বিস্তৃততম পৃথিবী। আর যে সব জনগোষ্ঠীর সমন্বয়ে এই বিরাট 'পরিবার' গড়ে উঠেছিলো তা ছিলো ইতিহাসের দেখা সবচে' সংহত মানবপরিবার, যাতে বিভিন্ন প্রকৃতির সংস্কৃতি এবং বিভিন্ন জাতির মেধা ও প্রতিভা দ্রবীভূত হয়ে একটি অভিন্ন সংস্কৃতির রূপ ধারণ করেছে, যার নাম ইসলামী সংস্কৃতি। এ মহান সংস্কৃতির 'গর্ভ' থেকে যুগে যুগে এত বিপুল পরিমাণে ইসলামী প্রতিভা জন্মগ্রহণ করেছে যার সংখ্যা-শুমার আল্লাহ ছাড়া কেউ করতে পারে না। এবং ধর্মীয় ও বুদ্ধিবৃত্তিক এত এত কর্ম ও কীর্তি সম্পন্ন হয়েছে, ইতিহাসের বিস্তৃত পরিসরেও যা সম্ভব হয়নি। এ নতুন নেতৃত্ব অধিকার ও যোগ্যতাবলেই বিশ্বনেতৃত্বের সমগ্র ইতিহাসের অভিজাততম,

বিরাটতম ও শক্তিশালীতম নেতৃত্ব বলে স্বীকৃতি লাভ করেছে। এই নেতৃত্ব দ্বারা আরবজাতিকে আল্লাহ মর্যাদাবান করেছেন। তারা ইসলামী দাওয়াত-এর প্রতি পূর্ণ আন্তরিক ও আত্মনিবেদিত হয়েছিলো এবং এই মহান দাওয়াত ধারণ করা, রক্ষা করা ও বহন করার জিহাদ-মুজাহাদায় নিজেকে বিলীন করে দিয়েছিলো। তাই বিশ্বের মানবমণ্ডলী তাদের এমন ভালোবেসেছে যার তুলনা নেই এবং প্রতিটি বিষয়ে তাদের এমন অনুসরণ করেছে, যার কোন নযির নেই। তাদের ভাষার প্রতি বিভিন্ন ভাষা, তাদের সংস্কৃতির প্রতি বিভিন্ন সংস্কৃতি এবং তাদের সভ্যতার প্রতি বিভিন্ন সভ্যতা আনুগত্য প্রকাশ করেছে। ফলে তাদের ভাষাই ছিলো সভ্য পৃথিবীর এক প্রান্ত থেকে অপর প্রান্ত পর্যন্ত জ্ঞানসাধনা ও গ্রন্থরচনার ভাষা। সর্বোপরি তাদের ভাষা এমন প্রিয়তা ও পবিত্রতা অর্জন করেছিলো যে, মানুষ যে ভাষায় বড় হয়েছে, প্রতিপালিত হয়েছে এবং যে ভাষায় তার মুখে কথা ফুটেছে সেই মাতৃভাষার উপরও তাকে অগ্রাধিকার দিয়েছে এবং 'ভাষাপুত্র'দের সমান, বরং আরো অধিক ব্যুৎপত্তি লাভ করেছে। এমন উচ্চস্তরের ভাষা-বিশারদ, সাহিত্যসাধক ও লেখক-গবেষকের আবির্ভাব ঘটেছে, যাদের প্রতিভা ও শ্রেষ্ঠত্ব স্বয়ং আরববিশ্বের সুশীল সমাজ, সাহিত্যিক ও সমালোচকমহল স্বীকার করে নিয়েছেন।

তাদের সভ্যতাই ছিলো আদর্শ সভ্যতা, যার গৌরবকীর্তন করেছে সর্বভাষার, সর্বজাতির মানুষ, এবং যা গ্রহণ ও বরণ করে তারা আভিজাত্য বোধ করেছে এবং উলামায়ে দ্বীন যাকে অন্যান্য সভ্যতার চেয়ে শ্রেষ্ঠ বলে ঘোষণা করেছেন এবং এ সভ্যতার বিপরীতে সমস্ত সভ্যতাকে জাহেলি সভ্যতা ও আজমি সভ্যতা বলে আখ্যায়িত করেছেন এবং ঐ সকল সভ্যতার রীতি-নীতি, ভাব ও অভিব্যক্তি গ্রহণ করতে নিষেধ করেছেন।

এই সর্বব্যাপী ও সর্বাঙ্গীণ নেতৃত্ব দীর্ঘ বহু যুগ স্বমর্যাদায় ও স্বমহিমায় অধিষ্ঠিত ছিলো। কোন জনগোষ্ঠী এর বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করার বা এর 'কবল' থেকে উদ্ধার লাভের কথা চিন্তাও করেনি; যেমনটি ঘটে থাকে প্রত্যেক পরাস্ত, বিজিত ও শাসিত-শোষিত জাতির পক্ষ হতে। কিন্তু আরবজাতির ক্ষেত্রে তা ঘটেনি। কেননা এই মহান নেতৃত্বের সঙ্গে তাদের সম্পর্ক বিজেতা ও বিজিত, শাসক ও শাসিত এবং দাস ও মনিবের সম্পর্ক ছিলো না, বরং ছিলো মুমিনের সঙ্গে মুমিনের এবং ধর্মনিষ্ঠ মানুষের সঙ্গে ধর্মনিষ্ঠ মানুষের। খুব বেশী হলে বলা যায়,

এ সম্পর্ক ছিলো অনুগামী ও অগ্রগামীর মধ্যে অনুসরণের সম্পর্ক; যেখানে অনুগামী অগ্রগামীর এ অবদান ও শ্রেষ্ঠত্ব স্বীকার করে যে, হক ও সত্যকে তারাই আগে জেনেছেন; দাওয়াতকে তারাই আগে গ্রহণ করেছেন এবং হকের দাওয়াত ও সত্যের আহ্বানের পথে তারাই জানমালের কোরবানি দিয়েছেন। সুতরাং বিদ্রোহের, অসন্তোষের এবং অকৃতজ্ঞতা প্রকাশের কোন অবকাশই নেই, বরং তাদের অবদান স্বীকার করা, এবং স্বতঃস্ফূর্ত ভাষায় কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করাই হলো ভদ্রতা ও আভিজাত্যের দাবী। কোরআনের ভাষায়–

وَٱلَّذِينَ جَآءُو مِنۢ بَعۡدِهِمۡ يَقُولُونَ رَبَّنَا ٱغۡفِرۡ لَنَا وَلِإِخۡوَٰنِنَا ٱلَّذِينَ سَبَقُونَا

بِٱلۡإِيمَٰنِ وَلَا تَجۡعَلۡ فِي قُلُوبِنَا غِلّٗا لِّلَّذِينَ ءَامَنُواْ رَبَّنَآ إِنَّكَ رَءُوفٞ رَّحِيمٌ ۝

আর যারা তাদের পরে এসেছে তারা বলে, হে আল্লাহ, ক্ষমা করুন আমাদের এবং আমাদের ভাইদের, যারা আমাদের অগ্রে ঈমান এনেছে। আর আমাদের অন্তরে, যারা ঈমান এনেছে তাদের প্রতি বিদ্বেষ রেখেন না। হে আমাদের প্রতিপালক, নিঃসন্দেহে আপনি কোমল ও দয়ালু। (আল-হাশর, ৫৯ : ১০)

এমনই ঘটেছিলো, বিজিত জাতিবর্গ আরবজাতিকে বিজয়ী শাসক না ভেবে ভেবেছে শিরক ও জাহেলিয়াত থেকে মুক্তিদাতা, শান্তির আবাস জান্নাতের পথে আহ্বানকারী ও পরিচালনাকারী এবং নীতি, নৈতিকতা, আদব ও শিষ্টাচারের শিক্ষাদানকারী।

এটাই হচ্ছে সেই বিশ্বনেতৃত্ব, নবুয়তে মুহম্মদির শুভাগমন যার বিনির্মাণ করেছে, এবং যার ঘোষণা এসেছে সূরাতুল ইসরায়। এই নেতৃত্বকে পরম মমতায় ও সযত্ন সতর্কতায় আকড়ে ধরে রাখা আরবজাতির অপরিহার্য কর্তব্য। সব মেধা, প্রতিভা এবং সাধ্য ও যোগ্যতা-এর পিছনেই ব্যয় করে যাওয়া উচিত; প্রজন্ম-পরম্পরায় দাওয়াত সম্পর্কে অছিয়ত করে যাওয়া উচিত। ধর্ম, বিবেক, বুদ্ধি ও গায়রত- কোন দৃষ্টিতেই আরবদের জন্য এর বৈধতা নেই যে, কোন যুগে কোন কারণে এই নেতৃত্বের দায়ভার থেকে তারা সরে আসবে। কেননা এই নেতৃত্বের মধ্যে প্রত্যেক নেতৃত্বের পূর্ণ বিকল্প রয়েছে, এবং আরো অধিক কিছু রয়েছে। কিন্তু কোন নেতৃত্বে না আছে এর বিকল্প, না আছে ন্যূনতম যথেষ্টতা। এ নেতৃত্ব সর্বপ্রকার নেতৃত্ব ও কর্তৃত্বকে নিজের পরিধিতে বেষ্টন করে এবং তা দেহ ও

শরীরের উপর কর্তৃত্ব অর্জন করার চেয়ে বেশী গুরুত্ব প্রদান করে হৃদয় ও আত্মার উপর কর্তৃত্ব করার বিষয়কে।

এই নেতৃত্ব লাভের পথ আরবজাতির জন্য সহজ, সরল ও পরিচিত এবং নিজেদের প্রথম যুগে একবার তারা তা পরীক্ষা করেও দেখেছে। আর তা হলো ইসলামী দাওয়াতের প্রতি ইখলাছ, ঐকান্তিকতা ও আত্মনিবেদন; মনে-প্রাণে ইসলামী দাওয়াতকে গ্রহণ ও বরণ; ইসলামী দাওয়াতের পথে আত্মত্যাগ ও সর্বস্ব বিসর্জন এবং অন্যসব জীবনব্যবস্থার উপর ইসলামী ব্যবস্থাকে অগ্রাধিকার প্রদান, এপথেই– তবে নেতৃত্ব লাভের ইচ্ছা ও উদ্দেশ্য ছাড়া– বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্তের মুসলিম জনগোষ্ঠী তাদের আনুগত্য গ্রহণ করবে, তাদের অনুসরণ করবে এবং তাদের প্রতি ভালোবাসা ও শ্রদ্ধা পোষণ করবে।

এভাবেই শুধু পৃথিবীর পূর্বে পশ্চিমে সর্বত্র তাদের জন্য খুলতে পারে বিজয়ের নতুন নতুন দুয়ার ও নতুন নতুন দিগন্ত, যা সাম্রাজ্যবাদী ও উপনিবেশবাদী পাশ্চাত্যের জন্য কখনো উন্মুক্ত হয়নি, বরং তার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ছড়িয়ে পড়েছে।

এভাবেই ইসলামের আলোকিত অঙ্গনে প্রবেশ করতে পারে নতুন নতুন জাতি ও জনগোষ্ঠী, যাদের মেধা, প্রতিভা, যোগ্যতা ও গুণভাণ্ডার এখনো নির্ভেজাল ও ব্যবহার-দোষ থেকে মুক্ত, সম্পূর্ণ নতুন অবস্থায় রয়েছে। ফলে তারা সহজেই ইউরোপের সভ্যতা, সংস্কৃতি ও বুদ্ধিবৃত্তির সফল মোকাবেলা করতে সক্ষম, যদি তারা পেয়ে যায় নতুন দ্বীন, নতুন ঈমান, নতুন প্রাণ, নতুন বার্তা, নতুন পায়গাম।

আর কতদিন হে আরব, ক্ষুদ্র তুচ্ছ ক্ষেত্রে তোমাদের বিপুল শক্তির অপচয় করে যাবে, যা দ্বারা প্রাচীন বিশ্বকে একবার তোমরা জয় করেছিলে? এই সর্বপ্লাবী জোয়ার আর কত দিন এই সঙ্কীর্ণ উপত্যকায় আবদ্ধ থাকবে, যা একদিন সমস্ত সভ্যতা ও স্বেচ্ছাচারী শাসকদের ভাসিয়ে নিয়ে গিয়েছিলো?

এবার ওঠো, জাগো এবং এই বিস্তৃত মানবসমাজের প্রতি মনোযোগী হও, যাদের নেতৃত্বদানের এবং পথপ্রদর্শনের জন্য আল্লাহ তোমাদের মনোনীত করেছেন। আর নবুয়তে মুহম্মদি ও দাওয়াতে মুহম্মদিই হচ্ছে তোমাদের ইতিহাসে এবং মানবজাতির ইতিহাসে এক নবযুগের শুভ উদ্বোধন, এবং তোমাদের ভাগ্য ও সমগ্র বিশ্বের ভাগ্য নির্ধারণের সূচনা। সুতরাং এই দাওয়াত নতুনভাবে তোমরা

গ্রহণ করো এবং এর জন্য জান-মাল সর্বস্ব কোরবান করো। আর আল্লাহ তা'আলার এই আহ্বানে লাব্বাইক বলে সাড়া দাও–

وَجَٰهِدُوا۟ فِى ٱللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِۦ ۚ هُوَ ٱجْتَبَىٰكُمْ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِى ٱلدِّينِ مِنْ حَرَجٍ ۚ مِّلَّةَ أَبِيكُمْ إِبْرَٰهِيمَ ۚ هُوَ سَمَّىٰكُمُ ٱلْمُسْلِمِينَ مِن قَبْلُ وَفِى هَٰذَا لِيَكُونَ ٱلرَّسُولُ شَهِيدًا عَلَيْكُمْ وَتَكُونُوا۟ شُهَدَآءَ عَلَى ٱلنَّاسِ ۚ فَأَقِيمُوا۟ ٱلصَّلَوٰةَ وَءَاتُوا۟ ٱلزَّكَوٰةَ وَٱعْتَصِمُوا۟ بِٱللَّهِ هُوَ مَوْلَىٰكُمْ ۖ فَنِعْمَ ٱلْمَوْلَىٰ وَنِعْمَ ٱلنَّصِيرُ

আর তোমরা আল্লাহর রাস্তায় জিহাদ করো তাঁর রাস্তায় জিহাদের হক অনুযায়ী, তিনিই তোমাদের মনোনীত করেছেন (তাঁর দ্বীনের জন্য)। আর দ্বীনের বিষয়ে তিনি তোমাদের উপর কষ্টকর কিছু আরোপ করেননি। তোমরা তোমাদের পিতা ইবরাহীমের মিল্লাত আকড়ে ধরো। তিনিই তোমাদের নাম রেখেছেন মুসলিম, পূর্বেও এবং এই কোরআনেও; যাতে রাসূল তোমাদের জন্য সাক্ষী হন, আর তোমরা সাক্ষী হও মানুষের 'উপর'। সুতরাং তোমরা ছালাত কায়েম করো এবং যাকাত আদায় করো, আর আল্লাহকে আকড়ে ধরো। তিনিই তোমাদের অভিভাবক, সুতরাং কত না উত্তম অভিভাবক এবং কত না উত্তম সাহায্যকারী!

(আলহাজ্জ, ৫০ : ৭৮)

আরববিশ্বের কাছে ইসলামী বিশ্বের প্রত্যাশা

আরববিশ্ব তার স্বকীয় গুণ ও বৈশিষ্ট্য, ভৌগোলিক অবস্থান এবং রাজনৈতিক (ও সামরিক) গুরুত্বের কারণে দাওয়াতে ইসলাম-এর সুমহান দায়িত্বপালনের সবচে' বড় হকদার। এখন সে যা করতে পারে তা হলো, ইসলামী বিশ্বের নেতৃত্বের দায়িত্বভার গ্রহণ করা। তারপর পূর্ণ প্রস্তুতি গ্রহণ করে পূর্ণ যোগ্যতার অবস্থান থেকে ইউরোপের সঙ্গে চোখে চোখ রেখে কথা বলা। তখন সে তার ঈমান ও দাওয়াতের শক্তি এবং আল্লাহর গায়বী মদদ ও সাহায্য দ্বারা ইউরোপের উপর নিরঙ্কুশ বিজয় অর্জন করতে পারবে, (হয় যুদ্ধ করে কিংবা বিনা যুদ্ধে)। এভাবে দুনিয়াকে সে অকল্যাণ ও অনিষ্টতা থেকে কল্যাণ ও নিষ্টতার দিকে পরিচালিত করতে পারবে। ইউরোপীয় জাহেলিয়াতের আজকের তাগুত যারা তাদের সামনে দাঁড়িয়ে পূর্ণ সাহসের সঙ্গে সুস্পষ্ট ভাষায় ঘোষণা করতে পারবে, যেমন মুসলিম

দূত একদিন পারস্যের রাজদরবারে ঘোষণা করেছিলেন–

'আল্লাহ আমাদের পাঠিয়েছেন তোমাদের বের করে আনতে, মানুষের দাসত্ব থেকে এক আল্লাহর ইবাদতের দিকে এবং পৃথিবীর সঙ্কীর্ণতা থেকে পৃথিবীর প্রশস্ততার দিকে এবং নানা ধর্মের অবিচার থেকে ইসলামের সুবিচারের দিকে।'

মানবজাতি আজ নিজেদের মুক্তিদাতা ও ত্রাণকর্তারূপে মুসলিমবিশ্বের দিকে আশা ও প্রত্যাশার ব্যাকুল দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে। পক্ষান্তরে মুসলিমবিশ্ব আজ তাদের নেতৃত্ব ও 'রাহবারি' গ্রহণ করার জন্য আরব বিশ্বের প্রতীক্ষায় রয়েছে।

মুসলিমজাতি কি মানবজাতির আশা ও প্রত্যাশা পূর্ণ করতে পারবে? আর আরব -বিশ্ব কি মুসলিমবিশ্বের আহ্বানে, আন্দোলনে সাড়া দিতে পারবে? বহু যুগ ধরে মজলুম মানবতা এবং ধ্বংসের দ্বারপ্রান্তে উপনীত মাননজাতি কবি ইকবালের দরদপূর্ণ কবিতার ভাষায় মুসলিমজাতির কাছে ফরিয়াদ করে আসছে, আর এখনো তারা বিশ্বাস করে যে, যে নিবেদিতপ্রাণ মানুষের হাত কা'বা নির্মাণ করেছিলো তারাই আজ পারবে পৃথিবীর 'নব-নির্মাণে'র মহান দায়িত্ব পালন করতে। ইকবালের কবিতা–

ناموس ازل را تو امینی تو امینی　　دارائے جہاں را تو یساری تو یمینی
اے بندۂ خاکی تو زمانی تو زمینی　　صہبائے یقیں درکش و از دیر گماں خیز
از خوابِ گراں، خوابِ گراں، خوابِ گراں خیز
از خوابِ گراں خیز

فریاد از افرنگ و دل آویزیٔ افرنگ　　فریاد ز شیرینی و پرویزیٔ افرنگ
عالم ہمہ ویرانہ ز چنگیزیٔ افرنگ　　معمارِ حرم! باز بہ تعمیرِ جہاں خیز!
از خوابِ گراں، خوابِ گراں، خوابِ گراں خیز
از خوابِ گراں خیز

হে মুসলিম, উর্ধ্বজগতের শাশ্বত বার্তার তুমি বিশ্বস্ত ধারক/ বিশ্বজগতের মহান অধিপতির তুমি নিবেদিত সেবক/ হে মাটির বান্দা, যমীন তোমার, যামানা

তোমার/ ঈমানের শরাব পান করো, কুফুরির বুতখানা থেকে বেরিয়ে এসো/ জেগে ওঠো, জেগে ওঠো, ঘুমের ঘোর থেকে জেগে ওঠো।

ধিক ফিরিঙ্গীকে ও তার ছল ও ছলনাকে/ কখনো সাজে লাইলী, কখনো মজনু/ ফিরিঙ্গীর চেঙ্গিজিতে জাহান আজ বরবাদ/ হে হারামের নির্মাতা, ফিরে এসো বিশ্বের বিনির্মাণের জন্য/ জেগে ওঠে, জেগে ওঠো, ঘুমের ঘোর থেকে জেগে ওঠো।

বি০ষ০য়০বি০ন্যা০স

দ্বিতীয় অধ্যায়

প্রথম পরিচ্ছেদ

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

তৃতীয় অধ্যায়

প্রথম পরিচ্ছেদ

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

চতুর্থ অধ্যায়

প্রথম পরিচ্ছেদ

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

পঞ্চম অধ্যায়

প্রথম পরিচ্ছেদ

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ